হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের

ক্ষুধার্ত সংকলন

সাতটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী সংখ্যা

সম্পাদনা

শৈলেশ্বর ঘোষ

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

সম্পাদকের
উৎসর্গ

বাসুদেব দাশগুপ্ত
সুভাষ ঘোষ
ফালগুনী রায়
তিন সহযোদ্ধার স্মৃতিতে

শৈলেশ্বর ঘোষ

হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের

'ক্ষুধার্ত'

'ক্ষুধার্ত' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আভাগার্দ কাগজ। জীবন সম্পর্কে নতুন বোধ, নতুন চিন্তা এবং নতুন সাহিত্য ভাষা সৃষ্টি করেছে এই পত্রিকা। বহু আলোড়ন, তর্ক বিতর্ক ক্রোধ এবং বিস্ময় পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। অনেকের কাছে 'ক্ষুধার্ত' আজও ভয়ের। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বাহকরা প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিয়োজিত। আর ক্ষুধার্ত সম্প্রদায় বা হাংরি কবি লেখকরা প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাকে সমূলে বিনাশ করে নিয়ে আসতে চেয়েছে মুক্ত বোধ। খুলে দিতে চেয়েছে সংবেদনার সমস্ত রুদ্ধ দরজা। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকা এই মুক্ত বোধ এবং ক্ষমতাবিরোধী জীবনসূত্র বহনকারী একটি কাগজ। ক্ষুধার্তই "আধুনিকতার শবদেহের উপর উল্লাসময় নৃত্য"।

যে পাঁচজন হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন তারা হলেন, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য এবং শৈলেশ্বর ঘোষ।

হাংরি সাহিত্য

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৩-৬৪তে। এটি বাংলাভাষার সাহিত্যে একমাত্র আন্দোলন, যাকে আভাঁগার্দ আন্দোলন বলা হচ্ছে। চিন্তা, ভাবনা, ভাষা প্রয়োগ সবকটি ক্ষেত্রেই এটি বাংলা ভাষার একমাত্র সাহিত্য আন্দোলনই নয়, বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং সাহিত্যের নতুন পথ খননকারী আন্দোলনগুলির চেয়ে কোনোভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ তো নয়ই, (এর সৃষ্টি আকস্মিক) আধুনিকতার হত্যাকারী বর্তমান পৃথিবীর অন্য দু-একটি আন্দোলনের চেয়ে কোনো কোনো চিন্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে। কেউ কেউ বিট জেনারেশনের কথা বলতে চান, কিন্তু তাঁরা বিট সাহিত্য এবং হাংরি সাহিত্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেননি। বিটরা ধর্মীয় গোষ্ঠী, যদিও সেভাবে গোষ্ঠীবদ্ধতা তাদের মধ্যে ছিল না। হাংরিরা সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধে (শুরুর প্রথম ১৫ বছরের মধ্যে বিষয়টির কোনো পরিবর্তন হয়নি) বিটরা যৌনতাকে ব্যবহার করেছে অস্ত্র হিসাবে, আমরা চেয়েছি যৌনতার স্বাভাবিক প্রকাশ, যা স্বাধীনতাকে বড়ো স্পেসে নিয়ে যেতে পারে। বিটরা সমসাময়িক রাজনীতির সমালোচনা করেছে কিন্তু আমরা সবরকম ক্ষমতার ধ্বংস চেয়েছি। এবং নিজের ভিতর থেকে ক্ষমতার ভাষাকে ধ্বংস করার কথা বলেছি। বিটদের চেতনা দখল করেছিল 'জৈন বৌদ্ধধর্ম'। আমরা আমাদের চেতনা জগৎ প্রভাব মুক্ত রেখে জীবনকে দেখতে চেয়েছি এবং সেভাবেই লেখায় তা প্রকাশ করতে চেয়েছি। এক সাহিত্যের সঙ্গে অন্য সাহিত্যের কোনো তুলনা হয় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সবদেশেরই মানুষের চেতনা অঞ্চল সম্প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু এটা ছিল আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য। হাংরি রচনা উপভোগ করা যায় না। এর

উপযোগিতা মূল্য শূন্য। হাংরি কবি লেখকরা কোনো দর্শনের উপর ভিত্তি করে লেখে না, নিজের জীবন মন্থন করে, অভিজ্ঞতার কাঁচা মালই তাদের লেখা। এতদিনের বাংলা সাহিত্যে সব সময় কোনো-না-কোনো বিদেশি কবি বা লেখকের প্রভাব আমরা লক্ষ করেছি। এই প্রথম সম্পূর্ণ বিদেশি প্রভাব মুক্ত বাংলা ভাষায় এক সাহিত্য রচিত হ'ল। হাংরি লেখালেখিকে একসময় বলা হয়েছিল ৩য় শ্রেণির আমেরিকান সাহিত্যের নকল। উদ্দেশ্য ছিল সেই প্রাথমিক পর্যায়েই এই সাহিত্যকে বিনাশ করা। সে দিনের ষড়যন্ত্র ছিল যেন কোনোভাবে পাঠকের কাছে এই সাহিত্য পৌঁছাতে না পারে। তারা প্রতিষ্ঠান ভাঙতে চায়, ক্ষমতার অচলায়তন ভাঙতে চায়, নিজের ভিতর থেকে ক্ষমতাকে মুছে ফেলতে চায়, অতএব হাংরিরা নৈরাজ্যবাদী। হাংরিরা মানুষের টোটাল ফর্মটাই ভেঙে ফেলতে চায় কারণ এই ফর্মে মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারবে না। আমরা আমাদের অস্তিত্বের আসল অর্থটাই জানি না। জানতে দেয়া হয় না। জন্মগ্রহণ ব্যর্থ হয়ে যায় যদি জানতে না পারি আমি কে এবং এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু কণা, প্রতিটি প্রাণের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারি। মহাশূন্যের জন্মগর্ভ অন্ধকারের সঙ্গে যদি পরিচয় না হয় তবে অন্তরের আলো জ্বলবে কী করে? অন্ধকার আগে, আলো পরে। অন্ধকারের বিপরীত অবস্থা আলো নয়। আলো অন্ধকারের সন্তান। আমাদের জন্মের আগেই বস্তুসমূহ ষড়যন্ত্রময় অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। ক্ষমতার প্রভাবে এই ঘটনা ঘটে। তাই বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই ক্ষুধার্তদের উদ্দীষ্ট পথ। অবশ্যই এ পথে চলার জন্য কোনো পুরস্কার নেই। বলা হয়েছিল হাংরিদের ক্ষুধা আসলে বিকৃত যৌনতার ক্ষুধা। কিন্তু আমরা জানি এ ক্ষুধা নিজেকে দগ্ধ করে নিজের সত্য আবিষ্কারের ক্ষুধা। আজ সমালোচকগণ বলছেন, হাংরি সাহিত্যই নতুন বাংলা সাহিত্য। যদিও এই সাহিত্যের গঠন প্রক্রিয়া, চেতনা স্তর এবং ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে অনেকটাই অপরিচিত। বাংলা সাহিত্যের বদ্ধ অঞ্চলটাকে এবং কনফরমিষ্টদের প্রতিরোধকে আমাকে ভেঙে ফেলেছি বললে আজ আর অহংকার করা বোঝায় না, আরও একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে হাংরি সাহিত্য কারো কোনো ফতোয়া থেকে কোনো ইস্তাহারের নির্দেশ থেকে সৃষ্ট নয়। নিজেদের জীবনই এর উপাদান।

হাংরি সাহিত্য যে চেতনা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেটি 'বাইরের'। বাইরের বলতে অবশ্যই বিদেশের নয়। 'বাইরের' বলতে এতাবৎকালের বাংলা সাহিত্য যেসব চিন্তা চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তার পরিধির বাইরে থেকে এনে ফেলা হয়েছিল এমন সব চেতনা এবং অভিজ্ঞতা — যেগুলিকে বর্জনীয় বলে শিখিয়েছিল প্রতিষ্ঠান। মানুষের অস্তিত্বের স্বাধীনতার অন্যতম শর্তই হ'ল যৌনতার মুক্তি। বিশ শতকের ষাটের দশকে ভণ্ডামির নামাবলীটা সরিয়ে মানুষের সার্বিক যৌনশক্তিকে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছিল। ভিক্টোরিয় নীতিবোধের অবদমন থেকে যৌনতাকে মুক্ত করে হাংরিরাই। আর যে ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হ'ল : মাত্র ১০/১২ বছর আগেও অর্থাৎ এই আন্দোলন শুরু হবার ৩৫ বছর পরেও তা ছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে। 'The underground has its own aristocracy — an aristocracy of absence.' ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করে হাজতে পোরার পর TIME পত্রিকার সাংবাদিক এসে হাংরি আন্দোলনের খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। আরও অসংখ্য পত্রপত্রিকা এই আন্দোলনের খবর ছাপে। এবং হাংরিদের লেখার সংকলন বেরোয় আমেরিকা এবং আরও দুই একটি দেশে। হাংরিদের লেখাপত্রও অনূদিত হতে থাকে। হিন্দি, মারাঠি ভাষায় লেখাপত্র বের হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে Now পত্রিকায় লেখা হয় যে হাংরিরা হাঁচি দিলে সেটাও খবর হয়ে যায়। এর ৪/৫ বছরের মধ্যে অবস্থাটা চলে যায় একেবারে বিপরীত মেরুতে।

কারণ হাংরি রচনায় প্রাতিষ্ঠানিক জীবনবোধের উপর আক্রমণ চলতেই থাকে। প্রতিষ্ঠানও সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই সাহিত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। এই ভয়ংকর লড়াইটা করেই হাংরি সাহিত্যকে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বের করে আনা সম্ভবপর হয়েছে। তবু বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর কাছে যে হাংরি সাহিত্য পৌঁছেছে তা নয়। প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ মিডিয়াগুলি হাংরিদের না চেনার ভান করে। চিনতে পারলেও অবশ্য আজ আর হাংরিদের কিছু যায় আসে না। প্রতিষ্ঠান শক্তি আমাদের কখনও প্রতিক্রিয়াশীল বলে, কখনো বলে নৈরাজ্যবাদী। আবার কখনও চরমপন্থী (রাজনৈতিক অর্থে)। ভাবধারা, চিন্তাচেতনা, স্বাধীনতর প্রশ্নে আমরা অবশ্যই চরমপন্থী। কোনো দর্শন, কোনো ধর্মবোধ, কোনো রাজনৈতিক আদর্শই হাংরিদের আরাধ্য নয়। তারা প্রাপ্ত শিক্ষাগুলিকে ভুলে গিয়ে নিজের চেতনা অঞ্চলকে শুদ্ধ করে একেবারে শূন্য অবস্থা থেকে শুরু করার কথা বলে। এবং হাংরিদের মধ্যে অধিকাংশই এই চেতনাই সাহিত্যে প্রয়োগ করেছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ যে আজও তারা কেউ কেউ শূন্য অবস্থানেই আছে এবং এই দীর্ঘকাল পরেও সৃষ্টিশীল আছে।

হাংরিদের উপর এবং তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের উপর দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক-মুরুব্বীদের আক্রমণ অব্যাহত আছে। তাদের লেখা প্রকাশ করা এক বিরাট সমস্যা। নানা মিথ্যা প্রচারে পাঠকদের বিমুখ করে রাখা হয়েছে। যদিও আজ সে অবস্থাটার পরিবর্তন, কিছু পরিমাণে হলেও, দেখা দিয়েছে। TIME পত্রিকার প্রচারে কারও মাথা ঘুরে না যাওয়ায় (অবশ্য একজন বাদে। সেটা পরেই বলব) নিজেদের লেখালেখি নিয়ে ভাবার সময় পেয়ে যাই। ইংরেজ এদেশে এসে এর অনড় সমাজ প্রতিষ্ঠানের উপর চেপে বসে। ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয় ইউরোপের অমানবিক এবং অবদমনকারী ভাবধারা সমূহ। হাংরিদের বিদ্রোহ এই সামগ্রিক অবদমনের বিরুদ্ধে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে এই শক্তিগুলি নিজেদের বর্জিত বিষ্ঠায় নারকীয় করে তুলেছিল। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করার তালে ছিল। ফলে ভারতীয় ভাবধারা এবং ইউরোপীয় ভাবধারা দুটোই নস্যাৎ হয়ে যায় হাংরি লেখক কবিদের কাছে। যে কজন এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছে তারা প্রত্যেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু। কিছুদিন আগে এক প্রাক্তন হাংরি যে নিজের পিঠ বাঁচাতে ১৯৬৫ সালে আন্দোলন ছেড়ে পালায়, সে উদ্বাস্তুদের নিয়ে তামাশা করতে শুরু করে এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করতে থাকে উদ্বাস্তুদের। এই প্রাক্তনটির নাম শ্রী মলয় রায়চৌধুরী। উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা, যে উদ্বাস্তু হয়নি তার পক্ষে বোঝা কোনোদিনই সম্ভব নয়। জীবনের এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে থেকেই এসেছিল সেদিন ঐ বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী এবং শৈলেশ্বর ঘোষ। বাল্যকালেই তারা যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার নির্যাসটাই নিদারুণ হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে তাদের রচনায়। বাংলার সুদুর গ্রামগঞ্জ থেকে এসে কলকাতায় আকস্মিকভাবে মিলিত হয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে তারাই হাংরি জেনারেশনকে আন্দোলনে পরিণত করবে। তাদেরই সৃষ্টি দিয়ে। এবং করেছেও তাই। ১৯৯৫ সালে 'দেশ' পত্রিকা (২০শে মে) লিখল "এঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিভাধর ; এঁদের ভিতরেই ছিল কবিতা। উচ্চশিক্ষিত এইসব যুবকেরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন প্রথা ও প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে।" আর ১৯৯৫ সালে, জানুয়ারি ৭ তারিখের The Times of India পত্রিকায় লেখা হলো, "In the 60's when he (Sakti Chattopadhaya) be come a full fledged writer he started a genre. Called Hungryalism, agenere in Bengali literature that challenged and significantly changed the language and

vocabulary of contemporary wirting.

আগেই বলেছি শূন্য অবস্থান থেকেই শুরু করতে হয়েছিল হাংরি কবি লেখকদের। না ভারতীয় না ইউরোপীয় কোনো মূল্যবোধই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সমস্ত রকম দার্শনিক চিন্তাধারার উপর পড়ল সন্দেহের কালো ছায়া। জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝে ফেলেছিলাম যে সমস্তরকম শিক্ষা যা আমরা পেরেছি পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, রাষ্ট্র থেকে বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে নিজের ভিতর থেকে মুছে ফেলতে হবে। লেখা শুরু হবে তারপর। এইসব শিক্ষা মানুষের সংবেদনার দরজাগুলি অবরুদ্ধ করে রাখে। অবরুদ্ধ দরজাগুলি খুলতে না পারলে নতুন সাহিত্য সৃষ্টিই সম্ভব নয়। আর এই দরজাগুলি উন্মুক্ত করার ফলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হলো, তাকে কেউ সাহিত্য বলে মানতেই চাইল না। তাদের বিচার ছিল, তাদের চরিত্র অনুযায়ী একেবারে সঠিক। হাংরিরা কেবল বাইরের বাস্তবকেই বিচারের কাঠগড়ায় তুলল না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তুলল, বিচারের কাঠ গড়ায়। সাহিত্যে একেবারে নতুন একটা মাত্রা। এতদিনের ধারণা ছিল কবি মানেই সে সমস্ত বিচারের উর্দ্ধে, সে শুদ্ধ, সে সাধারণ মাপের মানুষ নয়। শুধু বাস্তবটাই কবিকে পীড়া দিচ্ছে। ভেঙ্গে দেয়া হলো এই ধারণাটা। ফলে আলোড়ন, গোলমাল এবং আক্রমণ ধেয়ে এলো। এতদিন উপরের বাস্তবের আঘাতে যে অনুভূতি তৈরি হয় সেটাই ছিল কবিতার উপজীব্য বিষয়, কিন্তু আমাদের ধারণায় অনুভূতিগুলির স্থায়ীত্ব নেই, অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সেগুলি পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমাদের মতে কেবল অভিজ্ঞতাই সত্য। ফলে বলা হলো সাহিত্য হ'ল সরাসরি অভিজ্ঞতার প্রকাশ। এক এক জনের ক্ষেত্রে যা অবশ্যই হবে একেকরকম। তথাকথিত মানবতার ধারণাকে কাঠগড়ায় তোলা হ'ল। ইউরোপীয় নবজাগরণের ফসল এই মানবতার আড়ালেই তো হিটলার এবং স্ট্যালিনের গণহত্যা। এর সুবিধা ব্যবহার করে পৃথিবীর অনুন্নত দুর্বল অংশ দখল করে, শোষণ এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায় ইউরোপীয় শক্তিগুলি। এটা হয়ে পড়ে শোষণের হাতিয়ার। একের পর এক পর্দা সরে যেতে লাগল আমাদের চোখের সামনে থেকে, যা কিছু মহৎ বলে চিহ্নিত হয়েছিল একদিন তার উপর থেকে। আলোকায়িত পৃথিবীর দুটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে গেল। কলোনি তৈরি করো, শোষণ করো, বিজ্ঞান এবং শিল্পে এগিয়ে যাও এবং তাকে ব্যবহার কর শোষনের অস্ত্র হিসাবে—আর সেই বিকৃত মুখশ্রীকে সুশ্রী দেখাবার ছলনায় তৈরি হ'ল গল্প কবিতা ছবি—যাকে বলা হলো 'শিল্প'—এই শিল্প জিনিসটাকে আমরা বলেছি 'ভুষিমাল'—এই তথাকথিত শিল্পকে ধ্বংস করেছে হাংরিরা। নতুন অভিজ্ঞতার সরাসরি উপস্থাপনে শেষ হয়ে গেছে বুর্জোয়াদের ড্রয়িং রুমের শিল্প। বাংলা সাহিত্যেও আমরা অনেক ড্রয়িংরুম বিপ্লবী দেখেছি। আমাদের আক্রমণ থেকে তারাও রেহাই পায়নি। সমস্ত পৃথিবী আজ বধ্যভূমি। ক্ষমতা মানুষের জীবনের বিনিময়ে চেয়ার দখল করে থাকতে চায়। আবার ক্ষমতার একরূপ অপসারিত হয়ে আসে আরেক রূপ। এ কেবল রূপের ভেদ মাত্র—ক্ষমতা একই অবস্থায় থেকে যায় এবং মানুষের চূড়ান্ত অবদমন ঘটায়। ক্ষমতা সেই পচে যাওয়া মানবতার দোহাই পেড়ে নিজেকে সুদৃঢ় করে। শোষণ পদ্ধতির মধ্যেই বেঁচে থাকতে হয় প্রত্যেকটি মানুষকে। এবং মানুষ একে অপরকে শোষণ করে—পুরুষ শোষণ করে দুর্বল নারীকে, পিতা শোষণ করে শিশু পুত্র কন্যাকে। এই চক্রই আমাদের জীবন, আমার মনে হয়েছে মানুষ আজও এক অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব। শোষণ চক্রটি ভেঙ্গে তার সমস্ত ফর্মটার রূপান্তর চাই। রূপান্তরিত হতে হতে একদিন হয়তো তার পূর্ণ বিকশিত অস্তিত্বটি মানুষ খুঁজে পাবে। হাংরি সাহিত্য এই রূপান্তরের দিকেই আঙুল তুলে দেখায়। আমি নিজে মনে করি হাংরি সাহিত্য হলো চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুটিকে ভেঙে ফেলার পক্ষে এক বড়ো শক্তি। একটি কেন্দ্র থেকেই চিন্তা

শুরু করে মানুষ এবং তার সমস্ত অভিজ্ঞতা আবার তাকে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট কেন্দ্রে। কেন্দ্রটি ক্ষমতার তৈরি। সুতরাং ক্ষমতাকে ভাঙতে গেলে কেন্দ্রকে ভাঙা জরুরি। সেই সাহিত্যকে আমরা অস্বীকার করেছি, মানুষ যা পাড়ে এবং অপরাধ করে। আমরা সেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছি যা মানুষের চেতনাকে ডিসটার্ব করবে। সে, তার কেন্দ্রগত চিন্তার প্রভাবে এই লেখা প্রত্যাখ্যান করবে কিন্তু অনেকেই পুনরায় তাকে পড়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করবে। আরও একটা কথা স্পষ্ট করে বলার যে, যার বা যাদের রচনায় এইসব বৈশিষ্ট্য নাই তারা হাংরি আন্দোলনের ভিতরে থাকলেও, তাকে প্রকৃত হাংরি কবি বা লেখক বলে মান্য করা আজ সম্ভব নয়। প্রকৃত হাংরি রচনা পড়লেই ধরা যাবে যে সেটি হলো বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমি মনে করি হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রাণসত্য এটিই। হাংরি কবিতা বা গদ্য কোনো বিশেষ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। বা মানুষের মনে করুণ রস সৃষ্টি করে তাকে নিষ্ঠুর সত্য থেকে দূরে থাকতে প্ররোচনা দেয় না। ক্ষমতা যত কেন্দ্রিভূত হচ্ছে আমাদের বাস্তব তত প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। আজ সত্যের জায়গা সচেতন থেকে অবচেতনে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে অচেতন পর্যায়ে। সেখান থেকে সত্যকে টেনে বের করতে গেলে নিষ্ঠুরতার চাবুক চালাতে হয় নিজের উপর, বাস্তবের উপর। রচনার ভাষা হয়ে ওঠে ভয়সংকুল। তাই হবার কথা। প্রতিটি মানুষই জানে তার সত্য অভিজ্ঞতাগুলি সচেতন স্তরে কতটা ভয়ংকর মনে হবে। সাহিত্যকে আবার জীবনের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য এই ভয়ংকরের সাধনা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে এইসব কবিলেখকদের। সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে কবিতাকে মানুষের শেষ ধর্ম বলে স্বীকার করে নিয়েছি। কবিতাপাঠের সত্য-অভিজ্ঞতায় মানুষ নিজের সত্যকে খুঁজে পাবে, এটা এখন দৃঢ় বিশ্বাস। কবিতাকে তাই বলেছি চেতনার সম্প্রসারণ এবং আত্মাবিস্কার। কবি নিজের অস্তিত্বকে লেখেন। ফলে কবিতা পেয়ে যায় একটা জৈব সত্তা। এই সত্তা অনেকের সংগে কথা বলতে চায়, সেই অনেক হলেন পাঠকবর্গ। আমরা যা জানি তা ভুল জানি। ভুল সম্পর্কগুলিকে সত্য মেনে নিয়ে যখন জীবনে প্রবেশ করি তখন মানুষের যে অভিজ্ঞতা হওয়ার কথা তা হয় না। অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ বুঝতে পারে যে সে ভুল জীবন যাপন করে চলেছে। সত্য সম্পর্কটা কী, সেটা পাওয়া যাবে ''বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান''কে ভেঙে দিতে পারলে। প্রথমে কবিই একাজ করে, তার, কবিতায় বস্তু পৃথিবী এবং অন্তরজগতে তাদের সঠিক অবস্থানকে সঠিক সম্পর্কে বেঁধে দিয়ে। আর কবিতাটির চলন কোনোদিকে, কবিতাটির জৈব সত্তা কোনো অভিজ্ঞতা দিতে চায় সেটা কবিতাটির শরীরে লেখা থাকে না। সেটা থাকে কবিতাটির বাইরে। পাঠকের অবচেতনে সাড়া জাগিয়ে, তাকে জাগায়, এবং সত্যের একটা কায়া পাঠকের মধ্যে তৈরি হতে থাকে। আবার ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতায় একই সত্যের নানান প্রকার তৈরি হয়ে যায়।

এই বাস্তবকে দেখা শুরু হ'ল নতুনভাবে। পুরানো সম্পর্কের জায়গায় এলো নতুন সম্পর্ক। বস্তুগুলি স্থান পরিবর্তন করে সূচিত করল নতুন সম্পর্ক সূত্রের। বিশ্বাসের জায়গা নিয়ে নিলো অবিশ্বাস। ধর্মগুলি নির্দেশময়, তাকে অস্বীকার করা হলো। কোনো নির্দেশই জীবনকে সাহায্য করে না। নির্দেশ ছাড়াই বেড়ে ওঠে একটি গাছ। স্বাভাবিকতার বিকাশ। ক্ষমতাকে সেবা করার জন্যই নির্দেশগুলি তৈরি। সুতরাং ক্ষমতা/প্রতিষ্ঠান যা লুকিয়ে রাখে তাকে টেনে বের করতে হবে। ক্ষমতা তৈরি করে মানুষের দুর্ভাগ্য। এবং সেটাই ছলে বলে কৌশলে লুকিয়ে রাখে। প্রাতিষ্ঠানিক কবি লেখকরা ক্ষমতাকে সেবা করে বলেই মানুষের দুর্ভাগ্য চেতনাকে প্রকাশ করতে ভয় পায়। তাছাড়া আছে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা হারাবার ভয়। ক্ষমতার

আয়ত্তের বাইরে যা আছে তাই জীবন, তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তার জন্য কবিকেও ত্যাগ করতে হবে সুখ এবং সিকিউরিটির প্রলোভন। সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ দাবি করে কবিতা। ক্ষমতার সেবা করে কৃত্রিম জীবন যাপন করে প্রকৃত কবিতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। স্রষ্টাকে জানতে হয় যে কাজ সে করছে তার কোনো পুরস্কার হয় না। সর্বস্ব ত্যাগ ঐ সত্যকে তুলে আনার জন্য। যেসব দর্শন, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব মানবের সার্বিক মুক্তির কাজে লাগে না তা পরিত্যাজ্য। আর যদি আমি সেগুলিকে মেনে নিই তবে সেই মুহূর্ত থেকে আমিও হয়ে যাবো ক্ষমতার পাহারাদারদের একজন।

আর ঈশ্বর, ভালোবাসা—এইসব শব্দ? এইসব শব্দ যেসব ধারণা সৃষ্টি করে তার স্বরূপ কীরকম? ভালোবাসাকে মনে হয় জীবনের বাইরের কোনো কল্পনা মাত্র। যার নির্দিষ্ট কোনো অস্তিত্ব আমরা জীবনে বুঝতে পারি না। একরকম নয় তার প্রকৃতি। ভালোবাসার মধ্যে হিংসা লুকিয়ে আছে, এই বোধ ক্রমেই স্ফুট হচ্ছে। মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য 'ভালোবাসা' শব্দটা আবিষ্কার করেছে বলেই মনে হয় আজ। 'আমি মানুষকে ভালোবাসি'—এটা একটা অর্থ শূন্য ছেঁদো কথা মাত্র। এ হলো বিপন্ন না করার একটি কৌশল মাত্র। আর ঈশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন এক দার্শনিক। সে ছিল খ্রীস্টধর্মের ঈশ্বর। ঈশ্বর যদি বিশ্বজগতের স্রষ্টাশক্তির নাম হয়, তাহলে সে শক্তি সত্য। কিন্তু সে কোথায়? গৌতব বুদ্ধ 'আত্মার' অস্তিত্ব অস্বীকার করেও ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব ছিলেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু আমি মনে করি যদি কোনো মহাশক্তি থাকেও তবে সে ঘুমিয়ে আছে আমাদের অবচেতনে। সেখান থেকে, আগেও বলেছি, ভাষার শক্তি দিয়ে তাকে বের করতে হবে—সেই হলো সত্য। বস্তুসমূহের ঘড়যন্ত্রময় অবস্থান, এর সবচেয়ে বড়ো বাধা। ঈশ্বর ঘুমিয়ে না থাকলে, মানুষকে ভালোবাসার নাম করে দেশে দেশে পরমাণু বোমা সঞ্চিত হচ্ছে কী করে? ক্ষমতাবান মহত্বের নামাবলী গায়ে চাপিয়ে মানুষকে বঞ্চনা করছে কী করে? ধর্মগুলি এতদিন মানুষের ঘাড়ে পাপের দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ঈশ্বরকে রক্ষা করেছে। সেই ঈশ্বরের আড়ালে ধর্মগুরুই মানুষকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরকে কেবল তারাই দেখতে পায়! এই ঈশ্বর হ'ল ক্ষমতার চূড়ান্ত চেহারা। তাই ঈশ্বর নামক কেন্দ্রটির বিলুপ্তি চেয়েছি আমরা। কেন্দ্র ভেঙে দিলে শাসক থাকে না, অবচেতন, অচেতন জেগে উঠতে থাকে। তাতে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। হাংরি লেখালেখি নিয়ে যা এতকাল হয়েছে এবং হচ্ছে। সমাজ ক্ষেপে উঠেছে কারণ তারা এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমি বলি, প্রস্তুত হতে হবে। সাহিত্যকে সহ্য করতেই হবে। প্রায় ৫০ বছর পর এই সাহিত্যকে আর বিদায় করা যাবে না।

চিন্তায় কেন্দ্রিয় অবস্থানকে মুছে ফেললে প্রথমেই যা ঘটে তা হলো বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান ভেঙে যায়। সমস্ত বস্তু তার স্বকীয় অবস্থান ফিরে পায়। এর ফলে কবিতাটির কী অবস্থা হয়, আদৌ কোনো কাঠামো থাকে কী থাকে না, সে বিষয়ে দু-এক কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে। জীবন যেমন হঠাৎ এক জায়গায় শুরু হয় এবং আকস্মিকভাবে এক জায়গায় শেষ হয়ে যায়—কবিতাও তেমনি হঠাৎ শুরু হয় এবং শেষ না করেই শেষ হয়—কারণ পাঠক বুঝে যান, এটা কোনো শেষ নয়। কবি যখন তার জ্ঞানকেই লেখেন তখন তার রচিত কোনো কবিতাই শেষ কথা চলে না। কেন্দ্রিয় চিন্তা না থাকার ফলে এবং কোনো দার্শনিক তত্ত্ব না থাকার ফলে এবং বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থা ভেঙে যাবার ফলে কবিতার ভিতরে চেতন অবচেতন অচেতন—সেই মুহূর্তে সমস্ত জগৎটাই এসে ঢুকে পড়ে। ভালমন্দের কোনো বাছবিচার করা সম্ভাব নয় কবির পক্ষে। কারণ তখন সে কিছু 'নির্মাণ' করছে না, তার কলমের

মাধ্যমে তার জীবন এবং জগৎ দুটোই তাদের সমস্ত রুঢ়তা নিয়ে এসে পড়েছে। কিন্তু যৌনতার ব্যাপারে বাঙালি পাঠকের এবং প্রতিষ্ঠানের সমস্যা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘকালের অবদমিত যৌনতা তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলে এরকম প্রতিক্রিয়া হবেই। অবদমিত যৌনতার প্রকাশ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করে। আমাদের কাছে যা স্বাভাবিক মনে হয়েছে অন্যদের কাছে তাকে মনে হয়েছে 'বিকৃত'। এই সাহিত্য কিন্তু যৌনতার শুচিবাই বহুল পরিমাণে দূর করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এতদিন কবি কবিতা লিখেছেন, সমস্ত কবিতায় তারই স্বর। এক-স্বর কবিতা। কিন্তু এখন কবির নিজের স্বরের সঙ্গে এসে উপস্থিত হচ্ছে কবিতার মধ্যে সমস্ত জগৎ তার বস্তুসমূহের নিজ নিজ স্বর নিয়ে—কবিতা হয়ে উঠেছে বহুস্বর। আবার কোনো কেন্দ্রিয় অর্থ না থাকায় অভিজ্ঞতাপ্রসূত ইমেজগুলি এক পাঠকের কাছে একএকটা তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তারাও হয়ে যাচ্ছেন ভিন্ন একটি কবিতার রচয়িতা। কবিতা তখন আর কেবল সেই কবির নয়, পাঠকেরও সৃষ্টি। এক একটা ইমেজ এইভাবে বহুস্বর পেয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ আমি মূলত কবিতা সম্পর্কে বললেও কথাগুলি হাংরি গদ্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

অবদমিত যৌনতার প্রথম বিস্ফোরণ হাংরি সাহিত্যে ঘটেছিল এই লাইনটির মধ্যে দিয়ে। এটি একটি ১৬ লাইনের কবিতা যার প্রথম লাইনটি ঃ "তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্য বিছানায়।" এটি ১৯৬২।৬৩ রচনা। ১৯৬৪-র হাংরি বিস্ফোরণটি ঘটার তখনও এক বছরের বেশি বাকি। সমাজের বিরাট অংশ এবং স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এর রচয়িতার উপর। কলকাতার বহু প্রতিষ্ঠান—এর মধ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে পুলিশকে উসকিয়ে দেয়া হয়। এতদিনের লালিত আদর্শ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্ম, রুচি সব যে যায়! পুলিশ বসে থাকেনি। হেনস্থা করা হলো কবিকে। তারপর এলো ১৯৬৪র সেপ্টেম্বর। পুলিশ হাতকড়া পরালো ৬ জনের হাতে। ঢোকানো হলো হাজতে। শুরু হলো বিচার। পরে এ ব্যাপারটায় আসছি।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলার আছে। দুজনের কেউই হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্ম। নিজ নিজ ঈশ্বরের স্তুতি তাঁরা করে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দের রচনায় বাস্তব জীবন যেভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে ঈশ্বর চেতনা তা হয়নি। যেন ভেতরেই তাঁকে রেখে দিয়েছিলেন। যদিও সমস্ত কবিতার আবহে যে আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে তা ঈশ্বর বিশ্বাস থেকেই এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর ঈশ্বর একেবারে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত আছেন। কথাটা তুললাম এজন্য যে আমাদের কবিতায় যেমন ঈশ্বর উপস্থিতও নেই তেমনি অনুপস্থিত নেই। আসল কথাটাই বলা যাক ঃ অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই এই কবিতাকে চালনা করে না। সত্যের অনুসন্ধানই সেখানে সব। অর্থাৎ সমস্ত রচনাই হয়ে ওঠে এক একটি অনুসন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ আলোর বিপরীতে অন্ধকারকে দেখেছিলেন। জীবনানন্দ খানিকটা এগিয়ে পৃথিবীতে অন্ধকারের উৎসব দেখেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি সৃষ্টির মৌলিক অবস্থাটির নামই অন্ধকার। আলো তার গর্ভের সন্তান। অন্ধকার আমাদের আদি মাতা। অন্ধকারের ঘোনিত শব্দবন্ধটি এই ইঙ্গিত বহন করছে। জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'অন্ধকার' কবিতায়। আমরা অভিজ্ঞতাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু জীবনানন্দের কাছেও কিছু জিনিস শিখে নিয়েছিলাম। তাই অন্ধকারকে না চিনলে আদি মাতাকে না চিনলে নিজেকে চিনব কী করে। তাই কবিতার মধ্যে এমন সব জিনিস ঘোরাফেরা করতে লাগল, যার রং সমাজের মাথাদের কাছে বেশ কালো বলে মনে হলো। তারা বলেন ঃ এ নৈরাজ্য। সব ভেঙে ফেলতে চায় এরা। কেউ বলেন, "কোনো

শ্মশানে ঠাঁই হবে না এই কাপালিকদের।" আমাদের মজাই লাগছিল। কি আর হবে খুব বেশি হলে মেরে ফেলবে। একবার তো বৌবাজার ব্যায়াম সমিতিকে লাগাবার তোড়জোড় চলছে শুনেছিলাম।

হ্যাঁ, আমদের গ্রেপ্তারের কারণ দুটি এখানে উল্লেখ করা দরকার। "অশ্লীল সাহিত্য রচনা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র"—এই ছিল অভিযোগ। যৌনতার ব্যাপারটা কিছুটা সংক্ষেপে বলেছি। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি কিন্তু আজও সত্য। ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করার কথা যখন বলি তখন তো রাষ্ট্র শক্তিরও বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। অনেক দর্শনশাস্ত্রের এবং বিপ্লবের পরেও রাষ্ট্র মুছে যায়নি, যাবার কোনো কারণও দেখা যাচ্ছে না। কারণ যারা রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা দখল করে, ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার ফলে রাষ্ট্রশক্তিকে শুধু রক্ষা করতে তৎপর হয় না, নিজেরাও যেন ক্ষমতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে সজাগ থাকে। রাষ্ট্র শক্তি ক্ষমতার চূড়ান্ত অবস্থা হলেও ক্ষমতা কাজ করছে সমস্ত রকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। সমাজ, পরিবার, শিক্ষাক্ষেত্র এবং তার চেয়েও ছোটো ছোটো ক্ষেত্রগুলির মধ্যে দিয়ে

যে অস্ত্রের নাম যুক্তি তাই দিয়ে শাদা-কালোকে, ভালো-মন্দকে, ঘৃণা-ভালোবাসাকে ক্ষুদ্র-মহৎকে, প্রেম-অপ্রেমকে, যুদ্ধ-শান্তিকে আলাদা করে দেখানো হচ্ছিল। আধুনিকতার অস্ত্রটির বহুল প্রয়োগ শুরু হয় পশ্চিমে। অবশ্য যুক্তির এই প্রয়োগের বিরুদ্ধে কথা বলার মানে এই নয় যে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যুক্তির প্রয়োজন নাই। যুক্তি প্রয়োগের ফলে মানুষ আজকের মানুষ হতে পেরেছে। কিন্তু আমরা যা বলছি তা সাহিত্যদর্শন সমাজনীতি, রাজনীতির ক্ষেত্রের কথা। এখানেই যুক্তিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়। একাজ করা হয়েছিল বিশেষ করে বিমূর্ত ধারণাগুলির ক্ষেত্রে। যেগুলির সত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া হয়েছিল নিজেদের সুবিধার জন্য। এটা ছিল নবজাগরনের সবচেয়ে বড়ো 'অবদান'-আলোকায়ণের দান। তাই এতদিনের সাহিত্যে যে যুক্তি পরম্পরা সাজানো হতো তা ভেঙে ফেলার দরকার হয়েছিল। যুক্তি পরম্পরা ভেঙে দেবার ফলে পাঠকের বহু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কারণ তার মস্তিষ্কটি যুক্তির শক্তিতে একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে ওঠার পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র লুপ্ত হলো, যুক্তি পরম্পরা অকেজো হয়ে গেল, আত্মপ্রকাশের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় যৌনতার রুদ্ধ দুয়ার খুলে ফেলা হ'ল এবং ভাষার মধ্যে চলে এলো সমাজের অবদমিত শ্রেণির বহু ব্যবহৃত স্ল্যাং। মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল এতদিনের ক্ষমতার তৈরি নন্দনতত্ত্ব। 'সাহিত্য-শিল্প' ধারণাটাকেই বিদায় করে দেওয়া হ'ল।

যেসব চিন্তাভাবনাকে সমাজ দূষনীয় বলে লুকিয়ে রাখে সেগুলির মধ্যেই থাকে সেই সময়ের সত্যটি। সুতরাং সত্যকে যদি জানতে হয় ঐ সব চিন্তার সঙ্গে সহবাস করতে হবে। কবিতা তার হৃদয়টি দান করে বসল তুচ্ছ, দূষণীয়, যৌনতার প্রবল আবেগ এবং লুকিয়ে রাখা চিন্তাসমষ্টিকে। এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং সুভাষ ঘোষের হাতে যে গদ্য সৃষ্টি হলো তাতেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক কবিতার ক্ষেত্রে যা যা ঘটেছিল তাই। হাংরি গদ্যও কবিতার চাইতে এক মিলিমিটার পিছিয়ে ছিল না।

'চেতনা' শব্দটার মধ্যেও রয়েছে গোলমাল। চেতনা হয় সৎ, না হয় অসৎ। ক্ষমতার গর্ভাশয়ে যে চেতনার জন্ম তা আমাদের কাছে অসৎ। অবদমিতের চেতনাই আমাদের কাছে সৎ। তার মধ্যেই সত্য আছে। আর ক্ষমতার গর্ভে যে চেতনার জন্ম তার মধ্যে আছে অন্যকে শোষণ করার এবং ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষা।

এই সংকলনের প্রথম ভাগে রাখা হয়েছে washington state university-র অধ্যাপক

Howard Mccord-এর একটি রচনা। লেখাটি হাংরি কবিতা সম্পর্কে। ১৯৬৪-তে আমাদের গ্রেপ্তার এবং তুমুল উথাল পাথালের মধ্যেই তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। তার মন্তব্যটি ঃ "That any poetry written in India is a miracle...the poetry of the Hungry generation is dangerous and revolutionary, cleanses by violence and destruction and confounds the reader."

ভাষা সম্পর্কে আমাদের চিন্তার সঙ্গে আগের কোনো ভাষাচিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে মনে হয় না। ১৯৭১ সালে লেখা প্রবন্ধ থেকে প্রথমে একটু উদ্ধৃতি দিয়ে নিই। "শব্দের আদিম জৈবতা নষ্ট করে তাকে বাজারী বেশ্যায় পরিণত করা হয়েছে। আজ একাজে সবচেয়ে অগ্রণী মধ্যবিত্ত ভাঁড়ের দল, যারা যে কোনো প্রকৃত সৃষ্টির উপর তাদের কলঙ্কিত বীর্য নিক্ষেপ করে তাকে ধ্বংস করতে চায়।" ভাষা নিয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করতে করতে আমার এ বিশ্বাস জন্মায় যে হাংরি আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে নতুন সাহিত্য ভাষা সৃষ্টির আন্দোলন। সংবেদনার দরজা যদি খোলা যায় তবে দেখা যায় ক্ষমতার প্রভাব মুক্ত ভাষা স্রষ্টার চেতন অবচেতন এমনকি অচেতন প্রদেশটিতে ঢুকে যেতে পারে। তুলে আনতে পারে অভাবনীয় সব সম্পর্ক সূত্র। জানা যায় বস্তুগুলির সত্য অবস্থান। আলো-অন্ধকার, ঘৃণা-ভালোবাসা, যুদ্ধ ও শান্তির দ্বৈত অবস্থান মুছে যায়। "একটি নতুন ভাষা একটি ভয়ংকর বিপ্লবের ফল।" "ভাষাকে যে আক্রমণ করে সেই ভাষাকে বাঁচায়।" আর নিজেকে যে আক্রমণ করে সেই নিজেকে বাঁচায়। "ভাষা বিমোচন" রচনায় এই কথাগুলি লেখা হয়েছে, "ক্ষমতাই ভাষাকে নির্মাণ করে। পুরুষতন্ত্র যে উদ্দেশ্যে এবং যে পদ্ধতিতে নারীকে নির্মাণ করে নিয়েছে, অনেকটা সেই ভাবে। কিন্তু ক্ষমতার পদ্ধতি আরও জটিল এবং ভয়ঙ্কর। আমরা যে ভাষায় ভাব বিনিময় করি, সেটি ক্ষমতার নির্মাণ। রচনাকার যে ভাষায় 'কবিতা' রচনা করেন, সেটি ক্ষমতার ভাষা। রচনাকার যে ভাষায় গদ্য রচনা করেন সেটিও ক্ষমতারই ভাষা। এমনকি যে ভাষায় আমরা নিজের সঙ্গে কথা বলি, তারও চরিত্র নির্দিষ্ট করে দেয় ক্ষমতা। ক্ষমতার ভাষা আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক অবস্থানকে অস্বীকার করে—এটা আমাদের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। অস্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তনের যে অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চিত হতে থাকে তাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না, কারণ আমাদের নিজের ভাষা নেই। ক্ষমতা পরিবর্তনকে অস্বীকার করে। তার কেন্দ্রটি স্থির। পরিবর্তন, অস্থিরতা ক্ষমতার আধিপত্যকে বিনাশ করতে চায়। পরিবর্তনকে স্বীকার করলে কেন্দ্রটি ভেঙে যায়। ক্ষমতার ভাষার চাপে মানুষের চিন্তা জগৎ ক্ষমতা নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ হয়ে যায়। তার সংবেদনার দরজাগুলি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে জ্ঞানচৈতন্যের নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় না। মানুষের যে জ্ঞান চৈতন্যের উৎপাদন হয়, ক্ষমতাই তার উৎপাদক। চেতনা জগতে বিরাট অন্তর্ঘাত না ঘটলে মানুষ ক্ষমতার ভাষাকেই নিজের বৈধ ভাষা বলে ভাবতে থাকে।"

"ক্ষমতার ভাষা মানুষকে disintegrate করে— তার অস্তিত্বকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। একের সঙ্গে অন্যের কম্যুনিকেশন বন্ধ করে দেয়। প্রতিটি অস্তিত্ব নীরবতার অন্ধকার সমুদ্রে দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হয়। শেষে তার অস্তিত্ব মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। ক্ষমতা জানে মানুষ যদি তার integrity ফিরে যায়, অস্তিত্বের ভাঙা টুকরোগুলিকে একত্র করে তুলতে পারে, অস্তিত্ব নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত করে তুলতে পারে, তবে ক্ষমতা বিপন্ন হয়, ধ্বংস হয়। সেই মানুষের অস্তিত্বে ক্ষমতার বাসস্থানটি ধ্বংস হয়। ক্ষমতা ভাষার মাধ্যমেই এই বাসস্থানটি তৈরি করে। ক্ষমতার ভাষা তৈরি হয় ক্ষমতার মূল্যবোধগুলি দিয়ে। মানুষের মস্তিষ্কে এই মূল্যবোধগুলি জায়গা করে নেয় ভাষার সাহায্যে। ক্ষমতার ভাষা ক্ষমতার আদেশ নির্দেশগুলি বহন করে।

ক্ষমতার অধীন সমস্ত ক্ষমতাশূল্য অবদনিত মানুষ ক্ষমতার আদেশ নির্দেশগুলিকে বেঁচে থাকার উৎকৃষ্ট উপাদান হিসাবে ভাবতে শেখে। ভাষা দিয়েই ক্ষমতা তার আদেশ নির্দেশের মোড়কে মানুষকে আটকে ফেলে। আর এই মোড়কটিই সেই মানুষের কাছে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে হয়।"

"মানুষের যৌনতার অবদমন ঘটে (ক্ষমতার দ্বারা) ক্ষমতার স্বার্থে। যৌন মুক্তি মানুষের স্বাধীনতা চেতনাকে আরও প্রসারিত করে। ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের যে নিরন্তর সংগ্রাম সেটা নিজেদের স্বাধীনতা চেতনাকে সম্প্রসারিত করার জন্যই। ক্ষমতা মানুষকে ছোটো মানুষ করে রাখতে চায়।...মানুষ ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত অবদমন থেকে মুক্ত হলে তখন সেই ক্ষমতা শূন্য মানুষই মুক্ত চেতনার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে।" ("ভাষা বিমোচন")

ক্ষমতার ভাষায় যারা কবিতা লেখেন গল্প উপন্যাস লেখেন তারা কখনই ক্ষমতার মুখটিকে উন্মুক্ত করেন না। তারা ক্ষমতার রক্ষক। এইসব কবিলেখক সম্প্রদায় মানুষের স্বাধীন সত্তার শত্রু। এরা দক্ষিণপন্থী। ভাষার ভিতরের দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি কখনই তারা সৃষ্টি করতে পারেন না। তারা একপক্ষকে সমর্থন করছেন। যে পক্ষের কোনো সংগ্রাম নাই আছে শোষণ এবং অবদমন। মুক্ত সংবেদনাগুলি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করলে তবেই এই দ্বান্দ্বিক অবস্থাটা স্পষ্ট হয়। আসে নতুন অভিজ্ঞতা। ক্ষমতার ভাষা ব্যক্তিকে যে মোড়কে ঢেকে ফেলে ব্যক্তি তার বাইরে আর কিছুই দেখতে পায় না। 'বাইরে' বলে কিছু থাকতে পারে এটা সে আর বিশ্বাসই করে না। নতুন অভিজ্ঞতার সামনে পড়ে যে হতভম্ব, হতচকিত, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ঐ রচনাকে সাহিত্য হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। মুক্ত ভাষা হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক। ভাষার প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এই বিরোধের বীজ। এই জন্যই বলা হয়েছে 'Language is class struggle'—প্রাধান্যবাদীর ভাষা ভেঙে তৈরি হয় অবদমিতের ভাষা, এই ভাষাই কবিতার ভাষা, গদ্যের ভাষা। আমাদের ভাষা। ক্ষমতা (বুর্জোয়া), যে রুচির গাওনা গায়, আমরা সেই রুচিকে অস্বীকার করি। কারণ বুর্জোয়ার আধিপত্য এবং ভণ্ডামি আড়াল করে তাদের তথাকথিত সুরুচি।

মানুষ আজ দাঁড়িয়ে থাকে অন্যের পায়ে। কথা বলে অন্যের মুখ দিয়ে। দ্যাখে অন্যের চোখ দিয়ে শোনে অন্যের কানে। কেবল কবিই সর্বস্বহরণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিজের পায়ে। কথা বলে নিজের মুখে। দ্যাখে নিজের চোখে। রচনা করে নিজের ভাষায়। নিজের সময়কে আবিষ্কার করে তার গর্ভে নিজের ভাষা দিয়ে সত্যের বীজটি বপন করার শক্তি কেবল তারই আছে। মানুষ আর ট্র্যাজেডি চিনতে পারে না। তাকে জীবনকে দেখতে শেখানো হয়েছে কমেডি হিসাবে। ফলত ট্র্যাজেডি এবং কমেডি দুই-ই বিলুপ্ত। সে বিশ্বাস করতে শিখেছে যে জীবনটা হ'ল 'বিনোদন' মূলক পার্থিব অবস্থাগুলিকে উপভোগ করা মাত্র। ক্ষমতাবান অবস্থান করে তার সুরক্ষিত দুর্গে—আর তার বাইরে অক্ষম, দুর্বল, অবদমিতের দল। যাদের রক্তে ক্ষমতার দুর্গটি শক্তি অর্জন করে নেয়।

তাই হাংরি সাহিত্যকে বলা হয়েছে, নিজের ভিতর থেকে ক্ষমতার বাসস্থানটি লুপ্ত করে, সংবেদনাকে মুক্ত করে, নিজের ভাষা আবিষ্কারের আন্দোলন। ভাষা দিয়েই সত্য অভিজ্ঞতাটি প্রকাশিত হবে। স্বর্গ এবং নরক মুছে গিয়ে এখন একটা জিনিস সামনে আছে তার নাম, জীবন।

[১৭]

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন/ক্ষুধার্ত আন্দোলন

যা ক্ষমতার নন্দনতত্ত্বে সাহিত্য হিসাবে গণ্য ছিল না তাকেই যারা সাহিত্য করে তুলেছিল, তারা ক্ষুধার্ত সম্প্রদায়। হাংরি জেনারেশন। অবচেতনকে যারা আকাঁড়া ভাষায় তুলে নিয়ে এসে বলেছিল,—এই অভিজ্ঞতাই সাহিত্য—তারাই ক্ষুধার্ত সম্প্রদায়। বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই হাংরি আন্দোলন। ক্ষমতার ভাষাকে ধ্বংস করে নিজের ভাষা আবিষ্কারের পদ্ধতিটিই ক্ষুধার্ত সাহিত্যের পদ্ধতি। ক্ষমতার বাসস্থানটি নিজের ভিতর থেকে উৎপাটিত করার জন্য যে আন্দোলন, সেটিই হাংরি জেনারেশন আন্দোলন। আধুনিকতার শবদেহের উপর উল্লাসময় নৃত্যের নাম হাংরি আন্দোলন।

কীভাবে এই আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই এবার আমরা দেখব।

গায়ে পেট্রল ঢেলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতিবাদ ও আত্মত্যাগের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। আত্মকে ত্যাগ করতে না পারলে সত্যকে পাওয়া যায় না। সত্যকে ভাষা দিয়ে উন্মোচিত করা ব্যতীত সাহিত্যের আর কোনো মূল্য নেই। আর এই আত্মত্যাগ ব্যর্থ মনে হবে যদি তা প্রতিবাদ থেকে না ঘটে। ভুল বলা হ'ল। আত্মত্যাগ মাত্রেই চূড়ান্ত প্রতিবাদ। মানুষ, 'মানুষ' হয়ে উঠতে চাইছে এই প্রতিবাদের অস্ত্রটি ব্যবহার করে। প্রতিবাদেই জন্ম নেয় নতুন চেতনা, নতুন জীবন বোধ, জীবনকে দেখার ও বোঝার জন্য নতুন সাহিত্য পদ্ধতি। এ জন্য দরকার নতুন চোখ। দরকার হয় পূর্ব শিক্ষা মুক্ত মানস। ভোগবাদ এবং কৃত্রিম জীবন ক্রমশ আমাদের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে আজও বেঁচে আছে সেই প্রথম আদিম সত্তাটি। সে ছিল মুক্ত। মানুষের তৈরি কোনো অস্ত্র দিয়েই মারা যায়নি সেই সত্তার যেটুকু আজ অবশিষ্ট আছে, তাকে। সেই সত্তাই বিদ্রোহ করতে বলে মানুষকে।

আজ আমরা জানি না, আমরা কে। আমাদের যে পরিচয় এই পৃথিবীতে তৈরি হচ্ছে, আমরা মেনে নিই তাই। সংখ্যা ছাড়া আজ আমরা কিছুই নয়। নিজের অজ্ঞাতেই শূন্য হয়ে, অর্থহীন হয়ে পড়েছি আমরা। সকলেই সন্ত্রস্ত, সকলেই ভীত। ভয়ই চালনা করে আমাদের। এতদিনের সমস্ত ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিদ্রোহ, বিপ্লবকে অতিক্রম করে একটাই স্লোগান মানুষের কানে বাজে "ভোগেই জীবনের সার্থকতা"। একটা আন্দোলনের মধ্যেও এ ঘটনা ঘটে যায়। কেউ জীবন বাজি রেখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার কেউ ঝাঁপ দিয়ে বুঝতে পারে ভুল করেছে—আন্দোলন ছেড়ে পালায়, ক্ষমতার সেবা করলে যথেচ্ছ পরিমাণ ভোগ করা যাবে। আমাদের পৃথিবীতে এরকমই ঘটে। বুঝতে পেরেও মানুষ লোভের বশে সরে যায় জীবন সত্য থেকে। এরকম দু'একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, আন্দোলন যদি আন্দোলিত করে তোলে সমাজ প্রতিষ্ঠানকে, যদি সত্যের দিকে মুখ ফেরাতে ডাক দেয়া যায় মানুষকে—তবে যারা শেষ পর্যন্ত আত্মত্যাগ করে, তারা জীবনের অর্থ পেয়ে যায়। আমি মনে করি আজকের সাহিত্য সত্যকে চিনতে মানুষকে সাহায্য করবে, তাকে বলবে, 'তুমি নিজেকে আবিষ্কার কর'। যে সাহিত্যের বিনোদন মূল্য আছে, সেটা মানুষের হাতে ধরিয়ে দিলে মানুষ নিজের অস্তিত্বের তলদেশ পর্যন্ত খুঁজে দেখার কথা আর ভাববে না। খুশি হবে ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠান। সত্য যখন জঞ্জালের স্তূপে চাপা পড়ে যায়, তখন নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে ঐ জঞ্জাল সাফ শুরু করতে হয়। প্রকৃত সাহিত্যের মধ্যে এই উপাদানটি লক্ষ করা খুব কঠিন নয়। জীবন যত কৃত্রিম হবে, ভোগবাদ জীবনকে চালনা করবে, কবির ভাষা ততই হবে নিষ্ঠুর। চুল্লির ভালোবাসা জীবন আমাদের, পুড়ি আর দেখি। তাই, "before poetry can be human again it must learn to be cruel" মধ্যবিত্ত

জীবনবোধ, যা ক্ষমতাকে সেবা করার ফল হিসাবে সৃষ্ট তার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, সেই ১৯৬৩-৬৪তে। এবং 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন' নামে যার প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে ১৯৬৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বরে। ক্ষমতাচক্রের বাইরে প্রত্যেকটি মানুষ আজ জানে যে বন্দি অবস্থায় ধ্বংস হওয়া ছাড়া তার কপালে অন্য কিছু লেখা নেই। কেউ কেউ অন্যের হাতে ধ্বংস হওয়ার চাইতে নিজের হাতে ধ্বংস হওয়া শ্রেয় মনে করে। পেট্রল ঢেলে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আজ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকে যে অভিজ্ঞতা নিতে হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে আজকের তৈরি আধুনিক সাহিত্যকে একটা বিনোদনমূলক খেলা বলেই মনে হবে। একথা বলাটা আর বাড়াবাড়ির মধ্যে পড়ে না যে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতাকে ধ্বংস করার জন্য আমরা যা করতে চেয়েছিলাম, তা করেওছিলাম। এবং এ কাজের জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাও আন্দোলনের স্রষ্টা পাঁচজনকে দিতে হয়েছে। আমি দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ১৯৬১-তে কলকাতায় একটা জায়গা পেয়ে যাই। বন্ধু সুভাষ ঘোষের সঙ্গে একত্রে থাকা শুরু। কলকাতায় একটা তাড়নায় এসেছিলাম। সাহিত্যটা মাথার মধ্যেই ছিল। সম্ভবত ১৯৬২ সাল নাগাদ কফি হাউসে ছোটো ছোটো বুকলেট বিলি হয় কয়েকবার তাতে লেখা হত "হাংরি জেনারেশন" কথাটি। সম্প্রতি কাগজে একটা লেখা পড়ে জানতে পারি সেটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি। শক্তিই নেতা, সঙ্গে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং পাটনা নিবাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারী মলয় রায়চৌধুরী। তাকে কলকাকাতায় কখনো দেখা যায়নি। হাংরিকে ওরা সকলেই পরে বলেছেন, "মজা করা।" আধুনিক জীবনে "মজাটাই" সকলে উপভোগ করে। এসব লিফলেট বুকলেটে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া কোথাও দেখা যায়নি। আবার শোনা গেল কৃত্তিবাস গোষ্ঠীরই একটা অংশ নিজেদের স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্বের জন্য শুরু করেছে হাংরি জেনারেশন। যাইহোক শক্তির যে লেখা থেকে এটা শুরু হয়েছিল সেটার কিছুটা উদ্ধৃত করছি, কারণ এগুলিই ঐতিহাসিক ঘটনা। এসবের স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিল অপরিহার্য। শক্তি বিনয় মজুমদারের "ফিরে এসো চাকা" বইটির আলোচনা করতে গিয়ে কথাগুলি লিখলেন, "বিদেশে সাহিত্য কেন্দ্রে যেসব আন্দোলন বর্তমান হচ্ছে, কোনটি বীট জেনারেশন, কোনটি এ্যাংরী বা সোভিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলা দেশেও কোনো অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে ক্ষুধা সংক্রান্ত আন্দোলন হওয়াই সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক পরিবেশ অ্যাফ্লুয়েন্ট—ওরা বীট বা এ্যাংরী হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলা হবে। কোনো রূপ, কোনো রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।" এই হচ্ছে হাংরি জেনারেশন কথাগুলির উৎপত্তি। শক্তি হাংরি জেনারেশন মামলার সময়েও বলেছেন, "It is a fact this literary movement, Hungry generation movement was started by me with some other friends." (১৯৬৪) আরও পরে Penguin থেকে প্রকাশিত New writings of India বইতে পুনরায় একই কথা বলেছেন। ১৯৬৩-তে বা তার একটু আগে, হয়তো ৬২-তেই দুটি ঘটনা ঘটে। হাংরি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমালোচকদের মতে দুটি ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। বাসুদেব দাশগুপ্ত লিখলেন তার বিখ্যাত গদ্য "রন্ধনশালা" আর আমার প্রথম কবিতা "ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা" প্রকাশিত হলো।

এই দুটি লেখা সম্পর্কে ১৯৮১-তে আজকাল পত্রিকায় লেখা হ'ল, "ক্ষুধার্ত আন্দোলন কিছুদিনের মধ্যেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। "ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা" নামে এক দীর্ঘ কবিতা ক্ষুধার্ত বুলেটিনে লিখে শৈলেশ্বর ঘোষ সকলের নজর কাড়েন। টাইম ম্যাগাজিনে শৈলেশ্বর উৎপল, দেবী রায় ইত্যাদির ছবি বেরয়। পুলিশ অশ্লীলতার দায়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার

করে।—বাসুদেব দাশগুপ্ত তাঁর অভিনব রন্ধনশালা গল্প সংকলন বের করেন ও ক্ষুধার্ত পত্রিকা তাঁদের কয়েকজনের দায়িত্বে বেরোতে থাকে।" (ছোট কাগজ ও আন্দোলন ঃ আজকাল পত্রিকা ; ২৮ জুন ১৯৮১) কিন্তু এখানে একটু সংশোধন দরকার। আমার কবিতাটি কোনো ক্ষুধার্ত বুলেটিনে বের হয়নি, বের হয়েছিল 'এষণা' পত্রিকায় এবং বাসুদেবের গল্প বেরিয়েছিল "উপদ্রুত" পত্রিকায়।

১৯৬৩-তে আমাদের বন্ধু সতীন্দ্র ভৌমিক আমার ঐ কবিতার শেষ অংশ, যার প্রথম লাইনটি "তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্য বিছানায়" নিজে একটি হাংরি বুলেটিনে ছেপে বের করে। সঙ্গে সতীন্দ্রের একটা গদ্য। তখন ঐভাবেই হাংরি লিফলেট বের হচ্ছিল। আমার ঐ কবিতা বের হওয়া মাত্র শক্তি ভীষণ চটে গেলেন। সরাসরি কবিতাটিকে অশ্লীল বলে বন্ধ করে দিলেন হাংরি জেনারেশন। ওদিকে মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশনে থাকার জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে চিঠিতে এপোলজি চাইলেন। গ্রেপ্তার করে লালবাজার নিয়ে গিয়ে আমাকে পুলিশের হাংরি ফাইল দেখতে দিলে সেখানেই চিঠিটা দেখি। উৎপল বললেন তিনি শক্তির বন্ধুত্ব হারাতে পারবেন না। ফলে একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল সব। ইতিমধ্যে বাসুদেবের সঙ্গে আমার এবং সুভাষের বন্ধুত্ব হওয়ায় আমরা হলাম ৩ জন বাকি দুজনও এসে গেলেন। প্রদীপ চৌধুরীর এবং সুবো আচার্য—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে এবং ফুটপাতে দিন কাটাচ্ছিলেন। ঐ "তিন বিধবা" কবিতাই তাদেরকে নিয়ে এলো আমাদের কাছে। সবাই নতুন ধরনের লেখালেখির পক্ষে এবং লিখেছি সেইভাবে। কিন্তু এসবের আগে ঐ "তিন বিধবা" কবিতাটি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সেটা একটু বলা দরকার। কারণ তখনই ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরে যা ঘটবে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। পুলিশের কাছে অভিযোগ আসে বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা সাহিত্যগোষ্ঠীর কাছ থেকে। সমাজের বড়ো অংশ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে পুলিশ সক্রিয়। আমাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সাবধান করে বলা হ'ল, এরপর বড়ো ঘটনা ঘটবে। যৌনতা নিয়ে সমাজে যে ভণ্ডামি চলছিল, কবিতাটার আঘাত পড়ে সেই ভণ্ডামির উপর। তাদের মতে যৌনতার ওরকম rash প্রকাশ মেনে নেওয়া যায় না। তখন থেকেই চালু হয়ে যায় ঐ কথাটি যে হাংরিরা বিকৃত যৌনতার কারবারী।

ওই পাঁচজনের একটা যৌথ জীবন শুরু হয়ে যায়। ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রিট—(টালা) এ থাকতাম আমি এবং সুভাষ—সেই ঘরকে কেন্দ্র করে শুরু হলো নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন, সাহিত্য নিয়ে তর্কাতর্কি, আলোচনা। কখনো দিনের পর দিন রাতের পর রাত। এইসব লেখা প্রকাশ করার জায়গা নেই। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো বন্ধ হয়ে যাওয়া হাংরি জেনারেশনকেই নিজেদের লেখা প্রকাশের মাধ্যম করে একটা আন্দোলনে রূপ দেয়া হবে। পাঁচ উদ্বাস্তু দ্বারা সৃষ্টি হলো হাংরি জেনারেশন আন্দোলন। একটা কথা সকলেরই মনের কথা ছিল যে নিজেদের জীবন খুঁড়ে অস্তিত্বের সত্যটাকে খোঁজা হবে।

"অধঃপতিত ভারতবর্ষের সন্তান আমরা। অর্থহীন শূন্যতা পরিবেশের সন্তান আমরা। বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের জন্ম। শোষণ, হত্যা ও ধর্ষণের মধ্যে আমাদের বৃদ্ধি। অতীত আমাদের কাছে মিথ্যা, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। নব নব মৃত্যু শব্দ, ভীতি শব্দ আমাদের হৃদয়কে মূক করে দিতে চায়, সন্ত্রস্ত করে চেতনাকে, আচ্ছন্ন করে রাখতে চায় দৃষ্টিকে। আমরা দেখতে পাই হাজার হাজার বছরের ঝর্ঝরে মূল্যবোধগুলি জীবনের নতুন ধারণার পথে রক্তচক্ষু মেলে দাঁড়িয়ে আছে। অপশক্তি জীবনকে পথ দেখাতে চায় আজও। কোটি কোটি মূক মূঢ়ের বেদনার প্রতিধ্বনি নাই ভারতবর্ষের ঘোলাটে আকাশে। তত্ত্ব আছে তথ্য আছে, জয়ধ্বনি

আছে, শাসন আছে, শোষণ আছে কিন্তু হৃদয়ের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো বিপ্লব নাই।"—এই ছিল তখনকার মানসিক অবস্থার সংক্ষিপ্তসার।

প্রতিষ্ঠানিক সমস্ত ভাবনা, জীবনবোধ, ধর্মাধর্ম, ন্যায়-নীতি, মানবতা, মঙ্গল-অমঙ্গল মহত্ব, ভালোবাসা—সব কিছুকে পরীক্ষা করাই এই নতুন লেখালেখির যাত্রাপথ। সব দর্শনকে মনে হলো অকেজো। Blitz পাত্রকায় Interview-তে বলা হলো মার্কসের দর্শনও অসম্পূর্ণ। সেটা ৬০ এর দশক। পশ্চিমবঙ্গে তখন বামপন্থীদের তীব্র আন্দোলন কিন্তু সে আন্দোলন ধরে রাখতে পারল না এই কয়েকজনকে। যদিও এদের অতীতের সঙ্গে বামপন্থার একটা সম্পর্ক ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যেতে তখনও ২৫ বছর বাকি। ক্ষমতা সচেতনতা দিয়ে ক্ষমতার কার্যকলাপ বিচার করলে এই সত্যগুলিই বেরিয়ে আসে। সংবেদনা মুক্ত হলে অবদমনের বোধ দ্রুত উপলব্ধি হয়। তখন আমাদের বয়স আর কতই হবে ২০ থেকে ২৩ এর মধ্যে। গণ্ডগ্রাম থেকে সহায় সম্বলহীন হয়ে কলকাতায় এসে ঘটনাক্রমে মিলিত হওয়া। সাহিত্যজগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহলে কোনো শক্তি বলে এরা কবি লেখক হবার কথা ভাবে। অমিতাভ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন, "সম্পূর্ণ শৈত্য ও উদাসীনতাকে উপেক্ষা করেও কোনো শক্তিতে এঁরা আজও যথসামান্য সংঘের শক্তি ও নিজেদের জীবন চর্চাকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে কবিতা লিখে যাচ্ছেন...এঁদের সততা, দুর্জয় প্রয়াস আমাকে বিস্মিত করে, খানিকটা বা বিব্রতও। একদম জাগতিক অসফলতা নিয়ে কিসের জোরে, এঁরা লড়ে যাচ্ছেন এবং লড়েই যাচ্ছেন—এ ব্যাপারটা আমার বুঝতে বুঝতে বেলা পড়ে যায়, বোঝা হয়ই না বস্তুত। তাহলে কি সমস্ত আপাত নৈরাজ্য, আপাত যৌন ক্লিশে, আপাত বিশৃঙ্খলার ঝড়ের ভিতর কোথাও কেন্দ্র ছিল কোথাও ছিল সেই ভয়াবহ সকরুণ, সর্ব নির্যাতন করা সত্যি? যার স্বাদ একবার পেয়ে গেলে কোনো কিছুই আর বাজে না।"

ঠিক করা হলো এই পাঁচজনের বাইরেও লেখা চাওয়া হবে কয়েকজনের কাছে। উৎপল বসু রাজি হলেন। মলয়ের 'শয়তানের মুখ' এর লেখাগুলিকে কবিতা বলে মনে হয়নি আমাদের। কিন্তু তার প্রবন্ধ ভালো হচ্ছিল। তার কাছেও লেখা চাওয়া হলো। চাওয়া হলো সুবিমল বসাক এবং দেবী রায়-এর কাছে। পরিকল্পনা করা, লেখাপত্র সংগ্রহ করা থেকে ছেপে বের করা এবং তা ছড়িয়ে দেয়া সবটাই করেছিলাম এই পাঁচজন। মলয় রায়চৌধুরী আগে গোটা তিনেক ম্যানিফেস্টো লিখেছিল ইংরাজিতে, সেগুলি আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়নি। কোনো ফতোয়া আমাদের কাছে মূল্যহীন। প্রত্যেকে নিজের জীবনকেই দেখবে। তা থেকেই তার লেখালেখির চরিত্র তৈরি হয়ে যাবে।

ছোটো সংকলন। নাম দেওয়া হলো "হাংরি জেনারেশন কবিতা সংকলন" লেখা হলো এটা হলো "মাতৃহারা, মাতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃহন্তারক" কবিদের কবিতা সংকলন। ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'ল সমাজের সর্বস্তরে। লেখা হ'ল কাগজে, এ ক্ষুধা জঠরের নয়—একটি সাপ্তাহিকের শিরোনামই হ'ল, "পুলিশের ব্যাটন নিষ্ক্রিয় কেন?" পুলিশ নেমে পড়ল কাজে। ১৯৬৪-র ২ সেপ্টেম্বর প্রথম গ্রেপ্তার হলাম আমি এবং সুভাষ ঘোষ। তারপর দেবী রায়, মলয় এবং সমীর রায়চৌধুরী এবং প্রদীপ চৌধুরী। ভয়ে, আতঙ্কে কফি হাউস ফাঁকা হয়ে গেল। খবর পেলাম নন-হাংরি কবি লেখকদের অনেকেই কলকাতা ছেড়ে পালিয়েও গিয়েছেন। ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রতিষ্ঠানের উপর এতবড়ো আঘাত—এটাই তো চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু আমাদের সবাই চায়নি। সে কথা পরেই বলছি। সে সময়ের প্রতিক্রিয়াগুলি ক্ষুধার্ত ১ এ ধরা আছে। আর ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যারা চান, তারা "হাংরি জেনারেশন আন্দোলন" বইতে

পেয়ে যাবেন। এখানকার এই স্বল্প পরিসরে সেটা উল্লেখ করা যাচ্ছে না। গায়ে পেট্রল ঢেলে আত্মহত্যা করতে সবাই প্রস্তুত ছিল না, ফলে ১৯৬৫ সালে মামলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মাত্র মলয় রায়চৌধুরী, উৎপল বসু, দেবী রায়, সুবিমল বসাক সরে যায় এই আন্দোলন থেকে। যে পাঁচ উদ্বাস্তু শুরু করেছিল থেকে যায় তারাই। এবং বাধাবিঘ্ন, বিপন্নতা, প্রতিরোধ, আক্রমণ সহ্য করেও এই আন্দোলনকে আজকের অবস্থায় নিয়ে আসে। আগেই বলেছি যে আমাদের পত্রিকা ক্ষুধার্ত এবং আমাদের নিজের পয়সায় ছাপা বইপত্রকে পাঠাতে হয়েছে আন্ডার গ্রাউন্ডে। গ্রেপ্তার করে মলয়কে কলকাতায় আনার পর মলয়কে প্রথম দেখি। এবং ১৯৬৫র পরে আর বাংলার সাহিত্য পরিমণ্ডলে তাকে পাওয়া যায়নি। ৩০ বছর সাহিত্য সেবার পরিবর্তে সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বড়ো অফিসার হয়ে ক্ষমতার সেবায় নিযুক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষমতা সৃষ্ট ভোগবাদীদের দলে ভিড়ে যায়। তার অবস্থা সম্পর্কে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুবিমল বসাক কী বলছেন মলয়েরই লেখা বইতে, সেটা একটু শোনা যাক। "পাটনায় মলয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে আমাকে কিছু বই এবং চিঠি পত্রের বান্ডিল তুলে দেয়। অর্থাৎ বিদায়। তারপর যতবার সাক্ষাত হয়েছে ভুলেও সে কখনও সাহিত্য সম্পর্কে, বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে উল্লেখ করেনি। শুধু একদা প্রসঙ্গত বলেছিল,—মানুষ রুটির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। মলয় তখন ঘোর সংসারী, সন্তানের পিতা সফল স্বামী (প্রসঙ্গত, মলয়ের স্ত্রীও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকুরে।) দায়িত্বশীল অফিসার পরিপূর্ণ জমাটি। দেখে মন দুঃখিত হয়ে পড়ে আমার। আমি মলয় সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।...মলয় হয়তো ভেবেছিল সে থেমে যাওয়ায় আন্দোলন থেমে যাবে। লেখা ছেড়ে দেবার পর সাহিত্য নিয়ে তার আর মাথা ঘামানো ছিল না। কিন্তু আন্দোলন থামেনি। আন্দোলন থেমে থাকে না। নেতৃত্ব কখনও কারও পায়ের কাছে গেড়ে বসে না।" সুবিমল যেটা বুঝতে পারেনি বা বুঝেও বুঝতে চায়নি তা হলো একজন কেরিয়ারিস্ট কখনই নিজের কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করতে পারে না। মলয় যখনই বুঝতে পারে যে হাংরি আন্দোলনে থাকার অর্থই হ'ল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা। যে প্রতিষ্ঠানের সেবা করতে প্রস্তুত সে কী করে সাহিত্যের জন্য নিজের ভোগবাদী আদর্শে গড়ে ওঠা জীবন নষ্ট করতে পারে?

পাঠক আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন এই একটি লোক সম্পর্কে এত কথা কেন বলা হচ্ছে? যে কোনো বড়ো আন্দোলন থেকে পলাতকের সংখ্যা তো একেবারে কম নয়। সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ তো মানুষের মধ্যে বিরল নয়। বলছি এবং আরও একটু বলতে হবে, কারণ ৩০ বছর ধরে নিজের আখের গুছিয়ে, একেবারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন ডাইরেক্টর হয়ে, কবিতার বদলে টাকা পয়সার হিসাব লিখতে লিখতে কব্জির শক্তির শেষ করে ১৯৯৩/৯৪-তে কলকাতা এসে প্রথমে পোস্টমডার্ন করে সুবিধা করতে না পেরে, চিৎকার শুরু করে যে সেই হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা এবং আন্দোলন টান্দোলন যা হয়েছে সে-ই সব করেছে। আমাদের ৫জনের বিরুদ্ধে নোংরা গালাগাল সমন্বিত কাগজপত্র পাঠাতে শুরু করে টেলিফোন গাইডের নাম ধরে ধরে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীও প্রধানরাও এই প্রচারে মজা পেতে শুরু করেন।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার মাঘ ১৩৮৩ সংখ্যায় লেখা হ'লঃ "হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য আন্দোলন একালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অব্যবহিত পরে শঙ্খ ঘোষের জোরালো সমর্থন পাওয়ার আগেই এক অনির্দিষ্ট ও আকস্মিক কারণে হাংরি জেনারেশন ভেঙে দু-তিন টুকরো হয়ে যায়। এক টুকরো বহুকাল আগেই (১৯৬৫) স্তব্ধ লেখনী মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রস্থান করেন।....অন্যদল 'ক্ষুধার্ত' নাম দিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন..." উত্তম দাস তার বইতে লিখেছেন, "১৯৬৮ থেকে ১৯৮৪ সাল...এ সময়ে মলয়

নিরুদ্দেশ।" যে লোকটা সেই ১৯৬৫-তে বেপাত্তা হয়ে গেল আজ তার মিথ্যাচার এবং শঠতা ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ই নাই। সেই ১৯৬২ সালেই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ওর কবিতা পড়ে বলেছিলেন 'ও কবি নয় ছুতার'—এখন Internet ও এইসব কাণ্ড চলছে। সে যে ১৯৬৫-তে পলাতক সেটা গোপন করে লেখাগুলি তৈরি হয়েছে এমন ভঙ্গীতে যা পড়লে যে কোনো পাঠকের মনে হবে এই লোকটাই এতকাল ধরে হাংরি আন্দোলন করে এসেছে। internet-এ পাওয়া গেল যে হাংরি আন্দোলন নাকি সৃষ্টি হয়েছে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ি থেকে। মলয়ের এক পূর্বপুরুষ, যার জন্য মলয়ের গর্বের শেষ নাই তিনি হলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। রাজা প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান। মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতাপাদিত্যকে বন্দি করতে সাহায্য করেন। বিনিময়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের কলকাতা সুতানুটি ও গোবিন্দপুর তিনটি গ্রামের জমিদারী দেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। মলয় এই বংশের লোক। (এসব বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, এই লেখকের "হাংরি আন্দোলনের সত্য মিথ্যা" বইতে। এ বিষয়ে একটাই কথা বলার যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন কোথায় শুরু হয়েছিল, এবং কারা এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের তা অজানা নয়। আন্দোলনের শুরুতেই যে পলাতক তার স্বপক্ষে কোনো তথ্যই থাকা সম্ভব নয়।

আবার সেই ১৯৬৪-তে আবার ফিরে যেতে হয়। মামলা চলার সময় আমেরিকা থেকে TIME পত্রিকার প্রতিনিধি এই বিষয়ে প্রতিবেদন লেখার জন্য কলকাতা এসে উপস্থিত হন। এর আগে Blitz, Link ইত্যাদি অসংখ্য কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়ে এক বড়ো রকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। TIME পত্রিকার প্রতিবেদন, সকলের ছবি সহ প্রকাশিত হলো ১৯৬৪-র ২০-শে নভেম্বর। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। আমেরিকার কয়েকজন নোবেল লরিয়েট আমাদের উপর পুলিশি হামলা এবং গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। স্বয়ং ইন্দিরাগান্ধী, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া বুঝতে পেরে পুলিশকে চাপ দিয়ে মামলা তুলে নিতে বললেন। সারা ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। এক গবেষকের হিসাবে প্রকাশিত হ'ল যে ভারতবর্ষের বাইরেই প্রায় ৭০টি কাগজে হাংরি জেনারেশন বিষয়ে প্রতিবেদন বের হয়। এবং ভারতবর্ষে প্রতিটি ভাষায় অজস্র। TIME পত্রিকার ইন্টারভিউ-এর সময়েই মলয় সেই কাজটি করে বসে যার জন্য আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "ক্ষুৎকাতর আক্রমণ" নামের গল্পটি মলয় নিজের নামে চালিয়ে দেয়।

অবশ্য মলয় রায়চৌধুরী এই দাবি আদৌ করত না, করা সম্ভবই হতো না যদি না ৩০ বছর পর সে কলকাতা এসে বুঝতে পারত, যে আন্দোলন ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল তা এরকম একটা গুরুত্বের জায়গায় পৌঁছে গেছে। তার উদ্দেশ্য ছলে, কৌশলে, মিথ্যাচার করে তথ্য বিকৃত করে লুকিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে হাংরি আন্দোলনের শরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিরিশ বছর আগে ভয়ে যে পালিয়ে গিয়েছিল ৩০ বছর ধরে ভোগ-বন্দনা করে এখন বলতে চায় যে আসলে সন্ন্যাসী। কেলেংকারীর এখানেই শেষ নয়, ঐ সময়কাল ধরে আমরা যা লিখেছি আন্দোলনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সেগুলো বেমালুম নিজের নামে নিয়ে এক একটি ম্যানিফেস্টোর তৈরি করে বলছে এগুলো এতদিন পাটনায় তার সেন্টুদার তোরঙ্গে লুকানো ছিল। ইতিহাসের তথ্যেও চুরি চামারি হয়ে চলেছে। কে লিখেছে আর কে তা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমরা হাততালি দিয়ে বলি, বাহবা বিহারী বাবু! ঘটনা হ'ল মলয় এই আন্দোলনের কেউই নয়। তবে মনে হচ্ছে এখানেই শেষ নয়, এখন গর্ত থেকে আরও কিছু অন্ধকার চরিত্র বেরিয়ে আসবে হাংরি স্ট্যাম্পটা গায়ে লাগিয়ে নেবার লোভে। পরে যারা লিখতে এসেছেন

যাদের আমরা স্বীকার করেছি যেমন ১৯৬৬-৬৭-তে এসেছিল ফালগুনী রায়। সত্তরের দশকে কিছু সময়ের জন্য অরুণেশ ঘোষ এবং উত্তরবঙ্গের সমীরণ ঘোষ। কিন্তু অনেক ব্যর্থ লেখক কবি এখন এই হাংরি নামে নিজেদের পরিচয় দিতে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। লেখালেখির ক্ষেত্রে যারা নতুন কথা বলবেন এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা করার সাহস দেখাবেন, সেরকম নতুনদের আমরা স্বাগত জানাব অবশ্যই।

প্রচার, তার মধ্যে অবশ্য অপপ্রচারও যথেষ্ট ছিল। ধীরে ধীরে চাকাটা ঘুরতে লাগল উল্টোদিকে। মিডিয়াগুলি কোনো না কোনো ক্ষমতাবানের সম্পত্তি। অচিরেই তারা বুঝে গেল হাংরিরা কী চায় এবং কী ধরনের লেখালেখি তারা এখনও করে চলেছে। প্রতিষ্ঠান ভয় পেল এই ভেবে, যে সাহিত্যের উপর তাদের একচেটিয়া দখলদারী সম্ভবত শেষ হতে চলেছে। বুদ্ধদেব বসু এবং সমরেশ বসু লিখতে থাকলেন যৌনতাময় লেখা। তাতে সুনাম হবে। হাংরিরা লিখলে দুর্নাম হয়। কারণ প্রতিষ্ঠান দুজনের পক্ষে আছে। কোনো পাঠকের নাম করে 'মামলা'ও হলো দুজনের লেখা নিয়েই। সন্তোষ কুমার ঘোষ লিখলেন, "হাংরিরা যা পারেনি, বয়স্ক সমরেশ তাই লিখে দেখিয়ে দিল।" উনি সেদিন বুঝতে পারেননি যে হাংরিরা যৌনতাকে লেখার কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে না। তাদের লেখায় যৌনতা আসে সমস্ত অস্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ হয়ে। আত্মকে প্রকাশ করতে-গেলে ঝাড়াই বাছাই করা যায় না। তাতে লেখা কৃত্রিম হয়ে যায়। আমাদের বিশ্বাস, কবিতা আসলে কবির নিজের সঙ্গেই কথোপকথন, একেবারে মুক্ত ভাষায়, সত্তার কোনো অংশকে গোপন না করে। আর আমার সত্তার গোপন অংশে রয়েছে সেইসব ব্যাপার, প্রতিষ্ঠান যেগুলিকে প্রকাশিত হতে দিতে চায় না। কৃত্রিম সমাজের কৃত্রিম নৈতিকতা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেদিন। না, শুধু ১৯৬৪-তেই নয়, তারপরের ৪৮ বছর ধরে ঘটছে এই একই ঘটনা। মিথ্যা প্রচারে পাঠকদের মধ্যে তৈরি করে দেয়া হ'ল ঘৃণা ও ভয়। সংস্কৃতি জগতের সংঙ্গে একযোগে আমাদের বিরুদ্ধে গলা মিলিয়ে চলে আজও রাজনৈতিক জগৎ। পিছু হটতে হটতে দেয়ালে পিঠ লেগে গেল। কিন্তু হাংরিরা হারমানার জন্য আসেনি। আত্মবিস্ফোরণের তীব্র ইচ্ছাশক্তি নিয়েই তারা এসেছে। কাজ শুরু হ'ল আন্ডারগ্রাউন্ডে। বইপত্র ছেপে হাতে হাতে বিক্রি চলে। দোকানগুলি বিক্রি করতে অস্বীকার করে। কিন্তু যেখানে সত্য আছে সেখানে আগুনের প্রতাপও থাকে। দীর্ঘদিন ধরে চলে এই suppression এবং oppression, তুঙ্গ প্রচার যখন চলছিল তার মধ্যেই এই অশুভ ভবিষ্যৎটির ইঙ্গিত আমরা পেয়েছিলাম। সাফল্যকে আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু পাঠক আমার লেখা পড়ুক এটা কোনো কবি লেখক না চায়! যারা সফল হবার জন্য জন্মেছে তারা তো অনেক আগেই পলাতক। শক্তি, সন্দীপন '৬৪ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেয়, ১৯৬৫তে একেবারে ঘোষণা করে পালায় মলয় রায়চৌধুরী, সঙ্গে আরও কেউ কেউ। লেখা ছেড়ে চলে যেতে এই ৫জন অন্তত আসেনি।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল নিজেদের পত্রিকা বের করতে হবে। ১৯৬৮ থেকে শুরু হলো সেই কাগজ যার নাম "হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত"—যাকে কেন্দ্র করে বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক আলোড়ন—এর কোনো কমতি ছিল না। বাংলা সাহিত্যে কোনো পত্রিকা এরকম আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। একটি পত্রিকা দীর্ঘদিন একটি আন্দোলনকে বহন করে নিয়ে এসেছে আজ তাই সবগুলির একটি সংকলন পাঠকদের হাতে তুলে দিতে চলেছেন 'দে'জ পাবলিশিং' আমাদের ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু ইতিহাস বলে প্রতিবাদী বিদ্রোহী যদি অত্যাচার পীড়ন সহ্য করে নিতে পারে তবে ক্ষমতা একসময় সেই ক্ষেত্রটিতে দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক তাই, আন্দোলন শুরু হবার ৩০ বছর পর একটু একটু করে পাল্টাতে শুরু করেছে অবস্থাটা।

১৯৯৫-তে আমার "হাংরি জেনারেশন আন্দোলন" বইটি বের হতেই অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গেল। এতদিনের অপপ্রচারে নতুন পাঠক নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই না-ছোড় হাংরিদের ব্যাপারটা কী সেটা দেখতে হবে। ইতিমধ্যে ঘটল আর এক ঘটনা, কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশক 'কথা ও কাহিনী' প্রকাশ করলেন সমস্ত হাংরিদের লেখালেখির এক প্রামান্য সংকলন। এই প্রথম হাংরি লেখালেখি বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর সামনে উন্মুক্ত হলো। মনে হলো গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু ঘটনার ৪৮ বছর পরে মনে হচ্ছে ; কৃত্রিম যা কিছু ছিল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, একটা নতুন সত্তা হয়ে বেঁচে উঠেছি।

হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের 'ক্ষুধার্ত'

একটা টর্নেডো আসে। তার ভয়াবহতায় তছনছ হয়ে যাবে সব। ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। গাছপালা মাটি ছেড়ে উঠতে শুরু করে। ভয়ে মুখ লুকায় মানুষ। হাংরি আন্দোলন এইরকম একটি টর্নেডো। আর তার মুখপত্র 'ক্ষুধার্ত'—সে হ'ল টর্নেডোর পাকচক্র এবং গতিবেগ। অনেকেই এখন বলেন, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ইজ ইকুয়াল টু 'ক্ষুধার্ত'। একটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া যদি চলে বহুদিন ধরে তবু বুঝে নিতে কারোরই অসুবিধে থাকে না যে ক্রিয়াটির শক্তি ছিল বেশি। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু হবার পর পশ্চিম বাংলায় বেশ কয়েকটি নামে মাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলি হারিয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার হত্যাকারী হিসাবে হাংরি আন্দোলন আজও প্রবলভাবে বর্তমান আছে। 'ক্ষুধার্ত' বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো এটাই সময়ের ইচ্ছা যে ১৮ বছর পর সাত্ত্বিক নন্দীর সম্পাদনায় 'ক্ষুধার্ত সময়' নামে ক্ষুধার্তের পুনরভ্যুদয় ঘটেছে। বেশ কয়েকজন নতুন লেখক। সব্যসাচী সেনের সম্পাদনায় বের হয়েছে ৫টি সংকলন। ক্ষুধার্ত চেতনার আর এক রূপ "কারুবাসনা"। এখানেও আছেন নতুন লেখকরা' হাংরি আইডিয়া মুছে যাওয়ার পরিবর্তে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এ বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিষ্ঠানের ক্রোধ এবং আক্রমণকে উপেক্ষা করে রচিত হয়েছে সেইসব কবিতা গদ্য নাটক, যা আধুনিকতার কারবারী পঙ্গু কবি লেখকদের সুখের রাত্রিগুলি রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর সেই রচনা হৃদয়ে বহন করে প্রকাশিত হয়েছে এক একটি 'ক্ষুধার্ত' সংকলন। নৈরাজ্যবাদী এবং বিকৃত যৌনতার উপাসক হিসাবে নিন্দিত এইসব কবি লেখকদের রচনার পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। শুরু করেছিলাম ২০।২১ এ আজ ৭৩-এ এসব কথা লিখতে পারছি। খুব আগে এসব লেখার মতো অবস্থা আসেনি। আজ যারা নতুন লিখতে আসবেন তাদের প্রথমেই ভাঙতে হবে "বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান"—কারণ ওই অবস্থানটাই সংবেদনার দরজা রুদ্ধ করে রাখে। নিজের প্রকৃত সত্তাটি কথা বলতে পারে না। ক্ষমতা বার বার এই ষড়যন্ত্রময় অবস্থান তৈরি করে দেয়। যাতে মানুষ নিজের প্রকৃত সত্তার সন্ধান না পায়। তাই বার বার এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা একটা অন্তহীন পদ্ধতি এবং কর্ম।

কয়েকবার কথাটা বলেছি, আবার বলি, পশ্চিম বাংলার সাহিত্যে বা ভারতবর্ষের সাহিত্যে তো নয়ই গোটা পৃথিবীতেই আভাঁগার্দ পত্রিকা এবং আভাঁগার্দ সাহিত্য আন্দোলন খুব বেশি

নেই। ক্ষুধার্ত এমনই একটি কাগজ, যা নতুন চিন্তা এবং সাহিত্য সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে সমস্ত পশ্চিম বাংলায় ত্রিপুরায় এবং ভারতের অন্যান্য বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয় ক্ষুধার্ত পত্রিকা। কিন্তু ক্ষুধার্ত নিয়ে কিছু মানুষের ভয় আজও কাটেনি। এই সেদিন লেখক অমর মিত্র লিখেছেন, "ক্ষুধার্ত পত্রিকার যে কটি সংখ্যা সেই সময় সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তার ভিতরে বাসুদেব, অবনী ধর বা সুভাষ ঘোষদের লেখা পেয়ে যেতাম। সেইসব গল্প, কবিতা প্রচলিত গল্প কবিতার বিপক্ষে দাঁড়াতে চেয়েছিল। দাঁড়িয়েও ছিল নিশ্চিতভাবে। না হলে ক্ষুধার্ত নিয়ে সবাই অত বিব্রত কেন? এখনো, এত বছর বাদেও।" তিনি এও লিখেছেন, তাঁর ঐ অল্প বয়সে ক্ষুধার্তের মতো প্রায় নিষিদ্ধ কাগজ প্রকাশ্যে বহন করাও ছিল বিপদের। তিনি লিখেছেন, "পিছনে ছিল রক্তচক্ষু, আগ্নেয়াস্ত্রের হিমশীতল স্পর্শ।" আজকের বাংলা সাহিত্যে লেখক হিসাবে খ্যাতি প্রাপ্ত একজন মানুষের 'ক্ষুধার্ত' সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার এতগুলি পৃষ্ঠা ব্যাপী কথাগুলির মিল নিশ্চয়ই স্পষ্ট।

ক্ষুধার্তের জন্ম-ইতিহাস এবার আমরা দেখব। হাংরি আন্দোলন নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচার যে তুঙ্গে উঠেছিল তাকে যদি পূর্ণিমার ভরা জোয়ারের সঙ্গে তুলনা করি তবে ৪।৫ বছরের মধ্যে অপপ্রচার, শুধু সেটা ভারতবর্ষে, এই বাংলায় তার তুঙ্গ অবস্থা, সেটাকে শত বাঁধ দিয়ে একটি বেগবান নদীকে মেরে ফেলার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল আমাদের, নিন্দা এবং অপবাদটা এমন পর্যায়ে পৌছাল যে শারীরিক নিগ্রহ হতে পারে এই আশঙ্কায় চলাফেরাও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এই সময় কানে আসে যে আমাদের মারার জন্য কোনো এক ব্যায়াম সমিতিকে লাগানো হয়েছে। তখন বাসুদেব, সুভাষ, প্রদীপ, সুবো এবং আমি এই পাঁচ জন আর একমাত্র নতুন হলো ফালগুনী রায়। যে ৮০-তে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মারা যায়। সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ। বাংলা সাহিত্যে ফালগুনী আজ লিজেন্ডের পর্যায়ে। আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতির অবশ্য কোনো পরিবর্তন কেউ করে দিতে পারেনি। তবে কীরকম ছিল সেই জীবন যাপন পদ্ধতি সেটা এখানে বলার সুযোগ নেই। সবারই লেখা হচ্ছে। কিন্তু ছাপার জায়গা নাই। কোনো কাগজই ছাপাবে না। হাংরি লেখা ছাপা যাবে না। প্রদীপ সে সময় ত্রিপুরায় ছিল। সুবো ছিল বিষ্ণুপুর। কলকাতায় সুভাষ, বাসুদেব এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদেরই কাগজ বের করতে হবে। যা ঘটার ঘটবে। কাগজের নাম হবে "ক্ষুধার্ত"—"হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত"—প্রদীপ সুবোও যোগ দিল কলকাতা এসে আমাদের সঙ্গে। ঠিক হ'ল এই পাঁচজনের লেখা নিয়ে ক্ষুধার্তের প্রস্তুতি সংখ্যা বের করা হবে "ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ" নামে। সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। কাগজ বেরোল। হাতে হাতে কয়েকটা বিক্রি হলো। পাতিরাম থেকে ২।৩টা বিক্রি হবার পরই দেখা গেল পত্রিকা আর ঐ দোকানে নেই। বিক্রেতা নিরুত্তর। বুঝতে বাকি রইল না যে ভয় দেখিয়ে কাগজটাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি কপিগুলিও পাওয়া গেল না। সেখানেও বিক্রেতা নিরুত্তর। তখন কলেজ স্ট্রিট নরেন সেন স্কোয়ারে একটা মেস বাড়িতে আমি এবং সুভাষ থাকি। কারণ ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রিটের যে ঘরটাকে বাসুদেব দাশগুপ্ত তার লেখায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সৃষ্টির স্থান বলেছে, আমি ও সুভাষ পাড়ার ভেতরেই পুলিশের গাড়িতে গ্রেপ্তার হয়ে ওঠার ৪।৫ দিনের মধ্যে বাড়িওয়ালা সেখান থেকে আমাদের বিতাড়িত করে। নরেন সেন স্কোয়ারেই আড্ডা বসে। ওটাই হয়ে উঠল কেন্দ্র। এবার ক্ষুধার্ত পত্রিকা বের করার পালা। এই পাঁচজনের বাইরে লেখা যাদের কাছে চাওয়া হলো তার মধ্যে প্রায় কেউই লেখা দিল না। কিছু নতুন নাম পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল আমেরিকান লেখক উইলিয়াম বারোজের একটা অপ্রকাশিত লেখা। নিজেদের

অবস্থান বুঝে নেবার জন্য মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতাভ দাশগুপ্তকে বলা হ'ল লিখতে এই আন্দোলন এবং সাহিত্য বিষয়ে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখলেন, "উপনিষদের সেইসব ঋষি কুলের কথা মনে হলে একটি প্রচণ্ড হাংরি জেনারেশনের সুগম্ভীর আর্ত গর্জন শুনতে পাই। মৃত্যুর ভয়ে কাঁটা দেয়া আত্মার শীত থেকে পরিত্রানের জন্য যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাখতে হয়েছে ওদের।" প্রথম সংখ্যার সম্পাদনার ভার পড়েছিল বাসুদেব দাশগুপ্তের উপর। প্রথম সংখ্যার ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আজ যা বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, সেই বক্তব্য ঃ "আমরা শিল্পী সাহিত্যিক নই হাজার হাজার বছরের গু গোবর টানতে রাজি নই আমরা আমাদের কোনো প্রতিভা নাই প্রতিভাবানদের মতো পারিবারিক তাঁবেদারিতে আমরা অপারগ।" পাতিরাম থেকে ৪। ৫ দিনের মধ্যে ৫০। ৬০ কপি বিক্রি হবার পর সেই ঘটনাই আবার ঘটল। দোকানদার বাকি কাগজ ফেরৎ দিয়ে দিল। কারণ বলল না। যদিও আমরা বুঝে গেলাম ব্যাপারটা। কিন্তু মজার ব্যাপারটা ছিল, যারা আমাদের শত্রু বলে পরিচিত কফি হাউসে তাদের প্যান্টের পকেট থেকে ক্ষুধার্ত উঁকি মারছে সেটা কেউ কেউ দেখে ফেলল। লেখালেখি কাগজের আয়তন এবং বিদেশি কয়েকজন লেখকের নাম দেখে এবং পড়ে আক্রমণকারীরা সম্ভবত কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। বড়ো কাগজগুলো তো বটেই, এরা যেসব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত তাতে আমাদের সম্পর্কে এমন কোনো জঘন্য বিশেষণ নেই যা ব্যবহৃত হলো না। সুনীল গাঙ্গুলী 'দেশ' পত্রিকায় লিখলেন, "তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিন সাহিত্যের নকল" হলো হাংরিদের লেখা। আলোড়নটা টের পাচ্ছিলাম। দুচারজন কাগজ পড়ে 'বাহবাও' দিয়েছেন। অন্যদিকে নিজেদের ত্রাসকে ঢাকা দেবার জন্য নোংরা গালাগাল। এর কয়েকমাস আগে কলকাতার বহু পুরানো লেখক কবি মহলে অতি পরিচিত খালাসিটোলায় পালন করা হ'ল জীবনানন্দ দাশের প্রথম জন্মদিন। এবং সেই উপলক্ষে আমার প্রথম বই 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'এর প্রকাশ।' এই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ "হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলনে" সুভাষ ঘোষের লেখায় পাওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠান ব্যাপারটাকে হজম করতে পারল না। তারা লিখল, "উঠতি গুণ্ডার দল"—ভাবা যায়! রবি ঠাকুর যাদের রুচি তৈরি করে দিয়ে গেছেন তারা কয়েকজন লেখককে "উঠতি গুণ্ডা" বলে গাল পাড়ছেন। একমাত্র Statesman পত্রিকা এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিল কোনো খারাপ মন্তব্য না করে।

২নং ক্ষুধার্ত সম্পাদনা করে সুভাষ ঘোষ। ঠিক করা হয়েছিল প্রত্যেকেই পালা করে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করবে। প্রত্যেকের সাধ্যমতো সহযোগিতা থাকবে। হাংরির বাইরে থেকে লিখলেন শঙ্খ ঘোষ এবং দেবেশ রায়। এঁরা ছিলেন বিশেষ আমন্ত্রিত। শঙ্খ ঘোষ লিখলেন, "সিমলা পাহাড়ের চুড়োয় বছর বছর সমবেত হবেন ভারতীয় জ্ঞানগুণীরা, ১৯৬৯ সালেও সেখানে প্রতিবাদহীন ভাবে উচ্চারিত হবে যে ভারতে কোনো আন্ডার গ্রাউন্ড লেখক নেই আজ, বেশ আত্মতৃপ্তি নিয়েই ঘোষিত হবে যে স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত 'নো রাইটার হ্যাজ বিন চার্জড ফর রাইটিং অ্যান্টি গভর্নমেন্ট এ্যান্ড এ্যান্টি কনফরমিস্ট থিমস্। এইসব পণ্ডিতি ভাষণ সত্ত্বেও ইতিহাস অবশ্য থেকে যায়।"

দেবেশ রায় লিখলেন, "রাজনীতির নকশালপন্থার সঙ্গে বাসুদেব, সুভাষের লেখার, হয়তো সমগ্র হাংরি জেনারেশনের মিল আছে। সামাজিক ভাবে এই দুটি আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি নিম্নবিত্ত সমাজের হতাশা ক্লান্তি আর অধৈর্য্য। দর্শনের দিক থেকে দুটি আন্দোলনেরই প্রতিজ্ঞা ভূমি তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা। আর কার্য প্রণালীর দিক থেকে এই দুটো আন্দোলনেরই পদ্ধতি স্বতোপ্রণোদনার উপর নির্ভর করে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এনে দেয়া।" দেবেশ রায়ের ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু হাংরি সাহিত্যকে তিনি নাক সিটকে উড়িয়ে দেননি। হাংরি রচনা

প্রাতিষ্ঠানিক রচনাকারদের কাছে যে ভীতির সৃষ্টির করেছিল—সে ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়ার তাঁর মধ্যে নেই। ঘটনাকে তিনি তাঁর মতো করে বুঝতে চেয়েছেন।

আমরা তো গ্রামগঞ্জ থেকে আসা ৫টি অল্পবয়সী ছেলে। সাহিত্য জগতে যাদের কোনো মুরুব্বি ছিল না। একদা শক্তির হাংরি বন্ধু সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—আমি এবং সুভাষ কোর্টে জামিন পেয়ে হাজত মুক্ত হয়ে কেন জানি না গিয়ে পৌঁছালাম সন্দীপনের বাড়ি। সন্দীপন বাড়ির পেছন দিকের দরজা দিয়ে বের করে দিয়ে বললেন, "আপনারা তো কেউ নন্, পুলিশ আপনাদের হাজত থেকে ছেড়ে দিয়ে দেখছে, কোথায় কার কাছে আপনারা যান, পুলিশ তো ধরবে আসলে তাদেরই।" এই ঔদ্ধত্যের জবাব সেদিন দিতে পারিনি। কিন্তু এত বছরে যা লিখেছি আমরা তাতে নিশ্চয়ই মৃত্যুর আগেই সন্দীপন জবাবটা পেয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু আমাদের বলেছিলেন নিরক্ষর। আন্দোলনটা তাঁর অহমিকায় নিশ্চয়ই বড়ো ঘা দিয়েছিল। আর সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় যিনি হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টা তিনি কী বলেন? বলেন, 'হাংরিরা উল্লুক।"

১ম ক্ষুধার্ত বেরোবার সময়ই দেখতে পাচ্ছি 'কৃত্তিবাসে'র প্ল্যাটফর্মটি ভেঙে পড়েছে। শক্তি সুনীল দুজনেই আনন্দবাজারে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের 'বিদ্রোহ' 'বিদ্রোহ' খেলা শেষ। শক্তি রূপচাঁদ পক্ষী সেজে এবং সুনীল নীললোহিত নামে ফিচার লিখে খাচ্ছেন। এরাও সেই মলয় রায়চৌধুরীর মতো। 'মানুষ রুটির জন্য সব ত্যাগ করতে পারে।'—আমরাও বলি, হ্যা, পারে। কিন্তু এই বিশাল স্বার্থবাদী সম্প্রদায়ের বাইরে কয়েকজন থেকে যায় যারা রুটির জন্য নিজের বোধ বিবেচনা, চেতনাকে বিক্রি করে দিতে পারে না। তারা ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। পোড়ে আর নতুন চোখে পৃথিবীকে দেখে।

হাংরি সাহিত্য যদি জীবনের মূল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারত তবে তা এতদিনে মুছে যেত। সত্যকে চিনতে না পারায় মুছে গেছে মলয় রায়চৌধুরী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ। আজ শঠতা এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

ক্ষুধার্ত লেখকদের ভাষা চিন্তার কিছুটা আগে উদ্ধৃত করেছি। এবার দেখা যাক ৭টি ক্ষুধার্তের সুদীর্ঘ আলোচনা শেষে এর ভাষা সম্পর্কে উত্তম দাস কি লিখেছেন, "হাংরি লেখকরা পদ্যে বা গদ্যে যে ভাষায় কথা বলেন সে ভাষা আমাদের অভ্যাসের ভাষা নয়। বাংলা সাহিত্য পড়ার অভিজ্ঞতা এখানে কাজ দেয় না। এসব রচনা এমন যে প্রথম পাঠে প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সতর্ক হলে বোঝা যায়, এ ভাষা কোনো কৃত্রিম বাগভঙ্গী প্রসূত নয়। উঠে আসা একেবারে ভিতর থেকে। এড়িয়ে চলতে চাই এদের, নিজেদের মুখোশ লুকিয়ে। কিন্তু এঁরা সে মুখোস ধরে টান দেন, চিনিয়ে দিতে চান আসল পরিচয়।"

১৯৬৮-তে LINK পত্রিকায় রাজীব সাকসেনা লিখেছিলেন হাংরি সাহিত্য সম্পর্কে, "The shocking experiences of the modern reality have to be conveyed in an equally shoeking language."

লেখক অমর মিত্র লিখেছেন, "তখন সেইসব লেখাই খুঁজে বের করতে চাইছিলাম যা দাঁড়িয়েছিল স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিকভাবে ভাঙতে চাইছিলেন নকশালপন্থী যুবকেরা, আর সাহিত্যে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন অনেকেই। তাদের ভিতরে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন ক্ষুধার্ত প্রজন্ম।...হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত লেখকরা বিব্রত করতেন। পড়তে পড়তে সরিয়েও দিতে হয়েছে বারবার। আবার হাত বাড়িয়ে প্রথম পাতা থেকে পুনঃপাঠে মগ্ন হতেও হয়েছে। 'ক্ষুধার্ত'র লেখকরা বাংলা সাহিত্যের পড়ুয়াদের পাঠ-অভ্যাসকে ডিসটার্ব করতে চাইছিলেন। তা করেছিলেনও। বিব্রত হতে হতে মুগ্ধ হয়েছি আমি বার বার। টের পাচ্ছিলাম তাদের ওই

নৈরাজ্যময় লেখালেখির ভিতরেও শুরু হয়ে গেছে আমাদের সাহিত্যের এক নতুন নির্মাণ।" (কারুবাসনা ঃ ২০০৭)

এখানে কথাটা বলা দরকার। যা অবশ্য আজ সকলেই জানেন বলে মনে করি। তবু কারো কারো লেখা থেকে মনে হতে পারে যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন এবং নকশাল আন্দোলন একই সময়ে ঘটেছিল। হাংরি আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৩-৬৪-তে আর নকশাল আন্দোলন ঐ শতকের সত্তর দশকের প্রথম দিকে।

'ক্ষুধার্ত' পত্রিকা নিয়মিত বের হয়নি। অর্থাভাবও এর মূল কারণ। কিন্তু একটা সংখ্যা বের হবার পর অনেক বছর পরও তার প্রতিক্রিয়া টের পেতাম। খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেত মূলত প্রতিষ্ঠানিক কবি লেখকদের—আর এইসব লেখালেখির ভাষা নিয়ে ওরা তো আতঙ্কিত ছিলেনই, আর ছিলেন সমাজের সুরুচির ধারক ও বাহকরা। আমাদের কাছে সত্য সত্যই, সেখানে সুরুচি কুরুচি বলে কিছু নাই। কুরুচি বলতে ওরা স্ল্যাং এবং যৌন প্রসঙ্গকে বুঝত। এটা পরিষ্কারভাবে বুর্জোয়া চিন্তাধারায় আবিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনোভাব, যাদের উপর ইংরেজ—মানে 'কলোনীর মালিকরা তাদের ভিক্টোরিয় নীতিবোধ চাপিয়ে দেয়। ক্ষুধার্তের ১ম সংখ্যা ১৯৬৮, ২য় সংখ্যা ১৯৭২, ৩য় সংখ্যা ১৯৭৫। ঠিক তখন ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। গ্রেপ্তার হচ্ছেন কেউ কেউ বিশেষ করে সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা। ভেবেছেন সবার কণ্ঠরোধ করে দেবেন। ৩নং এর দায়িত্ব ছিল প্রদীপ চৌধুরীর উপর। কিন্তু সে তখন ত্রিপুরায়। কলকাতায় আমাকেই সব দেখাশুনা করে বের করতে হলো কাগজ। পত্রিকা বিক্রেতারা কাগজ নিতে অস্বীকার করল। কয়েকজন এমন বলেন, এ কাগজ বিক্রি হচ্ছে দেখলে পুলিশ কেবল তাদেরই ধরবে না, আমাদেরও কয়েদ করবে। পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেল কাগজ। হাতে হাতে বিক্রি হ'ল বেশ। সেই টেবিলের নীচে দিয়ে হতো লেনদেন। ওই কাগজে আমার একটি লেখা ছিল—পার্লামেন্টকে আক্রমণ করে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এমনই সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের যে তারা আর আমাদের কাগজ নিয়ে মাথাঘামাবার সময়ই পেলেন না। এর পরের চারটি 'ক্ষুধার্ত' বের হ'ল আমার সম্পাদনায়। একইভাবে ২।৩ বছর পরপর শেষ সংখ্যাটি বের হলো ১৯৮৪-তে। মোট ৭টি সংখ্যা। ১৯৮১-তে ৬নং সংখ্যা প্রয়াত কবি ফালগুনী রায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গিত হয়।

প্রথম 'ক্ষুধার্ত' বের হবার পরপরই এঁর প্রভাব লক্ষ করা গেল পশ্চিম বাংলার জেলা শহর এবং ছোটো শহর গুলিতেও। উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরায় ও বাংলা ভাষাভাষি বিহারের অঞ্চলগুলিতে একের পর এক প্রতিষ্ঠান বিরোধী, ক্ষুধার্ত চেতনা সমন্বিত পত্রিকা দেখা দিতে লাগল। এগুলি সবই যথার্থ অর্থে ছিল লিটল ম্যাগাজিন। ক্ষুধার্তের প্রভাব কত ব্যাপক হয়েছিল তার নিদর্শন ওই সব পত্রিকা। আমি প্রদীপ চৌধুরী, সব্যসাচী সেন, অরুণেশ ঘোষ ও সাত্ত্বিক নন্দীর সাহায্যে ৫৭টি কাগজের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি—সেগুলির প্রকাশের স্থান এবং সম্পাদকের নাম সহ, এই লেখার শেষে সেই তালিকাটিও থাকছে। কিন্তু আরও কাগজ যে ছিল, হয়তো নাম মনে পড়ছে কিন্তু প্রকাশের স্থান এবং সম্পাদকের নাম মনে নেই, ফলে সেগুলিকে এই তালিকায় দেয়া যায়নি। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবার দিতে হবে। সমগ্র ত্রিপুরায় ক্ষুধার্ত চেতনা ছড়িয়ে দেবার কাজটি করেছিল কবি প্রদীপ চৌধুরী। নিজে 'স্বকাল' এবং 'ফুঃ' "ক্ষুধার্ত-স্বকাল" বিভিন্ন নামে কাগজ বের করে গেছে। তাতে আমরা সকলে লিখেছি। এইসব কাগজকে শুধু ত্রিপুরার কাগজ বলা যাবে না। এগুলি হয়ে উঠেছিল সমস্ত বাংলা সাহিত্যের এক একটি বিশিষ্ট হাংরি পত্রিকা। যা আসলে ক্ষুধার্তের ভিন্ন সংস্করণ। আর উত্তরবঙ্গে এই কাজটি করে কবি অরুণেশ

ঘোষ তার "জিরাফ" পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। এবং জলপাইগুড়িতে কবি সমীরণ ঘোষ সহ আরও কয়েকটি তরুণ। কিন্তু যে দুজনের সহযোগিতা ছাড়া এই সংকলনটি পূর্ণ চেহারা পেত না, একজন হলেন বন্ধু লেখক সব্যসাচী সেন অন্যজন বন্ধু কবি অভীক মজুমদার। সব্যসাচী ছোটাছুটি করে প্রুফ দেখেছেন। আর অভীক ক্ষুধার্ত সংকলনের ঐতিহাসিক রূপটি রক্ষার জন্য কীভাবে সংকলনটিকে সাজানো হবে সে দায়িত্ব নিজে বহন করেছেন। ভূমিকাটুকু লিখে আমার কাজ শেষ করেছি—বাকি কাজ করেছেন অভীক। সাতটি সংখ্যার এই সংকলনের এবং আরও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির—সবগুলিকে কীভাবে সাজালে পাঠক ক্ষুধার্ত পত্রিকাগুলির সেদিনের চেহারা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন সে বিষয়ে তাঁর উদ্বেগই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং কল্পনায় ক্ষুধার্ত সংকলন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। দুজনকেই অশেষ ধন্যবাদ। পাঠকবর্গ, ১ম ক্ষুধার্তের ১½ লাইন সম্পাদকীয় দিয়ে এই লেখা শেষ করি ঃ

"প্রিয় পাঠকগণ, ক্ষুধার বিশাল মুখব্যাদানের মধ্যে একে একে সকলে প্রবেশ করুন।"

প্রথম ক্ষুধার্ত বের হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ভারতের হিন্দিভাষী অঞ্চল এবং বাংলাদেশেও এর বিরাট প্রভাব পড়ে। প্রতিষ্ঠান বিরোধী ক্ষুধার্ত চেতনা কলকাতার সাহিত্য পরিমণ্ডলে ও রাজনৈতিক আবহে তখনও প্রত্যাখ্যাত হলেও—বিরাট সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশিত হয় হাংরি চেতনার। তারাও নিজ নিজ এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের কেন্দ্র করে গোলমালও কম হয়নি। এদের অনেকগুলিতেই আমরা লিখেছি। মোট ৫৭টি পত্রিকার নাম সংগ্রহ করা গেছে। তাদের সম্পাদকের নাম এবং প্রকাশের স্থানসহ এখানে রাখা হলো।

১. স্বকাল (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা—এটি ২০ বৎসর কাল সক্রিয় ছিল)
২. ফুঃ (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা)
৩. ক্ষুধার্ত খবর (সুভাষ ঘোষ, চন্দননগর)
৪. ক্ষুধার্ত-স্বকাল (প্রদীপ চৌধুরী, ত্রিপুরা)
৫. ক্ষুধার্ত সময় (সাত্ত্বিক নন্দী, কলকাতা)
৬. জিরাফ (অরুণেশ ঘোষ, কোচবিহার)
৭. কারুবাসনা (সব্যসাচী সেন, কলকাতা)
৮. নিষাদ (সুবীর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)
৯. বিকল্প সাহিত্য (প্রদীপ চৌধুরী, কলকাতা)
১০. কুরুক্ষেত্র (সমীরণ ঘোষ, শিলিগুড়ি)
১১. উত্তরকাল—এই বিষ অর্জুন—(শুভঙ্কর দাস, কলকাতা)
১২. উদ্বাস্তু (অশেষ রায়, কলকাতা)
১৩. বর্ণ পরিচয় (ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)
১৪. মানুষের বাচ্চা (সুব্রত সেন, কলকাতা)
১৫. দন্দশূক (সূর্য মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর)
১৬. ফুঃ দ্বিভাষিক (প্রদীপ চৌধুরী, কলকাতা)
১৭. অজ্ঞাতবাস (অরুণ বসু, নবদ্বীপ)
১৮. উলুখড় (প্রিতম মুখোপাধ্যায়, হাওড়া)
১৯. সমবেত আর্তনাদ (শুভঙ্কর দাশ, কলকাতা)

২০. আর্তনাদ (দেবী রায় চৌধুরী, ত্রিপুরা)
২১. দশদিগন্ত (আশিষ ভট্টাচার্য, কোচবিহার)
২২. কনসেনট্রেশন ক্যাম্প (রাজা সরকার, শিলিগুড়ি)
২৩. মর্মার্ত (সাত্ত্বিক নন্দী, ত্রিপুরা)
২৪. মত্ত নীল ডানা (অরূপ দত্ত, ত্রিপুরা)
২৫. জঠর (শঙ্খপল্লব আদিত্য, ত্রিপুরা)
২৬. আস্পর্দ্ধা (সোমা ভট্টাচার্য), কলকাতা)
২৭. জখম (রত্নময় দে, ত্রিপুরা)
২৮. কালামাটি (অজিত রায়, আসানসোল)
২৯. পাগলা ঘোড়া (বিজয় দে, জলপাইগুড়ি)
৩০. খনন (সুকুমার চৌধুরী, নাগপুর)
৩১. অনার্য (সেলিম মুস্তাফা, ত্রিপুরা)
৩২. টার্মিনাস (অনুভব সরকার, মাথাভাঙা)
৩৩. সময়সূত্র (মলয় ঘোষ, জলপাইগুড়ি)
৩৪. পাঁক ঘেটে পাতালে (তড়িৎ চৌধুরী, গৌহাটী)
৩৫. নিম সাহিত্য (মৃণাল বণিক, দুর্গাপুর)
৩৬. রোবট (জীবতোষ দাস, কোচবিহার)
৩৭. শব্দভেদী (অশোক অধিকারী, কলকাতা)
৩৮. গেরিলা (অরুণ বণিক, ত্রিপুরা)
৩৯. সৃজন (সুমিতেশ ঘোষ, কোচবিহার)
৪০. কবিতা ক্রিয়া ইন্ডিয়ানা (উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা)
৪১ BAD (তপন পালিত, কলকাতা)
৪২. ক্রমশ (অলোক গোস্বামী, শিলিগুড়ি)
৪৩. কবিতা পত্র সংবর্ত (সমর ঘোষ, অশোক নগর)
৪৪. এখন এ-রকম (ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা)
৪৫. তৌর্যতিক (মলয় মজুমদার, শিলিগুড়ি)
৪৬. সাপ্তাহিক গ্রাফিত্তি (শর্মী পাণ্ডে, কলকাতা)
৪৭. একলব্য (দেবব্রত ভট্টাচার্য, কোচবিহার)
৪৮. বাইসন (শ্যামল রায়চৌধুরী ও প্রদীপ দত্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা)
৪৯. টিল (রত্নময় দে, ত্রিপুরা)
৫০. ঋদ্ধ (সুব্রত পাল, নবদ্বীপ)
৫১. ব্যাস (স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য ও অনমিত্র রায়, কলকাতা)
৫২. তিতির (সঞ্জয় সাহা, মাথাভাঙা)
৫৩. চিদাত্মা (অরূপ দত্ত, ত্রিপুরা)
৫৪. প্রস্তুতিপর্ব (শুভেন্দু সমাজদার, বালুরঘাট)
৫৫. দ্রোহ (দিবাকর ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি)
৫৬. প্রতিসর্গ (অশোক অধিকারী, কলকাতা)
৫৭. নান্দিমুখ (স্বপন সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা)

Poetry of the Hungry Generation

Howard McCord
(Professor, English dept.. Washington State University, U.S.A.)

This kind of poetry is dangerous and revolutionary, cleanses by violence, and destruction, unsettles and confounds the reader. This is the poetry of the disaffected, the alienated, the outraged, the dying. It is poetry which alarms, and disgusts the bourgeois, for it describes their own sickened state more clearly than they wish to hear, and exposes the hypocrisy of their decency. One reaction of good citizens has been to accuse the poets of hysteria and obscenity. The charges of obscenity indicates the virulence and depth of the fear which these poets have uncovered.

The energy of the poets is hysterical : the imagery of the poems are obscene. It is meant to be. But I take obscenity to be a just and natural reaction to a vile existence. Obscenity is the desperate music of poets who dare speak out against the rape of mind and soul that marks our demented and vicious civilisation. Obscently is the last attempt by honest men to speak their agony to those who torture them. Obscenity is a moral weapon with which to attack the degrading and filthy use of power that chacterises our age, and assert contempt for managers of our lives.

These poets say what poets and prophets have said for a hundred years—that our civilization is desperately sick, that our consciousness is polluted, our values murderous. They are outraged at the cruel and deliberate waste of beauty and intelligence that world culture represents, and sickened by the perversions of life our societies demand. Their poems record the ugly numbing truth that most men delight in these horrors, lust after their own destruction, and fear life insanely. The poets are nihilists They are pessimists. And most will die before their time. But each of them has a vision as what man ought to be, and should be, and their poetry stems from, the sad knowledge of what he is. I value their work most because it is an honest response to the reality of life in India. And India endures now what will come to us all before long. Pound said that poets are antennae of the race, and they are— but they are also gotten on cossandra, and will not be belived until too late, when the vacuous mouthings that pass as earthly wisdom are known by all to be empty, dreadful lies and the hideous future we have let to be prepared for us arrives. We will not be saved. This is the obscenity their poetry must celebrate.

[লেখক কলকাতা এসেছিলেন হাংরি কবি লেখকেরা গ্রেপ্তার হবার পর। তাঁর লেখাটি আমেরিকায় ১৯৬৭-তে প্রকাশিত SALTED FEATHERS-এর হাংরি সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে।]

TIME MAGAZINE (U.S.A.), November 1964

India : The Hungry Generation

A thousandyears ago India was the land of Vatsyayana's 'Kama Sutra', the classic volume that so thoroughly detailed the art of love that its translators still usually leave several key words in Sanskrit. Last week, in a land that has become so straitly laced that its movie heroines must burst into song rather than be kissed, five scruffy young poets were hauled into Calcutta's Bankshall Court for publishing works that would have melted even Vatsyayana's pen. The Hungry Generation had arrived.

Born in 1962, with an inspirational assist from visiting U. S. Beatnik Allen Ginsberg, Calcutta's Hungry Generation is a growing band of young Bengalis with tigers in their tanks. Somewhat unoriginally they insist that only in immediate physical pleasure do they find any meaning in life, and they blame modern society for their emptiness. On Cheaply printed paper, they pour forth torrent of starkly explicit erotic writings, most of them based on their own exploits ("In The Tajmahal with My Sister") or on dreams. "My theme is me", says Hungry Poet Saileswar Ghose, a school teacher. "I say what I feel. I feel frustration, hunger for love, hunger for food."

Three Widows : To all appearances, their appetites are unlimited. In a short story Bank Clerk Malay Roy Choudhury 25, tells of a starving poet who first devours his fiancee, then his poetry notebook, then a building and Calcutta's huge Howrah Bridge. A poem by school-teacher Ghose crows that "I impregnated three windows at a time, and now I am lying in bed happy. What next?"

Absurd as they seem the hungries see themselves as the sopkesmen of a betrayed miserable people. "Out frustration is not just personal', says a 28 year-old geology lecturer. 'It comes from the strains, the poverty, the squalor of our society", And in a series of violent manifestoes, the hungries singled out their enemies, including hypocrites, conventional writers and politicians whose place in society lies "somewhere between the dead body of a harlot and a donkey's tail." To "let loose a creative furore", the hungries last summer sent every-leading Calcutta citizen-from police commissioner to wealthy spinsters-engraved four-letter-worded invitations for a topless bathing suit contest.

Done for world : With that, the entire Calcutta establishment rose up in rage. Newspaper editorials, quoting passages from their works, proved conclusively that they were dangerous and dirty-so much so that Calcutta's reading public began to look for them. Under civic pressure, the police hauled away 6 of the poets for questioning. Five were suspended from their jobs and booked on charges of obscene writing and conspiracy against society.

The evidence got in last week's trial was irrefutable, but meanwhile the Indian government had been approached by sympathetic intellectuals at home and abroad. Looking for a face saving exit, the Calcutta prosecutor temporised, requested a postponement in court. To celebrate their temporary freedom, the hungering beats raided an art gallery, beat up three painters, then walked happily away to resume their pursuit of the Hungry Generation's declared goal-"to undo the done-for world and start afresh from chaos."

সূচি

প্রথম সংকলন।১৩৭৬

দ্বিতীয় সংকলন।১৯৭২-১৯৭৩

তৃতীয় সংকলন। ১৯৭৫

চতুর্থ সংকলন। মার্চ ১৯৭৭

পঞ্চম সংকলন। মে ১৯৭৮

ষষ্ঠ সংকলন। নভেম্বর ১৯৮১

সপ্তম সংকলন। ১৯৮৪

হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের

সম্পাদক

বাসুদেব দাশ গুপ্ত

KHUDHARTA

প্রথম সংকলন, ১৩৭৬

লেখক সূচি

সুবো আচার্য
অবনী ধর
অমিতাভ দাশগুপ্ত
দেবী রায়চৌধুরী
শঙ্খপল্লব আদিত্য
সুভাষ কুণ্ডু
ফালগুনী রায়
আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়
মোহিত চট্টোপাধ্যায়
শৈলেশ্বর ঘোষ
স্বপন চক্রবর্তী
সুভাষ ঘোষ
অরণি বসু
প্রদীপ চৌধুরী
Claude Pelieu
Carl Weissner
Carl Solomon
William Burroughs

বাসুদেব দাশগুপ্ত

আমরা শিল্পী সাহিত্যিক নই হাজার হাজার বছরের গু গোবর টানতে রাজি নই আমরা আমাদের কোনো প্রতিভা নাই প্রতিভাবানদের মতো পারিবারিক তাঁবেদারিতে আমরা অপারগ বাংলা সাহিত্যের অংশ বা পরিশিষ্ট আমরা নই যেকোনো ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা সীমাহীন আমরা দুষ্ট নই শিষ্টও নই পুরস্কার দিই না নিই না আসলে আমরা কিছুই চাই না ধুতি পাঞ্জাবী পরে সভাপতি হবার যোগ্য আমরা কখনও হব না কাউকে প্রভাবিত করা পরিচালিত করার মতো ভণ্ডামিতে বিশ্বাস করি না অন্যের মুক্তির কথা বলি না অন্যের মুক্তির উপায় আমরা জানি না আমাদের হাতে অমরত্বের নিশান নাই আমাদের শ্লীলতা নাই অশ্লীলতাও নাই আমরা মুখ এবং পোঁদ দু'দিক দিয়ে কথা বলি না অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোনো সত্য আছে মনে করি না।

ক্ষুধার্ত গোষ্ঠী বা সমাজ নয় ক্ষুধার্ত বাসুদেব দাশগুপ্তের নয় ক্ষুধার্ত কাউকে সুবাতাস দেবে না সমুজ্জ্বল ড্রইংরুমের স্বস্তি দেবে না সত্য ও সততা যাদের কাছে এক ক্ষুধার্ত তাদের ক্ষুধার্ত ক্ষুধার্তের।

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠকগণ, ক্ষুধার বিশাল মুখব্যাদানের মধ্যে একে একে সকলে প্রবেশ করুন

সুবো আচার্য

স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ

এক

আমরা আত্মার মধ্যে বিষকবিতার অভ্যুত্থান অহরহ
মানুষের উজ্জ্বল পায়েচলা পথ ছেড়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি
দূরে, বিষণ্ণ নদীর মধ্যে জাহাজের বিদায়বাঁশি সম্বোধন করে যায় আমাকেই
আমি বিদায়ের শব্দ শুনে দেখি কতো সহজে আমার এই মানুষআত্মা
ব্যথা পায়, কতো সহজে ভালোবাসা দিতে গিয়ে দ্যাখে কতো সহজে
বিষাক্ত হয়ে গেছে ভালোবাসা আর কতো সহজে ঘটে মৃত্যু--
মৃত্যুর সময়ে জীবনানন্দ কী ভেবেছিলো আর আমি কী ভাববো
এরকম অর্থহীন বাজে মানুষের ভবিষ্যৎ—

আমি একটি মেয়ের পাশে শুয়েছি আগুনের ভালোবাসা নিয়ে
আগুনের ভালোবাসায় আমার দুচোখ ভরে এসেছে জলে,
মানুষ নয়, মানুষ নয় মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমার ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ
তবু দেখতে পাই মানুষের সভ্যতার বিভ্রান্তিকর ব্যাপার—

আমি খুব পবিত্র মানুষ, অত্যন্ত সামান্য মানুষ আমি টের পাই
কোলকাতার মতো বিপজ্জনক হয়ে ওঠার দরকার ছিল না আমার
বিপজ্জনক কোলকাতা, আজ একটি বিষণ্ণ বালক ভেসে যায় নিমতলা
শ্মশানের দিকে—কী কষ্ট অথবা কী সুখ—আট বছর বয়েসে মৃত্যুকে
সাক্ষাৎ দেখি, দেখি কী রহস্যময় অস্বস্তিকর মানব জন্মদেয়া
হয়েছে আমাকে, রহস্যের ভিতরে শূন্যতা আবার রহস্য আবার শূন্যতা রহস্য
যতোদ্রুতসম্ভব বিষাক্ত হয়ে গেছে ভালোবাসা আমার
সেই পবিত্র অস্তিত্ব, সেই অসম্ভব শুদ্ধ, ঈশ্বরের মতো আমার আত্মা
তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ক্রমশ ভুল সভ্যতার
শায়া তুলে ফেলি—

দুই

ক্রমশ মাথার মধ্যে উড়ন্ত বালি খেলা করছে আজকাল
অথবা অন্ধকার সমুদ্রের বাতাস
উড়ে আসে, এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আমি একা বহুদূর হেঁটে যাই
'জন্ম হয়েছিল কেন' এই প্রশ্ন বিব্রত করে না মাথা—
আমার শান্ত ছটফটে চোখে মানুষ দেখি স্ত্রীলোক দেখি
আরো গাঢ় চুপ হয়ে যাই,
মাতাল হয়ে যেতে ভালোলাগে জ্যোৎস্নারাতে
আমার প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা তীরের মতো উঠে আসুক
আমি চুপচাপ দেখি, শুধু দেখি—

কীরকম পৃথিবীর মধ্যে আমি আছি?
রূপকথার মতো রাত্রির রহস্যময়তা—
আমি একটা ফাঁকা পথে বহুদূর হেঁটে যাই
আমার প্রেমিকা তোমার ঘুম নিবিড় হোক—
আমার নিজস্ব পৃথিবী নেই—
এই দম্ভেভরা পৃথিবীর রূঢ় সিমেন্টে জুতোর শব্দ চলে যায়—
আমি একা, গভীরতর রাত্রির দিকে আমার নীরব হেঁটে যাওয়া
এবং ফিরে আসা—কোথায় ফিরে আসা, বলো, কেউ বলো—

রাত্রি ঝরে পড়ে, গাঁজার ধোঁয়ার মতো কুয়াশা
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ঝরে যাওয়া বেশ্যার দৃষ্টি আমার
মাথা ছুঁয়ে যায়, সহসা গায়ে শীত লাগে, গায়ের ভিতরে
আমার আত্মার মধ্যে লেগে আছে সমস্ত শীত—
কীভাবে আত্মা বিক্রয় করে মানুষ হয়ে যেতে হয় আমি জানি
আমি জানি স্বাধীনতায় মানুষই আঘাত করে বেশি—
আমি আমার নিজস্ব পৃথিবী চাই যা শুধু আমার
নিজস্ব স্ত্রীলোক চাই, নেশা চাই, নিজস্ব সৃষ্টির ভেতরে
আমি সম্রাটের মতো ঘুরে বেড়াতে চাই
প্রতিটি অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে আমি নির্মম পবিত্রতা
নিয়ে বার হয়ে আসতে চাই, আমি চাই
আমি একেবারে দুঃখ বা অশান্তি চাই না,
কবিত্ব বা আধুনিকতার জন্য আমি কিছুই করতে রাজি নই
আমি স্বেচ্ছায়, স্বাধীন ও নিজের মতো থাকতে চাই—

কিম্ভূতকিমাকার জীবন—নিরাকার রহস্যের মধ্যে
আমার নিঃসঙ্গ আত্মা বাঁধা পড়ে যায়—আমার
ভালোবাসা ও ঘৃণা ভেদ করে দৃষ্টি চলে যায়—
আমি ক্রমশ শীতের মধ্যে খুব বেশি সিগ্রেট খাচ্ছি—

আচমকা কখনও 'কি সুন্দর এই জীবন'—
তৎক্ষণাৎ ঘোর অন্ধকার—
মাথা কেঁপে উঠে নিচু হয়ে যায়

তিন

আমার একজীবন ২ জীবন ছাই হয়ে পড়ে রইল
আমি হেসেছিলাম একদিন কেঁদেছিলাম
আজ ঠাণ্ডা চোখে হাহাকার, দীর্ঘ অবিশ্বাসের দড়ি ধরে ঝুলে আছি—
দ্যাখো, প্রমত্ত মানবসভ্যতার বদগন্ধ রক্তাক্ত রসের ওপর—
আমার চোখ থেকে দৃষ্টি মরে যায়
চোখ জেগে থাকে চোখ জেগে থাকে চোখ জেগে থাকে
অন্ধকার, আলো, গ্রন্থ, মনীষা, মহত্ত্ব—
সব ভেদ করে মরে পড়ে আছে ১ জীবন আমার—
এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে যতই আঘাত করি—
মন্দিরা, আমি জানি এতে আর কিছুই হবে না
মন্দিরা, কেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে গুহ্যদ্বার খুলে দেখিয়েছিলেন দুপুররাতে?
চলো আজ একসাথে দশটা ডাবলডেকারের সামনে দাঁড়াই,
পিষে যাক্, মৃত্যুর সময়েও দেখে যার জীবন কেমন—
ভালো লাগে না—এই জীবনে কোনো স্বপ্ন নেই
মন্দিরা, ভিখারির ঘষা পয়সার মতো ভাগ্য জীবনের—
আজ চলো, শেষবারের মতো সব দরজা ভেঙ্গে দেখি
কোথায় লুকিয়ে আছে সত্যি জীবন,
মন্দিরা, খুব সুন্দর তুমি, তোমার চুল যথেষ্ট যৌনদ্রেক করে
তোমার দাঁত আলোর ঝলক দিলে চচ্চড় করে কাম উঠে যায় মাথায়,
শান্ত হত্যার ইচ্ছা জেগে ওঠে,
মন্দিরা, কতোদিন বেঁচে আছি অথচ আজও জানি না কেন বেঁচে আছি—
কী চাই আমি তা জানি না
কেন সভ্যতার উলোটপালোট জানি না
ঈশ্বরের মতো বিকারহীন ধ্বংসক্ষমতা হাতে চাই
চাই বিশাল স্বেচ্ছাচারের অধিকার—
স্বাধীনতা,
হায়, ক্ষুধা ও কামের চাপে আমার স্বাধীনতাও ফেঁসে যাচ্ছে
উলঙ্গ, একাকী আমি এই ভয়াবহ বন্দীত্বের ভিতরে এসেছি
চুপচাপ ফিরে যাবো—
সমস্ত সৃষ্টির উত্তরাধিকার ব্যর্থ হয়ে যায়।

চার

চূড়ান্ত ঘৃণার পরেও
কিছু ভালোবাসা অবশিষ্ট থেকে যায়
কিন্তু নারীর জন্যে নয়
কিশোর বালকের প্রতি নাকি?
সবুজ বসন্ত এসে ব্যঙ্গ করে
দুটো চামচিকে কান টেনে রাখে কার্নিশে
প্রেম ভালোবাসা উরু ভেদ করে আত্মা টানে না
শুধু সঙ্গমের পরে চোখ জেগে থাকে কার্নিশে
দুটো চামচিকে কান টেনে কার্নিশে
তোমার সমস্ত শাড়ি তোমার মাকে পাঠিয়ে দেবো
তুমি আর কখনও আমাকে নক করবে না—

সবই মনে পড়ে যেভাবে মনে পড়া স্বাভাবিক
চোখে জল আসে না, মৃদু হাসি পায়—
তোমাকে যেভাবে চুমো খেয়েছিলাম আর
কোনো মেয়েকে সেভাবে খাইনি
আমি ভালোবাসবার চেষ্টা করেছিলাম
বহু বছর পর, আদর করে তোমার নাম
দিয়েছিলাম—নাঃ ভুলে গেছি
অথচ প্রতিটি খানকির নাম মনে আছে—
এই কি জীবনের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা নয়?
একি নয় আমার বিশ্বাসের প্রমাণ?

ট্রেনের শব্দ দিগন্তের দিক ভেঙ্গে দ্যায়—
পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই আমার
হৃৎপিণ্ডের শব্দ ছাড়া—দুটো চামচিকে
তোমার যোনি ও ক্যান্সার তুলে ধরে—
না, তোমার ক্যান্সার নেই আমি জানি—
ভালোবাসার আস্ফালন ক'রো না, বাথরুম
খোলা আছে—আমি চাই না আবার তোমাকে
দেখতে হয়—আমার ভালোবাসা নেই—
আমি মদ খেতে খেতেও ভুলিনি সঙ্গম—
তবে কেন ভয় পেয়েছিলে? তোমাকে আমি
যথেষ্ট সুখ দিতে পেরেছিলাম—সম্মান?
আঃ, তোমার কথা ভাবলেই হাসি পায়—
আসলে ভালোবাসা একটা খিস্তির চেয়ে বেশি নয়

সেজন্যই ছ'মাস সময় কেটে গেল—
এইটেই বিরক্তিকর—

আমার ঘরে কোনো ছবি নেই, আমার হৃদয়
অস্বাভাবিক অন্ধকারে ভরে গেছে, সকলের উচিত
বাথরুমেই কান্নাকাটি ও গান করা, দরজার বাইরে
দুঃখ দেখানো উচিত নয়, ভালোবাসার জয়
এবং পরাজয় দুটোই সমান হয়ে যায় আমার
ঘুমের ক্ষতি হয় না, তোমার সেই ঠোঁট কুঁচকে
চুমো খাওয়ার ব্যাপারটা মনে আছে, মনে
আছে একদিন তোমার পাশে শুইনি বলে
পরদিন কথা বলোনি—যতক্ষণ
কাম থাকে শরীরে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেম
মাঝে মাঝে প্রেমভালোবাসাও আমার ভালো লাগে না
ঘুমের ওষুধেও আজকাল কিছু হয় না,
মেয়ে মানুষের কাছে গেলেও কিছু হয় না,
কবিতাফবিতার কাছে গেলেও কিছু হয় না,
আমি সহজভাবে মানুষের মধ্যে যেতে চাই
একবার দেখতে চাই তাতেও কিছু হয় কিনা—

অবনী ধর

আমার দুঃখী মা

ফরিদপুর পাঙ্গাশিয়া গ্রামে আমার মামাবাড়ি। সেখানেই আমার জন্ম। মামাবাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে আমার বাবা আর ঠাকুমা থাকত! মা মাঝে-মাঝে সেখানে যেত। আমার জন্ম হবার পর থেকেই বেশ কয়েক বছর মা অসুস্থ হয়েছিল। দিদিমাই আমার দেখাশুনা করত। ঠাকুমার এক জা থাকত মধুপুরে। সে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাত। তাই দিয়ে বাবা আর ঠাকুমার চলে যেত। বাবা জীবনে কখনও চাকরি করে দেখেনি। দিনরাত বাইরে বাইরেই কাটাত। মাসে দু'দিনও. মার পাশে শুতো না। ঠাকুমার কথা খুব শুনতো। মাঝে মাঝে মাকে মারধরও দিত। মা কখনও আধপেটার বেশি খেতে পেত না। খেতে বসে মা মাঝে মাঝে খাবারের পরিমাণ দেখে কেঁদে ফেলত। বাবার পাশে যদি কখনও মা শুতো তাহ'লে ঠাকুমা মশারির কাছে এসে উঁকি মেরে দেখত—আর বিড় বিড় করে গালাগালি দিত। মাকে আলাদা বিছানা পেতে শুতে বলত।

একদিন রাতে বাবা বাড়ি ছিল না। মশারির ভেতর থেকে মা দেখতে পেল, ঠাকুমা লুকিয়ে লুকিয়ে ভাত খাচ্ছে। সামলাতে না পেরে মা বলতে শুরু করল—'ভগবান সইবে না। আমাকে কষ্ট দিলেন, একদিন এর শাস্তি পাবেন।' আবার বলল—'ছি ছি, লোকে শুনলে কী বলবে?' ঠাকুমা তাড়াতাড়ি গত ধুয়ে মায়ের কাছে এল। আদর করে মাকে ডাকল—'ও বৌ—বৌ, দুটো ভাত খাবে নাকি?' মা কোনো কথা বলল না। মায়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ঠাকুমা বলল—'শ্বাশুড়িরা দু'কথা বললে তাতে রাগ করতে নেই।' ঠাকুমার এই সব কথায় গলে গিয়ে মা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। পা জড়িয়ে ঠাকুমার কাছে ক্ষমা চাইল। তারপর মাকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুমা খেতে বসল।

পাশের এক গ্রামে কোনো ধোপার মেয়ের সঙ্গে বাবার ভাব ছিল। সেখানে সে রাত কাটাত। মা জানত। ঠাকুমা কোনোদিন আপত্তি করেনি। হঠাৎ রটে গেল—বাবা নিরুদ্দেশ। সংসার ত্যাগ করে নাকি বৈষ্ণব হয়ে গেছে। এদিকে সেই ধোপার মেয়েটিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মা মামাবাড়িতে চলে এল। আমার তখন বয়স তিন বছর। অন্যের মুখে বাবা ডাক শুনে আমিও বাবার কথা ভাবতাম। আত্মীয়-স্বজনেরা বলত—তোর বাবা সাধু হয়ে চলে গেছে, আর ফিরবে না। এখানেও মামির সঙ্গে মার বনত না। দু'জনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। মামি মাঝে মাঝে রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যেত। তখন মা আর দিদিমাকে না খেয়েই থাকতে হত। ভাঁড়ার ঘরের চাবি থাকত মামির কাছে। দিদিমা আমাকে প্রায়ই লুকিয়ে খাওয়াত। একদিন আমার জন্য মাছ চুরি করতে গিয়ে মামির হাতে ধরা পড়ল। আর যায় কোথায়? একেবারে উনুনের মধ্যে ঠেসে ধরে বুড়ির নাম ভুলিয়ে দিল। আর একদিন—কি নিয়ে যেন মায়ের সঙ্গে মামির ঝগড়া বেঁধে গেল। মাকে চিৎ করে ফেলে বুকের উপর পা দিয়ে পাড়াতে লাগল।

'মেরে ফেলল, মেরে ফেলল...ধরো ধরো' বলে মা চিৎকার করতে লাগল। পাড়ার কয়েকজন ব্যাটাছেলে এসে মামিকে থামাল। দিদিমা তখন চিৎকার করে কাঁদছে। আমি ভয়ে আর কাঁদিনি। বারান্দায় দু'হাত দিয়ে একটা খুঁটি জড়িয়ে ধরে নুনু ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

মামা তখন কলকাতায় সামান্য মাইনেয় চাকরি করে। ছ'মাসে ন'মাসে একবার বাড়ি আসত। মামি এক চিঠি লিখল—'এক্ষুনি তোমার বোনকে সরাল নইলে আমি গলায় দড়ি দেব।' মামা চিঠি পেয়েই বাড়ি চলে এল। সেই সময় মাকে মধুপুরে নিয়ে যাবার জন্য ঠাকুমার জা এক চিঠি লিখল। আমিও মায়ের সঙ্গে চলে গেলাম।

মধুপুর। এখানে ভাতের কষ্ট ছিল না। ঠাকুমার জাকে আমি বুড়োমা বলে ডাকতাম। বুড়োমা ঘরের দরজা বন্ধ করে দুধ, ঘি দিয়ে নানা রকমের খাবার বানাত আর একা একা বসে খেত। মাঝে মাঝে মা চুরি করে এনে আমায় দিত। বুড়োমা দু'একদিন মাকে একটু দিত। মাসের মধ্যে কুড়িদিনই মার সঙ্গে বুড়োমা কথা বলত না। অনেক করে হাতে পায়ে ধরে মা ক্ষমা চাইত। তারপর কথা বলত।

বুড়োমার আড়ালে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত। আর ধরা গলায় বলত—'তুই বড়ো হয়ে চাকরি করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবি—যাবি তো?' 'হাঁ মা'—বলে আমি মায়ের চোখ মুছিয়ে দিতাম।

তুমি বড়ো ভাগ্যবান হে

সেদিন আমি তিন নম্বর খালাসিদের লাইনে দাঁড়িয়েছি। মুখে পাইপ লাগিয়ে লম্বা রোগা এক সাহেব এল। ঘুরে ঘুরে সকলের নলি দেখছে। যাকে পছন্দ হচ্ছে তার নলি নিয়ে সাহেবের সঙ্গের বাবুর হাতে দিয়ে দিচ্ছে। সকলেরই মুখ খুব শুকনো। সকলের মুখ চোখ সাহেবের দিকে, করুণ। যদি সাহেব দয়া করে একবার নলিটা নিয়ে ফেলে। সাহেব ঘুরতে ঘুরতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার হাত পা কাঁপছে। সাহেবের দিকে সোজা চোখ ফেলে তাকাতে পারছি না। ক্রমেই বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। নড়াচড়া করছি না। সাহেব ইংরেজিতে আমার নাম জিজ্ঞেস করল—আমি খুব স্মার্ট হয়ে বুক ফুলিয়ে মুখ তুলে বললাম—'মাই নেম ইজ শ্রীঅবনীকুমার ধর স্যার।' 'আই সি' বলে আমার নলিটা হাতে নিয়ে সাহেব একবার আমার ফটোটা আর একবার আমার থেকে মাথা পর্যন্ত দেখছে আর মিচকি মিচকি হাসছে। সাহেব আবার জিজ্ঞেস করল—

'হাউ ওল্ড ইউ?'

'এইটিন ইয়ার্স স্যার'।

'বহুত বাচ্চা হ্যায়...।'

সাহেবের কথা শেষ না হতেই আমি বলে ফেললাম—

'নেহি সাব হাম সব কাম করনে সাকেগা।'

'তুমি ভাগকেতো নেহি জায়গা?'

'নেহি সাব, কভি নেহি ভাগেগা। আপ হামকো টেস্ট করকে দেখিয়ে।'

সাহেব হাসি হাসি মুখে আমার নলিটা নিয়ে নিজের কাছেই রাখল, বাবুর হাতে আর দিল না। আমি বুঝতে পারলাম না আমাকে পছন্দ হলো কিনা। একবার ভাবলাম পছন্দ না হলে আর নলি নিল কেন? আবার ভাবলাম বোধ হয় অফিসে গিয়ে সাহেব বলবে যে এত ছোটো

ছেলেকে কেন নলি দিয়েছ? তাহলে কি আমার নলি ক্যান্সেল হয়ে যাবে? আবার মামাবাড়ি ফিরে যেতে হবে? কেঁদে কেঁদে ভগবানকে ডাকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু অত লোকজনের মধ্যে লজ্জায় আর কাঁদতে পারলাম না। সাহেবের লোক বাছাই করা শেষ হয়ে গেছে। সাহেব গাড়ি করে চলে গেল। সাহেবের সঙ্গের বাবুটি শুধু রইল। মেরিন হাউসে তার অনেক কাজ আছে। আমি আস্তে আস্তে বাবুটির কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করলাম—'স্যার আমার নলিটার কী হল?' বাবু আমাকে দেখে হেসে জবাব দিল—'সাহেব তোমাকে খুব পছন্দ করেছে। তুমি বড় ভাগ্যবান হে। জাহাজে উঠতে না উঠতেই সাহেবের নজরে পড়ে গেছ। ভালো করে কাজ করবে। যে যা বলে তা শুনবে...'। একগাদা জ্ঞান দিতে শুরু করল বাবুটি। আমি তখন আর আমার মধ্যে নেই। বুকটা যেন ফেটে যাবে। আনন্দের চোটে চোখে জল এসে গেল। আঃ—মামাবাড়ি আর ফিরে যেতে হবে না। বাঁচলাম।

আমি যে জাহাজে সাইন করব সে জাহাজের নাম 'ক্ল্যান ম্যাকলিলান'। জাহাজ কোচিন পোর্টে আছে। সেখান থেকেই জাহাজে উঠতে হবে। বাবুর পেছন পেছন একটা হলঘরে গিয়ে বসলাম। সেখানে আরও অনেক খালাসি জটলা করছে। তাদের নানান কথার টুকরো আমার কানে ভেসে এল—'আইজগোর ডাক্তারটা হারামি আছে। হালা ঘুষ খায়। ঘুষ না দিলে ডাক্তারি পাশ করাইবো না।'

'কত কইরা নিবোরে বো?'

'পাউজগা টেহা'র কম না।'

'দ্যাহো ক্যাডা ক্যাডা রাজি আছে। হ্যাগোরথাই একলগে টেহা লইয়া দিয়া অহিগ্যা।'

'চুপ থাকে মিঞা, টেহা দিমু কিয়ের লইগ্যা, চঁইয়ার মাথা কি ফোলসে?...দিলে হালা মাগীরেই দিয়া হারা রাইত থাইক্যা আমু। ডাক্তারের দিমু কিয়ের লইগ্যা?'

'তোমাগোরে যদি চুলকায় তয় যাও হালা গোয়া দিয়া আহোগিয়া...ধোনে হালা কড়া পইড়্যা গেল কোন হালারে এউগ্যা পয়সা দিলাম না, আইজ হালা ডাক্তারের দ্যাওন লাগবো টেহা?'...

'আরে খোও ফ্যালাইয়া, হালা ডাক্তারের গুষ্ঠি কিলাই।'...

এক সময় ডাক পড়ল। কেউ কেউ ঘন ঘন ডাবের জল খেয়ে নিচ্ছে। কেউ পকেটে ভারী ভারী বাটখাড়া পুরছে। কেউ 'আল্লা আল্লা' বলে ডাকছে। সকলকে একটা ঘরে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হলো। একজন চাপরাসি এসে প্যান্ট, জামা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া সব খুলে দাঁড়াতে বলে গেল। সবাই চটপট করে খুলে ফেলল। সকলের দেখা দেখি আমিও সব খুলেই দাঁড়ালাম। কেউ কারো দিকে সোজাসুজি দেখছে না। সবাই সামনের দিকে বীর জওয়ানের মতো তাকিয়ে আছে। আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। একটু বাদে আমি আঁড় চোখে অন্যদের বাঁড়া দেখতে লাগলাম। সকলেরই সাইজ বেশ বড়ো। সবারই টুপি ওল্টানো, বাঁ দিকে কাত হয়ে আছে। কারোর কুচকুচে কালো, কারোর তামাটে, কারোর মোটা, কারোর সরু লিকলিকে। ডগার দিকটা এট্টু লাল, সকলেরই বাল কামান। আমার নুনুটা সোজা হয়েই কুঁকড়ে আছে। সবে বাল গজিয়েছে বলে ট্রেনিং সিপের ডাক্তার বলে দিয়েছিল—'আভি তোমহারা বাল কাটনে কা জরুরৎ নেহি।' তাই কামাইনি। স্টেথিসকোপ গলায় ঝুলিয়ে মোটা বেঁটে মাথায় টাক পড়া এক হোঁৎকা ডাক্তার এলো। সবাইকে এক নজরে দেখে নিল। হঠাৎ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আমি সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে আছি। নুনুটা আরও ভেতরে চলে গেছে। মনে হল বিচি দুটো ওঠানামা করছে। ডাক্তারবাবু আমাকে লাইন থেকে ডেকে তার ঘরে নিয়ে গেল। পেছন ফিরে উবু হয়ে দাঁড়াতে বলল। আমি সেইভাবেই দাঁড়ালাম। একটা টর্চলাইট দিয়ে আমার পোঁদের

গর্তের মধ্যে কী যেন দেখল বার বার। তারপর আবার সামনের দিকে ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলল। দাঁড়ালাম। বিচির তলায় হাত রেখে জোরে জোরে কাশতে বলল। জোরে জোরে, আহ্ আহ্, করে কয়েকবার কাশলাম। তারপর নুনুটা ধরে দু-তিনবার হাত মারার কায়দায় নাড়ানাড়ি করে এক হ্যাঁচকা টান দিল। প্রাণটা বেরিয়ে যাবার জোগাড়। কানের ছেদা, গলার ছেঁদা, চোখ, বুক, পেট, পিঠ টিপে টিপে এক এক করে সব দেখে বলল—'যাও ফিট'। আমি গম্ভীর হয়ে নুনুটা নাচাতে নাচাতে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জামা প্যান্ট পরে ফেললাম। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ডাক্তারি পরীক্ষায় আমার ফেল করার কোন চান্স নেই তা সবাই জানত। একজন লাইন থেকে আস্তে আমায় বলল—'যাও তোমার হইয়া গ্যাছে, বহো গিয়া।' বাইরে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। একে একে সকলেরই ডাক্তারি পরীক্ষা হয়ে গেল। কেউই ফেল করল নয়। কোম্পানির বাবুটি এল। সবাইকে ডেকে নিয়ে আর একটি হল ঘরে ঢুকল। আবার লাইন দিয়ে সবাই দাঁড়ালাম। একজন একজন করে নাম ডাকছে আর দু'হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ সই নিয়ে এক মাসের যার যা মাইনে আগাম দিয়ে জাহাজে ওঠার তারিখ বলে দিচ্ছে। আমারও ডাক হল। গেলাম। দুই বুড়ো আঙুলের টিপ সই দিয়ে একশ টাকা পেলাম। টাকাটা খুব সাবধানে রুমালে বেঁধে পকেটে রেখে দিলাম।

লাথি মারি কলকাতাকে

মেরিন হাউস থেকে গঙ্গার পাড় ধরে ট্যাকসি করে সোজা ধর্মতলায়। সাজানো জামাকাপড়ের দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছি। কত কী যে কিনতে ইচ্ছে হচ্ছে! কিন্তু খুব দরকারি জিনিসপত্র ছাড়া আর বেশি কিছু কেনা যাবে না। ঠিক করলাম মাকে কিছু টাকা পাঠাব! ঘুরতে ঘুরতে একটা চামড়ার সুটকেসের দোকানে ঢুকলাম। পঁচিশ টাকা দিয়ে একটা সুটকেস কিনে ফেললাম। বিদেশে টিনের বাক্স চলে না। সুটকেস কেনার পর হিসেব করে দেখলাম, টাকায় কুলোবে না। অত দাম দিয়ে সুটকেস কেনাটা ঠিক হয়নি। আবার দোকানে ফিরে গিয়ে বললাম—'ভাই, বাড়িতে খুব গালাগালি করছে। আমাকে টিনের বাক্স কিনতে বলেছিল, আমি ভুল করে চামড়ার সুটকেস কিনে ফেলেছি। এটা ফেরৎ নিয়ে নিন।' দোকানদার অসন্তুষ্ট হয়ে আমার দিকে ভ্রূকুঁচকে তাকাল। অবশ্য সুটকেস ফেরৎ নিয়ে আমায় টাকাটা ফিরিয়ে দিল। আমি ওখান থেকে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বাসে চেপে গোপালনগর রোডের কাছে একটা চোরাবাজারে গেলাম। সেখানে হরেক রকমের পুরানো মাল পাওয়া যায়। বাজারের মধ্যে ঢুকে চামড়ার সুটকেস দেখতে লাগলাম। অনেক বাছাবাছির পর একটা পছন্দ হলো। পনের টাকা চেয়েছিল। বারো টাকা দিয়ে কিনে ফেললাম। ওখান থেকে চামড়ার সুটকেসটা নিয়ে চলে গেলাম খিদিরপুর। জাহাজিদের পুরানো পোশাক কিনতে। সেখান থেকে বেছে বেছে একটা পুরানো কোট, একটা প্যান্ট, একটা ফুলহাতা উলের সোয়েটার, মোজা, মাথার টুপি কিনলাম। তারপর বাইরের দোকান থেকে একটা গেঞ্জি, তোয়ালে, সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাস, আয়না চিরুনি, মাথার তেল, একটা নোট বুক, পেন, কালি, চিঠি লেখার প্যাড...একে একে সবই কিনে ফেললাম। সুটকেস বোঝাই হয়ে গেল। এইসব কেনাকাটি করতে প্রায় পঞ্চাশ টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে। মাকে কুড়ি টাকা পাঠাব ঠিক করলাম। এখনও বিছানা বালিশ কিনতে হবে। জাহাজে শুধু একটা গদি আর দু'টো কম্বল ছাড়া আর কিছুই দেয় না। খিদিরপুরেই এক দোকানে একটা তোষক আর একটা বালিশ তৈরি করতে দিলাম। এতে পনেরো টাকা লাগবে। মশারি কিনতে হবে না। ট্রেনিংশিপ

থেকে বলে দিয়েছিল—জাহাজে মশা মাছি নেই। একটিন লজেন্সও কিনলাম। মাঝে মাঝে জাহাজে খাব। কয়েকটা খাম পোস্টকার্ড কিনে ফেললাম। মাকে, মামাকে কয়েকজন বন্ধুদের যাবার আগে চিঠি লিখব। কেনাকাটি প্রায় সবই হলে একটা ট্যাক্সি ক'রে সোজা ট্রেনিং শিপে পৌঁছলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ট্রেনিং শিপে উঠে প্রথমেই চিফ অফিসারকে জাহাজে সাইন করার কথা জানালাম। এখনও তিনদিন ট্রেনিং শিপে আমাকে থাকতে হবে তাও বললাম। চিফ অফিসার আমার পিঠ চাপড়ে বলল—ভেরি গুড্ ভেরি গুড। ঠিকসে জাহাজমে কাম করেগা। বদমাশি নেহি করেগা—ঠিক হ্যাঁয়।' 'ইয়েস স্যার' বলে এক সেলুট ঠুকে ট্রেনিং শিপে আমাদের থাকার জায়গায় সুটকেসটা নিয়ে রেখে দিলাম। ভালো করে দেখে নিলাম তালা দেয়া ঠিক আছে কিনা। তারপর মুখ হাত ধুয়ে একটা পায়জামা আর সার্ট পরে বাইরে খেতে চলে গেলাম। খেয়ে দেয়ে হোটেলের পাওনা চুকিয়ে পানের দোকানে গিয়ে একটা মিষ্টি পান খেলাম। এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট আর একটা দেশলাই কিনে মেজাজে পান চিবুতে চিবুতে ডকের মধ্যে এসে জেটির উপর বসে সিগারেট টানতে লাগলাম। ডকের ভেতর বিভিন্ন দেশের জাহাজ বাঁধা। বড়ো বড়ো ক্রেনে করে জাহাজ থেকে মাল খালাস করছে। আবার বোঝাই করছে। আমিও ওই রকম জাহাজে চড়ে লন্ডন যাব। কত দেশ বিদেশ ঘুরব। ইংরেজিতে কথা বলব। সুট-টাই পরব। যখন দেশে ফিরব, মামা-মামি দেখে ট্যারা হয়ে যাবে। এবার জাহাজ থেকে ঘুরে এসেই আলাদা বাসা ভাড়া করে মাকে নিয়ে থাকব। কলকাতায়। মামা-মামি দেখে তখন জ্বলে পুড়ে মরবে। আফসোস করবে আর ভাববে—কেন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল।

জেটি থেকে উঠে পড়লাম। ট্রেনিং শিপে শোবার জায়গায় গিয়ে মাকে মামাকে আর শুনুকে চিঠি লিখলাম। মাকে লিখলাম—'মা, আমি বিলেতে যাইতেছি। আমার জন্য চিন্তা করিও না! তোমাকে কুড়িটা টাকা পাঠাইলাম। ইচ্ছেমতো খরচ করিবে। বিলেত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধুপুর হইতে তোমায় লইয়া আসিব। পরে জাহাজের ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিব।'

মামাকে লিখলাম—'আমি ইংলন্ডে যাইতেছি। সেখান হইতে আফ্রিকা তারপর অস্ট্রেলিয়া ঘুরিয়া ইন্ডিয়ায় ফিরিব। দেশে ফিরিতে বছরখানেক লাগিবে। মাকে টাকা পাঠাইয়াছি।'

শুনুকে লিখলাম—'আমি ইংলন্ডে চলিয়া যাইতেছি। আবার কবে দেখা হইবে জানি না। পরশু সকাল আটটায় হাওড়া স্টেশনে আসিলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে। তোর অপেক্ষায় থাকিব।'

চিঠিপত্র সব লিখে সুটকেসটা খুলে ভালো করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলাম। একটা হোলডল কিনতে হবে। আর একটা ইংরেজি ওয়ার্ড বুকও কিনে নিয়ে যাব। জাহাজে ছুটির সময় ওয়ার্ডবুক পড়ে ইংরেজিতে কথা বলা শিখব। রাত দশটার মধ্যে ট্রেনিং শিপে শুয়ে পড়ার নিয়ম। সুটকেশে ভালো করে তালা লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম! ভোর ছ'টার আগে ওঠার নিয়ম। আগেই উঠলাম। নতুন কেনা টুথব্রাস দিয়ে দাঁত মাজতে কীরকম মায়া লাগছে। ঠিক করলাম জাহাজে উঠে নতুন ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজব। এ'কদিন আগের মতোই আঙুল দিয়ে মাজি। মুখ হাত ধুয়ে বাইরে গেলাম। মামলেট টোস্ট, চা খেয়ে ট্রেনিং শিপে ফিরে এলাম। স্নান করে প্যান্ট সার্ট পরে বেরিয়ে চলে এলাম ধর্মতলার দিকে। হোলডল দর করলাম। সাত-আট টাকায় পাওয়া যায়। ঠিক করলাম বিকেলে ফেরার পথে কিনব। পোস্টঅফিসে গিয়ে চিঠিগুলি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে মাকে কুড়ি টাকা মনিওর্ডার করলাম। ধর্মতলা স্ট্রিটের ফুটপাত ধরে হাঁটছি। আর এ দোকান সে দোকান ঘুরে ঘুরে দেখছি। বারোটা বাজে। খুব খিদে পেয়েছে। একটা হোটেলে ঢুকে মুরগির মাংস আর ভাত খেলাম। এদিক ওদিক আর একটু ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ টিকিট কেটে মেট্রোতে ঢুকে

পড়লাম। কী বই দেখেছিলাম মনে নেই তবে বেদম মারামারি, দৌড়াদৌড়ি, আর পিস্তলের গুলি ছোঁড়াছুড়ি এই-ই মনে আছে।

সিনেমা দেখে বেরিয়ে এসে হোলডল কিনে সোজা খিদিরপুর। সেখান থেকে বিছানা নিয়ে হোলডলে পুরে ট্রেনিং শিপে ফিরলাম।

পরদিন সকালে উঠে একব্যর ভাবলাম—মামাবাড়ি গিয়ে দেখা করে আসি। আবার ভাবলাম—না, চিঠি লিখে দিয়েছি, এমন যাওয়াটা খারাপ দেখায়। একবার ভাবলাম—পাড়ায় গিয়ে ঘুরে আসি। কিন্তু মামার বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলে? যাগগে। লাথিমারি কলকাতাকে। কলকাতায় আমার কে আছে? আজকের দিনটা কাটাতে পারলেই আর কোনো চিন্তা নেই। কয়েক দিন ট্রেনে কাটবে। তারপর জাহাজ সমুদ্র আর সমুদ্রের জল। কোচিন থেকে জাহাজ ছেড়ে বাইশ দিন পর লন্ডন পোর্টে পৌঁছবে। লন্ডনে গিয়ে কী কী কিনব ভাবতে লাগলাম। আগে একটা সুট আর টাইতো কিনবোই তারপর একটা ঘড়ি, একটা ক্যামেরা এই সব কিনে পরে বাকিটা। ভাবতে ভাবতে দিনটা কেটে গেল। রাতও ফুরোল। ভোরবেলায় উঠেই ভগবানকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। মাকে মনে মনে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলাম। বিছানা সুটকেস বেঁধে স্নান করে একে একে ট্রেনিং শিপের সমস্ত অফিসারদের সঙ্গে দেখা করলাম। কাল্টুদার সঙ্গে দেখা করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

তারপর দু'হাতে সুটকেস আর হোলডল ঝুলিয়ে বেরিয়ে গিয়ে একটা ট্যাকসি ধরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম। তখন সাতটা বাজে। আটটার মধ্যে পৌঁছবার কথা বলে দিয়েছিল। আর তিন চার জন আমার আগেই এসে পৌঁছেছে। ওদের জিনিসপত্তরের সঙ্গে আমার সুটকেস আর হোলডল রেখে চা খেতে গেলাম। একে একে সকলেই এসে গেছে কোম্পানির বাবুও এসেছে। সকলের মালপত্র ওজন করল। কুলিরা মাল নিয়ে প্লাটফর্মে চলে গেল। বাবু সকলকে ডেকে লাইন করে দাঁড়াতে বলল। এক একজনের রোজ তিন টাকা হিসেবে তিন দিনের খোরাকি বাবদ ন'টাকা দিয়ে বলল—'সবাই বারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম গিয়ে দাঁড়াও।' আমার জন্য কেউ আসছে কিনা দেখবার জন্য একবার বাইরে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেছে। কুলিরা আমাদের জিনিসপত্র সব লাগেজ ভ্যানে তুলে দিয়েছে। বাবু এসে আমাদের দুখানা রিজার্ভ করা বগি দেখিয়ে দিল। স্টল থেকে একটা খবরের কাগজ কিনলাম। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘুরছি আর দেখছি কেউ আসে কিনা। হঠাৎ চেয়ে দেখি ছোটো দুই মামাতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মামা হন হন করে এগিয়ে আসছে। মামাকে দেখে আনন্দে বুক ভরে উঠল। ছুটে গিয়ে মামাতো ভাই দু'জনের হাত ধরলাম। মামা জিজ্ঞেস করল—'কোন কামরায় উঠেছিস?' মামাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কামরাটা দেখালাম। মামা কামরায় ভেতর উঠে সকলের দিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর কেমন ঘাবড়ে গিয়ে একে ওকে ডেকে বলতে শুরু করল—'আপনারা একটু ওকে দেখবেন। একেবারেই ছেলেমানুষ। একলা কোনোদিন বাড়ির বাইরে যায়নি।'

আমাকে ডেকে বলল—'খুব সাবধানে থাকবি। যেখানেই যাস চিঠি দিবি।' গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। মামার আড়ালে দুই মামাতো ভাইয়ের হাতে একটা করে টাকা গুঁজে দিলাম। গার্ডের হুইসেল পড়ল। মামাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। মামার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে। আর আমার দিকে চেয়ে ক্রমাগত হাত নাড়াচ্ছে। আমিও যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় রুমাল নাড়িয়ে গেলাম। তারপর এক সময় ওই রুমাল দিয়েই চোখ মুছে ফেললাম।

আমার বৈষ্ণব বাবা

কলকাতা থেকে তিরিশ মাইল দূরে একটা রিফিউজি কলোনিতে মাকে নিয়ে থাকি। বাড়ি থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় একটা মার্চেন্ট ফর্মে চাকরি করছি।

এক ছুটির দিন বিকেলবেলায় আমাদের বাড়ির পাশেই একটা ময়দানে জনসভা হচ্ছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিলাম। হঠাৎ দেখি কলকাতা থেকে আমার এক মামাতো ভাই আমাকে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি দেখেই ওকে ডাকলাম। ও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল—শিগ্গি বাড়ি চল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কী হয়েছে?' বলল—'পিসেমশাই এসেছে।' পিসেমশাই? কে পিসেমশাই? ভাই হেসে বলল—'তোর বাবা।' আমার বাবা? কোত্থেকে এলো? ভাই বলল—'কলকাতার এক রাস্তা দিয়ে পিসেমশাই যাচ্ছিল। বাবা দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছে। তারপর আমার সঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিল।'

তাড়াতাড়ি মামাতো ভাইকে নিয়ে বাড়ি এলাম। দরজায় মা দাঁড়িয়েছিল, আমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। মা আমাকে দেখেই চুপি চুপি বলল—'তোর বাবা এসেছে।' আমি মাকে ইশারা করে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি ঠিক চেনোতো?' মা হেসে বলল—'কী বলিস—আমি চিনবো না। যা-প্রণাম কর।'

মা ঘরে চলে গেল। মায়ের মুখখানা খুব হাসিখুসি দেখলাম। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছি—কীভাবে গিয়ে বাবা ডাকব।

জীবনে কখনও বাবা বলে কাউকে ডেকেছি মনে পড়ে না। জ্ঞান হবার পর থেকে কখনও বাবাকে দেখিনি। মা-ও দু'বছরের বেশি বাবার সঙ্গে ঘর করেনি। বাবা স্বার্থপরের মতো মাকে আর আমাকে ফেলে চলে গেছে। শালা এখন এসেছে বাবা মারাতে!

ঘরে ঢুকলাম। লম্বা চওড়া বেশ মোটাসোটা চেহারা। শ্যামবর্ণ। গেরুয়া কাপড়, কপালে তিলক। মেয়েদের মতো মাথায় চুল। বৈষ্ণব বেশে একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে আছেন আমার বৈষ্ণব বাবা। আমি সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখছি। বাবাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মা আর মামাতো ভাই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছে।

বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করল—'তোর চেহারা এত খারাপ কেন?' আমি কোনো উত্তর দিলাম না। কী ভাবল জানি না। বাবা মুখ ঘুরিয়ে আবার বলল—'খুব রোগা হয়ে গেছিস।' এবারও আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঝপ করে একটা প্রণাম করেই ভেতরের ঘরে চলে গেলাম। পাশে রান্না ঘরে দেখি—গেরুয়া কাপড় পরা মোটাগাটা তেলতেলা চেহারার কালো একটি মেয়ে তরকারি কুঁটছে। মাকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলাম—'এ আবার কে?' মা আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল—'ও ওর সেবাদাসী। ওর সঙ্গেই ও এখন থাকে।' বলেই মা আমায় বলল—'থাক, তুই কিছু ওদের বলিস না। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।' মা ঘরে চলে গেল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইচ্ছে করছিল—ঘাড় ধরে ওই মাগীটাকে বার করে দিই। আবার ভাবলাম—শেষে এই নিয়ে পাড়ায় একটা কেলেঙ্কারি হবে। যাগগে!

একটা থলি হাতে নিয়ে বাজার করতে গেলাম। কিছু মিষ্টিও কিনে আনলাম। বাড়িতে বাজারের থলে রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় হাঁটছি আর ভাবছি—বাবাকে কী বলব! কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। বাড়ি ফিরে এলাম। আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল, এক সঙ্গে খেতে বসবে বলে। আজ আবার সেবাদাসীই রান্না করছে। সে-ই আমাদের সকলকে খেতে দিল। মা এক কোনায় বসে বাবাকে আর সেবাদাসীকে একমনে দেখছিল। মাঝে মাঝে আমাকে

মা ইশারায় বলছিল—'ওদের কিছু বলিস না।'

আমি মুখ গুঁজে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মামাতো ভাই আমার চেয়ে ছ'মাসের বড়ো, সেও আমার সঙ্গে আর কথা বলছে না। বাবাও চুপ করে বসে খাচ্ছে। হঠাৎ সেবাদাসী বলে উঠল—খোকাকে এবার একটা বিয়ে দিয়ে দাও। কেউ কোনো উত্তর দিল না। সেবাদাসীর কথা শুনে আমার মেজাজটা আরো খাট্টা হয়ে গেল। ইচ্ছে করছিল ভাত ফেলে উঠে চলে যাই। মা'র ইশারার কথা ভেবে চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়লাম।

বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি। সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। আমি ঘরে ঢুকলাম। মা ভেতরের ঘরে দু'টো বিছানা করেছে আর সামনের ঘরে একটা বিছানা। ঘরে ঢুকে বাবার সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। বাবা আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'তুই যদি ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারতিস, তাহলে রেলে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম।'

আমি কোনো কথা বললাম না। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু বাদে আমি গম্ভীর হয়ে বাবাকে বললাম—'শুনুন, এখানে যদি থাকতে চান তাহলে ওই মাথার চুল আর এই গেরুয়া ছাড়তে হবে। আমি একটা মুদি দোকান দিয়ে দেব তাই নিয়ে থাকবেন।' বাবার মুখ চোখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কোনো উত্তর দিল না।

আমি আর বসে থাকতে না পেরে সামনের ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মামাতো ভাইও আমার পাশে এসে শুলো।

মা, বাবা আর সেবদাসী ভেতরের ঘরে শুতে গেল। ভেতরের ঘরে কে কোথায় শুলো তা আমি জানি না।

ভোর বেলায় উঠে দেখি আমি ওঠার আগেই বাবা তার সেবাদাসীকে নিয়ে চলে গেছে। মা আমার সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কী বলে গেল?' মা দেখলাম একটু ভেঙে পড়েছে। আমায় বলল—'তোর উপর খুব রাগ করেছে।'

কিছুদিন বাদে ভবানীপুরে আমার এক পিসতুতো দিদির কাছে শুনলাম—বাবা আর মা খাটে শুয়েছিল আর সেবাদাসী শুয়েছিল নীচের বিছানায়। বাবা নাকি মাকে বলেছিল—তুমি ইচ্ছে করলে আমার উপর উঠে করতে পারো। মা নাকি বলেছিল—'আমি ওই রকম ভাবে করতে পারি না।'

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ক্ষুধার্ত তরুণদের গদ্য বা তজ্জাতীয় কিছু

সুনীল যখন কলকাতাকে ফুস্‌লে হল্‌দিয়া বন্দরে গিয়ে গুম্ করার তালে, ঠিক তার আগেভাগেই আমাকে কান মূলে বাউন্ডারি থেকে বের করে দিয়েছে কলকাতা। হাবাগোবা বয়েসের ঢাউস অভিমান নিয়ে ঘুরে ফিরছি দিল্লি সোনেপথ খামোখা ময়নাগুড়ি দুম্ ক'রে বরাকর রাতে টেলিগ্রাম পেয়ে ধানবাদ দিনে টেলিগ্রাম পেয়ে জলপাইগুড়ি। এখানেই তেষট্টির গোড়ার দিকে সতীন্দ্র ভৌমিক নামে একটি যুবক কলকাতা থেকে নবজাত ক্ষুধার্ত বংশাজদের এলোপাথারি অঢেল লেখা-পত্তর আমাকে গছাতে শুরু করল। দু চারটে চিঠি পাই—আমার বন্ধুদের কেউ কেউ বেশি মাত্রায় শক্তি, উৎপল আর সন্দীপন পেল্লায় চেঁচামেচি শুরু করেছে এ হেন নতুন সাহিত্য নিয়ে—শক্তি লিডার সন্দীপন মুরুব্বি। ওদের আর কেউ না হোক, আমরা দু চারজন তো হাড়ে হাড়ে চিনি—বেহদ্দ বোকা বনে যাচ্ছিলাম এদ্দুর থেকে। নিজে তখন তিনচার বছর একবর্ণ লিখি না, মাঝে মাঝে ভীষণ অস্থির হই, এক দিন তো তিস্তার বাঁধে দেবেশ রায়ের কাছে দুঃখ করতে করতে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদেই ফেল্লাম। কোনো কিছু তখন ধাতে সয়না, বেশি সাহিত্য ফাহিত্য দেখলে বাংকে উঠে যেতে ইচ্ছে করে। এমন নিটোল ঘুমের সময় 'এই সব মানবক তোমরা কোত্থেকে—খিদেই বা তোমাদের কিসেরহে'—ইত্যাদি ভেবে প্রচণ্ড বিরক্তিকর দাঁতন বর্জিত মুখ কেমন চটচটে, তেতো হয়ে গেল।

পঁয়ষট্টি সালে যখন ফের কলমের মুখ খুলেছি, বাজার আঁচ করার জন্য পুজোর ছুটিতে কলকাতার এসে পা দিয়েই গড়িয়াহাটের মোড়ে দৈবত উৎপলের সঙ্গে দেখা। 'বাসুদেব দাশগুপ্তর রন্ধনশালা পড়েছিস?' ফার্স্ট কোয়ারি। সে আবার কে?' মফঃস্বলের লোকের শহরে এলে ফ্যাকরা তো কম নয়—অজ্ঞতা ঢেকে খুবই লাজুক প্রেমিকের গলায় বললাম, 'এমন চাঁদিনি রাত—চ' মাল খাই।' একটা স্ল্যাং ইউজ করে উৎপল চলে গেল। আর এমনি গেরো, ঘাসপট্টির মালের দোকানে ঢুকেই সেদিন বাসুদেবের সঙ্গে আলাপ। শক্তি আর আমি এক কোণে নিরিবিলি টানছি। হঠাৎ শক্তি ওকে ডাকল। যেন জর্ডনের জল নিয়ে আসছে, দুহাতে দুটি পাঁইট, শ্রীমানকে চাক্ষুষ দেখলাম। কি একটা কারণে খুব মনোকষ্টে ছিল সেদিন। বেঁহুশ অবস্থায় চান্স নিয়ে বললাম, 'কিসের হাংগার মশায় আপনার?' আর বলা মাত্তর গলগলিয়ে বলতে শুরু করল ছোকরা, 'আয়্যাম হাংরি ফরলভ্—হাংরি ফর ফ্রেন্ডশিপ'...ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরের দিন ওর 'রন্ধনশালা' পেয়ে আদ্যন্ত পড়ে ফেলি। তেরিয়া ছেলে—কোনো কমেন্ট চায়নি। জলপাইগুড়ি ফিরে এলাম। দেবেশকে পড়ালাম। কোনো তাপ-উত্তাপ পেলাম না ওর দিক থেকে। আমি পদ্যের কারবারি দেবেশ বন্ধু বান্ধবদের ভেতর পয়লা নম্বর না হোক পয়লা সারির গল্প-লিখিয়ে—বেশ একটু দমে গেলাম। কিছুটা নির্মম হয়ে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পড়লাম

বই-টি। খুবই অস্বস্তিকর ধরনের, আমার সংস্কারে নেই এমন লেখা। আর আমাদের বাপ পিতামহ থেকে পাওয়া সেই সাবেকি অভ্যেস, চট করে একটা লেখা পড়ে সেটাকে ক্যাটিগোরাইজ করে দেয়া—তা না পেয়ে রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়ছিলাম আরকি। অবশ্য ইতিমধ্যে বেহার থেকে শ্রীমলয় রায়চৌধুরী, যার মুখ আমি এখনও দেখিনি, পাঠিয়ে যাচ্ছেন চিঠি প্যাম্ফলেট বাংলায় ইংরিজিতে, তাঁর পদ্যের বই পরপর। তবুও নয়, রন্ধনশালা-কে তার ঘোষিত ম্যানিফেস্টোর খোপে কোনো প্রকারেই বসাতে পারছিলাম না। কারণ কী নেই বাসুদেবের গদ্যে ; প্লট? সিচুয়েশান তৈরি? আছে। ক্যারেকটারস্? পাবেন। অর্থাৎ এক কথায় গপ্পো বলতে এটু জেড যা মনে করেন। তবে? ওই প্রশ্নবোধক চিহ্ন পেছনে সেঁটে ঘুরলাম ঝাড়া চাট্টি বছর—সেই ভয়ংকর জিনিসটা যা আঁচ করতে পারি, বোঝাতে গেলেই চিত্তির অনেকটা নিজের প্যালপেবল হৃৎপিণ্ড হাতে নিয়ে তার থির থির রক্ত চোঁয়া, নড়া চড়া দেখার মতো। এত বেপরোয়া, তবু ফ্যাইন্যালি বাঙালির ছেলে, মা এড়াতে পারলো না বাসুদেব, ওর আগুন জ্বলা রিঙের দেখার দর্শক তিনি, একমনে বাঘের খেলা দেখছেন। ফ্লাড লাইটের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে তাঁর নাকের নাকছাবি আর চোখের কোনায় জল।' ওর আর এক সহলেখক সুভাষ ঘোষ কী প্রচণ্ড সোশিয়ালিস্টিক—'হাঁসেদের প্রতি'র মতো আগাগোড়া কমিউনিস্ট গদ্য লিখে ফেলে—করিমের দোকানে কারবাইড্ গিলতে গিলতে রাগী গলায় বলে, 'হ্যাঁ মশায় আমি সবচেয়ে জেনুইন কমিউনিস্ট!' আর বাসুদেব? কোনো গল্পে শেষ অব্দি কোথাও পৌছতে পারে না, বুড়ি ছুঁয়ে এসেছে মা, মার্কস সায়েবের ওপর আরেকটু গলা বাড়িয়ে বলে কী না, 'আমাদের যেমন কিছু হারানোর ও নেই জেতার-ও নেই।' অর্থাৎ সদাসৎহীন পরিণামহীন ফলাফলহীন—এই ওর লেখার নিয়তি, প্রস্থানপথ। বাসুদেব নিজেকে খুব বমন-প্রবণ বলে ঠাওরায়। বড়ো দীর্ঘকাল বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে যুগ থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু ইনুনি বিনুনি ধ্যাস্টামো বানানো ওপর চালাকি ভ্যাজভ্যাজে সুখ ধাপ্পাবাজ গৃহী মানুষের আচরণ বাদে থিক থিক করছে, তার দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে বাসুদেব পয়লা চোট 'বমন রহস্য' গল্পে 'বমি করে যাই রক্তাক্ত পথের উপরে। সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো, সমস্ত জীবন ভোর খেয়ে যাওয়া যাবতীয় মাংসের টুকরো আমি বমি করে উগরে বার করতে থাকি। বমির তোড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। আমি বমি করি' থেকে 'অভিরামের চলা ফেরা—৭' ইস্তক আউড়ে যায় 'এত ভালো জিনিস সব বেরিয়ে যাবে শেষে? আমার প্রায় কান্না পেয়ে যায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করি নিজেকে।... ...বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করি যেন। হঠাৎ...মুখ ভরে ওঠে বমিতে...সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলি...আবার...এবারও গিলে ফেলি...আবার আবার...।' আসলে, বাসুদেবের যা গল্পের কেন্দ্র, যেখানে সে নিক্ষেপ করে নিজেকে, সেখানে রক্ত ও ইতিহাসের পাপ তার চাওয়ার বা পৌছনোর ইচ্ছেটাকেই গোড়া থেকে খতম করে দিয়েছে। বাস্তবে তো নয়ই, ফ্যানটাসিতে পর্যন্ত ভূতগ্রস্থ হয়ে শেষতক বুঝি চলা যায় না। হাড়মজ্জা রোমাঞ্চে তুলতুলে হয়ে আছে বলেই বাসুদেব এ্যাপারেন্টলি ঋজু বয়স্ক ভাবসাব 'বসন্ত উৎসব', 'রতনপুর'-এ দেখাতে যেয়েও স্বভাবের দোরগোড়ায় আছড়ে পড়ে শেষ অব্দি চেঁচিয়ে ওঠে, 'চুমকি আয়, চুমকি আয়।' আসলে চুমকি তো ইল্যুশন—বাসুদেব কী ইল্যুশনের দ্বিতীয় পৃথিবী গড়ে তার ভেতরে চোখ কান বুজে সেঁধোতে চায়, তাই কি ওর স্বপ্নের মধ্যে মনিকার খসখসে সুঁচোলো জিভ লালাগ্রন্থি, আরতির এগোতে থাকা নৌকো, বন্‌শি-ই, ব...ন্...শি...আ...রে ডাকে বালকের দৌড়ে এসে ওর হাত ধরা? না, কমিট্ করতে চাই না এভাবে ; কারণ বাসুদেবের সমস্ত লেখার ব্যাপারটা আমার কাছে কোলাজের এফেক্ট আনে দু-পরত তিন-পরত ভাঁজের

ভেতর থেকে মোমজামার পাতলা ত্বকের ভেতর থেকে এখানে উস্‌কে আসে এক এক ডাইমেনশনের আলো। ওর লেখা পড়তে পড়তে বহুবার আমার সময় দিনরাত নরনারী উত্তম মধ্যম অধম পুরুষ ইত্যাদি ভেদ ধুয়ে গিয়ে সব কেমন একসা হয়ে যায়। খুব মনে হয়, বাসুদেব আসলে সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে প্রোজেক্ট করে। এই অবারণ ঢুকে যাওয়া তন্ন করে করে দেখার পরিশ্রমের শেষ যে কয়েকটি খট্‌ খটে শাদা হাড় তা বাসুদেব জানে কিনা আমি জানি না। ধরনে ধারণে খুব অ্যান্টি রোমান্টিক হওয়ার চেষ্টা আছে ওর। কিন্তু পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওর বুক ছাড়া আর কিছুই নেই—তা কি এখনো ও ঠাহর করতে পারেনি? না কি নিজের জন্ম, স্বভাব ও সংস্কারের বিপরীতে অভিযান-ই বাসুদেবের শিল্প-ঘোষণা? একেবারে গেঁয়ো, প্রিমিটিভ হয়ে যাওয়া?

অথচ এ সবেরই পাশাপাশি দেখুন, পাঠককে কী নিদারুণ অস্বস্তিতে ফেলে বাসুদেব একই সঙ্গে কী প্রচণ্ড চতুর, কোরাপট্—একেবারে শয়তানের মতো ছক কেটে কেটে সুপরিকল্পিত ওর ক্লিশে-র অনবদ্য ব্যবহার, দারুণ সূক্ষ্ম রসবোধ, বাক্য গঠনের ইকনমি, শয়তানিতে গিজ্‌ গিজ্‌ ঠাসা মাথা। আমার এ উক্তির মোক্ষম দলিল ওর অভিরামের চলাফেরা (৯), অভিরামের চলাফেরা (ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ ১ম সংকলন) রন্ধনশালা-র এখান ওখান এবং 'রিপুতাড়িত' রিপুতাড়িত রিপুতাড়িত। এই 'রিপুতাড়িত' পড়ে আমি তাজ্জব বনে গেছি। এবং এ গল্প পড়েই আমার মোক্ষম জ্ঞান হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত জঠর ক্ষুধা ও মূলমূত্র ত্যাগ—এই দুটো বিষয়ই মানুষের খেয়াল খুশি ও সংযমের বাইরে থেকে যায়। সারা পথ যৌনতার সঙ্গে হেঁটে যৌনতাকে এমন প্রচণ্ড লাথি আর কোনো তরুণ লেখক কষতে পেরেছে কি না, জানি না। 'কাছাকাছি এগিয়ে দেখি—ও কী! ঝোপের ওখানটায় বসে ওরা কী করছে। (লক্ষ করুন, বাসুদেবের ন্যাকামো আর বদমাইসি ')...এদিকে ফোঁটা ফোঁটা পেচ্ছাপে আমার জাঙ্গিয়া বেশ খানিকটা ভিজে উঠেছে। আমিও আর সাড়া শব্দ না দিয়ে প্যান্টের বোতাম খুলে ছড় ছড় করে পেচ্ছাপ করতে শুরু করি। শব্দ পেয়ে ছেলেটা চমকে তাকায়, দেখে আমাকে, তারপর মেয়েটাকে আবার কাছে টেনে নেয় কোলের কাছে। মেয়েটা ফিসফিসিয়ে বলে—'হচ্ছে কী? দেখছো না, লোক আছে?' পেচ্ছাপ করছে, বলবে না কিছু—ছেলেটা মৃদুস্বরে বলে উঠে। কী সমঝাওতা! কী চূড়ান্ত সহাবস্থান!

এসবও হয়তো বাইরের দিক। এখন পর্যন্ত, বাসুদেবের লেখা যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছি, তাতে অন্তত আমার কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার। বাসুদেব আত্মহনন নয়, আত্মখনন করছে। যারা অশিক্ষিত এবং ইডিয়ট্, তারাই একমাত্র আমার এ উক্তিকে এ্যালিটারেশন্ হিসেবে নেবে।

সুবিমল বসাকের গদ্যে ঢাকাই ভাষার ব্যবহার নিয়ে কারো ঔৎসুক্য, কারো বা প্রশ্ন। বৃদ্ধদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র আর মনীশ ঘটকের কাছে মূলত এই ভাষা ব্যবহার-ই কৌতুহলের কারণ হয়েছে। ঢাকায় যাঁরা থেকেছেন বা যাঁরা ঢাকার লোক—তাঁরা যে খুবই আনন্দিত হবেন সন্দেহ কী? অন্যপক্ষে কোনো কোনো ক্ষুধার্ত তরুণ মনে করে, সুবিমলের গদ্য থেকে ঢাকাই ভাষার ছাল চামড়া তুলে নিলে আর বেশি একটা কিছু থাকবে না। এসব বিতণ্ডায় না গিয়ে স্বয়ং সুবিমল কী বলছে শোনা যাক! 'নিজের ভাষাতেই লেখা উচিত। আমি পূর্বে জানিয়েছিলাম, —যে ভাষায় আমি বাড়িতে কথা বলি, মা তাই বোন, জ্যাঠা বউদি, সুনু এবং ওঁরাও আমার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলেন—সেই ভাষাই আমি ব্যবহার করেছি।

আমার নিশ্চিত ধারণা, ওপরের কথাগুলো সুবিমল সিরিয়সলি নয়, প্লে-ফুল মুডে বলেছে। এ ভাষায় ও ভাষায় দুচারটে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করা যেতে পারে বটে, কিন্তু এ একেবারে তর্কাতীত,

বাংলা সাহিত্যের ভাষা ভাগীরথী তীরের ভাষা। এতে নানা আঞ্চলিক ভাষার কিছু পলি ঢালা যেতে পারে বটে, কিন্তু রংপুরি, চাটগাঁইয়া, ঢাকাই, যশুর কোনো ভাষা কোনোকালে এর উপর কঙ্কোয়েসট জাহির করতে পারবে না। সোজা কথা বাংলা লেখায় 'নিজের ভাষা' কলকাতার কথ্য ভাষা। মা বাবা ভাই বোনের সঙ্গে আমি তো কাঠ্‌ বাঙাল ভাষায় কথা বলি—সো হোয়াট! মা বাবা ভাই বোন 'সুনুর-'র জন্য আমরা কেউ লিখি না। প্রথমে লিখি নিজের জন্য। দ্বিতীয়ত বন্ধুবান্ধবের জন্য। তৃতীয়ত পাঠকের জন্য। এই তৃতীয় গ্রুপে অকস্মাৎ বাড়ির লোকজন, থেকে যেতে পারে—নাও পারে। অঞ্চল-প্রিয়তা সাহিত্যের মদ রুটি নয়। যদি মলয় রায়চৌধুরীর মতো সুবিমল মনে করে সাহিত্যের মোদ্দা কথা কমিউনিকেশন, তবে 'চ্যারা ভালাসির' 'তেনাডুম' 'মানু' 'লেহান', ফেঁকন—টেকন পেরিয়ে জায়গামতো যাওয়া কি সম্ভব? কুট্টিয়া থোড়াই পরোয়া করে সুবিমলের লেখার, তার যা কিছু পিতোশ সবই তো এ বাংলার শিক্ষিত পাঠকের কাছ থেকে। নয় কি? তা ছাড়া ভাষা শব্দ এসব নিয়ে আদিখ্যেতাও এখন একেবারে রিডিকিউলাস। লেখকেরা যখন ভাষা থেকে শব্দ থেকে ক্রমশ সংকেতের দিকে চলে যেতে চেষ্টা করেছেন, যখন আভাঁগার্দ-দের সমস্ত প্রয়াস পুরোনো খাঁচা লাথি মেরে ভেঙে টেলিপ্রিন্টার টরেটক্কায় কম্প্যুটারে, তখন অন্যরকম কথাবার্তা এমনকি আর কমিক্যাল-ও বোধ হয় না। 'সুনু'-র সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে সুবিমল, তাই যদি তার লেখার ভাষা হয়, অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের ভাষা হয়, কই, কফি হাউসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে তো ওই ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলে না, চিঠি লেখে না? তখন কি 'লোহা সুবিমল বা তামা সুবিমল' (টু ক্যোট সুবিমল) কথা বলে বা চিঠি লেখে? রক্ত-মাংস নিয়ে আমাদের কারবার, লোহা তামা টাঙ্‌স্টেন্‌ নিয়ে নয়। দু-জায়গায় দু-রকম কেন—সে তাহলে স্রেফ সুনু র-জন্যই লিখুক।

অতএব সুবিমলের লেখার খোসা খুলতে খুলতে আমার মাথা ধরে যায়। স্যারিডন খাই আর ওই বই নিয়ে পাশের বাড়ির মানিকগঞ্জের ভদ্রলোকের বাড়ি যাই। অথচ সুবিমলের লেখায় তো সত্যিকারের কাঁচা মশলা আছে—আঁতের ভেতরে ছোরা চালাচালির ব্যাপার আছে। বিনয়ের কবিতার অসাড়ে প্রস্রাব ঝরে যাওয়ার মতো সবকিছু ঝরে যাওয়ার, আঙুল থেকে স্পর্শ পালিয়ে যাওয়ার আল্‌টিমেট্‌ বিপন্নতা আছে। একটা গোটা মানুষের সমস্ত কিছু দিনকে দিন এ্যানিমিক' টং টং ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, ওর প্রায় তামাম লেখার ভিতরে। ছাতামাথার আগপাস্তলা-য় আছে, গিদড়ামি-তে আছে, জাবড়া-য় আছে। সুবিমল চাক বা না-চাক, ফিলজফি আছে। না হলে কি সে লিখতো—

(১) চিৎ হইয়া শুইলেই আমার চিতার কথা মনে পড়ে। মানুষজন মইর‍্যা যাওনের পরেও কত কিছু ছাড়তে পারে না।

(২) এউগা ম্যায়া সন্তান পুরুষ-মানু রে কতটুকু দিতে পারে? কৃষ্ণার নিজের যা আছে, হেইয়াই দিতে পারে—তবুও বেবাক কিছু পুরোপুরি দিতে পারে নাই। পুরোপুরি দেওন যায় না।

(৩) খর্চের কোঠায় বেবাক কিছু, একদিন দেহা যাইব বেবাক জমা শ্যাষ হইয়া গ্যাছে, খর্চের আর কিছু শ্যাষ নাই, ভূততান করণ যাইব না। হেদিন আমার চাম থিক্যা ডর এক্কেরে তাফাৎ গিয়া দাঁড়াইব।

কেবল এই সর্বস্বহীনতার হাহাকার-ই সুবিমলের লেখাকে লেখার গেরো থেকে মুক্তি দেয় বলে আমার বিশ্বাস।

আর্তগদ্যকারদের একজন প্রদীপ চৌধুরী। পদ্যও প্রচুর লিখে থাকে। এই যুবকদের অন্তত

একজনের লেখাতেও যদি একফোঁটা অবজেক্টিভিটি না থেকে থাকে, সে প্রদীপ। তা ছাড়া যে কোনো প্রিয় জিনিসের সংগে যুক্ত হওয়ার জন্য ওর লেখায় প্রাণান্তকর বেদনা রয়েছে। লেখায় ছেলেমানুষি আছে বিস্তর—এবং, তাই ছেলেমানুষের মতোই ব্যবহার করা অগুনতি অর্থহীন স্টান্ট। লেখার রীতির দিক থেকে প্রদীপ সুভাষ ঘোষের কাছাকাছি, আত্মায় বাসুদেব-কে ছাপিয়ে তিনগুণ রোমান্টিক। দুর্ভাগ্যবশত এরই পাশাপাশি রয়েছে শস্তা চালবাজি থেকে কীর্তিমাৎ করার দুরারোগ্য অবশেসন্। ভেতরটা পুরোপুরি পেঁকে না গেলে যেহেতু মোক্ষম লেখা হয় না—প্রায় কাছে ভিতে ছুঁই ছুঁই করেও তাই তার অস্তিত্বের টোটালিটিকে ভেজে তোলা অভিজ্ঞতার পর্যায়ে এখনো নিয়ে যেতে পারে নি। যেখানে অক্ষমতার ফাঁক, সেখানেই এলোমেলো হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি—আমাদের পড়তে পড়তে পচে যাওয়া চোখ অন্তত এটুকু বোঝে এবং এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র বিনয় দেখানো যা দয়ালু হওয়ার সদিচ্ছা নেই। আমার জ্বলে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে বলে বাথরুমে লাফালাফি আর্তনাদ তুলে পৃথিবীর সমবেত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কী ছিঁড়তে পারি আমরা? আর এ সবের পাশাপাশি, না ভাই প্রদীপ, KAFKA কী বলেছেন, ভার্সিটি-তে অস্তিত্ববাদ পড়ানো হয় কিনা, রবীন্দ্র সংগীতের কী অর্থ, কেন বেদনাপ্রধান চিঠি আমার পকেটে লিখেছে শৈলেশ্বর ঘোষ, জীবনানন্দ তাঁর সুবিনয় মুস্তাফীর চেয়ে কমদামি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন বিতাড়ন, সন্দীপন কী দেখল সন্দীপন কি জানে না সন্দীপন কী বলল, সুনীল কেমন লেখে, এসব জরুরি হয়তো তোমার কাছে প্রচুর জরুরি ইনফর্মেশনের কিস্যু পাঠক জানতে চায় না। জানতে চায় তুমি কী বলো, লেখো বা স্পষ্ট করে ভাবো। নিজেকে নিজের চারপাশ থেকে শেকড় সমেত উপড়ে না নিতে পারলে আর যাই হোক লেখা হয় না। কোনো প্রয়োজনে প্রদীপের 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি'—র সর্বাঙ্গ লেপটে থাকে লীনা সুকুমার সুকুমার লীনা লীনা সুকুমার লেখক মানেই তো একটা পুরো ব্যাটাছেলে। যে কারও পরোয়া করে না যাকে সবাই পরোয়া করে। যষ্টিবিহীন হয়ে কেন হাঁটতে শিখল না এ যাবৎ প্রদীপ? ওর লেখার মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ইলুমিনেশন আছে, স্পার্ক আছে মাঝে মাঝে অসম্ভব সত্যবাদী—কিন্তু প্রয়োজনীয় ঔদাসীন্য, নির্লিপ্তি বা যে জরুরি নিষ্ঠুরতা ছাড়া, মোহিতের ভাষায়, কোনো বৃক্ষ মাটির বুক ভেঙে ওঠে না—সেই আল্‌টিমেট্ জিনিসেরই মর্মান্তিক অভাব। '....বার আত্মহত্যা' করা, ভারতের '৩,০০০০কর্পোরেশনে চূড়ায় নিজের চেহারা লট্‌কে দেওয়া বা ১, ০০০ পূর্বপুরুষকে চ্যালেঞ্জ' জানালেই নগ্ন আত্মমোচন হয় না। সমান নিরর্থ মনে হয় সারা বইয়ে ভালোবাসা মমতা ইত্যাদির জন্য হেদিয়ে মরে এ হেন লেখা, 'কোথায় ভালোবাসা ভালোবাসা বলে সময় নষ্ট করব—শান্তি নিকেতন?'

যাকে আমি এতক্ষণ ধরে নানা ছল ছুতায় এ্যাভয়েড করে এসেছি, এবার উপায়বিহীন সেই সুভাষ ঘোষকে ফেস্ করতে হবে। ক্ষুধার্ত গদ্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে ইমাজিনেটিভ ও আকর্ষণীয় যদি হয় বাসুদেব, সবচেয়ে ডেলিবারেট ও অমোঘ সুভাষ। কী বললাম, গদ্যকার? এক সুভাষের লেখা পড়েই আমি গদ্য ও পদ্যের মাঝখানের দেয়ালটা হারিয়ে ফেলি। লাইনের কোমর ভেঙে দিলে যদি পদ্য হয়, সুভাষ পদ্যকার। যদি টান রাখা যায়, গদ্যকার। আসলে ও গদ্যপদ্য ওসব কিছুই লেখে না। ওর লেখার ফর্মের কোনো নাম নেই—অন্তত আমি জানি না। আমার আবার একটা কাঠামোর দরকার—প্রেম ফ্রেম ভাবতেই আস্তো মেয়েছেলে ভাবি। আমার ভেবে নিলে সুবিধে গদ্য জাতীয় কিছু লেখে, তাও যখন পড়ি ওর 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' থেকে 'এক-একদিন রাস্তায় বোধহয় পড়ি, কুমারী, KEELER, মেরি মারমেইড দেখি, গড়িয়াহাট থেকে গবানহাটায়, কলেজ স্ট্রিট থেকে ক্যামাক্‌স্ট্রিটে, হাতের কাছে চোখের পাশে, আমার হানার সামনে

হাজার হাজার ভার্জিনিটি—ক্ষুধা গন্‌গন্ করে,

কোনো শনি ও রবিতে ক্যানিং যাই, কথা হয়, মাছের ব্যাপারী, ফড়ে ও চালানদার সামুদ্রিক মাছের দরদাম চলে, কোলেবাজারের গুপ্তযন্ত্র এখানেই আবিষ্কার হয়—আবিষ্কার হয় ঠান্ডা ঘর, ইলেকট্রনিক ওয়েভ পাঠিয়ে আবিষ্কার—লালবাজার স্ট্রংরুম, হাতের ডায়েগ্রাম, পায়ের ডায়েগ্রাম, চোখের ডায়েগ্রাম, দেখি—কে কে আমার ভুল বুকের ছবি গোপন পায়ে তুলে নিয়ে গেছে...রাতে আজ কিছুতেই ঘুম আসে না, ঘুমেও কখনো আমি মাইলস্টোন পড়ে পথের দূরত্বে বুঝতে পারি না। জল খাই ও পেচ্ছাপ করি, পেচ্ছাপ করি ও জল খাই, কুঁজো ফাঁক হয়ে যায়। ১, ২...করে, ১০০, ৯৯...—করে রাত কেটে যায়, কখনো বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে জানালা ধরি, বাইরে আকাশ রাতের পাখি উড়ে যায়, কেবল বাইরে আকাশ—বিমান মহড়া—মিলিটারি—সকাল ৭।৮।৯—যে কোনো দিন বড়দার চিঠি,—

'তুমি তোমার প্রিমিয়ম জমা দাও,—
তুমি তোমার প্রিমিয়ম জমা দাও,
'তুমি তোমার প্রিমিয়ম জমা দাও,

আবার যে কোনো দিন চিঠি—'বিবাহের দ্বারা যুক্ত হও যত দ্রুত পারো'—তখন ফর্মাল টেকনোফ্র্যাসির কোনো ফাঁদে সুভাষকে রুখতে না পেরে খুবই বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে বসে থাকি।

সুভাষের ডায়েরি ভাঁজে ভাঁজে লেখার পাতার পর পাতায় ঘাস বিছানো মাইন পেতে বসে আছে ভয়। যেন বা প্রত্যেকের শার্টের ফ্ল্যাপে ছুরি ঢাকা আছে জিভ আর টাকরার মাঝামাঝি গোপন কার্তুজ। মজ্জমান জাহাজের বিপদব্যাঞ্জক ফ্ল্যাশ...ফ্ল্যাশ আমার চাবি-র সর্বাঙ্গে, টি-বি/ভি-ডি-'তে, থ্রু গাড়ির টিকিট'-এ, ফুলকুকুরের প্রদর্শনী'-তে 'কামরূপ'—এ এবং পূর্বোক্ত 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট'-এ তো বটেই। হাসি ঠাট্টা ; মস্করার ধার দিয়ে যায় না সুভাষ, সর্বসময় ভয়ঙ্কর গ্রেভ্, থমথমে। ক্ষুধার্তদের লেখায় আসল লড়াই-এর চেহারা ওর লেখাতেই দেখা যায়। যেন সব সময় গোলা ফাটার পর পর অবাধ্য মুহূর্তে ট্রেঞ্চে বসে ত্রস্ত দেখে নিচ্ছে যৌনতা স্বৈরাচার, ফিলিস্তানি, তেল চুয়ে চুয়ে পড়া সুখের আদত চেহারা, ঠিকঠাক অনায়াস সন্তান প্রসব ও গর্ভধারণ। সুভাষ প্রচণ্ড স্ব-নির্ভর হতে চায় বলেই হাতে তুলে দেওয়া জিনিসের প্রতি এমন নির্মম হতে পারে, 'বিবাহের রহস্য করে নষ্ট করেছি কাকিমা, তুমি জানো না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পুরুষের বিবাহ লজ্জা কী পড়ো!

অথচ তুমি এমনভাবে সব বলে গেলে—'ধরো এই টিকিট নাও, রাখো পকেটে, এতটায় গাড়ি, গাড়ি ধরে অমুক জংশন, তারপর জংশনে এতটায় অমুক গাড়িতে উঠলেই ঠিক তোমার জায়গায় চোখ বুঁজে পৌঁছে যাবে।

আগেই বলেছি সুভাষের লেখা দারুণ ডেলিবারেট, চাঁদমারি ছাড়া কিছুই বিঁধতে রাজি নয়। প্রতিটি পংক্তির চলাফেরা প্রিপস্ট্ররাস, ঠান্ডা, খুনে। চরিত্রে কষাটে, সার্ডনিক ভাষাকে বহুক্ষেত্রেই হাতের মতো ব্যবহার করে সুভাষ। সমস্ত তার হিসেব, গোনাগাথার ভেতরে বলেই সে সঠিক জানে পুলিশ এলে কোথায় পাঁচিল, যুদ্ধের মুহূর্তে ফ্রন্টের চালন-পদ্ধতি, যীশুর জন্মদিনে তার প্রথম যৌনরোগের প্রতিষেধক পেনিসিলিন। চতুর অপরাধীর মতোই সুভাষ কিছু কমিট্ করে না, স্টেট্‌মেন্ট দেয় না অথচ কী হাট হাট ক'রে খুলে দেয় যাবতীয় পরিবারিক ও সামাজিক ভণ্ডামীর বোরখা—'বিবাহিত হলে কুমারী মেয়েদের তখন—গণ্ডায় গণ্ডায় তাদের আমার হাতে অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে—'এদের অমুক বাড়িতে একটু পৌঁছে দিয়ে এসো না বাবাজী' 'বাবাজী মেয়েদের নিয়ে আজ একটু নাইট শোয়ে যাও' 'মেয়েরা চেঁচামেচি করবি না

তো, যা না সব, বাইরে যা, জামাইকে দেখিয়ে টেখিয়ে নিয়ে আয় না, একটু ঘুরে ফিরে আয় তোরা'—আড়ালে 'জামাইয়ের আমার তুলনা হয় না, কী স্বভাব চরিত্র...মুখ তুলে...।'

ক্ষুধার্ত-দের মধ্যে একমাত্র সুভাষের লেখাতেই একটা লড়াকু, মুড, মিলিট্যান্সি আছে ; সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ও নয়। যা কিছু প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠান তাকে বম্বার্ড করার, তার বিরুদ্ধে ব্যারিকেড গড়ার একটা মরীয়াপনা ওর অস্তিত্বে কাজ করে। যদিও জানে এ অসম লড়াই-এ ওর হার নিশ্চিত, কেমনভাবে হয় ক্রমান্বয় পতন, তবু ওর পিঠে অস্ত্রচিহ্ন নেই। সর্বোপরি, যাবতীয় এক্স্‌প্লয়টেশনের উপর ওর ঘৃণা এত জেনুইন, যা আমাকে হঠাৎ হঠাৎ অভিভূত করে।

জীবন ও শিল্প সম্পর্কে সুভাষের কিছু নিজস্ব মতামত আছে, যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমি দ্বিমত। রাজনীতি সম্পর্কে ওর বক্তব্যের আমি কোনো গুরুত্বই দিই না। আরক্ষা দপ্তর নিয়ে সুভাষের অবসেশন্ মাঝে মাঝে আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকে—এমনকি কখনো ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ার শামিল মনে হয়। এবং যেকোনো, যে কারো বিষয়ে ওর নিষ্ঠুর উদাসীন হওয়ার ক্ষমতা আছে বলেই, 'আর চারণ কবি, আমি সাবধান করি, যদিও এখন ব্যমপিরিয়ড তোমার, খুবই তোমার হাঁক ডাক নাম, তবে নিশ্চিত জেনো এই V. D. V. I. P শহরে তোমার পাছা মারা যাবে,' এ জাতীয় ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে উঠে আসা বক্তব্য রাখা (এখানে তো টারগেট্ নিশ্চিত শক্তি) সুভাষের পক্ষে অনুপযুক্ত ও ইডিয়টিক কাজ বলে মনে হয়।

এসব মিলিয়েও, ক্ষুধার্ত বা যাকে এ্যাটিচুড্ বলে, তার একটা সরাসরি আদল আমি সুভাষের লেখাতেই সবচেয়ে বেশি পাই।

মলয় রায়চৌধুরী কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। কবিতার কথা উঠছে না, আর যেহেতু আমি প্রবন্ধকে কোনো অর্থেই ক্রিয়েটিভ গদ্য মনে করি না, তাই মলয় আমার আলোচনার বাইরে। শৈলেশ্বর ঘোষ-কে ক্ষুধার্ত কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বোধ হয়, কিন্তু তার গদ্য আমাকে উৎসাহী করে না। আর এরা কারা, অক্ষম পিতার নির্জীব সন্তান-সন্ততি রেসের মাঠে নন্ স্টার্টার ব্যর্থ করুণার পাত্র ত্রিদিব মিত্র, দেবী রায়, আলো মিত্র এট্‌সেট্‌রা?

দেবীরায় চৌধুরী

হাসপাতাল

সদ্যজাত বাচ্চার আওয়াজ শুনি আমি
হাসপাতালের নর্দমায়
আমি কোলে তুলে নিই তাকে
চুমু খাই
ছুঁড়ে ফেলে দিই ডাস্টবিনে

হাসপাতালের মৃত্যুর গন্ধ
সাহসী বানিয়ে ফেলে আমাকে
রিএলি
আমি আরো ১ বার দুঃসাহসী হই
ঢুকে যাই তৎপর
এম্বুলেন্সের ভেতর
তারপর রেপ করি
রেপ করি—

সাদা এপ্রণের উপর
রক্তের নদী বয়ে যায়
শ্রেষ্ঠ মাতাল আমি এখন
বেপরোয়া নেশাঘোর
অক্টোবরের কুকুর এক
লাল কুয়াশার অন্ধকারে
হাসপাতালের শাদা লেবেল সাঁটা
বিকৃত একটা কপাল দেখতে পাচ্ছি আমি
বিছানায় শুয়ে হতভাগা ধুঁকছে
আমি নান্দীমুখে মদ খাই
নিজের রক্ত খাই চেটে চেটে
ঐসব পারিশ্রমিক নিয়েই
আমার জীবন যাপন
আমার রাত্রি দিন
আমার জন্ম মৃত্যু

শঙ্খপল্লব আদিত্য

স্যাণ্ডুইজ্‌ড কক্‌টেল

পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেলে মাথার উপর থেকে দেয়াল ও আকাশ কোথাও কখনো কোন মৃতমঞ্চে সদর ফাজিল রাস্তা জ্বলে ওঠে গলে পড়ে থাকে বোতাম টেপাটেপি করে কে? আগুন ধরানো নিয়ে সতর্কতা বন্ধুদের রহস্যহীনতা নিয়ে গরম পাত্র থেকে লালা বেচে খায় অতীত ও ভবিষ্যৎ শূন্য জীবনে যারা বেঁচে যায়—আমি বেঁচে আছি।

মাতাল গ্লাসের মতো শূন্য বিকট দৃষ্টির অচল দুয়ানি ফুলালো ভ্রুণ অবসর তাপে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে একটা সঙ্কটকাল মন্বন্তর ম্যানহোল। ভ্রুণহত্যার চাবুকের ঘায়ে জারজ চামড়া ফেটে গেলে যারা বেঁচে যায়—আমি বেঁচে থাকি।

ঋণকরা শাদা খামে লালা সেটে কালো ঘামের প্রাপ্তি সংবাদ, মাংসলপেশীর চাপে নষ্টভ্রুণ হৃত প্রেমিকার শরীর উরুর বালিশ যে আরাম দরকার ছিল না কোনো সহানুভূতির পার্বত্য নির্জন পথে আদিবাসী সরলতা নিয়ে যারা সন্ত হয়ে বেঁচে যায়—আমি বেঁচে থাকি।

সম্প্রতি ব্রহ্মসন্তদের পাশে বসে শব্দহীন গ্লাস গ্লাস ফেরারি মদ ভারী লাগে ইস্পাতের যান্ত্রিক নিব ঢুকে গেছে বাঁদিবের বুকে ঝুঁকে আছি রক্ত চুষে নিয়ে কয়েকটা প্রিজম গ্লাস বিলিয়ে দিয়েছি ইন্ট্রাওয়ার্ল্ডহেল কবি বন্ধুদের...ফ্লাশ বাল্ব, জঙ্গি ব্লাকআউট কিছু মনে না নিয়ে যারা বেঁচে যায়—আমি বেঁচে আছি।

যারা বেঁচে গেছে মনে হয় তারা বেঁচে নেই কোনোদিন বেঁচেও ছিল না তবু দ্বিতীয়বার সৌখিন বাদামি বোতলে মৃত্যু, বিষাক্ত মৃত্যুর রক্ত মুক্তিহীন সৈনিকের বিদ্যুৎ রক্তে বরফের যে জানালা খুলে প্রতিদিন গ্রিনল্যান্ডে সে জানালা খুলে রাখে যদি কোনো শূয়র-সন্তান ঘর্মাক্ত দুপুরে, গোপন দুপুরে যদি খুলে রেখে কেউ বেঁচে থাকে—আমি বেঁচে যাই।

অপসৃত শহরের ঘুমে জলের আওয়াজ সমুদ্রের পাড়ে ভাঙে, ভাঙা সমুদ্রের বালুপাড় তলানির দু-ইঞ্চি অনাদৃত পোড়ো জমি জন্মে গেছে, ঈশ্বর বদমাশের মুখ থেকে দ্রুত ছুটে আসছে অশ্লীল উল্লাসে পিষ্ট মত্ত জল্লাদের ছুরি। ভাগ্যের নীল শিরায় লিক্‌লিক্ করছে লতানো সাপের জিভ, ফায়ার এলামের চেয়েও পরিকল্পিত সুস্থ খুনের জল ছাপ নিয়ে যারা বেঁচে আছে—আমি বেঁচে থাকি।

সুভাষ কুণ্ডু

মশামাছি

বসন্তকাল, সকাল বেলা খাটের উপর শুয়ে আছি, বাড়িতে কেউ নেই, অগাধ স্বাধীনতা, ডাকাডাকি নেই ; তাড়াহুড়া নেই। রোদের জিল সমস্ত প্রাচীর ভেদ করে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বিছানায়। আর আমি সেই রোদের ভেতর লুটোপুটি খাচ্ছি, কী মজাই না। আহ্লাদে জামাকাপড় খুলে ফেলছি, এপাশ ওপাশ করছি সোহাগে। এরকম অদ্ভুত ভালোবাসা আমার নিজের প্রতি জন্মায়। বাতাস বইলে সুরসুরি লাগে চম্‌কে উঠি, শরীরময় আঙ্গুলিগুলি বুলিয়ে যেতে থাকি। শিশুদের মতো কখনো বা পায়ের আঙুল মুখে দিয়ে চুষতে থাকি। আমার মুখ চোখ, কালো লাল হয়ে যায় ইচ্ছে হলে উঠে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াই।

কিন্তু আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারা দেখে ঘাবড়ে যাই। গলার হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল দুটো থুবড়ে গেছে। কোমরের হাড় উঁচু হয়ে আছে। বুকের দু'ধারে রিবগুলো গোনা যায়। লিঙ্গটা চুপসে ঝুলছে। দেখেই খুব বিপন্ন-বোধ করি। আমাকে সবচেয়ে কাতর ক'রে দেয় যৌনাঙ্গ। মনে হয় স্ত্রী সহবাসের যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এরকম আমার প্রায়ই মনে হয়। মনে হলেই উঠে এসে আরশির সামনে দাঁড়াই। অভ্যাস হয়ে গেছে যেমন পায়খানা গেলেই সন্দেহ হয় ; আর তখনই নীচের দিকে তাকাতে থাকি। লক্ষ করি—পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ছে কি না। খুব উদ্বিগ্ন বোধ করি একটু পেট কামড়ালেই, আগে ডাক্তারখানায় ছুটে যেতাম, এমন কীরকম ভয় হয় ডাক্তারকে, তলপেটে ও লিঙ্গে জ্বলুনি হয়, তবুও মুখ বুজে পড়ে থাকি। ডাক্তারখানায় যাই না। ভাবি একবার দেখিয়ে আসি ডাক্তারকে, আবার মত পাল্টাই, ভয় হয় পাছে কোনো বড়ো অসুখের কথা বলে ফেলে। তাই আমি আর ভরসা পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার যৌন-ক্ষমতা কি সত্যিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবে অযোগ্য পুরুষ হয়ে বেঁচে থেকে লাভ? কখনো মনে হয় আমি ভুল বক্‌ছি না তো? আমার বোকামি নয়তো এটা? বুঝতে পারি না, আবার মনে হয় এ আমার যৌনজ্ঞানের অভাব। বিভিন্ন মেডিকেল জার্নাল, যৌনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এনে পড়া শুরু করে দেই। একে একে সবগুলো পড়া শেষ করে ফেলেছি, কিছুদিন ভালো থাকি, উদ্বেগ কম হয়, মাথা ঝিম্‌ঝিম্, গা চুলচুল থাকে না। বমি বমি ভাবটাও কমে যেতে থাকে। কিন্তু তারিখ দেখতে গিয়ে আমার খেয়াল হয় এটা মে মাস—হ্যাঁ গত কয়েক বছর ধরে মে মাসেই তো তলপেটে ব্যথা হয়, কখনো বা মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। আমি আবার মুষড়ে যেতে থাকি। আমার এসব দেখে বেবি বলে—তোমাকে আজকাল কীরকম ফ্যাকাশে মনে হয়। এরকম তো ছিলে না। অসুস্থ? কই আমায় জানাওনি তো?'

বেবি বেশি পীড়াপিড়ি করলে আমি এড়াতে পারি না। আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, ডাক্তার পরীক্ষা করে আমার থুথু, রক্ত, পেচ্ছাপ, পায়খানা। রিপোর্টে কিছুই পাওয়া যায়

না। সব ঠিক আছে, ডাক্তার কমেন্ট করে 'আপনি তো মশাই সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

সত্যিই তো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, আমার এত ঘাবড়াবার কি আছে? আর আমি বলেছি আমার অসুখ আছে। এসব ব্যাপার বেবিকে ক্রমাগত ঠান্ডা ও নিস্তেজ করে দেয়। অথচ কয়েক মাস আগেও বেবি আমাকে কতভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে।

আমাকে উত্তেজিত করার কত কৌশল ওর জানা ছিল। ওর কাছে কতটুকু সময়ই বা থাকতাম? ওই সময়ের মধ্যে বুব ওর চুম্বকশাড়ি মেলে দিয়ে আমাকে লেপ্টে ফেলে, আমিও সমুদ্র গর্জে ওঠার মতো গায়ে সেঁটে যাই ও ফুঁসতে থাকি। ভালোবাসা, প্রেম—আমাদের সোহাগ! আমার সারা শরীরে বেবি লেপ্টে আছে। বেবিকে জড়িয়ে ধরে সারা রাত, বেবি—তুমি কী অদ্ভুত! গরম! রক্ত বিন্দুগুলি টগবগ করে উঠত ওর শায়ার দড়ি খুলতে খুলতে, একটু দেরি হলে জিভ দিয়ে চাটতে থাকে বেবি আমার যৌনাঙ্গ। কত অসংখ্য জড়াজড়ি! সেই বেবি ক্রমশ সরে যেতে থাকে আমার কাছ থেকে। ওর সব তৎপরতা, উৎসাহ থেমে যায়। আগের মতো শোবার সময় মশারির ভেতর ঝড় তোলে না। উত্তেজিত হওয়ার চেষ্টাও করে না আমার মনে হয় ওর এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। পরে মনে হয় আবার ওর জন্য আমি কেন দায়ী হব, আমি কি করছি, আমার অসুস্থতা ঐ সে তো আমার নিজের ব্যাপার। ওর তাতে কী? তবুও বেবি পাশ ফিরে শুতে গেলে আমি বলতে বাধ্য হই ডাক্তার দেখালে পারো তো? তুমি, কী রকম নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছো। তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?

সেদিন রাত্রে আমি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠি। দেরি সয় না। কাপড় শায়া তুলে ঘুমন্ত অবস্থায়ই বেবিকে ধর্ষণ করে যাই জাপ্টে ধরে। জেগে উঠে ও চমকে যায়। তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মড়ার মতো শুয়ে থাকে সারা শরীর আলগা করে দিয়ে। ওর সারা শরীরে খাবলা খাবলা নখের দাগ কোথাও ছাল উঠে গেছে, দেখে আমার উত্তেজনা ও বোধ নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গম ছেড়ে সরে আসি। তখনও আমার বীর্য বের হয়নি। পা থেকে শুরু করে বুক, লিঙ্গ, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে। দম ধরে থাকে। আমি কি জড়, অক্ষম এই প্রশ্ন আমাকে বারবার অস্থির করে দেয়। আগের মতো আবার কাৎরাতে থাকি। নিজের প্রতি কদর্য ঘৃণা জন্মে। চূড়ান্ত অপদার্থ আমি তবে! দাঁতে দাঁত কামড়ে নিজের প্রতি নিজের এই বিষোদ্গার আমাকে এক কোনের দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘদিন হলো ঘরে বসে। ঘর থেকে বেরোই না। রাস্তায় বেরোতে সাহস হয় না। কারো সাথে কথা বলি না। বাড়ির লোকেরা বিস্ময় বোধ করে। জড়সড় হয়ে যায় আমাকে দেখে, আমি ঘুমিয়ে থাকলে খাবারটা রেখে যায় ; ঢাকা দেওয়া থাকে, আমার যাবতীয় প্রয়োজনগুলো আমার ঘরে দিয়ে গেছে। আমাকে বেরোতে হয় না। আমি শুয়ে থাকি ও সিলিং লক্ষ করি। কটা বড়গা—১, ২, ৩, ৪...গুণে যাই। লিঙ্গটা কাঁৎ হয়ে পড়ে থাকে এক পাশে। জানলা দিয়ে দেখি—একটা সুন্দরী বউ ল্যাংটা হয়ে কাপড় ছাড়ে। আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি। একদম নড়ি না। লিঙ্গটা একইভাবে কাঁৎ হয়ে পড়ে থাকে, বহু নগ্ন ছবি কিনেছিলাম কবছর আগে। লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠত, যৌনাঙ্গ শক্ত হয়ে যেত নাড়াচাড়া করলে, মা বাবা ঘুমিয়ে পড়লে একটার পর একটা উল্টে যেতাম ; অনেকক্ষণ ধরে দেখতাম। ঠোঁটে ঠোঁট লেগে যেত উত্তেজনায়। ছবিগুলোর ওপর এখন ধুলো জমে গেছে এক ইঞ্চি।

রাস্তায় যদিও বেরোই, নির্জন রাস্তা দিয়ে হাটি গলি দিয়ে কখনো। আশ্চর্য! সামনে লোক পড়ে যায়, ওপর দিকে মুখ তুলি, গিয়ে বসি ধর্মতলায়। এখন গরমকাল। সন্ধে হতে না হতেই

ভিড় জমতে থাকে। বেশিক্ষণ বসতে পারি না। বাগবাজারের শেষ ঘাটে রাত্রে গাছের গাঢ় অন্ধকারে আমি বসে থাকি। পেছনে কেউ এসে বসলে মুখ চাপা দেই রুমাল দিয়ে। মুখ ঢাকবার চেষ্টা করি। আর রাত্রে দিনে বহুবার আত্মমেহন করতে যাই। তলপেটে টনটন করে তবুও। আমার এক বন্ধু বলে স্বাস্থ্যবানদের সপ্তাহে ২বার ৩বার হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনাদের মতো রুগ্ন যারা সপ্তাহে ১ বারের বেশি ইচ্ছাকৃত বীর্য ফেলা কোনো মতেই উচিত নয়।' তারপর থেকে আমি সাবধান হয়ে যাই। আত্মমেহনের আগে গুনি কতদিন আজ।

রেডিয়োতে বিশেষ ঘোষণা করতে থাকে 'সিঙ্গাপুর একটা ক্যান্সার ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে, ওখানকার প্যাথোলজিস্ট বলছেন—ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচতে হলে ধূমপান, মদ, সুপারি বর্জন, স্ত্রী-পুরুষের সহবাস ব্যাপারে বেশি মাখামাখি করবেন না।' ঘোষণা শেষ হলে আমি আমাকে নির্বিকার দেখতে পাই। আমি চুপচাপ পড়ে থাকি। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম ; বন্ধ দরজা জানলাগুলি খুলে দেই, কিন্তু লোক দেখলেই ধপাস ধপাস শব্দে দ্রুত বন্ধ করি আবার।

সেই সময় অকস্মাৎ পাশের ঘর থেকে শব্দ হতে থাকে
'বাবা তোমার পিঠে মশা।'
'কইরে কই' বলে বাবা উঠে পড়ে।
'মাছি মারি বাবা মশা মারি
মশা মারি বাবা মাছি মারি'

আবার শিশুদের কণ্ঠস্বর 'বাবা তোমার গালে একটা। চট্ শব্দ হয়।
এক সাথে 'হো হো ও ও ও ও ও...
বাবা নিজের গালে নিজের হাতে'
তারপর ঘরময় ধ্বনিত হতে থাকে
মশা মারি বাবা মাছি মারি
মাছি মারি বাবা মশা মারি
মাছি মারি বাবা মশা মারি
মশা মারি বাবা মাছি মারি।

ফালগুনী রায়

দ্বিতীয় জরায়ু

SHOT ONE
গাঢ় সবুজ শুধু চারপাশে, সবুজ গাঢ় ;

SHOT TWO
অসংখ্য কালোবিন্দু সবুজের ওপর, অসংখ্য

SHOT THREE
লক্ষ লক্ষ মানুষের কান্না চিৎকার হাসি উপহাস সবুজের ওপর প্রতিটি কালো বিন্দু মানুষের মুখ হয়ে যায় বিভিন্ন জাতির, প্রতিটি মুখ ক্রমে সারিবদ্ধ হয় শোনা যেতে থাকে একটানা কান্না চিৎকার হাসি উপহাস

SHOT FOUR
বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জাতীয় পোষাক, মানুষেরা মিছিল করে এগোতে থাকে বৈষ্ণবের পাশে মুসলমান ইহুদির পাশে আফ্রিকান উপদেবতার উপাসক খ্রিস্টানের পাশে বৌদ্ধ

SHOT FIVE
মিছিলের ওপর, নানা দেশের নানা রঙের নানা বয়সের মানুষের ওপর একরঙা শকুনেরা উড়তে থাকে, অসংখ্য শকুন মিছিলের ওপরে ওপরে শকুনেরা আকাশের ঘন নীলকে ডানা নাড়িয়ে নাচায় একটানা কান্না হাসি চিৎকার উপহাস বেড়ে ওঠে আরও

হঠাৎ সব স্তব্ধ

সকলে থেমে যায় যে যে-অবস্থায় ছিল

SHOT SIX
শকুনেরা শূন্যে ভাসে, অনড় ; মানুষেরা সারিবদ্ধ, ১পা তুলে কেউ কেউ মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে, অনড়

SHOT SEVEN
অন্ধকারান্ধকারান্ধকারান্ধকারান্ধকারান্ধকারন্ধকার

SHOT EIGHT

সবুজ বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর ঢালু নিরেট কালো উঁচু আকাশের পেট চিরে পাহাড় যার স্তব্ধ ঢেউ দিগন্ত পেরিয়ে আরও দূরে চলে গ্যাছে

SHOT NINE

এক দঙ্গল উলঙ্গ শিশু, কাঁদে হাসে হাত-পা ছোঁড়ে তারা সেই ঢালু বিস্তীর্ণ উপত্যকায় ঘাসের ওপরে শিশির হয়ে শুয়ে থাকে হাত-পা ছোঁড়ে হাসে কাঁদে

SHOT TEN

পাহাড়ের শীর্ষ ছুঁয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসে এক ঝরনা, ঝরনার জল রক্ত লাল

SHOT ELEVEN

ঝরনার প্রবল বন্যায়, সেই গাঢ় রক্ত লাল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় শিশুরা, শিশুরা রক্ত নদীতে ভাসে কাঁদে হাসে

SHOT TWELVE

পাল পাল শকুন সহসা নেমে আসে তীব্রগতি ভাসমান শিশুদের দিকে শকুনেরা শূন্যের অনড় অবস্থা ছেড়ে নেমে আসে—নেমে এসে প্রতিটি শিশুর চোখের ভেতর তাদের ঠোঁট ঢুকিয়ে দ্যায়—নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে শিশুদের নাভি লিঙ্গ, মেয়ে শিশুদের যোনি—শিশুদের চোখ দিয়ে রক্ত পড়ে, নাভি লিঙ্গ যোনি দিয়ে রক্ত ঝরে, রক্ত এসে মেশে রক্ত নদীতে

SHOT THIRTEEN

অজস্র পাখিপাখালির ঘুম ভাঙা গান আর সীমাহীন সাদা পাখিদের ডাক আর সাদা

সব স্তব্ধ

SHOT FOURTEEN

শ্বেতপাথরের দীর্ঘ এক খ্রিস্টমূর্তি খ্রিস্টমূর্তির প্রতি প্রত্যঙ্গ কালো সাপ তাদের হিসহিসানি

SHOT FIFTEEN

খ্রিস্টমূর্তির বাঁপাশ দিয়ে এগিয়ে আসে মানুষের বর্ণময় মিছিল, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষেরা তাদের জাতীয় পোষাক পরে এগিয়ে আসে পুরুষমানুষের বিশাল সম্প্রদায়, প্রত্যেকের বাঁচোখের জায়গায় একটি করে অণ্ডময় লিঙ্গ আর খ্রিস্টমূর্তির ডানদিক দিয়ে এগিয়ে আসে রক্তনদী, নদীতে ভাসমান শিশুদের ছিন্নভিন্ন শরীর, কারো মুণ্ডু শুধু কারো হৃদপিণ্ড পাকস্থলী যোনি বা পা-হীন তলপেট কারো এই সব ছিন্নভিন্ন শিশু প্রত্যঙ্গের ওপর বসে থাকে ক্লান্ত শকুনেরা

SHOT SIXTEEN

মানুষের মিছিল খ্রিস্টমূর্তি প্রদক্ষিণ করে রক্তনদীর জল পড়ে, ডুবে যায় সবুজ উপত্যকার ঢালু দেশ রক্তে ডুবে যায় খ্রিস্টের পেরেক বিদ্ধ পা ক্রমে উরুছোয়া রক্ত জলে দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন জাতির বর্ণময় মিছিল মিছিলের মানুষদের ডানচোখ দিয়ে জলে পড়ে, বাঁ চোখের বরাদ্দ

জায়গায় লিঙ্গ থাকায় ঝরে পড়ে বীর্যরস—শাদা বীর্য রক্তে মিশে যায় ভেসে থাকে—ছিন্নভিন্ন শিশু প্রত্যঙ্গ, প্রত্যঙ্গের ওপর শকুনেরা

SHOT SEVENTEEN

খ্রিস্টমূর্তির গায়ে জড়ানো কালো সাপগুলো নেমে আসে রক্তস্রোতে—সাপেরা সাবলীল সাঁতারের সাহায্যে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে চলে আসে এবং মানুষেরা বাধা দেবার আগেই তাদের গা বেয়ে উঠে যায় মুখের ভেতর দুর হতে ভেসে আসে লক্ষ কণ্ঠের ঘোষণা অয়ম আত্মা অয়ম আত্মা অয়ম আত্মা অয়ম আত্মা অয়ম আত্মা...

SHOT EIGHTEEN

মিছিলের প্রতিটি মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে থাকে একটা করে সাপের ফণা শকুনেরা যারা ভাসমান শিশু প্রত্যঙ্গের ওপর রেখেছিল তাদের শরীরের ভার, সেইসব শকুনের মাথায় দ্যাখা যায় একটি করে সাপ

SHOT NINETEEN

খ্রিস্টমূর্তি নড়ে ওঠে, দুলে ওঠে সমগ্র ব্যক্তি কাঁপতে থাকে দৃশ্যমান প্রতিটি বর্গফুটের অনুঅংশ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ফুলে কেঁপে ওঠে রক্তনদী পাগলা ঘণ্টা বাজতে থাকে দ্রুত আরও দ্রুত খ্রিস্টমূর্তির পাথর হাত নড়ে ওঠে শকুনেরা চিৎকার করে আকাশে ওড়ে ডানা ঝাপটায় শিশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগতে থাকে এলোমেলো মুণ্ডুর তলায় ধড়ের বদলে উরু কোনোটার—কারোর হাতের জায়গায় পা কারোর নাভিমূলেই যোনি

SHOT TWENTY

প্রবল জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচার জন্যে মানুষেরা গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে খ্রিস্টমূর্তির চারপাশে সাঁতার শুরু করে—তাদের মুখে হাসির বদলে দুমুখো সাপ বাঁ চোখের বরাদ্দ জায়গায় লিঙ্গ জোড় লাগা কিম্ভূত শিশুমূর্তিগুলি জমতে থাকে খ্রিস্টমূর্তির লিঙ্গ দেশে তাদের ওপরে শকুনেরা শকুনদের মাথায় ফণাতোলা সাপেরা।

আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

শুকিয়ে যায় কেন

এই যে ৯ সেপ্টেম্বর আমরা মাথা ফেটে গেল একে কি বলব? এ্যাকসিডেন্ট, বিপদ, না ভালো করে হ্যান্ডেলটা ধরে রাখিনি?--কীরকম পেঁয়াজি পেঁয়াজি লাগছে। তখন নিজেকে কবি কবি ভাবছিলাম। তাছাড়া ওই বাজে তিনটে ছেলের পিরীতের ভ্যানভানানি শুনে, আমার কেমন যেন আমি হামবড়া—আমার কবিতা—এসব হয়ে যাচ্ছিল। আমি চুল ডানহাতে দিয়ে মুঠি করে ধরে, ঠিক কবিজনোচিত আস্তে লম্বা পা ফেলে কম্পার্টমেন্টের দুটো দরজার ডানদিকেরটায় এগোচ্ছি। ওরা ঠিক ভ্যানিয়ে যাচ্ছে বুঝে কিছু একটা করা দরকার—কিছু একটা করা দরকার--আমি শান্তি পাচ্ছি না—আমি শান্তি পাচ্ছি না ভেবে, প্রথম সিড়িটায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে দুটো হ্যান্ডেল ধরে হাওয়ায় বুক ভাসিয়ে দিলাম। হাতের নড়া দুটোয় লাগছে। ওরা তখনও মেজাজে আড্ডা মেরে যাচ্ছে। আচ্ছা, তরুণটা কী করে ওই বুদ্ধু দুটোর সঙ্গে মজে গেল। খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করছে—পার্কসার্কাসে সেই মুসলমান মেয়েটার কাছেই কি এখন যাচ্ছো নাকি? তোর কী জানার দরকার? শালা, তোমার বুদ্ধি খুলে গেছে। খুব রসে গেছ তাই না। এদিকে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত কচলে রস গলে না। তিনবছর ধরে বোঝাচ্ছি—তোর বাবাকে বুঝিয়ে বল—শেষ পর্যন্ত এক ফ্যাসাদ বাধাবি—রস শুকিয়ে যেতে পারে ; শুনেছি। কি কাজের সময় ঝরবে না। শ্রাদ্ধ শান্তি, গয়ায় পিণ্ডি, চুলোয় যাক ; বউ-এর কাছে ঝাড়, খাবি। শুধু নাঙলার মতোন হাসে—বিয়ে করবই না। : না, বিয়ে করবে কেন। মুঠোয় ধরে রাখবে। শুনে পিত্তি জ্বলে ওঠে। কত করে বলে কয়ে ওকে ভয় ধরিয়ে তবে ওর বৈমাত্রেয় বাবার কাছে নিয়ে গেছলাম।

ওকে ভয় দেখিয়ে মজা নেই। সব সময় জবুথবু। প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়ার সময় শুদ্ধু বোঝাবার চেষ্টা করত—ওর জামাইবাবু ভূতের সঙ্গে ঘুসোঘুসি চালিয়েছে। একটাও ভূতের গায়ে লাগেনি। সব পড়েছে মশারির ঘাড়ে। ওকে মাটিতে ফেলে বুকের চেপে বসেছিল। মাস খানেক রোজ আটটায় ঘটি নিয়ে আসত, রবিকুণ্ডুর কাছ থেকে জলপড়া আনবার জন্য। রবি দরজিও তেমনি ত্যাঁদড়। কোনোদিন রাত দশটা, সাড়ে দশটার আগে ছাড়ত না। অন্ধকার ঘুটঘুটে বাগানের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে বাড়ি ফিরতাম। ইচ্ছে করে ওকে টেনে নিয়ে যেতাম বাগানের সর্ট কাট রাস্তায়—আর এই সময়ই ওর হাত মারলে ধাতু পড়ে না—এটা পরে খুব খারাপ দাঁড়াবে এমন প্রাণের বন্ধুর মতো বোঝাতাম। রাতে ভয় পেয়ে কাৎ। দিনের বেলায় কোনো উচ্চবাচ্য নেই। দিনে যে কে সেই।

গিয়ে দাঁড়াতেই ছোটো হাবিলদার যেভাবে ছিঁচকে চোরের দিকে তাকায় তেমনি, তাকাল তরুণের বাপ। কী করে সাতসকালে লোকটা তার কদাকার মুখ দাড়ি কামাতে গিয়ে এতক্ষণ

ধরে ধরে দেখছে। মাজা কালো। ঢ্যাঙা, মুখ চোখের ফিরিস্তি দেওয়া যায় না এত বাজে। ছোটো ছোটো ছাঁটা চুল কানের এক ইঞ্চি ওপর থেকে ফাঁক করে তুলে দেওয়া পাট খেত। ঝোলা ওপরের ঠোঁট নাক থেকে বেশ কিছুটা দূর খাড়া নাক। কালো শুয়োপোকা ভুরুর চোখ দুটো অগোছালো। চার খাবড়া দিয়ে মুখের মাংস সব হাড়ের গায়ে সেঁটে। যা ব্বাবা! লোকটার সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে তবু তুলেও চায় না। আমি উসখুস—তরুণ চেয়ারের পেছনে পজিশান নিয়েছে। এই বার মালপত্তর গোটাচ্ছে—ডেটলের শিশি, সাবানের ফেনা। ব্লেড খাপে পুরেছে।

—তুমি ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে গিয়ে বসো।

—না মেশোমশাই। আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

—কী বলবে?

—আমি বলছিলাম—তরুণের ইয়ে...মানে...

বোকার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে কী দিয়ে শুরু করব বুঝে পাচ্ছি না। সরাসরি মুখের উপর তো এসব ব্যাপার ট্যাপার আবার বলা যায় না। যতো উটকো ঝামেলা। নিজেকে বলতে থাকি—কী দরকার ছিল তোর এখন ঠ্যালা বোঝ। তরুণটা কাঠের মতো দাঁড়িয়ে হাত চিতোচ্ছে আর উপুড় করছে। যেন এমন সুখের খেলা কখনো খেলেনি। বলই না,—রস গলে না। ডাক্তার দেখাও, কিছু পয়সা খসাও বাবা আমার। তরুণের বোনটা কিছু সন্দেহজনক আঁচ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে রান্নাঘর থেকে ঘরে যাওয়ার পথে। চেয়ারের উল্টো দিকে হাত রেখে আমাদের বিপদ দেখে হাসছে মিটমিটিয়ে। —তোর এখানে কী। যা তুই। আমি কথা বলতে পেরে হালকা হলাম। আমাকে কিছু বলতে হয় এবার। —মানে আমি বলছি ; ওর দেহের যে ধাতব পদার্থগুলো ন্যাচারাল কোর্সে দু'মাস তিনমাস অন্তর অন্তর ক্বচিৎ কখনো পড়ে, ন্যাচারাল ছাড়া আর্টিফিসিয়ালভাবে করতে গেলে কিছুই হয় না। এটা হয়তো ওর কোষে জমে পাউডার-টাউডার হয়ে যেতে পারে ; এরকম শুনেছি। এই উনিশ বছর বয়স এখনই যদি—

তরুণ আমার কথা শুনে ভড়কে গেছে। লজ্জা লজ্জা ভয়ভাব আনার চেষ্টা করছে মুখে। আমিও বেশ উত্তেজিত। বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছি তাহলে—ধাতব পদার্থ-টদার্থগুলো।

—আর্টিফিসিয়াল কোর্সে করতে যাওয়ার কী দরকার। আমি ভয় পাই গলার স্বরে। তবু চেপে রেখে বলি—ন্যাচরাল কোর্সে এত দেরিতে হয় যে ভয় পাবার মতো।

—কিছু ভয় পাবার আমি তো দেখছি না।

—ডাক্তার টাক্তার ডাকলে হতো না মেশোমশাই?

—এসব কোনো ব্যাপারই না। ঠিক সময়ে কাজ হবে।

—ঠিক সময়ে কাজ হবে? আমি বোকার মতো ফিচলেমি করে ফেলেই মনে মনে নিজেকে শাসিয়ে ভেংচিয়ে বলতে থাকি, ঠিক সময়ে কাজ হবে তো? হবে তো!

—কী জানো, আমাদের কেবলি ধাতুক্ষয় হচ্ছে। আমরা সব সময় টেরই পাইনে—পেচ্ছাপের সঙ্গে বেরোয় নয়তো অন্যভাবে ওর নিশ্চয়ই বেরোচ্ছে নাক দিয়ে গয়ের হয়ে কিংবা মুখ দিয়ে কাশ—ও কিছু না।

—আমাদের তো ভয় ধরে যাচ্ছে ওর ব্যাপার শুনে।

—তোমরা এখন নতুন, ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। তা তুই এক কাজ করতে পারিস—ওর দিকে ফিরে বলে—বিমল বাবুকে একবার দেখা—এসব ব্যাপারে হোমিওপ্যাথই ভালো।

আমার মুখটা হঠাৎ গাধার মতো, ইন্দ্রের গন্ধর্বদের মতো লম্বাটে বেমানান হয়ে যায়। এই লোকটার জনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না কেন? তাহলে তরুণের তো কোনো কষ্ট থাকত না।

ওর মুখ চুন, উবু হাটুতে খাকি হাফপ্যান্ট পরে খেতে বসা—খেন্তি, কলি, ছেমড়ি, কেকাদের নির্বিকার ওর কলায়ের চটনা-ওঠা থালের উপর, আলু পটলের মতো গড়িয়ে পড়তে দেখেনি নাকি লোকটা? ছাচের বেড়া, এটুকুন গোছলখানা, বারোয়ারি পাকা এক বিঘৎ উঠানে বুক সমান উঁচু তুলসীমঞ্চও কি ওর নজর এড়ালো? লোকটা কি কখনো পায়রা ওড়ায়নি, বা আমাদের নাটমঞ্চের মতো কোনো স্থাপত্যের সিঁড়িতে বকম্ বকম্ করেনি? তুমি আমার বন্ধুর প্রতি অবিচার করেছো। এজন্য তোমার মেয়ের বিয়ে আমি ভেঙে দেবো। ছিপুর বিয়ে আমি হতেই দেবো না। (তবে আমি কি ওকে বিয়ে করে বাঁচাব?—নাঃ তুই বিয়ে করে মরতে যাবি কেন? বারো বছরের মেয়ে ভালোবাসার মানে কী?) ছিপুর বিয়ে না হলে বুড়ো ভেকুটের কিছু এসে যাবে না। তরুণের ঘাড়ে বসেই তো সোমত্ত হাতি গিলবে আর উগরোবে। ওর পরেও আর চারটে বামিনী কামিনী। ওঃ! আমি কারো সর্বনাশ করতে পারব না, নিজের ছাড়া। আমি প্রমাণ থাকলেও বরপক্ষকে বোঝাতে পারব না—ওর বাবার নাম এই সাধুচরণ খাস্তগীর না হয়ে যোগীপদ কুণ্ডু হওয়ার ছিল। সাধুচরণ লোকটা ভাগাভাগির সময় চার বছুরে মেয়ের হাত ধরে, হাঁড়ির হালে এক ফাঁড়ি থেকে বর্ডার বরাবর গজিয়ে ওঠা আর এক ফাঁড়িতে বদলি হচ্ছিল। আর হোটেলে কাঁকড়া খাচ্ছিল। পাকে চক্রে ঘরপালানো একটা বউ জুটলো সঙ্গে। আর একটা মেয়েও হতো, কিন্তু সাত বছরের মেয়ে মামাবাড়ি আদর খাওয়াই ভালো। তরুণ নামে বছর তিনেকের ছেলে হলো। তরুণ ওর দিদির মতো বলতে পারত না—আমার বাবা তো পাকিস্তানে থাকে। এ বাবা ভীষণ কালো। এরে বাবা বলাবি কেন। আমার বাবা ফরসা। তরুণের বৈমাত্রেয় দিদিটিও কম যায়নি। সম্প্রতি বিয়েতে হাড় জুড়িয়েছে। এই সাধুচরণ লোকটা ওই তিনটে গোলমালে সন্তান প্রাপ্তি ছাড়াও নিজস্ব জনন ক্ষমতায় খেন্তি, কলি, ছেমড়ি ও কেকাদের পেয়েছেন। ইহাদের বাবার বিয়ে হয়নি। ইহা ইতিহাসগত সত্য।

আমি নিজের উপর উঠে দাঁড়াতে চাই রেগেমেগে। তরুণকে ওর বাপের সামনে ফেলে উঠে আসি। আর সারা পথ কীর্তন করতে করতে বাড়ি ফিরি—বিদ্যাসাগরের ছাবালের নাম নারান ডোবা। বিদ্যাসাগরের ছেলের নাম নারান ডোবা।

ওষুধ আনতে ঘনঘন কয়েকদিন ওর সাইকেলের ক্যারিয়ারে চড়ে বসেছি। চালা, তোর বিচিতে ডবল ক্যারির চাপ পড়ুক। শালা, নাড়ু আর মুড়ির মোয়া হয়ে যাক। মনে মনে খুঁটি এঁটে থাকতাম বসে। কিছুতেই চালাইনি। যদিও জানি, সাইকেল চালালে কিছুই হয় না। ওর দুটো দাবনা পুরুষ্ট হবার সুযোগ দিচ্ছি। ওই পুঁচকে গ্লোবিউলের শিশিও ধরিনি। সাইকেল চালাতে চালাতে প্রায়ই বলে ওর হাফবাবার কথা। আমি বলি—আমায় কেউ ভালোবাসে নারে। মা বড়ো অছেদ্দায় পাতে রুটি দেয়। আগে মেটে ঘরে থাকতে—একটুতেই ঘুঁটের বস্তার খোলে ঢুকে—পৌষের শীত—ভিজে দাওয়ায় কত রাত যেত। তুই জানিস না। তখনও তোর সাথে আমার এত পিরিত হয়নি। মাঝে মধ্যে মাঝরাতে দয়া হলে আ—আতু ডেকে চারটে রুটি ফেলে, ঝরঝরে তালিমারা দরজা দিয়ে শুত। কোনোদিন ঘুণধরা দরজাটায় লাথি মেরে বলিনি—আমাকে ঘরে নাও—আর করব না—আমাকে ঘুটের বস্তায় ঢুকে ; গোবর লেপা, লোনা, মেটে বারান্দায় শুতে হবে কেন? এমনি ঘুমকাতুরে হাবা ছিলাম।—তোর তো ও নিজের বাবা না। শুধু তুই ওর পদবীটা বয়ে বেড়াস বলে তোকে খোরপোষ দেয়। তোর মা তোকে খোঁটা দেয় শুনিয়ে শুনিয়ে যাতে, যে লোকটা তোকে আর তোর মাকে পোশে—তার কিছু উসুল হয়। আর আমার ব্যাপারটা দ্যাখ—আমার নিজের মা—অবশ্য প্রায়ই শোনায়—পাকিস্তান থেকে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে আসার সময়, আমার যে আসল মা—একটা কাঁথার কোণে শুইয়ে

অন্য কোনো গায়ে চাপা দিয়ে নদীর চরে ফেলে পালায়। আমি ট্যা ট্যা করে কাঁদতে থাকি ; সেসময় বুঝলি—মা, দাদাদের পোঁটলা থেকে চিঁড়ে—পাটালি বের করে একটা বনঝাউ ঝোপে কোচড়ে কোচড়ে ভাগিয়ে খাওয়াচ্ছিল। আমার কান্না শুনে প্রথমে ভাবে কোনো শকুনশিশু মাকে ডাকছে! কী অস্বাভাবিকভাবে মা বলে—মাঝ রাত্রি। আধখানা চাঁদের আলোয় মা ঝোপ থেকে উঁকি মেরে দেখে চকচকে চরে আবছা পা দাপিয়ে সত্যি একটা মানুষের বাচ্চা কাঁদছে। হয়তো আমার মা'টা বর্ডার পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে। নয়তো পুলিশেরা চুলোর দোরে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে আমি মার ছেলে। আর আমার দাদার রক্তজলের পয়সা। খেয়ে খেয়ে ভুষ্টিনাশ। আমি রোজ রাতে পড়তে বসে ঢুলি! সারাদিন টইটই করে বড়ো ক্লান্ত। রিলিফে টিপছাপ—ধারচাওয়া এদোর-ও বাড়ি—গম ভাঙ্গানো দু'মাইল ঠেঙিয়ে—ক্লাসে ননীবাবু, কোলে শুইয়ে অনবরত এক গালে চড়—বিকেলে চোর চোর খেলায় ওরা জোট বেঁধে বারবার আমায় মোর করত। বরুণদের গাবগাছে বাঁদরের মতো চোর চোর খেলা। ছুটির দিনে সকালে মার্বেল খেলা। খাটনি দিতে দিতে—একে এঁড়ে—উনিশে গায় হলুদ—কুড়িতে বিয়ে—একুশে বউভাত বাইশে একমাস—বত্রিশে ছেলে—তারপর আবার দশমাস কাটলে মেয়ে। যতক্ষণ না বাড়িতে মার-বকুনি খাবার ভয়ে কেঁদে ফেলতাম—ততক্ষণ, দুটো—আড়াইটে অব্দি ওরা কেঁয়েমি আর চোট্টামি করে আমার ছেলে-মেয়ে করে দিত। ওরা ভীষণ শয়তান আর ছ্যাঁচড়া ছিল। আমি মার খাচ্ছি,অথবা মা'র বকুনির বেগ আর কড়ায় খুন্তি ঠোকা কমার জন্য প্রার্থনার রান্নাঘরের কোণে কাঠ ; দেখে তবে বাড়ি যেত।

দুর, সাইকেল কোথায় আর এই ট্রেন কোথায়! হ্যাঁ, হাওয়ায় বুক ভাসিয়ে দিয়েছি, নড়াদুটোয় বেশ লাগছে। টিপটিপ করে ইলশেগুড়ি বিষ্টি পড়ছে। ওদের মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে নেই। আমি আলাদা—তরুণ ও ওই ছেলেদুটো থেকে অন্যকিছু—ওদের দেখাতে চাই। মুখের দিকে না তাকিয়েও বুঝছি ওরা আমার দিকে একে একে দেখে গজালি চালিয়ে যাচ্ছে। দুহাতে হ্যান্ডেল। পিঠ সবটা হেলিয়ে আমি টাগরা দিয়ে আওয়াজ দিই। এইতো অনেক শান্তি। আমি জীবন কেমন জানছি। এখন খুব স্বস্তিতে মৃত্যুর কথা ভাবা যায়। কী হবেই বা মৃত্যু ভেবে। একদিন তো এসে সমস্ত আঁটসাট কাছাকোঁচা খুলে দেবেই। এত তাড়া কীসের। আমি আমার ভালো লাগা, তারিয়ে জিরিয়ে নিই। তবু রেজাল্টের কথা উঁকি দেয়। ওরা দুজন যাচ্ছে কলকাতায়। ইউনিভার্সিটিতে ফোন করে খবর নেবে। শিয়ালদায় ৫টায় গাড়ি ইন করবে। ধুস, ল্যাজ নাড়ল, কি শিং নাড়ল—আমার কী। পাশ করেই বা কী? আমি আমার বাড়ের আঙুল চুষতে থাকি। সেইতো আমড়াআটি চোষা। তিনুটা যে কী করে আঙুল চোষে বুঝে পাইনে। ধাড়ি বয়সে আঙুল চুষে পায় কী? একটা আরাম আছেই তো। আঙুলটা বারবার সামনে পেছনে ঠেলে, চুষে—নালটাল জড়িয়ে একটা ভালোলাগার ব্যাপার থেকে যায়। দাদুর শ্রাদ্ধের ফাঁকে রীতিমতো কাজ করতে করতে ওর পুরোনো অভ্যেসটা-ঝালিয়ে নিচ্ছিল। ইলেভেনে পড়ে। কী ভোঁদাই না ছিল। মিতু ; ওর দিদি—আমার ইয়ে, মামাতো ভাগ্নী হয়। গুলিয়ে যাচ্ছে—আমি ওই একরকম মামা হই। আমি তখন কলেজে পড়ার জন্য চোতা পেয়ে গেছি। কাছাকাছি মাইল ছয়েকের মধ্যে থাকলেও দেখা হতো বেশ দূরদূর। মিতুর বয়স বছর চোদ্দো তখন। বেশ দশাসই মাগীপানা। হ্যাৎ, তখনকার সেরূপ মনে করলে নক্ষীপিতিমে বলতে ইচ্ছে করে। কোথা থেকে ফক্কর শালা এক লোচ্চা-কার্তিক জোগাড় করেছে কে জানে? আঠাশ বছর বয়সে চার ছেলের বাপ। এক টুকরো ভুঁড়িও করেছে—ব্যাঁকা মদন। বছর তিনেক পর গেছি সে' বার।

মনে আছে সন্ধে সন্ধে বারবারান্দায় ঠাং ঝুলিয়ে গল্প করছি আমি, তিনু আর ওর বড়োদাদুর

ছেলে স্বপন বা কমল। ওর বড়োদাদুর ছেলে একথা সেকথার পর—গইলের দোরে সন্ধে দেখাতে যাওয়া মিতুর দিকে দেখিয়ে হাসল। ও কাপড় পড়ত। ওর মা, আমার দিদি, গোঁড়া বৈষ্ণবী। অল্প বয়সেই ঠাকুর সাজিয়ে বসেছেন সারা ঘরময়। ওর বাবা কোথায় ফেরার। দিদিটি তাই হাত-পা ধুয়ে গৌরাঙ্গের ফুটোবাঁধা হয়ে পড়েছেন। মেয়েটিকে সাততাড়াতাড়ি এক কেষ্টর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে নেতাই'র সেবাদাসী হলেন।

যাকগে, তিনুর দাদুর ছেলেই বলল, ও আর তিনু ; মিতুকে গোয়ালে কী সব করেছে। আমাকে বলছিল—আমি রাজি আছি কি না। নক্ষীপিতিমে উঠোনে দাঁড়িয়ে সাঁঝের বাতি নাড়াতে চাড়াতে—কী সুন্দর হাসছে। ও বড়ো কথা বলতে উসখুস।...এখন আটটা দশের ট্রেন যায়নি। রাতের বেলা শুধুমুধু কাট মারব? পারি না, শেষ পর্যন্ত ভাগ্নীর সঙ্গে। ভাগ্নের ব্যবস্থা! ভারি—তিনুর বয়স মোটে দশ কি এগারো, মিতু ওর আপন দিদি। আচ্ছা, এসব ভাবার কী মানে। ওরা তো শরীরটাকে চিনতে শিখেছে তাছাড়া ও একটা মেয়ে আর ওর মায়ের পেটের ছোটো ভাই, একটি ছেলে। একেবারে না বলে খাওয়া—ঘুরে যাই রান্নাঘরে! দিদিটি একহাতে কুড়োজালি ধরে আর হাতে জল ঢালছে কড়ায়। রান্নাঘরে ওঠার সময় ছাঁচতলায় অন্ধকারে যেন দিদির নেতাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বাঁদিকে নিতাই-গৌর পেল্লায় হাতছানি। আমার ভীষণ রাগ হয়। ওমা, মিতুও এখানে দাঁড়িয়ে। আমি যে, তোকে কাটাব বলে ঘুরে এলাম তাও তুই। মিতু বড়ো ইচ্ছে রাত কাটিয়ে যাই। কিন্তু ওর মা মাটির নিতাই-গৌরের দিকে চেয়ে আমায় আর আটকে রাখল না।

দিদির গাঁইগুই, মিতুর বাছুর চাউনি ফেলে চলে তো এলাম, এখন মাকে কী বলি। আচ্ছা মিতালীর শো ভাঙুক। আটটা দশের ট্রেন বয়ে যাক। সাড়ে দশের ট্রেন ধরব। বাজারে চলে এলাম হাঁটতে হাঁটতে। খালি ডাবের খোলায় শর্ট মেরে মেরে কিছু সময় গেল। তারপর ইচ্ছামতির পার। মেছোহাটার বেঞ্চিতে শুয়ে, আঁশটে গন্ধ। সাধের ইছামতি. গুনগুন গান করে এগিয়ে দেখি মিলনীর মেলা ভাঙল কি না। ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। আসার সময় বেশ গ্যাঁজাতে গ্যাঁজাতে এসেছিলাম। বিনয়টাকে ধরে নিয়ে স্রেফ মাকে বলব সিনেমায় গেছিলাম—দেখা করে এসেছি। উত্তমকুমারের মুখ দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়। পিলপিল করে বেরোচ্ছে। আমার গা ঘিনঘিন করে। হাসি পায়। সব মা'র দোর থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসছে। এত মানুষ, এত শুক্র ; আমি পড়েছি, শুক্রকীট। শুক্রকীটই সব, দলদল শুক্র। আমার ষোলো বছরের শুক্রটি আমি, আমার বাবার দেওয়া শুক্রকীট। ঠিক এমনি গা ঘিনঘিন করেছিল তবে এখন কেমন ঠান্ডা মাথায় সহ্য করে যাচ্ছি। সেদিন রাগে ঘেন্নায় সবকিছু তছনছ—মুঠো করেছি হাত দুটো। আমার বাবার সবচেয়ে নোংরা কাজটির থেকে আমার জন্ম। এখন হাসি আসে। নোংরা কোথায়। আমার শরীরটা তো বেশ আরাম দেয়—শরীরটা যেখান থেকে আসুকগে, কী দরকার।

বিনয় বুঝিয়ে বলেছিল সব। ওর সঙ্গে কতদিন কথা বলিনি সেজন্য। ও আমার সঙ্গে শয়তানি করেছিল। আমি ক্লাস নাইনে সারাবছর হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকাইনি। আমি বিশ্বাস করিনি—আমার দেবতার মতো হেডমাস্টার সুবোধবাবু—কেলেকেলে পেটগ্যাঁড়গেড়ে ছেলে-মেয়েদের এই একই উপায়ে পেয়েছেন। আমাকে কালীতলায় নিয়ে গিয়ে বিনয় দিব্যি গেলে বুঝাতে চেষ্টা করে, আমরা এই। এই—এইভাবে হয়েছি। আমি ওকে বলি, মা আমার সঙ্গে ওর মতো বদমায়েশি করে না। আমার মায়ের নাইটা যে খুব খোদল, আমি হাত দিয়ে দেখেছি। মা তেল মাখার সময় আমি মা'র নাভিটার দিকে চেয়ে প্রায় দিন জিজ্ঞেস করি—মা

আমি তোমার পেটের থেকে হলাম কী করে। পেটে কাটা দা" পাইনি। মা বলেছে নাই দিয়ে হয়েছি। হাসপাতালে গেলেই তো ভাইবোন, ছেলেমেয়ে হয়। —হাসপাতালে গেলেই ছেলেমেয়ে হয়? বিনয় ভেংচিয়ে বিরাট জোরে এক চড় কষিয়েছে ; ন্যাড়াশিবের কালো মাথা থেকে হাত সরিয়ে, আমার গালে। ওর ভ্যাংচানো ভালো করে দেখতেও পাইনি। শিবের ছাদহীন চাতাল ঘেরা ইটের রেলিং ধরে ফেলি, রেগে উঠে ওর খালি বুকে দুম করে কিল বসিয়েছি—গেলেই হয়তো। ওর সঙ্গে মারামারিতে পারতাম না। কুদো চেহারা নিয়ে বুকে উঠে বসে গলা টিপে ধরেছে। প্রাণপণে হাত সরাই—ছাড়, তুই তো সেভেনে পড়িস—তোর সঙ্গে কথা বলব না। আরো জোরে চেপে ধরে বলে—তুই নাইনে পড়ে সব জেনে গেছিস, না? কথা বলতে হবে না। চল, শালা দীপকদার কাছে। দীপকা যদি বলে হেডমাস্টারের অ্যাভাবাচ্চা, আমি, তুই তোর গুষ্টিশুদ্ধু বাবার রসে হয়েছি—তো তোকে তিন লাথি কষাব। হ্যাঁ, আমিও তোকে সাত লাথি ঝাড়ব।

দুজনে তেরিয়া মরিয়া হয়ে ছুটে, আসি দীপিকদার কাছে। দীপকদা চান করছে ঘাটে। তার মা ধুলোমাখা মারামারি মূর্তি দেখে কেবলই দেরি করাচ্ছিল জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে। আমার আর বিনয়ের তর সয় না। ছুটে যায় ঘাটে। কোথায় দীপকদা, দু'তিনবার হাঁক মারতেই দীপকদা বাগান থেকে বেরোয়—গামছা ঠিক করতে করতে, রেগেমেগে—এখানেও জ্বালাতে এসেছিস্—কী হয়েছে, এত শ্যালের মতো চেল্লাচ্ছিস কেন?

দীপকদা আমাদের হিরো, কলেজে পড়ে। আলাদা মাঞ্জায় পাড়ার দাদা। খালি গায়ে বেশ দেখায়। বিনয় বলে—বললে কিন্তু মারতে পারবে না—ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। দীপকদা কিছু বলার আগেই বলে ফেলি—কচি আর খোকা কুণ্ডুদের বাগানে যেরকম করেছিল—সেই যে যারজনে' খোকারে আমরা ক্লাবে নিইনি। মা-বাবার ওইরকম করলেই নাকি ছেলেমেয়ে হয়! বিনয় বলছে তুমি, আমি, আমাদের ভবেশ স্যার ; সব্বাই এই—এইরকম করে হয়েছি। আমার জ্বলা আরও হালক' হয় দীপকদাতে জড়াতে পেরে। দীপকদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ—বিনয়কে দেখে—তারপর হুড়-মুড়িয়ে আঘাটা দিয়ে নেমে যায় বিজগুড়ি কেটে জলে। কাদা ঘোলা জল পাক খায়—ডানকানা মাছেরা দিকভুলে ছোটে। কোমর অবধি গামছা ডুবিয়ে—কাজ সেরে—খেজুরের খেটো বেয়ে উঠে আসার সময়—জল ছুঁয়ে খরখর করে পায়ের পাতা ধোয়। উঠে এসে আমার হাত ধরে—। চল, তুই তো কদিন পরে টেন'এ পড়বি। হ্যাঁ বলে হাত ছাড়াই। ফুলরাগানের ভেতর দিয়ে চলে আসে ঘরে। উবু হয়ে—বিছানার পরতে পরতে হাত চালিয়ে, খবরের কাগজে মোড়া একটা বই ট্রেনে বের করে। আমার হাতে দেয়। —কাল-পরশু, পড়ে দিয়ে দিবি। ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে চলে আসার সময় বলে—আমাদের মা-বাবারা কিছু জানায় না। বোধ হয় জানেও না প্রকৃতরহস্য কোথায়। অনেক কিছুই জানবি—মূলরস কোথায়, কীভাবে, কীভাবে—।—এই বিনয় তুই এদিকে আয়। দীপকদা ওকে বাগানের দিকে টেনে নিয়ে

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

হাংরি লেখকের কাছে প্রশ্ন

উপনিষদের সেইসব ঋষিকুলের কথা মনে হলে একটি প্রচণ্ড হাংরি-জেনারেশনের সুগম্ভীর আর্ত গর্জন শুনতে পাই। মৃত্যুর ভয়ে কাঁটা-দেয়া আত্মার শীত থেকে পরিত্রাণের জন্য যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাখতে হয়েছে ওঁদের। মৃত্যু অতিক্রম করার বাসনা, আত্মার পরিকল্পনা ইত্যাদি যেন জীবনের সঙ্গে জুরে থাকারই 'হিপনটিক স্পেলে' তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকা ; আর এই 'ফিক্সেসন থেকে ওরা জীবনের অর্থ খুঁজেছেন তন্ন তন্ন করে, ক্ষুধার বর্ণ, বাসনা, চিৎকার, কাতরতা, আর্তনাদ, আনন্দ সবকিছুকে 'প্রিজমের' বঙ্গভঙ্গ কাঁচের মধ্যে লক্ষ করেছেন। কিন্তু ওই কাঁচ ভেঙে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে, ধ্যান ছেড়ে নিজের শিরা উপশিরার মধ্যে, মন্ত্র ছেড়ে ধর্মাধর্মহীন জীবনের কর্দম-চন্দনে মাখামাখি হয়ে তার স্বাদ-বিস্বাদ ঘোষণা করার জন্য বীরাচারী তান্ত্রিকদের হয়তো যথার্থ হাংরি বলা সংগত হবে।

মদ, মাংস, মৎস, মুদ্রা এবং মৈথুনের পার্থিব অনুপান ঘেঁটেঘুঁটে, তার কাদায়, রক্তে, রসে মাখামাখি হয়ে জীবনটাকে চেখেচুখে 'ধর্ম' শব্দটি ওরা উচ্চারণ করতে চাইলেন। এখানে অভিজ্ঞতাই ধর্ম, এদের মন্ত্র তাই অনেক ক্ষেত্রেই 'কোড্', প্রথাসিদ্ধ শব্দের 'স্ট্যাবলিসমেন্ট' ভেঙে এরা 'প্রহেলিকার' আশ্রয় পর্যন্ত নিয়েছে মন্ত্রে—কারণ সাহিত্য রচনা এদের উদ্দেশ্য নয়, সর্বজনবোধ্য ধর্মের তাত্ত্বিক প্রচার পুস্তিকা রচনাও এদের অভিপ্রেত নয়। জীবনকে ভেঙেচুরে, দুমড়ে মুচড়ে, চেখে ; ছেঁকে বের করে তার 'ডকুমেন্ট' রাখা মাত্র। নিছক দীক্ষিত যিনি তার কাছেই এর গুরুত্ব, অন্যজন সংসারে সুখে থাকুক। মৃতদেহের উপর বসে সাধনার মধ্যে যে প্রচণ্ড উদ্ভট এবং ভয়ংকর রয়েছে তার তাৎপর্য যেমন সাংকেতিক তেমনি প্রাঞ্জল বাস্তব। উত্তেজনা, ঈশ্বর মৃত্যু, যৌনতা, রহস্যময় গুহ্য আচার এবং ব্যক্তিগত এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আত্মানুসন্ধানের সে অভিজ্ঞতা তন্ত্র-সমাজে উন্মোচিত তারই আধুনিক প্রতিধ্বনি কিংবা প্রতিরূপ সাম্প্রতিক যুগে দেশে বিদেশে লক্ষণীয়।

Villon বা Genet-এর পাঠক মাত্রেই জানেন, অভিজ্ঞতাই যে সাহিত্য তা কত সহজেই প্রমাণ্য। অথচ এই সহজকে আয়ত্ব করা যে কত দুরূহ তার প্রমাণ সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রলম্বিত অষ্টপ্রহরে ওই Villon বা Genet কেবল একজন কী দুজনই এসেছে। Genet নিজেকে ব্যবহার করে সাহিত্যে তার প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। 'আইডেনটিটির অনুসন্ধানে খুন, ব্যাভিচার, জালিয়াতী, লাম্পট্য এবং বিকৃত যৌনচারের বিচিত্র উদ্দাম প্রহারে নিজের Being-কে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। কর্দমে লালিত জেনে জীবনের পুঁজ, রক্ত, ক্ষত, বমন, লোভ, লালসা, রিরংসা সবকিছুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে নিজেকে খুঁজেছেন এবং সেই অনুসন্ধানের যে তথ্যচিত্র

রচনা করেছেন, তা-ই মহৎ রচনা হয়ে উঠেছে। এক কথায় জেনে নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সভ্যতার প্রতারক মনভোলানো সোনা দিয়ে যত ঢাকনা তৈরি হয়েছে তার সবকটা পা দিয়ে ঠেলে এক প্রচণ্ড সততার বিস্ফারিত নগ্নতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। সভ্যতার মূঢ়তায় নির্মিত যাবতীয় Power-symbol–identity-র মেকি মুখোশ এবং Stablishment-এর কাগজের তৈরি দুর্গগুলো প্রবল ফুৎকারে তছনচ করে ব্যক্তিত্বের অমোঘ এবং একাগ্র দুঃসাহসিক নৈঃসঙ্গকে উন্মোচিত করেছেন। যাবতীয় মিথ্যের আবরণ ভঙ্গ করে সততার এই যে উলঙ্গ উল্লমফন, অভিজ্ঞতাকে শব্দে ও রচনায় এই যে নিনাদিত করে তোলার প্রলয়-প্রেরণা তার প্রকাশ পূর্ববর্তী ও সমকালীন কোনো কোনো লেখকের মধ্যে শ্রুত হলেও এত নিখাদে এবং জীবন ব্যাপী এতখানি প্রয়োগগত নিষ্ঠায় লক্ষ করা যায়নি। জেনে নামটির অর্থই যেন জীবনকে ব্যবহার করে তার অভিজ্ঞতা প্রকাশের বাসনা।

বাংলাদেশের হাংরি জেনারেশনের লেখকদের প্রসঙ্গে এই ভূমিকার কারণ উপরোক্ত ভাবনার সঙ্গে এঁদের কিছু মিল আছে। এর অর্থ এই নয় যে ক্ষমতার দিক থেকে এঁরা পরস্পরের তুল্যমূল্য—সাহিত্য ও জীবনের সাঙ্গীকরণের অনিবার্যতার স্বীকৃতিতেই এই সাদৃশ্য সন্তানের প্রসঙ্গ এসেছে। বঙ্গীয় ক্ষুধার্ত সম্প্রদায় তত্ত্বতগভাবে (যদিও স্বাভাবিক ভাবেই এঁরা যে কোনো রকম তত্ত্বে অবিশ্বাসী) অনেক কথা ভাবছেন, ব্যক্তিগতভাবে তা আমি উপেক্ষণীয় মনে করিনি। যদিও ক্ষমতায় এই মুহূর্তে তাদের একমাত্র বরণীয়, ভাববার সময় হয়নি, তাহলেও এঁরা ভাবনাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। স্ববিরোধিতা এদের মধ্যে অস্পষ্ট নয়, তাহলেও দৃষ্টিভঙ্গী, এবং প্রকাশ পদ্ধতিতে এঁরা স্পষ্টভাবেই যে স্বতন্ত্র হবার আকুলতা পোষণ করছেন সন্দেহ নেই। নিজেকে ব্যবহার করাই সাহিত্য একথা হাংরি লেখকরাও বলেন, কিন্তু এর স্ববিরোধিতা মুক্ত পরিণাম যা Genet-র মধ্যে দেখেছি, তা এদের মধ্যে এখনও আসিনি। এবং আসেনি বলেই জীবন এবং সাহিত্য, ক্ষমতা এবং বিশ্বাস, পদক্ষেপ এবং গন্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতার ফাঁক রয়ে গেছে।

এঁদের হাঙ্গার জীবনকে নগ্ন করে ভাঁজ খুলে খুলে দেখার—তাতে যত ভয়ংকরই প্রকাশ পাক ক্ষতি নেই। জীবনের যাবতীয় রিলেসন, আচার এবং যুক্তিশৃঙ্খল যদি ভণ্ডামি বলে প্রমাণিত হয়, তাকে এরা নির্দ্ধিধায় ঘোষণা করবেন। এবং এঁরা এসব কিছুকে প্রতারণা বলেই ভাবেন। সবরকম এসট্যাবলিশমেন্ট এঁদের কাছে দুরারোগ্য ক্যান্সারে অধিকৃত বলে মনে হয়, এবং এই বীজানু বলয়ের বাইরে এরা পা ফেলতে চান। পূর্ববর্তী যাবতীয় শিল্পকর্মও এদের কাছে মূঢ়তার বিশ্বকোষ মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন অবসেসনের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে, বুদ্ধি ও যুক্তির বুর্জোয়া গণিতকে প্রহারে প্রহারে অথর্ব ক'রে সভ্যতার বিচিত্র রাংতার পলেস্তার নোনা আচ্ছাদন আঁচড়ে তুলে ফেলে এঁরা নিজেদের আত্মায় নিজের তর্জনী স্থাপন করে চতুর্দিকে তাকাতে চেয়েছেন। অভিজ্ঞতার দর্পনে যতটুকু মুখচ্ছবি ঠিব ততটুকুকেই এরা পৃথিবীর আয়তন মনে করেন, এবং ততটুকুকেই সাহিত্যের চৌহদ্দি ভাবেন। এর বাইরে কিছু হয় না, হতে পারে না ; যা হয়েছে তা ভুল, যা হবে তা ভণ্ডামির কারসাজি। নিজের সঙ্গে এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের ভাবনা নিরর্থক—যুদ্ধটাই সব, যুদ্ধ থেমে যাবার অর্থই মৃত্যু। সাহিত্য তাই হবে এই যুদ্ধের রানিং কমেন্টারি। গুলি ও কামান কোনো প্রতিপক্ষের দিকে নির্দেশিত হবে না—নিজের অস্তিত্বের ভিতরে গর্জন ক'রে ঢুকে যাবে, ভিতরটাকে ভেঙে-ফাটিয়ে যথার্থ আর্তনাদগুলিকে প্রকাশ করবে এবং আক্রমণে সজাগ রক্তকনিকা explode করে বাইরে আসবে—এই exploded Red corpuscles- ই অক্ষরে রূপান্তরিত হয়ে সাহিত্যের শব্দ এবং ভাষা বলে চিহ্নিত হবে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আত্মার intimate এবং Naked সংঘর্ষে যে কটি শব্দ এই সাহিত্য তার বাইরের

যেকোনো অভিধানকেই ব্যান করবে—এ-প্রসঙ্গে শব্দের শ্লীলতা অশ্লীলতারও কোনো মার্কা নেই, জীবন যেভাবে react করবে শব্দ তার সমানুপাতিক হবে। শব্দ আসলে রিয়াকসনের Sound effect– ভাষা ও বাক্য তার পুঞ্জীভূত রূপ মাত্র। সব মিলিয়ে জীবনের কর্দম ও চন্দনের মধ্যে স্ট্রেইট ড্রাইভ। যাবতীয় এসট্যাবলিশমেন্ট বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে সবল প্রতিরোধ এবং আত্মাকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আক্রমণেরও প্রয়োজন। এক কথায় জীবন ও লেখায় অরিজিনাল হয়ে ওঠা। এইভাবে আত্মার ক্লিষ্টতাকে আহার জোগাবার জন্যেই ক্ষুধা এবং ক্ষুধার্ত সমাজ। অর্থাৎ হাংরি জেনারেশন। এর কোনো আলাদা সংঘ নেই, সদস্য-পদের জন্য আবেদন পত্র বা যোগ্যতাবলীর পরিচয়পত্র নেই। স্বাধীনতাপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী যে কোনো লেখকই আত্মার যোগ্য আহারের জন্য পিপাসার্ত হলেই হাংরি লেখক।

উপরোক্ত চিন্তা-প্রণালী হাংরি জেনারেশনের বিভিন্ন রচনার মধ্যে ঘোষিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট জীবন ভঙ্গী এবং সাহিত্য কর্ম্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা স্পষ্ট এবং সে কারণে চিন্তনীয়। ব্যক্তিগতভাবে এদের কাব্যবিষয় এবং শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে বিভিন্ন অমিল থাকা সত্ত্বেও আমি হাংরি মতামত চোখে পড়া মাত্রই ফেলে দিতে চাই না। চলতে ফিরতে যা পাই সবকিছুকেই প্রথমত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক থাকি—ক্রমান্বয় সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে। কবিতার পাঠক হিসেবে হাংরি কবিতাও তাই পড়েছি এবং বর্তমান নিবন্ধে প্রতিক্রিয়া যথাসম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু কবিতার সাহিত্যিক মূল্য এরা বিশ্বাস করেন না, সেকারণে সে-জাতীয় পর্যালোচনা আমি অবাঞ্ছিত হবে এই বিবেচনায় বর্জন করছি। কেবল মাত্র ওদের জীবন বোধের উল্লেখ করেছি। লেখকদের রচনা শক্তির উৎস মূল লক্ষ করাই কার্যকরী ভেবেছি। অনেক ক্ষেত্রেই এদের রচনায় ক্ষুধা ও প্রতিরোধের আর্তনাদ কর্ণগোচর হয়েছে একথা স্বীকার করার পরেও হাংরি লেখকদের লেখায় স্ববিরোধিতা লক্ষ করেছি বলেই কয়েকটি বক্তব্য নিবেদন করছি। এক্ষেত্রে কবিতাই আমার একমাত্র উপজীব্য। অনেকটা প্রশ্নের আকারে এই বক্তব্য রাখতে চাইছি—হাংরি লেখকদের কাছেই এই প্রশ্ন। বিশেষত মলয়, শৈলেশ্বর, সুবো এবং প্রদীপকে উদ্দেশ্য করেই আমার প্রশ্ন, কারণ হাংরি কবিতায় উল্লেখযোগ্য যা কিছু তা এ-কজনের মধ্যেই গুরুত্ব পেয়েছে বলে আমার ধারণা।

১. আপনারা কবিতা লেখেন কেন? সাহিত্যের দীর্ঘ-দীর্ঘ কালের এসট্যাবলিশমেন্টের একটা ফর্মের কনভেনসন 'কবিতা' নামধেয় রচনায় সমর্থিত। আপনারা অভিজ্ঞতার Notes রাখাই লেখার উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। কবিতা শব্দের ব্যবহারের কবিতাগ্রন্থের প্রকাশে, কবিতা হিসেবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিভাগীয় স্তম্ভে স্বতন্ত্র মূল্য আরোপে আপনাদের আক্রমণস্থল সেই বুর্জোয়া এসট্যাবলিশমেন্ট এবং কনভেনশনকেই লুকিয়ে আলিঙ্গন করছেন না কি? বলতে পারেন, 'কবিতা' শব্দটি আপনারা নতুন তাৎপর্যে গ্রহণ করছেন। তাও কি একটি বিশেষ ফর্মের বা শিল্প-প্রতিমার প্রতি আপনাদের অবচেতন আসঙ্গ লিপ্সা নয়। আপনাদের সচেতন আত্মপরিচয়ের ঘোষণার সঙ্গে এই কর্মপ্রণালীর একাত্মকরণ কি সার্থক হয়েছে? তাছাড়া নতুন ভঙ্গীতে কবিতা লেখাও কি একধরনের এসট্যাবলিশমেন্ট ছেড়ে অন্য ধরনে যাওয়া নয়। এ-বাড়ি বদলে ও-বাড়িতে গিয়ে ওঠার অর্থ তো গৃহত্যাগ নয়।

২. কবিতাকে Directly বলা কি আপনারা রক্তে এবং কালিতে মাখামাখি করে নিতে পেরেছেন? অভিজ্ঞতাকে সাহসের সঙ্গে সরাসরি অনেকটা রানিং কমেন্টারির মতো বলেননি তা বলছি না। কিন্তু এই প্রথা কি সম্পূর্ণ বশীভূত? Direct statement হিসেবে লেখাকে প্রকাশ করতে গেলে উপমা, প্রতীক, বিমূর্ত শব্দ-কল্পনা, অনুভূতিগম্য (অভিজ্ঞতা প্রকাশক প্রত্যক্ষ

আবেগজাত নয়) শব্দ, ধ্বনি এবং বাক্য বর্জনীয় বলেই মনে হয়। কারণ এগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ ভূমি থেকে অনুভূতির অপার্থিব বিমূর্ত চেতনা-স্তরে মনকে চালিত করে যাকে আপনারা কৃত্রিমতা ভাবেন আপনাদের অজ্ঞাতে কিংবা যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও কনভেনশণের দুর্জয় মোহময় চাপে ওইসব অপার্থিব রেশমি অনুভূতি-তন্তু ফাঁসের মতো কাব্যকে জড়িয়ে ছুঁয়ে থাকেনি? কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি, নিম্নরেখ অংশটি বিচার করবেন। অনেকের মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

আমি দেখলুম হাতঘড়িতে পরিয়ে রাখা দরদী কান্না মোছা হাত
আমি নালির পাঁক থেকে রঙ ওঠা বেলুন তুলে ফুলিয়েছিলুম

—জখম/মলয়

গাছের ছায়াকে ঘুরে ঘুরে দেখতে চাইছে অধ্যাবসায়ী রোদ

—জখম/মলয়

মানুষের আদর খেতে পাথরের নুড়ি চলে আসে
বোতলের পুজনীয় সিংহাসনে

—জখম/মলয়

জেটি থেকে লাফাতে গিয়ে আমার বুকে নোঙর আটকে গেছে

--অমীমাংসিত শুভা/মলয়

মশারির মধ্যে দেয়াল ঘড়ি

—দেশলাই, হৃৎপিণ্ড ২/শৈলেশ্বর

এ্যালার্ম কাঁটার উপর আমার অতিথি রুমাল

ঐ/শৈলেশ্বর

মানুষের মূত্র রহস্যে গোলাপ ফুটে থাকে কার্নিশের উপর

—কার্পেট/শৈলেশ্বর

বিশালসমুদ্র ভাসে মাথায়

—টেরিলিন টেরিকটন/সুবো

হাওড়া ব্রিজ চেখে দেখে কলকাতার হাড়

—কেবল মাধবীর জন্য/সুবো

একটি পাঁপড়িও আজ গলে না শরীরের তাপে
কেবল পায়ের ছাপ চোখ ছিঁড়ে চেয়ে থাকে

প্রতিভা/প্রদীপ

চৈত্রের বাতাস খেয়ে কর্পোরেশনের পুল ফেটে যায়

—প্রসূতি সদন/প্রদীপ

ইত্যাদি অনেক ছত্র আছে যা কাব্য হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু হাংরি চিন্তার অনুকূলে Direct প্রকাশ ভঙ্গীকে গ্রহণ না করে পুরোনো প্যাটার্ণকেই আশ্রয় করেছে।

৩. আপনাদের কবিতার মধ্যে নিজেদের চলাফেরার, আচার ও আহারের একটি নিষিদ্ধ (?) সমাজ নির্মান করেছেন। অভিজ্ঞতা সংগ্রহের পথঘাট, অনুপান, অনুসঙ্গ ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকেরই একরকম। আপনাদের আক্রমণের লক্ষ্য, প্রতিরোধের চরিত্র, আপনাদের ভয় এবং

পরিমানবোধ ; প্রেম, সংসার, পিতা-মাতা ভাই-বন্ধু সম্পর্কে ধারণা—সবকিছুই কিন্তু পরস্পরের রচনায় একই ধরনের। আপনারা কি এক ধরনের সমাজের উপর আঘাত করে অপর এক ধরনের সমাজ-গঠনের কর্মী? বলবেন, সমাজের ভণ্ড-শাসন, পুলিশী সন্ত্রাস, চতুর্দিকের বৈনাশিক সম্পর্ক আপনাদের একত্রিত করে এক কোণে ঠেসে ধরেছিল, সেখানকার জীবন যাপন তাই কিছুকাল একরকম হতে বাধ্য—তাহলেও আপনারা প্রত্যেকেই রিয়্যাকশনে স্বতন্ত্র। অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য আপনাদের কাছে, তবে তা যথেষ্ট তীব্র এবং উল্লেখযোগ্যভাবে স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। প্রকাশগতভাবে পার্থক্য অবশ্য লক্ষণীয়। আপনাদের প্রত্যেকেই মুখ্যত নারী (ভুল প্রেমিকা, বেশ্যা, চারদিকের যুবতীরা) এবং মদ্যপান এই দুই সামগ্রীকে তান্ত্রিক মতে গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতস্তত অসংখ্য প্রমাণে দেখানো যায়, এ-প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়ার দিক থেকেও আপনারা—(১) যৌনতাই নারীর একমাত্র রহস্য, (২) যৌনতা দাসত্ব ও নিয়তি, (৩) যৌনতা আত্মার ভ্রমণ ও বিশ্রাম, (৪) যৌনতা ক্লেদ ও চন্দন (৪) ক্রমাগত মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ, (৫) সন্ত্রাস (৬) মদ্যপানের মধ্য দিয়ে কনসাস লেভেল ভাঙ্গার উদ্যোগ এবং বোতলকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ—ইত্যাদি ভাব প্রকাশে সমধর্মী। চতুর্দিকে আঘাত করার গর্জন রয়েছে কিন্তু সেটা কীভাবে হবে তা বোঝা শক্ত, কারণ যে আচার বিধি কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে তাতে যৌনতা এবং স্নায়বিক উত্তেজনার অঞ্চলটুকুতেই কেবল জাগরণের পরিচয় পাই। যে-অসহায় জন্মের জন্য পিতা মাতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বাধ্যতা বশ্যতা ইত্যাদি দায়ী তার বিরুদ্ধে তেমন প্রচণ্ড আক্রমণ কিংবা সত্যোদ্ঘাটন ঘটছে না। সমাজের চতুর্দিকের মূঢ়তা বা অন্যায় সম্পর্কে আপনারা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সক্রিয় নন, তবে লিখে মনোভাব জানিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের লেখা তো কার্যক্রমেরই ইস্তাহার। আপনারা আগে নিজেকে ব্যবহার করতে চান, তার পরে লেখা ; আগে ঘটানো পরে লেখায় তার সংবাদ জ্ঞাপন। এদিক থেকে ভাবলে আপনাদের অভিজ্ঞতার অভিযান এবং পর্যটন মাত্র দুএকটি পথেই কি বারংবার ভ্রাম্যমান নয়। একি পথের মোহ—সেই পুরোনো বুর্জোয়া আসক্তি? আমি বলতে চাই আপনাদের 'রিচ্যুয়ালস' ব্যাপকতা এবং বৈচিত্র্য এলেই দুর্দান্ত হয়ে উঠবে, না-হলে বাড়ির পাশের ডোবাটাকে একদিন সমুদ্র, সমুদ্র বলে চেঁচিয়ে উঠে দৃষ্টি আর বোধের বিপুল খঞ্জতা প্রায় ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করার মতো শোনাবে। কোনোরকম উপদেশের কণ্ঠে কথাগুলো বলছি না—আপনাদের জীবনভঙ্গী এবং রচনায় নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সৎ থাকতে গেলে এই ব্যাপক Rituals এর প্রয়োজন আছে বলেই, বলেছি। Genet এর জীবন এই অর্থে রিচ্যুয়ালস-এরই পুঞ্জীভূত হুংকার।

৪. এই প্রসঙ্গেই রাজনীতি সম্পর্কিত প্রশ্নটি আসে। অর্থাৎ Responsibility-র প্রশ্ন। আপনারা কেবল নিজেদের সম্পর্কেই রেসপনসিবল। আপত্তি নেই। কী বুর্জোয়া কী কমিউনিস্ট রাজনীতি মানেই আপনাদের কাছে ধূর্ত প্রভুত্বের নজির। ব্যাপারটাকে আপনারা হয়তো ব্যক্তিস্বাধীনতা অপহরণের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। কিন্তু যে কোনোভাবেই হোক আপনারা রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের মধ্যেই আছেন, এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবর্তনের চিত্রও লক্ষ করছেন। অতএব রাজনীতি একটা বিপুল শক্তি—পৃথিবীকে আপনাদের অনিচ্ছা এবং উদাসীনতা সত্ত্বেও পালটে দিচ্ছে, এবং আপনাকেও আপনার ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও তার পরিমণ্ডল ও প্রভাবের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আধুনিক মানুষ যে জাতীয় উপেক্ষা নিয়ে আছে, বর্তমানে ঈশ্বর রাজনীতি সম্পর্কে সেই উদাসীনতা সম্ভব কি? আপনাদের লেখায় বর্তমান যুগের সর্ব নিয়ন্তা রাজনীতি সম্পর্কে মতামত তেমন সুগঠিত স্পষ্ট এবং সোচ্চার নয়। যে ব্যাপারে প্রচণ্ড রি-অ্যাক্টেড হবার প্রয়োজন ছিল, সেখানে আপনারা মোটামুটি চুপচাপ।

কেন? রিয়্যাকসন নেই কেন?

৫. আপনাদের শব্দ প্রয়োগ সাহসী। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে কিছু অশ্লীল শব্দকে সকলে মিলে যেন প্রচারের মতো করেই ব্যবহার করছেন। এতে এক ধরনের সামাজিক মূঢ়তার অবসান হতে পারে, কিন্তু আপনাদের এই অভিযান অনেকটা আন্দোলনের মতো লাগে। আপনারাতো নিজেদের প্রকাশ করতে পারলেই খুশি, বিভিন্ন শব্দের উপর সাধারণের সংস্কার বা কুসংস্কার ঘোচানোর সংশোধনবাদে কিছুটা উৎসাহও যেন লক্ষ করি। ধরা গেল, গুটিকত শব্দকে মর্যাদা দান করা গেল—তাতে জীবনের কী এলো গেল। আপনারা প্রকারান্তরে সেই প্রকাশতন্ত্রের কনভেনশনের মাহাত্ম্য সম্পর্কেই সচেতনতা দেখাচ্ছেন না কি। শব্দ আপনাকে টেনে তুলবে না শব্দের ঘাড় ধরে আপনি দৌড় করাবেন? এতো আপনাদেরই বিশ্বাসের কথা। তাই যখন বলেন, নির্বিচারে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তখন আমার হাসি পায় এই ভেবে যে, জীবনকে ব্যবহার করার আগেই অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের পূর্বজ সিদ্ধান্ত আপনাদের অবেচতনে গাঁথা আছে—এবং এক অর্থে সেই শিল্পগত কনভেনশন অর্থাৎ আগে তত্ত্ব পরে জীবন ইত্যাদি মূঢ়তা এখনও কিছু ছুঁয়ে আছে।

৬. তাছাড়া রচনার মধ্যে প্রায়শই বিলাপ এবং অস্থির আর্তনাদের কাতরধ্বনি শোনা যায়। কেন? অভিজ্ঞতাকে উদাসীন বুকে নিতেই তো আপনারা চান। সত্যকে নিষ্ঠুর হলেও ঋজুভাবে গ্রহণের কথা আপনারা বলেন। যে মুহূর্তে Truth আপনাদের অভিজ্ঞতায় ঢুকছে তখন তো প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ ঘটা উচিত। নিতান্ত লৌকিক হা-হুতাশ সেখানে বেমানান নয় কি? আফসোস, কাতরতা, ছটফটিয়ে বেদনার ঢেউ তোলা, ব্যর্থ প্রেম সম্পর্কে খেদোক্তি, প্রেমহীনতা সম্পর্কে হাহাকার, ইত্যাদি কেমন পানসে লাগে। মলয়ের জখম এবং অমীমাংসিত সুভায় বহু স্পষ্ট লাইন, জোরালো প্রয়োগ, প্রখর, শব্দ শক্তি, সাহসী উচ্চারণ আছে কিন্তু একটু ভেবে দেখুন সব মিলিয়ে একটি দীর্ঘায়ত লৌকিক কান্নার মতো শোনায়। শোকগ্রস্ত মা মৃত সন্তান সম্পর্কে কোনো এক'টা কথা বারবার বলে যেমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ কায়দায় কাঁদে, এও অনেকটা তেমনি। রবারের দড়ি টানতে টানতে লম্বা করে প্রায় ছিঁড়ে ফেলে আরকি, কিন্তু বই শেষ হলে মনে হয়, দড়িটা লাফিয়ে তার প্রাচীন খর্বতায় ফিরে গেছে। গ্রন্থদুটিতে মলয় এক্সেসিভালি ইমোসনাল, অনেকটা শব্দ নিয়ে 'ওরেটরি' করার প্রচেষ্টা, একই সেন্টারে লাটিমের মতো আল বসিয়ে অনর্থক ঘুরছে। অভিজ্ঞতার ভ্রাম্যমানতা, ইমোসনের ভাঁজ খুলে খুলে ছড়িয়ে যাওয়ায় তৃপ্তি খুঁজেছে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা বলা অপেক্ষা আবেগ এবং অনুভূতি প্রাধান্য পেয়েছে। কোনোক্রমে একবার রিঅ্যাক্টেড হলেই মলয় যে কবিদের আক্রমণ করেন, তাদের ধর্ম গ্রহণ করেন, তবে প্রকাশে ও স্বাদে কিন্তু পার্থক্য স্পষ্ট। শব্দ এবং ভাষা নতুন অভিজ্ঞতার রিচুয়ালস না দেখিয়ে তার আহত অনুভূতির আলাপ ও বিস্তারের প্রকাশে মগ্ন হয়েছেন। এদিক থেকে শৈলেশ্বরকে তাদের জীবনভঙ্গীর বিন্দুতে যথেষ্ট স্থিত বলে মনে হয়েছে। নিজেকে ব্যবহার করা এবং সেই প্রত্যক্ষতার গর্ভমন্থন করে নিজের জন্মগ্রহণের ধারাবিবরণী নিজেই প্রকাশ করতে করতে লেখায় আত্মপ্রকাশ তাঁর মধ্যে যথেষ্ট নিষ্ঠায় বর্তমান। তিনি সাহসী, ধীর, গভীরতা পছন্দ করেন, চিন্তাপ্রবণ রচনাতেও দক্ষ। 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' পড়ে বহু জায়গা ভালো লাগার কারণ আছে। ধর্ম, উদাসীনতা, যৌনতা প্রেম, বন্ধুত্ব, সমাজ ইত্যাদি শব্দগুলো তিনি ছেনেছুনে দেখছেন খুব ঠান্ডা মাথায় অথচ শরীরের রক্তের গরম ফুরিয়ে দিচ্ছেন না। তবে সামগ্রিকভাবে এই জেনারেশনের মূল বক্তব্য সম্পর্কে আমার যে প্রশ্ন তা শৈলেশ্বরের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সুবো-কে আমার কিছুটা সেন্টিমেন্টাল মনে হয়—কথাটা অসদর্থে ব্যবহার করছি না। তার মধ্যে

আক্ষেপোক্তির দিকটা বড়ো বেশি ভারী। বিষাদের মন্থরতায় প্রায়শ সে নুয়ে আছে। কবিত্বের প্রতি প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেনি। ধ্বংসের ভয়, ঠান্ডা হয়ে যাবার ভয়, নৈমিত্তিক যান্ত্রিকতার পেষণ, সাংঘাতিক মৃত্যুর হ্যালিউসিনেশন ইত্যাদির মধ্যে সুবোর অস্থিরতা, যন্ত্রণায় ছিন্ন আর্তনাদ নেশার অঘোরপন্থী সাহচর্যে এবং আত্মিক উন্মাদনায় বহুক্ষেত্রেই প্রচণ্ডতা পেয়েছে। প্রদীপের চর্মরোগ গ্রন্থের মলাটে ওর দুই পা ফাঁক দাঁড়ানো ছবিটা যেন ওর স্বভাবের 'ইমেজ'। যেন ও সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চোখ উঁচু দিকে কেন—উর্দ্ধে তো কেবল আকাশ এবং ভাবনা অনুভবের চওড়া শূন্যতা জীবন-ভোগের পরবর্তী রোমন্থন চিত্র কি? ওর অজান্তে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কিছু পালিয়ে যাবে না তো? গোল কিপারের মতো দুই গোড়ালি জুড়ে একটু ঝুঁকে কোনো মারাত্মক গ্রাস কাট সট ধরার ভঙ্গী থাকলে কেমন হতো? না তার দরকার নেই। কারণ ওই প্রতিরোধের সতর্কতা ওর লেখায় আছে। প্রদীপ মুখ্যত সভ্যতা, শহর এবং যৌনতার ভণ্ডামিতে উচ্চকিত এবং প্রতিরোধ সশস্ত্র। জন্ম প্রসঙ্গে জননী ও পিতা তার কাছে সমালোচ্য—বোধহয় হাংরি লেখকদের মধ্যে প্রদীপই এ-ব্যাপারে সব থেকে বেশি সতর্ক। এবং এই সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতা প্রকাশে প্রদীপ শব্দকে নিদারুণ আর্তিতে আলিঙ্গন করে বলে ওঠে ঃ

> আমি শব্দের ভেতর ফেটে যাই
> শব্দের ভেতর গলিত আত্মা বিষাক্ত করে শহর
> শব্দের ভিতর আমি বোবা হয়ে যাচ্ছি
> শব্দের ভিতর আমি হোহো শব্দে দেখি
> একটা মৃত বেড়াল প্রস্রাব থেকে স্বর্গের নিশান দুলিয়ে ওঠে...

১৯৬৮ থেকে হাংরি জেনারেশন পতাকায় নতুন রঙ করে ওড়াতে চাইছে—উড্ডীন পতাকার গমন পথ লক্ষ করব।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই লেখায় হাংরি লেখকদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—যা হাংরি জেনারেশনের লেখকদের জীবন ও লেখার সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন হাংরি লেখকের এ্যাটিচুড, বুর্জোয়া শিল্পের সঙ্গে হাংরি লেখার তফাৎ ; ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি একজন হাংরি লেখকের কাছ থেকে কতটা দূরে,—অভিজ্ঞতার সরাসরি প্রকাশ বলতে কী বোঝানো হয়েছে—এইসব মূল বিষয়ে আলোচনা পাঠক শৈলেশ্বর ঘোষের 'যে কেউ আমার/আমাদের লেখা পড়বে'—লেখায় পাবেন।

—সম্পাদক।

শৈলেশ্বর ঘোষ

আমার পেছনে কে?

প্রত্যেকে ঘুমিয়ে পড়লে ১২টার পর আমার মাঝরাত
প্রতিটি বন্ধ দরজায় আমি শুনতে চাই যদি কোনো গান হয়
যদি অপমান বিশ্বাসহন্তা নিয়ে কোনো দরবার
এদিকে বেশ্যাবাড়ির ঘুলঘুলি এখনও বন্ধ হয়নি
ভালোবাসা ও মৃত্যুর মধ্যে হাতছানি দেখা যায়
জোচ্চোর মাতাল নামাবলী লুকিয়ে সাধু কেউ থেকে গেছে ওখানে
বা হয়তো এইসব মেয়েদের বাজার কলকাতার
'মহিলা'দের হাতে খানিকটা চলে গেছে—মেয়েদের
ভালো লাগছে না আমার—অপারেশন টেবিলে কারও
সংগে শুতে ভালো লাগে না, প্রতিবার ন্যাংটো হয়ে
একইভাবে একই কাজ—অবশ্য সহবাসে আমার কোনো
ক্ষতি হয়নি, কিন্তু মেয়েরা নিজেদের মাগী বলে ডাকে বলে
আমার স্বপ্ন চাঁদের মতো ভেসে ওঠে
কারও সংগেই আমার খাপ খাচ্ছে না
মদের মতো আমি এ শরীর উড়িয়ে দিতে চাই
বলতে চাই, হবে নাকি? বা মাসিক হয়ে থাকলে
বিরক্ত কোরো না আমাকে

মানুষ মরে গেছে, আমরা মরে গেছি, ত্রিবেদী মালতি
মরে গেছে—মানুষ মরে গেছে
সেনার বেশে সে আজ মশাল নিয়ে যায়
সমকামী মাতাদের শিস্ দিতে ভয় পায়
মানুষ ঘুমের ঘোরে লিঙ্গে হাত দেয়
নিজেকে বিক্রি করে অন্যকে বেশ্যা বলে
মানুষ নিজের কলিজা ফুটো করে এবং আমাকে
মাতাল দেখে হো হো করে হাসে
নোংরা বলে কবিতার উপর পেচ্ছাপ করে
ঘুমাতে পারে না বলে ধর্ষণ করে
ঈশ্বরের যৌনাঙ্গ চিনতে না পেরে

ঈশ্বরের ছবি টানিয়ে রাখে
মেয়েদের নষ্ট করে এবং নষ্টা বলে
নষ্টমানুষ আমার ভালো লাগে—
ধ্বংস মৃত্যুর উপহাস ছোটো জাতের জন্য করুণা
আত্মার জন্য কোনো আইন মানি না আমি
আমার অপরাধ এ বিছানায় কোনো ভূমিকা থাকে না আমার
কারণ আমাদের মৃত্যু মানে তো এই যে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে
তবু চমকপ্রদ কিছু এর মধ্যে থেকে যায়
যেমন যোনির গর্তে সিফিলিসের বিষ চাই
এবং বাঁচার ওষুধ চাই
যেমন দণ্ডাজ্ঞা চাই এবং মুক্তির স্মারকলিপ চাই
যেমন ভালোবাসা চাই আবার গর্ভচ্যুতের দুঃখ চাই

আশ্চর্য শান্তিতে ঘুমাচ্ছে সকলে—
মৃত্যুর মুখে বসে যোদ্ধার শান্তি আমি পেয়ে গেছি
বোঝা গেছে নকলদাঁত খুলে রেখে ঘুমোতে হবে
বোঝা গেছে পরমায়ুহীন বিদ্রোহীর মতো হাসতে হবে একবার
প্রেমিকের ৬ ইঞ্চি তার শান্তির বিঘ্ন নয় এও জানা গেছে
ঔরসের উপরের বীর্য আমার কে মুছে ফেলেছে?
আমার কোট খুলে নাও
টেলিফোনের তার কেটে দাও
তামাশার তাস খেলা বন্ধ করো
পুলিশ! পুলিশ! কে আসছে পেছনে
একে বাড়ি পৌঁছে দাও—
খবর দিও নাইট শো থেকে ফিরতে দেরি হবে আমার।

৬ থেকে ৭ এর দিকে

ক্যাথিড্রাল গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হলে আমার খাস চত্বরে
মাস্তুল ভেসে ওঠে
জনমের শব্দে সাম্রাজ্যের পাথর লোহা গুড়া হয়ে যায়
প্রেমিকের বুকে হাত রাখা হলে গোলমাল হয় আমার স্মৃতি
চৌরঙ্গী হোটেলে ভালোবাসা নষ্ট হলে সাঁওতাল পল্লীতে ডোবে
আদিবাসী সূর্য
গোপন বাগানের ফুল ঈশ্বরের দিকে ছুঁড়ে দিলে
হাত বোমার মতো ফাটে

গত শতাব্দীর রাজার মতো এক বিলাসী ভিক্ষুক আমাকে বলেছিল
তার স্বপ্নের কথা
বিজয় মিছিলের চিৎকার আমার কাছে পরাস্তের শোক মনে হয়
বিকেল ৫টার সুপার মার্কেট নিষিদ্ধ যৌনাঙ্গের মতো টেনে নেয়
এয়ারকন্ডিশান বাথরুমে কোনো শব্দ নাই
মানুষ ক্রেতা নাই
শৈশবের জলছবি নাই
এক রাত্রির বেগমের দারোয়ান আমাকে চিনতে না পেরে
৬ এর বদলে ৭নং বাড়ির দিকে এগিয়ে দেয়!

সুবার্বান এনকোয়ারি

যোনির লাল মুখ
মন্দিরের দরজা নিচু জবাফুলের মতো কড়া বদরক্ত
হা-করে আছে
আমার একজন্মের রক্তে ভেসে যায় মায়ের আঁতুর
দেখা যাচ্ছে আলো, পড়ে আছে পীত চাদর
পাছার টেরিলিন তুলে দিয়ে বারবার
উত্তেজিত ফিরে আসা
সামনে ২নং প্ল্যাটফর্ম
হাওড়া স্টেশন
৩৩৩০ মিটার দূরে নিমতলা—ঘুষ নিয়ে স্বর্গে
পাঠাচ্ছে ডোম
আমি প্রাইভেট ট্যাক্সির সিটে রসিদ ফেলে এলাম
সটান গির্জার মধ্যে একদিন আমার জন্মের প্রসঙ্গ খুলে যায়
এক কপালের পাঠ ঢুকে যায় মদের দোকানে
চৌরঙ্গীর মাঝরাতে ব্রিজময়দানের থাম কাত হয়ে আসে
১০ টাকা মেয়ের উলে হাত দিয়ে চমকে উঠিনি আমি

গঙ্গার জলে ট্রেনের আলো,—এসব নীলামের ডাক
আমার আত্মার কাছে পৌছায় না
দেখি আমি সহবাসের বিছানা সমুদ্রের মতো জেগে ওঠে
দেখি গায়ের গেঞ্জি অব্দি ভিজে উঠেছে আমার
সস্তা সুতি জামার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে
১ জীবন ২ জীবন ৩ জীবন
মনে পড়ে না আমার নেমন্তন্ন চিঠি কেউ নিয়েছিল কিনা
মনে পড়ে না মীরার বুকের গন্ধে পঞ্জিকা পুরাতন

আমাদের স্বাধীন ঝাণ্ডা ফ্যাসিস্ত নির্দেশের মতো
মনে হবে একদিন—
তারকেশ্বরের জল হাতে মীরা টেবিল ল্যাম্পের মতো
এখানে নিভে দেয় তার পুরুষ
আমি দেখেছি ভোর ৪টায় ১৯/১১/৬৭র
১ম ট্রেন ছাড়ছে

প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছাড়াই আমরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছি
মেয়েদের খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ
গেট বন্ধ ১৭ দিক
ছোটো শরীর থেকে মহত্ব বাতকর্মের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে
মানুষ নিজের জীবন ওভালটিনের কৌটায় পেচ্ছাপের মতো
জমিয়ে রাখে
× × নেশার বিজ্ঞাপন
চোখের উপর শীতের রাত
দুজন বাড়তি মানুষের মধ্যে আরেকজন—
সিল্ক দোকানে গড়িয়াহাটার মেয়েরা,
আমি নিশ্চিত পুরুষ লিঙ্গ ছাই করে চলে যাবে
আমি নিশ্চিত মুনাফাখোর শরীরের ভালোবাসা ধরা পড়ে যাবে
আমি নিশ্চিত যোনির নোনতা স্বাধীনতা খেয়ে—
বাইরে সান্ত্রীর পকেটে থেকে গেল জেলখানার চাবি

মনে আছে মুখে নিয়ে চুষতে গিয়ে মেরিনার হিহিমার
১২ টার লাষ্ট কার
জারজ ছেলের দুর্বল ভালোবাসা চেটে খেয়ে
অ্যালসেসিয়ান
ঘুমিয়ে—
বাবুদের ঘরে ঢোকার সময় লাল আলো নীল আলো
তফাৎ থাকে না
সে ঘরে ঢোকার সময় প্রিয়া এসেন্সের গন্ধ
নাকে লেগে আছে আমারও
মাঝরাতে কোনোদিকে সাড়া নাই, তাহলে সবকিছু চুপচাপ
হয়ে যায় একসময়
কুমারী মেয়েদের মতো মৃত্যু কেড়ে নিতে আসে স্বপ্ন
বাসি চায়ের টেবিল
হিম পাউডার
লিলি রেক্স
একঘুমের চোখ না খুলেই আবার ঘুমিয়ে পড়তে

গিয়েছিলাম আমি বিছানার একই উৎপাতে
২নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ৩নং প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার মধ্যে
শেষ হয়ে যায় সবকিছু
কুঁচকির সংক্রামক মুখ অব্দি ছড়িয়ে পড়ে
হ্যা তাই পড়ে, সেজন্য
আপিসের মেয়ের চোখ মারা দেখে
ভুলে গিয়েছিলাম আমিও
বোটানিকাল গার্ডেনের মিলন মন্দির

পিতা তোমার পরমার্থের তল থেকে কার এ লুকানো থাবা
বেরিয়ে পড়ে?
দেখি পুরুষ ড্রাইভার ফুটা হয়ে যায়
হা ঈশ্বর
অবধারিত ভোর ৪ টায় ট্রেন তোমার
২টা বেজে যায় আমার যেতে ইচ্ছা করছে না
ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতো ধৈর্য্যশীল আমার
গজিয়ে ওঠা মাথা খুলে পড়ছে
কবে আমি পেছন দরজায় টোকা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছি
মনে পড়ে না? রক্ত মেহনের জল, স্বপ্নের মধ্যে শরীর
এ্যানাসিনের ৪ আঙ্গুলের মতো
তলিয়ে যায় ন্যাংটো সন্ন্যাসী
মেরিণ ড্রাইভের তাজা প্রেম
ইঁদুরের বাচ্চার মতো ময়দার মধ্যে পড়ে থাকবে

২—১২ মিঃ আমার মনে পড়ছে সব
এক্সপ্রেস ট্রেনের জানালার ধারে
সারা পৃথিবী পাক খাচ্ছে দেখেছিলাম
ক্যাপস্টানের বিজ্ঞাপনের মতো আমার দুর্ভাগ্য জ্বলছে নিভছে
মৃত্যু রাত্রিবাসে ঢাকা শৈশবেব ফুল
আমি দেখতে চাই না।
এত সকালে ডাকবাক্সের তালা খুলছে পিওন
এক জীবনেই ভিক্ষুক হৃদপিণ্ডের ধন তর্পণ জলের মতো
হাত থেকে পড়ে গেল—
ঠিক আমার পেছনেই এখন ঘুমিয়ে নিচ্ছে সীমান্তগামী
মিলিটারি—

রাতের এসেন্স এখনও আমার রুমালে লেগে আছে
১৫ পয়সার বাস আজ স্থানচ্যুত করে দিতে পারে আমাকে

বলতে হয় সব ঠিক- আছে সব ঠিক থাকে
দৈব সহবাস বৈধ ভগবানের লোম
সংশয় মুক্ত এক ভালোবাসার রাত কেটেছিল উনুনের ধারে
জীবন ও মৃত্যু—১ হাজতে আটক থেকে পাশের কয়েদিকে
সন্দেহ করতে জন্মদিনের অতিথি খাতায় সই
দিতে পারি না আমি
এখানের নুনমাটি স্বপ্ন পৃথিবী নিপাত
ব্যর্থ শাস্তির ভয়ে কারাপুলিশের ডাক
খুব সহজভাবে লিখে কেউ আমার নামে দুঃখের টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে
ভাবছি চামড়ার ব্যাগের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ডুরাপ্যাক পুরে নিয়ে
কীভাবে ব্যবহার করতে পারি—

শেষ সহবাস

মানুষের ভালোবাসার মধ্যেই মানুষের মৃত্যু হতে থাকবে
কোনো পুরুষ ক্ষয় করে তার টাকা
কোনো স্ত্রীলোক তার কোমরবিছা ছুড়ে দেবে জলে
আমাদের সমুদ্রের কোনো অর্থ আছে?
শিশুর কান্না, ভিখারির হাসি, বন্দীর ইচ্ছা
ছাড়া পেয়ে আরও কষ্ট পায়,
২০ বা ২৫ বছর যৌনাঙ্গ ব্যবহার করতে হবে আমাকেও
কপালের ঘাম মুছতে হবে
সমকামী ঈশ্বরের ফেস্টুন তুলে নিতে হবে কাঁধে
জয়গান শুনতে হবে, দিতে হবে কল্যাণের ধান বা রূপা
দেখতে হবে ভাইয়ের সংগে বোনের কিছু দরদাম আছে
অন্ধকার ঘরে আমার জীবন বিদ্যুৎ বাল্বের মতো জ্বলে না
আর কোনো শৈশব নাই, পিতার পুরুষানুক্রমিক বিচার নাই
করজোড় বিচারপ্রার্থীর মতো—
৭ কোটি জন্ম দেবতার ফাঁকি বরাহ অবতার
উরুর মধ্যে আমার মেহনের ফুল
আমিও এইভাবে ভালোবাসি
বেঁচে থাকি
এইভাবে মরে যাই
শেষ সহবাস কখনো হয় না বলে দুঃস্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে।

স্বপন চক্রবর্তী

জন্মের সূচনা

বিকেলের ১০০ রৌদ্রকে আমি খুন করেছি,
খুন করেছি আমি আমার সমস্ত প্রেমিকাদের
খুন করেছি ঈশ্বরবাদের অস্তিত্বকে।
জন্মের সমস্ত বীভৎসক্ষণকে আমি
রিকুইজিসন্ করা হাজার গোপন এর আগ্নেয়গিরিতে
নিক্ষেপ করেছি।

এখানে প্রাসঙ্গিক ধূর্ত লম্পট—
লাম্পট্যের আসুরিক শক্তির সর্বশেষ রহস্যে
বেশ্যারও আজ রেহাই নেই,
সাদা রাত্রির অন্ধকারে সূচনা নেয়
জন্মের ক্ষণ।
তবুও আমার মুখের আদলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—
ঈশ্বর, তোমার দেয়া লাম্পট্য আর বেশ্যার গর্ভ।

সমস্ত শর্ত ছিঁড়ে ফেল তুমি
যোনিহীন মাতা ;
স্বামীর ডিপ্রেভিটির এ্যাকশনে
বদরক্তের সাদাকালো মাংসের তালগোল
পাকানো একটি অতিকায় জীব, রিএ্যাকশনে
সুন্দরী রাত্রির কালো ঘাম আর পুঁজ।

১৯৬৯ : টেলিগ্রাম

কতটা বীর্য আমি তোর জননে ঢেলে দেবো
রূপসী, তোর রাঙ্গা ঠোঁটে আবার সেই
অর্থহীন সুর—
আমারও শরীরে পায়রা ঘা গুলিয়ে উঠ্‌ছে
ডান উরুর তলপেটে লাথি মারতে গিয়েই
জীবন/সভ্যতা/এক সঙ্গে হাওয়া

আমার অধঃপতিত কল্পনা একদিন উড়ে গিয়েছিল
শহর বধ্যভূমির দিকে
আমার নামমাত্র আত্মা বিখ্যাত ভাতের থালায়
সজ্ঞান প্রেমিকার সন্ধান পেলো
মুহুর্মুহুঃ রাঙ্গা করাঘাতে খুলে গিয়েছে আমার
নিম্নাঙ্গ—বেগে বেরিয়ে আসে রেডিয়ো
টেলিগ্রাম—টেলিভিশন সেট।
তাবৎ পৃথিবীর এদিক ওদিক ছুটে বেরিয়ে যায়
নৈশরাতের ভয়াবহ টেলিগ্রাম
অদৃশ্য টেলি-প্রিন্টার কবর থেকে মুহূর্তে উঠে আসে
দ্রুত স্কুপ সংবাদ পরিবেশন করে
"তামাম দুনিয়ার সংখ্যালঘু বৃদ্ধি পেয়ে গ্যাছে।"

যুদ্ধ আর বাঁধে না—বসন্ত বাতাসের উদ্দামতা
শিথিল ১ মিনিট
ক্লান্ত কোকিলের রব—ঝড়ের অনুর্ভাষ
আমরা তার মধ্যেই বেঁচে আছি।

সুভাষ ঘোষ

আলফা বিটা গামা

আলফা : এই আমি একজন—সুভাষঘোষ—নিজেকে কখনোই লেখক বলে গণ্য করতে পারিনি—গতকাল পারিনি আজ পারিনি—আগামীকাল কী বলব বলতে পারি না যদিও—তবে ইতিমধ্যে যদি আমার পা একটা খোঁড়া না হয় তাহলে নিজের শাদা কার্ড ওইভাবে দেখাতে পারলেই ভালো লাগবে সবচেয়ে—

এই আমি যেমন, তেমনি আমার বন্ধুরা—প্রদীপসুবোবাসুশৈলেশ—এরা কেউই লেখক কবির পরিচয় চায় না—মানে এরা "উদীয়মান/শক্তিমান কবি/কথাশিল্পী" এইসবকে ইয়ে করে—পরে অবশ্য কী হবে জানি না—যদি ইতিমধ্যে এদের কারো কোনো একটা পা খোঁড়া না হয়—

একজন বলছিল কাল কফিহাউসে—সমরেশবাবু নামে লেখককে আমি তো জানতুম তিনি একজন Social worker পরে আবার সুভাষঘোষ আমাকে—"তিনি একজন পলিটিক্যাল ওয়ারকার—" আমি কাল সেই লোকটাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টায়—'আমি যতদূর জানি তিনি খুব ভালো সোশালওয়ারকার/পলিটিক্যাল কর্মী ও অতিচমৎকার অলিগলির সাংবাদিক—' তিনি খুবই চটে যাচ্ছিলেন—ও আমি তাঁকে—সমরেশবাবুকে কোনোভাবেই লেখক বলছি না বলে, আমাদের খানিক আগে 'প্রীতিপূর্ণ' আবহাওয়ায় যে কফির অর্ডার দেয়া হয়েছিল তা সবশেষে ফিরিয়ে নেন এইভাবে—'আমাকে এখুনি যেতে হবে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম—আমাকে কাগজের অফিসে যেতে হবে এক্ষুনি—একটা খুব জরুরি লেখা পৌঁছে দেয়ার কথা...'

তারপর উঠতে উঠতে 'আচ্ছা, আপনি আমাকে জাঁ জেনে পড়াতে পারেন, সিলিন... হেনরিমিলার হোলো গিয়ে বুর্জোয়া অবসেসানের গু...'

আসলে আমি এতদিন জানতাম—সার্বজনীন ভোট পেয়ে কবি/শিল্পী রবীন্দ্রনাথ (আমি ভারতবর্ষে ২০ বছরে একবারও ভোট দিইনি) এবং আরও জানতুম একজন মানিকবাবু লেখক (বাঙালি ৯৯% পাঠকের অর্থে, আমাদের অর্থে—মানে যে অর্থে আমরা আমাদের লেখক মনে করি না সেই অর্থে তিনি ৭৫% লেখক নন)—কবি জীবনানন্দ (আমাদের অর্থে—অর্থাৎ লেখককবির মুকুট যারা ছেড়ে দিতে চায় সেই অর্থে—পুরুষক্ষমতার দৌড় ও মানবজাতির দূষিত অণ্ডকোষ যারা পরীক্ষা করে দেখতে চায় সেই অর্থে তিনি ৭০% কবি নন)—আমরা জানতুম একজন বঙ্কিমবাবু শিল্পী/ভারতচন্দ্র একজন/একজন কবি চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি—কবি-লেখক কমলকুমার বা মাথার লেখক সন্দীপনবাবু কয়েক পারসেন্ট—অবশ্য আরও একজন থেকে গিয়েছেন—যিনি এতাবৎ পরিচিত কবি ও নাট্যকার হিসেবে—যদিও আমি মনে করি তিনি খুব বেশি পরিমাণে সামাজিক ও খুবই উত্তেজিত অমরত্বের বিষয়ে—কিন্তু এও জানি পরিষ্কার—মাইকেলের বইপুঁথির কথা বাদ দিলে তাঁর ব্যক্তিগত আত্মা সম্পূর্ণভাবে কবিতা ও

নিয়তি ধর্ষিত—তাই আমার প্রস্তাব :

যেকোনো অর্থেই লেখালেখির জগৎ থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ও মিশন কর্মী ও সেক্সপারভারট—নিউরোটিক্স্/egoist/বালক-শিশুর স্মৃতিচারণা/বমি, বালকবেলার বয়স্ক-মানুষের—স্ত্রীশরীর নিয়ে অতিন্যাকামী যাদের অসময়ে বীর্যপাত—এবং স্ত্রীলোকবিষয়ে মরাল, ধর্ম, ডেস্‌পটিজম যারা আরোপ্ করে

—এবং ভালোবাসা যাদের কাছে এই—

কেবল প্লাসের ভেতরে মাইনাস—মাইনাসের ভেতরে প্লাস/প্লাসের ভেতরে মাইনাস/মাইনাসের ভেতরে প্লাস্—

বা এখনও যে পাঠক লেখক লেখা/লেখক বলতে ত্রিভুজ ও ত্রিভুজ নির্মাণ করেন—তাদের আমরা সংবাদপত্রে, বিভিন্ন নিউরো—নার্সিংহোমে, খেলার মাঠে, ক্ষেতখামারে, কলকারখানায়, মনুমেন্টমাঠে ফেরত পাঠাতে চাই—বাবার দেয়া বিয়ের বাসরে বা উদার কোনো মহিলা/বেশ্যার উরুর ফাঁকে—এইজন্যেই যে, এরা এসবে গেলেই সুস্থ হয়ে অনায়াসে ফিরে আসবে—

আমরা এই যারা এসবের বাইরে—তারা তিনপ্রকার বা একই সঙ্গে একপ্রকার সাপের বিষয় খুবই বিভ্রান্ত—মাথার উপরে ফণাতুলে যে সাপ তার বিষয়, পায়ের নীচে যে—আর বুকের ভেতরে—রক্তের ভেতরে নীল ছড়িয়ে খেলা করে যে সাপ—এদের শাস্তির প্রকৃত বাঁশি কী—কে প্রকৃত বেদে, আমি, না কে—ফণার সামনে কী শেকড়/কী পাতা—প্রকৃত প্রতিশেধক কী, প্রকৃত প্রতিষেধক কী

এইসব যখন আমার ভেতর—ক্রমাগত এইসবে যখন আমি, এইসময় একজন **রন্ধনশালা** দেখায় আমায়—একজন **চর্মরোগের** কয়েকটি নমুনা—আর একজন খুব দ্রুত টক্‌টক্ পা ফেলে **"এই যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ" "ঈশ্বরের টেরিলিন/টেরিকট এই যে"**—আমার পিস্ দুইখানা ও **জরায়ুর** একথলি—চোখে জখমের শেষ পর্যায় ও লক্ষ করি তাবৎ বরণডালা বন্যার ভয়াবহ আবর্তে—

তবু আমি, কিছু ফিরিয়ে আনি, সে ক্ষমতা কই—

বাঁশি নাই যে সাবধান করি—

জলপুলিশ নই যে 'রেসকু রেসকু' বলে নৌকা নিয়ে ছুটে যাই—হাত খালি/মাথা ফাঁকা/মাথার উপরই ভাগ—

কোনো ছাতা নেই যে রোদ আটকাই/বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি—শুধু একটা ছাতা থেকে গেলে বৃষ্টির দিনে সেদিন নির্ঘাত প্রেম হয়ে যেত,—জেনেও কেন আমার ছাতা ছিল না/কেন ছিল না—

আমার খালি হাত/মাথা ফাঁকা—রাস্তা হাঁটি, হাঁটা ভালো না লাগলে ট্রাম—ট্রাম যখন ভালো লাগছে না, বাস—বাস থেকে ট্রাম—ট্রাম থেকে বাস—তারপরে পা—ট্রামবাসপা—আর আমি বুঝতে পারি না—টিকিট কিনতে কেন কখনই, কোনোক্ষেত্রেই ভালো লাগে না আমার—পয়সা থাকলেও ইচ্ছে করে না—না থাকলে খুবই বেঁচে যাই—ও যখন টিকিট ফাঁকি দিচ্ছি বলে কন্‌ডাক্টর ননস্টপে ঘণ্টা টেনে নামিয়ে দেয় এবং আমার পিঠের—মাথার উপর টিটকিরি/গিরগিটি—আরামের কুলকুচি ক্রমাগত ছিঁটায় উপস্থিত ভদ্রজনেরা, তখন খুবই ভালো লাগে, আরাম লাগে, আমার প্রায় ৩ দিনের আটকে থাকা পায়খানা পরিষ্কার হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ক্ষিদে পায় অসময়ে—

যদিও লাইনে দাঁড়াতে মোটেই ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমি চাই—প্রচুর খাবার চাই আমি—আমার নানাসময়ের নানা ক্ষিদের খাবার—চাই সামনে পেছনে, বামে দক্ষিণে—যত্রতত্রই জমা থাকুক—কমশক্তির হোক বেশি শক্তির হোক...পচা, ভালো মন্দ যা-ই কিন্তু চাই—প্রচুর, প্রচুর চাই—যেসব খাদ্যের কোনো মেনু হয় না—মেনুতে ধরানো যায় না—কত অজস্র ভ্যারাইটি খাবার—আমার খাবার চাই ও স্বাস্থ্য চাই কিন্তু কর্ডনপ্রথা ভালো লাগে না মোটে/কোনোপ্রকার রেশান্ বা নিয়ন্ত্রণ—চাই এই ঢালাও খাবার—যে যার খাবার ও স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে যাক, চাই আমি—এবং এভাবেই আমি ও দীপকবাবু মুখোমুখি হয়ে যাই—

উনি আমাকে, 'আগামী রোববারে আসুন আমার ওখানে—আটটা ফাটটা নাগাদ চলে আসুন—সারা সকাল/দুপুর কাটানো যায় এইভাবে সারা বিকেল কাটানো যায় এইভাবে...

আমি ওঁর ডাক পেয়ে খুবই বেঁচে যাই—ফ্রি মিল—ফ্র চা—ফ্রি সিগারেট—কদিন কম পয়সা বলে বড়োই ভাবনায় পড়ি—

কিচেনের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে নাকে হুড়হুড় ঢুকে পড়ে মাংস/মাছ/পেঁয়াজ রসুনের কড়াঘ্রাণ—দেখতে দেখতে জিভ জলে ছলছল করে--এবং এখান থেকেই প্রথম দীপকবাবুকে ড্রইংরুমে দেখতে পাই কয়েক পা এগিয়ে লক্ষ্যে উনি ও আর একজন টেবিল চেয়ারে, খুব ঘন হয়ে—আমার চোখের সঙ্গে ওঁর চোখ মেলে কিন্তু ব্যাপার এরকম, যেন উনি আমকে দেখতেই পাননি—ডেকেছিলেন—ভুলেই গিয়েছেন এমনি—

আমার খুবই ভয় হয়—আজ যে নিশ্চয়ই চাই—ফ্রিমিল/ফ্রিচা/ফ্রি সিগারেট/তবু তক্তক মোজাকের উপর স্যানডেল নিয়ে খাওয়া ঠিক কি ঠিক নয়—এসব হতে হতেই কখন নিজেই আমি একটা চেয়ার টেনে ঠিক দীপকবাবুর পাশে—

—শুনুন ইনি হচ্ছেন সমীরণ—সমীরণ সরকার...আর এ-সুভাষ...সমীরণ নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত অনেকখানি নাকের কাছে তোলে—তখন ওর আংটি S ঝকঝক করে—আমি হাত তুলি 'ইঞ্চি ২—খুব সামান্য—আসতেই এই ঝুলবারান্দার শেষ দিকে যে আলসেশিয়ান কান ও লেজ তুলেছিল—আমি বসে পড়তে—সেও লেজ বসায়—কান ও বসায়—বোধহয় আমাকে দেখা ওর শেষ হয়ে যায়—

খুব কাছে থেকে লক্ষ করার সুযোগ হয় দীপকবাবুকে—ইনি বেশ লম্বা—কিন্তু ঠিক রোগা নন্—কানেধার, নাকে চোখে—তবু এই ধারণা ক্রমশই দৃঢ়—নিশ্চিত ইনি চোর কাঁটা—শাড়িতে বিঁধে যান অনায়াসে—অথবা শাড়ি বেঁধে ফেলতে ওস্তাদ ইনি—আর এই সমীরণ লোকটার কী করে অত স্বাস্থ্যই বা,—প্রথমে ঈর্ষা—সন্দেহ পরে,—কেন ওর টেরিলিনের হাওয়াই সার্টের নীচে সোনার চেনে মাদুলি—বোধহয় পাচনপ্রণালী তত সুবিধের না—ওর পুরুচশমার পেছনে, চোখে নাড়িভুঁড়ি দেখি একগাদা—

টেবিলে রাখা ওদের প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরাই—ওরা একমনে কথা বলে—ঝি, রানি চা দেয়—ওরা চা খায় ও মান্ কাফকা বলে—আমি দেখি ঘনঘন, ওদের কবজির কালোগভীর রোমে ঢাকা পড়েছে, ঘড়িতে সময়—সকালের কাগজ—কাপপ্লেটের/গ্লাসের গায়ে জলপরী মাছ নীল,—দেখি ওই আলসেশিয়ান কীরকম অনায়াসে শুতে ও ঘুমুতে পারে—

বেলা তখন ১২ বাজে—ওরা কেবলই ফর্ম টেকনিক বলে—টেবিলের নীচে ডাকাডাকি করে, আমার পেট—রানিঝি কাপ পালটিয়ে আবারও চা দেয়—'নিন্, সুভাষ চা খান, নিন্ সিগারেট ধরান—' চা শেষ করে আবারও সিগারেট ধরাই—কিচেন থেকে হাওয়া আনে পেঁয়াজ রসুনের ঘ্রাণ—ওরা ফশফশ ম্যাচ জ্বালে, সিগারেট ধরায়—মান্‌কাফকা/কাফকামান্ ফর্মস্টাইল-একটানা

চালিয়ে যায়—ইতিমধ্যে ক্যালোরি ক্রমশই নীচে হয় বলে ধরে আসে মাথা,—আর মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে দীপক বাবুর শোবার ঘরে, ভারি পর্দার আড়াল থেকে, ক্যালেন্ডারের ছবি—খুবই সুন্দরী, সবুজের উপর পা আছড়ে পড়ে গিয়েছিল কিংবা ঘুমিয়েছিল—ঠিক বোঝা যায় না—গায়ের কাপড় খুব পাতলা ও সংক্ষেপ—কিন্তু ও এবার প্রায় উলঙ্গ উরু/হাত/পা/আঙুল গ্রীবা/পিঠ চুল চোখ নিয়ে উঠে পড়বে—যেন এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে—যে ভঙ্গিতে কেউ আর কখনোই ছড়িয়ে পড়েনি—এইভাবে ছড়িয়ে পড়বে—যেন আলোমাটি আকাশ ছাড়িয়ে জেনিথ বিন্দুর দিকে চলে যাবে শাঁশাঁ...

আমি তো ওরকমই চাই, খাবার ও স্বাস্থ্যের ভেতর দিয়ে ও তাদের কখন পেছনে ফেলে এরকম জেগে উঠতে, যাতে মৃত্যুও ভয় পায়—

দীপক, 'আচ্ছা সমীর, দেখেছেন ইয়ের নুড ছবি...'

ইয়া...ইয়া...

'রানি, চা'...তখন ওদের কবজির উপর যাকে বলে বারবেলা—সিগারেট ধরাই—ওরাও ধরায় রানি বাসি কাপ সরায় ও নতুন চাইনিজ কাপে চা দেয়—তখন আর একবার—নিন সুভাষ চা খান, সিগারেট ধরান, কিছু বলুন আপনি—কিছু বলার আগেই আবারও ওদের—মান্‌কাফকাফর্ম—স্টাইল টেকনিকধর্ম দর্শন জিজ্ঞাসা—

হঠাৎ ঝিরানি 'মৃত্যুন...' কুকুর মৃত্যুন ঝপাং দাঁড়িয়ে খেতে যায়—খেয়ে দেয়ে ফিরে গা এলিয়ে নুনু চুলকায় একসময় দীপকবাবু কথায় কথায়—আসলে জানেন সমীর, এই খাবারদাবারের ব্যাপারগুলিই কীরকম বিশ্রী—খাওয়া আসলে কোনো ব্যাপারই নয়—এমন বোর্ডসাম্—আমারং তো পরিশ্রমেরই মনে হয়...আপনার এরকম হয় না কখনো—খেতেই ভুল হয়ে গেল...

এ্যাক্‌জাক্‌ট্‌লি...এ্যাকজাক্‌ট্‌লি...

হঠাৎ কী হয়, আমি 'শাট্‌আপ—গলাচিরে চিৎকার করে...কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ি আমি...ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ে...ফুলন্ত নুনুসহ কুকুর মৃত্যুন...কয়েকটা কাপপ্লেট মেঝেয় ভেঙে পড়ে আমার হাতের ঝটকায়...তখন ওরা আমার দিকে...আমি ওদের দিকে...ওরা আমার চোখে...আমি ওদের চোখে...সমীর হাতগুটায়...দীপক বোতাম সাঁটায়...আমি ফিরে যাওয়ার রাস্তা নিই হুইরল দিয়ে দ্রুত...১ সেকেন্ড...২ সেকেন্ড...হঠাৎ কী হয়—আগে দীপক, পরে আমার চোখ থেকে চোখ উঠিয়ে, বসে পড়ে সমীর—'অত উত্তেজিত হবার কী হয়েছে...অত উত্তেজনার কী হয়েছে...'

'ইউ শাটআপ'.. ড্রইংরুম ছেড়ে যাই২/৩ লাফে—যখন কিচেনের কাছে গিয়ে পড়ি—দেখি দুয়ার বন্ধ—কিন্তু কেউ নেই—এদিকে নেই, ওদিকে নেই কিন্তু দোরগোড়ায় দুটো বড়ো ধরনের চামচ দেখি—সিলভারের হতে পারে—স্টেনলেস্ স্টিলেরও বা—এদিক ওদিক তাকিয়ে দুটোই তুলে নিই—চালান করি ট্রাউজারের ফাঁকে—

অথচ একথা ঠিক যে—সিঁড়ি হয়ে নামতে নামতেই বুঝি—এভাবে এক-ফুটো মোকাবেলার পরও ফুটো থেকেই যায়—অথবা বেরিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ আর এক ফুটো—

বিটা : সাড়ে ছয়ের দিকে কফিহাউসে যাই—দরজায় দাঁড়িয়ে চোখফেলি১/২ করে সব টেবিলের উপর—যেমন প্রায় প্রতিদিন ফেলে থাকি আমি—এইভাবে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগোই কাউন্টার অব্দি, একবার দেখে ফেলা টেবিল চেয়ার আবারও খুঁচিয়ে ল্যাট্‌ট্রিনের কাছাকাছি—না—কোনো ডাক ইশারার হাত নেই—চোখমুখ,—ব্যতিক্রম ২/১ দিন ছাড়া—কাউকে না পাওয়াটাই এখন নিয়ম—তবু প্রতিদিনই প্রায় একবার উঁকি মারা—যদি বেরিয়ে পড়ে

আজ' কেউ—চেনা মানুষের মুখ দেখা—এত মুখ—এত মাথা—এত হাত চোখ, অথচ একটাও কেউ নয়—এরকম হয় না কখনো—হঠাৎই কোনো মুখ সামনে—এই ভদ্রলোক/ভদ্রমহিলা আমাকে খুব চেনা—হয়তো তাকে, আগে কখনোই দেখিনি—কথা চোখের বিনিময়ও ছিল না কোনোদিন—অথচ মনে ঠিক যেন নিজেদের লোক—অথবা হবার কথা ছিল নিজেদের বলে—অথচ এখানে কোনো মুখ থেকে এরকম কিছুই আসে না,—প্রত্যেক চেয়ারে টেবিলে এত হাসি/গল্প/ফিস্ ফিস্ শলাপরামর্শ, হা-হা, টেবিল চাপড়ানি—কিছুই ভেতরে ঢোকে না—যে কোনো মুখ চোখ থেকে, আমার চোখ পিছলে পড়ে—

এরকমভাবে চিনতে চাইলেও সময় কাটে কখনো—ভালো লেগেও যায় একদাসময়ে অথবা—গত সামারে যখন বিহারে আমি—এই এক উপসর্গ—যতমুখ দেখি খালি অবাঙালির—কেবলই সব ভিন্ন প্যাটার্ণের—আমার চেনাজানার বাইরের ডায়েগ্রামের—আমি হাঁপিয়ে উঠি—তখন যেমন চেনাজানা আদলের মুখ খুঁজি—আমি বাঙালি বলে, তখন প্রথমে বাঙালি—কোনো বাঙালি মুখ খুঁজে থাকি—

একজনের সঙ্গে আলাপ কাটিহারে, ট্রেনে—আমরা কথা বলে যাই বাঙালি/অবাঙালি, এইভাবে—অথচ একসময় জানাজানি বাঙালি লোকটা—আমি তথ্য হিসেবে শেষপর্যন্ত মেনে নিই যদিও—কিন্তু সে কিছুতেই আমার ভেতর ওইভাবে ঢুকে পড়তে পারে না—যেমন মণিকা কেবিনে আলাপ ছেলেটিকে আমি কিছুতেই কেরালার হলেও—তাকে এইভাবে নিতে পারিনি—আজ এখন পর্যন্ত পারিনি আমি—সে আমার কাছে আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙালি—অবশ্য এসব ব্যাপার ভূগোল ইতিহাস তথ্যের কিছুই এসে যায় না, এক আমার ছাড়া—

সেদিন সুবোর ওখানে খাওয়া খুব বেশি হয়ে যায়—আমাদের ঘরে, খাবার ঢাকা দিয়ে সন্ধের পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে ওর মা—মাস দেড় দুই সুবো এই বাড়িতে—বাইরে খুব বড়ো, ঘাস মরে যাওয়া মাঠ—কিছুদুরে বড়ো বটগাছ—আরও কিছুদুরে পুবপশ্চিম বরাবর বাঁকুড়ার এ্যবড়ো খেবড়ো মাটির উপর কয়েকটা শাল—কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় এখানে ওখানে—এত বড়ো জায়গা জুড়ে লোক মোটে ৪/৫ ঘর—মাঠের শেষে লম্বা ২ তলা হলুদ হাসপাতাল বাড়ি—খোলা, ঘরের দরজা—ঘরে টেবিলে বসে মুখোমুখি হয়ে খেয়ে যাচ্ছি—লক্ষ করছি থেকে থেকেই হাসপাতাল বাড়ির শার্সি ফুঁড়ে কেমনভাবে এরা সহসা বাইরে পড়েই, মাঠে নতুন জীবন হয়ে ছিটকে পড়ে—

'লাস্ট গ্লাস'...সুবোর গলা—যেন লাস্টসাপার—আমি, 'শোন, ডাকো তোমার ওই ইঞ্জিনিয়ারকে—বাগানের তথাকথিত মালিক বলে তোমার সঙ্গে সকাল বেলায় কথা চলছিল—বাগানের পেছনে ওর ৭-বছর, না কবছর—আমার কটা শাদা গোলাপ চেয়ে পাইনি...তুমি জানো যে ও বাগান আমার...?'

'মানে?'

'আমি প্রথম দিন এসে দেখেই চিনি এ বাগান আমার...৭ বছর কী কতদিন আগে ছেড়ে গিয়েছি যে—কতদিন ধরে তৈরি যে...ডেটফেট্ আজ মনে পড়ে না...পৃথিবীর যেখানে যাবে—সমস্ত বাগানই আমার...' হাঁ, বাগান তোমার...ডেট আমার ঠিক...' 'চলো বাগানে...সকালে ফুলচুরির কথা হয়েছিল...চুরির প্রশ্ন কী...আমার বাগান...কত ফুল...কী ফুল চাই তোমার...'

সুবো চটপট পোষাক খোলে...আমার সামনে শিশু ও দাঁড়িয়ে পড়ে...আমিও দ্রুত খুলি ধুতি পাঞ্জাবী গেঞ্জি আন্ডারওয়্যার—

গেট একধাক্কায় খুলে বাগানে ঢুকি—ফুলতুলি আমি ও ওর হাতে দিই—গোলাপ, শাদা

লাল...করবী...যুঁই, কাঠমালী...টগর, গন্ধরাজ, শিউলি একমুঠো...একটা লাল ঝুমকো জবা ওর লিঙ্গের গায়ে বেঁধে দিই...মুখ তুলে দেখি পুরাণ/ধর্মীয় যাত্রার কেউ আমারই সামনে...চুমু খাই সুবোর কপালে...

আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুবো ফুল তোলে ও আমাকে সাজাতে থাকে—আমার ২ কানে ঝুলিয়ে নেয় ফুল—গলায় চুলে কবজিতে বাহুতে, কোমরে,—লিঙ্গে ঝুলিয়ে দেয় বড়ো শিষঅলা লালজবা—

আমি, 'আর শোন, পুকুর পাড়ের যে ১/২ বাড়ি দেখে তোমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল...ও বাড়িতে আমার...যাদের দিয়েছিলুম এখন ওখানে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে—তুমি ইচ্ছে করলেই পেয়ে যাবে ওই বাড়ি...'

গেটের কাছে হঠাৎ সেই ইঞ্জিনিয়ার/তথাকথিত এই বাগানের মালিকের চিৎকারে আমি মুখ তুলি—লোকটা দ্রুত গেট পেরিয়ে আসে—আমি 'গেট আউট আই সে...গে-ট-আ-উ-ট...' লোকটাকে হঠাৎ জাপটে ধরে সুবো—গেটের বাইরে ওদের কী সব কথা হয়—জড়াজড়ি হয়...জড়াজড়ি হয় ও কথা হয়...বাগানের গাছ/ফুলের তদবিরে জেগে যাই আমি—সুবো আমাকে ডাকে একসময়—দেখি লোকটা আর নেই—আমরা গেট বন্ধ করে আস্তে আস্তে ঘরে যাই—

সুবো ঘুমিয়ে গেলে অনেক রাতে নীল আলো জ্বালি—ফুলস্কেপের অর্দ্ধেকের উপর আমার নাম ধাম/মালিকানা পরিচয় বসিয়ে ঝুলিয়ে আসি বাগানের গেটে...

সকালে উঠেই সোজা ল্যাট্রিনে—সেখান থেকে বাথরুম—মুখচোখ ধুয়ে তোয়ালে ঘষতে ঘষতে বাইরে বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিই—সামনে টেবিল—কিছুদূরে ঝুরিনামা, বটগাছ—শালগাছ, মাঠ কিছুটা পেরিয়ে—এসবের গা ঘেঁষে হলুদ হাসপাতাল বাড়ি—কিন্তু আমার শরীরের উপর—চারদিকেই অদ্ভুত রোদ,--এক একদিনের রোদ এমন সব গোলমাল বাধিয়ে দেয় না—মনে হয় না এরকম, এই রোদের সঙ্গে একদিন যেন খুব চেনা হয়েছিল—কবে/কোথায়/কীরকমভাবে/কোন্ পরিস্থিতিতে—হয়তো ঠিক ধরা পড়ে না, তবু কত কী আউলিয়ে দেয়—মনে হয় আজের এই রোদ, আমি যেদিন প্রথম গোপন শরীরে রোম দেখি, সেইদিন ছিল—আমার যুবতীমায়ের শাড়ির কলকাপাড়ে, আঁচলে, কাঁচা কালোচুলে, একদিন—প্রথম যেদিন আমার চুলে, মাঠে বসে বিলিকাটে করুণা—মণিকার সঙ্গে গোয়াবাগানে প্রথম আলাপ যেদিন...

কিন্তু লক্ষ করি সুবো সকাল থেকে আমার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখে না—আমাকে এড়িয়ে চলে বেশ বুঝতে পারি—ইতিমধ্যে ঝি টেবিলে চা বিস্‌কিট রেখে যায়—বিস্‌কিট খেয়ে সিগারেট ধরাই—চা হাতে নিই—তৎক্ষণাৎ আমার সামনে বাগানের গেটের কাছে সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক—চোখে চোখ পড়তে ওর চোখ দপ্ জ্বলে ওঠে—আমার ভীষণ হাসি পায়—মুখ/কাপ থেকে ছলকে পড়ে চা—লোকটা গেটে পৌঁছেই হল্ট করে—এবং আমার উপর আবারও আগুন ফেলে দ্রুত সেই কাগজ, যা আমি গত রাতে ঝুলিয়ে আসি—হাতে নেয়—এবং এবার আমি একটু জোরে হাসতে হাসতেই সেই শাদা কাগজের উপর আমার নামধাম/বাগানের মালিকানাস্বত্ব পরিচয়ের কুচিকুচি লক্ষ করি...

কিন্তু আমি এখানে এই কফিহাউসে, ক্যাশকাউন্টারের সামনে, এত হাসি আলো বিনিময় তর্কবিতর্ক/মুখ চোখ থেকে কিছুই বুঝতে পারি না—কিছুই অনুমান হয় না—মাথা খোলে না—এমনকি তুচ্ছ এরকমও না—

এই লোকটা বাঙালি/বিহারি ও, এ সিন্ধুদেশের, ও অন্ধ্রের, ইউপির এ—বা এরকমও অনুমান

হয় না কখনো—নিশ্চিত চোর এ, ওশালা উঠতি গুণ্ডা, ইনিবুঝি মেয়েলোকের দালাল, মেয়েলোক পটানোয় ওস্তাদ বুঝি বাঁপাশের ইর্নি-হিজড়ের যেমন প্যাটার্ণ, এর ঠিক তেমনিটি—কবি শিল্পী লেখক-টেখকের ফর্মটর্ম বলে বাজারে যা চালু সেরকমে বুঝি ওই টেবিলের উনি...এমন কিছুই না...

আমার ধারণার কোনো প্রতিমুখ জাগে না—লেট্রিনে ঢুকি—যদিও পেচ্ছাপ একেবারে পায়নি...তবু কীরকম যেন, হুট করে আসা ও চলে যাওয়া—দেখানো চাই একটা কিছু করা—এমনি এমনি নয়—পেচ্ছাপ এই কাজ করা—যেন এখানে আমি কেবল ওই জন্যেই এসেছিলাম...

ইসমাইলের ওখানে পানামা কিনি দুটো—একটা বুক পকেটে রেখে বাকিটা দড়ির আগুনে ধরাই—কয়েকপা গিয়েছি হঠাৎ বাঁ কাধের উপর ভারি ওজনের থাবা—অন্যমনস্ক আমি গোটা শরীরে কাঁপি—

ঠোঁট থেকে সবে ধরানো সিগারেট টুপ খসে যায়—সিগারেট ধরতে গিয়ে হাত বাড়াই—হাত শেষে ফুটপাত ছুঁয়ে ফ্যালে—তৎক্ষণাৎ আমার বিকৃত মুখের ঝক্‌ঝক্—আয়নার পালিশ খাওয়া একজোড়া পয়েন্টেড শুর উপর মুখ আমাব—সিগারেট কুড়িয়ে সোজা দাঁড়াই—

—কী সাহিত্যিক, কেমন আছো?

যেন, ও কথা বলে না, যেন বীরেশ বর্দ্ধনের হয়ে তার চকচক চুল কথা বলে, লালটাই, টেরিলিন—টাইটপ্যান্টের টেরিকট বলে—

—শালা খুব ফুটুনি হয়েছে, না?

—মানে?

—কলার ছাড়ো, বাবাগিরি কলিও না—

—আগে কথা উইথড্র করো—

—কলার ছাড়ো—

ধীরেশ আমার গায়ের উপর আরও ঘন হয়—গলার আঙুল বোধহয় আরও শক্ত,—গলার শিরা ফুলে ফেটে যেতে চায়—প্রাণপণে চাপ দিয়েও হাতে ওর একটুও নড়াতে পারি না—কিন্তু অকস্মাৎ আমার মাথা খোলে—

—শোন্ কলার ছাড়, কথা আছে—নিরু মারা গ্যাছে জানিস—

—মানে? 'মানের' সঙ্গে সঙ্গেই ধীরেশের হাত আমার গলা থেকে অবশ পড়ে যায়—চোখ মুখ নিভে যায় ওর—দুহাতে এ্যাটার্চি কেস্ বুকে চেপে, কথা আরও পরিষ্কার করতে বলে,—

যদিও ধীরেশ এবার ফুঁটে যাওয়া কাঁটা তোলার জন্য খুবই ব্যস্ত—কিন্তু আমি এগোই খুব ধীরে

—আমাদের নীরুরে...মানে নথের সেই...অরুণার বোন...ইয়ে মানে...তোর আগের সেই...

—কবে, কী হয়ে...

এইসব উঠে পড়তে ওকে জানিয়ে দিই—এই দিন ২০/২২ হবে...আজকাল যেমন সব হচ্ছে ঘটছে...আগে থেকে তো কিছুই জানা যায় না—গলার ক্যান্সার...

তোর গলাটা একবার চেক করিয়ে নিস না ধীরু—গলায় মাঝে মধ্যে ব্যথাট্যাথা হয় শুনি...

আমার কথার শেষে ওর লালমুখ একেবারে শাদা হয়—দুমড়ে মুচড়ে যায় ধীরু—পচাগোবরের তালের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে ও—হঠাৎ আমাদের পেছনে ট্রামের ঢং ঢং—লাইন থেকে সরে যাই—ট্রাম যখন আমাদের গায়ের সমান্তরাল—ধীরু খুব দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে আমার সঙ্গে

কোনো বিনিময় না করেই ঝুলে পড়ে হ্যান্ডেলে যেন দৈবের পাঠানো এই ট্রাম, ওকে এই মুহূর্তে, সোজা চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে পৌঁছে দেবে—যেন ওরই জন্য এই ট্রাম এসে পড়ে—আমি ওর পেছনে হো-হো করে উঠতে গিয়েই আটকে যাই,—সামনে ওর শাদা করুণ মুখ এসে যায়—

আমি বুঝি না এই খোঁচাখুঁচির কী দরকার—অনিলের কী দরকার—ধীরেশের কী দরকার—বাবা বার্মাসেলের কোনো চেয়ার খালি করে—ছেলে গিয়ে সেই ফাঁকা চেয়ার দখল করে—এইসব নতুন কী আর ঘটিয়ে থাকে—

যখন বাসে উঠি তখনই শুনি কার মুখ থেকে, এটা লাস্টকার—বাস টার্সিনাসে নেমে যেতে, সিট ছেড়ে সবার শেষে নামতে শুরু করি সিঁড়ি হয়ে—হঠাৎ পা হড়কে যায়—তৎক্ষণাৎ কন্‌ডাকটর ধরে ফ্যালে—নিশ্চিত নাক মুখ হাত থেঁতলে যেত...

নেমে পেচ্ছাপ করতে বসে দেখি পাঞ্জাবী পাজামা বমিতে মাখামাখি—তাহলে গিলেকরা পাঞ্জাবীর ওই লোকটার গায়ে পড়েনি বমি—পড়লে নিশ্চিত, এখন বুঝি, ছিঁড়ে দিতো ছাল—লোকটা দোতালায় যখন, নাকে রুমাল, আমাকে লক্ষ্যে রেখে খিস্তি করে—মোদো মাতাল টান ধেনো—এইসব করে তখনই ভীষণ বমি পায়—গলা ওর উপর বাড়াতে গিয়ে বমি কখন যে নিজেরই গায়ে—

এখন হাঁটছি বটে কিন্তু কিছুতেই ঠিকমতো ফেলা যাচ্ছে না পা—কোনো লোক কোথাও চোখে পড়ে না—সিগারেট পানের দোকানে ঝাপ পড়ে গিয়েছে কখন—কখন বন্ধ চণ্ডীর দুপুর, রাতের হোটেল—ট্রাফিক দ্বীপ হা-হা—বটগাছের নীচের রাতের চোলাই—নেপালি পাঞ্জাবির, দাঁড়ানো লড়িগুলোর ফাঁকে, রাত বেশির বোর্ড—গেটে পা দিয়েছি অম্‌নি বুলেট শাঁ শাঁ—

—'শালা এত রাতে মাল খেয়ে বাড়ি ফেরা হচ্ছে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার পিঠের উপর ফুঁড়ে বসে তিনতিনটে ২০-ব্যাটারির টর্চ—ওই বর্শা,—ফোকাস মাটি থেকে আমায় কয়েকফুট চাঁড়িয়ে ওঠায়,—ঠাণ্ডা হিম, অবশ হাত পা—তবু সম্মোহিতের মতো, গেট পেরিয়ে ঘরের দিকে এগোতে থাকি—পিঠে ফুঁড়ে বসা বর্শা ফোকাস ঠ্যালে পেছন থেকে—দ্রুত তালা খুলি ঘরে ঢুকি—আজই প্রথম, নতুন মানুষ হওয়ার বিপদ কী, টের হয়—

যদিও ওদের সঙ্গে,—ওই রাতের যুবাগার্ডদের সঙ্গে—ওরা চণ্ডীর হোটেলে পারিশ্রমিক বাবদ মদ মাংস নিয়ে বসবে যখন আগামীকাল অথবা পরশু যেকোনোদিন দেখা হয়ে যাবে...

লাইট জ্বালিয়ে দ্রুত দরজা বন্ধ করি—পাজামা পাঞ্জাবী টেনেহিঁচড়ে খুলে ফেলি মেঝেয়—লাইট অফ করে আনডারওয়্যার সমেত সোজা বিছানায়—সঙ্গে সঙ্গে পেটে অসহ্য ব্যথা খিঁচুনি—ভীষণ বমি পায়—মুখ বাড়িয়ে মেঝের উপর হড়হড় বমি করি—শুয়ে পড়ি আবারও—ভীষণ হেঁচকি উঠে, কুঁজো থেকে গ্লাসে জল গড়িয়ে খাই—আবারও বমি—খিঁচুনি ব্যথা,—হেঁচকি—জল খাই—বমি আবারও...

বিছানায় গা এলানোর পর ভীষণ ভয় হতে থাকে—কোনো লোক নেই জন নেই...সাড়া শব্দ নেই, না কুকুরের গলা...আলোর নড়াচড়া...পাখি কিংবা গাছপাতা—ধীরুর সেই করুণ মুখ অকস্মাৎ সামনে...করুণ মা মণিকা শিবেন, বন্ধুরা গুলিয়ে যায়...

হেঁচকি ওঠে—শরীর ওঠে না—তবু কোনোরকমে দাঁড় করিয়ে লাইট জ্বালি...হাত বাড়িয়ে কাগজ ও পেন নিই—তারপর মেঝের উপর কাগজ রেখে বাঁকাচোরা, ভাঙা অক্ষরে—

যদি দেখা যায় আমি আগামী ভোর থেকে আর নাই—তাহলে করুণা ও শিবেনকে ডায়েরিতে

টোকা এই-এই ঠিকানায় জানানো যায়....

ঘনঘন শেকল নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙে, চোখ মেলেই দেখি ঘরে অজস্র হলুদ রোদ—ঘরে কানায় কানায় আলো—জামাকাপড়ে হাওয়ার নাড়া-চাড়া—গুনগুন করতে ইচ্ছা হয়—আবারও শেকল, 'ঝি জল...'

দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়ি—তক্ষুণি চোখে, গত রাতের ভাঙা-চোরা অক্ষরে লেখা সেই কাগজ...সামনে ধীরেশ বর্দ্ধনের করুণ মুখ,...আমার ঠোঁটে ঠোঁটে মৃদু হাসি—

ও, তাহলে আমিও এই...

•বাসের অনেক দেরি দেখে সিগারেট ধরাই—সিগারেট অর্দ্ধেক হয়ে এশ্চে এইসময় স্টপে ব্রেক কষে বাস, সিগারেট আর ফেলতে ইচ্ছা করে না, নেকস্ট বাস...আমার বাঁ পাশে ঘন হয়ে কথা বলে যাচ্ছিল এতক্ষণ ছেলে ও মেয়েটা...মেয়েটা দ্রুত বাসে ওঠার আগে, এইখানে, এই সময়েই থাকব কাল...

—ঠিক আছে এই সময়ে এইখানে

—এই সময়ে, এইখানে...

একদিন এইসব আমার ও মণিকার ছিল—আমার জন্য মণিকার—মণিকার জন্য আমার...একদিন দেখা গ্যালো নেই...আমার-মণিকার পরিণতি ওদেরও হবে—কী করে বলা যায়...তবে একথা ঠিক, আজ অপেক্ষা...কাল...পরশু...এখন এইসব...একদিন অপেক্ষা চুকিয়ে দেয়ার জন্যেই অপেক্ষা এখন...

মনে পড়ে কদিন আগে দেখা ৩নং স্টপে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক—কিছুটা গাঁ-শহর ঘেঁষা—কী একটা বিয়ের দিন—পরণে বিয়ের পাঞ্জাবী—জড়িপাড় ধুতি—কপালে গালে চন্দন ফোঁটা—কেমন বোকার মতো একা দাঁড়িয়ে—লাজুক কিছুটা—বছর ৩০/৩২'র ও—সঙ্গে লোক নেই, জন নেই—মুকুট বাঁহাতে—নিজের বিয়ের মুকুট নিজের হাতে—যে মুকুট মাথায় পরা হবে—আমার গোটা শরীর কেঁপে ওঠে—কিন্তু ওর সঙ্গীসাথি কই—ওকে কি একাই আসতে হয়েছে—অথবা ওর লোকজন ওকে রেখে অন্য কোনো কাজে—শেষে আটকে গিয়েছে বিপদে—কে জানে হয়তো ওকে একাই ওই অবস্থায় বিয়ের বাসরে হাজির হতে হবে—কিন্তু ও মাঝেমধ্যে এদিক ওদিক তাকায়—আবারও অসহায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে—কোনো বাস থেমে গেলে ঝুঁকে পড়ে বাসযাত্রীর উপরে—আমার হঠাৎই কেমন ইচ্ছে হয়, ওর সঙ্গী হয়ে পড়ি—কথাবলি বরবেশী লোকটার সঙ্গে—কিন্তু হাতে সময় কম—জরুরি কাজ—স্ট্রপে দাঁড়ায় আমার বাস...

আজও কখনো ওই স্টপে দাঁড়ালে মনে পড়ে মুকুট হাতে অপেক্ষা করা সেই লোকটা...কে জানে,—শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গীসাথি এসে পড়েছিল কি না—

আজ অনেকদিন বাদে ডায়েরি পড়তে গিয়ে চোখে আসে ডায়েরির এই অংশ—সত্যি, এতসব উদ্ভট ব্যাপারও আমার মাথায় আসে— ...কদিন ধরে খুব বিশ্রী সময় কাটে...এত মন খারাপ, খুবই বিষণ্ণ আমি—খাওয়া দাওয়া কিছুই ভালো লাগে না কতদিন, কাজকর্ম—বন্ধুবান্ধব —চলাফেরা মদ—সিগারেট খাই আবারও ছেড়ে দিই—সুপুরি খাই আবারও ছেড়ে দিই—আমাদের অফিসের রিপ্রেজেন্টেটিভ লোকটা গলার ক্যানসারে মারা যাবে আর কদিন বাদেই...এক ছেলে আছে বলে—কোথায়, জানা নেই...কথা এখন একদম প্রায় বোঝা যায় না—যা বলে ফেঁসে যায়—যখন শক্ দেয়া হবে, হাসপাতালের লোক সেই সময় রোগীর জামিনদার হবে—এরকম কোন আপনজন চায়...এই জন্যেই ও অফিসে আসে...কিন্তু কেউই রাজি হয়

না...একজন খোলাবন্দুক বেয়োনেট নিয়ে সোজা আমার বুকের দিকে হু-হু...কিন্তু কোনো প্রতিরোধ নেই...সহ্য করা যায় না...

আমি ইদানীং মাঝেমধ্যে খোঁজ খবর করি—চিন্তা করি—এরকম কোনো মদ,/মেডিসিনের আবিষ্কার, যা আমাকে অনায়াসে নিয়ে যাবে—কিন্তু কীরকমভাবে, টের পাব না—কোথায়, তাও না—কিন্তু সবকিছু আমার জ্ঞান সজ্ঞানের ভেতরে নিঃশব্দে—কাকুতি মিনতি, কাতরানি ছাড়াই ঘটে যাবে...বা এরকম কিছু সেলের আবিষ্কার, যার একটিমাত্র প্রয়োগেই মৃত্যু তৎক্ষণাৎ...কাৎ...খুবই হাস্যকর...তবু এরকম কিছুর অপেক্ষা...

এইসব অপেক্ষা-টপেক্ষা যখন, কদিন হঠাৎ বেশ ভালো থাকা গিয়েছিল...খুব একটা কিছু ভাবা গিয়েছে,—গায়ে ফিনফিন হাওয়া...২৫শে বোশেখ পার্কে গানটার শুনে বাড়ি ফিরছি হঠাৎ আমার চমৎকার ঘরে হুড়মুড় বনমহিষ/জঙ্গীহাতি আমার এই কালমাথা স্মৃতি ঘটনাদুর্ঘটনা...কপাট ভাঙাচোরা...হ্যাঁ আমার অপেক্ষা..ছিল বাবার ও আমার...আমার...কে বলবে এইসব অপেক্ষার দাম শেষ পর্যন্ত কোন্ শিকেয়—কোন্ ঝাঁপিতে তোলা...

রাতে জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ি যাওয়া গ্যালো—'ফাদার সিরিয়াসলি ইল'—যদিও সেই সময় নিজে খুবই অসুস্থ আমি—২/৩ জ্বর, মাথাধরা—তবু 'ফাদার সিরিয়াসলি ইল'—যখন বাড়ি পৌছি, উত্তর শিয়রে বারান্দায় চিত শুয়ে বাবা—ওঁকে ঘিরে মাথার কাছে বড়দা, যিনি আমারই মতো নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম পেয়ে মুঙ্গের থেকে—ভিলাই থেকে সেজদা—ছোটদা তো বাড়িতেই—বাবার চুলে হাত রেখে সেজদা—গীতা বড়দির হাতে—ছোটদির হাতে গঙ্গাজলের কোশাকুশি—বাবার পায়ের শেষে মা—বাবার মুখ শাদা সূচসূচ দাড়িতে এত ভর্তি—চোখ এত ভেতরে, দেখা যায় না—এদের এত ঘনিষ্ঠতা/ঘনিষ্ঠ চোখ, আমার চলাফেরার বাবা যদি একবারও দেখে যেতে পারতো—!

একসময় বামে দক্ষিণে কী খোঁজার চেষ্টা করে বাবা—ঘোলা চোখ ঘুরোয় এদিক ওদিক, অনবরত মাথা, বারবার উঠে বসারও চেষ্টা করে ঠোঁট নাড়ে, বিড়বিড় করে—মাথা দোলায়/চোখ ঘোরে—উঠে বসারও চেষ্টা করে—বাবার শরীরময় অস্বাভাবিক ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়ে—মাননীয় কারো আসার কথা—কিন্তু আস্‌ছে না আসছে না—হঠাৎ এসে পড়ায় যেসব তৎপরতা...

কিন্তু মা দাদা দিদি ওরা বাবার উপর আরও আরও ঝুঁকে পড়ে—বাবার এই ইঙ্গিতগুলি ধরার জন্য ভয়ানক ছটপট করে—বারবার প্রশ্ন করে—কথা বের করার চেষ্টা করে—যেন বাবা এই শেষ মুহূর্তে কোনো গুপ্ত ধন/গুপ্ত কথা ফাঁস করে যাবে—কিন্তু পারছে না—তাই ওরাও পাচ্ছে না—যা পাওয়া গেলে অনায়াসে স্বর্গে যাওয়া যাবে...কিছুই করি না আমি—খুঁটিতে ঠেঁস দিয়ে চুপচাপ থাকি—যদিও বাবাকে বলার ইচ্ছে হয় একবার—বাবা যাকে খুঁজছো, সে আসেনি...সে নেই...

ওরা একসময় কান্নায় ভেঙে পড়ে, আমি বাবার গোটা শরীর ঢেকে দিই শাদা চাদরে—বাবার এই শেষ মুহূর্তে সেই ১৩ বছর আগের সাধু এসে পড়লে, যারজন্য এতদিন অপেক্ষা বাবার, বাবা কী বেঁচে যেত—কি জানি—হয়তো বাবা তাকে দেখেই শুধু, সুস্থ দাঁড়িয়ে পড়ত—তার দেয়া ভস্ম মেশানো ওষুধেরও দরকার পড়তো না বাবার—

ওঁর আর সুস্থ হওয়ার আশা নেই—এইসব জানাজানির পর ৭ বছর আগে ছাড়া গ্যাল ট্রিটমেন্টের সবরকম চেষ্টা—এই ৭ বছর বড়দা ছোটদা সেজদি সেজদা...এরা কেউ-ই আর বাবার কাছে নেই...এমনকি মাকেও প্রায় সময়েই বাবার উপর বিরক্তই দেখি—মানুষের চলাফেরায় অসুবিধে ছাড়া কি আর ফেলনা গাড়িবাড়ি...বাবার পরিধি তখন কেবল ঘর, উঠোন

বারান্দা...বারান্দা, উঠোন, ঘর—কচ্চিৎ কখনো বাহির বাড়ি—খুব বেশি হলে ২/৩ দিনে ১ দিন রাস্তা—আর মুখ প্রায় সব সময়েই বোবা—কার্তিকের শুরু থেকে—গাছে লতায় পাতায় মাটিতে—এমনকি পাখির গলায় শীতের মন্থর নেমে আসে যখন, তখন থেকে শীত না যাওয়া অবদি বাবার যা কিছু, তৎপরতা—চলাফেরা, যা কিছু কথাবার্তা—বাহির বাড়ি/রাস্তা, রাস্তা/বাহির বাড়ি এই সময় ওঁর কড়া পাহারায়--ভোর থেকে সন্ধে—হঠাৎ রাত নেমে আসা অবধি কেবল এই—এ-ই কেবল, ঘর, বাহির রাস্তা/রাস্তা, ঘর বাহির...আর মাঝেমধ্যে ওঁর কাছে ডাক আমার—অর্থাৎ আমি যেন দিনে বারকয় গদাধর বোরেগীর ওখানে খোঁজ খবর করি—মহিম সাধুর আখড়ায়—পাকদিই চৌধুরীবাড়ি কুমোরপাড়া, জেলেপাড়া—আর একটু সজাগ সতর্ক থেকে যাই রাস্তাঘাটে—এমনকি বেরানো কুড়োনোর সময়েও—কেননা সেই ১৩ বছর আগের সাধু—যিনি কলকাতায় এসেছেন, গিয়েছেন, আমাদের বাড়িতে অতিথি কত কতবার—কত কত ধুনিজ্বালা, ছাই ভস্ম, ব্যোমব্যোম চন্দন, গাঁদা—যে কোনোদিন, মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন তো—আর তাঁর আসা মানেই আমাদের বাড়িতে অতিথি হওয়া এবং একদিন যখন শুকতারা উঠিউঠি, বাবার পরণে পট্টবস্ত্র যখন, সেই সময় ওঁর হাতে সাধুজীর দেয়া ছাই ভস্মে মেশানো ওষুধ এক জাতীয়—সেই ওষুধ একবার খাওয়া ও ১৩ বছর আগে ৫ বছর টানা অসুস্থ থেকে যেমন অকস্মাৎ সুস্থ একবার—আবার একবার ওষুধ খাওয়া মাত্রই সুস্থ হয়ে যাওয়া...

এই বিশ্বাসে আজ কত কত বছর উনি—সাধুর দেখা না পেলে আর সুস্থ হওয়া হবে না, —শেষ সময়ে ওঁর ওইসব দেখে আবার ভীষণ কান্না পায়—কিন্তু ওদের সামনে কিছুই করে ওঠা যায় না—

কে জানে, বাবার অপেক্ষা না থাকাই হয়তো ভালো ছিল—নিজের কাছে নিজের থেকে যাওয়াই হয়তো সবচেয়ে ভালো ছিল ওঁর—কোনো প্রকার নির্ভরতা/অপেক্ষা না থাকলেই হয়তো একসময় অসুস্থ হতেন—সুস্থ হয়ে উঠতেন আবারও—আবারও অসুস্থ হতেন—সুস্থ হতেন কখনো—এইভাবে যতদিন...কেবল যে, অপেক্ষাই হয়তো বাবাকে আরও অসুস্থতার দিকে টেনে নিয়ে গ্যালো..এমনও হতে পারে তো, অপেক্ষাই শেষ পর্যন্ত এতদূর টেনে আনতে পেরেছে বাবাকে...না হলে কবে...একবস্ত্রে, খালি হাত, পা মাথা খালি—বাবার মুখাগ্নি হয়—ওঁকে ওঁর অপেক্ষা রেখেই একা চলে যেতে হয়—অপেক্ষাহীন, এ-আমি কোথায়....

গামা : আজকাল প্রায় এরকমই হচ্ছে—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঠিক আগের মতো, তেমন করে বিনিময় নেই—দেখা সাক্ষাৎ ক্রমশই কম—হলেও আর আগের মতো কথা নেই, যখন হয়, যেটুকু মাঝখানে খাল/ডিচ রেখে—আমিও ঠিক লাফিয়ে ওপারে যেতে পারি না—আসে সেও—অথচ ত্রুটি ঠিক কার—ঘাঁটতে গিয়ে পয়েন্ট আউট করি আমিই নিজেকে—

এই তো সেদিন অমিয় এলো—বেশ ফ্রেশ গরম, টগবগ—কিছুবাদেই দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা ও—গরম করতে পারি না, অথচ কত অনায়াসে ঠাণ্ডা করতে পারি একজনকে—

ইদানীং আরও এরকম—এমনকি ছোটোখাটো ভিড় দেখলেই কয়েক হাত দূর দিয়ে চলি—কেমন চমকে উঠি সামান্য বাসব্রেকের শব্দে—যখনই পাশে ফিসফাস্, ৫টা জোয়ান তাগড়াছেলের জটলা যখন—তৎক্ষণাৎ এই দৃঢ় ধারণা আমার ফাইনাল তৈরি হচ্ছে এদেরই হাতে—

আর মাঝরাতের দিকে ঘটে যায় কিছুদিন যাবৎ কীরকম সব বিশ্রী ব্যাপার—আমার ঘরের আশেপাশে, ঘরের ভেতরেও এমনকি অদ্ভুত ধরনের টর্চ/ফোকাস্—হয়তো পড়ে না, আমারই মনের ভুল—এই তো কদিন আগে, ঘুম আসছে না, মশারির ভেতর ছটফট করছি—ওইরকম

কিছু হঠাৎ মশারির ভেতর, তক্ষুনি আমি—'কে কে...' কিন্তু কোথায় কী—কোনো উত্তর না—সাড়াশব্দ না—একদিন তো এরকম হয়েই গ্যালো—বাইরে হঠাৎ অস্পষ্ট আলো/ফোকাস—দ্রুত হাতে রুটি কাটা ভোঁতা ছুরি তুলে নিই—তারপর ক্ষিপ্র হাতে ছিটকিনি খুলেই বাইরে এদিক তাকাই ওদিক তাকাই, সামনে দূরে পেছনে—কোথায় কী, কিছুই না—এসবকে কী বলা হয়, হয়তো ভয়—কীসের ভয়, কিছুই বুঝি না—আর আমি তো ভেতর থেকে ওসব, সত্যি সত্যি চাইও না—করুণার সঙ্গে ব্যাপারগুলি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যা দিন—দিন—ফোন করলে আসে—চিঠি লিখলে—যখন আসে ও, গরম, ছিলছিলভাব নিয়েই চলে আসে—একসঙ্গে বসার কিছু পর থেকেই ওর ঠাণ্ডা হওয়া টের পাই—হাই ওঠে, ওর ওঠে, আমার ওঠে—একসময় চলি, আচ্ছা—আচ্ছা...আর ইদানীং শুরুও হয়েছে আমাদের উকুন বাছাবাছি—বুঝিয়ে এসবই সেই লক্ষণ যখন আরম্ভ করব খোঁড়া—মণিকার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির আগে যা সব হয়ে যাচ্ছিল—করুণার বেলাতেও ওইসব ভাবতে গিয়ে আঁতকে উঠি—তখনই ওকে চিঠি লিখি কিংবা ফোন করি—অথচ চাই একটা কিছু ঘটুক—বিস্ফার, বিস্ফোরণ—উৎপাত জাতীয় যা হোক কিছু—এ-কোথায়, কী এক বিশাল গারবেজের নীচে পড়ে গিয়েছি—অথবা গারবেজ জমে কোথায় স্থির আমার ভেতর—

মদ/গাঁজার ব্যাপারটাই কীরকম ভোঁতা হয়ে আসছে দিন দিন—খেয়ে, না খেয়েও কিছুই খোলে না—কোনো দুয়ার ছিদ্র না—অথচ পাওয়া যায় যদি কোনো চাবি—যাব, কি যাব না—এসব হতে হতেই কখন সন্ধেয় পৌঁছে যাই শিবেনের বাড়ি—চা সিগ্রেট খাওয়া হয়—কথা হয় টুকটাক—একসময় ও, চল, একটু খালাসিটোলায় যাওয়া যাক, অনেকদিন যাওয়া হয় না, এক সঙ্গে...' যদিও আমার যাওয়ার ইচ্ছে মোটেই থাকে না—শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয় ওর পীড়াপীড়িতে—আজ শনিবার, সমস্ত খালাসিটোলা লোকজনে গেঁজে গিয়েছে—উগ্র বেলফুলের গন্ধ, মদ ঘাম গরম...অনেক খোঁজাখুঁজির পর লাস্ট বেঞ্চের কাছে কোণায় জায়গা পাই—গ্লাস, বোতল চানাচুর দেয় মোহন,—আমরা খাওয়া শুরু করি—পুরোনো পাখার ঘরঘর—পরপর কটা গ্লাস ভাঙে কাউন্টারের কাছে—হৈ হৈ—ছুরি বোতল চলবে নাকি—শিবেন ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—কালীদা এসে পড়ায় সবশেষে অবশ্য ২/৩ মিনিটে—ইতিমধ্যে শিবেনের বেশ নেশা হয়—বেশ অল্পেই হয়ে যায় ওর—রুবিদা বলে অল্পে নেশা হওয়া নাকি ভাগ্যের লক্ষণ—কত কত ভাগ্যবান মানুষের দেখা পাওয়া যায়—যার ঘরে, না চাইতেই উচলে ওঠে আলো—হাত না তুললেও কারো জন্য থেমে যায় ননস্টপে বাস—পায়ে কাঁটা ফোঁটার আগেই প্রস্তুত থাকে ১ জন কাঁটা তোলার জন্য—কেউ চাইলেও পায় না—মাথা কোটাকুটি করেও সারা জীবনে প্রেম না—অথচ এক ভাগ্যবানের হাতে প্রেম তুলে দিতে দলবেঁধে আসে মেয়েরা—আর শয়ের দোকানে একদিন মদ খাই যখন—দেখা হয় আর এক ভাগ্যবানের—কেমন অনায়াসে তিনি কথায় কথায়—

তিনি ডাকলেই, তৎক্ষণাৎ হাসি মুখে হাত তুলবেন ইনি প্রস্তুত—আমি, 'তবু নো হেজিটেশান...? উনি—'এই দেখুন না, আমার বন্ধু...মাসদেড়েক আগে, কত রাত অবধি তাঁর বাড়িতে আড্ডা দিলুম, বাড়িতে সকালে ফোন—অফিস বেরোবে এই সময়—উনি আর নেই...কী দাম আছে...?

—তবু ওই বিষয় কখনো কষ্ট, বিষণ্ণতা...। —কেন?

—শুনেছি এই সবই নাকি ভালোবাসা, এ্যাটাচ—মেন্ট, মায়াটায়া আর কি...এই জায়গায় কতদিন থেকে গেলাম, কত কাণ্ড কত কী করে গেলাম...একদিন আর নেই...

আমার কথার পরে ভদ্রলোক যা সব বলেন, মাথায় ঢোকে না—তবে এখনও আমার স্পষ্ট মনে, উনি প্রায় পুরো দেড়পেগ ব্রান্ডি ফেলে দিয়েছিলেন—কেননা অসতর্কে কখন গ্লাসের ভেতর ওঁর সিগারেটের খুব সামান্য ছাই...

একসময় শিবেনের মাথা নুয়ে আসে...ও, কী বলতে চায়—আমি শোনার জন্য প্রস্তুত থাকি না—কিছু বলতেও পারি না আমি—কথা না বের করতে পারায় বড়ো কষ্ট হয়—পেচ্ছাপ করবে বলে একসময় উঠে যায় ও, ২ মিনিট, ১০ মিনিট কাটে...ফিরে আসে না শিবেন, ওর বমি হচ্ছে বলে সন্দেহ হয় কিংবা অসুস্থ বলে—গ্লাস বোতল চাঁট একজনের কেয়ারে রেখে ল্যাট্রিনে যাই—পাই না ওকে, কাউন্টারে যাই, এদিক ওদিক খুঁজি, ডাকাডাকি করি নীচু স্বরে, রাস্তায় খানিক খুঁজেও পাই না, এইভাবে ডেকে এনে ফেলে যাওয়া—আগে আগে খারাপ লাগতো, আজকাল আর তেমন হয় না—

টেবিলে ফিরে আসি—একটা পাঁইট আনাই আবারও—খেতে শুরু করি...কালীদা, 'চলো ভাই...', প্রথম ওয়ার্নিং লাইট অফ, বন্ধ পাখা—১ মিনিট বাদে আবারও পাখা লাইট—আমার সামনে একজন মুখে গ্লাস সমেত প্রথম বেঞ্চে—ঢলে পড়ে মেঝেয় তারপর—শিশু মাইয়ের বোঁটা থেকে খসে গিয়ে টুপ করে ঘুমের ভেতরে...বেয়ারা ওকে বাইরে চালান করে—দুই বন্ধু হঠাৎ আমার ডানপাশে, তর্কেবিতর্কে, এরপর কী করা যাবে, হোয়াট্ নেকস্ট্...কোথায় যাওয়া যাবে—লীলার ওখানে অথবা মাধুরীর ঘরে—মাধুরীর কাছে অথবা লীলার ফ্লাটে—একসময় কেটে পড়ে লীলা মাধুরী/মাধুরী লীলা ধান্দা নিয়ে—

ইতিমধ্যে, আমার ভেতর শুরু হয় কখন পটপট গিঁট খোলা—কখন মন ওজনের ভারি বস্তা/ব্যাগ, কাঁদ মাথা থেকে নেমে যায়—কয়েক টেবল দূরে বন্ধুদের ভেতর কীসব মিটমাট হয়—পরস্পরের হাত ধরে, জড়াজড়ি হয়, চুমুখায়—হেসে ওঠে সবাই কী এক, একই কারণে—কিন্তু কখন আমার গলায় এইসব জড়িয়ে যায়—

...কার্তিকেব মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে...নাচ হবে ঘুরেঘুরে...কীসব অধিকার করে আছে...এড়াতে চাই তারে...খুলির অট্টহাসি...জীবন নেশার মতো নয়...তবু...হয় যদি হয়ে যাক...ভেসে যাক রাজ্য আর...কখন ঘুমিয়ে যায়...একা মাঠের ধারে কে তুমি...প্রস্তুত বিউগল ওই...কিন্তু কন্ডাকটর ছাড়াই বাস কোথায় এ...নয়....হয় যদি...শেষ করে চলে যাব জীবনের...ফুল্ সব সাউন্ড এ্যান্ড...জানিতে চাহি না আর....দেখিবে জীবন কখন খুলে গ্যাছে...লাইট দ্বিতীয়বার নিভে আসে—সেই সঙ্গে পাখা, কার লাস্ট গ্লাস পড়ে যায়, আর 'চলো ভাই' কালীদার, শেষবার মঞ্চ ঘোরে বেলফুলওয়ালা, চাইচাপা, মদ, গন্ধ, বেলফুল ঘাম পাখা অফ লাইট...

কয়েকটা টেবিল দূরে হঠাৎ 'আমার সাধের ভাসুর গো তুমি কেন দেওর হইল্যা না...' ১ গলার সঙ্গে দ্বিতীয় গলা...দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ...উচলে যায় লাইট আবার...ঝাড়ুদার এগিয়ে আসে...কালীদার 'চলো ভাই' তবু ছড়িয়ে পড়ে...কিন্তু ওদের '...সাধের ভাসুর...' তখন গ্রাম থেকে ভিন্নগ্রামে...অল্পবয়সি কেউ, কেউকেউ মাঝবয়সি, ৬০/৭০'র কোঠায় কেউ কেউ...এক লিখিত দলিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে, ওইভাবে ক্রমাগত ওরা, ওদের উৎসাহ দেয় 'হিয়ার হিয়ার' চুটকি/তবলা হাত টেবল্ গ্লাস...কখন তবলায় সুর তোলে আমারও হাত—এতদূর থেকে মেশে ওদের গলার সঙ্গে নিজের গলা—হঠাৎ ডানপাশ থেকে কানে'...এরা এখানে হয় প্রেমে ব্যর্থ হয়ে' তাকাই, আমিই ওদের চোখ ও আঙুলের লক্ষ্য, এরকম অনুমান হয়, মুখ ফিরিয়ে নিই, আবার।...রাজনৈতিক কারণে...ব্যর্থ পারিবারিক...' আমি এখানে প্রকৃতপক্ষে কী কারণে, রহস্যময় ওদের জিজ্ঞেস করতে চেয়েও থেমে যাই—তাকাই 'সাধের ভাসুরে...' ব্যস্ত ওদের

দিকে—ওদের মুখ এবার উপরের দিকে—বৃষ্টির প্রার্থনায় রত মুখ যেমন হয়ে থাকে...ওদের গান সুর এবার ভিন্নসুরে...অকস্মাৎ আমি নৌকাযাত্রা/এক অভিনব জলযাত্রা দেখতে পাই—উপরে মাস্তুলের শব্দ শুনি যাত্রী তারা—এরা যারা এখন কেউ ভাই নয়, বন্ধু নয়, স্বামী পুত্র, বাগদত্ত নয়...কিন্তু যাত্রীরা...এদেরই দিকে, এই জলযাত্রা নৌকাযাত্রার দিকে রুমাল হাতে, পারে, কেউ মা স্ত্রী বোন বাগদত্তা, লাইট তৃতীয়বার অফ, গ্লাস ফাটা, বন্ধ পাখা, আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, ওদের নৌকা, জলযাত্রার দিকে রুমালতুলে ধরি।

বেরিয়ে আসি থালাসিটোলা থেকে এস্‌প্লানেডের দিকে পা বাড়াই, খানিক হাঁটার পর বড়ো ক্লান্ত লাগে, রাতও অনেক, বাস ধরা যাক—দাঁড়াই গির্জার উল্টোদিকের স্টপে—জায়গাটায় আলো অন্ধকার, কী একটা ডালপালায় ঠাঁসা গাছ, চেনা যায় না, একটু বাদে গির্জার ভেতর থেকে মাঝবয়সি দুজন, একে অন্যের কোমর জড়িয়ে স্টপের দিকে,—পরণে অদ্ভুত শাদা, শাদা প্যান্ট, শাদা সার্ট—আমার থেকে সামান্য দূরে খুব ঘন হয়ে কথা বলে—হঠাৎ কানে জুতোর খুটখুট—গির্জা থেকে একজন এ্যাংলো জাতীয় মেয়ে...ওর থাই জুতোর আগে বুক চোখে আসে—আমার আসে, ওদেরও চোখে আসে—ওরা একে অন্যকে ভুলে গিয়ে তাকিয়ে থাকে—ও ২/১ মিনিট বাঁকের রাস্তায় শেষ হয়—ওরা আবার কথা বলে—এসে পড়ে বাস...আমার নয় কিন্তু দ্রুত এগিয়ে যায় বাসের দিকে ওদের একজন, তার আগে,

লেট্ আছ, ফরগেট এ্যান্ড ফরগিভ.../লেট্ আছ্ ফরগেট এ্যান্ড ফরগিভ...দুজনকেই আমার খুব চুমু খাওয়ার ইচ্ছে হয়—বাস ছেড়ে দিতেই নীচের লোকটা চোখমুখ খিঁচিয়ে তোলে, চোয়াল মাড়ি নাক শক্ত হয়...ঘোরে চোখ...একটু আগের সঙ্গীর উদ্দেশ্যে উপরে ওঠে শক্ত মুঠি, হাত...যেন পেছন থেকে তার ঘাড় হঠাৎ মটকিয়ে দেবে...কিছুই বুঝতে পারি না, কিন্তু ওর এই অস্বাভাবিকতায় হঠাৎ হো-হো হেসে উঠি...লোকটা এবার আমাকে লক্ষ্য করে গোঁ-গোঁ করে...কিন্তু কিছুর আগেই আমাদের মাঝখানে খ্যাঁচ ট্রাম এসে পড়ে....

ফালগুনী রায়

মা, আমি আর তোমাদের অভিজাত সমাজের মাজাঘষা বাঁকাহাসি হাসতে পারবো না করুণাঘন ঈশ্বরের ক্যালানেকেষ্ট.শাদা দাঁত নিয়ে শয়তানের মেধাবী চোখ নিয়ে আমি পারবো না রামকৃষ্ণীয় ভঙ্গিতে স্ত্রীকে ব্যবহার করতে মাতৃতান্ত্রিক প্রথায়

চিনির বদলে স্যাকারিন খেয়ে ডায়বেটিসকে ভয় করতে পারবো না আমি পারব না অসুখী লিঙ্গ নিয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার রেজিস্ট্রীর দিন দেবদাস হ'তে খালাসিটোলায়।

আমার লিভার ক্রমশ পচে আসছে আমার পিতামহর সিরোসিস হয়েছিল হেরিডিটি বুঝি না আমি মদ খেয়ে কবিতা পড়ি আমার বাবা পুজোআচ্চার জন্য উপবাস করতেন পাড়ার দাদারা ধর্মের দোহাই দিয়ে দোলের দিন টিপে দ্যান পাড়াতুতো বোনদের মাই

মা বিদেশ ভ্রমণের দিন তোমাদের অভিজাত সমাজের অনেকেই ভদকা খেয়েছেন আমি নির্বিকার তোমার চিতা থেকে ধরাবো চার্মিনার তোমার মৃত্যুর কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে তখন আমি ডাঙার ভূমিকম্প আর জলের বন্যার কথা ভাবি না কুমারী প্রেমিকার শায়ার দড়িতে হাত রেখে আমি বৈষ্ণব পদাবলীর কথা ভাবিনি মা, আমিও মরে যাবো একদিন।

বেলুড় মন্দিরে প্রণামরতা এক বিদেশিনির স্কার্টঢাকা আন্তর্জাতিক পাইথন পাছা দেখে জেগেছিল আমার সীমাহীন যৌনতা মা তোমার যৌনতা আমৃত্যু বাবার স্মৃতির সাথে লেপ্টে থাকবে বলে আমি মাতাল তোমায় ঈর্ষা করছি নিরহংকার নোংরামি নিয়ে লিঙ্গের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অন্যগ্রহের জীব মনে হচ্ছে এখন আমার মুখের ওপর এসে পড়ছে ডুবন্ত সূর্যের আঁচ আর সূর্যাস্তের রং পাখায় মেখে পরিবার পরিকল্পনাহীন পাখির দল ফিরে যাচ্ছে বনলতা সেনের চোখের শান্তিময় নীড়ের দিকে—ডিমে তা দেবার সময় হয়েছে তাদের—

অরণি বসু

অস্থির মগজ ও জেট প্লেন সম্পর্কিত

অগুন্তি চাউনির তাড়া খেতে খেতে
হাওড়া স্টেশনের রোঁওয়াওলা পাঁচিলে হেলান দিয়ে
আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না
একাধিক ইন্‌জিনের শানটিং-এর শব্দ শুনতে শুনতে
সময়মতো খুঁজে না পাওয়া নয়াপয়সা
যতসব আবাল অপোগণ্ডের হৈ-চৈ, কোলাহল ও
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদির ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে।
বস্তুতই এইসব ছেনালিপনা আমার একদম বরদাস্ত হয় না,
তোমার ঠোঁটের তৈরি করা দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপণ আমার ভ্রূকুঁচকে দেয়
অবশ্য হাওড়া স্টেশনে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে
নিঃসঙ্কোচে তুমি অন্যকারোর হাত ধরে মেট্রোর
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে প্রবেশ করতে পারো কিংবা কে জানে
হয়তো বা চটাওঠা কলাই-এর এর বাসন
বহুব্যবহৃত তোমার উরুর ওপর কাউকে মাথা রাখার সুযোগ দিয়ে
তাকেই তোমার চট্‌চটে ভালোবাসা দান করে দিচ্ছো।
ধরা দিতে গিয়েও চড়ুই কিত্‌ কিতের নিপুণ খেলোয়াড়
হাতের নিশ্চিন্ত নাগাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছো কেন?
আমি তো শুধু নিবিড়তার লোভে
জ্বলন্ত শরীর নিয়ে তোমার বাড়ির চৌকাঠে বসে
সদর্পে দেবদূতকেও ফিরিয়ে দিতে পারি।
আমার রক্তে বিষ ঢেলে দিয়ে এখন শীতল হবার ভান করলে
আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না,
পায়ের আওয়াজ শুনে দূর থেকে গন্ধ শোঁকা বেড়াল হয়ে
পালিয়ে আসা আমার পছন্দ নয়
আমি কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই
তোমার আগ্নেয়গিরি-গুহাওলা শাঁসালো শরীরের ওপর
পদ্মের সমস্ত পাপড়ি ছিঁড়ে মধ্যিখানের শাদা শাদা মুড়ি খাবার ইচ্ছে
ধাক্কা মেরে মেরে আমায় সচেতন করে তুলছে।
ভালোবাসার জন্য কিছু রক্তপাত করতেই হবে আমায়,
সমস্ত নীতির মুখে লাথি মেরে
আমার সম্পর্কে তোমায় সজাগ করে দেবো,
অযথা কথার খেলাপ করে আমায় প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলো না
অন্তত নিজের জন্যে আমাকে একটু পবিত্র রক্তপাত করার সুযোগ ও নিবিড়তা দাও।

প্রদীপ চৌধুরী

অধঃপতন—১

আমি এক জন্মের মরুভূমি পেরিয়ে শহরের সবচেয়ে
প্রসিদ্ধ স্কোয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি
মনে হচ্ছে যেন এক গুদামঘরের দারোয়ান—
চারদিকে নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে দোকান
দামি পাথর থেকে ঠিকরে-আসা-আলো অকেজো করে দিচ্ছে
পাথরের চোখ
বার-রেস্তোরাগুলিতে ২২শে জুনের বদগন্ধ
নাকে আসছে
এখানে আঁকাবাঁকা রাস্তায় আমার হনিত-স্বজনদের
পায়ের ছাপ
এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত
সভ্যতার এই আরব্য রজনীতে আমি কোনো প্রকৃত মালিক
দেখতে পাচ্ছি না
ওইসব শিক্ষিত মেয়েছেলেদের তৈরি শরীরের গন্ধ
মুনলাইট, নিয়ন আলো—
আমি একটা নরম চামড়ার বল তুলে নিলাম
এবং তৎপর হাতে চালান করে দিলাম আমার
জেব্রাশার্টের তলায়
"আছিস্ কেউ
এলেম থাকেতো ছিনিয়ে নে, হত্যাকর আমাকে"
আমার বিশাল চিৎকারে প্রতিধ্বনিতে
শহরের ফস্‌ফরাস্ দ্বিগুণ জ্বলে উঠে
দৌড়ে পালিয়ে যেতে যেতে আমার মেরুদণ্ডে শেষবার
শীতল উৎসব শুরু হয়।

অধঃপতন—২

আমরা সবাই এক ভয়ংকর নাইটক্লাবে যাবার জন্যে প্রস্তুত
হয়ে আছি
কুমারীর বুকের মতো অনতিনরম মেঝেতে ফুঁসছে
১ লক্ষ বিষাক্ত সাপ
আদিম জন্তুব কঙ্কালের পিরামিড শহরবাজার—
ধর্মঘট ও গুলি শেষ হবে, এবং আদিম প্রকৃতি গ্রাস করবে
আমাদের প্রিয় শহর।

আমাদের মাংসের জোয়ার শেষ হলে রক্তের জোয়ার শুরু হবে
অন্ধকার আমাদের যাবতীয় হিংসা/ষড়যন্ত্র হাস্যকর করে দেবে
অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার
লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে পারছি না আমরা
রাত্রির পাহারাদারকে ঠেকিয়ে রক্ত আমাদের কাছে আসতে পারছে না
আমাদের নিগ্রো চামড়ার নীচে চিৎকার করছে রক্ত
রক্ত বাঘের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে
বিস্ফারিত বুকে
এখন থেকে ক্যান্সারগ্রস্থ চাঁদ দেখা যায়, অস্পষ্ট

একদিন রক্তই শুধু প্রবাহিত হবে রাস্তায়, আদিম গুহা
এবং ছাদের উপর থেকে রক্ত
স্রোতের মতো ঠেলে-বেরিয়ে-আসা নারীশক্তির ক্লোরিশ
খেয়ে ফেলবে রক্ত
নির্ঘুম বিছানার পাশে গুমরে গুমরে উঠবে, রক্ত

পাণ্ডুর সতীচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলবে
জাহাজ ছাদের ওপর অথবা গলির কোণে
কোলাহল করতে করতে আদিম জঙ্গল তাড়া করছে আমাদের
ধাতুগোলাপ এবং ব্যবহৃত মাংস খুলে পড়ছে
অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার—

১০০ কুমারীর অনুপস্থিতিতে

শব্দে গুঁড়ো হয় দেহ, কিন্তু কাকে দিতে পারি
এই দেহ এই শব্দগুলি
সোনার বেলুনগুলি নষ্ট করে চলে যায়
১০০ কুমারী
পিকনিক রোদের মতো ঘ্রাণ আসে
অসম্ভব হর্ণ দিয়ে চলে যায় ফাল্গুনের
শেষ মালগাড়ি
অন্ধকার দালানের পাশে
১০০ কুমারী তা কি জীবনেরই ধুলি

কেবল আমারই বুকে অপ্রেমের ক্ষত বাড়ে
১০০ কুমারী শব্দ, শব্দহীন
১০০ কুমারী জ্যোৎস্না
খড়ের ঘরের দীর্ঘদিন
নেশাখোর হাড়ে।

শৈলেশ্বর ঘোষ

যে কেউ আমার/আমাদের লেখা পড়বে

আমি কী লিখি, কেন লিখি, কতটা পাঠকদের জন্য কতটা নিজের জন্য, আমার রেসপন্‌সিবিলিটি কী, অমরত্ব নিয়ে আমি ভাবি কিনা, এসমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি দিতে রাজি নই—দেবার মানে হয় না দেবার সময় কোথায়? নিজেকে নিজের কাজে লাগানো ছাড়া অন্যভাবে ব্যবহার করতে আমার জীবন নির্দেশ দেয় না। তবু কিছু কিছু লেখক এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে—তারা যা লেখে তাকে জাস্টিফাই করতে চায় এইভাবে। আমি এভাবে লেখাকে জাস্টিফাই করতে চাই না—সম্ভব নয়—আমি বিশ্বাস করি অমোঘ লেখাগুলির মধ্যেই থেকে যায় সবকিছু—সমস্ত প্রশ্নের অবসান হতে পারে কেবল সেখানেই—সেখানেই একজন জানতে পারে এ লোকটা নিজেকে লেখে, না লিখে এর উপায় নাই তাই লেখে, সে নিজের জন্য লেখে বা এসব অভিজ্ঞতার পরে রেসপনসিবিলিটি একটা অর্থহীন শব্দ, অমরত্ব চূড়ান্ত হাস্যকর—কিন্তু ইতিহাস অভিযোগ করে, বিচার করে—সেই বিচারের সামনে আমাকেও দাঁড়াতে হবে নাকি? হতে পারে—হয়, ইতিহাস হয় গলাধঃকরণ করে না হয় অস্বীকার করে—আমি এর অস্বীকারকেও স্বীকার করি না বলে সে আমাকে দণ্ড দেয়—

যিশু তার দণ্ডদাতার চেয়ে সত্য ছিল—প্রমাণ হয়ে গেছে। বিচারক মাত্রই 'পেড'—বিচারকের সঙ্গে আসামীর সমান-সমান সম্পর্ক থাকে না—বিচারক কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে বসে, যাতে তার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ে—আসামী মাটিতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে—কারণ আমরা জানি নীচে যে থাকে সে...। কোনো বিচারকই ৩য় পক্ষ নয়, আমরা তাকে ৩য় পক্ষ বলে জানি আসলে সে ২য় পক্ষের 'পেড' লোক।

এখন আমি বুঝতে পারি দণ্ড দেয়া হয়ে গেলে—প্রত্যাখ্যান একবার হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিথ্যা—কারণ তা ফেরানো যায় না। মিথ্যা এইজন্য যে মানুষের একজীবন খুবই ছোটো এবং যা কিছু ঘটে যায় তার প্রতিবাদ করলেই তা যে ঘটেছে এটাই শেষ সত্য হয়ে থাকে—আমি বলতে পারি, ওই মুখভঙ্গীটাই দেখতে চেয়েছিলাম, দেখা হয়ে গেল। পরিত্যক্ত শিশুকে সমাজ রাষ্ট্র গ্রহণ করে, করে কিন্তু সে পরিত্যক্ত হয়েছিল এটা মিথ্যা হয়ে যায় না—আমি মনে করি আমি তাদেরই একজন যারা সমাজ রাষ্ট্র মানবযুথের বাইরে কখনো কখনো ছিটকে পড়ে যারা পতিত পাপী হয়ে যায়—যারা ধ্বংস হয়ে যায় যারা এক ইতিহাসের বদলে আর এক ইতিহাসের নায়ক নয় যারা এক অর্থহীনতার বদলে আর এক অর্থহীনতাকে এগিয়ে আনে না—যে মূঢ় অর্থহীনতার মধ্যে আমার জন্ম তার জন্য কাকে আমি দায়ি করি? সবকিছুকেই বা কোনোকিছুকেই নয় কেবল নিজেকে—এই অর্থহীনতার কোনো অর্থই খুঁজে পাই না—একে কেবল কয়েকলক্ষ গুণ বড়ো করে নিজের অর্থহীন ফাঁপা শূন্য চেহারাটা আমি দেখতে চাই—আমি বিশ্বাস করে কোনো কাজ করতে

পারি না, সন্দেহভূত আমাকে দেখার বাইরে অনেক কিছু দেখিয়ে দেয়—আমি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি না—আমি ভালোবেসে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি না—আমি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বাজে, আমার কোনোই দাম নেই—কিছু থাকলেও তা আমি নষ্ট করেছি নষ্ট না করে উপায় নেই—কারণ আমি বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে নিঃস্বের স্বস্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমাকে—আমি যা করি তার কোনো অর্থ আছে কিনা আর ভাবি না, ভাবি না কারণ আমি যা করি তার সবই আমি করি না, যা করা উচিত তা আমি সব করতে পারি না—এসব খুব অন্যায়—কিন্তু বিশ্বাস করুন এসব ভেবে ভেবে আমি আবিষ্কার করিনি এসব আমি বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পারছি—পৃথিবী আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বলেছে—দণ্ড দেয়া হয়েছে, হচ্ছে, হবে—আর এক পক্ষ যে দণ্ড নেয়া ছাড়া কিছুই পায় না, জীবনের অন্য ব্যবহার যারা জানে না মানে না, যারা নিজেকে ছাড়া পৃথিবীর একটি কণাও ব্যবহার করে না। কেউ কেউ মনে করে, জানতে চায় এই সামান্য শক্তি দিয়ে বিশাল বুর্জোয়া। এসটাললিশমেন্টের কতটুকু ছেঁড়া যায়—কিছুটা যায়—বা আপাতভাবে কিছুটা গোলমাল করা ছাড়া কিছু করা যায় না মানুষের শক্তি তো সীমাবদ্ধ—কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্যরকম একবার 'না' বলে ফেললেই হলো—পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারলে সেই ইতিহাস সবটাই নষ্ট হয়ে যায়—সমস্ত ইতিহাসটাই এ্যাকিউজড হয়ে যায়—নিজেকে সম্পূর্ণ শূন্যে রূপান্তরিত করতে পারলেই হলো। কোনো মূল্য কোনো ঈশ্বরই আর থাকে না, 'না' দিয়েই শুরু 'না' দিয়েই শেষ—আমার উত্থান পজিটিভ উত্থান নয় বলে এ ইতিহাস শূন্যের ইতিহাস—শূন্যের 'কলাম' দাঁড়িয়ে পড়লে মানুষ তাকে স্বীকার করতে পারে না—স্বীকার মানে নিজের ধ্বংস নিজে মেনে নেওয়া—আবার অস্বীকারও করতে পারে না—অস্বীকার করা মানেও 'আছে' স্বীকার করা—এ রকম এক চরম ভয়াবহ ম্যালাডির মধ্যে আধুনিক মানুষ এসে পড়েছে—বাংলা দেশে আজ ৩০ বা কম বয়সী অজস্র লেখক এইসব কথাই বলতে চাইছে—অস্বীকার করতে চাইছে—কিন্তু তাদের প্রায় কেউই পরিনাম সম্পর্কে সচেতন নন, ইতিমধ্যে তারা নানান রাস্তায়. এসটাবলিশমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, হয়তো একদিন 'অস্বীকারেরই এসটাবলিশমেন্ট, তৈরি হবে—তাদেরও কাছে আমি ও আমার কতিপয় বন্ধু ঠিক একইভাবে ধিকৃত হব—সমস্ত এসটাবলিশমেন্টেরই বিরোধিতার জন্য—। ইতিহাস এইসব নষ্টভগু মুখোশদের এক গ্রাসে পেটে পুরে নেবে, চিহ্ন মাত্র থাকবে না—বিদ্রোহের মেকিফ্যাসন বুর্জোয়া ভয় পায় না—বরং তাকে প্রথমে বুকে তুলে নেয়—সুধীন দত্ত এজন্যই এসটাবলিশমেন্টের বরপুত্র, জীবনানন্দ দাশ এজন্যই পিষ্ট নিক্ষিপ্ত—এইসব লেখকদের আমি বলতে চাই : একটা সত্যও অন্তত জোরে বলে ফেলুন দেখুন কী ঘটে যায়—সত্যি কী কী ঘটে দেখুন, ১০০০ ভাগের আধভাগ মাত্র দেখা যাক কে কী বলে যারা নিজেদের লেখক বলে মনে করে কবি বলে মনে করে—লোক শেষ পর্যন্ত যাদেরকে লেখক বা কবি নামে ডাকে, প্রেম শ্রদ্ধা দেয় তারা কী বলে, যারা আবার এই ইতিহাসেরই পেচ্ছাপ মাত্র—

১। এইসব অপোগণ্ডের দল নোংরামি করাকেই সাহিত্য বলে মনে করে

২। অশিক্ষিত

৩। বাংলা সাহিত্যে এদের দান এক বালুকণারও বেশি নয়

৪। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক যাদের পুলিশ ভুলভাবে বিদ্রোহী ভাবে

৫। ওঃ এ তো আমেরিকায় ছাপা পত্রিকাগুলির কপি করা মাল

৬। এই উঠতি গুণ্ডাদের এখনই দমন করা উচিৎ

৭। উল্লুকরা শুধু মাস্টারবেট করে

৮। যৌনাঙ্গ পূজক

৯। এদের লেখাকে সাহিত্য মনে করা আর পানের দোকানে লুকিয়ে যা বিক্রি হয় তাকে সাহিত্য মনে করা এক

১০। শূয়ারেরবাচ্চাদের কি মা মাসি নাই

১১। জুতার তলে পিষে দাও কৃমিকীটদের

১২। এদের লেখা ভদ্রলোক পড়তে পারে না

১৩। পুলিশ, পুলিশ কি মরে গেছে

১৪। বাংলা দেশের তরলমতি ছেলেমেয়েদের এরা বিপথে নিয়ে যাচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটামুটি এরকমই বিচারের ভাষা।

একথা ঠিক যে মুখোশে টান দিলে মুখোশধারী ফুঁসে উঠবে, প্রভোক করলে রিএ্যাক্ট করবে—জীবনের সত্য বিন্দুর দিকে যেতে থাকলে যে সচেতনতায় আঘাত পড়ে তা সকলে সহ্য করতে পারে না, ভালো লাগে না—যে পৃথিবীতে সুখ অতি সহজ, একটি মুখোশের দাম যেখানে একটি কানা কড়ির বেশি নয়, ন্যায়পরায়ণ ভণ্ডামি যেখানে সত্য হিসাবে মূল্য পায়, সেখানে যে অস্তিত্ব মূলত একা আলাদা, স্বাধীন হয়ে যাওয়া যার আকাঙ্ক্ষা, নিজের জীবনই যার মুক্তির শখ, শরীরই যার কেবল মাত্র কম্যুনিকেট করে তাকে পৃথিবী বরদাস্ত করতে রাজি নয়, রাজি নয় সমাজ রাষ্ট্র—তাই প্রতিটি মানুষ যখন একা আলাদা হয়ে যেতে থাকে তখনই পৃথিবীর সঙ্গে তার যুদ্ধ শুরু হয়—তাকে ইতিহাস অপরাধী বলে ঘোষণা করে—ঘোরতর এই যুদ্ধের পরমানবিক বিস্ফোরণই সাহিত্য এবং এখানে জীবন ও সাহিত্য এক—কোনো তফাৎ থাকা মানেই কৃত্রিমতাকে মেনে নেওয়া—মানুষের ইতিহাসে অতঃপর এই যুদ্ধের ধারাবিবরণীই থেকে যাবে আর থাকবে প্রতিটি একক যোদ্ধার পরাজয় ও পতনের কাহিনি—'কল্যাণধর্ম' 'মূল্যবোধ' শব্দগুলি কেবল বিচারকই উচ্চারণ করে যাবে—

মোহিত চট্টোপাধ্যায় আমার ও আমার বন্ধুদের লেখা পড়েছেন এবং কিছু জানতে চেয়েছেন—উনি বিচারক নন, সাহিত্যিক কিচিরমিচির ঈর্ষা, ব্যর্থতা বোধ থেকে উনি কিছু বলেননি—বললে ত'র কোনো জবাব পেতেন না—যেমন কিছুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংরিজি সাহিত্যে ক্ষুধিত বংশ' নামক ঈর্ষাকাতর নিজের ব্যর্থতা জনিত সাহিত্যিক কিচিরমিচির এর কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন আমি বোধ করি না—মোহিত রানিং ডগস্ অব এসটাবলিশমেন্টের কেউ একজন নন—তবে তার প্রশ্নগুলির কিছু কিছু হাংরি লেখকদের জীবন এ্যাটিচুড সম্পর্কে পুরা ওয়াকিবহাল না থাকার জন্য এসে পড়েছে বলে মনে হয়েছে আমার—দু-একটি এসেছে ভুল শিক্ষার রাহুগ্রাস থেকে, যা হোক, উনি বলছেন :—

আমরা এক ধরনের কবিতাই লিখছি, এটা শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া পদ্ধতিকেই স্বীকার করা।

না, যা লিখছি আমরা কবিতা হিসাবে তা বুর্জোয়া মেনে নেয় না, মেনে নিলে তারা আমার বই, প্রদীপের বই, বাসুদেবের বই সুভাষের বই সুবোর লেখার আলোচনা করত—

বাংলাদেশে প্রতি বছর যে বেশ কয়েকটি কবিতা সংকলন (বার্ষিক) বের হয় তার কোথাও এদের লেখা চোখে পড়েছে কি আপনার—না, পড়েনি এমনকি 'নোংরা কবিতা' একথাও বলতে সাহস পাচ্ছে না এসটাবলিশমেন্ট—ব্যাপারটা ঘটছে সব জেনেশুনে চোখ বন্ধ করে রাখার মতো নিজেকে এভাবে অন্তত সান্ত্বনা দেওয়া যায়—ভাবনা কি এরকম কিছু তো সত্যিই ঘটেনি, এরকম কিছুর অস্তিত্ব তো সত্যি নাই। মজাটা বেশ উপভোগ্য। দেখুন আমি যা লিখি তার ভাষা শব্দ

ভিশান, রচনা পদ্ধতি কোনোটাই কি বুর্জোয়াকে স্বস্তি দিচ্ছে—দিলে সে ছেড়ে দিত? তার মুখের হাঁ-টা বিরাট, এত জিনিস ঢুকে যাচ্ছে আমিও অনায়াসে ঢুকে যেতাম—এ ছাড়াও জীবনানন্দ দাশের রচনা যেমন একধরনের রচনা, জাঁ জেনের রচনা যেমন একধরনের রচনা, গীতা যেমন একধরনের রচনা, আমি যা লিখি তাও শেষ অবধি এক ধরনের রচনাই হবে, নয় কি? ভালো লোকের চেহারা যেমন খারাপ লোকের চেহারাও তেমনি, তফাৎ কিন্তু অন্যখানে লেখার ব্যাপারেও তাই, তবে 'কবিতা' বা 'গদ্য' এই সব বস্তাপচা শব্দের বদলে বলা উচিৎ আমার প্রস্রাব, আমার পায়খানা, আমার বীর্য, আমার রক্ত—বুর্জোয়ার ডাইনিং হলে ঢোকার আগে পর্যন্ত চেহারাটা সেই রকম রাখতে হয় যাতে দারোয়ান আটকে না দিতে পারে—নষ্ট করা হবে ঢুকে পড়ে—এজন্য লেখার লাইন সাজানো হয়, বইয়ের মলাট দেওয়া হয়,—ইত্যাদি

কিন্তু লেখাকে যে চরম সত্যের উলঙ্গ প্রকাশ বলে মনে করি তার সঙ্গে বুর্জোয়া ধারনার কোনো যোগ আছে কি?—আত্মার উলঙ্গ অবস্থা, স্বাধীন নির্দেশ বুর্জোয়া সহ্য করে না।

লেখার পাঠযোগ্যতার প্রশ্নও থেকে যায়—কোনোভাবেই কম্যুনিকেট করতে না পারলে তা ব্যর্থ—যে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে এ সম্ভাবনা নাই বলা চলে না,—কারণ আমাদের ভাষা সামাজিক নয়—এ ভাষাকে নানানভাবে দুমড়ে মুচড়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় সবক্ষেত্রেই ভাষা তার সামাজিক, অর্থাৎ ব্যবহারিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে—ভাষা হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত মারাত্মক—তবে আমার বা আমার অন্যান্য বন্ধুদের ভাষা ব্যর্থ হয়নি, প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—লেখাকে পাঠযোগ্য করার অর্থ হলো, প্রলুব্ধ করা, প্রলুব্ধ না করতে পারলে প্রোভোক করাও যায় না—

এজন্য এমনকি বুর্জোয়া শিল্পের ব্যবহৃত সিম্বল ইমেজ। (যা আপনি দু-একটি দেখতে পেয়েছেন) থাকতে পারে—থাকবে এইভাবে ঃ বুর্জোয়া যে গ্লাসে সবরত রাখে আমি সেই গ্লাসেই বিষ রাখি। বুর্জোয়ার সৌন্দর্যকে আমি জননের ফুলে রূপান্তরিত করি। আমার হাতে তা নষ্ট হয়ে যায়, বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

সোজাসুজি বলা (Direct expression) কী?

আমার ভাষা চেতনার নৈরাজ্য এবং অবচেতনার গাঢ় রাত্রি প্রকাশ করে—এভাষা direct এবং অজ্ঞাত অন্ধকার থেকে উঠে আসে বলে কোথাও indirect মনে হতে পারে—চেতনা এবং অবচেতনার সংযোজন হলে অভিজ্ঞতা কেবল অভিজ্ঞতাই থাকে না, বোধে রূপান্তরিত হয়—কিন্তু এ বোধ কলঙ্কিত, বামপন্থী, ভয়ংকর শূন্যের ভিতরে টেনে নিয়ে যায়, বুর্জোয়া একে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করে—চরম অভিজ্ঞতার ফল হলে সব লেখাই direct। আমার কাছে স্বপ্নও direct অভিজ্ঞতা এবং সত্য। Indirect লেখা মাথার লেখা যার মধ্যে রক্ত মাংস নাই, রক্ত মাংস ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে সত্য আছে বলে আমি মনে করি না। সব অভিজ্ঞতাই 'আমি খারাপ আছি', 'আমার ঘুম হয়নি' 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'—এ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—লেখায় ওই অবস্থার অভিজ্ঞতা থাকে—মানে আমাদের লেখায়, directness ভাষার যতটা তারচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতার—শেষ পর্যন্ত লেখা রক্ত মাংসের কিনা, তা অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরে কিনা, যদি ধরে তবেই তা direct-স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষলোকের চূড়ান্ত কম্যুনিকেশন হয় যেমন যোনিলিঙ্গের যোগাযোগে তেমনি লেখাও কম্যুনিকেট করে তখনই যখন লেখার মধ্যে দিয়ে এক শরীর আর এক শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে—এই সোজা কম্যুনিকেশনই লেখার directness আমার কাছে।

হাংরি জেনারেশন কি একটি আলাদা সমাজ?

না, কোনো সমাজ গড়ে তোলেনি। নিজের নিজের জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই আলাদা হয়ে আছে এবং হচ্ছে—জৈব অস্তিত্ব টিকিয়ে যতটা স্বাধীনতা নেওয়া যায়, যতদূর জানি প্রত্যেকে নিজ নিজ মতো স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে, প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেকেরই পরাধীনতার মাত্রা বিশেষ আছে—তবে আমাদের বন্ধুত্ব বোধ খুব তীব্র, যতদূর সম্ভব আমরা পরস্পরের কাছাকাছি থাকি—একটি সেলে বন্ধ থাকলে আসামীরা যেমন পরিচিত হয়ে যায়—একজনের ফাঁসি হলে আরেকজন নিজের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে আঁতকে ওঠে—আমাদের অবস্থাও তাই—আমরাও একজনের জীবনে অন্যের পরিণাম অনেক সময় দেখতে পাই—আমাদের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার সমঅনুভূতি সম্পন্ন মানুষের—সমদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে থাকার দরকার আছে আমার—আমি যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পাঠাই তাতে এরাই সকলের আগে সাড়া দেয়, এবং এরা যেটা পাঠায় তাতে আমি—আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায়—সাধারণ সমাজের সঙ্গে কোনো কম্যুনিকেশনই প্রায় হচ্ছে না বা সমাজ আমার ভাষায় কম্যুনিকেটেড হতে চাইছে না—'মুদ্রাদোষেই' সকলে আলাদা হয়ে যায়, মুদ্রাদোষ অবশ্যই চেতনা—জড় ইতিহাস সমাজ একদিন এই বিদ্যুৎ চৈতন্যে আহত হবে বা হবে না, আজ আমি জানি না। আমি একা, আমার কোনো নিজের সমাজ নাই।

শুধু মাত্র সামাজিক মূঢ়তাকে আঘাত করা নয়—নিজের জীবনকে খুলে ধরা।

মানুষ সব সময়ই কোনো না কোনো মূঢ়তাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থাগুলির মধ্যে ঘুম একটি স্বস্তিকর অবস্থা—এই ঘুম অনেক সময় বেশি হয়, ভাঙতে চায় না বা মানুষ নিজেই চায় না, জেগে উঠেও আবার সে ঘুমাতে চায়—সেখানে এক মূঢ়তাকে ভেঙে আর এক মূঢ়তাকে গড়ার মধ্যে বোকামি ছাড়া আর কি আছে?

নিজেকে ঠিক ঠিক ভাবে মেলে ধরতে পারলে ইতিহাস সমাজ তা দেখেই শিউরে ওঠে—ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়।

ভালোবাসা এবং স্বাধীনতার জন্যই সমস্ত গোলমাল

ভালোবাসার প্রশ্নে যৌনতাই থাকে কেবল। পৃথিবীতে এক জৈব অস্তিত্ব আর এক জৈব অস্তিত্বের সঙ্গে কম্যুনিকেট করে যা দিয়ে তাই যৌনতা। যৌন পৃথিবীতে যৌনতা ভিন্ন কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় না—আমার যৌনতার মধ্যেই পৃথিবী নিজের চেহারাটা দেখে নিতে পারে।

অন্য যে কোনো রিচ্যুয়ালসের চাইতে যৌনতা প্রধান ও প্রচণ্ড। প্রচণ্ড কারণ স্বাধীনতাও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে এর সঙ্গে। জীবনের এই মূল্য অবসেশন থেকে মুক্ত না হওয়া অব্দি স্বাধীনতা অসম্ভব—আর সমস্ত অবসেশন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কিনা তা আমি এখনও জানি না অন্তত মৃত্যু নামক ভয়ংকর জিনিসটির হাত থেকে মুক্তি নাই, সমস্ত চৈতন্যের সঙ্গে মৃত্যু জড়িয়ে আছে আমার—প্রত্যেকটি সহবাস শেষে মৃত্যুকেই দেখতে পাই প্রথম, একা আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যু সচেতন হয়ে ওঠে।

যৌনতা এবং মৃত্যুই সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে। জীবনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এগুলিই—এখানেই আঘাত পড়ছে সবচেয়ে বেশি—মোহিত, আপনি যাকে সংকীর্ণতা মনে করছেন ; আমার কাছে, আমার অভিজ্ঞতায় তাই বিস্তৃততম।

জাঁ জেনের সমস্যা এবং আমার সমস্যা এক নয়।

জেনে পৃথিবীতে জন্মেই নিজেকে পরিত্যক্ত দেখেছে, আমি পরিত্যক্ত হয়েছি ভিন্নভাবে এবং আরও পরে—জেনের স্বপ্ন ছাড়া অন্য স্বাধীনতা প্রায় নাই—আমার কিছু কিছু স্বাধীনতা আছে বা কিছু কিছু, আদায় করেছি—যদিও তার জন্য যে দাম দিতে হয়েছে, মনে হয় এটুকু না হলেও কিছু যায় আসে না—জেনে নিজেকে সব সময়েই অন্যের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে আমি কখনো কখনো নিজেকে নিজের মধ্যে পাই—এবং তাকে বোধ করবার স্বাধীনতাও পাই কখনো কখনো। জেনের অভিজ্ঞতা এবং আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন।

তবে এও ঠিক, জেনের Position এবং আমার অনেক ক্ষেত্রেই আইডেন্টিক্যাল। যেভাবে আমার সঙ্গে আমার অন্য বন্ধুদের Position আইডেন্টিক্যাল।

রাজনীতি আমাকে কী দিতে পারে? আমি সন্দেহ করি

নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি মানুষ রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে। আমার বাঁচার সঙ্গতি আমি চাই, পেলে আমি খুশি হব, প্রত্যেকটি মানুষের দরকার, কিন্তু এখানেই আমার সমস্যার শেষ হচ্ছে না, রাজনীতি মানুষকে মুক্তি এনে দিতে পারেনি, এক ধরনের সমাজ ভেঙে সে আর এক ধরনের সমাজ তৈরি করে কিন্তু সেখানেও কিছু মানুষ পরিত্যক্ত হয়ে যায়, দল থেকে যারা ছিটকে যায়, যারা নিজের জীবন এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সব বুঝতে চায়—এদের বিশ্বাসঘাতক বলা হয়—আধুনিক পৃথিবীর রাজনীতি আত্মার পরিবর্তে সুখ দিতে চায়, মাথা নত করতে বলে তার কাছে—সকলেই সে পৃথিবীতে সমান স্বাধীন হচ্ছে না—পৃথিবীর সমস্ত মূল্য সমস্ত ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে মানুষ কোনো ধারণারই সমান হচ্ছে না, তার প্রকৃতি তার আকাঙ্খা প্রত্যেক যুগে তাকে অসুখী করেছে—পাস্টেরনাক রাশিয়ায় বিশ্বাসঘাতক—যারা শাদা, শাদা দেখে না হিটলার তাদের কোতল করতে বলেছিল, প্লেটো বলেছিল কবি নামধেয় সমস্ত জীবকে তাড়িয়ে আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে—যে নিজের দিকে আগে তাকায়, যে সমস্ত শোষণ অত্যাচার ভণ্ডামি, পীড়ন অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং নিজেকে আলাদা করে তাকে রাষ্ট্র ক্ষমা করতে ইচ্ছুক নয়, পৃথিবীতে দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো রাজনৈতিক নেতা অহং ত্যাগ করে মানুষের মঙ্গল চায়নি। আমার সন্দেহ এজন্যই। সন্দেহ থেকে আমি মুক্তি পাই না। এই 'অপরাধ' থেকে কোনো ইতিহাস আমাকে ছেড়ে দেবে না—কারণ সব ইতিহাসই বুর্জোয়া ইতিহাস। সন্দেহ আমাকে অসাড় করে দেয়, আমি নড়তে পারি না, কোনো যুদ্ধে আমি যোগ দিতে পারি না, আমি দেখি, সেজন্য সকলে আমাকে সন্দেহ করে,—দেখা পাপ কিন্তু আমি চোখ বন্ধ রাখতে পারি না। পৃথিবীতে মানুষ সুখে থাক এ আমিও চাই।

আমাদের জীবন মোহ ও ভ্রান্তির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে, কতকগুলি শব্দকে অশ্লীল বলা হয়—'কল্যাণ' শব্দও এক ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়—'নির্বিচার অশ্লীল শব্দ'—বলতে এই বোঝাতে চাই, যে আমি যখন অশ্লীল বলে কিছু মানি না তখন কতটুকু নয় এ বিচারও অর্থহীন—তাই প্রয়োগ হবে নির্বিচার—যেমন আসে। 'অশ্লীল' শব্দ লেখা হয়েছে কারণ ওই শব্দের মধ্যে কবিতার বিশেষ যে ধর্ম লুকিয়ে আছে তাকে সামাজিকভাবে উল্লেখ করার জন্য। জীবন যেখানে পরম অস্বীকার সেখানে শ্লীল অশ্লীল অবান্তর।

যেমন ধরুন একজন দোতলা থেকে ব্যবহৃত কনডম ছুড়ে দিচ্ছে সকলের সামনেই—এটা কি, অশ্লীল? ইতিহাস কি একে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে না, যাবে না?

Carl weissher

SOMOS ESTAS PALABRAS

'...here is an extension of Panic idea : turn the sound off on a television set and use an arbitrary recorded sound track-street sound, music, conversation, recordings from other TV programs, radio etc. you will notice that the arbitrary sound tracks seem to be appropriate to the silent image track on the screen, in other words **what we see is dictated by what we hear** which is why i find tape recorder experiments more interesting than photographic experiments...'(William Burroughs in a letter to .C. W.)

turn the sound off on a panic TV set—use an arbitrary street turn recorded sound BACK track recordings of panic from OTHER HALF to TV muttering in ice-or use a radio track-radio track seems to be in OTHER WORDS—the SILENT IMAGE track we see is dictated by WHAT street sounds radio music conversation ? —what we hear is recordings by which we SEE—THE SILENT.IMAGE HALF BURIED IN ICE the other/s eyes—in other words here is an extension of television—

WHATEVER you see will not sound on the screen—use prerecorded sound track— the sound of an arbitrary street—the SOUND OF PANIC-TV muttering radio sound seems to be IN the silent image on screen—we SEE other words—what we hear is street sounds music recordings in OTHER image—TV images an extension of words muttering behind your eyes you will see & sound other words WHATEVER track you are on—the sound you hear is precisely WHAT you want to see on screen—THE SOUND OF PANIC THE IMAGE OF PANIC—in PRE-RECORDED sound OTHER image—TV image film image... IMAGE TRACK an extension of WORD/SOUND/VIBRATION... IN your eyes

Claude Pélieu
VIA SATELLITE

blister-columns of skin—dilated eyes—flat bellies furrowed with ejaculated twirls, milky bellies, smooth buttocks-Tango-Moon—thighs covered With burning sand—bodies 'replete with shit—cocks stretched by orgasms flowered by hands— rectal cavities, hoops wrapped in skin, stretched throats, caressed by 100 pairs of perfumed lips, active hands harnessed to flabby bellies--long sopo-spora ejaculations—retrospective shudders — deliriously perverted adolescents, armed with leather dildoes, clad in sky-blue Jackets, flabby shapes, filth, liquefactions, turdi smoking on the frozen ground–interrogatories, chained sexes, free-fall-death, dazzling metamorphosis, genital globes & exasperated germs, wires cut forever—colorings & suspicious breakdowns—must go out with felt-jaws & autogenous puking—**la perdida en rumor de la ribera** —tears & laughter—under lips upsetting limits of horror (indeed :— laconic stammering of a fairy) — dazzlement, nil illumination at every latitude—my Wool & Cotton symptom ? back-platform of tensions—blue *&ashes*—fruit crushed on the windows of the Town Hall—the greyneis of effort, saliva-wreaths, vacuum, deafness, repetitions of a mechanical gestuee - elongated shapes, movings, reefs of sperm filaments in the Bay of San Francisco—town buried in a cloud of mud, animated from underneath, meat mounted on pivots, detectors, Geiger counters of incantation dnaces—tender shadows, cotton flakes, splicing-soot—rash in the hollow of hands—queens collapsed in marshmallow costumes, Turk Street, midnight, turkish delight all shitty furrowing the Summer Shit & Sun Sphere —frail adolescent girls beribboned with kotex, bobbing down on mechanical sidewalks, haunted by the minute winks of juke-boxes—acrid smoke, police sirens, sinister super-markets, residential areas telephonic vents op6n night & day—

five convulsive lapels of Fluid Time—skid—make veins blossom once again—parks strewn with Coca-Cola cans, plantations of red pubic hair, machine-tools that are sumptuous, prefabricated ecstasy, Royal Jelly tablets, & puddles of pink gelatine—narcosis.(discreet plot)—obvious magic in the red sky streaked with licorice sticks— River of Largactyl where newborn Indians are baptized—stretch of dry skin, trans-alpine, deafening clink of transparencies—modulations of electro-convulsive syringes—& the special editions mention that all is well Grand-Vizir-Orgasm-Curve—

We must repeat : be not afraid of The Scribes of The Great File—we know or

we don't—underground all those stupid Jerks smeared with absence, with rancid oil,bile, underground ill yellow smudges & suffocating blankets, underground, beyond age, out of bonds—we must repeat to the pre-terrestrials to the extra-terrestrials, to the janitors of The Arts & Letters Ossuary : "The Secret of Space is Underground"— I'll find them all again in greyness, I'll unbolt them, I'll find them wherever they hide, & up their asses, swallowed up, jealous false witnesses—I'll track them down in the Funnel City, in electrified canalizations, etc—

"Do you smell it ? Something's burning—"

Bloody trunks, haystacks of burnt down entrails, exposed entrails, ultrablue spasmodics, ovens, grinding rhapsody, sew-, ers;escorts of kilometric emotions—perforated intestines—the future as piercing as a flower under the floodlights of the Ossuary, like a tumor, entrails to go.falsified genital devices, enslaved nervous systems & all the others are obedient, blind, deaf, dumb—at night, under the Paris sky, .he filthy mug of The Robot Dictator, the great flat livid far,-face—it was in greyness & seen on the crapper of the Wool & Cotton Embassy—one day we'll have to (but we'll see) —smoke permutations of shoddy goods, alternating current—

' Yes, something's burning. But it disappears into thin air—'

' Turbulent mucus, no ? '

Terrible scenes on The Native Land, the essential trial, the bitten balls of angels—& there— at the bottom of the basket, in socks & T-shirt with a design judged simply—played on divine velvet of Onan City—

' Something's burning. Do you smell it ? '

Too late. It's always pink—shit, something infinitely sad–end of absence—night—silence, recorded signals & before dawn the angel drags the horns of mist—insensible seis mographs— on the Genital Ramp my Mexican double is protected by two rows of electrified barbed wire—mike plugged into the sticky night—Mobilized Secret Services travelling on a modification train—Eastern secret agents won't know anything about it— things are pretty clear: the West is fucked up—the- rest of the world isn't worth much more, larva-chains are ready to take
off, & pseudo-poetic effusions infiltrate into meat—

' Yes or shit, Mr. President, will Western Cooperation rise again ? '

' Er, well, yes, no, why not ? '

Motionless bellies of the night, sexes to wring out, somber sexes beating against a cheek, spreading gesture linked to half-closed eyes, incomprehensible world, enigma of denials, profound identity of trivialities—radioactive dust released in bulk through surface-leaves—metaphoric character—amphi of the Vague Full Moon—flights (encirclement) the vomit-chain is cast in adjection in the juke-box of orgasns in board daylight— captive birds,heavenly show-windows on glass slides clouded with sperm—curves of Black Suns, curves meeting the follies of El Paso, Santa Monica, Sheridan East Corinth, Long Island—bare bones—

filaments— thermal stations ransacked by Baron Saturday's divers—simultanous pirate broadcasts —luminous discs—nebulae—mechanisms released by metallic phosphorescent showers—interplanetary night-clubs—pink neon omen-spectacle—prototypes slumbring among stones— sulky machinations, Police truths, terrible documentation & the shadow advances—

'That is not the, question'.

'No matter which one, drugs are all dangerous', added the Commissioner.

'No question about it Curtain.

'React on the edge. Hang up pimp., Over 'n out.'

Quatuor Style Snots In The Storm—careful of the superstructures, it's over, the yellow conflict of generations stick their tongues out at The Great Page of Parallel History— the world will be given back to you in a ghostlike digestion— the world on a rounded out screen, fixed vertigo—let us pick up the old newspapers, superfluous notes & the fatigues of dmere air—violent shocks among the different communities, the very fact that we can lie down bunch of authors—& on the sticky floor the Deprostrated Septuagenary in permanent contact with The Old Beast—

'Really Sir. the West is something !'

Electronic syringes, muffled shocks inside bodies & all those who fall never able to push a bubble before turning the corner —Ali The .Nostril's short counted heroin—hide-outs in hotel rooms, identity checks, searches—scraps are no longer enough —&; newspapers dragged in piss look like my eyes—eyes are not only made to see, but to hear, & nothing is real enough yet, in the low windows of the Juke-box (The Duet explodres in faded' smoke) the indiscernable oblivion shadow—the mob of inevitables bumped by fang*—everyone will try to get. out of it, but we can't get out of it, even dead— 'Caution Green—the flood-gates of the Interplanetary Juke box are open—

(Translated by Mary Beach)

Carl Solomon
LETTERS .

Carl Solomon : Letter to Carol Weslon
Dear Carol Weston,
Well, it's been a year now. I can't make head or tail of what goes on. Motivation is a deep dark secret that doctors can't comprehend any more than the layman can. I don't believe psychiatry is an adequate or real science. Two men can't agree on anything, so where-in lies its sanity ? The mind had better be left alone and let us look after the bodies of the mortals. Sexual repression is a dubious explanation of our weaknesses. I have had more sexual intercourse and experimented in the art of love and in other aspects of human life more than any mature man I know. The complete or perfect orgasm...is unknown to man or beast. Forget it all, I advise the proliferation of homosexuality in this tormented country, (even Hemingway couldn't make it so give Tom a lit tie consolation) — is probably related to the Americans' interest in psychology. Psychology is the art of having to jump on someodne else. Psycboanalists are sadists. They railroaded me out of the hospital and they railroaded me in. Mother complex probably.

As for me, I've got some girl here now. One or two, but one living with me. I'm getting sex again but I'm still unhappy. The love element is missing. I'm socially sterile and too embittered. Could it be that I am too learned ? No ! The answer is that I put down social conventions and if there is anything a strata-minded society can't stand—goes berserk when it is confronted with— it is the poor. Is it that I have dirty insights into the culture ? Puritanism—the basis of the long island regeneration creed, emphasizes the hard life. Brainwashed, I live in Hotel Embassy. I saw Barbara last week at some verse dramas downtown. Barbara and Sydney, who.is a vary nice guy... I see Paul, one of the boys from Pogrom State pretty regularly. I mean, er-.-Like as if...he talks well. How cool. He is well- Er, I mean— 'as if' there were any such thing as 'normal'. Most of the attendants I put down as self-satisfied normals. I dig Wills, though, and like him because of this weirdness, really extremely weird. One of the healthier eltments, as you are. Huncke, Allen, I.Kerouac Burroughs, the rest of the more normal men in this anal-sadistic mess are continually put down by this population of nincompoops who ... (here the letter breaks off)

Carl Solomon : Letter to Dr .Kenneth Miller
Sunday February 18th , 1962
Dear Mr . Miller ,
Time permits me to write. How are t'lings with you ? It's rather tough getting started again, believe me, for want of sufficient or sufficiently knowing assistance from my family and friends. Still without an adequate typewriter and cavorting around the city with a group of goodhearted but socially ignorant friends who might best be described as harmless lunatics socalled beatniks, french sccialists, bums, etc. A sporting life...

Haven't written anything much. Swallowing tranquilzers. Soon to be giveninal release by Aftercare as convalescent year is about up. Finally, really and truly made it. Thereby proving it can be done. I'm doinga little free-lance reading for Uncle Ace Books. (Note: Ace Books, owned by carl Solomon's uncle, first published william burroughs' JUNKIE) I receive $ 8 a book and get them done at the rate of about 4 a month, or 6 a month or 8 a month. Also receiving State disability payments so I have an income of about $ 150 a month.
Voted at the last election and voted Republican for the first time, though I'd shaken hands with Wagner at a street rally. From communist to Republican marks quite a switch. I suppose this conservatism of mine is born of a desire to be socially accepted and may be short-lived. I am a sort of rootless radical who looks for something and can't seem to find it in any group. The'Socialist movement may be my objective if I can get the money. Socialists have apartments and attend cocktail parties. They are about .the eltie of the radical types at the present time. Anarchists are more fun but they eat less and are more like bums. I'm still a-typical so this is my area of wandering, the left-outs and the seekers after causes. The disowned, the rebels,' the disorderly. All looking for love or drugs or revolutions or handouts. Those want the world changed. Some of these are religious and some are not, but all seek to disturb the present order of things. The negative elements, pacifists, degenerates, dope ' users.—Those who cannot face it, the changeless, sterile eoiiformmty of urban life.

Rimbaud, our mutual French friend, wanted to 'change life' through 'L' 'alchimie du verbe'. Turn black to white through art. He is my Messiah, I thing. He proposed, I remind you, 'a reasnoed derangement of the senses' to create an artificial paradise - the realm ot the super-real. The art of the void-the art of the madman without sense to shut his eyes and admit there is nothing but reaiity. Reality caresses us. I must give in to it. Surrealism and the super-natural, the wave of discontent, it is a rebellion against the money-changers, I admit—there you have my friendship. What is positivism and psychiatry but the effort to deny Christ. I admit your God. So we have standing before us, before our naked eyes the two alternative realities. The reality of Kenneth miller and the reality of Dr. Path. Which is truth ? The truth of the prophet or the truth of the gentleman with the necktie. Rath stands for the New Order materialism, mental health—the anti-Rath perspective is spiritual. The lunatic goes into the asylum. The spiritual man is mad. Our God is dead. We must eat we must make friends, we must give our women good things. We must regret ever having met you...

Interrupted the letter to go down to the Cedar Bar with Cordula Von Koschambahr, my new chick. Met two French poets, one of whom wants to translate my AFTERTHOUGHTS OF A SHOCK PATIENT in to French. He says Michaux read me and enjoyed me. Greatest satisfaction. In Existentialist sign language that means I am sane. Not merely sane but self-satisfied too. Michaux, great occult mind, in case you had never heard. Michaux tells the truth. Read PLUME ; VOYAGE TO GRAND CARABAGNE ; and A BARBARIAN IN ASIA. Also a painter, Klee-like. .

Since Christmas is past, may be you can make a date with me to eat a hot dog and discuss the past.

Frustration and 'TARA GUGIDO' (Artaud ; ' texte inedit) Working for uncle-publisher 11 months out (Note : out of insane asylum), boiling with rage over regulations to low-income groups, Job situation sloppy. Need more time...

Best regards,

Carl Solomon

William Burroughs
A TAPE RECORDER EXPERIMENT

Here is a tape recorder experiment. Walk are ride if you have a car to and fro up and down any city streets. Record the words you see street signs shop windows what is written on passing trucks etcetera. Type out recording in one column. Now type out a second column, replacing the words in column I with words having a similar sound. (Daily Express April 7, 1966—Gaily Depress April II, 1956 ; Director Angus Ogilvy between flights at Orly —Between fights at Orly). Here is a sample taken from a walkup Trebovir Road, London S.W. 5 to Earl's Court Station and back:

D. M, 707 Strathmore Hotel
George HouseNoVacancies
Sunnyhill Court A. J. Fines Co.
To Let Ever open Shop Sainsbury Higgs Hill
B. O. A. C. His Ever open Shop Clothes Philips Combes The Golden Egg Restaurant and Coffe Lounge Raines Touch and Glow Cool Ray Prince of Teck Kenway Road English Cheese English Cheese Milk Milk Milk Reeds Employment Open Now Till 9 P.M. Sunny hill Court unborn feet whatever Rushmore Hotel sooner or later have to show their hand C.W. M.iyne Hair women Dressing Prince of Tech Biggs A.J. Bar'klay's Bank Mr Nash Cour.tfield Dino's Allo spiedo Earl's Court Station Restaurant Hot X Buns confectionary W. J. Gou't Trader Primrose Laundry Fish and Chips 7 Kenway Road ABjC Post I like the job so would you

M. D. 7 Eleven Mathmore Hotel
forge house foe vacancies
money fill fort A.J. fine
company new set ever open
hop Wainsbury wigs hill
see so may be his ever
so pen wop clothes Philips
combs the fold in peg
restaurant toffe lounge
cold Kentucky rains one
song touch and go fool say
Prince of deck English seas
bilk bilk bilk feed employ
meant open cow fill fine
P.M. Funny, Bill, Mort unborn
feet forever rush for motel
schooner of satyr have to mow
their land me double you slain
fair women pressing prince of deck
frigs A. J. far clay bank
mister nasti sort field he knows
'allo Speed oh Earl's Court
nation rest or rant dot boss
nuns confessionary
double you fool raid her primrose
laundry dish and lips
11 Fenway Road maybe sse ghost
by Mike sea god oh could you
etc...

If you have a two track machine, record on two tracks column one and two and play back so the two track run simultaneously. If you do not have a two track machine the same effect can be created by two people speaking at the same time, one reading column one, and one reading column two. When you have recorded the two tracks running at the same time, **Play back in the area where the recording was made.** You will soon have people seeing double Maya Maya illusion illusion.

As usnal the tip off came from those who wish to monopolize and control the technique by which socal!ed 'reality' is formed and directed. In the Nottingham Guardian Journal. 23.2.66, a review of my novel NOVA EXPRESS: "Joyce is rather easier to read and comprehend. Take for instance the opening paragraph of this book : 'Listen to my last words anywhere. Listen to my last words any world. Listen all you boards syndicates and governments of the earth and you powers behind what filth deals consumated in what lavatory to make what is not yours to see the ground from unborn feet whatever....... '•"

Now the text actually reads "to sell the ground from unborn feet forever". Which is comprehensible enough. The reviewer obviously hoped that anyone leafing through the book undecided wheather to buy or not, would See the altered text and dismiss the book as nonsense. Well any number can play.

All the best, William Burroughs

(William Burroughs in a letter to Carl Weissner)

ফ্রান্স, জার্মানি আমেরিকার নতুন সাহিত্য আন্দোলনের প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক এরা। বুর্জোয়া এসটাবলিশমেন্ট বিরোধী পুরোনো মূল্যবোধ নস্যাৎকারী লেখক। বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে এদের কেউ কেউ একেবারে অপরিচিত নয়। গত ৪।৫ বছরে বাংলাদেশের তীব্র সাহিত্য আন্দোলনে পৃথিবীব্যাপী বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে বিদেশে হাংরি লেখকদের লেখার কয়েকটি সংকলন বেরিয়ে গেছে। বহু লেখা 'ক্ষুধার্তে' প্রকাশের জন্য বিদেশ থেকে এসেছে—এই সব লেখকদের ইচ্ছা বাংলাদেশের পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। বাংলাদেশে যেখানে সাহিত্য তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে একদিকে, আর একদিকে কবি লেখকদের জেলখানায় পুরে দেওয়া হয় সেই দেশের সাহিত্য পাঠকদের জন্য মাত্র ৪টি লেখা ছাপা হল। আমাদের সঙ্গতি যে কত সামান্য তা এরা ওই সব দেশে বাস করে বুঝতে পারে না—নিজেদের লেখাই আমরা ছাপতে পারি না।

Car Weissner–জার্মান গদ্য লেখক। Klacto পত্রিকার সম্পাদক। Tape–cut up method এ লেখেন। চিন্তা এবং অভিজ্ঞতাকে সমস্ত রকম inhibition থেকে মুক্ত করে প্রকাশ করতে চান এভাবে।

Claude Pelieu–ফরাসী লেখক। Burroughs এর বন্ধু। ইনিও Cutup method এ লেখেন। ইংলন্ড আমেরিকা এবং ফ্রান্সে তার যে কয়েকটি বই বেরিয়েছে সবগুলিই পাঠককে চমকে দিয়েছে।

Carl Solomon–Allen Ginsberg-এর Howl একেই উৎসর্গ করা। ১০ বছরে ১১ বার পাগলা গারদে ছিলেন। বিনয় মজুমদারের মতো। সম্প্রতি কিছুদিন হল বেরিয়ে এসেছেন। কেউ কেউ তাকে আমেরিকার আর্তো মনে করেন। তার চিঠিগুলির মধ্যে বর্তমান আমেরিকান সভ্যতা কতটা অসুস্থ পচা তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

William Burroughs–cutup method এ লিখে শোরগোল সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত বই The Naked lunch. নিজেকে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করছেন। পঞ্চাশোর্ধ এই লেখক এখনও এসবটাবলিশমেন্টের তোয়াক্কা করছেন না।

—সম্পাদক

বাসুদেব দাশগুপ্ত

দেবতাদের কয়েক মিনিট

১ বিকেল পাঁচটা পাঁচের আগেই আমার অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া ভালো। কেননা আমি যা বলতে চাই তা লিখতে পারি না, যা লিখতে চাইছি তা বলতে পারি না—কষ্ট হয়। অথচ যা লিখে ফেলেছি তা জানাতে চাইনি তোমায়। কিংবা আমিও এক ভুল করে যাচ্ছি, অকারণে একই ভুল ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছি বারংবার। আরামকেদারায় একা চুপচাপ একা বসে থাকলে কে যেন ক্রমাগত খুঁচিয়ে তোলে আমায়। উইংসের ফাঁক দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে—এই নাও, মুঠো করে পাকিয়ে ধরো এই ছুরিকা...। নগ্ন শরীরে দুই উরুর ফাঁক দিয়ে তিরতির করে রক্তস্রোত গড়িয়ে নামলে মেয়েটি এবার সশব্দে কাঠের চেয়ারের একপাশে হেলে পড়ে। তখন আবার সব শান্ত, সবই ঠিকঠাক। চশমার কাচ মুছে নিয়ে দেখি সব পরিষ্কার—যেমনকে তেমন সব ঠিক। শুধু কড়িকাঠ বেয়ে একটা মাকড়সা সরসর করে নেমে আসে নীচে। সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি এবার আমার সময় হয়েছে, সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে হাত তুলে এবার আমার বলা উচিত—গুড বাই! চলি। কেননা আমিও এক অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে সেঁদিয়ে পড়ছি, বারংবার একই ভুল ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছি। আরামকেদারায় একা চুপচাপ একা বসে বিমূঢ় আমি দরজা খুলে এসে বাইরে দাঁড়াই। অন্ধকারেই রিমঝিম বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনি। অন্ধকারেই দমকা হাওয়ায় আমার বেশবাস এলোমেলো হয়ে যায়—অন্ধকারেই অভয়ের গলা শুনতে পাই—মাথাটা ঠিক রাখিস, মাথা যেন গোলমাল না করে। সুতরাং প্রথমেই আমি আমার বক্তব্য সরাসরি জানিয়ে দিতে চাই, যা কিনা সিনপসিস আমার গোটা লেখার সংক্ষিপ্তসার, যদি তা না হয় তাহলে ভূমিকা বা পূর্বাভাষ মাত্র যারপর নির্মলের এই ফাটানো চিৎকার দিয়ে শুরু হবে—

হ্যাল্লো বয়েজ, লেট আস স্টার্ট!

২. মা'র পাশে শুয়ে আমি প্রথম কিছুই বুঝতে পারিনি। মা'র পাশে শোয়া তো আমার ছেলেবেলারই অভ্যাস। তবে আজ কেন এমন মনে হলো? এতক্ষণ আমি একটা ছবি টাঙাবার জন্যে দেয়ালে পেরেক পুঁতছিলাম। কংক্রিটের স্ল্যাবের দেয়াল বলে পেরেক বসে না, হাতুড়ি গরম হয়ে আমার হাতের চেটো লাল হয়ে যায়। একটানা শব্দ হয় ঠকঠক—ঠকঠক। তবু মা ফিরে তাকায় না একবার। তখন আমি চেয়ার ছেড়ে নেমে দেখি একটি পেরেকও আর অবশিষ্ট নেই। সব কটাই বেঁকে দুমড়ে গেছে। তবুও মা ফিরে তাকায় না একবার। স্বাভাবিকভাবেই এবার রেগে গিয়ে মা'র শরীরটা দুহাতে চটকাতে গিয়ে আমি বুঝতে পারি এই বিধবার শরীরে এক ধরনের বাসি ঠান্ডা ভাব, যা কিনা বাড়ির পেছনে নোংরা ডোবায় থাকে পচা পানার মধ্যে গেঁজিয়ে ওঠে। তখন আমি হাতমুখ ধুতে বাথরুমে চলে যাই। হাতমুখ ধুয়ে এসে দাড়ি কামাই।

দাড়ি কামাতে গিয়ে আয়নায় দেখি চোয়ালের তলায় দু'তিনটে দাড়ি পেকে আছে। তবু লক্ষ করি আমার চুল একটাও পাকেনি। এতে আমি একটু স্বস্তি বোধ করি। দাড়ি কামানো শেষ হলে হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। একই সঙ্গে কড়-কড়াৎ শব্দে প্রচণ্ড বজ্রপাত ও বিদ্যুতে ঝলকে ওঠে আকাশ। টেবিলে চিঠিটায় তখনও লাল কালিতে জ্বলজ্বল করছিল—ভুলো না প্রিয় আজ শনিবার। চিঠিটাকে পকেটে রেখে ছবিটাকে কাগজ দিয়ে ভালো করে মুড়ে নিই। তারপর মাকে ডেকে বলি—মা, আমি যাচ্ছি। দরজা দিয়ে দাও। মা ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে বসে। আমি কাছে গিয়ে প্রণাম করবার জন্য মাথা নোয়ালে মা মাথায় হাত দিয়ে বিড় বিড় করে কীসব মন্ত্র উচ্চারণ করে সম্ভবত শেষবারের মতোন আমার চারপাশে অসুখ সব অমঙ্গলকে দূর করবার চেষ্টা করে মা। তারপর কখন যেন খোলা দরজা দিয়ে দেখেছিলাম অদূরে বটগাছের তলায় একটিবার দেশলাইয়ের আলো ফস করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

৩. এস্রাজের সুর আর মেয়েলি গলার গান অনুসরণ করে এবার আমি যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াই তার চারতলার পুবদিকের জানালা ফুঁড়ে নীল মলিন আলো আভা ছাড়ায়। সদর দরজা খোলাই ছিল, সুতরাং সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠে যাই—চারতলায়। ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে বলি—নীলা, একটা কথা ছিল। নীলা সামান্য থেমে এক পলক তাকায় আমার দিকে। তারপর হেসে আবার ছড় টেনে সুর তোলে এস্রাজে। গুনগুন করে গায়—শুধু কাঙালের মতো চেয়েছিনু তার মালাখানি...। অগত্যা আমাকে ভ্রু কুঁচকে বলতেই হয়—নীলা তুমি চমৎকার ঠাট্টা জানো তো—বাঃ। পরে বলি—মা আসবে তোমাকে সাজাতে। বিধবার হাতের সাজ—পছন্দ হবে তো? তখন নীলা আবার গায়—

যত প্রেম দীপ জ্বালি
বাড়িল শুধু যে কালি-ই-ই...

তখন আমি ফিসফিস করে বলি—আজ অসিতের বিয়ে, আর আজ তুমি এই গান গাইছো? বলে দরজা ছেড়ে সরে আসি সিঁড়ির গোড়ায়। এক পা, দু'পা করে নেমে আসি নীচে। কেননা ইতিমধ্যেই আমি দেখে নিয়েছি যে নীলা 'কাঙাল' আর 'প্রেমদীপ বলার ফাঁকটুকুতে লালায় ভেজা দাঁত দিয়ে একবার নীচের ঠোঁটটা আলতো করে চেঁছে নিয়েছে। ফলে আমারও বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ও অল্প আগেই ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষেছিল একবার।

৪. একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা গাছতলায় অসিত দাঁড়িয়ে—বাউণ্ডুলের মতো চেহারা ওর। ন্যুব্জ, ভাঙাচোরা শরীর—চক্ষু লাল দৃষ্টি ঘোলাটে। পথে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে বলে এই গাছের নীচে এসে ও আশ্রয় নিয়েছে—তবু গাছের পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল প'ড়ে ওর জামাকাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে অনেকটা। যেন আমিই কিছুই জানি না, যেন আমি কিছুই বুঝিনি এইভাবে মুখেচোখে ধরে রেখে বলি—আসিত, সদ্য অসুখ থেকে উঠেছিস। এই অবস্থায় আবার বৃষ্টির জলে ভিজছিস কেন? বাড়ি যা, ঠান্ডা লাগাস নে। তখন অসিত আমায় ডেকে মৃদুস্বরে বলেছিল—শোন, দাঁড়া, তোর সঙ্গে কথা আছে। আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করি। দুজনে দুটো সিগারেট ধরাই। দুজনে সন্তর্পণে পাছে জলে ভিজে না যায় এইভাবে হাতের আঙুলে আড়াল করে খুব সাবধানে সিগারেট টানতে থাকি। তারও অনেক পরে অসিত আমায় বলে—আমি বিয়ে করব। আমার বড্ড বিয়ে বসতে ইচ্ছে হচ্ছে। তারপর অত্যন্ত দ্রুতস্বরে ও বলে যেতে থাকে—বেশ সানাইটানাই বাজিয়ে, টোপর মাথায় দিয়ে...তোরা সকলে বরযাত্রী যাবি তো? মেয়েটা প্রথম চোটে টের পাবে না...যদ্দিন না টের পায় ভালোটালো বাসবে তো? নিশ্চয়ই। যতদিন না পর্যন্ত বুঝবে আমি একটা কসাই ততদিন নিশ্চয়ই ও বলবে—ওগো চলো

না, এই চাঁদের আলোয় একটু রাস্তা দিয়ে ঘুরি। কিংবা ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলবে—লক্ষ্মীটি, আজ নয়। আজ আমি স্নান করিনি। হয়তো তিনমাস, হয়তো তিনদিন—হয়তো তিনসেকেন্ডের লাজুক চাউনি মাত্র দেখেই আমি ভুল ভেবে যাবো ও আমায় ভালোবেসেছিল। তাই-ই বা মন্দ কি? ওটুকুর জন্যেই আমার ভারী লোভ হচ্ছে, বুঝলি? ওটুকু পেলেই...মনে হয়...আমি আবার ৩০ বছরের জন্য বেঁচে থাকব। আমি কি বেশি হ্যাংলামি দেখাচ্ছি রে?

আমার গলার স্বরটা সম্ভবত শ্লেষ্মায় আটকে গিয়েছিল বলেই আমি একটু কেশে নিয়ে বলি—রোমান্টিক! তুই হ্যাংলা নোস। তুই মরবি, নে চল।

দূর থেকে এস্রাজের সুর ভেসে আসে। যেহেতু এটা আমার শোনা গান চেনা সুর তাই সামান্য মনোযোগ দিয়ে শুনেই সুরটা ধরে আমি বুঝতে পারি নীলা এখন গাইছে—সে কোথায় দূর বিদেশে হেসে মাতায় মধুরাতি...। অসিতের দিকে ফিরে এবার আমি বলি—নীলা একটা নাম্বার ওয়ান বেশ্যা। তুই শুধু শুধু সময় নষ্ট করছিস কেন? তখন অসিত কোনো কথা না বলে আমায় পেরিয়ে আরও এগিয়ে যায়। সামনে।

৫. সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতেই দেখি দোতালায় সিঁড়ির গোড়ায় মেয়েটি তার নিজের ঘরে দরজার চৌকাঠে চুপ করে বসে আছে। একলা। খোপায় তার বেলফুলের মালা জড়ানো। আমায় নামতে দেখেই মেয়েটি খিলখিল করে হাসে, জাপানি হাতপাখা নাড়িয়ে বাতাস খায় আর বলে—আমি জানতাম, আমি জানতাম আপনি আসবেন। কাছে এসে দাঁড়ালে বলে—আজ কিন্তু দশটাকা দিতে হবে। বেশি টাকা দেবেন আরাম করে করবেন। আমি কোনো সাড়াশব্দ না করে ভিতরে ঢুকে চারিদিকে তাকাই। ঘরের মধ্যে ফুলের ছড়াছড়ি। টেবিলে, খাটে সর্বত্র ফুল আর ফুলের গন্ধ নয় ঠিক, যেন সৌরভ। ফুলের কুঁড়ি, ফুলের পাপড়ি, কুসুম...বৃন্ত সব ছড়ানো ছিটোনো কিংবা থেতলানো—যাতে বোঝা যায় আমার আগে এঘরে কেউ এসেছিল। অনেকেই এসে থাকে আমি জানি। কেননা ঘরের লাগোয়া বাথরুমেই তখনও জল ঢালার শব্দ শুনছিলাম। কখনো ওই বাথরুমেই আমি আর ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করেছি কতবার—এমনও দিন গেছে। অথচ আজ ওর খাটের নীচে দুটো দেশি মদের বোতল গড়াগড়ি যেতে দেখে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ওর খাটে বসে বসে কেবলই পা নাচাই আর দেখি। মেয়েটি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পটপট করে ব্লাউজের বোতাম খোলে, তারপর ব্রেসিয়ারে হাত দিয়েই আয়নার মধ্য দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে—এখনও বসে কেন? আমার এখনও কত কাজ বাকি। এই 'বাকি' কথাটি বলার সময় মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ায় আমার দিকে। মেয়েটি বোধ হয় কান্নাকাটি করেছিল বহুক্ষণ, তাই চোখের সাদায় সামান্য লাল দেখা যায়। আর চোখের জলে চোখের কাজল ধুয়ে মুছে লেপটে গ্যাছে গালে। তবুও আমি চুপচাপ বসে আছি দেখে আবারও বলে—তবে কি একটু গান শুনবেন? তখন নড়েচড়ে বসে গলাটা কেশে সাফ করে নিয়ে আমি ওকে বোঝাই যে গান আমি আর শুনবো না। কারণ গানের সুর, অর্থাৎ সংগীতকে আমি বোকার মতো ভালোবেসে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম—আর ও ভুল আমি করব না। আমার কথা শুনে মেয়েটি এবার ইয়ার্কি মারার ছলে চোখের মণি নাচিয়ে ফিক করে হেসে ফ্যালে। বলে—গান না গেয়ে আমি দুঃখ করব কী করে? আমি বরং একটু দুঃখ করি, কেমন? বলেই মাথা হেলিয়ে মেয়েটি দু'হাত পিছনে দিয়ে ব্রেসিয়ারের পিনটা খুলে দেয় আর গুনগুন করে গায়—

সে কোথায় দূর বিদেশে
হেসে মাতায় মধুরাতি-ই-ই...

বুকে বেদনে মরে
হেথা মোর আশা পাখি-ই-ই...।

গাইতে গাইতে মেয়েটি ঠোঁটের কোনায় হাসে আর দু'চোখ বেয়ে টপটপ জল গড়িয়ে পড়ে। তারপর কখন যেন ওর কান্নাকাটি/হাসি/গান সবকিছু শেষ হবার পর এগিয়ে এসে একটা চটকানো ফুলের মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। পরে কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলেছিল—ফুটোটা একটু বড়ো করে দেবেন? নইলে বড্ড লাগে।

৬ নীচে নির্মল বসেছিল। তার টেবিলে সামনে ছিল মদ। বিপরীত আলোর বিচ্ছুরণে টেবিলের বড়ো বড়ো তিনটে বিয়ারের বোতল নির্মলের মুখে পর পর লম্বা সরু তিনটে ছায়া ফেলেছিল। যেন গরাদের আড়ালে তার মুখ, শরীর তার অবয়ব। আমাকে দেখে কথা বলার জন্য মুখ তুললে সেই ছায়া কেঁপে নড়ে ওঠে—তবু শেষ পর্যন্ত নির্মল কিছুই বলে না। শুধুমাত্র হাতের ম্যাগাজিনটা টেবিলের উপর রেখে দিলে নাম পড়ি—Poor man's guide to rich woman। মলাটের মেয়েটিও নিজের ফেটে যাওয়া ছেঁড়া ব্রেসিয়ারের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখে তার কত অভিমান কত দুঃখ। আমি নিঃশব্দ এসে নির্মলের সামনে একটা চেয়ার দখল করি। হাতের প্যাকেটটা দেখিয়ে বলি—প্রেজেনটেশনের জন্য। তখন নির্মল একচুমুকে গ্লাসের তলানিটুকু শেষ করে বলে—তোর নামে চিঠি নয়, ফোন আছে। ঠিক তখনি কাউন্টারের পেছনে সশব্দে চুমু খাবার শব্দ শুনে চমকে উঠে ঘাড় ঘোরাই। দেখি সারি সারি রঙীন মদের বোতলের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে সুবোধের মুখ ভেসে উঠছে আয়নায়।

৭ তবে অসিতকে আমি একা ছেড়ে দিইনি। আমিও ওর পেছন পেছন সুয়িং ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ি ভেতরে: তখন কাউন্টারে বাঁ কনুইয়ের ভর রেখে ডান হাতে ভর্তি মদের গ্লাস নিয়ে ফেকু দাঁড়িয়েছিল। আমাদের এগিয়ে আসতে দেখে ও বাঁ হাত বাড়িয়ে আটকে দেয়, আর যেতে দেয় না আমাদের। মদের গ্লাস আমার হাতে তুলে দিয়ে ফেকু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অসিতকে। কানের লতি আলগোছে কামড়ে দিয়ে বলে—এসো এসো বঁধু আধ আঁচরে বসো। সবচেয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে এবার আমি বলি—বাজে রসিকতা রাখ। ওকে কিছু দে, ওর তাজা হওয়া দরকার। ভিজে নেয়ে গেছে এ্যাকেবারে। তারপর চারজন একটা টেবিলে বসে বেয়ারাকে ডাকলে আমি বিস্মিত হয়ে বলি—সে কী! এই শীতের মধ্যে বিয়ার! কিন্তু নির্মল বলে—আমি শুধু বিয়ারই খাবো। আমার রক্ত আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। বাইরে যে এত বৃষ্টি, বজ্রপাত, মেঘের গর্জন সেসব কিছুই এই ভেতর থেকে শোনা যায় না। বোঝা যায় না। এখানে উর্দিপরা বেয়ারা শুধু মদ বানিয়ে দেয়, ট্রেতে করে নোনতা বাদাম নিয়ে আসে আমাদের জন্য। সেই বাদাম একটা তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে কটকট করে কাটতে কাটতে ফেকু আমায় একবার বলেছিল---তোর কি মনে হয় না এটা একটা বিরাট শোষণ? অ্যাঁ...কী বলিস! ১২ বছর বয়স থেকে কেবল মাস্টারবেট করে যাওয়া...কেবলই মাস্টারবেট করা। পরে আবার অসিতকে জাপটে ধরে বলেছিল--দাদামণি, এবার তোমার শরীর সেরে যাবে। তারপর বেয়ারা এসে আমাদের গ্লাসে সোডা ঢেলে দেয়, তরল মদের ফেনা উপচে ওঠে। সকলে মদের ভাণ্ড শূন্যে তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠি—চিয়ার্স!' অসিত শীতে হি হি করে কাঁপছিল। শালের চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে ও শুধু চক্ষু দুটো বার করে রাখে। সম্ভবত সবকিছু দেখবে বলেই। একসময় হঠাৎ আমি অসিতকে জিজ্ঞেস করি—তোর কেমন লাগছে রে? ভয় করছে না তো? অসিত তখনও শীতে হি হি করে কাঁপছিল। শালের চাদরটা মাথার ওপর দিয়ে আরও টেনে দিতে দিতে বলে—ভয় কেন? ভয় কীসের? আমার বৌয়ের মাইও নেই পাছাও নেই আমি দেখেছি। তখন ফেকুকে আমি জিজ্ঞেস

করি—চিনিস নাকি ভদ্রমহিলাকে? ফেকু কোনো উত্তর দেবার আগেই কাউন্টারের কোনায় ফোন বেজে ওঠে ক্রিং...ক্রিং।

৮. কাউন্টারের সামনে চলে এসে আমি নিজের উত্তেজনা যথাসম্ভব সামলে নিয়ে দ্রুত হাতে ফোন তুলি। হ্যালো, স্পিকিং। একটানা শব্দ হতে থাকে পিঁ-ই-ই-ই-পট, পিঁ-ই-ই-ই-পট। এনগেজড। ফোনটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকাবামাত্র দেখতে পাই সুবোধ কাউন্টারের ডান পাশে একটা টুলের উপর উঠে পেরেক দিয়ে ছবিটা দেয়ালে টাঙাবার চেষ্টা করছে। আর নীলা ওর এক হাঁটুতে নিজের মাইটা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে, পেরেকের ঠোঙা। আমি ওখান থেকেই সুবোধকে নির্দেশ দিই—উহুঁ...আর একটু ওপরে...হ্যাঁ...নইলে ঠিক আলো পড়বে না। তারপর নীলাকে ধমকে বলি—তুমি এখানে কেন? নিজের ঘরে যাও, ডাক্তার আসবে তোমায় দেখতে। এমন সময় আবার ফোন বেজে ওঠে—ক্রিং-ক্রিং। তুলে নিয়ে হ্যালো! সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে কে যেন ঘড়ঘড়ে গলায় বলে ওঠে—কেতনা ভাঁও হ্যায়...। হ্যালো? আবারও শুনি—কেতনা ভাঁও হ্যায়...এবার আমি ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠি—কে আপনি? কে কথা বলছেন? তখন দূর থেকে আবছা মিহি ছবির গলা ভেসে আসে—নীলা কোথায়...? কেমন...? বাদবাকিটুকু আমি অস্পষ্ট নানা গোলমালের মধ্য থেকে আর ভালো করে শুনতে পাই না। তখন আমি আবারও বলি—কে? ছবি বলছো কী? কী খবর?

—নীলা কোথায়? নীলাকে ডাক্তার দেখবে...।

—নীলা এখানে...হ্যাঁ এখানেই...ডাক্তার কখন...?

—ঠিক পাঁচটা...থাকবে...হয়েছে ওর...?

—সেক্স রিপ্রেসন...যৌন অতৃপ্তি...ওই জন্যই সব...ডাক্তার বলছে...?

ওপাশে ফোন নামিয়ে রাখার খট শব্দ হয়। আমি পুরোপুরি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। অগত্যা হতাশ হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখি। ঠিক তখনি সুয়িং ডোর ঠেলে যে ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকে পড়েন তাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে পর পর কয়েকটি সীসের বল লাফিয়ে ওঠে! নিয়ন আলোয় তার কালো চুলে বৃষ্টির ফোঁটা চকমক করে। অধরে স্ফুরিত হাসিও বুঝি দেখতে পাই। বস্তুত একপলকে এরচেয়ে বেশি আর কিছু আমার নজরে আসে না। তখন পেছন থেকে কেউ গম্ভীর গলায় বলে উঠেছিল--ওই যে উনি এসে গেছেন। চম্‌কে মুখ ঘুরিয়ে দেখি ফেকু দাঁড়িয়ে, ঠিক আমার পেছনেই। আমাকে চম্‌কাতে দেখে ফেকু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে—চিনিস নাকি ভদ্রমহিলাকে?

৯. নির্মল তখন একটা গ্লাস পুরো ভর্তি করে অসিতের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে—নে, গলাটা ভিজিয়ে নে। আজকের দিনে মুখ শুকনো করে থাকতে নেই। নেশায় নির্মলেব মুখটা একটু লাগে, চোখ দুটো জুলজুল করছে। সমস্ত শরীরে হঠাৎ খুশি উছলে ওঠে ওর। আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলে—চমৎকার এই হোটেল, ফাস কেলাস এই বার—টেবিল চেয়ার দিব্য সবুজ আবছা আলো। ঠিক যেন ইন্দ্রপুরী। আজ নাচবে কে রে? তবুও অসিত মুখ তুলছে না দেখে জামার হাতায় একবার মুখটা পুছে নিয়ে বলে—ঠিক আছে, চলি বন্ধুগণ...বাই...আবার দেখা হবে। বলে টলতে টলতে সিঁড়ির মুখে এগিয়ে যায়—আবার ফিরে হাত নাড়িয়ে বলে—বাই...আমার সঙ্গে কোনো বিবাদ নেই...কারোর নেই। এদিকে যতদূর মনে পড়ে আমি নির্মলের কথায় বিশেষ কান দিইনি। কেননা আমি তখন আস্তে আস্তে মদ সিপ করছিলাম আর সমস্ত বন্ধুদের চোখ এড়িয়ে ওই ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করছিলাম। উনি কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে সুবোধের কাছে সম্ভবত তাঁর ঘরের চাবি চাইতে গিয়ে আরও হেসে হেসে

কী সব কথা বলেন আমি এতদূর থেকে কিছুই শুনতে পাই না। মহিলার পরণে গাঢ় নীল ভয়েলের শাড়ি, নীলে শাদায় ফুঁটকি দেয়া জংলা ব্লাউজ। আঁচলের পাশ দিয়ে যতটুকু বেরিয়ে আছে সেটুকু দেখেই বোঝা যায় ওই ভরাট স্তনের গঠনে কোনো খুঁত নেই। পাকা ফুটি ফলের মতো গায়ের রং, পাতলা প্লাস্টিকের মতো মসৃন শরীরের ত্বক। কোমরের কাছে শাড়িটা বেশ নামিয়ে দেয়া হয়েছে বলেই মাংসল পাছার ওপরের খাঁজটুকু আমার নজর এড়ায় না। সুতরাং আমি আর কোনো সাড়াশব্দ করি না বরং আমার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে চিন্তা করি দ্রুত। এমন সময় ফেকু আচমকা জিজ্ঞেস করে—ছবিটার নাম দিয়েছিস কী? আকস্মিক ফেকুর এই প্রশ্নে আমি কেমন থতমত খেয়ে যাই। কোনো কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। এ-ও বুঝি যে ফেকু আজ আমায় কেবল অপদস্থ করারই চেষ্টা করবে কিংবা নির্মলই বা উঠে চলে গেল কেন? কিন্তু কোনো কিছু ভেবে উত্তর দেবার আগেই অসিত মুখ তুলে জবাব দিয়েছিল—ছবির নাম, The dream and lamentation।

১০. তখন আমরা সকলেই হাতের গ্লাস নামিয়ে, কেউ আর মুখে তুলি না নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা, শুধুই অপেক্ষা। সুবোধের সঙ্গে অনেক ফস্টিনস্টি, কত হাসাহাসি ঢলাঢলি সব শেষ করে ভদ্রমহিলা এবার আমাদের দিকে মুখ তুলে চান, হয়তো তার চোখের কোনে ইশারাও খেলে যায়। ডান হাতের চাবিটি ব্লাউজের মধ্যে চালান করে বাঁ হাতে শুধু ওই পেরেকের ঠোঙাটি নিয়ে এবার উনি দ্রুত এগিয়ে আসেন সিঁড়ির দিকে। সম্ভবত দোতলায়, বা তিনতলায় কিংবা চারতলায় কোথায় তাঁর ঘর—কত উঁচুতে তাঁর আবাসস্থল, জানি না। আর ইতিমধ্যে আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় ফেকুর গায়ে তাঁর শাড়ির, তাঁর শরীরের উষ্ণ হাওয়ার ঝাপটা লাগে। দেখি, ফেকুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। মুখ চোখ ওর বিকৃত হয়ে আসে, দাঁতে দাঁত পিষে সে বলে—জানিস কেউ? এই ২য় প্রকৃতি সৃষ্টি করল কে? এই নাপামরকেট স্কাইক্রেপার টেলিভিশন নাইলন ধাড়ি মেয়েছেলের পাছাপিঠ...কে তৈরি করল এসব? তখন আমি ওর পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—বরং ফলো কর। সঙ্গে সঙ্গে ফেকু উঠে দাঁড়ায়—আমার এই বাণী বুঝি মন্ত্রের মতো কাজ করে। আমিও উঠে পড়ে পোষাকআশাক থেকে ধুলো ঝাড়ি, চুলে আলতো হাত বুলিয়ে নিই একবার। কিন্তু অসিত টেবিলের ওপর দু'হাতে মুখ গুঁজে বসে থাকে, কারোর দিকেই তাকায় না। বুঝতে পারি খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে ছেলেটা—কিন্তু কী-ই বা করা যায়? আমি অসিতের কাঁধে হাত রেখে বলি—আজ আমাদের। আজকের দিনটা আমাদের। তখন অসিত মুখ তুলে ভীত চোখে করুন তাকালে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিলাম—স্নো, মেখেছিস নাকি? মুখের সামান্য রং বদলও ধরা পড়ছে বেশ। ওদিকে নীল শাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। আমরাও আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ওকে অনুসরণ করি। টপকে টপকে যাই সিঁড়ির ধাপ। চোখের সামনে ভরাট পাছা নড়েচড়ে, জলভরা ভিস্তির মতো দোল খায় দোল খায়—আমাদের আরও টেনে আনে কাছে। দোতলা পার হই, তিনতলা পার হই, চারতলায় উঠবার সময় অকস্মাৎ সিঁড়ির বাঁকে থেমে গিয়ে মেয়েটি পিছন ফিরে তাকায়। স্থির চোখে দ্যাখে আমাদের আমরাও দেখি। কোনো কথা নেই, সাড়া নেই শব্দ নেই। ধারে কাছে কেউ কি কোথাও নেই যে এগিয়ে আসবে কেউ? ঠিক তখনই একতলায় একটা গ্লাস ভাঙার শব্দ হয়। আমি জানি এবার আমাদের দুজনের মুখ নীরব লম্পটের হাসিতে ভরে উঠবে। আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা কড়কড়ে নোট বার করে মেয়েটিকে দেখাই। মেয়েটির মুক ফ্যাকাশে হয়ে যায়—সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কোমর ভেঙে বসে পড়ে সিঁড়িতে তারপর হু হু করে কেঁদে ওঠে, কেবলি কাঁদে মাথা নাড়ায় আর

বলে—প্লিজ আজ আমি পারব না, প্লিজ, বিশ্বাস করুন...সঙ্গে আমার স্বামী আছেন। তখন হঠাৎ চারতলায় সিঁড়ির মুখের ছোট্ট ঘরখানায় দরজার খিল খুলে যায়—খটাং।

১১. সশব্দে ঘরের খিল খুলে একলাফে সিঁড়ির মাথায় বেরিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় নির্মল। শ্যাম্পু, চুল, সার্টের বোতাম খোলা, ঠোঁটে চুরোট, টেরিলিন টেরিকটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিখুঁত নিভাজ পোষাকে নির্মল দিগ্বিজয়ী নায়কের চেহারায় ফাটানো চিৎকার দিয়ে ওঠে—

হ্যাল্লো, মাই ফ্রেন্ডস! সমস্ত রেডি, লেট আস স্টার্ট।

তবুও আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে নির্মল অবাক হয়য়—একি? সব হা হয়ে আছিস কেন? আয় ভেতরে। তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বলি—উনি ভীষণ কান্নাকাটি করছেন। কেন করছেন তা অবশ্য আমরা কেউই জানি না। তবে এ অবস্থায় এঁকে একলা ফেলে যাওয়াও খুব মুশকিল। কে কাঁদে? বলে নির্মল দু'পা এগিয়ে এসে মেয়েটিকে দেখেই যেন পাথর হয়ে যায়। নিস্পন্দ নিথর, চোখের পলকও পড়ে না আর। গোটা মুখ ওর থমথম করে। তখন হয়তো ওদের দুজনের মধ্যে কোনো বোঝা পড়া আছে এরকম ভেবেই আমরা পাশ কাটিয়ে আরও এগিয়ে যাই। ঘরের ভিতর থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। ভেসে আসে মেয়েলি গলার গান। একটু শুনেই বুঝতে পারি এটা আমার শোনা গান, চেনা সুর...। সব গানেরই সুর এত করুণ হয় কেন? যেমন ঠিক রং মাখা ক্লাউনের হাসি? কিন্তু আর বেশি কিছু ভাবার আগেই কোথা থেকে অভয় এসে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল—তোর ছবিটা শেষ হয়েছে? ছবি শেষ করবি কখন? পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি নির্মল তখনও টান হয়ে দাঁড়িয়ে—নীরব, নিথর।

১২. তখন ছবিটা শেষ করার জন্য ঘরে ঢুকে দেখি মা খাটে শুয়ে আছে। যদিও মা শুয়ে আছে কিন্তু জেগেই ছিল। এমন সুযোগ আর পাবো না বলেই তখন আমি মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকি—মা, তুমি আজও কেন এই খাটে শুয়ে আছো? আজ থেকে এই খাটে আমার বউ শোবে এখন। মানে আমার স্ত্রী, আমার ধর্মপত্নী। এখন তোমার এই খাট দখল করে থাকা ঠিক নয়। তারপর আরও তাকে জানাই যে সে যদি পাশের ঘরেও গিয়ে শোয় তাহলেও এই স্ল্যাবের দেয়াল এত পাতলা যে পাশের ঘর থেকেও আমাদের নড়াচড়ার আওয়াজ শোনা যাবে। মা আমাকে নির্লজ্জ ভাবুক এটা আমি চাই না। কিন্তু আমিও বা কী করতে পারি? এসব আমি অভয়কেও বোঝাই। তখন মা ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। এবং আমাদের দুজন, কারোর দিকে না তাকিয়ে মা ঘর ছেড়ে আস্তে আস্তে নুয়ে বেঁকে বেরিয়ে যায়। এমন সময় অভয় বলে যে ও একটু বাথরুমে গিয়ে স্নান করবে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘামে জামা গেঞ্জি সব ভিজে আছে। স্নান করে ও তাজা হবে। তখন আমি বলেছিলাম—তুই স্নান করতে যা। ফিরে এসে দেখবি আমার ছবি শেষ। বেশি সময় আমি নিতে চাই না। অভয় তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলে আমি বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। বাইরে তখনও রিমঝিম বৃষ্টি, দমকা হাওয়ায় বৃষ্টি আরও ঝেঁপে আসে। ওই ঝাপসানো বৃষ্টির আড়ালেই লক্ষ করি সব মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে সকলে নাগালের বাইরে—ওই বৃষ্টির ধোঁয়ার মধ্যে। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে একটু ভয় পেতেই হয়, সেহেতু, আমি সামান্য নার্ভাস হয়ে পড়লে পকেট থেকে এ্যানাটেনসলের বড়ি বার করে মুখে পুরে চুষতে থাকি। এভাবে কিছু ঠিক হয় না জানি। ঠিক করা যায়ও না। তবু এভাবেই আমি চেষ্টা করি নিজেকে সামলে নিতে। হাওয়া কমলে বৃষ্টির ঝাপটা মিইয়ে আসে। সেই সময় দূরে দেখতে পাই একটা বটগাছের

তলায় অসিত দাঁড়িয়ে ভিজছে। একা। ওর কাছে কেউ কোথাও নেই। আমি বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে হাত নেড়ে ডাকি ওকে। ক্রমাগত ডাকি—আয়...আয়...। তবু ও একবার ফিরে চায় না। আমায় দেখতে পেয়েছে বলে মনেই হয় না।

১৩. সম্ভবত আমি বাথরুমের দিকেই ঘন ঘন তাকাচ্ছিলাম বলে মেয়েটি এবার এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খুলে দেয়। তখন ফেকু বেরিয়ে এসে আমায় দেখে বলে—বাঃ, এসে গেছিস। অথচ মেয়েটি কারোর দিকে না তাকিয়েই একনাগাড়ে বকে যেতে থাকে—কে আগে বসবেন? আপনি না উনি? কে আগে করবেন? তিনি না উনি? আমার ব্রেসিয়ার কি আমি নিজের হাতেই খুলব? বলেই মেয়েটি পাগলের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বাভাবিক হাসি হাসে—হি-হি-হি-হি...। ওর পায়ে ঘুঙুর বাঁধা ছিল বলে হাঁটাচলার সময় শব্দ হচ্ছিল রমঝম, রমঝম। মেয়েটি এবার ঘরের মাঝখানে যেয়ে হাতের আঙুলে নাচের মুদ্রা তোলে, ভুরুদুটো নাচিয়ে চোখ স্ফুরিত কটাক্ষ হানে কাকে ঠিক বোঝা যায় না। গোটা শরীর তার ঠমকে ঠমকে দুলিয়ে গান ধরে—

বহু দাগা বুক পেতে নিছি
জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর তো রব না...।

এসব শুনে ফেকু খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে টুসকি মেরে বলে ওঠে—সাব্বাস, চমৎকার। এতক্ষণ আমি শুধু মেয়েটাকেই দেখছিলাম। শরীরের প্রতিটি অংশে চোখ বিঁধিয়ে, ভালো করে খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। তবু ফেকু আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করছে না দেখে বাধ্য হয়েই এবার আমি বলতে শুরু করি। আমি ওকে বলি যে সে এই মেয়েটাকে কোত্থেকে ধরে এনেছে? ওর তো মাই-ও নেই, পাছা-ও নেই। মাইদুটো ঠিক যেন চোপসানো বেলুন। আর মেয়েমানুষের পাছার হাড় বেরিয়ে যায় এতো আমি জানতাম না। তখন ফেকু আমায় চোখ টিপে বলেছিল—বিছানায় কাজ দেবে ভালো। পরক্ষণেই আবার কী ভেবে যেন বলেছিল—চল ভাই, তবে চারতলায় যাই—সেখানেই আসল মজা।

১৪. খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে দেখতে পাই গোটা ঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ফুলের গন্ধে চারিদিক মঁ-মঁ করে। চারিদিকে কেবল যুবতীর মেলা, তাদের কলরোল। এক কোনায় খাটের ওপর বিয়ের কনে বসেছিল ; নীল বেনারসি শাড়ি, শাড়িতে বসানো জরির চুমকি আর হাতে গলায় কানে জড়োয়া গহনাগুলো বুঝি হাজার পাওয়ারের ধাঁধানো আলোয় ঝকমক করে। কিন্তু কনের মুখের ওপর দিয়ে একটা শাদা জালের ওড়না, তাই ওর মুখ আমি ভালো ঠাওর করতে পারছিলাম না। তবে এসব দেখে শুনে আমি ফেকুর ওপর খুবই খুশি হয়ে উঠি। অথচ ফেকু তখন আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে যে বন্ধুদের বিয়েগুলো এখন ও খুব সহজভাবেই নিতে পারছে। আজকাল সবকটা মাতাল রাত ১২টার পর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অপেক্ষারত বউমাদের বলি--নাও, তোমাদের ধন ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। শেষে একা আমি বন্ধঘরের তালা খুলি আমার কোনো বিকার হয় না। স্বভাবতই এবার আমি বিরক্ত হয়ে বলি—তোর নাকি আত্মা জেগে গ্যাছে? একথায় ফেকু লাজুক কিশোরীর হাসি হাসে মৃদু মৃদু। তাই দেখে আমি আরও চটে গিয়ে বলি--তোর আত্মাটা আমার কাছে বিক্রি করবি? আমি তোর বোনাস বাড়িয়ে দেবো। কিন্তু তার আগেই ফেকু হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করে, হি হি করে হাসে আর বলে—তোর ঠোঁটে মুখে রক্ত লেগে কেন? ফেকু হাসে...কেমন কিম্ভুত দেখাচ্ছে...হি হি...মুছে ফ্যাল...ফেকু হাসে, হাসতে হাসতে কাশে, এত জোরে যে ঘরের

সকলে ঘন ঘন ফিরে তাকায়। হয়তো ওর কাণ্ড দেখেই কিংবা হাসিটা সংক্রামক বলেই এবার আমিও হাসতে শুরু করি। হাসতে হাসতে কাশতে থাকি। পাছে ঘরের লোকেরা আবার বিরক্ত বোধ করে এই জন্য আমি ফেকুর হাত ধরে বাইরে টেনে বারান্দায় নিয়ে আসি। বারান্দায় রেলিং ধরে পেটে হাত দিয়ে আমি বলি—উফ্...আর হাসাস নে...হোঃ হোঃ মাইরি হিঃ হিঃ...মাইরি বলছি আর হাসাস নে...ছবিটা...ওফ্...ছবিটা শেষ করব কখন? আর তো সময় নেই...হাঃ হাঃ—মাইরি আমার। হাসির দমকে এবার আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

১৫. ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজার পর্দা অল্প একটু ফাঁক করে দেখি একবার। ফেকু আমার পিছনে ছিল, বোধ হয় আমার সম্মতির অপেক্ষা করছিল বলেই আমি ওকে বলি যে আগে আমি ঘরে ঢুকে অবস্থাটা বুঝি। যদি ওর মেজাজ ভালো থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ফেকুকে আমি ডাকব, ওকে আমি বঞ্চিত করব না। ফেকু এক কথায় রাজি হয়ে যায়, তাই আমি ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিই। বিছানায় মেয়েটি চিৎ হয়ে শুয়েছিল, বুক থেকে কাপড় সরে গ্যাছে, গাঢ় ঘুমে এ্যাকেবারে কাদা। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ানো বুক ওঠা নামা করছে। ব্লাউজের বোতাম অবশ্য ঠিক মতোই সবকটা আটকানো ছিল, তবে ভিতরে ব্রেসিয়ার ছিল না বোধ হয়। তা ছাড়া নীল ভয়েলের শাড়িটি ঠিক কোমর পর্যন্ত তোলা। সুতরাং আমি কোনো বর্ণনা দিতে চাই না অবশ্য। তবে একথা ঠিক যে মেয়েটি কিছুক্ষণ আগে এত বেশি শারীরিক সুখ পেয়েছিল যে তার পক্ষে এখন জেগে থাকা খুবই কঠিন। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমার কোমর থেকে বাকি শরীর ক্রমশ ভারী হয়। আবার এ-ও মনে হয় যে এখন ওকে না জাগিয়ে বরং দাড়িটা কামিয়ে নেওয়াই ভালো। সুতরাং আমি আয়নার সামনে বসে দাড়ি কামাই। দাড়ি কামাতে গিয়ে লক্ষ করি চোয়ালের তলায় দু'তিনটে দাড়ি পেকে আছে। তবু আমার চুল একটাও পাকেনি, এতে আমি একটু স্বস্তি বোধ করি। দাড়ি কামিয়ে পাশেই বাথরুমে হাত মুখ ধুতে যাই। হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি—মেয়েটি নেই, দরজা খোলা। ফেকুও নেই। টেবিলের ওপর পেপারওয়েটের তলায় একটা শাদা কাগজের টুকরো। তাতে লাল কালি নয়, লাল লিপস্টিক দিয়ে লেখা ছিল—ভুলো না প্রিয়, আজ শনিবার। লেখাটা পড়বার পর হঠাৎ আয়নায় আমার চোখ পড়লে আমি শিউরে উঠি। দেখি আমার সমস্ত গাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে—বীভৎস ভয়ংকর বিকৃত রক্তে মাংসে মাখামাখি আমার মুখ কী বিকট বেটপ দেখায়। হতে পারে যে দাড়ি কামাতে গিয়ে হয়তো আমি আমার গাল কেটে ফেলেছিলাম। অথচ আয়নায় এখন নিজের ওই চেহারা দেখে রাগে আমার গোটা শরীর জ্বলে ওঠে। ঘেন্নায় আমি থুথু ছেটাই আয়নার কাচে আমার থুথু ছিটিয়ে পড়ে—থুঃ থুঃ। যত ছেটাই ততই দেখি আয়নার মধ্যে আমার মুখ আরও বিকৃত আরও ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে চতুর্দিকে।

১৬. বারান্দা থেকেই আমি শুনতে পাই ঘরের ভেতর ঘুঙুরের মিঠে আওয়াজ। আমার কানে আসে। আমি এবার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলে দেখি পাশের বাথরুম থেকে একটি মুখোশ পরা সম্ভবত মানুষ—নাচতে নাচতে ঘরে এসে ঢুকল। তাকে দেখে কনেকে ঘিরে সুন্দরী যুবতীর দল খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে। কত বিচিত্র তাদের সাজ পোষাক, শরীরে তাদের কত রং—আমার নেশা ধরে যায়। সেই সময় আমি ফেকুকে বলি—অভয়ের সত্যিই মাথা আছে। বেশ করেছে সব, তাই না? তখন ফেকু আমার প্রশ্ন করে—অভয় কোথায়? তারপর অভয় বাথরুমে আছে শুনে ফেকু অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে বলেছিল—বাথরুমেই তাহলে আসল মজা, আরও বলেছিল—নির্ঘাত অভয় বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে আছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

কিন্তু ওর কথা আমার কানে কিছু ঢোকে না। আমি শুধু ওই মুখোশ-পরা লোকটার নাচ দেখি। লোকটা পাছা দুলিয়ে কোমর বেঁকিয়ে কনের ওড়না ঢাকা মুখের কাছে গিয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে গায়—আমি ঢের সয়েছি আর তো সব না। তারপর হঠাৎ এক লাফে ঘরের মাঝখানে চলে এসে বারবার পাছা নাচায় আর গায়—এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব আর তো রব না। লোকটার হেড়ে ভাঙা খোনা গলার গান শুনে আমার খুব বাজে লাগে। বাথরুমেই আসল মজা—আবার একথা ফেকু বলে উঠলে আমি ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলাম—লোকটা মাঝখানের লাইনগুলো বাদ দিচ্ছে কেন? পুরো গানটা ও গায় না কেন? তখন ফেকু আমার কাছে জানতে চায় যে আমি এত চটে যাচ্ছি কেন? কারণ মেয়েটা তো আর কোথাও যায় নি। ঘরেই আছে। অপেক্ষা করছে আমার জন্য। বরং ফেকু ওকে ছাদে ডেকে নিয়ে দুজনের জন্য ১৫ টাকায় রাজি করিয়েছে। আরও বলেছে যে খুশি করতে পারলে পরে হাত ভরে দেবো। তখন মেয়েটি গদগদ হয়ে ওকে চুমু খেতেই ও একবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দু'মিনিটের মধ্যে করে নিয়েছে। তা আমার তো গালে সাবান ঘষতেই লাগে দু'মিনিট এর চাইতে কমসময়ে করা যায় কি? যায় কি? ফেকু আমায় যেন চ্যালেঞ্জ করে। সে সময় হয়তো আমি কিছু বলতাম, কিন্তু তার আগেই নৃত্যরত লোকটির সারা শরীর দুলুনির চোটে মুখ থেকে মুখোশটা খসে পড়ে যায়। ফলে বাসর ঘরের কনে তখন মুখের ওড়না সরিয়ে লোকটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ চিৎকারে চিরে যায় ঘরের বাতাস। মনে আছে ফেকুর হাত খুব শক্ত করে চেপে ধরে আমি তখন বলেছিলাম—বাণী তোর চিঠি আমি পেয়েছি। তবু আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি সংজ্ঞাহীন বাণীর অচেতন দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে। সঙ্গত কারণেই ফেকু তখন ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—এভাবে একটা হিজড়েকে নিয়ে এসে বাসরে নাচাবার কোনো মানেই হয় না। বলে দ্রুত সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে লাইটটা অফ করে দিয়েছিল। তারপরই অন্ধকার।

১৭. ক্রমশ চারিদিক স্তব্ধ হয়ে এলো। কোথাও আর কোনো সাড়াশব্দ শোনা যায় না। শুধু একতলায় কখন যেন একটা কাঁচের গ্লাস খান খান শব্দে ভেঙে পড়ে। তখন আমি ফেকুকে টেবিলের ওপর থেকে মোমবাতি তিনটে নিয়ে আসতে বলি। ফেকু আলো জ্বালাতে চাইলেও আমি নিষেধ করি। বলি মোমের আলোয় অয়েলের ছবি খুলবে আরও ভালো। দেখিস তুই। অগত্যা ফেকু দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সাবধানে পা ফেলে পা ফেলে টেবিলের সামনে গিয়ে হাজির হয়। একটু বাদেই ইজেলের সামনে উঁচু টুলের উপর পর পর তিনটে মোমবাতি জ্বলে উঠলে আমি ছবির উপরের ঢাকনাটা সরিয়ে দিই। তখন দেখা যায়—কাঠের চেয়ারে মেয়েটি হেলে আছে। দুই উরুর ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তিরতির করে। পায়ের নীচে শূন্য চায়ের কাপ। তার মধ্যেও কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। কাপের গা বেয়ে এগিয়ে আসছে পিঁপড়ের সার। মেয়েটির চোখ দুটো বোজা, মুখে যন্ত্রণার বিকৃত চিহ্ন। ব্রেসিয়ার ফেটে বেরিয়ে আসা স্তনের উপর একটি বড়ো মাকড়সা বসে জাল বোনে।

১৮ তখন অন্ধকারে নীলা এসে আমার হাত ধরে টানে। টেনে ঘরের এক কোনার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। মেঝেতে যদিও কার্পেট পাতা ছিল তবু নীলা বলে—জুতো খুলে...। ফলে ওর নির্দেশমতো আমি জুতো খুলি এবং দুজনেই জুতো খুলে খালি পায়ে হেঁটে যাই বলে আমাদের চলাফেরার বিন্দুমাত্র শব্দ হয় না। কেউই টের পায় না কিছু। অন্ধকারেই আমি নীলার হাত ধরে এগিয়ে চলি। অন্ধকারে যদিও আমি ওর মুখ দেখতে পাই না তবুও ও যে নীলা—এতে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। ঠিকমতো চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না বলেই আমি অন্ধকারে

দু'একবার হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে যাই। তখন পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বালাতেই আবছা দেখি ফেকু খাটের উপর মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে অর্থাৎ বিয়ের কনেকে বুকের তলায় চেপটে ধরে চুমু খাচ্ছে। ফস করে আলো জ্বলে উঠতেই ওরা ছিটকে দুজনে দু'দিকে সরে গেল। সুতরাং খুবই লজ্জা পেয়ে 'সরি' বলে আমি এক ফুঁয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে ফেলি। এভাবে ওদের বিব্রত করা ঠিক নয়। নীলাও আমার কথায় সায় দিয়ে বলে—নিশ্চয়ই। তবে আমরা কেউই আর এ সম্পর্কে বেশি মাথা ঘামাই না। অন্ধকারেই দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যাই। তারপর সম্ভবত বারান্দা দিয়ে যেহেতু বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগছিল, কিংবা সিঁড়ি বেয়ে কেননা আমার উঠতে কষ্ট হচ্ছিল—হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। এইভাবে দীর্ঘ সময়, দীর্ঘ পথ পার হয়ে আমি নীলার পিছু পিছু যে ঘরে এসে ঢুকি তার দেয়াল কেমন ভিজে। সেই ঘরের মেঝে বড়ো পিছল। অন্ধকারেই আন্দাজে কখন যেন ঠিক জায়গামতো পৌঁছে নীলা সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেয়। স্বভাবতই এরপর নীলা বলে—এখানেই আমরা ভালো থাকব। এখানে আমাদের কাজের কেউ ব্যাঘাত করবে না। তারপর নীলা একে একে শাড়ি শায়া ব্লাউজ সব খুলে ফেলে। শুধু ব্রেসিয়ারটাই থাকে ওর গায়ে। ঘরের মধ্যে একটা পুরোনো বাথটাবের পাশে ওই ভেজা মেঝেতেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে নীলা। চিৎ হয়ে শুয়েই নীলা গোঙাতে থাকে। পরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বড়ো আফশোসের সুরে বলেছিল—জানেন, আমি চারসেট জড়োয়া গহণা পেয়েছি। অথচ একেবারে আমি একসেটের বেশি কখনই পরতে পারব না। তাহলে আমার চারসেট পেয়ে কী লাভ হলো, বলুন তো? বলতে বলতে নীলার চোখে জল ভরে ওঠে। নীলা ছটফট করে আর গোঙায়। আর তখুনই ওই পুরোনো বাথটাবটার মধ্যে ছপছপ সপসপ আওয়াজ শুরু হয়—যেন ওই জলভরা বাথটাবটার মধ্যে কেউ নড়াচড়া করছে, ওলটপালট খাচ্ছে। সহসা আতঙ্কে আমি চমকে উঠি—কে? মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই বাথটাবের ভিতর থেকে অভয়ের মুখ, ওর ভেজা শরীর ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে। আমার দিকে চেয়ে অভয় মেঝেতে থুঃ থুঃ করে থুথু ছেটায় আর মুখ বিকৃত করে বলে—বড়ো নোংরা গেল রে! গা হাত পা সব নোংরা হয়ে গেল—থুঃ!

১৯. বারান্দা থেকে আমি অবশ্য লক্ষ করছিলাম ফেকু কখন বেরিয়ে আসে। ফলে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফেকু বেরিয়ে এলে তা আমার দৃষ্টি এড়ায় না। আসলে আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। তাই অন্ধকারে ফেকুর ছায়া মিলিয়ে গেলে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে যাই। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে খাটের দিকে এগোতে গেলে মিস্টি সেন্টের গন্ধ নাকে এসে লাগে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে হয় না যে খাটের ওপর এখন বিয়ের কনে শুয়ে আছে। তবে ঠিক শুয়ে নয়। কেননা কিছুক্ষণ আগে ফেকু যখন বেরিয়ে গেল তখন সে নিশ্চয়ই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ঘুমোচ্ছে। আমিও ঘুমোতে চাই নির্বিবাদে। বহুদিন ভালো ঘুম হয় না আমার। বিশেষত শরীরে আমার এত অবসাদ জমে আছে যে ক্রমাগত সকাল, দুপুর সন্ধে, রাত্রি একটানা পর পর কয়েকদিন ঘুমিয়ে নিতে পারলে হয়তো আমার শরীর সুস্থ হতো। আমার মাথা ঠান্ডা হতো। আমার যৌনক্ষমতাও হয়তো আমি ফিরে পেতাম। এখন যেন শরীর থেকে হাড়, হাড়ের থেকে খিলগুলো খুলে বেরিয়ে আসতে চায়। অথচ পাছে বধূর এই পরম পরিতৃপ্তির ঘুম যেন না ভাঙে তাই আমি সন্তর্পণে খাটের একপাশে খুবই আলতোভাবে গা এলিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার হাত ধরে টানে। তবু আমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি। মড়ার মতো। পিছন ফিরে তাকাইও না একবার। কিন্তু সে আমায় ছাড়ে না। বারংবার আমার হাত ধরে টানে, আঙুল দিয়ে খোঁচা মারে। আরও ঘন হয়ে আসে আমার শরীরের কাছে। এমনকি শেষপর্যন্ত

তার দুই উরু দিয়ে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরলে স্বভাবতই আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। একলাফে উঠে বসে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে বলি—কী চাও তুমি? তখন সে কাঁপা গলায় বলেছিল—আমার ফুটোটা একটু বড়ো করে দেবেন। নইলে বড্ড লাগে। এমন সময় ঘরের ভেতর কে যেন 'খুক' করে হেসে ওঠে। বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুতের চকিত আলোয় দেখি নির্মল ঠিক ঘরের মাঝখানেই একটা চেয়ারে বসে। তার সামনে টেবিলে পর পর তিনটে বোতল। তখন আমি বেড সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিই। দেখি দেশি মদ নির্মল বোতল থেকে সরাসরি গলায় ঢেলে খায়। আলো জ্বলে উঠতেই নির্মলের গলা গমগম করে ওঠে—শেষ লাথিটা মারার আগে আমার তিনবোতল দেশি চাই। পরেই আবার 'খুক' করে হেসে বলেছিল—আত্মার ফুটো এত ছোটো যে লিঙ্গ ঢোকে না। বড্ড লাগে। বলেই হাঃ হাঃ করে ঘর ফাটানো হাসি হেসে উঠেছিল নির্মল। বুঝতে পারি অনেকক্ষণ থেকেই ও মদ টানছে। বেশ নেশা হয়ে গেছে ওর। নইলে 'যোনি' বলতে গিয়ে ও 'আত্মা' বলবে কেন?

২০. আমাকে তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অভয় এবার উদোম গায়ে বাথটাব থেকে নেমে আসে। নেমে এসে জিজ্ঞেস করে যে এই বাথটাব কতদিন পরিষ্কার করা হয় না? কতলোক এসে এর ভেতরে স্নান করে গ্যাছে। তাদের সকলের শরীরের ময়লা জলের মধ্যে ভাসছে। সাবান কাটা ময়লা কালো সর হয়ে জলের ওপর ভাসছে। সব ময়লা আমার গায়ে লেগে গেল। থুঃ থুঃ! সমস্ত শরীব আমার নোংরা হয়ে গেল রে। এখন কী করি? তখন আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি অভয়ের কথাই ঠিক। বাথটাবের জলের ভেতর হাত ডুবিয়ে দেখি তলায় ময়লা জমে ফুটো বন্ধ হয়ে আছে। জল সরছে না। অগত্যা বাধ্য হয়েই আর কোনো উপায় না দেখে আমি মেঝেয় পড়ে থাকা ছোট্ট মগখানা হাতে তুলে নিই। ওই মগ দিয়েই তারপর আমি বাথটাব থেকে জল ছেঁচে ফেলতে থাকি। অভয় আমায় প্রচুর উৎসাহ দেয়—পুরোটা ছেঁচে ফ্যাল ভাই। আমি একটু পরিষ্কার জল দিয়ে স্নান করব। কিন্তু ওই ছোট্ট মগে কতটুকুই বা জল ধরে? আধঘণ্টা খানেক বাদে দেখি আমার কোমর টনটন করে, মাথা টিপটিপ করে, চোখ কটকট করে। অথচ তখনও ওই বাথটাবের ময়লা জলের পরিমাণ কমেনি একটুও। এবার আমি হাতের মগ ফেলে দিয়ে রসিকতা করে বলি—অভয় বয়স হয়ে গ্যাছে রে! এখন এই জঞ্জাল পরিষ্কার করা আমার সাধ্যি নয়। বলেই মুখ ফিরিয়ে দেখি অভয় নেই। নীলাও নেই। কেউ কোথাও নেই। ওরা গেল কোথায়? আমি আবারও ডাকি—অভয়!

২১. আধো তন্দ্রার ঘোরে এবার আমি দেখি যেমন মানুষ ঠিক স্বপ্নে দেখে থাকে। সেই ভাবেই দেখতে পাই অভয় আমার ঘরে বসে আছে। কোথাও যায়নি। অভয়ের হাতে রংয়ের প্যালেট আর তুলি। ইজেলের দিকে চেয়ে দেখি আমার ছবিটা পালটে গেছে। আসলে আমি খুব শ্রান্ত বোধ করছিলাম বলেই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। কোমর ভেঙে আসে। ফলে মেঝেতে বসে বসেই দেখি ইজেলের মেয়েটি হয়ে গ্যাছে মারমেইড, জলের মধ্যে সাঁতার কাটছে। মাকড়সা পাল্টে হয়েছে সূর্য। তবে জলের আড়ালে বলে তার তেজ তত তীব্র নয়। ঠান্ডা কোমল ঠিক জোছনার মতো। আর চায়ের কাপের জায়গায় একটা শাদা কাগজের নৌকা ভাসছে। গোটা ছবি জুড়ে নীলে সবুজে মেশানো এমন এক রং ফুটে বেরোয় যা কিনা শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। এমন সময় বাথরুমের দরজা খুলে ফ্রক দুলিয়ে বেণী নাচিয়ে ছুটে আসে বাণী। আর সামনের বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢাকে মা। বাণী বলে—শিল পড়ছে...শিল...চলো দুজনে মিলে বৃষ্টি ভিজে শিল কুড়োবো। বলে বাণী হাত বাড়ায়। কিন্তু আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারি না। ওদিকে মা শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বলে—আর তো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

এবার আমায় একটু ঘরে ঠাঁই দে। মা আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখে ঠক ঠক করে কঁপাতে কাঁপতে মেঝেয় বসে পড়ে—আমার সামনে। মা'র ভেজা ধুতি থেকে জল ঝরে। মেঝেতে গড়িয়ে যায়। দুজনেই শূন্যদৃষ্ট—মুখোমুখি তাকিয়ে থাকি শুধু। তখন চুরোট কামড়ে অভয় বলে—কেন তুই এত মা মা করিস এবার বুঝতে পারি। আসলে তুইও একটা বিধবা। এমন সময় একটা শোরগোলের আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

২২. আসলে বাথরুমের ভেতর থেকেই আওয়াজটা আসছিল। গিয়ে দেখি চারিদিকে হৈচৈ, হট্টগোল আর ভিড়—তারই মাঝে সংজ্ঞাহীন বাণীর অচেতন দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে। ফেকু তাকে বাতাস করে। চোখে-মুখে জল দেয়। নাড়ি দ্যাখে। ডাক্তারের মতোই পরীক্ষা করে ওকে। আর বাণীর মাঝে মাঝেই খিঁচুনি ওঠে, কখনো গোঙায়। আমাকে দেখতে পেয়ে ফেকু তাড়াতাড়ি উঠে চলে আসে আমার কাছে। উত্তেজিত স্বরে বলে—একটা ডাক্তার ডাকা দরকার। তুই নীচে গিয়ে একটা ফোন করে দে। কুইক। পরক্ষণেই আমার মুখচোখের বিহ্বল অবস্থা দেখে প্রবোধ দিয়ে বলেছিল—গুরুতর কিছু নয়। হিস্টিরিয়া। কানাঘুষোয় যা শুনেছি তাতে মনে হয় যৌন অতৃপ্তি থেকেই এসব হচ্ছে। আরও পরে একটু হেসে—আসলে চারপাশে এত সব যৌন উপকরণ...এক জীবনে কতটুকুই বা ভোগ করা যায়...?...অতৃপ্তি থেকেই যায়। তারও পরে আমি তবু দাঁড়িয়ে আছি দেখে বলে—চলে যা, আর দেরি করিস নে।

২৩. নীচে নেমে এসে দেখি ঝমঝম বাজনা বেজে চলেছে। জোড়ায় জোড়ায় যুবকযুবতী নাচে, কত আহ্লাদ করে। তাদের ওই উল্লাসের মাঝখান দিয়ে আমি একা নিশ্চুপ কাউন্টারের দিকে হেঁটে যাই। ডাক্তারকে ফোন করি। ফোন করা শেষ হলে এক কোনায় আবছা অন্ধকারে একটা টেবিল দখল করে চুপচাপ বসে শুধু দেখি। এমনকি ওই বারের কোনো 'বয়' এসেও আমায় আর বিরক্ত করে না। তবুও ওই সমস্ত গোলমালের মধ্য থেকে কখন যেন সুবোধ মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে আমার কাছে নিয়ে আসে। বলে—এবার তুই মজা লোট। মেয়েটি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে আমার সামনে। সুবোধ বয়কে ডেকে আমাদের দুজনের জন্য মদের অর্ডার দিয়ে চলে যায় কাউন্টারে। সেখানে গিয়ে ও রেকর্ড প্লেয়ারের রেকর্ড পালটে একটা নতুন গান চাপিয়ে দেয়। পর মুহূর্তেই ভরাট গলায় গমগমে সুরে বেজে ওঠে—We're in the same boat brother...। গান শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে নদীর রূপোলি জল, তার দু'পাশের চওড়া সবুজ বন, হলুদ বালি ঝিকিমিকি...উদ্দাম বাতাসে নৃত্যরত নিগ্রো বালকের দাঁতের শাদা ঝকঝক আমার চোখের ওপর ছবি হয়ে ভেসে ওঠে। আমি কেবলই বিমনা হয়ে যাই। এমন সময় বয় এসে আমাদের সামনে স্কচ হুইস্কির গ্লাস নামিয়ে রাখে। সঙ্গে আলুমটর, পাঁপড় বাদাম ভাজা। মেয়েটি এবার ফিক ফিক করে হাসে। চোখে চোখ পড়লে বলে—এত গম্ভীর কেন? কথা বলেন না কেন? আমি তখন সামান্য হেসে দিলে সম্ভবত ও সাহস পেয়েই এবার বলে ওঠে—আমার বড্ড খিধে পেয়েছে। আলু-মটরের প্লেটের দিকে লোলুপ তাকিয়ে বলে—সকলে মদই খাওয়ায়। খাবার কেউ খাওয়ায় না। আমার সঙ্গে খাবার আছে...আমি খাই।...কেমন? বলে আদুরে ভঙ্গিতে মাথা কাত করে ও আঁচলের আড়াল থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বার করে। ওই ঠোঙাতে অবশ্য পেরেক ছিল না ঠিক ছিল আটার রুটি। এদিক ওদিক একবার দ্রুত দেখে নিয়েই ও আর আমার অনুমতির অপেক্ষা করে না। আটার রুটি ছিঁড়ে আলুমটরে মাখিয়ে গপগপ করে ও গিলতে শুরু করে। খায় আর আমার মুখের দিকে চেয়ে হি হি করে হাসে। আমি তখন জিজ্ঞেস করি—তোমার নাম কী? রুটির দলা গলায় আটকে গেলে মেয়েটি জলের মতো হুইস্কি খায়। তারপর একটু দম নিয়ে

বলে—আমার কী একটা নাম? আমার এক এক বাবু আমায় এক এক নাম ধরে ডাকে। কেউ ছবি...কেউ নীলা...কেউ বাণী...কত নাম আমার। পরে হয়তো আমি ওর এই কাঙালপনা খুব সহজভাবে নিচ্ছি ভেবেই চুপি চুপি বলে—ওই মেনুকার্ডে যা যা খাবার আছে সব একদিন আমায় খাওয়াবেন? প্রথম থেকে সব...একেবারে শেষ অবধি?

২৪. তখন সুবোধ পেছন থেকে বলে—এখনও বসে? পছন্দ হচ্ছে না বুঝি হাত ধরে আমায় চেয়ার থেকে টেনে তোলে। তবে চল চারতলায় যাই। সেখানেই আসল মজা। আমি উঠতে চাই না তবু ও জোর করেই আমায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। হ্যা হ্যা করে হাসে আর বলে—শিরদাঁড়াটা সোজা রাখ। দেখবি তোর সব অসুখ সেরে যাবে। এর ওপরেই সব দাঁড়িয়ে...সকলেই জানে...। তুই একটা হিজড়ে নাকি...এ্যাঁ? সুবোধ আমার কাঁধ চেপে ধরে সিঁড়ি বেয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। আমার আর সহ্য হয় না। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলি—তুই কি জোর করবি? নেশায় সুবোধের মুখ টকটকে লাল। আমায় আবারও টেনে নিয়ে উঠতে উঠতে বলে—তোর সন্নিসীগিরি আমি ছুটিয়ে দেবো...। ওর কথা শুনে হঠাৎ আমার মাথায় যেন আগুন ধরে যায়। হয়তো সঙ্গত কোনো কারণ ছিল না তবু একতলায় কোথায় যেন পর পর কয়েকটা কাচের গ্লাস ভাঙার শব্দ হলে আমার ভেতর এক হিংস্র দানব গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। আমি একলাফে সুবোধের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে ওকে ঠেসে ধরি সিঁড়ির ধাপেই। তলপেটের তলায় হাত চালিয়ে আমি এবার ওর আসল শিরদাঁড়াটা চেপে ধরি—যার ওপর সব কিছুই দাঁড়িয়ে...নাপামরকেট স্কাই-ক্রেপার টেলিভিশন নাইলন ধাড়ি মেয়েছেলের পাছা পিঠ...সব। এটাকে একবার বাঁকিয়ে ফেলতে পারলেই সব একসঙ্গে হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়বে...ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে সব। ক্রমাগত ওর কিল চড় লাথি খেয়েও আমি ছাড়ি না...সুবোধের ধুতিব মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে আমি ওই শিরদাঁড়াটাকে এবার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরি। তৎক্ষণাৎ আমাদের পাশ দিয়ে সশব্দে কে যেন গড়িয়ে পড়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি সিঁড়ির মাথায় নির্মল। আমাকে বলে—একটা ট্যাক্সি ডাক, হসপিটালে রিমুভ করতে হবে। ওর পেটে একটা বাচ্চা ছিল। নীচে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি সিঁড়ির বাঁকে হেলে পড়ে আছে। নীল ভয়েলের শাড়িটা কোমর পর্যন্ত তোলা। দুই উরুর ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তিরতির করে।

২৫. বেরিয়ে এলেই দেখি অপর ফুটপাতে একটা ট্যাক্সি ঘ্যাচ করে এসে ব্রেক কষলো। বাইরে তখন সান্ধ্য টেলিগ্রাম গরম খবর রেসের মাঠ থেকে ফেরা বাবুদের ভিড় লাল সিগনাল মিছিল ট্রাক উপচে পড়া ডাস্টবিন গর্ভনিরোধের বিজ্ঞাপন প্লেনের শব্দ রেস্তোরায় মজলিশ কারখানায় ভোঁ মোটর গাড়িতে সান্ধ্য ভ্রমণে পৃথুল মানুষের দল এইসব নিয়ে গোটা শহর আমার কাছে হাট করে খুলে যায়। তারই মধ্যে ট্যাকসির দরজা খুলে নামে বাণী। গায়ে নীল ভয়েলের শাড়ি, নীলে শাদায় ফুটকি দেয়া জংলা ব্লাউজ। রাস্তা পার হয়ে হাসিখুশি বাণী আমার দিকে এগিয়ে আসে। তখুনি আমি বুঝতে পারি এ বাণী নয়। কেননা এতক্ষণ আমি বাণীর কাছেই ছিলাম। সুতরাং ও যদি এসে আমার হাত ধরে তাহলে আমি সিম্পলি বলব—তোমায় আমি চিনি না কিংবা আমি আর দুঃস্বপ্নও দেখতে চাই না। মুখের রক্ত চেটে নিয়ে পিছনে। তাকিয়ে দেখি নিয়নে বিদ্যুতে জ্বলে উঠলে—Hotel De Luxe।

সুভাষ কুণ্ডু

হাংরি রচনা ধর্ম না অশ্লীলতা?

'আধুনিক যে কোনো মানুষের পক্ষে অশ্লীলতা, মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীর সর্দি-জ্বরের মতোই তুচ্ছ ও হাস্যকর।'

'মানুষের শেষ ধর্ম কবিতা'

১৯৬৩/৬৪ সালে বাংলা দেশে হাংরি অভ্যুত্থান পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাবের মতোই ঘটনা। এই অভ্যুত্থান এর নায়ক ছিলেন—বাসুদেব, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর, মলয়, প্রদীপ, সুবো, দেবী, উৎপল, সুবিমল, রামানন্দ। এই উত্থান আকস্মিক নয় ; অত্যন্ত সঙ্গত, স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এই হাংরি আন্দোলন বুর্জোয়া সভ্যতা ধর্ষিত ১৮ ইঞ্চি পলেস্তারা পড়া, ঝাঁঝরা নির্বিজ ভারতবর্ষের মাটিতে আত্ম-প্রকাশ করে, কিন্তু হিব্রুদের হাতে নির্যাতিত যিশুর মতোই এসব হাংরিরা কামার্ত স্ত্রী পুরুষ, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, নপুংসক রাজনীতি ও বুর্জোয়া এসটাব্লিশমেন্টের ঈর্ষা, ঘৃণা, ধিক্কারের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের দৃষ্টি সেই সঙ্গে এইসব শবপোবিষ্ট তান্ত্রিকদের উপর পড়ে। অপরাধ? তারাই প্রথম ভারতবর্ষের আসন্ন ঘনীভূত অন্ধকারকে দেখে ফেলেছিল। এদের রচনায় সরাসরি চিহ্নিত হয়েছিল এসটাব্লিশমেন্ট ও রাজনীতির ঔরসে জন্ম পাওয়া এক পৃথিবীর বিপর্যয়। পরিণামে এসব হাংরি লেখক/কবিরা—শৈলেশ্বর, সুভাষ ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায় চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায় গ্রেপ্তার ও অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হন। শুধু মাত্র এদেশের মাটিতেই এই ভয়াবহ, অমোঘ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ রইল না। সারা পৃথিবী এই আন্দোলনের প্রচণ্ড ধাক্কায় দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা শিশুর মতোই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইল। তারপর ঘোর কেটে গেলে কেউ কেউ গম্ভীর মন্তব্য প্রকাশ করলে ; আর কেউ কেউ হাংরি কবি/লেখকদের দিকে শ্লেষ্মা, থুথু, কফ ছুঁড়ে দিলেন—কেননা মেগাটন, হাইড্রোজেন আবিষ্কার ও তেজস্ক্রিয় বিস্তারও আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে এভাবে সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। এই শতাব্দীতে কবিতা আবার পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিলো।

১৯৬৪ সাল থেকেই যারা হাংরিদের ধ্বংস করার তালে ছিল, সেই পেটোয়া নবাবরা ১৯৬৫-তে চিৎকার করেছে হাংরিরা খতম, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ এ একই কথা বলে চলেছে এইসব ন্যাকা ভণ্ড সুবিধাবাদীরা। এটা কোনো রাজনৈতিক দল নয় যে ভেঙে গেলে শেষ বা কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম থাকতে পারে না এর যা সবাই মেনে চলবে। প্রত্যেকেই একা এবং একক—এদের কেউই ভদ্রতায় মুখোশ পরে না, নিজের ভালো লাগা বা মন্দ লাগার ব্যাপার সরাসরি বলে ফ্যালে—আর এক সঙ্গে ৫/৭ জন তীব্র লেখক কবি থাকলে তাদের মধ্যে তীব্রতম দ্বন্দ্ব এবং মতো বিরোধ যদি না ঘটে তবেই বলতে হয় এরা শেষ—শেষ পর্যন্ত একজন লিখতে পেরেছে কিনা, এটাই শেষ বিচার। মাঝে মাঝে এরা চুপ

করে·থাকে, তারপর হয় এক একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তাই হওয়া উচিত। ক্রমাগত লেখা এবং ক্রমাগত ছাপিয়ে যাওয়া এবং ক্রমাগত সম্পাদকের দপ্তরে লেখা পাঠানো যাদের উদ্দেশ্য এরা তারা নয়। এরা লেখে অতি কম, প্রতিটি লেখাকে শেষ লেখা বলে মনে হয়—যখন না লিখে উপায় থাকে না—নিরুপায়ভাবে তখনই এরা লেখে। হাওয়ার্ড ম্যাক্কার্ডের কথায়—হাংরিরা এখন আর একা নয়—সমগ্র ভবিষ্যৎ তাদের—ভারতবর্ষের প্রধানতম ভাষাগুলির সাহিত্যে আজ তাদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

গত ৪½ বছরে হাংরি বিস্ফোরণের অমোঘ ধাক্কায় যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে এবং যে ধীর এবং অনন্যোপায় স্বীকৃতি দেয়া চলেছে তার আংশিক পরিচয় ও ১৯৬৭-৬৮ সালে পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ হাংরি ঘটনা নীচে দেওয়া হল।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়: উপনিষদের সেইসব ঋষিকুলের কথা মনে হলে একটি প্রচণ্ড হাংরি-জেনারেসনের সুগম্ভীর আর্তগর্জন শুনতে পাই।...বাংলা দেশের হাংরি-জেনারেশনের লেখকদের প্রসঙ্গে এই ভূমিকার কারণ উপরোক্ত ভাবনার সঙ্গে এঁদের কিছু মিল আছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বলে আমরা লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হলুম যে হাংরি জেনারেশন নামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। এই প্রকার কোনো আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি না!...হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ভালো কি খারাপ আমরা জানি না। ওই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নাই। **এ পর্যন্ত ওদের প্রচারিত লিফলেটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি চোখে পড়েনি। নূতনত্ব প্রয়াসী সাধারণ রচনা কিছু কিছু হাস্যকর বালক ব্যবহারও দেখা গেছে**; এ ছাড়া সাহিত্য সম্পর্কহীন কয়েকটি ক্রিয়া কলাপ বিরক্তি উৎপাদন করে। তবে ওই আন্দোলন যদি কোনোদিন কোনো নতুন সাহিত্যরূপ দেখাতে পারে—আমরা অবশ্যই খুশি হবো। (কৃত্তিবাস, ১৯৬৬)

সাহিত্যের নামে এরা নোংরামি করছে। (দেশ, ১৯৬৪)

এদের লেখা পড়ে মনে হয় এদের মধ্যে যদি কেউ ভবিষ্যতে সার্থক লেখক হতে পারেন তবে এসব রচনা তখন নিশ্চিত তার কিশোর বয়সের ডায়েরি হিসাবে আদৃত হবে। সনাতন পাঠক ঃ (দেশ, ১৯৬৭)

সাহিত্যে মাঝে মাঝেই নতুন আন্দোলন আসে। ইদানীংকালের আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাংরি জেনারেশান—যাঁদের মূল বক্তব্য সমস্ত মূল্য বোধের বিনাশ...। প্রত্যেক যুগেই এইসব আন্দোলনের সময় যেসব লোক বাংলা সাহিত্যের সবকিছু গেল গেল রব তোলেন, তাঁদের অতিশয় ন্যাকা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ন্যাকা এবং থুথু চাটা। যে কোনো ধ্বংস বা দক্ষযজ্ঞের কথাতেই সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং নিশ্চিত কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। (আজকের গল্প, ১৯৬৯)

Time Magazine : Calcutta's Hungry generation is a growing band of young Bengalees with tigers in their tanks. To all appearances, their appetites are unimited. The entire calcutta establishment rose up in rage. Newspaper editorials, quoting passages from their works proved conclusively that they were dangerouus and dirty. The Hungry generation's declared goal–'to undo the done-for World and start afresh from chaos". (1964)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক কিন্তু যে মানুষ সারাক্ষণ ক্ষুধা ক্ষুধা করে তার প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে বিরক্তির উদ্রেক হয়। (আনন্দবাজার দোল সংখ্যা,

১৩৭১)

জ্যোতির্ময় দত্ত : নির্বিচার অতিরঞ্জন বাংলা ভাষার অন্যান্য লেখকদের প্রতি অবজ্ঞা, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা—ক্ষুধিত বংশের অধিকাংশ রচনায় ওইগুলি হল প্রধান লক্ষণ।

বাংলা সাহিত্যের অংশ হিসাবে ক্ষুধিত গোষ্ঠীর রচনা অতীত তুচ্ছ। দিনে দিনে চর্তুদিকে যে গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা, শুচিবায়ু প্রবল আসুরিক আকার ধারণ করছে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এরা তার প্রথম বলি। ভাবতে দুঃখ হয় যে ফরাসি দেশে যা একশো তিরিশ বছর আগে ঘটে গেছে তা এখন আমাদের দেশে বৈপ্লবিক বিবেচিত হয়। কেবল কয়েকটি অল্পবৃদ্ধি যুবকের দ্বারা নয়, আমাদের সরকারের দ্বারা, পুলিশের দ্বারা আদালতের দ্বারা যারা এদের বিদ্রোহী বিবেচনা করে দণ্ডদান করেন। (দেশ, ১৯৬৮)

Statesman : Calcutta's young 'Rebel' poets of the Hungry Generation...(1968)

শরৎ দেবড়া : নতুন পবিত্রাতা।

বিমল রায়চৌধুরী : ফ্যানিহিল, ট্রপিক অব ক্যান্সার, ট্রপিক অব ক্যাপরিকরণ এবং লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার প্রভৃতি বই নিয়ে বিদেশে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার নতুন সীমা নির্বাচনের প্রশ্ন উঠতে দেখে সম্প্রতি এখানে এক সম্প্রদায় সস্তায় কিস্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। **হয়তো তাদের ধারণা যে আত্মবিজ্ঞাপনের সব চেয়ে সহজ মাধ্যম হলো নিজেদের খরচে কিছু অশ্লীল পুস্তক** ছাপানো। অতএব অশ্লীলতার দায়ে এদের ধরপাকড় শুরু হয়।...তাদের বক্তব্য হল এই সম্প্রদায়ের নোংরামি যতটা তাদের ব্যক্তিগত অপরাধ, ঠিক ততটাই আমাদের এই গলিত সমাজ ব্যবস্থার দোষ। ভদ্র **পঞ্চজনের** যুক্তি ধরেই তাহলে বলা যায় চোর ডাকাত, খুনি, জোচ্চোর, বাটপাড় এরাও সমাজ ব্যবস্থার কুপ্রসব। কিন্তু তাদের কে কবে কোল দিয়েছেন? (আনন্দবাজার, ১৯৬৪)।

রাজকমল চৌধুরী : বাংলা দেশের আধুনিকতম কবি-লেখকদের আন্দোলন 'ভুখী পিড়ী' (হাংরি জেনারেশন), বলা হচ্ছে এদের রচনা নগ্ন, অশ্লীল এবং বীভৎস—এরা মানবমূল্য, জীবন দর্শন, বিচার, সমাজ, ব্যবহার, শিল্প সাহিত্য ধ্বংস করে দিতে চাইছে। কিন্তু অশ্লীলতা এদের সীমা বা উদ্দেশ্য নয়, জীবনের ভিতরের অশ্লীলতা কুষ্ঠ অপরাধ ও বিকৃতি এরা উন্মোচিত করে তুলে ধরছে। এদের রচনাই তার সাক্ষী। (ধর্মযুগ, ১৯৬৫)

Howard Maccord : (Professor Eng. Dept. Washington University) The Indian cultural establishment has been under attack throughout the sixties by a group of earnest and rowdy poets who call themselves the Hungry Generation. The conflict has been most acrimonious in Calcutta, traditionally the center of the Indian literary world, but complacent literatures of Bombay and New Delhi have been stung as well. Acid, distructive, Morbid, Nihilistic, outrageous, mad, hallucinatery, shrill-these characterise the visions that the Hungralist insist Indian literature must endure if it is ever to be vital again. With new exceptions, contemporary Indian writing is school master's stuff : palid, otiose and dull. It tends either to be timid and moralistic with in a genteel realism or aimlessly philosophical and romantic. But the revolutionary Bengali writers whom the Hungry Generation has built up on such as Manik Bandopadhaya Jibanananda Das are absolutely unknown in the west. Only in the poets of the Hungry generation working their own Bengali poems into nervous energetic English, excluded from the academies and literary

aristrocraey can be seen the fullness of urgency and despair that covers south Asia. For they more clearly than any other group have realised that there is possibly no hope for India that what lies ahead is chaos and collapse. They themselves are not revolutionaries, for there are no longer any political solutions. They are only mourners. Rebellion is pointless when the betrayal is so complete, so deep. All that remains is to scream and writhe and love everything to foolishness, especially India and then nod callously and wisely to death.' That any poetry written in India is a miracle (1967)

যুগান্তর : হাংরি-জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত প্রজন্ম আখ্যাধারীদের উপর পুলিশী অভিযান শুরু হইয়াছে। তাহারা যে ক্ষুধার ব্যাপারী তা পেটের ক্ষুধা নয়, তাহার ভৌগলিক সংস্থিতি নাকি অন্যত্র এবং পিশাচসিদ্ধাই কাপালিকদের মতো উক্ত ক্ষুধার সমুদ্র পাড়ি দিয়াই মানুষকে সুধার কিনারে উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া নাকি উচ্চকণ্ঠে তাহারা গদ্যে পদ্যে নতুন দর্শন প্রচার করিতেছে। শুধু প্রচার নয় ইহাদের চলনে বলনেও নাকি এই মতবাদের ছাপ সুস্পষ্ট...যে দেশে বাৎসায়ন ও কল্যাণমল্লের গ্রন্থ শাস্ত্র বলিয়া কথিত, গীতগোবিন্দ ধর্মায়তনের ধুমধুনায় সম্মানিত, উড়িষ্যা খজুরাহের শিল্প যে দেশে নিঃসঙ্কোচে রসশৈলীরূপে বিবেচিত আর তন্ত্র-ব্যবস্থিত মোক্ষ সন্ধানের উপায়রূপে বিন্দু সাধনাদি অশেষ মর্যাদায় গৃহীত, সে দেশে এই নাবালকবৃন্দ নূতন কথা এমনকি বলিয়াছে...**পুরানো ঈশ্বর অদৃষ্ট ও পাপ পুন্যাশ্রিত জীবন বোধের সঙ্গে বাস্তব লাভালাভ ও জৈব স্বাধিকারমূলক নূতন বিজ্ঞান বোধের যে দ্বন্দ্ব এ কালের মনকে আলোড়িত করিয়াছে তাহারই উৎক্ষিপ্ত ফসল ইহারা** এবং ইহারা কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির মধ্যে হইতে উঠে নাই। সর্বদেশের বিড়ম্বিত চিন্তাসংঘাত ও তিরস্কৃত জীবন যন্ত্রণাই এই শ্রেণীর মুহূর্ত সম্ভোগী পতঙ্গ-দর্শনের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। হয়তো নূতন ধ্রুব মূল্যমানের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভ্রান্ত যৌবনের পুনর্বসতিই ইহাই সত্যকার প্রতিকার। (সম্পাদকীয় : যে ক্ষুধা জঠরের নয়, ১৯৬৫)।

লক্ষ্মী-নারায়ণ মিশ্র: আমেরিকার Time পত্রিকায় ভুখীপীড়ী (হাংরি জেনারেশন) শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ করে সারা দেশের সাহিত্যকার, বিচারক গান্ধীবাদী শাসক দারুণ চিন্তা ও লজ্জায় পড়ে গেছেন। আমাদের জগৎ প্রসিদ্ধ মহামহিম দার্শনিক রাষ্ট্রপতির মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছে।

কোলকাতার এইসব তথাকথিত সাহিত্যিকের নির্লজ্জতা বিকৃতি প্রকাশের ফলে পত্র পত্রিকায় দারুণ ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এদের ৫ জনকে চাকরি থেকে হটিয়ে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে।...বাসনা এবং বিকৃতির ভূমি ভারত নয়, পশ্চিম। ইউরোপিয় দর্শনে, সাহিত্যে, ইস্কাইলাস, য়ুরিপিডিস সোফোক্লেসে হত্যা, হিংসা, অপরাধ—ত্রাস সঞ্চারক বিয়োগান্ত ঘটনা সব—অমৃতের দেখা মেলে না, সেক্সপিয়রের নাটকে, আত্মঘাত, নারীঘাত, রতির প্রদর্শন—ব্যক্তিবাদ, লালসা, প্রভৃতি মনোবিকৃতি পশ্চিম থেকেই এসেছে। *Time পত্রিকায় প্রচারিত বাঙালি সাহিত্যিকদের বিকৃতির যে অন্ধকার, সেই বিকৃতির অন্ধকারই ৩০-শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে দিল্লিতে অহিংসার অবতারপুরুষ রাষ্ট্রের পিতাকে হত্যা করে।* এইসব সাহিত্যিকরা চায় 'বদনাম না হলে নাম হবে কী করে?' (ভুখী পীড়ী : পশ্চিমি অবিদ্যা, ধর্মযুগ অনুদিত, ১৯৬৫)

সত্য গুহ: কিছু অতি তরুণ কবি একটা তুলকালামী ব্যাপার করে ফেলেছেন। এদের উন্মার্গগামীতা কারোর কাছে বিরক্তিকর হলেও কবিতা সৃষ্টিতে সততা এবং যুগ উন্মোচনের দক্ষতায় নিঃসন্দেহে এরা প্রমাণ করেছেন যে শক্তি, সুনীল, বিনয়েরা যে ভূমি তৈরি করার চেষ্টা

করেছিল এরা তাকে সার্থক করেছেন। এসব কবিরা নিজেদের হাংরি কবি বলে দাবি করেন। এরা কবিতায় একটা সম্পূর্ণ নতুন অবয়ব দিতে পেরেছেন। *বস্তুত গত ৫ বছর বাংলা সাহিত্যের নন্দন শিল্পাঞ্চলে যেসব রচনা নিয়ে ভয়ংকর বিতর্ক ঝড়, ওলটপালট ও পুলিশি নির্যাতন হয়ে গেল তারই মধ্যে আছে এদের ক্ষমতার নিঃসন্দেহ প্রকাশ—এবং আছে বলেই পাঠকদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে প্রচণ্ড।*

কৃত্তিবাস বা তৎসময়ের কবিগোষ্ঠী যা পারেননি অর্থাৎ সুভাষ মুখোঃ, সমর সেন, জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন দত্তের প্রভাবমুক্ত নতুন কবিতা সৃষ্টির যে কাজ তারা হাতে নিয়েও ব্যর্থ হলেন, সেটা এরা পেরেছেন। এদের হাতে বাংলা কবিতা সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। প্রচলিত কাব্য ধারণার মূলে এরা কুঠারাঘাত করেছেন। এদের কবিতা পড়লে মনে হয় প্রত্যেকের জীবন যেন কবিতার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে পড়েছে। কবিতা এরা বানাননি। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এক একজনের গোপন জীবন, ধর্ম অধর্ম, পাপপুন্য, ক্রোধ লালসা এবং তাই হয়েছে ওদের কবিতা। কবিতা তাদের উলঙ্গ জীবনেরই দিব্য প্রতিকৃতি।

কল্লোলের পর হাংরি আন্দোলনই বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন—যে আন্দোলনের এইসব কবি লেখকদের জীবন থেকেই উৎপত্তি কোনো উত্তরাধিকার থেকে নয়।

এদের কবিতা তথাকথিত অশ্লীল সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভান ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষমাহীন আক্রমণ এটা।

আজ প্রায় সকলেই যখন পার্থিব সুখের লালসায় এসটাবলিশমেন্টের ক্রীতদাস ভণ্ডের মুখোশ পরে ড্রয়িং রুমের কবি ও লেখক তখন এরাই জীবন ও রক্তের মূল্যে চৈতন্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করে যাচ্ছে।

নমিতা মুখোপাধ্যায় বা শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ হাংরি জেনারেশন গড়ে উঠেছিল শুধু ছাপার অক্ষরে—মননে বা ব্যবহারে এর কোনো স্বাক্ষর পড়েনি। দূরের লোকেরা ছাপার মাধ্যমে পরিচিত হচ্ছিল, তারা ভাবলো মারাত্মক কাণ্ড ঘটছে বাংলাদেশে। ফলে ডাক তার বিভাগের আয় বৃদ্ধি ও খাঁকি উটদের কুঁজ বৃদ্ধি এবং হয়রানি। বেনারস থেকে লোক এলো Revolution স্বচক্ষে দেখতে। কিন্তু এসে আশ্চর্য! শেষে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে গেল হাংরি জেনারেশন। (সাক্ষাৎকার : প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৯)

(বেনারস থেকে কাঞ্চন কুমার এসেছিলেন, তিনি 'মরাঁল' পত্রিকার হাংরি সংখ্যা বের করেন এবং নিজে হাংরি হয়ে যান। এখন বেনারসে অন্ততঃ ২৫ জন হাংরি লেখক এবং চিত্রশিল্পী রয়েছেন যাদের লেখা এবং ছবি সমগ্র উত্তর ভারত কাঁপিয়ে তুলেছে।)

অমৃত: হিন্দি সাহিত্যে হাংরি লেখার প্রভাব খুব বেশি। (১৯৬৭)

P. C. Roy: The fact can not be denied that a new type of writer, rather a new trend in Bengali writing has emerged, Many of the writers belong to the 'Hungry Generation.' Their hunger is insatiable. In a sprit of bravado a Hungry man shouts at the society and says:

'I have lost count if How
many widows I have made pregnant' (Thought, Delhi: 1968)

হাংরি জেনারেশনের উৎস সন্ধান : কল্লোল যুগের অস্থিরতা যেমন একটা কৃত্রিম ফাঁপানো ভুয়ো ব্যাপার এ যুগের বঙ্গীয় বিট হাংরি জেনারেশনও তাই, বরং তারচেয়েও বেশি। কলকাতার বিট আর হাংরি জেনারেশন এমনই দুটি হুজুগ, পশ্চিমী আন্দোলনের বদ্ধ ব্যর্থ অনুকরণ দাস সুলভ হীনমন্যতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত...জামাকাপড় সাজসজ্জা দাড়ি গোঁফে সে এক অপরূপ রূপবান।

তার সঙ্গে মদ, বেশ্যা পল্লী, বস্তি, বিবিধ যৌনবিকার বিদেশি উত্তরসূরীদেরও টেক্কা দিয়ে চললো। অবশেষে হাংরি বিট দগ্‌দগে ঘা হয়ে ফুটে বেরুল গল্প কবিতায় নিবন্ধে, যাকে এরা মলমূত্রের শামিল বলেই মনে করে যা আসলে মলমূত্রই। (দর্পন, ১৯৬৪)

শচীন বিশ্বাস: উত্তরাধিকারহীন নৈরাজ্য থেকে, যা এই, সময়ের বৈশিষ্ট্যও বটে হাংরি সম্প্রদায়ের জন্ম। এই অননুরূপতা তাদের জন্মের জন্য যেমন পুষ্টির পক্ষেও তেমন দায়ি। অতঃপর 'আমি কে, আমি কী, আমি কেন এবং আমি কেমন করে, ইত্যাদি এই মুহূর্তের অথচ শাশ্বত প্রশ্ন এবং সমস্যা যেমন এই দাহ্য জীবনকে সদা জাগ্রত রাখে এবং তাড়না করে বেড়ায় তেমন ওই সব তৎপর প্রশ্নের চোট এবং বিস্ফোরণ ছাড়া কবিতার আর কিছুই করার থাকে না। স্বভাবত সমগ্র ব্যক্তি মানুষ ও কবিতার স্বস্বভাব অস্তিত্বের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ছাড়া দেশকাল পাত্রের জন্য কোনো সর্ত স্বয়ম্ভু সত্যরূপে স্বীকৃত হয় না। বস্তুত বেঁচে থাকাই বেঁচে থাকার কারণ ছাড়া অন্য কোনো মৌল হেতুতে হাংরি কবি সম্প্রদায় বিশ্বাসী নন। হাংরি কবিতা পজিটিভ নিগেশন (১৯৬৬)।।

R. G. (Thirsty thirties, Now): বলেছেন, আগাখাঁ যেমন তার বহুমূল্য জীবনের একটি মুহূর্ত বাজেভাবে বাজানো বাখ শুনে নষ্ট করতে চান না, তার ক্ষেত্রেও তাই তিনিও, হাংরি জেনারেশনের কোনো লেখা পড়তে চান না বা তাদের নাম শুনতে চান না, সেই একই কারণে। তিনি বলেছেন, Time পত্রিকাও তার এই মনোভাব বিন্দুমাত্র পাল্টাতে পারেনি। (১৯৬৫)

J. D. Rao (Not by poetry alone) : Most youths now a days consider their highest ambition satisfied if they are able to enter I. A. S. but it may provide some refreshing contrast of find these five young people have by facing trial risked the security of Govermment jobs to write as they think fit. (Now. 1964)

জনতা : এদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা নোংরামি দেখে প্রশ্ন জাগে আদৌ 'মানুষ' বলতে যা বুঝোয় সে অর্থে ওরা মানুষ কিনা? (কাব্যচর্চার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, ১৯৬৪)।

যুগান্তর (১৮ জুলাই ১৯৬৪) : এই কলকাতার যে তরুণরা "অতিরিক্ত দুঃসাহসের" এবং "অভিভাবক, সমাজ, সাহিত্যিক, শালীনতা এমনকি পুলিশকেও উপেক্ষা করার" আন্দোলন শুরু করেন, নিজেদের তারা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায় নাম দিয়েছেন। এই গোষ্ঠীর যোগাযোগ নাকি বিশ্বব্যাপী।

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী (হায়ার্কিহীন বিপন্ন লেখক ও হাংরি জেনারেশন) : বাংলাদেশে তুলকালাম শুরু হয়েছে হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে। *শোনা যাচ্ছে ১৯৭০/৭১ এর পর বাংলাদেশে একমাত্র হাংরিয়ালিস্ট লেখক ছাড়া আর কোনো লেখক থাকবে না।*

হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে ছোটো বড়ো মাঝারি ঝাঁঝালো কিংবা অম্লমধুর আলোচনা চলছে। অনেকেই কিন্তু ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখছেন না। বাংলাদেশের মফঃস্বলীয় লেখকের কথা তো বাদই দিলাম, *খেতাবপ্রাপ্ত আধুনিক ও সাবালক লেখকরাও হাংরি জেনারেশনের বিপক্ষে বহু কিছু লিখছেন, বলছেন আবার নকল করার মুসাবিদাও করছেন কায়দার সঙ্গে।* এক কথায় হাংরিয়ালিস্টরা বাংলাদেশে হঠাৎ যেন একটা সাইক্লোন এনে দিয়েছেন। (ঘরণী : ১৯৬৮)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : এমন এক দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা নিজেদের নাম দিয়েছেন ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায়। এঁদের লেখার কোনো দৃষ্টান্ত দেয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। *এঁদের আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাদের রচনা তারা পিতামাতার সম্মুখে পাঠ করে শোনাতে পারেন কিনা—তারা উত্তর দিয়েছেন, না। তাদের এই সত্য উত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তাদের এই উত্তরে আমার সম্মুখে অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। আকাশের শেষ নক্ষত্রটি পর্যন্ত ঢেকে গেছে বলে*

মনে হয়েছে।

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী : পিতামাতার সম্মুখে পাঠযোগ্য রচনা যদি সাহিত্য বিচারের মাপ কাঠি হয় তাহলে হাংরিয়ালিস্টরা নিঃসন্দেহে ভোটে হেরে যাবেন। *কিন্তু ভাববার কথাটা এই যে যাদের রচনা 'সম্মুখের অন্ধকার ঘনীভূত' করতে অথবা আকাশের শেষ নক্ষত্রটি ঢেকে দিতে সক্ষম তারা কি সত্যিই অক্ষম নির্বিষ লেখক? (১৯৬৯)*

পাঠক ভুল করিবেন না : এইভাবে পাঠককে সাবধান করে একটি বহু প্রচারিত সিনেমা পত্রিকায় এই রকম লেখা হয়েছিল, যে এদের বইয়ের বিজ্ঞাপনে থাকে যে সে বইয়ে পশ্চাদ্ধাবমানা ভীতা স্ত্রীলোকদের রমন সুখের কথা লেখা আছে কিন্তু মলাট খুললেই দেখা যায় যে এটা এক মস্ত ধাপ্পা সেখানে মানুষের কুকুর রূপান্তর এবং কুকুরের দেবতায় রূপান্তরের মতো স্যামুয়েল বেকেটিও ব্যাপারে পূর্ণ। (এই সাবধানবাণীর লেখক বিমল রায়চৌধুরী। তিনি রমন সুখের কথা পড়বেন বলেই সম্ভবত বইটি খুলেছিলেন, পাননি, হতাশ হয়েছেন।)

আদিত্য ওহদেদার : বাংলাদেশের সমালোচকদের কাছে এদের বইগুলি নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। (দেশ ১৯৬৮)

Gary syder : These Bengali poets showed more wildness and openness.

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : উল্লুকের দল।...নষ্ট প্রতিভা।

Hungries V/S Hypocrites :

Calcutta : Even in the city of procession and demonstration that is Calcutta, it will have special flavour. The famous (or notorious) Hungry Generation pöets have emerged from nowhere and decided to confront the 'Establishment' in Bengali poetry, when the latter meets for a Three day Conference in the city from April 12, 1968 (ie, All India poet's Conference) Terribly excited over the proposed poets conference the Hungries claimed that it was their movement to expose the hypocresy of bourgeoise decency in poetry that has alarmed the establishment. The Hungries have faced court trial for being obscene. They Continue to maintain that obscenity is the desperate music of the poets a moral weapon with which to attack the degrading and filthy use of power that Characterise 'our age.' (Blitz, 1968)

মুকুল রায় : হাংরি জেনারেশনের গদ্য লেখকদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'এঁরা' দুরন্ত অভিমান নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করছেন।' (১৯৬৯)

Abu sayeed Ayyub : (letter to Allen Ginsberg, 1964) That you agree with the Communist Characterization of the Congress for Cultural Freedom as a 'Fraud and a bullshit intellectual liberal anti-Communist syndicate,' did not how ever surprize me...

If any known Indian literature or intellectual come under police repression For their literary or intellectual work, I am sure the Indian Committee For Cultural freedom would move in the matter I am glad to tell you that no repressions that kind has taken place here currently.

(শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরীদের arrest হবার পরে লেখা এই চিঠি।)

সত্য গুহ : ১৯৬১-৬২ সালে কোলকাতার শিল্পী সাহিত্যিদের মধ্যে হাংরি জেনারেশন নামে একটা আন্দোলন বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রথম প্রথম সে আন্দোলন তেমন কিছু দানা বেঁধে উঠতে পারেনি—১৯৬৩-৬৪ সালে (বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, সুভাষ ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক নতুনভাবে আন্দোলন শুরু করে।) বেশ

জোরদার হয়ে ওঠে। অশ্লীলতার দায়ে এদের বিচারের প্রহসন হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্য এই আন্দোলন থেকে পেয়েছে কয়েকজন অতি শক্তিশালী কবি ও গদ্য লেখক। এইসব গদ্য লেখক বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। *এতদিন পর্যন্ত প্রতীকি জগৎ এবং বাস্তব জগৎ ছিল আলাদা, এবারে বাস্তব এবং প্রতীকি জগৎ আর স্বতন্ত্র থাকল না।* বাস্তব, স্বপ্ন, অবচেতন প্রতীক সব একাকার হয়ে 'এক' এ পরিণত হলো। বাস্তব সত্যরূপ পেয়ে পরিণত হলো অতি বাস্তবে। *এতদিন পর্যন্ত গল্পকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে আসার যে চেষ্টা হয়ে আসছিল তাকে সার্থক করে তুললেন এইসব অতি তরুণ গদ্যকাররা।* শুধু ভাষা, আঙ্গিক বা শব্দ দিয়ে নয় খাঁটি কবিতার বিষয়কেই তুলে নিয়ে এলেন এরা গদ্যে।

কী ফর্মে, কী বিষয়বস্তুতে কী ভাষায় একটা অদৃষ্টপূর্ব নতুনত্বের আবিষ্কার দিয়ে বাংলা গদ্যকে নতুন করে তুললেন এরা। এর পাশে নতুন রীতি গল্পের স্লোগান কেমন যেন মিঁইয়ে এসেছে বলে মনে হয়।

সন্তোষ কুমার ঘোষ : ...ক্ষুধিত (কী না পেয়ে জানিনে) লেখক যা লিখতে চেয়ে পারছেন না, খালি আগাছার চাষ বাড়াচ্ছেন, বয়স্ক সমরেশও যেন তাঁদের দেখিয়ে দিতেই 'বিবর', লিখলেন দেশ, ১৯৬৫)

বুদ্ধদেব বসু : হাংরি লেখকরা নিরক্ষর।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : তাদের রচনা পড়লে মনে হয় যে মানুষের কেবল মাত্র একটি ক্ষুধাই আছে তা যৌন ক্ষুধা, তার মধ্যে আর কোনো ধর্ম নাই।

Karl E. Zink (Associate Professor of English and departmental Chairman at Indiana University) : *Salted Feathers* এর বিখ্যাত Hungry সংকলন এর আলোচনা প্রসঙ্গে MAHFIL পত্রিকায় লিখেছেন :—There is entirely too much rant, too much self justification, self Dity, self torture, too much cataloguing of suffering and threat of suicide. But for all this one remains downright haunted by the burning society the hysterical, the despair, the fear of and resignation to death, the common corviction that Indian culture is rotten and doomed, the intense dedication to Art. (1967)

Blitz (Erotic lives and loves of 'Hungry Generation') : They held that the highest form of sex should be masturbation. because it is not conditioned by the presence of a second individual and it gives scope to flights of Imagination.

They called themselves 'holy barbarians' holy because they are missionaries rebelling against conformities & inhibition which have come to pass for 'civilozation.' They claimed, they are the first Communist of the world. Marx was a product of this civilization and could not get over it. He wanted to bring in class struggle to ene in exploitation of man by man and thus to usher in a higher stage of society, poor Marx had limited vision. (1964)

Rajib Saxena *(Poetry of alienation)* : In recent yea's voices of protest emerged in those countries (Former colonies of England and Mamerica) who dare to speak about their backyard sunder and underworld. *The Hungry Generation group was meanwhile crowned with martyrdom.* In 1964 the stupid Calcutta Police arrested six Calcutta Poets...the event got highlighted by publicity in Time Magazine. But what are these poets upto? The first thing that strikes after reading their incoher ent manifestoes is *their complete rejection of the present social order.* They have to heap abuses against it in a most aggressive manner and for this purpose colloquial and the slangs seem to be most handy. *The shocking experiences of*

the modern reality have to be conveyed in an equally shocking language. That is what looks obscene to the 'Cultured' establishment (LINK, 1968)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি (রুশ লেখকের আগ্রহ) : রুশ লেখক ও মস্কো থেকে প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্য মুখপত্রের প্রাচ্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীশ্লোভেনশি ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৬, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান গতি প্রকৃতি বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার আগ্রহ জানিয়ে সে সম্পর্কে কিছু জানতে চান। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হাংরি জেনারেশনের লেখকদের সমালোচনা করেন। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীকে শাশ্বত ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন এ ধরনের চরিত্রকেই সাহিত্যে তুলে ধরতে হবে। ঈশ্বর বিশ্বাসকে বর্জন করে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। রাধারাণী দেবী বলেন, মানুষই ঈশ্বর। মানুষকে নিয়েই যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হবে।

দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, বাংলা সাহিত্যে নব নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটছে। জীবনে যেমন আলোর দিক আছে তেমনি অন্ধকারও আছে। অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন সাহিত্যিকেরা আলো অন্ধকার দুটি দিকেই তুলে ধরবেন। তাই হলো বাস্তব সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক লেখকরা সেই কর্তব্য পালন করে চলেছেন। "অশ্লীল সাহিত্য বা হাংরি জেনারেশনের রচনাদি নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই।"

উমাশঙ্কর যোশী : প্রশ্ন—আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? এইসব বিটল হাংরি, অ্যাংরি—এদের সম্বন্ধে আপনি কী অভিমত পোষণ করেন?

উত্তর (যোশী)—হাংরি আর অ্যাংরিকে যুক্ত করে আমি বলি, হ্যাংরি। আধুনিক কবিতা সবকালেই ছিল, আছে, থাকবে। সব যুগেই নতুন করে জমি কর্ষণের প্রয়োজন হয়...নতুন কিছু পরীক্ষা...এবং তা ঘোষণার জন্য উচ্চকণ্ঠও প্রয়োজন। তবে মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি।...কবিতা ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারে না। (সাক্ষাৎকার : দেশ, ১৯৬৮)

অমিতাভ দাশগুপ্ত : খুবই অস্বস্তিকর ধরনের, আমার সংস্কারে নেই এমন লেখা।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় : জামাল-আল জাহেদি একজন নতুন লেখক—এঁর ৬৪ পাতার একটা গ্রন্থ বেরিয়েছে,...বইটি হাতে পেয়ে উপহৃত হবার আনন্দ পাওয়া গেল ; এবং শেষাবধি পাঠ করে মনে হলো *এই বই প্রসঙ্গে সকলের আগে কিছু বলতে পারা একপ্রকার কৃতিত্ব, যে-জন্য পরে আমি কৃতত্ব দাবি করব।*...জামাল-আল জাহেদি একজন অতি তরুণ লেখক, *আমাদের ভাবী জেনারেশনের সম্ভাবনা অনেক বেশি*...বিশেষত মুসলমান জামাল-আল জাহেদি ; তাদের সম্প্রদায়গত হীনমণ্যতা থেকে পশ্চিমবাংলার মুসলমান বাঙালা ইমাজিনেটিভ সাহিত্যে অচিরেই একটা অপ্রত্যাশিত ভূমিকা নেবে, মনে হয়। ইওরোপিয় সাহিত্যে যেমন ফ্রানজ কাফকা, লুই ফার্দিনান্দ সিলিন বা এ্যালেন গীন্সবার্গ—যারা যু। (জামালের জন্য ভূমিকা : উত্তর তরঙ্গ, ১৯৬৫) *(সন্দীপনবাবু—এই জামাল-আল জাহেদি কে, যার সম্পর্কে আপনি এত প্রশস্তি গেয়েছিলেন?)*

THE HIGHEST ARE DEECTIVE OR SURPECT

৬ ফাল্গুন ১৩৭৪, কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

খালাসিটোলায় জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষ, বাসুদেশ দাশগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, অবনী ধর, ফালগুনী রায়, সুবো আচার্য, সুভাষ কুণ্ডু, সুবিমল বসাক,

অবোধনারায়ণ, কাঞ্চন কুমার আরও অনেকে সেই প্রশস্ত চালার নীচে লম্বা টেবিলগুলিতে মদের গ্লাস মুখে না তুলে তাকিয়ে রয়েছে নানান শ্রেণির মানুষ। শ্রমিক রিক্সাওয়ালা গৃহস্থ মধ্যবিত্ত, পণ্ডিত, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, চোর সমকামী, হিন্দু, মুসলমান শিখ—ধূপের ধোয়ায় পরিপূর্ণ, নানান সম্প্রদায়ের কবিলেখকরাও উপস্থিত—ফালগুনী : আমার পিতা জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, বন্ধুগণ। 'সম্ভবত এই প্রথম জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন পালন এবং এমনভাবে এমন স্থানে যা বুর্জোয়ারা ভাবলে শিউরে ওঠে। এখানেই, কেননা রবীন্দ্রসদনে বা ওভারটুন হলে দক্ষিণ কলকাতা থেকে যেসব দামি মেয়েরা কবিতার নামে মজা দেখতে আসে, তাদের কাছে কবিতা পড়া যায় না—কোনো কবিতার বই এদের হাতে তুলে দেয়া যায় না—একজন মহাকবির জন্মদিন এদের মধ্যে চালান করা যায় না। এস্টাবলিশমেন্টের কয়েকজন প্রথমে কিছু গোলমাল করার চেষ্টা করে, তারা এখানে নেশা করতে আসে, কবিতার জন্য নয়, কিছু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে হয়তো তাদের বিবেক তাদের স্বস্তি দেয় না বলে তারা এরকম করেছিল পরে স্তম্ভিত হয়ে ভারতবর্ষে কবিতার জীবন ও শক্তি দেখে তারাও। শৈলেশ্বর ঘোষের কাব্যগ্রন্থ 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর প্রকাশ সেদিনের অন্যতম প্রধান সূচি। পাঠ শুরু হয়। টেবিল ঘিরে শত শত দাঁড়ায়—শৈলেশ্বর পড়েন 'টার্মিনাস পার হতে গিয়ে'—বাসুদেব 'শোকগাথা' পড়তে গিয়ে বলেন, এ আমাদের সকলের জন্য—এ গ্রন্থ আমাদের কাছে ধর্ম গ্রন্থ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি বাসুদেবকে পুরু চশমায় মনে হচ্ছিল, নিশ্চিত ধ্বংস জানার পরে খ্রাইস্টের মতো। সুভাষ পড়লেন 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা'। বললেন, এ কবিতা বাংলা কবিতার সমস্ত অতীত চুরমার করে দিয়েছে। সুভাষের একহাতে গ্লাস। পড়লেন সুবিমল।

চারদিক স্তব্ধ, এই অভিনব দৃশ্য দেখে যাচ্ছিল সকলে। জীবনানন্দ দাশের জীবন স্মরণ করা হল। হিন্দি কবিরা বললেন, পড়লেন তার কবিতা, শ্রাদ্ধ জানালেন। ফালগুনী, সুবিমল, সুভাষ ঘোষ, সুভাষ কুণ্ডু, শৈলেশ্বর, বাসুদেব পড়ে গেলেন বোধ, অবসরের গান। প্রদীপ, সুবোর উপস্থিতি ছিল নীরব। এই দৈব পরিবেশে তাদের মাতাল আত্মা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারছিল না।

কাঞ্চন কুমার বেনারস থেকে এসেছেন। একজন হিন্দি কবি হাওড়া স্টেশনে দিল্লিমেলের টিকিট বাতিল করে ছুটে এসেছেন, ভারতবর্ষের এই অনন্য হাংরি ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে। এখানেই কবিতা, এখানেই জীবন, কবিতাই আত্মার মদ।

পাঠ শেষ হলে অবনী লাফিয়ে উঠলেন টেবিলে, গাইলেন নাবিকদের গান, ১৫ বছর অবনী সমুদ্রের নাবিক, টেবিলের উপরে এক পা সামনে, হাত উপরে, যেন সে স্বাধীনতার পতাকা এবার বহন করবে। কবিতাই স্বাধীনতা। শেষ হলে কেবল গ্লাস ভাঙার শব্দ। গ্লাস ভাঙার শব্দ।

বাংলাদেশে এই উৎসবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বুর্জোয়া শিল্পের ধারকরা লিখলেন, 'উঠতি গুণ্ডা' লিখলেন 'শুড়িখানায় কবিতাকে হত্যা' সম্ভবত ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরের পর এত বড়ো ধর্ষণ বাংলার বুর্জোয়া শিল্পে আর ঘটেনি—তাই। রবিঠাকুরকে নিয়ে ব্যবসা যারা করে রুখে দাঁড়ায় তারাই—এই বুর্জোয়া শিল্প বোধের জন্মদাতা আবার রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

কলকাতায় হাংরি কবিতা পাঠ

যে কোনো আততায়ীর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় লেখক কবি সম্মেলন (সর্বভারতীয় নির্বিজকরণ সম্মেলন) মানুষের জন্য কোনো পরিকল্পনা স্থির করা যায় না—মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে আমরা কেবল এও বুঝি না—লাইফ ইনসুরেন্স পলিসি, পি. এফ. বার্ধক্যজনিত ভাতা, গোলাপ খচিত বৌ বেবি বাচ্চা—এমনকি ওই হায়ারারকি সমর্থিত ভণ্ড কবি সম্মেলন—যাদের কিনা রবীন্দ্রসদনেই তৈরি মানুষের জন্য কবিতা পরিকল্পনা—ছো :—আপনি নিজেকে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে গণ্য করলে আগামী ১২/১৩/১৪ এপ্রিল নিকটবর্তী শহর ও শহরতলী রেস্তোরা ও স্ট্রিটকর্ণারগুলিতে বুর্জোয়া নামগন্ধহীন হাংরি লেখক/কবির ও তাদের রচনাপাঠের খোজ খবর করুন—

(সুভাষ ঘোষ প্রচারিত হাংরি রচনা পাঠের বিজ্ঞাপণ)

রবীন্দ্রসদনে ১২।১৩।১৪ এপ্রিল সর্বভারতীয় বুর্জোয়া কবি সম্মেলন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে হাংরি কবি লেখকেরা কালীঘাট ট্রামডিপো যাদবপুর কফিহাউস, শ্যামবাজার মোড়, চৌরঙ্গি ইত্যাদি স্থান সমূহে তাদের রচনা পাঠ করেন। কলকাতা তথা সারা ভারতবর্ষ এই প্রথম জানলো নারীর যোনি বরাবর উঠে যাওয়া উন্নত-পুরুষ-উরু-আত্মার মতোই কবিতা মানুষের ধর্ম যা রবীন্দ্রসদনে বানানো যায় না। বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় ছড়িয়ে পড়লে আক্রান্ত হয়ে এক প্রচণ্ড উন্মত্ততা ও আবেগ থেকে (সুভাষ ঘোষ শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, বাসুদেব দাশগুপ্ত, ফালগুনী রায়, সুভাষ কুণ্ডু) তাদের অশ্লীল সংজ্ঞাভুক্ত রচনাগুলি মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে পাঠ না করে উপায় ছিল না। রচনা পাঠের স্থানকে কেন্দ্র করে কয়েক সহস্র মানুষের ভিড় জমে যায়।

তাদের সকলের মধ্যে আগ্রহ ও কৌতূহল সমান বা আদৌ ছিল কিনা জানা যায় না। কেউ কেউ এতে মজাও পেয়ে থাকবেন হয়তো কিন্তু বিস্ময়টা এই আশ্চর্যরকমভাবে রচনাপাঠের সময় এক মিশ্রপ্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে।—কোথাও ধিক্কার/কোথাও শোনা যায় স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। একজন মন্তব্য করলেন 'পায়খানা প্রস্রাবের মতো পরিত্যাজ্য হলেও এ সত্য। এদের অস্বীকার করা যায় না।'

কবিতাকে সাহিত্য সম্রাট/কবি সম্রাট এর বুর্জোয়া পালঙ্ক থেকে নামিয়ে ফুটপাতে আত্মার কাছে নিয়ে আসা হলো।

আমেরিকায় হাংরি কবিতা পাঠ

ওয়াশিংটন য়ুনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগ সাগ্রহে এই কবিতা পাঠের আয়োজন করলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান—হাওয়ার্ড মেক্কার্ড প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতো ধ্যান গম্ভীর পরিবেশে পবিত্র কবিতা পাঠ শুরু করেন। ধূপের ধোয়ার উর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আবির্ভাব ও সমন্নোতি ঘটে। কবিতা পাঠ চলতে থাকে। বৃহস্পতিবার—বিকালবেলা। কবিতা পাঠকালে মেককার্ড ৪ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেন, বাঙালির গর্ব তারা ভারতের আঁভগার্দে। বাঙালির এই বিরাট ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন বাঙালিরা

ভালোবাসা, আবেগ, স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কবিতাকে ব্যবহার করেন।

কিন্তু ভারতের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা কবিতাকে দেখে মেক্‌কার্ড এক অভিনব বিস্ময়কর সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোত বাংলা সাহিত্যে আবিষ্কার করেন। —বর্তমান ভারতীয় জীবনের ভয়াবহ বিশৃংখলা, ভালোবাসার এই আবেগকে যন্ত্রণা ও আঘাতে রূপান্তরিত করেছে। ভালোবাসা ও আবেগের পরিবর্তে তাই কবিরা মৃত্যু ও আত্মহত্যার গাথা রচনা করে চলেছেন।

তিনি বলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও লক্ষণীয় সকলেই যখন এসটাবলিশমেন্টের নোংরামি ও রাজনীতির খপ্পরে পরে গড়াগড়ি খাচ্ছে তখন একমাত্র এইসব হাংরি কবি লেখকরাই ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে আসন্ন-ঘনীভূত-অন্ধকার দেখে শোকগ্রস্থ। মেক্কার্ড বলেন সাহিত্য আজ দ্বিধা বিভক্ত। একদিকে যেমন রয়েছে বুর্জোয়া এসটাবলিশমেন্ট এর অনুগ্রহে পুষ্ট ক্ষমতাহীন রক্ষণশীল কবি/লেখক, তারই পাশে রয়েছে দরিদ্র অবহেলিত নিন্দিত এক প্রচণ্ড হাংরি লেখক/কবি সম্প্রদায়। তিনি বলেন জীবনের যে সত্যকে হাংরিরা উপলব্ধি করেছেন সম্ভবত পরিশেষে তাই জয়ী হবে। পরিশেষে কবিতা-পাঠ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা মুরুব্বীরা হাংরিদের অশ্লীল ও যৌন কবিতাগুলি দেশ ও জাতির নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেবে এই ভয়ে তাদের জেলে পুরে দেয়। এসব হাংরি কবি লেখকেরা অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু এখন আর এরা একা নয়।

হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের

ক্ষুধার্ত

ক্ষুধার্ত

২য় সংকলন

ক্ষুধার্ত

১৯৭২-৭৩

সুভাষ ঘোষ সম্পাদিত ক্ষুধার্ত

মূল্য ৫.০০

সময় : ১৯৭২-৭৩

প্রকাশক : সুভাষ ঘোষ
চন্দননগর, হুগলী

মুদ্রক : অধুনা
১৭/১-ডি সূর্য সেন স্ট্রিট
কলকাতা-১২

যোগাযোগ : কনক ঘোষ
C/o ললিত মোহন সাহা
বাউরি পাড়া
চন্দননগর, হুগলী

প্রচ্ছদ : অনিল করঞ্জাই

দাম : ৫ টাকা

ক্ষুধার্ত দ্বিতীয় সংকলন ১৯৭২-৭৩

লিখেছেন :

অবনী ধর

দেবেশ রায়

ফালগুনী রায়

সুবো আচার্য

বাসুদেব দাশগুপ্ত

প্রদীপ চৌধুরী

রবিউল

শৈলেশ্বর ঘোষ

দেবী রায়চৌধুরী

সুভাষ ঘোষ

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জর্জ ডাউডেন

আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবীর মুখোপাধ্যায়

শঙ্খ ঘোষ

'ক্ষুধার্ত'র ১ম সংকলন বেরিয়েছিল প্রায় বছর ৩ আগে—এরকম হয়--

এই তো উনি সকালবেলায় দাড়ি মুখ পয়পরিষ্কার করলেন—বেরোনোর আগে, বউয়ের হাত থেকে মায় পান চুন অবধি—কিন্তু আর ফিরে এলেন না—হয় এরকম—তাছাড়া আমাদের বাবারা আমাদের জন্য কোনো উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেননি—রাখবার কথাও ছিল না অবশ্য—ক্ষুধার্তরা ওসব অস্বীকার করে—বাবা-ধর্ম—

ইত্যবসরে আপনাদের বহুবিধ ক্রিয়াকাণ্ড দেখে আমাদের অনেক সময় কেটে গেছে মুক-অবস্থায়—দেখতে হয়েছে সন্তান ভক্ষণ করে সন্তান করে সন্তান উৎপাদন, সন্তান উৎপাদন করে পুনর্বার সন্তান ভক্ষণ—বিশৃঙ্খল নিখিলের বিবাহ সভা ও আপনাদের সারা গায়ে গজানো দাড়ি—

আরও এই যে, মাননীয় প্রেসিডেন্টের মুঠিতেই আপনাদের রক্ষা কবচ--কাকাড়াকাড়ি হুন্ডা মোটর সাইকেলের জন্য, এতসব হয় কোথা থেকে—একটিন রঙের সঙ্গে মানুষের তুল্যমূল্য করণ—ভাদ্রের কুকুরের মতোই কাম যুদ্ধ উত্তেজনা?

যেহেতু ক্ষুধার্তদের সর্ব অবস্থায় বারবার ও পুনর্বার উত্থান ও জাগরণ হয়, তাই হাংরিরা তাদের নিজস্ব ও আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ডদ্যোতক সংকেত, সাওয়াল, টেলিগ্রাম, হুঁশিয়ারি, বিয়ারি-চিঠি পাঠিয়েছেন 'ক্ষুধার্ত'র এই ২য় সংকলনে—

ক্ষুধার্ত লেখক বলে পরিচিত নন, এমন ২/৩ জনের লেখাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অবশ্য—এ সম্পর্কে পাঠকদের কিছু জানানো প্রয়োজন—

একক বা দলবদ্ধভাবে নতুন মানুষরা যখন এই পৃথিবীতে আসে, বুর্জোয়াদের প্রথম কাজ হয়, ওই নয়া-মানুষদের ভেতর ক্রমাগত তাদের ট্রেডমার্ক মারা ভূষিমাল চালান করা--কমার্স ও কোরাপ্‌সান্—এই সঙ্গে আর একটি জিনিস 'ভী-তি'—ঠাস্ করে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওই কাজে কোনোই বিরতি নেই—

এখানের দালাল ও এস্টাবলিস্‌মেন্টের চাকর লেখকরাও তেমনি প্রচার করে নতুন লিখতে আসা লেখক কবিদের ভেতর একটি অভিনব বস্তু, 'হাংরি-ভীতি'—ততদিন চালিয়ে যায় যতদিন না ওই নতুনরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তাদের প্রকৃতস্বজনদেরা থেকে—যারা ওই 'ভীতি' কাটিয়ে ওঠে ক্ষুধার্তরা তাদের স্বাগত জানায়—

তাছাড়া এ-এলাকার এমন ২/৪ জন লেখক কবি আলোচক সমালোচক আছেন, বাজারে যাঁদের নাম চালু—এঁরা এমত মনোভাব পোষণ করেন, 'যদিও আমরা এস্টাবলিসমেন্টের ঘর দোরে যাতায়াত করি কিন্তু শয্যা গ্রহণ করি না—আমরা নিরপেক্ষ, নন্ কমিটেড'—

ক্ষুধার্তরা তাঁদের যুগপৎ চ্যালেঞ্জ ও প্রভোক করে—দেখে নিতে চায়, সত্যি সত্যিই কি তাঁদের ভেতর গলদ নেই? থাকলে, কতটা? 'ক্ষুধার্ত'র বর্তমান 'রিডার্স ফোরাম'-এ দেবেশ রায় ও শঙ্খ ঘোষের লেখা অন্তর্ভুক্তির সন্নিহিত কারণ এ-ই—

হাংরিদের লেখালেখি বিষয়ে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছেন—(এর আগেও

অনেকেই সুন্দর ও বীভৎস মনোভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন অবশ্য)—তার ন্যায়, ন্যায্যতা বিচার করবেন অন্যরা—সে বিষয়ে আমাদের মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়, এইজন্যই যে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আমরা সম্মান করি—

তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও সেই ক্লিশে লক্ষ্যে না পড়ে যায় না, রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা দিয়ে লেখালেখির বিশ্লেষণ—'নিট্‌শে থেকে হিটলারের জন্ম'—এই ভুল মতবাদের সমর্থন পুনরায় পাওয়া যায় দেবেশ রায় ও শঙ্খ ঘোষ যখন উগ্রপন্থী কর্মপন্থা ও দর্শনের পূর্ববর্তী বলে মন্তব্য করেন ক্ষুধার্তদের চিন্তা—

বুঝতে অসুবিধে হয়, এসব নিন্দা প্রশংসা বা ষড়যন্ত্রসূচক—যদিও প্রত্যেকেরই জানা দরকার, হাংরিরা যে কোনো 'সূচক'-এর বাইরে—তারা, তারাই—

সে, যে রূপেই আসুক, ক্ষুধার্তরা কোনো নামাবলিই গায়ে পরতে চায় না—সব নামাবলিতেই ফুটো পরিশেষে চোখে পড়ে যে!

অবনী ধর

কলিকাতা ভ্রমণ

কলিকাতায় এক অফিসারের প্রাইভেট গাড়ি চালাই। নো ওয়ার্ক নো পে। গাড়ি বেশি চলাতে হয় না, রোজ বাজারেও যেতে হয় না। বাড়িতে ফ্রিজ আছে।

দশটায় অফিসারকে পৌঁছে দিয়ে অফিসের সামনে গাড়ি পার্ক করে রাখি। গাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। চোখের আড়াল হলেই চাকা খুলে নিতে দু'মিনিটও লাগে না।

অন্যসব ড্রাইভাররা ফুটপাথে গামছা বিছিয়ে বসে পয়সা দিয়ে তাস খেলে। আমি ওদের পাশে বসে খেলা দেখি। যখন ঝিমুনি আসে তখন গাড়ির মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ি। গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে যায়। আবার নেমে ফুটপাথে পায়চারী করি। এমনই জায়গা, একটা ভালো মেয়েছেলেও দেখা যায় না।

বিকেলে অফিসারের মেয়ে বুলাই আর তার কুকুরকে নিয়ে লেকে যাই। বুলাই সবে শাড়ি পরা ধরেছে। মাথায় কোঁকড়ানো ববছাঁট চুল। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং। মুখে গোটা গোটা ব্রন।

কুকুর নিয়ে বুলাই হেঁটে হেঁটে বেড়ায়—হাওয়া খায়। আমি ঠায় গাড়ির ধারে দাঁড়িয়ে বুলাই-এর দিকে তাকিয়ে থাকি। ওর বুকের ওপর থেকে আমার আর চোখ সরে না। চেষ্টা করেও পায়ের দিক চোখ নামাতে পারি না। আর যাইহোক, বুলাই তো আর আমাকে বাবা বলে ডাকবে না।

বুলাই বাড়ি ফিরলে পর আমার ছুটি। মান্থলি টিকিট কাটতে পারিনি। মাইনে পেয়ে কাটবো ভেবে এখন বিনা টিকিটেই বাড়ি থেকে ট্রেনে যাতায়াত করি।

সেদিন আর অফিস যেতে হলো না। ভালো করে গাড়ি মুছেটুছে রেডি করলাম। বুলাই মার্কেটিং-এ যাবে। সঙ্গে চাকরও নেই কুকুরও নেই। বুলাই আর আমি। বালিগঞ্জ গেলাম। বুলাই নিজেই সব কেনাকাটি করলো। বাক্স আর প্যাকেট গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল। কয়েক জায়গায় বুলাই নেমতন্ন সারলো। পেছনের সিটে জিনিসপত্রে ঠাসা বলে বুলাই সামনের সিটে আমার পাশে এসে বসলো। বুলাই হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে,—'বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেলেটর চেপে ধরলাম খুব জোর। বুলাই গুনগুন করে গান গাইছে। আমি প্যাঁ—পুঁ—প্যাঁ—পু হর্ন বাজাচ্ছি। হঠাৎ বুলাই-এর গুনগুনানি থেমে গেল। কিন্তু আমি থামিনি, হর্ন বাজিয়েই চলেছি।

এক জায়গায় হঠাৎ গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে কীভাবে যেন ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। 'ধড়াম' করে এক শব্দ হতেই 'ও মা' বলে বুলাই চেঁচিয়ে উঠলো। আমি ঝপ করে স্টেয়ারিং ছেড়ে দিয়ে বুলাইকে দু'হাতে সাপটে ধরলাম। আপসেই গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বুলাই-এর

কোনো সাড়া নেই। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে উবু হয়ে আছে। আমিও খানিকটা নার্ভাস হয়ে গেছি। কী করবো? হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে নাকি? বাড়িতে ফোন করে দেবো? নাকি মাথায় জল ঢালবো? বুলাইকে ছেড়ে গাড়ি থেকে নামতে ইচ্ছে করছে না। গাড়ির সামনে তখন ভিড় জমে গেছে। হইচই-এর মধ্যে কারো কথা ঠিক আমার কানে ঢুকছে না। বাইরে মুখটা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—জল-জল। বুলাই তখন আমার হাত সরিয়ে দিলো। বললো—'কিছু লাগবে না। চলো।'

আমি তখন গাড়ি থেকে নেমে চারদিক দেখলাম। তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। গাড়িব পেছন দিকে খানিকটা জায়গা তুবড়ে গেছে। যেভাবে ধাক্কা লেগেছিল! গাড়ি উলটে সবশুদ্ধ যেতাম। বুলাই-এর বরাতেই হয়তো খুব জোর বেঁচে গেছি।

বুলাই বাক্স-প্যাকেটগুলি নেড়েচড়ে দেখলো সব ঠিক আছে কিনা। সে সময় জিজ্ঞেস করলাম—দিদিমনি, কোথায়ও লেগেছে? বুলা কোনো উত্তর না করে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলো। আমি তখন বিড়বিড় করে বলতে থাকি—আমার কী দোষ? আমি তো হাত দেখিয়েছি, হর্ণ দিয়েছি...। তবুও বুলা কোনো কথা বলছে না দেখে ভাবলাম—আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম বলে কি বুলাই আমার ওপর রাগ করেছে? কী জানি বাবা। মানে মানে এখন বাড়ি পৌছে দিই। তারপর যায় হয় হবে।

এক চান্সেই ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

এতক্ষণ আমি অনেকটা স্টেডিই ছিলাম। হঠাৎ কীরকম হাত-পা কাঁপতে শুরু করলো। রীতিমতো ঘাম বেরচ্ছে। ভাবছি—অফিসার শুনে কী বলবে? আমাকে ছাড়িয়ে দেবে? গাড়ি সারাই করার টাকা কি আমার মাইনে থেকে কাটবে? বুলাইও কি আমার দোষ বলবে...? ভেবেছিলাম—বউ বেচারি কোথায়ও বেরতে পারে না, এ মাসে মাইনে পেয়ে বউকে একটা শাড়ি কিনে দেবো তা বোধহয় আর হবে না। যাকগে—।

রাম এসে গাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল। রাম অল্পদিনই এ বাড়িতে কাজ করছে। মেদিনীপুর ওর বাড়ি ছিল। বন্যায় ওদের বাড়িঘর সব ভেসে গেছে। মা-বাবারও কোনো খোঁজ পাচ্ছে না।

একবার গাড়ি থেকে নামছি আবার উঠে বসছি। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখবো? না, আগে মুছেটুছে পরিষ্কার করবো? নাকি, সোজা গ্যারেজ করে দেবো?

এরই মধ্যে আবার রাম ফিরে এলো। পেছনে দু'হাত রেখে গাড়ির চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলো। তোবড়ানো জায়গাটা দেখে ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে অফিসারের মতো গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করলো—'চোখ নেই? দেখে চালাও না? সাহেবের হাতে তো কোনোদিন ধাক্কা লাগেনি আর তোমার ধাক্কা লেগে গেল?' আমি ফ্যাল ফ্যাল করে রামের দিকে তাকিয়ে আছি। 'হুঁ' বলে রাম আবার বললো—'এখন সারাতে তো অনেক টাকা লাগবে, কে দেবে?' ভেতর থেকে রামের ডাক পড়তেই চোখ পাকিয়ে আমার পা থেকে মাথা অবধি দেখে বললো—'যাও, সাহেব ডাকছে।'

ড্রইংরুমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পর্দার আড়াল থেকে শুনতে পাচ্ছি অফিসার টেলিফোনে কথা বলছে। আমি দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যাচ্ছে। নীল নীল আবছা আবছা আলো। রেডিয়োতে না রেকর্ডে বুঝতে পারলাম না, ইংরেজি গান হচ্ছে। মিসেস ঘোমটা খুলে সোফায় হেলান দিয়ে বসে পায়ের উপর পা তুলে তালে তালে নাচাচ্ছে। টেবিলের ওপর স্টিমের মতো সিগারেটের ধোঁয়া। দেয়ালের দিক তাকিয়ে

দেখি—দামি দামি ফ্রেমে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, আইনস্টাইন, মায়ের কোলে শিশু যিশুর ফটো টানানো রয়েছে। পাশে শিংওয়ালা কী এক জানোয়ারের মাথা ঝুলছে। নীচের দিকে কোনায় 'এল' সেপের কাঁচের আলমারিতে মোটামোটা ইংরেজি বই আর নানা রংয়ের খেলনায় ঠাসা। পাশেই উঁচু গোল টেবিলের উপর একটা বাস্‌কেট শাদা প্ল্যাস্টিকের ফুল দিয়ে সাজানো।

টেলিফোন ছেড়ে অফিসার মিসেসের পাশে এসে বসলো। কী যেন দু'একটা কথা বলে এক চুমুকে গ্লাস খালি করেই উঠে এলো। আমি মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে আছি। স্লিপিং সুটের পকেট থেকে একটা হাত বার করে আমার দিকে এগিয়ে এসে চাবি চাইলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাবি বার করে দিয়ে দিলাম। হাতে চাবিটা নিয়েই অফিসার মোটা গলায় বললো—'ইউ মে গো—কাল থেকে তোমায় আসতে হবে না'—বলে আবার গিয়ে সোফার উপর বসে পড়ল। আমার কোনো কথাই আর শুনলো না। মুখ শুকনো করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

গাড়ির ভেতর থেকে আমার লাইসেন্সটা বার করে নিয়ে পকেটে পুরলাম। রাস্তায় এসে দোতলার বারান্দার দিকে একবার তাকালাম। কেউ নেই। ওখান থেকেই 'এই ড্রাইভার গাড়ি বার করো—' বলে বুলাই আমাকে ডাকতো।

দুই

বাটি হাতে করে 'খেতে দাও খেতে দাও' বলে ছেলেমেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। বউ ঘর ঝাট দিচ্ছে আর গজগজ করছে। দোকানে শ্লিপ পাঠিয়েছিলাম। আগের ধার শোধ না করলে আর বাকি দেবে না বলে দোকানদার ফিরিয়ে দিয়েছে।

বউকে একটু জড়িয়ে ধরে বললাম—'এবার একটা চাকরি পেলেই তোমাকে অনেক দূরে বেড়াতে নিয়ে যাবো। এই ধরো দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীর। একটা বোট ভাড়া করে সেখানে আমরা থাকবো। ওখানে বাগানের ফ্রেস আপেল পাওয়া যায়। তুমি যদি একটা মাস থাকতে পারো না, দেখবে রংই পালটে গেছে।' বউ ঝেঁঝে উঠে এক ধাক্কায় আমার হাত সরিয়ে দিয়ে বলে—'তুমি গিয়ে এখন রং পালটাও, আমার দরকার নেই।' বিড়বিড় করে বলে—'ন'বছর হয়ে গেল একটু কালীঘাট নিয়ে যেতে বলেছিলাম...।' আদর করে বউ-এর গালে টুস্‌কি দিয়ে বলি—'রাগ করছো কেন গো—?' ঝ্যাটাটা আছড়াতে আছড়াতে বউ বলে—'যাই বলো বাপু আজকে গম না আনলে না খেয়ে থাকতে হবে। রোজ রোজ লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমি চাইতে পারবো না।'

জামাটা গায়ে দিয়ে একটা থলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে নজরে পড়ল—জামাটা উলটো করে পড়েছি।

অনেক ঘোরাঘুরি করে যখন কোনো ব্যবস্থাই করা গেল না তখন চেনা-জানা একটা ওযুধের দোকানে গিয়ে অনেক বলে কয়ে বুঝিয়ে বাকিতে একটা টনিক নিলাম। রক্তশূন্যতার জন্য ডাক্তার আমার বউকে ওই টনিকই খেতে বলেছিল। পাছে দোকানদার টের পেয়ে যায় সে কারণেই এক মাইল পথ হেঁটে অন্য আর একটা ওযুধের দোকানে গিয়ে বললাম—'দাদা, ভুল করে কলকাতা থেকে এনে ফেলেছি—' বলে একটাকা কমে টনিকটা বিক্রি করলাম। গম নিয়ে যখন বাড়ি ফিরি তখন বাজে বেলা বারোটা।

আর ক'দিন পরই বড়োদিনের উৎসব। পিকনিক, বেড়াতে যাওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গেছে। পাড়ার সব দল বেঁধে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে। আমার ছেলেমেয়েও বায়না ধরলো—'বাবা, চিড়িয়াখানা দেখব, টাকা দাও।' কিছুতেই মানাতে পারছি না। ওদের ভোলাবার জন্য তখন বললাম—ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে যাবি কেন? চল, আমরা সবাই মিলে একদিন চিড়িয়াখানা দেখে আসব। মেয়েই বড়ো। দু'হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে উঠলো—'হুঁ, তুমি তো খালি বলো, নিয়ে তো যাওনা কোনোদিন।' নগদ চার আনা করে পয়সা দিয়ে তবে ছেলেমেয়েকে শান্ত করি।

সেদিন হঠাৎ শ্বশুরমশাই এসে হাজির। বেড়াতে এসেছেন। বাজার করলাম। ধার করে শ্বশুরের জন্য মিষ্টিও নিয়ে এলাম। শ্বশুর একরাত একদিন থাকলেন। রাতে বোধহয় শীতে একটু কষ্ট পেয়েছেন। একখানাই কম্বল। আমরা ছেঁড়া কাঁথা-কাপড় গায়ে দিয়ে শ্বশুরমশাইকে কম্বলখানা দিয়েছিলাম।

শ্বশুর চলে যাবেন। তাকে বাসে তুলে দিতে গেছি। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে শ্বশুর বললেন—'বাচ্চাগুলো দেখলাম শীতে খুব কষ্ট পায়। একখানা লেপ বানিয়ে নিও'—বলে পকেট থেকে টাকা বার করলেন। কিছুতেই নেবো না আমি। তবু শ্বশুরমশাই জোর করে হাতে গুঁজে দিলেন। শ্বশুরকে বাসে তুলে দিয়ে গুনে দেখলাম—তিরিশ টাকা।

সে সপ্তাহে আগেই পুরো রেশন তুলতে পেরেছিলাম। এখন অন্তত সাতদিন নিশ্চিন্ত।

পরদিন খুব মেজাজ নিয়ে বউকে ডেকে বললাম—'তুমি কলকাতা দেখছো—যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ...?' বউ বললো—'সেই কবে একবার কাকার সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমি খুব ছোট্ট—এই বুড়োর মতো। এখন সেসব পরিষ্কার মনেও নেই আমার।'

'চলো তোমাকে কলকাতা দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

বউ শুনেই বলে উঠলো—'সত্যিই? নিয়ে যাবে?'

বললাম—'হ্যাঁ, কালই চলো।'

'একটু বড়ো গঙ্গায় নিয়ে যাবে—স্নান করবো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাবো।'

তুবও বউ-এর বিশ্বাস হচ্ছে না। বলে—'আমার গা ছুঁয়ে বলো।' বউ-এর গালে কষে এক চুমু দিয়ে বললাম—'সত্যিই সত্যি।' আঁচল দিয়ে মুছে মুছে বউ জিজ্ঞেস করলো—'তুমি টাকা পেলে কোথায়?' শ্বশুরের টাকার কথা বউকে জানালাম না। বললাম—'সে এক জায়গা থেকে জোগাড় করেছি।' বউ তখন এক গাল হেসে ফেললো।

জামা-কাপড় সিদ্ধ করে সব পরিষ্কার করলো। জিনিসপত্র গোছগাছ করে বউ রেডি। বউকে বললাম—'চিড়ে আর গুড় এনে রেখেছি। ওগুলো তোমার বালতি ব্যাগে পুরে নিও।'

আমরা খুব ভোরে বেরোলাম। এসময়ে এখানে বাস পাওয়া যায় না। রিকশা দেড়টাকা চাইলো। ভাবলাম—এই ক'টা টাকা, এখানেই খরচ করবো? কলকাতায় কত দরকারে লাগবে। তাছাড়া পনেরো মিনিটের পথ, হেঁটেই তো যাওয়া যায়? বউ রাজি হলো।

বাজারের ধার দিয়ে যখন যাচ্ছি, মুদিদোকানটা দেখিয়ে বউকে বললাম—'আর একটু বেলা হলে এ পথ দিয়ে আর যাওয়া যেতো না।' বউ ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে বলে—'কেউ দেখবে না তো?' বুক ফুলিয়ে বউকে বললাম—'আরে না না, ঘাবড়াবার কি আছে। এত ভোরে কি আর দোকান খোলে?'

তখন টিকিট ঘরের জানালা খোলেনি। বেনচিতে মাত্র কয়েকজন প্যাসেনজার বসে ঝিমুচ্ছে। ভাবছি—কখন গিয়ে পৌঁছব। আবার যদি গাড়ি লেট করে? ছেলেমেয়ে গাড়িতে খিদে খিদে করবে...। বউকে বললাম—'চলো এখান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

কাছেই একটা মিষ্টির দোকান সবে ঝাঁপ খুলেছে। আমরা ওই দোকানে গিয়ে বসে মিষ্টির অর্ডার দিলাম। বউ খেতে খেতে বলে—'একটা ফ্লাকস থাকলে ভালো হতো। গাড়িতে জলের ভীষণ অসুবিধে। আমাদের একটা চামড়ার সুটকেশ কিনো তো—এক জায়গায় যেতে গেলে লাগে।' ছেলেমেয়ে কী যেন বলে উঠতেই বউ থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি আবার টাকা পাবে কবে গো?' উত্তর দেবার আগেই বউ বলতে শুরু করে—'মুন্না-বুড়োর জুতো কিনতে হবে। সেই কবে কিনে দিয়েছো—ছিঁড়ে ঘুটো ঘুটো হয়ে গেছে।' এক সময়ে খাবারের টেবিলের নীচে চোখ পড়তেই দেখি, বউ-এর চটিও ছিঁড়ে গেছে।

গাড়ি আসার ঘন্টা শুনেই 'তোমরা এসো' বলে দৌড়ে টিকিট কাটতে গেলাম। গাড়িতে উঠে মনে পড়ল—মিষ্টির দোকানে পয়সা দিয়ে আসতে ভুলে গেছি।

আমরা জানালার ধারেই বসার জায়গা পেলাম। ছেলে আর মেয়ে একবার এ জানালায় একবার ও জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিক দেখছে। বউ আর আমি পাশাপাশি গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছি। একবার ছেলে একবার মেয়ে কেবলই জিজ্ঞেস করছে—'বাবা ওইটে কি খেলার মাঠ? ওই পুকুরটায় মাছ আছে? দেখ দেখ—গোরুর পিঠে একটা শকুন বসে আছে।' আমি 'হুঁ হাঁ' বলে যাচ্ছি। বউ-ও চুপ করে নেই। একটু আধটু কুয়াশার ঘনঘন গাছ, গ্রামের ঘর-বাড়ি, পুকুর দেখে বউ বলে চলে—'আমাদের যদি গ্রামের একটা বাড়ি হতো তাহলে হাঁস-মুরগি পোষা যেতো। পুকুরের চারপাশে নারকেল লাগিয়ে দিলে ওতে অনেক আয় হয়। আমার এক জ্যাঠামশাই-এর বাড়িতে তিরিশ-চল্লিশটা খালি নারকেল গাছই। নারকেল বিক্রি করেই সংসার চালায়।' জানালার দিক মুখ করে বউকে বললাম—'আমাদেরও হবে, একটা লটারি পেলেই তো ব্যস—। গ্রামে বর্ষার সময় জুতো পায়ে চলা যায় না। ইলেকট্রিক নেই। তাছাড়া সাপ-খোপের খুব ভয়।' বউ 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করে হেসে উঠে বলে—'না বাবা দরকার নেই, ওই অন্ধকার আমি থাকতে পারবো না, আমাদের অশোকনগরই ঢের ভালো।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে—'তোমার যদি একটা পাকা চাকরি হতো তাহলে আমাদের কোনো চিন্তাই থাকত না।' আমি চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। বউ-এর কথা শুনে মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে—গ্রামে বাড়ি—নারকেল গাছ—চাকরি...। শুধু দু'বেলা খাওয়ার ব্যাপারটায় যদি একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো—তাহলে আর কিছু নয়, শালা ফাটিয়ে দিতাম।

এক স্টেশন থেকে আমাদের কামরায় দুই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী উঠলো। বৈষ্ণবী করতাল বাজাচ্ছে আর বৈষ্ণব গাইছে। বউ পয়সা চাইতে পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে দিলাম। আমার বাবার কথা মনে পড়ল। শুনেছি, বাবা ভালো গান গাইত। এখন নাকি সেবাদাসী সঙ্গে নিয়ে গান গেয়ে বাবা ভিক্ষে করে। মামার মুখে শুনেছিলাম, শিষ্যরা নাকি বাবাকে অনেক জমি-জায়গা দিয়েছে।

ক্রমেই ছেলেমেয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এক একটা স্টেশন পার হচ্ছে আর কেবলই জিজ্ঞেস করছে—'বাবা আর কটা স্টেশন? কখন পৌঁছব...?' লজেন্স কিনে ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে বলি—'এখন আর চারটে স্টেশন—বিরাটি, ক্যান্টনমেন্ট, দমদম, উলটোডাঙা তারপর শিয়ালদা। আর আধ ঘন্টা।' ছেলে বলে—'তাহলেই কলকাতা পৌঁছে যাবো?' মেয়ে বললো—'আগে চিড়িয়াখানা যাবো তারপর যাদুঘর, না বাবা?' সঙ্গে সঙ্গে আবার ছেলে বললো—'তারপর গড়ের

মাঠ। গড়ের মাঠে ফুচকা খায়, না বাবা?' বউ বলে—'আগে গঙ্গায় স্নান করবো তারপর—।'

শিয়ালদা নেমে বউ-ছেলে-মেয়ে মিলে পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ সেরে নিলাম। বাইরে এসে মুচি খুঁজছি। এখন কি মুচি আসে? ট্রাম-বাস সব ফাঁকা ফাঁকা। ইলেকট্রিক তারের উপর সারি সারি কাক বসে আছে। টং টং ঘন্টা বাজিয়ে 'খবদ্দার খবদ্দার' বলতে বলতে রিকশা ছুটছে। রিকশার বাবুদের দেখে মনে হলো—সারারাত কলকাতাকে পাহারা দিয়ে ফিরছে।

আমরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলে কানে কানে বলে—'গাড়ি কিনে দিতে হবে।' মেয়ের চুড়ি চাই। বউ শুনে বলে—'আমাকে একজোড়া দুল কিনে দেবে? কানটা খালি খালি লাগে—বিশ্রী দেখায়।'

দোকানদার ধুপ-ধুনো দিয়ে বিস্কুট গুঁড়ো করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিলো। 'কা-কা-কা' ডেকে কাকেরা নীচে নেমে এসে খানিকক্ষণ ঝপটা-ঝাপটি কাড়াকাড়ি করে মুহূর্তের মধ্যেই আবার উড়ে চলে গেল।

ছেলে, বউ আর মেয়ের জুতো সারাই হলো। দোকানে নিয়ে গিয়ে ছেলের জন্য গাড়ি মেয়ের জন্য কাঁচের চুড়ি কিনে বউয়ের জন্য একজোড়া দুল কিনলাম দেড়টাকা দিয়ে। বউ-এর কানে দুলটা পরিয়ে দিলাম। দুল দুটো সোনার দুলের মতোই দেখাচ্ছে। বউ ভীষণ খুশি। একটা ফাঁকা ট্রাম দেখে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বউকে সঙ্গে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাশে উঠে পড়ি। বউ জানালা দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে করে চেয়ে দু'ধারে উঁচু উঁচু বাড়ি, দোতলা বাস, গাড়ি...দেখছে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে কেবলই আকাশের দিকে তাকায়। আস্তে জিজ্ঞেস করলাম—'কি দেখছো?' অত লোকজনের মধ্যে বউ চেঁচিয়ে বলে--'দেখ, এখানে কোনদিক পুব আর কোনদিক পশ্চিম তা বোঝায় যায় না।' বউকে চিমটি কেটে ফিসফিস করে বলি—'ওটা ভূগোল পড়ে জানতে হয়।'

গঙ্গার ঘাটে এসে নামলাম। ঘাটে বেশ ভিড়। খালি গায়ে কোমরে গামছা বেঁধে, কেউ জড়িয়ে, কেউ মাথায় দিয়ে বিড়বিড় করতে করতে ঘাটে নামছে। ডুব দিয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে কী সব বলে চলে যাচ্ছে। ঘাটে ওঠার বিরাম নেই।

বউ বাড়ি থেকে তেল গামছা নিয়ে এসেছে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে আমি ঘাটের একপাশে দাঁড়ালাম। বউ গঙ্গাস্নানে নামলো।

দূরে কয়েকটা জাহাজ বাঁধা। ছেলেমেয়েকে জাহাজ দেখিয়ে বললাম—'আমি ওই রকম জাহাজে করে অনেক দেশ ঘুরেছি।' মেয়ে জিজ্ঞেস করলো—'বাবা তুমি বিলেত গিয়েছিলে, না?' সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বলে দিলো—'জানিস, বাবা সমস্ত পৃথিবীটা দেখেছে।' মেয়ে বললো—'বাবা কি আকাশেও গেছে?' আমার তখন দেশ-বিদেশের বন্দরের কথা মনে পড়ছে। লন্ডনে মেমরা 'টু ইয়ং' বলে আমাকে কত আদর করত, চুমু দিতো। আর আমি ইংরেজিতে বলতাম—'ভেরি গুড ভেরি গুড।' ওরা হুইস্কি খেতো, আমাকে দিতো চকলেট, মিল্ক-সেক। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে আমার বুক ফুলে উঠত। কী গাণ্ডুই ছিলাম তখন!

বউ গঙ্গাস্নান সেরে পাণ্ডাদের কাছে গিয়ে পুজো দিলো। ছেলেমেয়ের কপালে চন্দনের ছাপ পড়ল। বউ খানিকটা গঙ্গাজল আমার মাথায় ছিঁটিয়ে দিয়ে হা করতে বললো। হা করলাম। বউ মুখে চরণামৃত দিলো। আমার কেবলই সেইসব মেমদের কথা মনে পড়ছে।

ঘাটের পাশে সারি সারি খাবারের দোকান। আমরা এক দোকানে বসে পেট পুরে সিঙাড়া, কচুরি আর একটা করে লাড্ডু খেলাম। হিসেব করে দেখলাম—প্রায় দশটাকা খরচ হয়ে গেছে। দশ-কুড়ি-তিরিশ টাকায় কি আর কলকাতায় বেড়ানো যায়?

একটা ট্যাকসি চড়ে সোজা চিড়িয়াখানা দেখতে গেলাম। নেমে দেখি, সে কী ভিড়! এক

মাইলের ওপর লাইন পড়ে গেছে। খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বউ বলে উঠলো—'এই ভিড় ঠেলে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না।' কিন্তু ছেলেমেয়ে? তারা তো নাছোড়বান্দা, কিছুতেই ছাড়বে না। অনেক করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শেষে কেটে পড়লাম। বাসেও খুব ভিড় ওঠা গেল না। আমরা হেঁটে হেঁটে ঘোড়ার মাঠ, পি. জি. হসপিটাল দেখতে দেখতে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে একটু ঘুরে দেখে গড়ের মাঠের দিকে গেলাম।

বউকে জিজ্ঞেস করলাম—'এখন কোথায় যাবে?' গড়ের মাঠে জায়গায় জায়গায় তখন ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। ছেলেমেয়ে খেলা দেখতে চাইলো।

আমরা একধারে গিয়ে বসে খেলা দেখছি। ছেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো—'আমাকে ওই রকম একটা ব্যাট কিনে দেবে?' আদর করে বললাম—'তুমি ওইরকম বড়ো হও, নিশ্চয়ই দেবো।' মেয়ে জিজ্ঞেস করলো—'বাবা তুমি ক্রিকেট খেলতে পারো?' বললাম—'হ্যাঁ। ছোটোবেলায় আমি ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলাম। কয়েকবার দৌড়ে ফার্স্ট হয়েছি। ক্রিকেটে ভালো ফিল্ডার হিসেবে আমার নাম ছিল। তখন আমার চেহারা কত ভালো ছিল।' বউ-এর দিকে মুখ করে মুচকি হেসে মেয়েকে বলি—'তোর মা আসার পরই আমার চেহারা এই রকম পটকে গেছে।' বউ ভ্রুকুঁচকে হাসি হাসি মুখ করে বলে—'আমার চেহারাও ছোটোবেলায় খুব ভালো ছিল। মেজো মামার বাড়ি গিয়ে দেখবে, এখনও আমার ফটো আছে। এই রকম রোগা-প্যাটকা ছিলাম নাকি?' পরে কানের কাছে মুখ এনে বলে—'তুমিই তো করেছো।'

রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠছে। আর বসে থাকা যাচ্ছে না। এখানে একটু ছায়াও নেই যে গিয়ে কোথাও বসবো।

ওখান থেকে দোতলা বাসে চেপে ধর্মতলা এসে নামলাম। খিদেও পেয়েছে। কার্জন পার্কটা দেখিয়ে বউকে বললাম—'চলো, ছায়া আছে। ওইখানে গিয়েই বসি।'

পার্কের এক কোনায় খুব ভিড় জমেছে। কী ব্যাপার দেখার জন্য আমরাও গেলাম। গিয়ে দেখি, বিরাট বিরাট সব ইঁদুর গর্ত থেকে বেরচ্ছে। লোকেদের হাত থেকে বাদাম, ছোলা মুখে করে নিয়ে আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ওই দেখে বউ বলে উঠলো—'দেখেছো ইঁদুরগুলির কী সাহস? হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের ওখানে খাবার দিয়ে রাখলেও সামনে আসে না।' বউ হাত ধরে টেনে বলি—'ওরা কলকাতার ইঁদুর কিনা, চলো—।'

পার্কে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে আছে। কেউ পা লম্বা করে বসে, কেউ গায়ের মধ্যে গা লাগিয়ে, কেউ নীচের দিকে ঝুঁকে, আবার একজনের কোলে আর একজন মাথা রেখে কেউ কেউ শুয়েও আছে।

কয়েকটা কলা কিনে নিয়ে একটা গাছতলায় গিয়ে বসে চিড়ের ঠোঙা, গুড়ের ঠোঙা বার করলাম। পাশ দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে। খুব সুন্দর একটা মেয়ে একটা ছেলের হাত ধরে যেতে যেতে একটুখানি চোখ খুব আমাদের দেখলো। আমরা কলা দিয়ে চিঁড়ে আর গুড় মেখে খাচ্ছি।

ছেলেমেয়ের জল তেষ্টা পেয়েছে। বাড়ি থেকে জলের জন্য গ্লাস বা শিশি-বোতল একটা কিছু আনা উচিত ছিল। বউ বললো—'আমার একদম খেয়ালই ছিল না।' বউকে একা বসিয়ে রেখে ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। খানিকটা দূরে ফেরিওয়ালাদের কাছে জল পাওয়া গেল। ভাঁড়ে করে বউ-এর জন্যও এক ভাঁড় জল নিয়ে এলাম।

ছেলেমেয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার শরীটাও ক্লান্ত লাগছে। ঘাসের ওপর টানটান

হয়ে শুয়ে পড়লাম। পয়সার হিসেব করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

তখন চারটে বাজে। বউ ডেকে দিতে তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। একটু আড়মোড়া ভেঙে বললাম—'এবার কোথায় যাবে?' বউ বলে—'যেখানে নিয়ে যাও।' তখন বললাম—'নিউ মার্কেট দেখেছো?' বউ বললো—'নামই শুনেছি। সেখানে নাকি সব সাহেব-মেমরা বাজার করতে আসে?'

রবিবার নিউ মার্কেট বন্ধ থাকে এটা জানতাম না। মনে হলো, নিউ মার্কেট দেখতে না পেয়ে বউ-এর মন খারাপ হয়ে গেছে।

হাঁটছি আর ভাবছি—এখন কোথায় যাবো? কাছাকাছি আর কোথায় নিয়ে গেলে বউ খুশি হবে...!

গ্র্যান্ডের বাড়িটা দেখিয়ে বউকে বললাম—'এই হচ্ছে গ্র্যান্ডহোটেল। নাম শুনেছো না?' বউ মাথা নেড়ে হা হয়ে তাকিয়ে দেখছে। বউ-এর পিঠ চাপড়ে 'চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি' বলেই গেটের সামনে গেলাম। সোজা ঢুকে যেতে কেমন যেন লাগছে। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে দরওয়ানের কাছে গিয়ে বললাম—'দরওয়ানজী হামলোক থোড়া অন্দর মে যায়গা?' দরওয়ান মুখ কুঁচকে বললো—'কেয়া?' বললাম—'অন্দর মে যায়গা, থোড়া দেখকে ফের চলা আয়গা।' দরওয়ান হাত নেড়ে বললো—'ইধার দেখনেকো কুচ নেহি হ্যায়।' আঙুল দিয়ে রাস্তার দিকে দেখিয়ে বলে—'আগে বাড়ো, বহুৎ কুচ দেখনেকো মিলেগা।' বলেই 'খ্যাট' করে এক সেলুট ঠুকলো। বউ আমার হাত ধরে টেনে বললো—'সরে দাঁড়াও।' একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখি, সুট পরা এক দেশি সাহেব বিলিতি মেমের হাত ধরে গ্যাট গ্যাট করে ভেতরে ঢুকে গেল।

বউকে ছেলেমেয়ে নিয়ে একটু সরে দাঁড়াতে বলে আবার দরওয়ানকে গিয়ে বললাম—'দেখিয়ে, বহুত দূরসে আয়া। কভি ইসকা অন্দর দেখা নেহি, লেকিন নাম শুনা বহুত। ওয়ালর্ডসে ভি ইসকা নাম হ্যায়। ইসলিয়ে যরা দেখনেকো সখ হুয়া।' বিরক্ত হয়ে দরওয়ান রাস্তার দু'দিকে হাত দেখিয়ে বলে—'যাও না বাবা, রাস্তাকা দো বাজুমে কেতনা তামাশা হোতা হ্যায়, যাও—, জি ভরকে দেখো।' তখন সাহেব-মেম-বাচ্চাদের একটা দল ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। দরওয়ান 'খটাস—খটাস—খটাস' সেলুট ঠুকলো। সে সময় আমি একটু সরে দাঁড়ালাম। বউ তখন আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে—'কী দরকার ভেতরে যাবার। চলো অন্য কোথাও যাই।' আমার তখন যেন কীরকম রোখ চেপে গেছে। শালা, এটা কি দরওয়ানের বাপের হোটেল যে ঢুকতে দেবে না? মুখ ফিরিয়ে বউকে বলি—'ভয় পাবার কিছু নেই। ভেতরে গিয়ে চা খাবো এক কাপ করে।'

'অত পয়সা আছে তোমার কাছে?' চোখ বড়ো বড়ো করে বউ বলে।

'আরে যত দামই নিক এককাপ চা খাবার পয়সা আছে।' একটু থেমে আবার বলি—'যখন জাহাজে ছিলাম তখন এর চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো হোটেলে আমি গেছি।' দরওয়ান খুব ব্যস্ত। দাঁড়িয়ে কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছি না। কেবলই সাহেব আসছে, বেরচ্ছে, ঢুকছে। এদিকে দরওয়ান ঠায় দাঁড়িয়ে 'খটাস খটাস' হাত তুলছে আর আর নামাচ্ছে।

একসময় এক সাহেবকে পৌঁছে দেবার জন্য গেট ছেড়ে গাড়ির ধারে যেতেই ভাবলাম—এই সুযোগে ঢুকে পড়ি। ছেলেমেয়ের হাত ধরে বউকে ইশারা করে গেটটা পেরিয়ে এক পা কি দু'পা এগিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ছুটে এসে দরওয়ান আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে বার করে দিলো। বউয়ের সামনে একটু অপ্রস্তুতেই পড়ে গেলাম। কী খেয়াল

গেল, হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। একটু গম্ভীর হয়ে দরওয়ানকে বললাম—'অন্দর জানেমে মানা হ্যায় কেয়া?' দরওয়ান এক ধমক দিয়ে বলে উঠলো—'তুম আদমি হ্যায় কেয়া? বেকার ঝামেলা লাগায়া। চলো—ভাগো হিঁয়াসে।' আমি এগিয়ে গিয়ে এক চড় তুলে বলি—'কাহে ফালতু বাত্ বোলতা, জবান সামালকে বাত করো। তুম কেয়া সমাজতা হ্যায় হামকো?'

এরই মধ্যে আমাদের আশেপাশে কয়েকজন বাইরের লোক এসে ভিড় করেছে। লোকজন দেখে আমি আরও একটু সাহস পেলাম। ভিড়ে গেট দিয়ে যাওয়া আসার পথও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতর বাইরে সব দেশি-বিদেশি সাহেব মেমরা দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে বেয়ারাদের মাথায় সুটকেশ, কারো হাতে ব্যাগ—অ্যাটাচি কেস। দরওয়ান বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেছে। ওদিকে সেলুট ঠুকবে না আমাকে সামলাবে বুঝে উঠতে পারছে না। খুব ব্যস্ত হয়ে নরম সুরে আমার দিক হাতজোড় করে বললো—'যাইয়ে ভাইসাব যাইয়ে—আপসে হাত জোড়তা হ্যায়।' হামকো ডিউটি করনা হ্যায়।'

তখন রীতিমতো একটা হইচই বেঁধে গেছে। দরওয়ান দিশেহারা হয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। বউ আমাকে কেবলই ডাকছে। হাত ইশারা করে বউকে থামতে বলছি।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েকজন বেয়ারা, রিসেপসনিস্ট সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। আমার দিকে দেখিয়ে দরওয়ান রিসেপসনিস্ট বলে—'এ আদমি বহুৎ ঝামেলা লাগায়া। দেখিয়ে কেতনা গরদি লাগা দিয়া, বলনেসে ভি মানতা নেহি হ্যায়।'

কোমরে দু'হাত দিয়ে রিসেপসনিস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলো—'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হিয়ার? কি চাই আপনার?' খুব শান্ত হয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলাম—'জাস্ট অনলি টু গেট ইন উইথ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন—নাথিং মোর।' হাত নেড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে রিসেপসনিস্ট বলে—'দেয়ারার লটস অফ প্লেস ইন দ্যা সিটি—ইউ মে এনজয় দেয়ার। হিয়ার নাথিং টু সি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড।' রিসেপসনিস্টের কথা শুনে হঠাৎ কীরকম ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে গড়গড় করে বলে যেতে থাকি—'হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক মি? ডু ইউ নো—আই হ্যাভ ট্রাভেলড অলমোস্ট অল দি ইমপরটেন্ট পোর্টস অফ দি ওয়ালর্ড ইনক্লুডিং মেরিকা অ্যান্ড চায়না। আই ব্লাডি এনজয় সো মেনি বিগ বিগ হোটেলস ইন নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, হংকং অ্যান্ড লট অফ মানি দেয়ার—ইউ নো?'

আমার কথা শুনে কীরকম সব চুপ মেরে গেল। কী ভাবলো জানি না। রিসেপসনিস্ট দরওয়ানকে সরিয়ে একটু পথ ফাঁকা করে নম্র হয়েই বললো—'অলরাইট, ইফ ইউ লাইক সো—ইউ মে কাম ইন দেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বউকে ডেকে বললাম—'এসো'। আর কোনোদিকে না তাকিয়ে দু'হাতে ছেলে আর মেয়ের হাত ধরে গ্যাট্ গ্যাট্ করে সাহেবদের মতো পা ফেলে ফেলে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভিজে গামছা আর কাপড়ে ভর্তি ব্যালতি ব্যাগ হাতে নিয়ে পেছন পেছন আমার বউ।

খানিকটা এগিয়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিকে ওদিকে দেখছি। কোনদিকে যেতে হয় তাতো আর জানি না। পেছন ফিরে দেখি, আমাদের পেছনে পেছনে একদল বেয়ারা-রিসেপসনিস্ট আসছে।

বাঁদিকে ঘুরে গেলাম। সামনেই দেখি ওপরে ওঠার সিঁড়ি। আমার ছেলেটা ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে স্লিপ করে পড়ে গেল। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতেই বউ তাড়াতাড়ি 'চুপ চুপ' বলে হাত দিয়ে ছেলের মুখ চেপে ধরলো। ছেলেকে কোলে নিয়ে শান্ত করতে করতে আমার জামা

ধরে টেনে চাপা গলায় বলে—'কী পাগলামি করছো? আমার একটুও ভালো লাগছে না—চলো, এখান থেকে চলে যাই।' বউয়ের কথায় কান না দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম।

দেখি, বাঁধানো উঠানের মতো একটা জায়গা। মাঝখানে ফোয়ারা আর একটা ল্যাংটো মেয়েছেলে দাঁড়ানো। তার চারপাশে টবে ফুলগাছ। একপাশে কয়েকটা খালি চেয়ার-টেবিল সাজানো রয়েছে। ওপরে ছাদ নেই ফাঁকা আকাশ। আমরা ওখানে গিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসলাম। চালার মতো একটা সেডের নীচে কয়েকজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় ওটা একটা স্টল বা বার হবে। চেয়ারে বসে 'বেয়ারা বেয়ারা' বলে ডাকলাম। বেয়ারারা আমাদের দিকে দেখছে কিন্তু কোনো উত্তর দিচ্ছে না, কাছেও আসছে না। দু'একজন কয়েকটা টেবিল মুছে নিয়ে চলে গেল। আমার কাছে এলো না কেউ। একটু দূরে ওই বেয়ারা রিসেপসনিস্ট-এর দল দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে। তখন পকেটে হাত পুরে চায়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখি, বউয়ের চোখে জল। বউ কাঁদছে। মুখ থেকে আমার আর কথা বের হয় না। দাঁড়ানো অবস্থাতেই বউয়ের হাত ধরে টেনে ফিসফিস করে বলি—'চলো, চলে যাই।'

বেরিয়ে এসে বউ আর দাঁড়ায় না। সোজা হাঁটা দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়—ফুটপাথে লোক গিজগিজ করছে। রাস্তায় নানান সুরে সারি সারি গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছে। কলকাতায় এখন মজার সময়।

বউকে ডাকি, মুখও ফেরায় না। লোকের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে এক সময়ে বউ দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখ মুছতে মুছতে বলে—'তোমার কী দরকার ছিল ওখানে ঢোকার?' হাঁপানির টানের মতো শ্বাস ফেলে বলে—'আমার বুকের ভেতরটা এখনও কাঁপছে।'

আমারও মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। ভাবছি—এখানে না গেলেই হতো। মাথায় কী যেন পাগলামি চেপে বসলো। তবু মুখে হাসি টেনে বউকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—'মন খারাপ করার কী আছে।' তখন হঠাৎ মনে পড়তেই বউকে বললাম—'সেই যে অফিসারের গাড়ি চালিয়েছিলাম তার কাছে আমার টাকা পাওনা আছে। চলো, আজ না হয় ভালো একটা হোটেলে থেকে যাবো। রাতে সিনেমাও দেখা যাবে। খুব সকাল সকাল উঠে কালীঘাট থেকে ঘুরে তারপর বাড়ি ফিরব।—কী বলো?' শুনেই বউ বলে উঠলো—'আমাদের তুমি গাড়িতে তুলে দিয়ে তারপর সিনেমা দেখ, হোটেল থাকো যা খুশি তাই করো—আমার আর দেখার দরকার নেই।' বলেই আবার হাঁটতে শুরু করে।

তখন বউয়ের হাত টেনে বলি—'বাড়িতে সংসার খরচের জন্যও তো টাকার দরকার। কলকাতায় যখন এসেইছি তখন গিয়ে টাকাটা নিয়েই আসি—তারপর যা হয় দেখা যাবে।' মেয়ে জিজ্ঞেস করলো—'বাবা আজ আমরা কলকাতায় থাকবো?' 'হ্যাঁ বাবা' বলেই হাসি হাসি মুখ করে বউ-এর দিকে তাকালাম। দেখলাম, বউ-এর চোখের একটা পাতাও নড়ে না। বউকে রাজি করার জন্য ছেলেকে তখন আদর করে বলি—'বুড়াই, তুমিই বলো, থাকবে না বাড়ি যাবে? তুমি যা বলবে তাই হবে।' ছেলে আমার ঘাড়ে মুখ গুঁজে বলে—'সিনিমা দেখব।' তখন দেখি, বউ-এর ঠোঁট কেঁপে একটু যেন হাসি বেরলো।

বউকে খুশি করার জন্য তাড়াতাড়ি দোকান থেকে মিষ্টি পান কিনে আনি। ছেলেমেয়ের জন্য কিনলাম চকলেট। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তিন

ট্রামরাস্তার ধারে বউ-ছেলেমেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখে সেই অফিসারের বাড়ি গেলাম। চাকরের কাছে খবর পাঠিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে আছি।

ঘনঘন ওপর বারান্দা আর নীচের দরজার দিক চেয়ে চেয়ে দেখেছি। মিহি গলায় চাকরের নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম। ভেতরে কেবল কাপ-ডিস নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আয়ারা তখন পার্ক থেকে বেবীদের নিয়ে বাড়ি মুখো ফিরছে। রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালারা যাচ্ছে সারাদিনের বিক্রির পয়সা গুনতে গুনতে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে। ক্রমেই চোয়াল শক্ত হয়ে দাঁতে দাঁত এঁটে যাচ্ছে আমার। সে সময় হঠাৎ ধপধপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার পায়ের শব্দ শুনে আমার বুক যেন ঘেমে উঠলো। দেখলাম, বাড়ির চাকর দৌড়ে কী যেন আনতে যাচ্ছে দোকানে। আমাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে গেল—'সাহেব এক্ষুনি নীচে নামবে।' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে হাত ঘষে মুখ-চোখটা একটু পরিষ্কার করে নিলাম।

একটু পরেই গাড়ি স্টার্ট কর শব্দ হলো। নীচের তলাতেই গ্যারেজ। বাড়ির ভেতর দিয়ে গ্যারেজ ঢোকার পথ আছে। সামনের দরজা দিয়ে কুকুর সঙ্গে করে মিসেসকে আসতে দেখে একটু সরে দাঁড়ালাম। পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। 'নমস্কার' বলার জন্য হাত তুলেও নামিয়ে নিলাম। চিনতে পারবে কিনা কে জানে।

কুকুরটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। প্যাট প্যাট করে একবার আমার মুখের দিকে আর একবার মিসেসের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। আমার প্যান্ট থেকে জামা অবধি শুঁকে 'ফ্যাচ ফ্যাচ' করতে করতে লেজ নাড়িয়ে চলে গেল।

দেখলাম, গ্যারেজ থেকে অফিসার নিজেই গাড়ি বার করে গেটের সামনে এনে দাঁড় করালো। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর লাফিয়ে উঠে পড়ল। মিসেস উঠে বসলো সামনের সিটে। আমিও এগিয়ে গেলাম।

অফিসার বনেট খুলে দেখছে। বোধহয় জল-মোবিল চেক করছে। শুনছি বিড়বিড় করে বলছে—'মিস্ত্রিগুলো যা হয়েছে, কতবার করে বললাম—এ সি পাম্পটা খুলে ভালো করে দেখতে, এ দেখছি হাতই লাগায়নি...।' গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে মিসেস জিজ্ঞেস করলো—'কার কাছে দিয়েছিলে?' মুখ না তুলেই অফিসার জবাব দেয়—'ওই যে—বাঙালি ছোকরাটা, কী নাম?' মিসেস মনে করে বললো—'মন্টুর গ্যারেজ?' অফিসার মাথা নেড়ে বলে—'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই ব্যাটাই আমার গাড়িটার সর্বনাশ করে দিয়েছে। এক পয়সারও কাজ করে না মাস গেলে ঠিক বিলটি এনে হাজির করবেন, যতো সব...।' মিসেস রুমাল দিয়ে গলা মুছতে মুছতে উঠলো—'এবার বিল নিয়ে এলে আটকে রাখবে--এক পয়সাও পেমেন্ট করবে না।'

আমি গাড়ির কাছে অফিসারের পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। চোখে চোখ পড়তেই হাত জোড় করে বললাম—'নমস্কার স্যার।' মনে হলো, আমাকে দেখেই আরও বেশি বিরক্ত হয়ে উঠলো। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো—'কি চাও? বলেই একহাতে টাই ধরে আর একহাত দিয়ে খুট খুট করতে লাগলো। আমি হাত কচলে বললাম—'খুব বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি স্যার। আমার কিছু টাকার দরকার।'

—'তুমি আবার কীসের টাকা পাবে?'

—'আমি স্যার আপনার গাড়ি চালিয়েছিলাম।'

—'ক'দিন চালিয়েছিলেন?'

—'চোদ্দোদিন।'

—'চোদ্দোদিন গাড়ি চালালেই টাকা দিতে হবে? সার্ভিস রুল জানো? তোমাকে তো ডেলি পেতে রাখিনি মানথলি রেখেছিলাম।'

আমি মুখের দিক সোজাসুজি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম—'ডেলি পে, মানথলি পে—এসব কী বলছেন স্যার? চোদ্দোদিন গাড়ি চালিয়েছি দেড়শোটাকা' হিসেবে আমার সত্তর টাকা পাওনা হয় এর সঙ্গে সার্ভিস রুলের কী আছে?'

—'তোমার কাছ থেকে রুল শিখতে হবে? আমাকে রুল শেখাতে এসেছো?'

আমি একটু রেগে গিয়েই বলি—'রুলের কথা বলছেন, আপনি কি আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছিলেন?' অফিসার তখন এড়িয়ে গিয়ে বলে—'আমার গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছিলে মনে নেই? সে টাকা কে দেবে?'

—'ঠিক আছে, ওই টাকা থেকে কেটে রাখুন।'

অফিসার গাড়িতে উঠে বসে সেলফ স্টার্টার টেনে বলে—'তোমাকে বেচলে এক টিন রংয়ের দামও হবে না।' এবার আমার ভয় হয়, সত্যিই বোধহয় টাকাটা না দেয়ারই মতলব। সঙ্গে সঙ্গে হাত পা যেন ঠান্ডা হয়ে আসে। গাড়ির দরজা শক্ত করে ধরে বলি—'আপনি বিল দেখান। যদি বেশি লেগে থাকে, আমি টু দি পাই মিটিয়ে দিয়ে যাবো।' পাশ থেকে মিসেস উঠলো—'কী বাজে বকছো অত—তাড়াতাড়ি চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।' আর সামলাতে না পেরে দাঁত শক্ত করে মিসেসের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলি—'কাজ করেছি টাকা পাই। আমি কি ভিক্ষে চাইতে এসেছি আপনাদের কাছে?' অফিসার গিয়ার দিয়ে 'তোমার সঙ্গে অত বকার সময় নেই আমার। ইউ মো গো নাউ' বলেই পা দিয়ে অ্যাকসেলেটর দাবিয়ে ধরলো। গাড়ির স্পিডে দরজা থেকে হাত ফসকে ছিটকে পড়ে গেলাম। রাগে মাথা ঝিমঝিম করছে, চোখে আর কিছু দেখছি না। চিৎকার করে বলে উঠি—'আমার ওই ক'টা টাকা মেরে রাজা হবি? টাকা দিতে না পারিস তোর বউকে দেনা। শাঃ—লা।' আমার চিৎকার অবশ্য ওদের কান অবধি পৌঁছয়নি। গাড়ি ততক্ষণে আমাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর বেরিয়ে গেছে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জামা-প্যান্টটা ঠিকঠাক করে নিলাম। কনুইয়ের কাছটা ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছিল। বউ এক মনে ছেলেমেয়ের হাত ধরে কলকাতার রাস্তার লোকজন দেখছে। গিয়ে বললাম—'চলো, এখনও আটটা দশের গাড়িটা পাওয়া যাবে। মফস্‌সলের গাড়ি, বলা যায় না, এরপর হয়তো বাড়ি ফেরার গাড়িও পাবো না।'

দেবেশ রায়

বিলম্বিত সওয়াল

বছর সাত আগে আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে, বাসুদেব দাশগুপ্ত বা সুভাষ ঘোষের লেখা আমার নজর এড়িয়ে থেকে যায় প্রায় এতদিন-ই? দুটো একটা লেখা তখন পড়েছি কী তারপর, বা পড়িনি এমনকি তারপরও সেকথা বড়ো নয়। যে-লেখাগুলি এখন আমি একসঙ্গে পড়ছি সেগুলির জন্যই কি পুলিশ তাড়া করেছিল ওঁদের? বাসুদেব দাশগুপ্তের রন্ধনশালা বইটি অভিরামের চলাফেরা আর দেবতাদের কয়েক মিনিট নামের দুই কিস্তির বড়ো গল্প, রিপুতাড়িত, লেনী ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে বা সুভাষ ঘোষের টি-বি ভিডি, যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট, আমার চাবি, থ্রু গাড়ির টিকিট—এই গল্পগুলির তালিকা কি পুলিশের চার্জশিটে ছিল? এর সঙ্গে হয়তো অবনী ধরের আমার দুঃখিনী মা বা ভাতের জন্য শ্বশুর বাড়ি-র উল্লেখ করতে চাই।

ঠিক এই রচনাগুলিরই জন্য পুলিশ এঁদের নাম আসামির খাতায়, এঁদেরই নাম, তুলেছিল কি না সেটার জবাব তো এই লেখাগুলির প্রকাশ তারিখেই মিলে যেতে পারে। কিন্তু সেইসব ঘটনার থেকে বছর সাত পেরিয়ে গেলেও আজ এই সূচীতে পুলিশ আক্রমণের আগে ও পরে—এই চিহ্ন দেওয়া যায় না। একবার ছুঁয়েই পুলিশ এই তাবৎ রচনায়—থাবার আধারচিহ্ন রেখে দিয়ে গেছে। এর কোনো একটি রচনা যদি অভিযোগ হিসেবে ফিরে এসে থাকে তাহলে সবগুলিই কাজে হোক না হোক, মূলত নিশ্চিত-অতিযোগপত্র।

১৯৬৯ সালের "হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত" সংকলনে "হাংরি জেনারেশন" সম্পর্কে বিভিন্ন সময় নানা ব্যক্তি ও সংগঠনের মতামত সংকলিত হয়েছে। হাংরিদের গার্হস্থ্য অভ্যাসগুলো সঞ্চিত এই তথ্যে জানা যায় পুলিশের অভিযোগপত্রে সেদিন অন্তত খানিকটা সামাজিক সায় ছিল। "হাংরি জেনারেশনে" কী ও কেন সম্পর্কে সামাজিক কৌতূহল সত্ত্বেও আমার সাহিত্য-জিজ্ঞাসা প্রখর নয়। কখনো বা মনেও হচ্ছে হাংরিদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা বা প্রচার প্রকরণ কি শিল্পের সেই অমোঘ আশ্রয় ঢেকে রেখেছিল, বাসুদেব দাশগুপ্ত বা সুভাষ ঘোষ সমস্ত প্রশ্ন ও পরীক্ষার পর সমস্ত পুলিশি ও সামাজিক অভিযোগ সত্ত্বেও যে-আশ্রয়ে থেকেই যান।

হাংরিদের উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টার সেইদিন বছরগুলি পেরিয়ে আজ তাঁদের রচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যখন, তখন, আমি নিজেকে খানিকটা দায়ী না-ভেবে পারি না। কেন আমি সেদিনই হাংরি নামধেয় হলেও সাহিত্যের পক্ষে দাঁড়াবার মতো ওয়াকেবহাল ছিলাম না? তাই এটি আমার বিলম্বিত সওয়াল, শারীরিকভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাহিত্যের পক্ষে।

দুই

অপরাধবোধ আমার প্রবল হয়ে ওঠে যখন বুঝতে পারি পুলিশ তার দৃষ্টি থেকে সেদিন চিনতে ভুল করেনি। পুলিশ ঠিকই বুঝেছিল এই লেখাগুলি নৈরাজ্যিক, শব্দের দ্বারা সাজানো সমাজকেও এরা অস্বীকার করছে, ফিরে যেতে চাইছে শব্দের আদিতে—যেখানে শুধুমাত্র একটি স্থূল অর্থেই শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে আর তাই পরোক্ষভাবে বিদ্রোহে ঘোষণা শব্দের তথাকথিত সামাজিক ব্যবহারের বিরুদ্ধেই।

অপরাধবোধ আমার প্রবল হয়ে ওঠে যখন বুঝতে পারি আমাদের দৃষ্টি থেকে সেদিন চিনতে পারিনি। আমরা বুঝতে পারিনি স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশকব্যাপী বঞ্চনা আর মূঢ়তার বিরুদ্ধে অধৈর্যে অস্থির এই লেখাগুলো আঘাত করতে চাইছে এই পুঁজি-সমাজের গায়ের ভিতে। বুঝতে পারিনি যে-সত্যকথন কথাশিল্পের একমাত্র মাপকাঠি, সেই সত্যকথনের তাড়না এই লেখাগুলির অক্ষরে বিন্যাসে। হয়তো কখনো কখনো অংশ সত্যই সমগ্রের চেহারা ধরে এসেছে, হয়তো সমগ্র সত্য আবিষ্কারের জন্য জরুরি চাবিকাঠিটি এদের হাতে নেই—কিন্তু কে অস্বীকার করবে লেখাগুলোর বিশ্বস্ততা, অস্বস্তিকর বিশ্বস্ততা। আর তাই শব্দের মায়ায় সাজানো গোছানো ডামির এই সমাজে এ-রচনা তাৎপর্যে নিঃসন্দেহেই মানুষের সন্নিহিত।

রাজনীতির নকশালপন্থার সঙ্গে বাসুদেব লেখার (হয়তো সমগ্র হাংরি জেনারেশনের) দার্শনিক মিল আছে। সামাজিকভাবে এই দুটি আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি নিম্নবিত্ত সমাজের হতাশা, ক্লান্তি আর অধৈর্য। দর্শনের দিক থেকে এই দুটি আন্দোলনেরই প্রতিভাভূমি তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা। আর কর্মপ্রণালীর দিক থেকে এই দুটো আন্দোলনেরই পদ্ধতি স্বতোপ্রণোদনার ওপর নির্ভর করে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এনে দেয়া।

তাই পুলিশ চিনতে ভুল করেনি যে ৬৫-৬৬ সালের এই সাহিত্য 'আন্দোলন' তো বিশ্বের ক্ষেত্রে নকশালপন্থার প্রথম ইঙ্গিত। রাজনৈতিক সাংগঠনিক ক্ষেত্রের জন্য ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও বেশি অপেক্ষা করতে হতো, যদি পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলন রাজ্যসরকারের ক্ষমতার মদেই মাতোয়ালা হয়ে না যেতো, যদি কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প হিসেবে বামপন্থী দলগুলির ওপর ভরসাটুকুও শেষ হয়ে না যেতো।

তাই ইতিহাসের দিক থেকে নকশালপন্থা, যেমন রাজনীতিতে, তেমনি সাহিত্যেও, হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়া (বৈজ্ঞানিক অর্থে রিঅ্যাকশন,—রাজনীতির বুলির অর্থে নয়),—ক্রিয়া নয়।

কথা ছিল শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতায় দেশপ্রেমিক মানুষ, কলকারখানার মজুর আর গ্রামের গরিব সকলে একসঙ্গে দেশের সামনে নতুন অর্থনৈতিক বিকাশের পথ খুলে দেবে। খুলে দেবার কথা যাঁদের, তাঁরা পরস্পর থেকে যোজন যোজন দূরে রইলেন। ঘটনাক্রমে যদি বা একটা নির্বাচন তাদের মিলিয়ে দিলো, তাদের ভেতরের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠলো। সুবিধাভোগী শ্রেণী সমাজটাকে নিজেদের ভোগে লাগাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীগুলির ঐক্য গড়ে ওঠাটাই একটি ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া। এ-ই ক্রিয়াটি না-ঘটায় যে-প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে ঘটলো, তাই-ই নকশালপন্থা।

কথা ছিল, শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতায় বৃহত্তর ও প্রশস্ততর সমাজ যখন পায়ের তলার মাটিতে এসে মিশে যায় তখন সেই প্রসারিত রণক্ষেত্রে সঙ্কটাপন্ন বিশ্বধনতন্ত্রের পরিস্থিতিতে নতুন বিকাশমান বুর্জোয়া সমাজের অসঙ্গত বাস্তবতা হয়ে উঠবে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী কথা সাহিত্যের অন্বিষ্ট,—ধনতন্ত্রের নতুন বিশ্বমুখিতা ও বিকাশের কালে, ফিল্ডিঙে যেমন অন্বিষ্ট ছিল

জীবনের উল্লাস আর ধনতন্ত্রের স্থিতিশীলতারকালে বাল্‌জাকের অন্বিষ্ট যেমন ছিল বুর্জোয়া জীবনের ক্লেদ আর ক্লান্তি—প্রায় সমতুল্য বিস্তৃতি ও গভীরতা ছিল এই অবস্থার পক্ষে নেহাতই জরুরি। তা তো হলোই না। হলো উলটো-টা। অব্যবহিত বাস্তবতার চ্যালেঞ্জের সামনে আমাদের কথাসাহিত্যিকরা রওনা দিলেন উজানে। মুঘলহারেম আর হোটেল-ক্যাবারের দুনিয়া আর তন্ত্রমন্ত্রের নিষিদ্ধ জগৎ—বুর্জোয়া সমাজের ঐতিহাসিক নিয়মে সমাজে সঞ্চারিত আগ্রহ ও কৌতূহলের তৃপ্তি ঘটাতে লাগলো এমন ধরনের রম্যরচনা আশ্রয়ী উপন্যাস। আর সমকালীন বাস্তবতা ক্রমশই ঢাকা পড়ে যেতে লাগলো দার্শনিকতার কৃত্রিমতায় সেন্টিমেন্টাল তারল্যে। তাই এর প্রতিক্রিয়া একটা ঘটনারই কথা, বাসুদেব-সুভাষও সেই প্রতিক্রিয়া আর সেই সূত্রে হয়তো হাংরি জেনারেশনও।

তিন

বসুদেবের 'লেনী ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে" গল্পের তিনটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে 'আমার' সঙ্গে অজয়ের, দ্বিতীয়টিতে সুমিতার, তৃতীয়টিতে কুমুদের সম্পর্কের কথা এসেছে। প্রথম অধ্যায়টি শেষ হয়েছে হরকিষণ আর তার "ধুমসী" বউয়ের রতিক্রিয়ায়, দ্বিতীয়টি "পায়খানা"-য়, তৃতীয়টি "বাতকর্মে"। এই শেষ অংশ ছাড়া, অধ্যায়গুলির বাকি অংশ কিন্তু প্রায় অবিকল চলতি গল্প উপন্যাসের মতোই। শেষ অংশগুলিতে এসে আমরা চমকে-চমকে উঠে আবিষ্কার করি আসলে রতিক্রিয়া, মলত্যাগ, বাতকর্ম ইত্যাদি শারীরিক ঘটনাই যেন আমাদের মানবিক মানসিক সম্পর্কগুলির নিয়ন্ত্রা। মন নিয়ে ছিঁচকাঁদুনির বিরুদ্ধে এটাই বাসুদেবের অস্ত্র। তাই প্রায় তার গল্পে এমন শারীরিক ক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে গল্পের শেষাংশের সঙ্গে প্রথমাংশের একটা ভাগ হয়ে যায়, যে-ভাগটা ধরাও পড়ে আর সেটাই যেন বাসুদেবের মজা—একটা প্রেমের গল্প বানাতে বানাতে পেচ্ছাব করার গল্প শুনিয়ে দেয়া—'রিপুতাড়িত' কিন্তু তবু একটা জায়গায় বাসুদেব মিলিয়ে দেন। এই রিপুতাড়িত গল্পের শেষেই "পেচ্ছাব করতে করতে আমি ওদের চুমু খাবার শব্দ শুনি"। একটু আগেই "আমার" যে প্রেমকাহিনি রচনা চলছিল তার ওপরই তাহলে তো এই মূত্রত্যাগ!

"রিপুতাড়িত"-তে এই দুটো দিকের ভেতর এমন একটা সামঞ্জস্য আমরা ভেবে নেই যে "আমিও" ওখানে "চুমু খাবার শব্দ" বানাতে পারতাম বা ওই প্রেমিকটিও পারতো পেচ্ছাপ করতে।

এতে বাসুদেবের উদ্দেশ্যটা খুব চোখাভাবে ধরা পড়ে বটে কিন্তু কেমন একটু সহজ চতুরতাও যেন থেকে যায়। গল্পটা একটা প্রেমের গল্পের ঢঙে নির্মিত হয়। তাই শেষটুকু আসে লেখকের মন্তব্য হয়ে। গল্পটা নিহিত আছে কেমন করে একটি প্রেমের গল্প পেচ্ছাবের গল্প হয়ে ওঠে—এই স্তরপরম্পরায়—যেটা বাসুদেব লাফিয়ে পার হন।

কখনো কখনো বাসুদেব যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, বাস্তবতাকেই সরাসরি হ্যান্ডেল করতে চেয়েছেন, লক্ষ্য বা পদ্ধতি ও এমন তির্যক নয়। "অভিরামেরা চলাফেরা" ও "দেবতাদের কয়েক মিনিট"—ধরা যায়। "অভিরামের চলাফেরা"-র মতো গল্পে বাসুদেব শব্দ, বাক্য বা প্যারাগ্রাফগুলিকে এমনভাবে সাজান যে তাতে তাঁর গল্পের লক্ষ্য-টা নেহাতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, প্রায় বৃত্তের মতোই সুগোল, বোঝা যায় সেই লক্ষ্যটাকে বিদ্ধ করার জন্যই বাসুদবে আগ্রহী, "রিপুতাড়িত"-এর মতো লক্ষ্যটাকে নিয়ে রসিকতা করতে চাইছেন না। যেন সবগুলি চরিত্রই

বলছে—তাদের আর কোনো পেশা (occupation) নেই। এই পেশাহীনতা থেকেই সারা গল্পে সঞ্চারিত হয়ে যায় সঙ্গতিহীনতার বোধ। সঙ্গতিহীনতার বোধ, একটি মানুষের সঙ্গে আর-একটি মানুষের সঙ্গতিহীনতার বোধ শেষপর্যন্ত বাসুদেব এমন সহজ করে আনেন—

"আমি তৃপ্তির খোলা বুকে মাথাটা গুঁজে দিই আর তৃপ্তির বুকের ভেতর ধক্‌ধক্ শব্দ হয় শুনি। ফেকু বলে, "অ্যাই আমি একবার"। ফেকু তৃপ্তির বুকে কান পাতে, বলে "এক শব্দ, ঠিক একরকম। তবে কেন আমরা ওদের মতো হলাম না রে?" ফেকু ছলছল চোখে আমার দিকে তাকায়, বলে—"দেখতে, শুনতে কি খারাপ ছিলাম কিছু! আমাদেরও লোক আসতো...'

এই পেশাহীনতা চরিত্রগুলির অপ্রামাণিকতা থেকে এসেছে। বাসুদেব (ও সুভাষ), বাংলা গল্পের প্রধান কর্মীদের দুজন, সেই অপ্রামাণিকতার কারণ খুঁজছেন।

এই খোঁজাটুকু আছে বলেই "দেবতাদের কয়েক মিনিট" নামধেয় গল্পদুটিতে প্রকরণে জাঁ জেনের বিশেষ বিন্যাস কখনো কখনো মনে এলেও, যেমন প্রায়ই মনে আসতে পারে সুভাষের কিছু গল্পে—তা নিঃসন্দেহে বাংলা গল্প-ই, মৌলিক বাংলা গল্প। সেই মৌলিকতা নিহিত আছে প্রথমত গল্পগুলির আনুষঙ্গিক বাঙালি সামাজিকতায়—নইলে বাসুদেবের গল্পে মা-ছেলের সম্পর্কের এত প্রাধান্য থাকতো না বা তার বেশ্যারাও হতে পারতো না এত গোঁড়া হিন্দু—আর, দ্বিতীয়ত তার চরিত্রগুলির সামাজিক মূলে। অসিত, অভয়, নির্মল, ফেকু ও "আমি", নীলা, বীণা, ছবি ও আরও কিছু কিছু মেয়ে—এই কটি চরিত্র আর মাঝে মাঝেই অনিবার্য মা—সমস্ত গল্পটির পরিধি। পরিধি থেকে কখনো কখনো এক-একটি চরিত্র ছুটে কেন্দ্রে আসছে, বাকি চরিত্রগুলি হাত ধরাধরি করে সেই চরিত্রের চারপাশে পাক খেয়ে যায়, কেন্দ্রে যে দাঁড়িয়ে—সে-ই-ই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন, সে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে পাক খেয়ে খেয়ে যেতে চায়—আর হাত ধরাধরি বৃত্ত পাক খেয়েই যায়। একই নামের দুটি গল্প আসলে একটিই গল্প। তবু ৬৮ সালে 'ফুঃ'-তে প্রকাশিত গল্পটাকে বিশ্লেষণ করা যাক্।

নির্মল-নীলা, অভয়-ছবি, অসিত-বাণী—এই তিনজোড়া স্বামী-স্ত্রী। তিনটি মেয়ের সঙ্গেই "আমি"-র যৌনসঙ্গ নিয়মিত, যার ফলে কোনো একসময় কারো গর্ভপাত ঘটে থাকবে। এই যৌনসঙ্গের অভ্যাস তো আসে ধর্ষণ থেকেই। সে ধর্ষণ শয়নকক্ষে অপরিচিত অতিথিকেও হতে পারে, হতে পারে রাস্তা দিয়ে চলা অজস্র মেয়েদের কাউকে। আসলে ধর্ষকামিতা-ই তো ধর্ষণ। দুটো অনির্দিষ্ট ঘটনা গল্পের প্রথমেই বাসুদেব উত্থাপন করে দেয়। যেন সমস্ত গল্পের সারাংশ, যদিও আঙ্গিকের দিক থেকে সমস্ত গল্পের শুরু। বাণী, নীলা ও ছবির সঙ্গে সম্পর্কগুলিকে যদি ৩, ৪ ও ৫ নং বলে চিহ্নিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে।

(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১নং প্রসঙ্গ (অতিথিকে ধর্ষণ) শেষ হয়ে যায় মূল গল্পের ভেতর এই কথাটুকু ঢুকিয়ে "তোর মুখে ঠোঁটে রক্ত লেগে কেন?"—এটি ফিরে আসবে একেবারে শেষে।

(২) পঞ্চম অধ্যায়ে ২ নং প্রসঙ্গ (ট্যাক্সিতে ধর্ষণ) শেষ হয়ে যায় মূল গল্পের ভেতর এই কথাটুকু ঢুকিয়ে "সর্দারজি, ইসকো লে যাও...মাঠমে ফেক দেও"—এটি ফিরে আসবে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে।

(৩) এরপর সারা গল্পের বিভিন্ন অধ্যায়ে বাকি তিনটি প্রসঙ্গ মিলেমিশে যায়। দশম অধ্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে ধর্ষণ। তারপর সিকোয়েন্স বদলে হাসপাতাল।

(৪) হাসপাতালেই গল্প শেষ, মাঝখানে "আমি" চরিত্রকে একটা বিশেষ অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

(৫) মাঝখানে নবম অধ্যায়ে লেখক গল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবেশটির খুব স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

সিকোয়েন্স ও চরিত্রগুলিকে এমন মিলয়ে ফেলা গল্পের জন্য যদি এত জরুরি তাহলে বাসুদেবকে শেষপর্যন্ত এমন স্পষ্টভাবে বলতে হয় কেন "সোনালির চুল দেখে মনে হতে পারে, নিশ্চয়ই বাণী। আবার গায়ের রং দেখে মনে হয়, বুঝি নীলা। পরক্ষণেই ঈষৎ স্ফীত উদর দেখে সিদ্ধান্ত করে, এ বোধহয় ছবি"।

তাহলে, বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো কোনো এক বাণী বা নীলা বা ছবির গল্প লিখলেই পারতেন—যে গল্পটিকে দেখে মনে হতো নিশ্চয়ই বাণী, বুঝি নীলা, বোধহয় ছবি।

কারুকার্যে মনোহারিতা সত্ত্বেও বাসুদেবের গল্পের লজিক-তার বিন্যাসের এই আপাতবিশৃঙ্খলাকে সমর্থন করে না। ঘটনা তার তাৎপর্যে যখন অন্বিত হয়ে যায় অন্যতর ঘটনার তাৎপর্যের সঙ্গে, তখন ঘটনাগুলির আপাতবিশৃঙ্খলার ওপর ভিত্তি করে লেখক প্রতিষ্ঠা দেন তাৎপর্যের ঐক্যের, যাকে অন্য ভাষায় বলতে ভালো লাগে, পুরুষার্থের। বাসুদেবের গল্পের এই ঘটনাগুলি ঘটনাগতভাবেও একই ধরনের। তাই পুরুষার্থের প্রতিষ্ঠার বদলে তাঁকে অমন সমীকরণ কষতে হয়।

কিন্তু তবু বাসুদেব বস্তুবর্ণনা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও, এ গল্পগুলিতে আনতে পেরেছেন প্রাক্তন কৃষিমূল, বর্তমানে উদ্বাস্তু, পরগাছা নিম্নমধ্যবত্ত শহরতলির সমাজের পরিপার্শ্ব উপস্থিত করতে। এটা তাঁর নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব।

কিন্তু ওই পরিপার্শ্ব-ই বোধহয় বাসুদেবকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। সুভাষের প্রসঙ্গ সেরে সে-কথায় ফিরে আসব।

চার

সুভাষের "যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট" "আমার চাবি" আর বাসুদেবের "দেবতাদের কয়েকমিনিট" "অভিরামের চলাফেরা"-র গঠন একই। সেই বৃত্তের মাঝখানে সম্পর্কহীন বৃত্তবিচ্যুত চরিত্র। তফাৎ আছে দুটি। এক : বাসুদেব মাঝেমাঝে অন্য চরিত্রগুলিকেও ভাবেন। সুভাষ কেন্দ্র ছেড়ে এক পা-ও নড়েন না। দুই : সুভাষের রচনার সমাজ পরিবেশের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ।

"যুদ্ধের আমার তৃতীয় ফ্রন্ট" খুব সরাসরি ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ভিত্তিতে সুভাষের নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধের রিপোটিং। নামকরণ থেকে ভেতরে অনেকবার যুদ্ধের উল্লেখ বেশ ইচ্ছে করেই। রিপোর্টিং-টার দুটো দিক—কখনো নিজের কথা, কখনো পরিস্থিতির কথা। কিন্তু পরিস্থিতটাই প্রধান। এমন কোনো জায়গা তো আমার নজরে পড়ছে না সেখানে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে বা পরিস্থিতির ওপরও প্রতিষ্ঠিত।

সুভাষের ইচ্ছেও নিশ্চয়ই তাই। সবটাই তো পরিস্থিতি চুষে বা শুষে নিয়েছে, তার আবার ব্যক্তিত্ব আসবে কোত্থেকে—এমন একটা জবাব আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু তাহলে মেসবাড়ি, করুণা, ইত্যাদি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলিরও প্রয়োজন ছিল না। বাসুদেবের "দেবতাদের কয়েকমিনিট" গল্প নিয়ে যে-অভিযোগ এর আগেই তুলে রেখেছি, এখানে, সুভাষ প্রসঙ্গেও তারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই আমি।

সুভাষের এই গল্পে, "যুদ্ধের আমার তৃতীয় ফ্রন্ট"—পরিস্থিতিটিতে তিনি কিন্তু একটা চলচ্ছক্তি সঞ্চার করতে পেরেছেন—যাতে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা বা কথাগুলি যেন পরিস্থিতি

থেকেই যুক্তিপরম্পরায় নিষ্কাসিত প্রায় অনন্য সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে "বলুন নেতা এই যুদ্ধে আমরা এই অ্যালারজি বহুল শরীর ছাড়া আর কী দেবার আছে..., আর ব্লাড ব্যাঙ্ক, আমার নষ্ট রক্ত যদি কাজে লাগে নিয়ে নিন।"

"কয়েক রাতের জন্য মোটে রাস্তা থেকে ডাস্টবিন সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ঘরের কোণায় রেখে নিজে দেখে নিন ওই সব যা উপর থেকে অপরের ঘাড়ে টুপ করে ফেলে দিচ্ছেন।"

"সে যখন ভিক্ষা চায় তখন তার দুর্ভাগ্যের জন্য আমাকে কীভাবে দায়ী করে এবং কেন করে"

এ এতগুলো পাতায় এত নানাধরনের প্রসঙ্গ আনবার বাইরের ছুতোটা সুভাষ দিয়ে রেখেছেন, আসলে, সেটাই দাঁড়ায় গল্পটির কাহিনি-বন্ধন "পুরোনো প্রেমিকাদের পাড়ায় কখনো রাস্তা নেই...অর্থহীনভাবে তাদের পুরোনো ঠিকানায় ঘোরাঘুরি করি" "এভাবেই আমি সময় কাটানোর পদ্ধতি কত আবিষ্কার করি, ১ম পদ্ধতি পুরোনো হলে, ২য় বের করে ফেলি..."

অথচ গল্পটির ভেতর কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গে তার যে সম্পর্কের বিবরণ দেয়া হয়েছে তাতে তার তেমন কর্মহীনতার কোনো সমর্থন মেলে না। তার এমন বন্ধু আছে (তারাপদ) যার কাছে টি. এম-ও চেয়ে চিঠি লেখা যায়। তার এমন বন্ধু আছে (সুনীল) যে প্রদর্শনী দেখবার জন্য ফোন দেয়, করুণা বলে এমন প্রেমিকাও আছেন—যার সঙ্গে সম্পর্ক যাচাই চলছে এমনকি মেসের বয়স্ক সঙ্গী বেড়াতেও নিতে চান সঙ্গে। ফলে চরিত্রটি মারফৎ পরিস্থিতিকে আমরা যে-ভাবে পাচ্চি তার সঙ্গে চরিত্রটির যে পরিস্থিতি আমরা পাচ্ছি—তার একটা পারস্পরিক বিরোধ আছে। বিরোধ তো থাকবেই, নইলে আর এত কিছু থাকতে গল্প-উপন্যাস লেখা কেন। কিন্তু এখানে বিরোধটা চরিত্রের গভীরতম ন্যায়ের সঙ্গে পরিস্থিতির গভীরতম গতির নয়, সুভাষের যুদ্ধের সঙ্গে দেশের যুদ্ধের নয়—বরং যুদ্ধ শান্তির এই গড় পরিবেশে চরিত্রটিকে বেশ মানানসই-ই মনে হয়। কিন্তু বিরোধ তো একটা আছেই—নইলে সুভাষের এই লেখাগুলো বাংলা গল্পের সাম্প্রতিক রচনাগুলির ভেতর অন্যতম প্রধান হয়ে উঠতো না।

পাঁচ

বাসুদেবের রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা যে-মন্তব্যে শেষ করেছিলাম, সুভাষের গল্পগুলো থেকে আবার সেখানে ফিরে যেতে চাই। তাহলেই আমার পক্ষে হয় তো বোঝা সম্ভব হবে চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিস্থিতির বিরোধটা আসলে কোথায়। বাসুদেব ও সুভাষের গল্পে মেয়েদের উল্লেখ তো হামেশাই। আর প্রায় সব উল্লেখই শারীরিক! কেন? কেন তাদের সব গল্পের মেয়েরা একটু উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। কেন মেয়ে জাত তুলে কথা বলতে তাঁদের ব্যস্ততা? কেন, মোটামুটি বলা যায় বেশ্যা পাড়া আর বালিগঞ্জ চৌরঙ্গি—এই অঞ্চল তাঁদের প্রায়ই ব্যস্ত রাখে? মেয়ে মানুষের শরীরটাকে তারা কিছুতেই ভুলতে পারেন না কেন?

"গড়ের মাঠ অন্ধকার ছিড়ে দ্রুত চলে যায় গাড়ি। গাড়ির ভিতর ক্ষণিকের জন্য দেখা যায় ফর্সা চামড়া, শাড়ি, গহনা, খিল খিল্ হাসির শব্দ" (অভিরামের চলাফেরা : বাসুদেব দাশগুপ্ত)

"বুবুন হবার পর শরীরে একটু মেদ জমেছিল, তাতে চেহারা যেন আরও খুলেছিল, বড়ো সুন্দর দেখাত বউদিকে—প্রতিমার মতো...ইচ্ছে হতো বউদির সুডৌল পায়ের পাতার দুটোয় পোশা কুত্তার মতো ঘষাঘষি করি গালে" (লেনী ব্রুস ও গোপলা ভাঁড়কে : বাসুদেব দাশগুপ্ত)

"গানের মাঝে তরলা বারবার আমাকে দেখছিল।...সব কিছু ভুলে গিয়ে অনিমেষ নয়নে

দেখছিলাম তবলার লাবণ্যময় মুখ, হাসিমাখা চোখ, টিকোলো নাক, কচি ঠোঁট, ফর্সা সুডোল বাহু—বাহুমূল আর লো-কাট ব্লাউজের ওপর দিয়ে দৃশ্যমান পরিস্ফুট স্তনের ভাঁজ" (বিপুতাড়িত—বাসুদেব দাশগুপ্ত)

দাঁড়াই, ওই সিল্ক হাউসের পাশে, সিগারেট ধরাই ও ওঁদেরই দেখি, দেখি ফাটানো বডিস, শায়া, সিল্কশাড়ি এবং একসময় বিলিতি এসেনসের গন্ধে মাথা ঠিক রাখতে পারি না (যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট—সুভাষ ঘোষ)

আসুন, শীতের এই বিকেলে, এই দিকে, মাঠ ময়দান ঘুরি, বাসকেট বলখেলা দেখি, ইজের, গেঞ্জিপরা অ্যাংলো মেয়ের, রাতের ঘুমের এমন চমৎকার দাওয়াই আর কে দিতে পারে (ঐ)

চিড়িয়াখানাগামী লরেটোর গাড়িভর্তি মেয়েদের...(ঐ)

আর যদি ওদের কারো উঁচুদরের বুক বাড়তি হিপ পাছা কোনো শীতের পোশাকই চাপতে পারে না (ঐ)

উদাহরণ বাড়াবাড়ি দরকার নেই। আর, এই কটিতেই এই অনুমানটুকু আমি উত্থাপন করতে পারি বোধহয়—উচ্চতর শ্রেণীর দিকে নিম্নতর শ্রেণীর লোভাতুরতা অনেক সময়ই বাসুদেব বা সুভাষকে প্রভাবিত করে ফেলে। সমস্ত জীবন সম্পর্কে যে ভাষ্য তাঁরা দেন সেটার প্রতিজ্ঞাবাক্যগুলো তৈরি করেন নিজের খুব ক্ষুদ্র শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। ফলে তাঁদের লেখাগুলো শৈলী আর নির্মাণের উন্নতি আরও বিষয়ের খর্বতার দীর্ণ হয়ে যায়।

পাঠক হিসেবে আমরা দুঃখ পাই—বাংলা গাল্পের এই প্রধান দুজন কর্মী যদি খুব ছোটো একটা উপশ্রেণীর খুব টিপিক্যাল ভাবনাচিন্তার গণ্ডী এড়াতে না পারেন। সুভাষের আমার চাবি ও বাসুদেবের রন্ধনশালা, বই দুটি নিয়ে এই প্রবন্ধে কোনো কথা বলতে পারা গেল না--বাসুদেব আর সুভাষের নস্টালজিক বা মেলানকোলিয়ায় মধ্যবিত্ত মানস রূপক, প্রতীক, উপকথায় তৃপ্তি পায় কত, তেমন অতৃপ্তি পায় চারপাশের বস্তুপুঞ্জে বাধ্যত লোভী হয়ে—

বাসুদেব ও সুভাষ বাংলা সাহিত্যের বা গল্পের পরপুরুষ নন। পুলিশ, হাকিম, প্রকাশক পত্রিকা, সার্টিফিকেট-সই-করা গেজেটেড সাহিত্যিকরা যতই বিপরীত সাক্ষ্য দিন, বাসুদেব ও সুভাষ এই সময়ের পক্ষে নিতান্ত জরুরি লেখক। আর মাত্র এই কটি লেখাতেই বাসুদেব ও সুভাষ বাংলা গদ্যের মর্যাদা বাড়িয়েছেন তাদের লেখার জোরে। গল্পের বিষয় হিসেবে নিজেদের ও শুধুমাত্র যেন নিজেদেরই উপস্থিত করে অনেক কুসংস্কার দূর করেছেন। গল্পকে আত্মবিষয়ী করে তুলতে পেরেছেন। গল্পের উপকরণের ব্যবহারের ওপর তাঁদের কর্তৃত্বের কোনো সংশয়েরও অপেক্ষা নেই। দেবতাদের কয়েক মিনিট, অভিরামের চলাফেরা, যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট ও আমার চাবি—সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের বিশিষ্ট সূচিপত্রের অন্তর্গত। তাই আমাদের এ-প্রত্যাশার কারণ থেকেই যাবে—তাঁরা ক্রমাগতই গন্ডি থেকে গন্ডি থেকে গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসবেন।

ফালগুনী রায়

ফ্রেশ ইনফরমেশান

ভাদ্রের রৌদ্র আমায় কুকুরের কামোত্তজনা জানানোর বদলে জানাল
শরৎ এসে গেছে আমি নক্ষত্র ও নৌকার নিহিত সম্পর্কের কথা জানলুম
নদী-তীরবর্তী জেলেদের কাছ থেকে--মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা
আমার এক বন্ধু কম্পাসের সাহায্যে সমুদ্রের দিকনির্ণয়ের কথা জানিয়েছিল।
আমি মরে গেলে আমার চারধারে আর চারদিক থাকবে কি?
ভাদ্রের রৌদ্রে শরতের আভাষ তখন পাবে অন্য কেউ যেরকম
আমার বাবা যে কাঁচামিঠে গাছের আম খেয়েছিলেন তিনি মারা যাবার
পর আমি সেই কাঁচামিঠে গাছের আম খাচ্ছি—এভাবেই
আমি মরে যাবো কাঁচামিঠে গাছের আম তখন খাবে আমার
উত্তরপুরুষ অর্থাৎ আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত
কথোপকথনের মতন ব্যাপারটা—অর্থাৎ মানুষ না থাকলে
সুন্দর অ্যাপলো মূর্তির সৌন্দর্যের কোনো তাৎপর্য থাকবে না কিন্তু
মানুষ না থাকলেও পৃথিবী সূর্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে যাবে ঠিকঠাক
মানে আমি বলতে চাইছি মানুষ না থাকলে আমটি কাঁচা অবস্থাতেও
মিঠে থাকবে কিন্তু সেটা বলার কেউ থাকবে না—সুতরাং
সূর্যকে সূর্য এবং মোমবাতিকে মোমবাতি মানুষ বলেছে
মানুষই বলেছে নরের পূর্বপুরুষ বানর বা নরগণ ঘোষণা
করেছে এরূপ বিদ্যা ফোনেটিকস অইরূপ বিদ্যা ফাইললজি
সেইরূপ অসুখ ফাইলেরিয়া এইরূপ প্রতাঙ্গ ফ্যালাস
ইত্যাদি ইত্যাদি—এমতা অবস্থায় আপন কণ্ঠস্বর খুঁজতে
গিয়ে যদি কোনো কবি খাবি খায় তবে আমরা আর কিইবা
করতে পারি আমার প্রপিতামহ যাকে বলেছিল জল আমিও
তাকে বলছি জল প্রপিতামহ যাকে বলেছিল আগুন আমিও
তাকে বলছি আগুন—মানে বাবারা যা বলে গেছে—ছেলেরা
তাই বলছে—নাতিরাও তাই বলবে—অর্থাৎ বস্তুর
বস্তুগত নামটি একই থাকবে কেবল পালটাবে তার ধারণা যেমন
আদিকালে পুরুষাঙ্গ-কে প্রজনন প্রত্যঙ্গ হিসেবেই দ্যাখা হতো
বর্তমানে পুরুযাঙ্গ-কে টেলিপ্যাথিক কম্যুনিকেশনের রাডার হিসেবেও

দ্যাখা হচ্ছে—অনেকেই আপেল-কে গাছ থেকে পড়তে
দেখে কিন্তু নিউটন কেবল আপেলের পড়াটাই দ্যাখেন নি
দেখেছিলেন তার সঙ্গে মাধ্যকর্ষণ—ভাস্করাচার্য অবশ্য
ল অফ গ্রাভিটেশন-কে অন্যভাবে আবিষ্কার করেছিলেন
ভোজরাজাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে
এবং কোপর্নিকাসের অনেক আগেই আর্যভট্ট আবিষ্কার করেছিলেন
পৃথিবীর সূর্য কেন্দ্রিক আবর্তন এইসব ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়
একই সত্যকে বিভিন্ন আবিষ্কারক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধিতে আবিষ্কার করেন
অনেকটা রামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তির মতো যত মত তত পথ নিয়ে মানুষ
মানুষের ঐক্যের ভেতর এভাবেই বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্য খেলা করে
শুধু জ্ঞানান্ধ সমালোচকরা সত্যের গুহায় বসে বলে দ্যান অমুক
তমুকের চর্বিতচর্বন ছাড়া আর কিছু নয়—হায় হায়—বিদ্যাসাগর
অ, আ, ক, খ, শিখেছিলেন অন্যের কাছ থেকে তারপর নিজেই প্রণয়ন
করেন বর্ণপরিচয়—হে মহান সমালোচকগণ—জানান আমায় বিদ্যাসাগর
কার চর্বিতচর্বন ছিলেন—জানান—জানান—ভাদ্রের রৌদ্র আমায়
কুকুরের কামোত্তেজনার খবর জানাবার বদলে জানিয়েছে শরৎ এসে
গেছে—আপনিও অইরকম কিছু ফ্রেশ ইনফরমেশন দিন—
নাকি মাও-কোট পরে আপনি কোট করবেন টাও-ইষ্ট মতবাদ—গলায়
ক্রুশ ঝুলিয়ে আপনি একহাতে রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ অন্যহাতে
হ্যাভলক এলিস রেখে বলে উঠবেন লেনিন বলেছেন
না-সন্ন্যাসী না-ডন-জুয়ান এর মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের থেকে যেতে—কোনটা স্যার?

সুবো আচার্য

মানুষের পৃথিবী থেকে কবিতা শেষ হয়ে গেছে

ফাঁকা শহরের মধ্যরাতে আমি হেঁটে যাচ্ছি
দূর নিরুদ্দেশ আমায় ডাক দিয়ে যায়
যেমন মানুষজন্ম অথবা নিগূঢ় কঙ্কাল
সমুদ্রস্রোতের কাছে অন্ধকার সেখানে মৃত্যু মুছে নিয়ে যাবে তোমাকে একদিন
আমাদের ভালোবাসা হয়েছিল একদিন
পৃথিবীর সব ভালোবাসা কোনো কালো গহ্বরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়—
নিশ্চিহ্ন কবিতার পৃথিবী, খালাসিটোলার সন্ধ্যা আর আমার ভালোবাসার সন্ধ্যা
ফাঁকা পথে আমার তাড়নাময় ছুটোছুটি, পকেট অসংখ্য টাকা (স্বপ্নে!)
এইই আমার সামান্য জীবন, আমার অস্তিত্বহীন চিৎকার রক্তের মধ্যে ডুবে যায়—
রক্তের আস্বাদ পায় কবিতাও আজ, দীর্ঘশ্বাসে কেঁটে ওঠে দশদিক
আমার অস্তিত্বে ভয় পায় কেউ কেউ, কেউ ঘাড়হেঁট চলে যায়—
আমার রক্তভরা আর্তনাদ আমরাই বুকের মধ্যে নিভে যায়—
কোনো চিৎকার কাঁপায় না পৃথিবীকে, মানুষের মতো
ভালোবাসা আমার ঢের আগে নষ্ট হয়ে গেছে, ভালোবাসার জন্য কষ্ট,
ভালোবাসার অভাবে হৃৎপিণ্ড রক্ত ঝরে যায়, ফাঁকা হৃদয়, তুমি
মাঝরাত্রির আলোর ঝলক দেখে মদ্যপান করো, যাই করো
দিব্যজীবন বলে কিছু নেই—এই ছোটো জীবন দেখে অবসেসড ভয়

অথবা বিপুল রক্তাক্ত শূন্যের গহ্বরে বেঁচে থাকা।
মানুষের ভীত পাইচারি আজ ১৯৬৮ সালে আমাকে উদাসীনতার কাছে নিয়ে যায়-
আমার জীবন এতরক্ত রক্ত রক্ত রক্ত এত রক্ত কেন?
আমি কে—কে আমি এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় জীবনের মধ্যে
ঐশী চিৎকারের মতো দাঁড়িয়ে আছি—কবিতার অন্তর্নিহিত
বিকারহীনতার মতো চিন্তা নিষ্ঠুরতা জেগে ওঠে—
কতদূরে চলে এসেছি মানুষের কাছ থেকে
আজ ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—

আমার মন্ত্র এবং আমার জীবন

এক

জাগ্রত অন্ধকারে একজীবন ধুলো হয়ে গেল
এখন অনেক রাত
শরীর কাঁপিয়ে জেগে উঠেছে চূর্ণবিচূর্ণ হৃদয়
রক্ত...শুধু রক্তের ছাপ
অসম্ভব অন্ধকারের ভিতরে একজন মানুষের
আধোচাপা গোঙানি ও চোখের জল ;

চোখের জল শুকিয়ে যায় একদিন,
এক জীবনের প্রতিচ্ছবিময় স্মৃতি হারিয়ে যায় অন্ধকারে
নিস্তব্ধতার ভিতরে আত্মা মৃত্যুর শান্তিতে শুয়েছে

দুই

বিকেল। অন্ধকার হয়ে আসে
পাখিরা।
একদল মানুষ বহুদূর দিয়ে হেঁটে যায়
জল। ছায়া। বিশাল শূন্য। উদাসীনতা।
রক্তমাখা হাত। নিস্পৃহ ঘৃণা।
ভয়—
চোখ শুকনো। ক্লান্তি। কিছু দেখা যায় না।
রক্তের ভিতরে জ্বালা। অসুখ।
ছলনার হাসি মেখে নারী নরকের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একা।
অভিজ্ঞতার ভিতরে চড়া পড়ে গেছে।
রাত্রিদিন বালি। জলের ভিতরে আকাশ
আকাশের ভিতরে নীলিমা বাড়ি থেকে পালিয়েছে
ছেঁড়া চিঠি পড়ে আছে রাস্তায় কিন্তু
আমি কিছুই জানি না—
অন্ধকার। জল। ছায়া।
আমার স্তব্ধ আত্মায় ভিতরে আজ শুধুই ঘুম।

তিন

স্বাভাবিক চেতনা বা জাগরণ মাঝে মাঝে ভেঙে যায়
অতিস্বাভাবিক নিশ্বাসগ্রহণ ও রক্তচলাচলের সময়েও
সহসা কী যেন কী এক বিস্ময় বুক থেকে উঠে আসে
সেই বিস্ময় আমায় জীবনের মধ্যে একাকী দাঁড় করিয়ে রাখে
আমি দূর, উদাসীন, খানিকটা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হই
তারপর আচমকা মাথা ঝাঁকিয়ে সিগ্রেট ধরাই এবং
দু'তিন মুহূর্ত সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকি

তারপর আবার স্বাভাবক হয়ে উঠি
চোখ ঠিকমতো কাজ করে, গলার স্বর মানুষের মতো হয়।
নিয়মমতো হাসতে ভুল হয় না,
উর্দ্ধতন অফিসারের দিকে নম্র ও বিনীতভাবে তাকাতে পারি
হেসে শুভরাত্রি জানাই ও মনে মনে বলি—
স্বাভাবিক চেতনা বা জাগরণ মাঝে মাঝে ভেঙে যায়
কখনো চমকে উঠি আশরীর কখনো চোখ কাঁপে
নিশ্বাস ব্যাকুল হয়ে কাকে যেন খোঁজে
কী যেন মনে পড়ে মনে পড়ে মনে পড়ে
না মনে পড়ে না
আহ্ কোনো স্মৃতি। বিস্মৃতির মধ্যে এলোপাথাড়ি হাতড়াই
নাহ্! দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে থাকি
না, মনে পড়ে না পড়ে না মনে পড়ে না
দৃষ্টি সূক্ষ্ম হয়, চোয়াল কঠোর, মলিন দাড়ি ও অনুজ্জ্বল চোখ
তীক্ষ্ণ হয়, বুকের ভিতরে বহু অভিমান অবিশ্বাস হয়ে জমা হয়
তবুও হৃদয় স্বপ্ন জাগরণ স্বপ্ন ভেদ করে জেগে ওঠে কী এক ঘাতক আবেগে

কী যেন পড়ে না মনে, কী যেন জলস্রোত থেকে সহসা ভেসে উঠবে,
হিজল বনের পাশে বহুবর্ণ মেঘ, জীবন একটি রক্তাক্ত বিস্ময়
আম নিম শিশু ও শিমূলঘেরা মফঃস্বলের স্থানীয় আকাশ ছিঁড়ে
আন্তর্জাতিক চাঁদ জেগে থাকে, নির্মম আলোর জাল ছিঁড়ে ফেলে
সহসা কী যেন কী এক শিহরণ বুকে লাগে, কেঁপে উঠি দূর থেকে
আন্তর্জাতিক চাঁদ জেগে থাকে, নির্মম আলোর জাল ছিঁড়ে ফেলে
সহসা কী যেন কী এক শিহরণ বুকে লাগে, কেঁপে উঠি দূর থেকে
কী আসবে হে হৃদয় কী হবে বলো তো—
পেঁচার কর্কশ ডাক নরকের ঘন্টাধ্বনিসম, উথালপাথাল হাওয়া
জমাট স্তব্ধতা,
এ কোনো স্বপ্ন নয় প্রেম নয় দৈবরাণী নয়
প্রেম ও স্বপ্নের চেয়ে অতীব অমোঘ
ঐশী থাপ্পড়ের মতো সহসা সমস্ত বাস্তব
গুমোট ভেদ করে ঝলসে ওঠে
আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যায়
আমি খুবই অন্ধকার বোধ করি

বাসুদেব দাশগুপ্ত

ডঃ ওয়াং-এর গোপন সংকেত

পাঠকদের প্রতি

চান কি আপনারা একটি রসমঞ্জুর কাহিনি—সুখদায়ক নিটোল অভিজ্ঞতা টেলিভিশনে তোলা চটকদার দৃশ্যাবলীসহ কুমার ও কুমারীর প্রেম—কেবলই মন দেয়ানেয়া—আরও কিছু গান—কিছু কৌতুক—নাচের ফোয়ারায় শুধু খেলা এই হাসিখেলা সারাবেলা--

তাহলে দেখুন ওই—

প্রেসিডেন্টের পাশে এক ব্যক্তি সর্বত্র ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন—রহস্যজনক সঙ্গী—পরণে তার রেনকোট, মাথায় ফেল্ট টুপি—হাতে কালো রংয়ের সুটকেস—প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি সর্বদাই ইনি রয়েছেন—লাল ভেলভেটের পর্দা লাগানো ভোজসভায়—কিংবা মিগ রাজাদের সমাধিক্ষেত্র—অথবা ফুলের টব বসানো হিমঘরে সর্বদাই ইনি আছেন—চোখে তার কালো চশমা, হাতে সুটকেস—সুটকেসে আছে কালো রংয়ের সেই বিখ্যাত বাক্স—

যার যাহায্যে, ইচ্ছে করলে—

নিমেষে সক্রিয় করে তোলা যায় পারমানবিক শক্তিকে—

প্রয়োজন দেখা দিলে—

এক মুহূর্তে গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো যায়—বন্ধুগণ—

শুধু একটিমাত্র সংকেতের অপেক্ষা—হুঁশিয়ার—

২১ বছর পর আপনাদের পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলো—২১ বছর ধরে আপনারা একই প্যাটার্ন বুনে চললেন যার নাম বিদ্রোহ—২১ বছর ধরে এই রহস্যময় সঙ্গী—ছায়ার মতো সর্বদাই আমাদের পাশে পাশে ঘুরে ফেরেন—গোপন নিশাচর এক—কালো চশমার আড়ালে একজোড়া সবুজ চোখ জ্বলে আর নেভে—কারো কাছ থেকেই তার দূরত্ব ১২ গজের বেশি নয়—তারও সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে লক্ষ্য স্থির রাখছে এক তীরন্দাজ—একটিমাত্র সংকেতের অপেক্ষায়—হুঁশিয়ার—আমার এই ছোট্ট কাহিনর মধ্যে তিনি আসবেন—পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াবেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—তার গোপন উপস্থিতি হয়তো টের পাবেন—সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ—লাল ভেলভেটের পর্দার আড়ালে দীর্ণ অস্ফুট চিৎকার—তীব্র মিষ্ট গন্ধের ঝলক—তার হাতে হয়তো থাকবে সিল্কের মোজা—যা দিয়ে সে মেয়েদের গলায় ফাঁস লাগায়—সেইভাবে শ্বাসরোধ করে—ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে মেরে ফেলে—এতে সে সুখ অনুভব করে—অদ্ভুত সুখ এক প্রকার—কখনো বা নিদ্রিত মানুষের উপরার্থ আচ্ছন্ন করে সে বসে থাকে—কারোর ঘুম ভাঙে না—জেগে ওঠে না কেউ—স্বপ্নের মধ্যে

নীল অর্ধ জাগরণে মনে হয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একটি জীব অলক্ষ্যে কণ্ঠদেশ থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে—এইসব ভয়াল দৃশ্য দেখেও মানুষ আবার ঘুমিয়ে পড়ে—এরই ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এই কাহিনি—এই চিত্রনাট্য—সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানেও খুঁজে পাবেন লেখার সামাজিক উদ্দেশ্য—যদি কোনোদিন ভেবেছিলেন সমাজই চেটে নেয় শরীরের বিষ—বিষ থেকে আবিষ্কার করে ক্যানসারের ওষুধ—তাহলে সহযোগিতা করুন—এখানেই নিজ নিজ জীবন অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ ফিরে পাবেন—যেমন ছিল আমার পূর্ববর্তী লেখা—তেমনি এরও নির্মাণ এক দুঃসাহিসিক উত্তেজনায় ভরা—উৎকণ্ঠায় ঘন—যেখানে ক্রমাগতই—

খুন অপরাধ নাটক খুনের
নাটক অপরাধ রহস্য খুনের
অপরাধ খুন হত্যা রহস্যের
হত্যা অপরাধ নাটক খুনের
দেখুন—

কেউটের বিষ থেকে কীভাবে প্রোটিন পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করা হয়—

নিশির ডাক

'সেদিন আপনার কখন ডিউটি ছিল?'

'ইভিনিং শিফটে। অবশ্য গোলমালের জন্য ম্যানেজারকে বলে রাত ন'টার আগেই আমরা বেরিয়ে আসতাম, আর লাস্ট বাসে বাড়ি ফিরতাম।'

'আপনাদের ওপর হামলা হলো কখন?'

'ওই রাত আটটার সময়েই। সবে গেট ছেড়ে বড়ো রাস্তায় পা দিয়েছি, দেখি একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন আবার কী কারণে যেন বাস ধর্মঘট ছিল। ট্রেনে যাতায়াত করা রিস্কি বলে আমরা ট্রেনে যেতাম না। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশি হয়ে ভবলাম—যাক্, ওতেই যাওয়া যাবে। এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম—ভাড়া যাবে কি না। তখন দেখি ট্যাক্সির মধ্যে দুজন লোক বসে।'

'কোন সিটে বসেছিল, সামনে না পিছনে?'

'পেছনের সিটে। ড্রাইভার বললো, ওরা নাকি মদ খেয়েছে, ভাড়াও দিতে চাইছে না আবার টাক্সি থেকে নামবেও না। আমাদের সঙ্গে ওদের এই নিয়ে খানিকটা কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, আমরা ওদের ট্যাক্সি থেকে নেমে যেতে বলছিলাম। এমন সময় একটা জিপগাড়ি শোঁ শোঁ শব্দে রাস্তার অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটে এসে আমাদের সামনে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে। সঙ্গে সঙ্গে টাক্সি থেকে লোক দুটো নেমে চিৎকার করে উঠলো—'খবরদার শুয়ারের বাচ্চারা, যে যেখানে আছিস সেখান থেকে এক পা-ও নড়বি না।' ওদিকে জীপগাড়ি থেকেও টপাটপ লোক নামছে—হাতে রড, পাইপগান,...নিমেষের মধ্যে ব্যাপরটা বুঝে নিয়ে তিনজন পাঁই পাঁই করে ছুটলাম কারখানার লোহার গেটের দিকে। 'দুম' করে একটা বোমা ফাটার আওয়াজ হলো। ফিরে না তাকিয়েই শব্দ শুনে বুঝলাম পেছনের সঙ্গীটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। দুপদাপ শব্দে অনেক লোক ছুটে আসছে। দারোয়ানও গেটটা একটু ফাঁক করে আমাদের দেখছে। আমি আর তাপস নন্দী ছুটে গিয়ে ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই গেট বন্ধ করে দিলো দারোয়ান। গেটের ফাঁকে আটকে

গিয়ে আমার নতুন কেনা জামাটা 'ফ্যাস্' করে দু'ফালা করে ছিঁড়ে গেল।'

'ভেতরে ঢুকে কেমন লাগছিল, নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন নিশ্চয়ই?'

'জানি না, প্রায় মিনিট পনেরো কোনো কথা বলতে পারিনি। উবু হয়ে মুখ গুঁজে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। তারপর মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি, কারখানার পরিচিত অনেকে এসে ভিড় করেছে চারপাশে।'

'ওই লোকগুলো কী করলো?'

'কী আর করবে! গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হল্লা করছিল। বলছিল, ভিতরে নাকি পাইপগান নিয়ে কয়েকজন লোক ঢুকেছে। তাদের বের করে দিতে হবে। ম্যানেজার এসে গেটের ফাঁক দিয়ে বললো—এরকম কোনো লোক ঢোকেনি। এর মধ্যে অবশ্য পুলিশেও ফোন করে দেওয়া হয়েছিল। তবে পুলিশ এসেছিল প্রায় ১ ঘন্টা বাদে। ততক্ষণে ওরা সুবিধে হবে না বুঝে চলে গেল।'

'আপনাদের যে সঙ্গীটি পড়ে গিয়েছিল তা আর হদিশ পেলেন কোনো?'

'তাকে কি আর পাওয়া যায়! খবরের কাগজে প্রতিদিন কত খবর বের হয় দেখেন না? মুণ্ডুকাটা অবস্থায় পুকুরে, মাটির তলায়, কাঠের বাক্সে...মাঠে, ঝোপেঝাড়ে কত পচাগলা লাশ পাওয়া যাচ্ছে—তারই মধ্যে হয়তো একজন ছিল আমাদের কারখানার শ্যামলেশ চৌধুরী। কে আর কাকে শনাক্ত করবে।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ওরা যখন আপনাদের পিছু ধাওয়া করে আসছিল তখন আর কোনোরকম শব্দ শুনেছিলেন—মানে...এই...পাইপগানে গুলি ভরার শব্দ বা অন্য কিছু...?'

'হয়তো শুনিনি, কিংবা শুনেছিলাম...এখনও শুনে থাকি দিনে রাতে যখন তখন চলতে ফিরতে সবসময়ই মনে হয় শুনতে পাচ্ছি—'

কিট্ কিট্ ক্রীক্ ক্রীক্—

ডঃ ওয়াং-এর গোপন সংকেত

কট্ কটর ক্রীক্ ক্রীক্—

টেবিল ল্যাম্পের ম্রিয়মান নীল জীবন্ত মমির উপর নিঃশব্দ—পিতলের ধুনুচি থেকে পাকিয়ে উঠছে সবুজ ধোঁয়া—সবুজ শয়তান পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—অন্ধকার থেকে ডাগর সবুজ চোখ জ্বলে আর নেভে—সব নিভে যাবার আগে পাতলা মিষ্টি গন্ধ হালকা হয়ে ঘুরে বেড়ায়—রেডিয়ম ঘড়ি ছুরির ফলার মতো ভয়ংকর হয়ে ওঠে—মশারির চালটা নামছে—নামছে—আরও কাছে—দম বন্ধ হয়ে আসে—নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না—

কটাং কট্ কিট্ কিটির—

কমান্ডোরা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে গেছে—হাওয়ায় কার্বন মনোক্সাইড ছড়িয়ে পড়ছে—দেড় মাইল দূর থেকে দেখা যায় কেবল গাঢ় ধোঁয়ার কুণ্ডলী—আগুনের আলোয় ত্রস্ত আমলারা ছুটাছুটি করছে—শবাচ্ছাদনের জন্য এখন প্রচুর কাপড় দরকার—কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার আশপাশের অঞ্চল অন্ধকার—অন্ধকারেই জেল ভেঙে তিনশত কয়েদি পালিয়ে যাচ্ছে—হতবাক পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছিল জেলভবনের চারিদিকে আগুন—আগুনের লেলিহান শিখা—নগ্ন বিলাসসঙ্গিনী আর তাদের নধর খদ্দেরগুলির মুখ ধীরে ধীরে আগুনে তাপে গলে পড়ছে—বন্ধুগণ, ভয় নেই—বাতাসের গতিবেগ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে—এই গ্রহটির নিয়তি সন্নিকট জেনেই আমাদের শোভাযাত্রা ক্রমশ জমকালো হয়ে উঠেছে—ওরে আয় রে—আয় রে আমার রাত্রির সন্তান—অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে জেগে ওঠ নিশীথ রাতের

তীরন্দাজ—লক্ষ্য স্থির রাখ—মনে রাখিস, অন্ধকারের বিভীষিকা আজ আর গীতিকবিতার ঐশ্বর্য এসে মুছে দিতে পারবে না—

সুতরাং এই সংকেত শোনা মাত্র আপনাকে যা যা করতে হবে—

তীরন্দাজকে যাতে শনাক্ত করা না যায় সেইভাবে ঘরের ভিতরকার সব আলো ভালোভাবে ঢেকে রাখবেন—

বধ্যভূমির বাইরেকার সব আলো এবং আলোকসজ্জা কিংবা 'শান্তির দূত' এই বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত আলোগুলিও নিভিয়ে রাখবেন—আপনার আয়ত্তাধীন রাস্তার ব্রাকেট লাইটের সুইচ বন্ধ করুন—টর্চের উপর খবরের কাগজ জড়িয়ে তা শুধু নীচের দিকেই মুখ করে জ্বালাবেন—সেইভাবে নিভিয়ে রাখুন হাসপাতাল আর নার্সিংহোমের গোপন আলো—বিমানবন্দরের বাতি—সমস্ত সেতুর দীর্ঘ সংযোগ রক্ষাকারী আলো—আলো রেলওয়ে সিগনালের আলো—ট্রাফিক সিগনালের আলো—নিতিয়ে ফেলুন উঁচু উঁচু অট্টালিকার মাথায় জ্বলা নিশানাসূচক লাল আলো—নিভিয়ে দিন—নেমে আসুক গাঢ় অন্ধকার—

ওরে আয় রে—আয় রে চলে অন্ধকারের সন্তান—শোন, যেখানে নদীর পাড়ে বালুর মধ্যে মর্মর ধ্বনি কেবলি আমাদের নিহত স্বজনদের পঙ্গুমুখ খুঁজে বেড়ায়—আয় রে আমার আঁধার রাতের তীরন্দাজ—চেয়ে দ্যাখ, হাসপাতালে আমাদের অসুস্থ শ্রমিক ভাইদের শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখে সকলেই চমকে, আঁতকে উঠছে—হাঃ হাঃ—এই অদ্ভুত অসুখের কোনো হদিস আজ পর্যন্ত চিকিৎসকেরা পায় নি—

হুঁশিয়ার—

উত্তমকুমার ফিরে এলেন

ক্যাডারদের নিয়ে পার্টি অফিসে আজ একটা মিটিং করছিলাম। গোলমাল হতে পারে অনুমান করে কয়েকজনকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। সকালবেলা। চারিদিকে ঝলমলে রোদ আর আলো। মনে কেমন যেন ভরসা এসে গিয়েছিল। চার্ট বার করে পেনসিলে দাগ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম কার উপর কোন অঞ্চলের দায়িত্ব থাকবে। ঠিক সেইসময়ই শম্ভু ছুটতে ছুটতে এসে বললো—ওরা এসে গেছে তপনদা, পালান। কাগজপত্র সব ব্যাগে পুরে বেরোতে যাবো, এমনসময় রৈ রৈ করে ওরা এসে পড়ল। পর পর বোমার শব্দ—ধোঁয়ায় ধোঁয়া—'মার, শালাদের মার'—এই চিৎকার। দিশেহারা হয়ে দরমার বেড়া দেওয়া পার্টি অফিসের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অথচ এদিকে দরজাটা খোলা। নিজের বোকামিতে নিজের উপরই কীরকম যেন মায়া হলো। এভাবে এক কোণায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই বুঝে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাত দশেক দূরেই একটা বোমা ফাটে। লাফ মেরে পিছিয়ে আসি খানিকটা। ধোঁয়ার কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু প্রাণপণে চিৎকার করে বলে উঠি—'কী হচ্ছে এসব? কী করছি আমরা? যা বলতে চান সামনাসামনি এসে বলুন।' ধোঁয়ার আড়াল একটু সরে যেতে দেখি ওদের দলের মধ্যে আমার ছোটো ভাইটার এক বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। ওই ছেলেটিই এগিয়ে এসে ঈষৎ নরম সুরে বললো—'আপনারা এখান থেকে চলে যান।' বুঝতে পারি এটা অনুরোধ নয়, আদেশ। ঘরের ভিতর গিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে চলে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠলো—'দাদা, আপনার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে।'

হাসপাতালে খগেনদার সঙ্গে দেখা হলো। বললেন—'খবর পেয়ে চলে এলাম। জানো তো, তোমরা চলে আসার পর পার্টি অফিসটা পুড়িয়ে দিয়েছে।' পরে মাথায় বাঁধা ফেট্টির দিকে তাকিয়ে বললেন—'ঠিক আছে, আজ এভাবেই তোমায় নিয়ে কয়েকটা পাড়ায় ঘুরতে হবে। খগেনদার সঙ্গে থানায় গেলাম ডায়েরি করতে। ও. সি পর্দা ঢাকা পিছনের ঘর থেকে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে এলেন। খগেনদাকে দেখে রসিকতার সুরে বলেন—'চলেছি মানুষ মারতে, দিলেন তো বাধা। এখন শিকার জুটলে হয়।' পরে খগেনদার কাছ থেকে সব শুনেটুনে চেয়ারে বসে খসখস করে কী সব লিখতে লিখতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'ছেলেগুলো আপনার চেনা তো? কার কার হাতে অস্ত্র দেখেছিলেন, বলুন।' একটু চিন্তা করে বলি—'কারোর হাতে কিন্তু তেমন কিছু দেখিনি।' 'সে কী! বোমা, পিস্তল, পাইপগান, ছুরি...কিছুই দেখেননি?' আমাকে তবু নিরুত্তর দেখে ও. সি খগেনদার দিকে তাকিয়ে বাঁঝালো গলায় বলে ওঠেন—'তাহলে আমি কীসের ডায়েরি লিখব? ভেবেছিলাম কয়েকটাকে তুলে এনে পুরে দেবো হাজতে—যত্তো সব বোগাস!' ও. সি কলমটা বন্ধ করে ফেললেন। বাইরে বেরিয়ে এসে খগেনদা বলেন—'দিলে তো ডুবিয়ে! হয়েছে কী তোমার? কারোর হাতে কিছু দেখতে পাওনি, তাহলে মাথাটা ফাটলো কী করে?' কী আর বলবো! চোখ দিয়ে আমার তখন জল বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা। আস্তে আস্তে বললাম—'সত্যি আমি কারোর হাতে কিছু দেখিনি। আন্দাজে কার নাম করবো?' পাশাপাশি চলতে চলতে একসময় বলি—'হত্যাকারীর হাতের অস্ত্র সবসময় দেখা যায় না। খগেনদা, আমাদের লড়াইয়ের ট্যাকটিক্সটা পালটাতে হবে।'

দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়, বিকট এক বীভৎস দৃশ্য দেখে প্রাণভয়ে দিশেহারা কয়েকজন দৌড়চ্ছে। ওরা দেখে না সৌন্দর্য সমাবেশ, বিচার করে না সৌন্দর্য এবং উপযোগিতার অপূর্ব ব্যবহার। দেখে না বিচিত্র বর্ণে অভূতপূর্ব আকারে নানান ধরনের অভিনব সব শেডের আড়ালে আলোকের জগতে সবার আগে আগুয়ান মানব সভ্যতা এই। এরা কেবল জানালার সার্সি খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বলি রাজনৈতিক জীবনের বাইরে আমাদের জীবন-যাপন বেশ স্বাভাবিক। সেখানে হাসি আর আনন্দের ঢেউ। আমি স্নান করি, সে রান্না করে, কেউ পাইখানায় যায়, অমুকে ছেলেকে আদর করে, কেউবা পড়াশুনাও করে। আর মাঝে মাঝে জানালার সার্সি খুলে দেখি ওকে ওরা ধরে এনেছে। দড়ি দিয়ে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধেছে। তারপর পেট্রোল ঢেলে শরীরে আগুন লাগিয়ে দিলো। ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে সম্ভবত ওকে কুপিয়েছিল। তারপর মাথাটা কেটেছিল ঠিক সকাল দশটার সময়। চারিদিকে ঝলমলে রোদ আর আলো।

দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, মানুষগুলিকে হত্যা করে কণ্ঠনালীর কেটে কীরকম বিসদৃশভাবে ফেলে রাখা হয়েছে—প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমরা এতদিন এ দৃশ্যের প্রতিবাদে নামিনি—তবে আজ এই শহরকে যখন নানা সাজে সাজানোর উদ্যোগ আয়োজন চলছে—তার মধ্যে এসব কুরুচির চিহ্নগুলোকে কেন আর বজায় রাখা—আমাদের চোখের সামনে কোনো ভারী পর্দা টাঙিয়ে এদের আড়াল করা হোক—স্বাভাবিক মানুষ আমরা—আমাদের বক্তব্য হত্যা হোক—কিন্তু সে হত্যা যেন লোকচক্ষুর অগোচরে ঘটে—জীবন্ত প্রাণবান মানুষের হত্যা দৃশ্যের মতো কোনো ঘটনা প্রকাশ্যে ঘটলে সুকুমারমতি কোনো লোকই স্থির থাকতে পারে না—অথচ দেখা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ আশ্চর্যরকম ক্ষমাশীল—বিনা রক্তপাতে তো হত্যা আর সম্ভব নয়—সুতরাং থৈ থৈ রক্তের সমুদ্রে দাঁড়িয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ প্রত্যহই পীড়িত বোধ করেন—দেখেন পাঁঠার গোড়ালিতে লোহার শিক ফুটিয়ে যেভাবে ঝোলানো হয়—অবিকল সেইভাবে একটি মানুষকে মাথা নিচু

করে ঝোলানো হলো—তারপর উদ্যত ছোরাখানি তার নিজের মতো কাজ করে যায়—হাতের মাংসপেশী কুচকুচ করে কেটে নেয়—শরীরের যেখানে যেখানে মাংসপেশী আছে কেটে কেটে একইভাবে ওই চকচকে ছোরা একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় করে চলে—এরপরই ছোরা ঢুকে যায় বাঁদিকের পাঁজর বরাবর—পরক্ষণেই মাঝখান দিয়ে নেমে আসে—এবার আস্তে আস্তে সে ডানদিকে এগিয়ে চলে—ক্রমশ ভিড় পাতলা হয়—গাড়ি নিয়ে থানার ও.সি এসে বলেন—'এ কী! কাজ দেখছি আপনারই গুছিয়ে এনেছেন'—পাতলা ভিড়ের মধ্যে পলকের জন্য মৃদু গুঞ্জন ওঠে—এরপর নিস্তেজ দেহটিকে তুলে নিয়ে কালো গাড়ি এগিয়ে যায়—ফাঁকা মাঠ বরাবর এগিয়ে চলে কালো গাড়ি—তারপর একটা গুলির শব্দ—মৃতদেহটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেল দিয়ে ও. সি এবং কনেস্টবলসহ সকলেই সামনের ডোবার জলে হাতমুখ ধুয়ে নেয়—

ওগো, তুমি তোমার সবখানি নিয়ে আনন্দময় ওয়ে ওঠো—

ইলিশ আসছে

তখন রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। অকস্মাৎ বড়ো রাস্তার দিকে থেকে পর পর প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটে। কিছুদিন ধরে সব বেশ চুপচাপ। শান্ত চারিধার। শুধু অফিস থেকে ফেরার সময় আমাদের মফস্বলের ছোট্ট এই প্লাটফর্মটিতে হাঁটতে গেলেও ক্রমাগত ঘুমন্ত, আধজাগ্রত মানুষের শরীর ডিঙিয়ে চলতে হয়। কারোর হাত, পা, কনুই বা হাটু মাড়িয়ে ফেললেও কেউ সাড়াশব্দ করে না। এরা এক আশ্রয় থেকে আরেক আশ্রয়ে, কখনো খোলা আকাশের নীচে ভেদবমিতে আক্রান্ত শিশুর দল শরীরে জলাভাব ঘটায় একসময় নেতিয়ে পড়ে। কেউ নিস্পন্দ। কেউ বা অতি ক্ষীণস্বরে কাতরায়। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে স্বল্পবাস পরিহিত মাতা মুমূর্ষু বাচ্চার দেহটিকে ক্রমাগত ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলে। ভাবলেশহীন চোখ। এরা জেনে গেছে এদের কিছু করার নেই। প্লাটফর্মে বসে এরা দেখে ট্রেন আসে ট্রেন চলে যায়। কাঠকুটো দিয়ে ভাঙা কড়াইতে মুসুরির ডাল রান্না করে কোনো শীর্ণা রমণী। পাশেই কারোর শিশুপুত্র ভেদবমি করে। লাইনের ওপারে ঝোপের পাশে বসে পাইখানা করে কেউ। বোঁটকা দুর্গন্ধে বাতাস বিষিয়ে ওঠে। শুধু ট্রেন থেকে গেটের দিকে যেতে যেতে দত্তবাবু বলেন—

'দেখেছেন মশাই এদের ডালের রং? এমন আপনি বাজার ঘুরে কোথাও পাবেন না। আমি আজকাল এদের কাছ থেকেই আটআনা করে কিলো ডাল কিনছি।

এদিকে ড্যাম চিপ, আবার জিনিসটাও ভালো। নেবেন আপনি?'

দত্তবাবু পানখাওয়া জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটেন।

তখন রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। অকস্মাৎ বড়ো রাস্তার দিক থেকে পর পর প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটে। কিছুদিন ধরে সব বেশ চুপচাপ। শান্ত চারিধার। ইন্দুমতী চমকে উঠে বলে—'আবার কী হলো?' আমিও খানিকটা থতমত খেয়ে যাই। পরক্ষণেই কী ভেবে রেডিয়ো খুলি। সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় খবর। উত্তেজনায় বুক ধরফড় করে। ইন্দুমতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে কোনোক্রমে বলি—'ঢাকা ফল।'

তখন ইন্দুমতী সরলভাবে হেসে বলে—'এগুলোর আওয়াজ কিন্তু তেমন জোরালো নয়। তাই না? সেই যে পুলিশটার গলা কাটলো যেদিন...কী আওয়াজ...বাড়ি যেন কেঁপে উঠেছিল।'

আবার চারিদিকে মানবিকতার জয়গাথা—এখন দেশাত্মবোধ অনায়াসে উৎসাহ উদ্দীপনা

নিয়ে চলে আসে—আবার বাজার থেকে তিন কেজি ওজনের ভেটকি ঝুলিয়ে ফেরে কেউ—আমাদের বধুমাতা নিরাপদে নাইটশোয়ে সিনেমায় যান—আর তখনই ছড়িয়ে পড়ে সব—দলে দলে চলে আসে শহরের দিকে—সকালে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দেখি—

ফুটপাতে পথের ধারে ব্রিজের তলায়

পাইপের ভিতরে গ্যারেজের তলায় প্লাটফর্মে

অট্টালিকার নীচে গজিয়ে ওঠে

কোনোমতে টিকে থাকার ঘরসংসার—এক আশ্রয় থেকে আরেক আশ্রয়ে—পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়—প্রত্যাখ্যাত হয় আবার হাঁটে—মাইলের পর মাইল—দিনের পর দিন—অনাহারে পথশ্রমে দুর্বল অবসন্ন—বসে পড়ে পথের ধারে—পড়ন্ত রোদে গাছের ছায়ায়—মৃত্যু কত তড়িৎ কত নিপুণ—বোঝার উপায় থাকে না—পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মান্তিক মুহূর্তগুলির সাক্ষী হয়ে শুয়ে থাকে পথের পাশে কুকুর—

ট্রেনে অফিস যাবার পথে দত্তবাবু ফিসফিসিয়ে বলেন—

'লট অফ গার্লস, অল নেকেড, ভাবতে পারেন কীভাবে টরচার করছে?'

দত্তবাবু পানখাওয়া জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটেন।

এখন শান্তি ফিরে এসেছে অস্থিতে, মাংসে ও মজ্জায়—ফিরে এসেছে সুস্থতা নগরীর হট্টরোলে—এসে গেছে শীত—এখন সমস্ত রাস্তাই ১২ নং রাসেল স্ট্রীট—

গো গো সেলর্স হর্ন পাইপ প্যাসো ডবল চার্লসটন

ক্যাসাসোক নাইট ইন রক অ্যান্ড চা চা চা পুরো রাত পুরো বার

আপনার সেবায়

পুরো রাত বিছানায় শুয়ে ইন্দুমতী ছটফট করে—জেগে থাকে—মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে বলে—'দেখ, নাড়ছে, এই দ্যাখ না'—আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে স্ফীত উদরের উপর চেয়ে রাখে—'বুঝতে পারছো?'—কিছুই বুঝি না আমি—কাছে সরে এসে ওর পেটে হাত বোলাই—আড়াল থেকে জীবন্ত অশুভ অপলক চেয়ে থাকে—মশারির চাল নেমে আসে—আরও নীচে, আরও কাছে—এবার নাকের ডগা ছোঁবে বুঝি—

স্বপ্ননগরী অরোভিল

এখন প্রত্যেকের নিঃশ্বাস থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র ভাইরাস—মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে বিমানের নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে চলে যাচ্ছে মুখোশধারী মানুষ—এক শরীরকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে অনেক শরীর তার কক্ষপথে আটকা পড়ে গেছে—ওপর থেকে নীচে তাকালে দেখা যায় মাটিতে রক্তের দাগ—অথচ স্বপ্ননগরীতে এসে গেছে নতুন আলোয় নতুন শেড—'এখন থেকে যতটুকু আলো চান, যেখানে চান, তাই-ই পাবেন'—তবে এমন ঘটনার সংখ্যা খুব বেশি নয়—তাই আমাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক-স্বভাবিক এই অভিশপ্ত জীবনের একটি কথাও কখনো পৃথিবীর কানে পৌঁছয় না—স্বাভাবিক জানালার বাইরে তাক করে থাকা রাইফেলের নল—যে শব্দ শোনা যায় না তাই-ই মানব দেহের পক্ষে ক্ষতিকর—যে দৃশ্য চোখে পড়ে না তারই টানে মানুষ লাফিয়ে পড়ে কার্নিশ থেকে—অবোধ শিশুর কান্না থামাতে না পেরেই তার গলা টিপে ধরা হয়েছে—টেবিলে পড়ে আছে ক্যামেরায় তোলা মরশুমি ভিখিরির অজস্র ছবি—শিশুপালন থেকে

যৌনসংসর্গ পর্যন্ত আজ আমরা ফুটপাতেই সেরে নিচ্ছি—

এখানে প্রেমের দৃশ্য স্পর্শরহিত-স্পর্শরহিত প্রাণের দৃশ্য প্রেম—এখানে শ্মশান পরিকল্পনাকারী মানুষ চমকপ্রদভাবে ব্যবহার করছে কুকুরের ডাক—হয়তো সব বিবরণই সত্য—সত্য ১০ ভাগ পরিবারের প্রাতঃকৃত্যের কোনো বন্দোবস্ত নেই—সত্য ৩৬.৯২ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ যন্ত্রণা—সত্য বটে ৩৫ লক্ষ বন্দির নাগরিকতা যেন চিড়িয়াখানার প্রাণী—সত্য বটে ফুটপাতে আরও মানুষ—আরও চল্লিশ হাজার খাটা পাইখানায়—আরও তিরিশ হাজার খোলা নর্দমায়—দৈনিক ২৭০০ টন আবর্জনার পাশে—কী খায় কেমন খায় এসব প্রশ্ন অবান্তর—কেননা বঙ্গোপসাগরের উদাত্ত বাতাস এই শহরের বায়ুমণ্ডলকে স্বেচ্ছায় পরিচ্ছন্ন রাখে—নৈসর্গিক ঝাড়ুদার আমাদের সবুজ ফুসফুস—যদি বলি এ এক অবিস্মরণীয় হেমন্ত গোধুলি—সখি, এমন করে কখনো নেমে আসেনি—অচেনা গাছের গন্ধ—নির্বোধ পাখির গান—কবিদের কলকাতায় এক নস্টালজিক আকুতির সন্ধান দিয়েছিল নাকি—ঘুমের ঘোরে আমরা ২১ বছর ধরে দেখলাম দুঃস্বপ্ন—ঘুমের ঘোরে আমরা ২১ বছর ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম অন্ধবিশ্বাসে—এখন প্রতিটি শহর ও গ্রাম, গ্রাম ও শহর এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে মুখে—আমাদের অনিশ্চিত অর্থনীতির মধ্যে এসে পড়েছে এক বিদেশি ছুঁচ—প্রতিটি শহর ও গ্রাম, গ্রাম ও গঞ্জ থেকে আমার স্বজন পরিজনেরা—তোমাদের বলছি—৫০ টাকা করে অগ্রিম পেলেও বেবুনের হাত থেকে মাইক কেড়ে নাও—যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দাও—কোকচুল্লির মুখ খুলে দাও—ফিসপ্লেট সরিয়ে দাও—রক্তচোষা বাদুড়ের দল তোমার ঘাম ও লবণ দেখেই বেঁচে থাকে—বীজানুবাহী পোকামাকড় অবাধ এদের গতিবিধি—বইয়ের পাতা থেকে কেবলই এরা কালো শুষে নেয়—

আমরা স্বজন পরিজনেরা—তোমাদের ডেকে বলছি—কাপুরুষের জীবন যখন নির্ধারিত তখন মৃত্যুই শ্রেয়—বাদ্যমুখর এই যুদ্ধ কাপুরুষের—ন্যায় ও সত্যের পথে তুমি মিলিত হও—তুমি নও পবন হিল্লোলে শুধু হায় হায়—তুমি নও আসমানে নবমীর চাঁদ অস্পষ্ট তারকারাজি—তুমি স্নান সেরে এসো—তুমি সারা অঙ্গে সুগন্ধি লেপন করো—তুমি মৃত্যু নিশ্চিত জেনে অন্তিম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও—অর্ধেক কাজ আমরা সম্পন্ন করে রেখেছি—মৃত্যু নাকি এজিদের পৈশাচিক অট্টহাস ওই—মৃত্যু তা কি এজিদের দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার লোভ—মৃত্যু জানি চক্ষু থেকে অশ্রু আর তৃষ্ণার জ্বালা—নশ্বর এই গ্রহটির নিয়তি সন্নিকট—শেষবারের মতো আমরা এবার তীরভূমতে উঠে এসে দাঁড়িয়েছি—

মজার মানুষ ড্যানি

কখনো বাস না পেলে রিকশা করে স্কুলে যাই। মোড় ঘুরতেই সামনের বাড়ির দেয়ালে আলকাতরায় লেখা শ্লোগান দু'টি নজরে আসে।

Long Live Chairman MOA

ঠিক তার নীচেই লেখা—

এই এলাকায় শান্তিপ্রতিষ্ঠাকারী...কে ভোট দিন।

'শান্তিপ্রতিষ্ঠাকারী' কিংবা মাওয়ের ভুল বানান নিয়ে ভাবতে ভাবতেই ১৫ মিনিটের পথ কখন যেন পার হয়ে টপ করে চলে আসি স্কুলের গেটের কাছে।

আমাদের স্কুলের পাশেই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। আর ক'দিনবাদেই ওরা ফিরে যাবে ঘরে। স্বাধীন দেশে। আজ ছুটির পর স্কুলের তরফ থেকে একটি সভায় ওই

ক্যাম্পের প্রধানদের সম্বর্ধনা জানানো হবে। তিনটের সময়ই ছুটির ঘন্টা দিয়ে দেয় মতিলাল। টিচার্সরুমে সকলে জড়ো হয়। ওরাও এসে যান। পাকা দাড়িঅলা বৃদ্ধটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন—'আমার একমাত্র ছাওয়ালডারে...।' কয়েকজন শিক্ষক তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন। একজন বলে ওঠেন,—'এ মৃত্যু তো গৌরবের...।' মতিলাল চৌকোনো করে কাটা খবরের কাগজ দিয়ে যায় হাতে। অবিনাশ প্রত্যেকটি কাগজের উপর একটা করে রাজভোগ ফেলে দিতে থাকে। ধুতি পাঞ্জাবী পরা আর একজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান। যশোর ক্যান্টনমেন্টের একটি সেল-এ ওই ভদ্রলোক আরও কয়েকজনসহ বন্দি ছিলেন। ওদের কোর্টমার্শালের অর্ডারও দেয়া হয়েছিল। ঠিক তার একদিন আগেই ভারতীয় সেনারা গিয়ে পৌঁছতে সে আদেশ আর কার্যকর হয়নি। অদ্ভুতভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। আমাদের রাজভোগ খাওয়া শেষ হলে সন্দেশ আসে। উনি বলে চলেন—'আমাদের উপর যে কীরকম অত্যাচার হয়েছে তা আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। এক একজনের শরীর পিটিয়ে থেঁতলে দেয়া হয়েছে মাংসের কিমার মতো। জলের বদলে পেচ্ছাব খেতে দেয়া হয়েছে। গায়ের ছাল তুলে নুন ছিটিয়ে দিয়েছে। বন্দুকের বাট দিয়ে মেরে মেরে...এই দেখুন...'—পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতেই অজস্র কালসিটের দাগ নজরে আসে। বৃদ্ধ হরিপদবাবু মুখ কুঁচকে একটু জোরেই বলে ফেলেন—'আর কেন, ওসব নিত্যই তো কাগজে পড়ছি।' অবিনাশ এবার একটা করে সিঙাড়া দিয়ে যায়। সিঙাড়ায় কামড় দিতে গিয়ে সামান্য সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যাই। পরক্ষণেই ভদ্রলোককে বলতে শুনি—'আপনাদের মাঝে ফিরে এসে আজ আবার কবিগুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—মানুষেরই মাঝে স্বর্গনরক মানুষেতে সুরাসুর...।' পাশে বসা রতনবাবু জিভ কেটে চাপা স্বরে বলে ওঠেন—'এঁ হেঁ হেঁ—ওটা রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়।' আমি ফিক করে হেসে ফেলি। রাতে বিছানায় শুয়ে ইন্দুমতী বলে—'আচ্ছা, কী হলে তুমি খুশি হও? ছেলে না মেয়ে?' এবারও আমি ফিক করে হেসে ফেলি। অন্ধকার জলের মতো ঘিরে রাখে আমাদের।

হাওয়ায় কেবলি জানালার পর্দা ওড়ে—রাত আর শেষ হতে চায় না—মৃত্যুলুব্ধ দৃষ্টি কার তাকিয়ে থাকে—অকস্মাৎ চমকে ওঠে ঘড়ির শব্দ—পরক্ষণেই অদৃশ্য উৎস থেকে শোনা যায় গান—হাওয়ায় মশারির পেট ফুলে ওঠে—ঘরের প্রাচীন আসবাবে আতঙ্কের ছায়া—কিছুক্ষণপরেই হয়তো এখানে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে—কিছুক্ষণ আগেই আমার যৌনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে তৃতীয় ব্যক্তি—৮ মিলিমিটার মুভি ক্যামেরা এখন সক্রিয়—ওই দুটি নর নারীর গোপন মুহূর্তের ছবি পরপর তুলে রাখা হচ্ছে—তারপর কখনো ওই ছবি দেখে আর সুখ অনুভব করা—সুখ ফুরিয়ে এলে সিল্কের মোজা হাতে নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়া—আমি চেয়েছিলাম কিছু বেশি দিতে—অন্তরের কোমল অনুভূতির সঙ্গে উজ্জ্বল কিছু বস্তু—অথচ আমার স্ত্রী জলভরা চোখে বলেন—'এই বিরাট বরফের টুকরোটি তিনি কেন আমার দিয়েছেন, জানি না'—আমার দৃষ্টি চিরকালই তাকে অনুসরণ করে চলে—আমাদের হাত কখনই পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকতে পারে না—চিনে রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে সুপ খাবার সময়ই কেবল দেখি-দেখি, প্লেটের আকৃতি ঠিক মনুষ্য হৃৎপিণ্ডের মতোন—

এয়ার কন্ডিসানড্ দেবতা

এ এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দের রাজ্যে ভাসমান আমাদের ভেলা
দেখা যায় উপকূল বরাবর শত শত মৃতদেহ পড়ে থাকে
দীর্ঘকাল রোদে পুড়ে আকৃতি বিকট
যার প্রাণ একদিন কম্পিত হয়েছিল
দুঃখে সুখে তড়িৎ প্রবাহে
যার প্রাণ একদিন কম্পিত হতে হতে
বাসনা থেকে বাসনায়
ছুটেছিল অই প্রাণ

এ এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দের রাজ্যে ভাসমান আমাদের ভেলা
মাথার উপরে তপ্ত সূর্যালোক
নদীতে সোনালী রং ডানদিকে
সবুজ গালিচাপাতা চর জেগে থাকে
একটা ন্যাংটা লোক অই চরে একা বসে আছে
ভেলা দেখে ঝাঁপ দেয় জলে
প্রবল ঢেউয়ের ঘায়ে ভেসে যেতে যেতে হাত নাড়ে
যেন কিছু বলতে চায়
প্রবল স্রোতের টানে কোথায় তলিয়ে যায় কে জানে
আধ টন বিস্কুট কিছু ধুতি শাড়ি নিয়ে
ছোটো এই ভেলা ভেসে চলে

অন্ধকার হলঘর
নাকে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ
অজস্র মানুষ আপনজনের মৃতদেহ মাড়িয়ে ছুটে আসছে
একমুঠো অন্নের প্রত্যাশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে
নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে
মরে
বিদ্যুতের আলোয় শত শত অশরীরী প্রাণী
যদিও সাহায্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়
যানবাহনের নিদারুণ অভাব
আর কর্তৃপক্ষ কখনই দুর্গত অঞ্চলে পৌঁছবার
কোনো উপায় খুঁজে পান না
খননকারীর অভাবে এক থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত
একটা গর্তেই কবর দেওয়া হলো হুজুর
মজুরি ছিল সারাদিন দু'টাকা

খবরে আরও প্রকাশ ভূতনাথের বাড়ির চারটে লোক
ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ি ধসে মারা গেল
তার অবস্থা সামান্য হলেও অই
ছোট্ট বাড়িখানিতে সুখের কমতি ছিল না
আজ খোলা আকাশের নীচে সামান্য ট্রাক ড্রাইভার ভূতনাথ
হাটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে
এস. ডি. ও জানিয়েছেন।
দরিদ্র-সাহায্য-তহবিল থেকে ২০টি টাকাও আজ নয় কারণ
আলমারির চাবি যার কাছে তিনি আজ অফিসে আসেননি

আকাশে শকুনের ভিড়—দূষিত আবহাওয়া—বিশতলা টাওয়ারের উপর রেড়ার—ঘূর্ণীঝড়ের সংকেত—এইমাত্র রিলিফের নৌকা লুঠ হলো—যেখানে মৃত্যু নেই সেখানে পুলিশ এসে হানা দেয়—৩৪নং জাতীয় সড়কটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—সাহায্য ফেলার মতো একটুকরো জমিও নেই—রানওয়েতে একটা পাগলি থালা বাজিয়ে গান গাইছে—রাজধানীর পাশেই বসানো হবে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটি—ক্ষিপ্রপদ কেউ হোটেলের কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন—কারোর মাথার খুলি ফুটো করে পাওয়া গেছে বুলেট—বিদ্রোহীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের বয়স ছিল আটবছর—আমাদের ক্ষণিক মনুষ্যত্ব আর চিরকালের জন্য কান্নাকাটি করে না নরম মাটিতে কোমর পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে—এখন রিং-এর মধ্যে দুটো বাইসনের পরস্পর যৌনসংঘর্ষ—করাল শব্দের আবর্জনা—পোষা শূয়ারের বাচ্চা হিসি করে দিয়েছে সুন্দরীর নাইলনে—পাটখেত থেকে মৃত শিশুকোলে আমাদের মাতা বেরিয়ে এলেন—কয়েকটি নাইলনের শায়াই হয়তো অগ্নিগাণ্ডের কারণ—আকাশে শকুনের ভিড়—সব সভ্যতার আলমারীতেই কয়েকটি কঙ্কাল তুলে রাখা আছে—শকুনের সঙ্গে রিলিফ বিমানের প্রপেলারের ধাক্কা লেগে গেছে—দূরে একটা পাগলি থালা বাজিয়ে গান গাইছে—এবার ওটাও মরবে—

আমি দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছি কান—আমি বাইরের কোনো শব্দ আর শুনতে চাই না—আমি দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছি আমার কান—আমি নিজের উচ্চারিত শব্দও আর শুনতে পাচ্ছি না—সুতরাং মৃত্যু—

তুমি স্নান করতে গিয়ে জল দেখেছো পীতবর্ণ—তুমি স্থির জলে দেখেছো তোমার ছায়া মস্তকহীন—তোমার মুখমণ্ডলে বস্ত্রে গাত্রে সর্বদাই শবগন্ধ নির্গত হয়—সুতরাং মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু—

মৃতদের মধ্যে আমি পরিত্যক্ত—নীচতম গহ্বরে আমাকে ফেলে রাখা হয়েছে—স্বজনের কাছ থেকে আমাকে দূরে রেখেছো—আমার বেরিয়ে আসার ক্ষমতা নাই—তুমি কি মৃতদের পক্ষে আশ্চর্য ক্রিয়া করবে—প্রেতারা কি উঠে এসে তোমায় স্তবগান করবে—কবরের মধ্যে তোমায় দয়া কি মৃতেরা অনুভব করে—অন্ধকারেই কি তোমার আশ্চর্য ক্রিয়া দেখা যায়—এই বিস্মৃতির দেশে তোমার ধর্ম কি কখনো জানা যাবে—আমদের মাংসের স্বাস্থ্য নাই—আমাদের অস্থিতে শান্তি নাই—ত্রাস আমাদের উচ্ছেদ করেছে—এখানে সকলেই মুখ মোছে আর বলে—আমি তো কোনো অধর্ম করিনি—

শান্তিরঞ্জন আত্মঘাতী হলেন

'যে শব্দ শোনা যায় না—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলে ইনফ্রাসাউন্ড—তাই-ই মানব দেহ ও মনের পক্ষে সর্বপেক্ষা ক্ষতিকর—শুনতে হয়তো অদ্ভুত লাগে—কিন্তু শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ জেটবিমানের বজ্রগম্ভীর শব্দের চেয়েও বেশি ক্ষতি করে—প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ হাজার কম্পনযুক্ত শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে কানে—এর চেয়ে কম কম্পনশীল দুর্বল শব্দতরঙ্গ মানুষের কানে ধরা পড়ে না—এইভাবে কম কম্পনশীল আলেকতরঙ্গ—যেমন অবলোহিত, অতিবেগুনী, গামা, এক্স আলোকরশ্মি—এরাও ধরা পড়ে না মানুষের চোখে—সম্প্রতি গবেষণার ফলে কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে—জানা গেছে, প্রতিটি শ্রবণোপযোগী শব্দই শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে যায়—এই অব-শব্দ কখনো কানে শোনা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়—ফলে মানবশরীরে নানারকম উপসর্গ দেখা দিচ্ছে—আমরা এখন এগুলিকে অব-শব্দের জঞ্জাল বলে শ্রেণীভুক্ত করছি—এই শব্দহীন শব্দ মানব জীবনে অনেক দুর্ঘটনার জন্যেই দায়ী—মানুষের কানে এই অতি দুর্বল শব্দতরঙ্গ পৌঁছে দেবার পর দেখা গেছে—মাথা ধরা, ক্লান্তি, বমির ভাব ইত্যাদি নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়—এমনকি কারোর কথা বলতে পর্যন্ত কষ্ট হয়—ফ্যালফ্যাল করে সে শুধু চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—কোনো কথা বলতে পারে না—'

এই পর্যন্ত বলে ডঃ সিঁনাপ্পা সরু চোখে আমাদের দিকে তাকান—সারা মুখ তাঁর কালো হয়ে আসছে—অস্বাভাবিক গম্ভীর তিনি—আমরাও চুপচাপ—হঠাৎ কথা বলার ক্ষমতা কে যেন কেড়ে নিয়েছে আমাদের—সমস্ত ঘর জুড়ে মৃদু এক কম্পন শুধু অনুভূত হয়—নাকি আমাদেরই মনের ভুল—

'ফিলিং সিক?'

'ওহ—না।'

'দ্যাটস্ অল রাইট। যা বলছিলাম...'

'আমরা প্রতিদিন চারপাশের পৃথিবীকে দেখে থাকি একটি মাত্র গবাক্ষ পথের মধ্য দিয়ে—এর নাম ভিজিবল লাইট বা দৃশ্যমান আলোক—এই আলো মানুষজন, গাছপালা, আশেপাশের বিভিন্ন বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে—সুদূর মহাকাশ থেকে গ্রহ, নক্ষত্র, বাষ্পপুঞ্জ যে বিকিরণটুকু পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দেয়—তার এক ভগ্নাংশমাত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের চোখে এসে পড়ে—শুধু তখনই তাদের আমরা দেখতে পাই—তবে মনে রাখবেন, আন্তনাক্ষত্র জগতের সর্বত্র সাধারণ আলো ছাড়াও অতিবেগুনী, গামা, এক্স প্রভৃতি রশ্মি বিচরণ করে—সম্প্রতি আমরা জেনেছি আমাদের এই গ্রহটির মধ্যেই কোথাও রয়েছে এক্স রশ্মি বিকিরণকারী উৎস—এই রশ্মি নিকটতম বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ছে—সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের বিস্ফারিত চক্ষুর সম্মুখে—ঠিক যেন কয়েক হাজার ১০০ পাওয়ারের বালব এক সঙ্গে জ্বলে উঠছে—একই সঙ্গে পা ফেলে পা ফেলে এগিয়ে আসছে—অচেনা গবাক্ষ পথের কপাটগুলি আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে—অদৃশ্য বস্তুপুঞ্জ আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে—আমরা মনে করি এই গ্রহটি তার জীবনকালকে প্রায় সমাপ্তির দিকে টেনে এনেছে—টের না পেলেও এখন এর তাপমাত্রা জানবেন কোনো কোনো অংশে এক কোটি ডিগ্রি—গ্রহটির কোথাও কোথাও বস্তু সামগ্রী পরিণত হয়ে যাচ্ছে নিউট্রন গ্যাসে—এই বায়বীয় পিণ্ড অদৃশ্য থেকে নিয়মিতভাবে বিকীর্ণ করে চলেছে এক্স রশ্মি—' এই পর্যন্ত বলেই ডঃ সিঁনাপ্পা অকস্মাৎ ঘরের আলোগুলি নিভিয়ে দেন—অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি বন্ধ হয়ে আসে—প্রথমে কিছুই দেখা

যায় না—পরে বুঝতে পারি অন্ধকারেই খোলা দরজা দিয়ে কয়েকজন একটি লোককে ধরাধরি করে নিয়ে এলো—একটি বন্ধ জানালার দিকে মুখ করে তাকে চেয়ারে বসানো হয়—ডঃ সিঁনাপ্পা এগিয়ে আসেন—হাত বাড়িয়ে দেয়ালের বিশেষ একটি জায়গায় চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু শব্দ করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জানালার কপাট খুলে যেতে থাকে—দেখি, তীব্র উজ্জ্বল এক আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে—একটা ক্ষীণ চিৎকারে চমকে উঠি—লোকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যায় জানালার সামনে—বিস্ফারিত চোখে কী যেন দেখে—ডঃ সিঁনাপ্পা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাকে জপটে ধরেন—কিন্তু ডঃ সিঁনাপ্পার বাহুবন্ধন ছিন্ন করে লোকটা উন্মাদের মতোই খোলা জানালা পথে লাফিয়ে পড়ে নীচে—

কিছুক্ষণের জন্য এক পৈশাচিক নিস্তব্ধতা—

তারপর আলো জ্বলে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের কাগজে বিশেষ সংখ্যাটি ডঃ সিঁনাপ্পার হাতে ধরিয়ে দিলাম—সেখানে লোকটি ছবি এবং জীবনীসহ সম্ভাব্য লোকসভার সম্ভাব্য বক্তাদের বক্তৃতার অংশটি কালো বর্ডারের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল—বিস্মিত সিঁনাপ্পার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলি—'সাংবাদিক দক্ষতায় এই আমাদের আর এক কীর্তি—দেখুন—'

সার্থক ছবি সীমাবদ্ধ

পাতায় ছাওয়া একটি কুঁড়ে ঘর—দরজা ঠেলে ইন্দুমতী বেরিয়ে আসে—ক্রমাগত খোঁপায় হাত বোলায় আর হাসিমুখে তাকায়—কুঁড়ে ঘরের মাথায় নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন জ্বলে আর নেভে—Beauty Parlour For Ladies anmd Gents—আমি ইন্দুমতীকে নিয়ে রাস্তা ধরে এগোই—পাশ দিয়ে মিলটারি কনভয় চলে যায়—সা সা আওয়াজ করা জিনিসগুলো মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—হৃৎপিন্ডের ধড়ফড়ানি আর শোনা যায় না—একটা আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি—সু...সু...সু—সিক—বাঁশঝাড়ের মাথায় সূর্য লটকে আছে—কতগুলি চাষি পরিবার হেঁটে চলে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে—হাতে ছেঁড়া মাদুর, পোটলাপুটলি, ভাঙা হাড়ি কড়াই—ক্ষুধার্ত শিশুর হাত ধরে রমণীরা—ক্ষেতে ধান পেকে আছে—আর কয়েকমাসের মধ্যেই সকলে উপবাসের প্রাণ হারাবে—পাকা ধানের শীষ হেলে পড়ে বাতাসে—তারও আগে অপুস্টিতে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে রমণীর ঋতুকাল—চাঁদনী রাতের মায়ায় ফসল আর ফসলের গান একাকার হয়ে যায়—আমি হাসিমুখে ইন্দুমতীর দিকে তাকাই—'চাদর দিয়ে পেটটা ঢেকে নাও'—আমি বলি—আমি আর ইন্দুমতী একটা মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি—হাতে হাত ধরে বুঝি বা ঘুরে বেড়াই স্বর্গের বাগানে—'তোকে আজ খুব সুন্দর লাগছে'—ইন্দুমতীর হাত ধরে কাছে টেনে আনি—'দোকান থেকে খোঁপা করিয়ে আনলাম, তুমি তো কিছু বললে না'—ইন্দুমতির দু'চোখে অভিমান—অদূরে ধানক্ষেতে শীতের রোদ্দুর—আলের পাশে ধীর মন্থর সারসপাখি—পুকুরে মাছেরা থেকে থেকে ঘাই মারে—এক প্রবাহমান শান্ত নদীতে আমরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাই—ঠিক তখনই ভয়ংকর একটা জিনিস আমাদের নজরে আসে—চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে নরমুণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে—বলে, পাশের ক্ষেতে নাকি আরও অনেক মুণ্ড পড়ে আছে—ইন্দুমতী কেঁপে ওঠে—আমি মুণ্ডটা ফেলে দিতে বলি—আর পকেট থেকে একটা টাকা বার করে ওর হাতে দিই—ছেলেটি ওটা ফেলে দিয়ে খুশি হয়ে দৌড়ে চলে যায়—তারপরই এই দয়াদাক্ষিণ্যের প্রতিদান আমরা পেতে থাকি—সামনে আবার আরও

তিনটি বাচ্চা নরমুণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে—খবর পেয়ে গেছে সব—একটা করে টাকা দাও—নইলে স্বর্গের বাগানে এরা কেবলি চোখের সামনে নরমুণ্ড নাচাবে—

আমি জানতাম অসময়েই ইন্দুমতীর Pain উঠবে—এই গভীর রাতে ট্যাক্সি পাওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব—ইন্দুমতীকে তাই ঘাড়ে তুলে নিয়ে দৌড়োই—হাসপাতালের গেটে ওকে নামিয়ে রেখে ভিতরে ছুটে যাই—শূন্য হাসপাতাল—কেউ কোথাও নেই—'ডক্টর ডক্টর' বলে চিৎকার করে উঠি—সাড়া দেয় না কেউ—যে কোনো ওয়ার্ডেই ঢুকি না কেন সব বেড খালি—যেখানে জঞ্জাল জমে জমে পাহাড় হয়ে আছে সেখানেই হাসপাতালের রান্নাঘর—সেখানেই আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়—ফ্রাইং প্যানে সকলে ডিম ভাজে আর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে কী যেন দেখে—আমিও উঁকি মেরে দেখি—ট্রাক বোঝাই বন্দি সৈন্যদের রাস্তায় নামানো হচ্ছে—ট্রাক খালি হলে দুজন অফিসার এগিয়ে আসেন—প্রত্যেকের হাতে একটা করে সিগারেট দিয়ে যান—সকলে সিগারেট পেয়ে ছেলেমানুষের মতো হাসে—সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সকলে সিগারেট টানে—ওদিকে আস্তে আস্তে দুই প্রান্তে জীপগাড়িতে বসানো দুটো মেশিনগান সেট করা হয়—বন্দিরা চোঁ চোঁ করে সিগারেট টানতে টানতে ভ্রুক্ষেপহীন এসব দ্যাখে—কোথাও একটা চিৎকার নেই—সকলেই চাইছে মেসিনগানটা গর্জে ওঠার আগে অন্তত সিগারেটটা শেষ হোক—বাতাসে ডিমভাজার গন্ধ—

ইন্দুমতী নাম্বার ওয়ানকে ঘাড়ে করে আমি একটা তেতলা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেছি—ইন্দুমতী এত ভারী যে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে কষ্ট হয়—যন্ত্রণায় ইন্দুমতী গোঙায়—আমার ঘাড়ের মাংস কামড়ে ধরে—প্রচণ্ড যৌনতাতেও ইন্দুমতীর দাঁত এমনভাবে শরীরে আর কখনো বসে যায়নি—ইন্দুমতী নাম্বার টু তেতলার বারান্দা থেকে ভীত চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে—ইন্দুমতীকে নিয়ে সিড়ি ভেঙে O.T-র দরজায় ঠিকমতো পৌঁছতে পারবো কি—ইন্দুমতী নাম্বার টু-র ফিসফিসানি শুনতে পাই—'লক্ষ্মীটি একটু চেষ্টা করো, একটু কষ্ট করো—এভাবে আমাকে মেরে ফেলো না'—প্রাণপণ চেষ্টায় সিড়ি বেয়ে উঠতে থাকি—পা দুটো টলমল করে—৪, ৫, ৬, ৭—ডান হাত দিয়ে কপালের ঘামমুছি—১৩, ১৪, ১৫, ১৬—সিড়ির বাঁক ঘোরার সময় ডানপাশে বাথরুম নজরে আসে—অকারণেই চোখ চলে যায় সুয়িংডোরের তলায়—দেখি মেঝেতে দলা দলা রক্ত, জননের ফুল—হঠাৎ সামনে সব দুলে ওঠে—ইন্দুমতীকে নিয়ে হুড়মুড় করে সিড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যাই—এরপর যে দৃশ্য দেখতে হবে তা আমার জানাই ছিল—তবু মুখ তুলে তাকাই একবার—অবাক হয়ে দেখি ইন্দুমতী কোথাও নেই—তার বদলে এক হিন্দি সিনেমার ভিলেন দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে সমানে—গোঁফের উপর দিয়ে সাঁৎ করে একবার আঙুল বুলিয়ে নিয়ে নাক টেনে সে বলে—'গর্ভপাত আইনসম্মত হয়ে যাচ্ছে—অনুমতি করুন'—

দোলনচাঁপা কাঁদে না ছিঃ

সে প্রায়ই বলে—'আমি রাজার বাড়ি জন্মেছিলাম—অনেক লোকজন, আলো ঝলমল বাড়ি—মন্দির আছে বাড়ির কাছে—সেখানে আমার মা, বাবা, ভাই, বোন সব আছে—এখানে আমার কেউ নেই—তোমরা আমার কেউ নও—এখানে থাকলে আমি বাঁচব না'—মাকে বলে—'আমি কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলাম—তাও তুমি জানো না?—তুমি তো আমার মা নও'—

খালাসিটোলায় একা বসে মদ খাই। কখনো মনে হয় ওই কোনা থেকে যেন সুবো চিৎকার দিয়ে উঠলো—'এই শাল্লাহ্।' মনে হয় পাশের টেবিল থেকে প্রদীপ টলতে টলতে উঠে আসছে। দম বন্ধ করে বসে থাকি। মনে হয় এইমাত্র পিঠে কেউ সজোরে চাপড় মারবে। চশমার কাচ মুছে নিয়ে আবার চোখে লাগাই। ঠিকঠাক হয়ে বসি। দেখি, দূরে ফর্সা বেটেখাটো কালীদা দাঁড়িয়ে আছেন—'আমি রাজার বাড়ি জন্মেছিলাম—সেখানে আমার মা, বাবা, ভাই, বোন সব আছে—এখানে আমার কেউ নেই—তোমরা আমার কেউ নও।'

প্রায় বছর সাতেক আগের কথা। কালীদার সঙ্গে এই খালাসিটোলারই এক টেবিলে আমার পরিচয় হয়। 'তোমাকে ভাই এবার পৌষমেলায় দেখেছিলাম কি?' আমি তাকে গম্ভীর হয়ে বলি যে আমি কোনোদিনও পৌষমেলায় যাইনি। তবু কালীদা মাথা নাড়েন, বার বার বলেন—'না ভাই, তোমাকে আমি দেখেছি। মহুয়া খেয়ে গাছের তলায় বসে একা গান গাইছিলে।' এবার আমার মনে হয় কালীদা বোধহয় ঠিকই বলছেন। আমরাই ভুল হচ্ছে কোথাও। একটু চুপ করে থেকে আমি গুনগুন করে গাই—'সুখে আছি, সুখে আছি সখা আপন মনে।'

কালীদাও অকস্মাৎ প্রমদার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ভ্রু ভঙ্গি করে গেয়ে ওঠেন—'জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা।'

আমি। 'কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।'

কালীদা। 'তাহারি লাগিয়ে রহিল মরম বেদনা।'

যতটা মনে পড়ে সেদিন আমরা একই গ্লাস থেকে পরস্পর মদ্যপান করেছিলাম।

আমার মদ ফুরিয়ে যেতে উঠে দাঁড়ালাম। সামনেই কয়েকজন পরিচিত ছেলে। কী নিয়ে তাদের মধ্যে যেন উত্তেজিত আলোচনা চলছে। একটু এগিয়ে যেতেই তারা আমায় ঘিরে ফেললো। এমন সব কথা আমায় বলতে শুরু করে যা আমার শুনতে মন্দ লাগে না। এসব শুনলে সব সময়ই আমার মনে হয় তাহলে আমারও সম্ভাবনা ছিল। একসময় তাকিয়ে দেখি আমার চারপাশের ওই বুহ্যের বাইরে কালীদা এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। সাতবছর পর হুবহু স্মৃতি থেকে চেঁচিয়ে বলি—'চিনতে পারছেন?'

কালীদা চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসেন। সেদিনের সামান্যই আজ মনে আছে। যতটুকু মনে আছে ততটুকুই কষ্ট। তবু আমি কাছে গিয়ে কালীদার হাত ধরে বলি। 'সুখে আছি, সুখে আছি সখা আপন মনে।'

কালীদা। 'সুখে থাকো, সুখে থাকো—আমি যাই, আমি যাই।'

আমি। 'গেল নিশি, স্বপন ফুরালো, মিছে আর কেন বলো।'

এবার কালীদা চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞেস করেন—'কি ভাই, পরীক্ষায় পাশ করছি তো?' আর আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। হাউ হাউ করে আমি কাঁদতে শুরু করি, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলি—'আমি তো কোনোদিন পরীক্ষায় পাশ করিনি, আমি তোমায় কী বলবো?' কান্না আমার কিছুতেই থামতে চায় না। চোখ গাল বেয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ে। আর ওই চোখের জলের মধ্য দিয়ে আমি দেখি—দরদালান, মন্দির, পদ্মদীঘি, আমার মা-বাবা ভাই বোন—আমার বন্ধুবান্ধব, পরিজন, সকলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আগের জন্মের বাড়ি দূর থেকে আরও দূরে সরে যেতে যেতে একেবারে মিলিয়ে গেল—

প্রেসিডেন্ট আনবেন শান্তি ফসলের ঐশ্বর্য

রাত ১টার সময় রিকশা করে নিজের আস্তানায় ফিরে আসি। রিকশাঅলাকে পথ বলে দিতে কোনো কষ্ট হয় না। নেশায় খালি মাথা ঝিমঝিম করে। খাবার নিশ্চয়ই ঢাকা দেয়া আছে। কোনোরকমে দুটো মুখে গুঁজে পাতা বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়া।

আঃ—এক ঘুমে যদি ভোর হয়—যদি হয়!

দরজা ভেজানো ছিল। সামান্য ধাক্কা দিতে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকতেই মনে হয় এ ঘরের দেওয়াল এক অদ্ভুত কারুকার্য করা। ছাদ থেকে শুধু একটা নীল ডুম ঝুলছে। তারই চাপা আলো এক রহস্যকে যেন কঠিন মায়ায় ধরে রেখেছে। ঘরের কোণে একটা টেবিল। সেই টেবিলের উপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কে?

অদ্ভুত এক তীব্র গন্ধ ঘরের বাতাসে ঘুরে বেড়ায়—স্তরে স্তরে অস্বাভাবিক জমাট এক নিস্তব্ধতা—উত্তেজনায় দেহের শিরা উপশিরা শির শির করে—পায়ের পাতা দুটো যেন অসাড় হয়ে আসে—কোনোক্রমে দরজার পাল্লাটা চেপে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াই—পাল্লার কব্জায় ক্ষীণ শব্দ হয় একটা—ধীরে ধীরে ডঃ ওয়াং চোখ খুলে তাকান—হাতে তার অদ্ভুত ধরনের লম্বা একটি পাইপ—গায়ে হলুদ রংয়ের রেশমী আলখাল্লা—চোখে ক্ষুধিত হায়নার হিংস্র দৃষ্টি—নীলাভ আলোর ম্রিয়মান রশ্মি ডঃ ওয়াং-এর কুৎসিত মুখখানাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে—তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গের সুরে ওয়াং-এর কুৎসিত মুখখানাকে আরও বীভৎস তুলেছে—তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে ওয়াং-এর খনখনে গলা বেজে ওঠে—'হায়রে মুর্খের দল—জীবনের শেষদিন ঘনিয়ে এলেই নিশির ডাকের অভিজ্ঞতা হয়—এই দ্যাখ—' পট করে আলো নিভে যায়—নেমে আসে নিকষ কালো অন্ধকার—অন্ধকারেই দেওয়াল জোড়া এক পর্দায় ভেসে ওঠে সব—ঘোষকের কণ্ঠস্বর গমগম করে—দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই বিশাল এক জনসমুদ্র—যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখা যায় মানুষের কালো মাথা—গাড়ির পর গাড়িতে আজ সব রাস্তা আটকে গেছে—শহরের পাশেই আজ উদ্বোধন করা হচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি—উদ্বোধন করবেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট—সমস্ত রাস্তাই আজ ওইদিকে—কিছুক্ষণ আগেই হেলিকপ্টারে করে প্রেসিডেন্ট এসে ঘাঁটিতে নেমেছেন—আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই তিনি মঞ্চে উঠে আসবেন—মঞ্চের ডানদিকে রয়েছে সুইচবোর্ড—মঞ্চ থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাঁ দিকে রয়েছে উৎক্ষেপ মঞ্চ—উৎক্ষেপ মঞ্চের উপরেই স্টিলের ফ্রেমে তৈরি তিনশো ফুট উঁচু বিশাল এক নগ্ন নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে—এখান থেকে নারীমূর্তিটির দু'পায়ের ফাঁকে ক্ষেপনাস্ত্রের মাথাটি দেখা যায়—জনতার মধ্যে রয়েছে চমৎকার এক উৎসবের মেজাজ—নানা রংয়ের পোষাকে সজ্জিত হয়ে এসেছে সকলে—বাঁশের তৈরি ছোটো ছোটো ক্ষেপণাস্ত্র মডেল বিক্রি হচ্ছে—দর্শকরা সেগুলি কিনে উঁচু করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে—

শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই সমবেত জনতার করতালি ধ্বনি—প্রেসিডেন্ট এবার মঞ্চে উঠে এসেছেন—হাত নেড়ে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন—জনতার উচ্ছ্বাস সব বাধা ভেঙে ফেটে চাইছে—উল্লাসে তারা হাত নেড়ে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাচ্ছে—নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে শেষবারের মতো পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে সব—উৎক্ষেপ মঞ্চের অদূরে দাঁড়ানো রেডার ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবিধি নির্ণয় করবে—প্রেসিডেন্ট সুইচ বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন—দর্শকরা চোখে দূরবীন তুলে ধরছে—আলোর সংকেত জ্বলে উঠলো—প্রেসিডেন্ট বোতাম টিপে দিলেন—প্রচণ্ড গর্জনে ইঞ্জিনের তলা থেকে ঝলসে উঠলো আগুনের তীব্র লকলকে শিখা—প্রায়

পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠলো—ছড়িয়ে গেল—পলকের মধ্যে ধোঁয়ার আবরণ ছিন্ন করে—নারীমূর্তিটির উরু যোনি ভেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র উঠে যায় আকাশে—ঠোঁটের কাছে লাল আলোয় জ্বলে ওঠে—

WISH YOU GOOD LUCK

দৃশ্য বদলে যায়—

অভিজাত একটি হোটেল—বিশাল বলরুমে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের ভিড়—তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্টকে—হাতে তার পানপাত্র—আশেপাশে বিকিনি পরিহিতা সুন্দরীদের ভিড়—মাইক্রোফোন হাতে সাংবাদিকেরা একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন—খ্যাচ খ্যাচ—ক্যামেরার ফ্লাশ বাল্ব জ্বলে উঠছে—টেলিভিশন ক্যামেরা তাক করে আছে প্রেসিডেন্টের মুখের দিকে—ঠিক ১২ গজ দূরেই এক ব্যক্তি সর্বদা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে—পরণে রেনকোট—হাতে কালো রংয়ের সুটকেস—একজোড়া সবুজ চোখ জ্বলে আর নেভে—সর্তক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখে—এক সাংবাদিকের হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে প্রেসিডেন্ট বলতে থাকেন—'যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ মানুষের হাতে আসছে তাকে কাজে লাগাতে হবে'—পরমুহূর্তে আরেকজন তার মাইক্রোফোনটি এগিয়ে দিতে প্রেসিডেন্ট মৃদু হেসে বলেন—'আমাদের এই কর্মসূচী পৃথিবীতে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে সহায়তা করবে'—সমস্ত কক্ষজুড়ে করতালির আওয়াজ সশব্দে ফেটে পড়ে—প্রেসিডেন্ট দুই সুন্দরীর কাঁধে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়ান—পর্দায় ক্রমশ প্রেসিডেন্টের শরীর আরও কাছে আসতে থাকে—দ্রুত কাছে আসে—শেষ পর্যন্ত বিশাল পর্দা জুড়ে জেগে থাকে প্রেসিডেন্টের ভারী কাঁধ—বিসদৃশ কামানো ঘাড়—ঘাড়ের উপর ছোট্ট কালো একটি তিল—

নীল আলো জ্বলে ওঠে—

পর্দাজোড়া ওই আবছা শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন ডঃ ওয়াং—ঘাড়ের কাছে ছোট্ট কালো তিলটি তখনও নজরে আসে—সেদিকেই তিনি ক্রমাগত আঙুল তুলে দেখান আমাকে—আর নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠতে থাকে তার বীভৎস মুখ—

উপসংহার

পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এই তিলটি গোলাপ কাঁটার মতোই ছোট্ট কালো একটি বিষাক্ত তীর। এই তীরের ডগায় এমন বিষ মাখানো থাকে যা গায়ে বিঁধলেও বিন্দুমাত্র অনুভূতির সঞ্চার করে না। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা তীরের ফলায় এই বিষ মাখিয়ে হাতি শিকার করতো। হাতিটা চলে ফিরে বেড়াতো, কিছুই সে টের পেতো না। কিছুদন পর তীব্র জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সে ওই তীরের অস্তিত্ব অনুভব করতো, তখন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। তারপর পচা মাংসের গন্ধে সকলে গিয়ে হাজির হতো সেখানে। মানুষের শরীরেও এই বিষের ক্রিয়া একই প্রকার। হয়তো আমাদের কারোর ঘাড়ের কাছে বিঁধে আছে গোলাপ কাঁটার মতো ছোট্ট ওই তীর। অথচ কেউই কিছু বুঝতে পারছি না। আমি স্নান করি, সে রান্না করে, কেউ পাইখানায় যায়, অমুকে ছেলেকে আদর করে, চলে ফিরে বেড়ায়। কিন্তু কেউই কিছু টের পায় না।

অকস্মাৎ লাল ভেলভেটের পর্দার আড়ালে দীর্ণ অস্ফুট চিৎকার—

সঙ্গে সঙ্গে ১৮ লক্ষ টাকায় তৈরি বাড়ি আটদিনে ধসে পড়ে—

তীক্ষ্ণ একটি বাঁশির শব্দ—

পরক্ষণেই কাঁটাতার দেয়া এলাকায় কমান্ডোরা ঢুকে পড়ে—শিবতলা অট্টালিকা দখল করে নেয় মরশুমি ভিখিরির দল—

তীব্র মিষ্ট গন্ধের ঝলক এক—

দেখা যায় বিশাল টাওয়ারের উপর রেডার প্রেতলোকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে—নাইট ক্লাবের প্রবেশ পথে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন—গাড়ির ছাদ থেকে উড়ে এসে পড়ে ব্যাঙ্কনোট—আমাদের আগের জন্মের বাড়ির ঝুল বারান্দা থেকে কেউ চেঁচিয়ে ওঠে—ওলা ওলা হেল্লা সেল্লা—বিরাট মদ্যাধার ফেটে ড্রেনের মধ্যেই প্রবাহিত হয়ে যায় মদের স্রোত—

ঘাড়ের কাছে শুধু একটা চিনচিনে জ্বালা—

ক্ষণিকের জন্য প্রেসিডেন্টের ঠোঁটের পাশটা ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—

কিট কিট ক্রীক ক্রীক

পরমুহূর্তেই সুন্দরীর কাঁধে বামহাত আর ডানহাতে পানপাত্র ধরে চিরকালের জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট অপূর্ব এক ফ্রিজ শটের মতোই স্থির হয়ে যান—

নমস্কার!

প্রদীপ চৌধুরী

গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হলো

শিশুর অপরিণত রক্ত
পাথরের ওপর ফুসফুস বিশৃঙ্খলা
মানুষের রুগ্ন নীল জেগে ওঠা, জেগে ওঠে
প্রতিটি গাড়ির হর্ন, সুখের বীজাণু, হ্যা
প্রেম শুক্রবীজ শহর নিজে আমাকে পাহারা
দেবার জন্য ছেঁড়া পাজামা আকাশ
থেকে নেমে আসে হাফপ্যান্ট রঙিন মিছিল
যৌনধাক্কার শব্দ বাবা জেগে আছো
ঠান্ডা মদ খেতে খেতেও পাগল হবার
ঝুঁকি নিয়ে শুতে হয় এখানে মেয়েরা
একহাত এদিকে রেখে আরেক হাত
ঘাতকের লোমশ পৃথিবীতে চালান করে
হায় বোন তোদের অতি-উত্তেজনা

যদি আমাকে ছুঁতে হয়, এখানেই
ছুঁতে হবে অথবা কোথাও নয় ভেবে দেখ
বিরাট হাঁ-করা মুখ নষ্ট কুঁড়েঘর, কুকুরী
উপজাতি ও চিরন্তন স্থানীয় শাসন
বিবেচনাহীনতা এক্সপ্রেস, ঘুম থেকে
এইমাত্র জেগে ওঠা গলার শব্দের ভীতি,
হিংসার নতুন স্বাধীনতা পার্কে শব্দহীন
গর্ভপাত পাগলের পুরুষবন্ধু কুমারীর
আর্তনাদ ও নিপীড়নের মধ্যে তোমার শরীরে
প্রথম আবির্ভাব।
জীবনের প্রথম সূর্যাস্ত
যে ভয়ের ভেতর টের পায় মেয়েরা পারস্পরিক
মাংসে মদ মুরগি সারাজীবন দলবদ্ধ
শরীরে জাগ্রত মাইকের গান অপেক্ষা
শিরাচালিত রক্তের নির্দেশ একদিন
গুলির আওতার মধ্যে আনে উপভোগের
কৌশল ও গল্পের অভ্যস্ত ওদের আমরা
পেশী একত্রিত করে বলি "এইভাবে হত্যা কর আমাকে"

স্প্ল্যানেড' ৭২

বন্ধু ও হস্তারক আমরা একই স্টপেজে, অদূরে
আন্তর্জাতিক স্থপতি দেখে আমাদের হাততালি
ভয়, যে হেলিকপ্টার ওকে রেখে যায়
শিশুরা অবাক, দেখে, ব্যাঙ্ক ও কারাগার
নির্মাণ কৌশল
মূত্রাগার চুনকাম, কী দারুণ ;
প্রস্রাব করা নিয়ে কাড়াকাড়ি আমাদের সমস্ত বিকেল

আমি শুধু একা নই
লুপ / শাস্তি / সহাবস্থান জানে বেশ্যামাতা
ভয়ার্ত-প্রসূতি—তবু যখন তোমার চোখের
দিকে তাকাই কেন এরকম মনে হয় আমার
মাংসেই কেন মানব প্রজন্ম মাথা নাড়ে?

সব জয় যাকে জীবনে / অফুরন্ত
রহস্য এনে দিয়েছে—স্প্ল্যানেড
এই নিয়ন আলোতেই কুমারীত্বের
হাহাকার—আমি নিখুঁত
জিহ্বা ব্যবহার করতে পারি অথচ
মানুষের পরিণতি কীভাবে ঘৃণায়
ফিরে আসা—মুক্তি, প্রভুতভক্তিতে
অবিচল থাকা কুকুরের শিরাসমর্থিত
ছাড়পত্র—কতটা হাঁ-করা পায়ু

বাসের ভিড়ের যে মেয়েটির আঁচল
আমার জুতোর স্পাইকের সঙ্গে উঠে
আসে আজ তাকে নিয়েই আমার
যাবতীয় বিকেলের আনন্দ মৃত্যু
ভাইরাস—আমরা প্রথম বাসের
চলে যাওয়া দেখি ২য় বাসের
চলে যাওয়া দেখার জন্য দাঁড়িয়ে
থাকি ময়দানের মাঝামাঝি—সে
আমাকে ওই সব এলাকায় হাত দিতে দেবে কথা দিয়েছে,

রবিউল

দশটি তারার ভিতর লুকিয়ে থাকা দশটি অলৌকিক প্লাস্টিকের বোতাম

পটকা ফোটানো হাউইবাজি আকাশে উড়িয়ে ফুলঝুরি খেলানো একটা প্রচারের মাধ্যম এই নিঃশব্দতা দিনে রাত্রি তার একটা মাপকাঠি কানের সঙ্গে সর্বদা সমতা রক্ষা করে চলেছে এই একঘেয়েমি আমার কথা তোর কথা গাড়িঘোড়া টয়লেটে আমার তোর পেচ্ছাপের আওয়াজ হঠাৎ শব্দ দিয়ে হয়তো তোর ছবি আঁকছিলাম কী কবিতার লাইন—পর্নোগ্রাফি আসলে তোর জন্মের উপক্রমণিকা

পিতামাতার
অন্ধকার ঘরের
মশারির ভিতরের
আমাদের পূর্বজন্মের একান্ত কলালকৈবল্য
মাকড়সা মাকড়সা তুই সমুদ্রে যা
জলের ভিতরে যা
জাল বোন আর জাল বোন
সেই জালে মাছ ধরো
তিমি ধরো আর জাহাজকাটা চিংড়ি মাছ ধরো
আর প্রভৃতিদেশের ডুবোজাহাজ ধরো
মা মা তুই আর আমার দিকে তাকাসনে অমন করে
তোর চোখের দিকে তাকলেই
আমি তোর যোনি দেখে ফেলি
তখনই আমি দুঃখ পাড়ায় হোঁচট খেয়ে ফিরি
মহাদেব মহাদেব তোমার কপালের তিন নম্বর চোখ দিয়ে
ভালো করে দেখে নাও
সত্যিই কী তোমার ওটা ত্রিনয়ন
নাকি তোমার কপালে আমার শিশ্নের ছাপ

হঠাৎ চমকে যায় সব লাইনগুলো জলের বর্ণহীন কালি দিয়ে ক্ষত হয়ে যায় শব্দের ভয়ে চমকে যাই ভয়ে কবিতাগুলো গল্প হয়ে যায় ভয়ে আমরা সাহসী হয়ে যাই ভয়ে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় ভয়ে আমরা কাঁপতে শুরু করি ভয়ে আমরা মেশিনগান চালাতে শিখি ভয়ে আমরা যুদ্ধ করতে শিখি ভয়ে আমরা মসজিদে যাই ভয়ে আমরা মন্দিরে যাই ভয়ে আমরা পেচ্ছাপখানায় যাই ভয়ে আমরা পায়খানায় যাই ভয়ে আমরা নামাজ পড়ি ভয়ে আমরা পুজো

করি ভয়ে আমরা পেচ্ছাপ করে ফেলি ভয়ে আমরা পায়খানা করে ফেলি তাহলে কি শালা মসজিদ মন্দির পেচ্ছাপখানা পায়খানা সব এক মনের ময়লা আর শরীরের ময়লা ময়লা সব সময় উচ্ছৃষ্ট যা আমাদের আর কাজে লাগে না ময়ূরপুচ্ছ শিল্প শিল্প আর্ট শিল্প নন্দনতত্ত্ব ময়লা ময়লা ময়লা দুর্গন্ধময় রুমাল রুমাল তুই কোথায় রুমাল তুই কোথায় আমাকে বাঁচা নাকে এসে বস তুই সবার নাকে তুই কাপড়ের ব্যবসা শুরু কর রুমাল কেন সর্বদা বর্গাকার হয় তোর চেহারা বদল কর গোলাকার ত্রিভুজাকার আয়তাকার সব আকারের হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে হয়ে তুই নিরাকার হয়ে যা আর সেই জন্যেই তোকে পকেটে আর রাখি না তোকে এখনও ব্যবহার করতে শিখিনি দুর্গন্ধে আমার বুক ফেটে যায় নামের ফুটোতে স্লুইস গেট বসিয়েও লাভ নেই সব দুর্গন্ধ আমার নাকে এসে জমা হয় বেলীহাস্নাহেনাগোলাপরজনীগন্ধাতে এত দুর্গন্ধ এত দুর্গন্ধ এত দুর্গন্ধ পথের পাশের ডাস্টবিনকে কবিতার মতো মনে হয় পথের পাশের ডাস্টবিনকে মসজিদের মতো মনে হয় পথের পাশের ডাস্টবিনকে মন্দিরের মতো মনে হয় এত দুর্গন্ধ এত দুর্গন্ধ দুর্গন্ধে আমার বুক ফেটে যায় দুর্গন্ধে আমার বুক ফেটে যায় আমার বুক ফেটে যায়।

আবার সেই শব্দ একঘেয়ে শব্দে যখন কানের পর্দাতে শ্যাওলা জমাতে আরম্ভ করে তখন গতানুগতক শব্দ থেকে একমাত্র পরিত্রাণের উপায়ই তার চেয়ে জোরের শব্দগুষ্টির পটকাবোমা উৎসব হয়ে ওঠে শব্দ তখন উৎসবের প্রকাশভঙ্গিমা হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে জেটের শব্দে সেতার বেজে ওঠে সেতারসরোদ উড়োজাহাজ হয়ে আকাশের গলায় গান গেয়ে ওঠে সারা শহরকে শব্দে ভরিয়ে তোলে তারপর নিথর একা নিশ্চুপ লাইটপোস্ট নিশ্চুপরাত রাস্তা ঘাট অলিগলি সূর্য পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে বাড়িতে বাড়িতে অন্ধকারে যৌনসঙ্গমের মীড়মূর্চ্ছনা দীর্ঘশ্বাস শীৎকার ধ্বনি প্রৌঢ়প্রৌঢ়ার তরুণতরুণীর যৌবনকেন্দ্রিক হা হতাশ একাকীত্বের বড়াই নিঃসঙ্গ দেহ তার ভিতর দিয়ে একটা জেট উড়ে যায় শব্দ করে সবাই কেঁপে ওঠে জেগে ওঠে ফিরে ওপাশ হই দাঁড়িয়ে যাই পৃথিবীর উপর বাদুড়ঝোলাঝুলি মাথা শূন্যে ঝোলে পা পৃথিবীর গায়ে আটকানো যেন ছাদে টিকটিকি পিঁপড়ে অনায়াস হেঁটে বেড়াই আমিতুমিসে তবুও ভেবে অবাক হই কেমন কার ছাদে টিকটিকি ঘোরে ফেরে আমরাও যে একধরণের টিকটিকি আরশোলার জাত আমাদের চেয়ে আরও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার কোনো জীব থাকলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে এক ধরণের টিকটিকির জাত বলত

*

পৃথিবীর মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে তার চেহারা বদলের জন্য একরকম কীরকম হাজার বছর ধরে স্থির ঘোরা আর ঘোরা তাই একটু আড়মোড়া পাহাড়ের মাথা থেকে মুকুট খসে যেয়ে নীচে গড়ায় নদীর পথ অন্যদিকে মুখ ফেরায় তবু কী মসৃণ গোলাকার মানচিত্র টেবিলে উপর ফুটবলের ভিতর দিয়ে শিক চলে গেছে এফোঁড় ওফোঁড় আসলে তো অমন নয় পৃথিবী থেকে জলগুলো ঝরিয়ে দিলে বাদুড়ে খাওয়া পেয়ারার মতো পৃথিবীর চেহারা হয়ে যাবে

হিমালয়ের এভারেস্টকে পেয়ারার বোঁটা আর সমুদ্রের জায়গাতে হবে থকথকে ক্ষত আসলে জল এক পৃথিবীর প্রসাধন যাবতীয় দুর্বলতাকে ঢেকে দিয়ে পৃথিবীর কোলে কোলে জলশিশু খেলা করে পৃথিবীর শরীরে শরীরে জলপোষাক ঘিরে রাখে তবু আমি এইখানে দাঁড়িয়ে পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি বুকের ব্যাস নিয়ে এক সুড়ঙ্গ হোক পৃথিবীর আট হাজার মাইলের বুকে এফোঁড় ওফোঁড় হোক আমার চোখের ছিদ্র দিয়ে পথের সুতো গলিয়ে দেওয়া হোক সুঁইয়ের মতো আমি ডুব দিয়ে পৃথিবীকে ভেদ করে চলে যাই ওই পায়ের আট হাজার মাইলের প্রারম্ভে স্বপ্নের বিবরে সাপের চামড়ার ভিতরে রক্তের টেলিগ্রাফি তারের ভিতরে শব্দের তীরধনুর প্রথম বিন্দুতে

সেখানকার নগরের সবচয়ে বাড়িটির সবচেয়ে প্রথমা বিছানো ইটটির ভিতরে নিমেষে অন্ধকারে ইনজেকশন সূর্যের গায়ে হুল ফুঁটিয়ে দিলো চারিদিকে বসন্তের প্রকোপ কলেরা মহামারী রোগ প্রতিষেধক সূর্যের যাতে ওলাউঠা না হয়

*

আবে বাঞ্চোৎ তারায় তারায় বিলিয়ার্ড খেলিস
নিরাকার আকাশের টেবিলে
জানিস আমার বুকের ভিতর কবর আর শ্মশানের ছড়াছড়ি
ইচ্ছে করলে তোর সাধের অমানিশিকে
গলার ভিতর আঙ্গুল দিয়ে বমি করে
ভাসিয়ে দিতে পারিস
তখন প্রখর আলো
বারান্দার বিকেলের গোধূলি
ঘরের ভিতরে সন্ধা ছয়টার মতো অন্ধকারের চেহারা
আর ঘরের কোণায় কোণায়
রাত বারোটার অন্ধকার থরে থরে সাজানো
অথচ বাইরে কী প্রখর আলো
তেমনি চোখ তোর শরীরের দুটোমাত্র জানালা
তুই যদি মস্ত এক পাঁচতলা অট্টালিকা হোস
শহরের উপকণ্ঠে
শুধু দেখবি চেয়ে চেয়ে
রাত পোনেতিনটের অন্ধকার বুকের ভিতরে পুষে
দেখিস
তুই কী অসহায়
তোর কিছুই করার নেই
অথচ বাইরে কী প্রখর আলো

তোর খুব ভাগ্য ভালো কবিতাগুলো টাকিমাছের মতো
পিছলিয়ে যায় রাজনীতির ভিতর দিয়ে দেশের
শাসকগোষ্ঠীর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে
তাই তোর এত গর্ব
তোর খুব ভাগ্য ভালো কবিতার কোনো স্কুল নেই মাস্টার দিয়ে
শেখানো হয় না
তাই তোর এত গর্ব
শুধু তোর মৃত্যুর পর তোর মাংস আর হাড় নিয়ে
অধ্যাপকরা বাবুর্চি হয়ে তার শিক্ষানবিশদের জন্যে
সুপেয় সুখাদ্য প্রস্তুত করে আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিশেষ করে সাহিত্যবিভাগ পুরাতন রান্না শেখা ভান
করার স্কুল ছাড়া আর কিছু নয়

তাই তোর এত গর্ব

সবচেয়ে মজা যখন তুই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ হয়ে ওইসব লেখা লিখছিলি যখন তোর বলা জানাশোনাবোঝার তোকে ভালোবাসার কেউ ছিল না অথচ তোর অনুপস্থিতিতে এখন তোর কাব্যি কেনার কী ভিড় জন্মদিনের উপহার ড্রইংরুমের শোকেসে মেয়েদের বিছানার পাশে তাদের বুকের ভিতরে তোর কাব্যির নিরুত্তাপ প্রকোষ্ঠ তোকে নিয়ে চায়ের টেবিলে বৈশাখী সাইক্লোন তোকে নিয়ে বুদ্ধিজীবী নামক শুয়োরের বাচ্চাদের কী পঞ্চাশটাকা দরের প্রবন্ধ লেখার পরাণফাটানো দরদ সেমিনার কনফারেন্স

তাই তোর এত গর্ব
তাই বলছিলাম ইচ্ছে করলে গলার ভিতর আঙুল
দিমে গর্বের মতো বমি করে ভাসিয়ে দিতে পারিস তোর
সাধের অমানিশিকে
তারচেয়ে রাজনীতি কর
দেখা না বিগতযৌবনা মাসিক ঋতুবন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলারা কী সুন্দর দেশে
দেশে মন্ত্রীত্ব
করছে

*

তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম রিকশার ঘন্টার ভিতর ঢুকে যেয়ে দেখলাম তার ঘন্টার শব্দগুলো আসলে রিকশাওয়ালার মুখের ভাষা মটর গাড়ির হেডলাইটের ভিতর যেয়ে দেখলাম সেটা ড্রাইভারের চোখের ভিতরের আলো আমি তাই বিরক্ত হয়ে অন্ধকারের পথে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম দেখি আকাশের তারারা উপরে মনে হলো প্লেনে চড়ে যাচ্ছি একটু পরেই এক বিরাট শহরে আমি শুদ্ধু আমাদের প্লেনটি অবতরণ কবরে তাই কী যেন প্রথমে খেঁজুর পাতার চরকি তারপর কাগজের তারপর টিনের চরকি হয়ে যেটা সিলিংফ্যান হয়ে প্রপেলার হয়ে উড়োজাহাজ হয়ে চিলের মতো উড়ে গেল চাঁদের দিকে তাকালেই টিভিতে দেখা মার্কিনী চন্দ্র অবতরণের দৃশ্যের কথা মনে হয় পৃথিবীর লিঙ্গসদৃশ্য রকেট দিয়ে চাঁদকে ধর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু কারো স্তনে হাত দিয়ে জোছনারাতের চাঁদের দিকে তাকালে বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই বলে মনে হয় আসলে বিজ্ঞানসাহেব আমাদের অনুভূতিকে দিন দিন এত বিপজ্জনকভাবে ক্ষুরধার করে দিচ্ছে যে ওই অনুভূতি নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে কবে যে...

*

আমার ঘরে দুটো পাখির খাঁচা একটাতে একটা ডানাওয়ালা সাপ আরেকটাতে এক ডানাওয়ালা মাছপাখি থাকে আর গোয়ালঘরে গরুর মতো উটপাখি থাকে দেয়ালে এক কালো রং-এর ডায়ালহীন কাঁটাহীন এক টিক্‌টিক্ শব্দসর্বস্ব ঘড়ি ঝুলানো থাকে দেখে মনে হবে গোল এক চ্যাপটা আগামীকালের মুদ্রা ঝুলানো দেয়ালে

* যেসব পুরুষদের যৌন সম্পর্কের সময় মেয়েদের চরম মুহূর্তের আগে ভাগেই বীর্যস্খলন হয়ে যায় সেই সব পুরুষরা বউদের দেখে ভয় পায়

* যোনি চিরে যখন শিশু জন্ম নেয় তখন মায়েদেরই নতুন.করে জন্ম হয়

* দেহ এবং দেহগত স্পর্শ ছাড়া কারো কিছু দেয়ার নেই মন কাউকে দেয়া অসম্ভব

* হৃদয়ে আসলে কোনো জায়গা নেই হৃদয় সর্বদা হৃদয় যকৃত ফুসফুস ইত্যাদি দিয়ে বোঝাই করা একজনের বিছানার পাশ ছাড়া প্রকৃত কোনো জায়গা খালি নেই

* যাবতীয় সমাজ স্বীকৃত যৌনসম্পর্কই আত্মীয়তার মূল কাঠামো একবার হোটেলে সব আত্মীয় মিলে রাতে একসঙ্গে খাচ্ছিলাম দেখে অবাক হলাম প্রায় বয়স্কবয়স্কা মেয়ে পুরুষ সবারই সবার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক আছে এবং এরা বড্ড অদ্ভুত জীব কারো বিবাহ জন্মদিন দুর্ঘটনা হাসপাতাল মৃত্যুর সময়ছাড়া এদের দেখা পাওয়া ভার

* যৌন সম্পর্কের সময় বউ প্রিয়া রক্ষিতা বেশ্যা সবার সঙ্গে একইরকম কথা ভাবভঙ্গী প্রকাশ পায়

* আয়োজিত বিবাহ সর্বদা ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর প্রচলিত

* যৌনযন্ত্র এবং যৌন সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত অক্ষর পরিচয় বয়স্কশিক্ষাকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করবে

* ছোটোবেলায় দেখা যে কোনো পুরানো হিন্দি সিনেমার গান শুনলেই আমার প্রথম শ্রেণীর রবীন্দ্রসংগীতের চেয়েও ভালো মনে হয় কে যেন সাঁড়াশী দিয়ে সেই দিনগুলোর জমে যাওয়া বরফের টুকরো দিয়ে ভীষণ গরমের দিনে আমাকে লেবুর সরবত খাওয়াচ্ছে মনে হয়

*

এইসব ছাড়াও আমার বারবার মনে হয় ওই গত নয় মাসের আসল সৈনিক ছিল প্রাণভয়ে পালানো এক কোটি স্মরণার্থীরা আর খামাখা মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ হারিয়েছে ওদেরকে এখন কেউ মনে মনের না সবাই ভুলে গেছে যেন ওই নয় মাসে আমরা কেমন জমজমাট একে অন্যের দুঃখের ভাগী ছিলাম এখন সে প্রাণের সম্পর্ক নেই আমরা এখন কেউ কাউকে চিনতে পারি না আসলেই স্বাধীনতা ভয়ংকর রকমের ভয়ের ব্যাপার একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদেরাও তাই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল হয়তো হঠাৎ গুলি লেগে মারা গেছে এখন শহীদ বরকতসালাম বলে গলা ফাটাই কেউ কি ইচ্ছে করে বুক পেতে মরে কিন্তু আমি কেমন করে বেঁচে গেলাম পুলিশের গুলি থেকে ওই নয়মাসের জমানো মৃত্যুর মেঘের ঝরানো বৃষ্টি থেকে তাই আমি সেই পঁচিশ বছর ধরে চাকুরি করা পিয়নদেবতার কথা মনে করি যে তার বিদেশে থাকা ছেলের টেলিগ্রামে মৃত্যু সংবাদ নিয়ে নিজের বাড়িতে কড়া নেড়ে অভ্যাসবশত চেঁচিয়ে বলেছিল এই যে ভাই বাড়িতে কেউ আছেন টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম

আমিও কবে হয়তো অলক্ষ্যে নিজের বাড়িতে কড়া নেড়ে নিজের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে ওইরকম টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম...

এবং

একমাত্র ভীষণ ক্ষুধার্ত হলেই আমি উপলব্ধি করি আমি আমার থেকে সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত

রবিউল বাংলাদেশের একজন প্রধান বিপ্লবী লেখক। বর্তমান সভ্যতা ও সমাজের বাহুবিস্তারকে সে 'না' বলে সাড়া দেয়। সারা পৃথিবীতে আমাদের যাদের আর পাভল্‌ভের কুকুরের মতো জিভ দিয়ে লালা ঝরে না রবিউল নিঃসন্দেহে তাদেরই একজন। যেমন এদেশে তেমনি ওদেশেও প্রতিষ্ঠিত ভৃত্যেরা বলে এসকল হলো গিয়ে কিনা বিদেশের নকল করা লেখা, এইসব মুর্খরা যেসব বিদেশি সাহিত্য আন্দোলনের নাম মুখস্থ করে পেট চালায়, সেগুলিই আবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করে যায়, যে কোনো নতুন সৃষ্টি তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়—আমরা জানি প্রভুরা যখন ঘুমায় তাদের কুকুরেরা তখন জেগে থাকে।—রবিউলের রচনা আক্রান্তের আর্তনাদ ও ক্রোধ।

শৈলেশ্বর ঘোষ

৩০২ আই. পি. সি

সুবো আচার্য কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে লেখে "কমলকুমার মজুমদারের লেখা পড়বার পর পুনরায় ওই লেখা পড়তে ভয় হয়—বিষম মায়াময় অদ্ভুত ভাষা, যার পরতে পরতে কবিত্ব লুকানো, গম্ভীর মেঘের মতো রহস্যময়, কিন্তু কমলবাবুর লেখা পড়ে জীবন সম্পর্কে আমার কোনো নূতন অভিজ্ঞতা হয় না—কোনো স্তিমিত কল্পনা এক ধাক্কায় বিস্ফারিত ফাটে না—কমলবাবুকে একজন পুরানোকালের সত্যবাদী ও ধার্মিক বলে মনে হয়, স্বভাবতই আমাদের জ্বালাভরা আত্মীয়তার কোনো ছাপ থাকতে পারে না।" কমলকুমারের রচনার বিরুদ্ধে সুবো কিছুই বলে না, তেমনি তার পক্ষেও সুবোর কিছুই বলার নেই, কমলবাবুর শিল্পরচনা, তার ভাষা সমেত সুবোর অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে পারেনি বলেই সুবো অতি সহজেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। যেভাবে মানিকবাবুকে পাশ কাটানো যায় না, যায় না জীবনানন্দ দাশকে—এঁদের রচনার সঙ্গে ভাষার প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়—বের করতে হয় নিজেকে রক্ষা করার পথ—কিন্তু কমলবাবুর ভাষা থেকে আমার সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে তা কখনই মনে হয় না, তাঁর ভাষা, সে এক অতি মূল্যবান কারুকাজ (শোলার দুর্গা প্রতিমা?) কখনো ভালো লাগে কিন্তু কাজে লাগে না। কিছুদন আগে কমলবাবু লিখিত প্রায় আধুনিক মতামত এখানে উল্লেখ করা যাক, "গদ্যে আমরা অত্যন্ত সরল, খুকু গদ্য ও সাহিত্য যাহা ইদানীং চলিত, তাহা বাংলা নয়, প্রতিদিন এক এক শব্দ ব্যবহারের ধ্বস্ত হয়, সেই সেই শব্দকে বাঁচানইতে আমাদের পবিত্র উচ্চশ্রেণীগত বংশধারা ও মর্যাদা অনুযায়ী চেষ্টা করিব—আমরা যারা লিখি বলিয়া অভিমান করি তাহাদের কর্তব্য—অনেক বিদেশি লোকতে বলে, এটাক—ভাষাকে যে আক্রমণ করে সে-ই ভাষাকে বাঁচায়।" কমলবাবুকে খাঁটি বাঙালি বিশ্বাসের প্রতীক ধরে নিয়ে যাঁরা যে কোনো পশ্চিমা ভাবধারার গুষ্টি উদ্ধার করেন, জানি না, কমলবাবুর এই উক্তি কতটা তাঁদের মান রক্ষা করে—বা তাঁর সম্পর্কে যাঁরা মনে করেন যে বাংলায় আজকাল কালাপাহাড়দের যে পাপকর্ম চলছে, তিনি তার ঋণশোধ করে চলেছেন, এসব ব্যক্তি ভেদে বিশ্বাস ও আশ্রয়, এতে আমাদের কিছু যায় আসে না, এসব মতমতে আপত্তি জানানো অর্থহীন। আমরা কমলাবাবুকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই এজন্যই যে আমরা জীবনানন্দ, মানিক এবং আরও কোনো কোনো স্রষ্টার কাজ থেকে যেটুকু শিখেছি, কমলবাবুর লেখা পড়লে আমাদের সেই সব চিন্তা ও শিক্ষা কোনোভাবেই টলে না, তাহলে কমলবাবু কি আমাদের সেই সব চিন্তা ও শিক্ষা কোনোভাবেই টলে না, তাহলে কমলবাবু কি আমাদের কেউ নন? আমাদের উত্তর—না। আমরা এই উত্তর-ই পেয়েছি। **তাঁর অন্তর ভক্তিপূর্ণ, তিনি শিল্পী—আমাদের অন্তরে কাজ করছে সন্ত্রাস, আমরা শিল্পকে ধ্বংস করেছি। কিন্তু কেন ধ্বংস করেছি, তাই বলবো।**

আজও পর্যন্ত যাঁরা কেবলমাত্র কমলবাবুর পাঠক হিসাবেই থেকে যেতে চান তাঁরাও দেখা যায় কমলবাবুর ভাষা-পাঠে পাঠকের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। একথা ঠিক যে কোনো নূতন ভাষাই পাঠককে, তার অভ্যাসকে বিচলিত করে, বিশেষ করে ১৯ শতকের পর থেকে। দৈনন্দিন ব্যবহারে যে ভাষা শুধু নষ্ট হয় তাই নয়, ভাষা সমাজগত ভাবসংযোগের একমাত্র মাধ্যম বলে তাকে নির্বিচারে ব্যবহার করে চলেছে নষ্ট পচা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের হীন, জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বাংলা খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে, সংবাদগুলি লেখা হচ্ছে কী চমৎকার ভাষায় মাঠে ঘাটে বক্তৃতামালা উদগীরণ হচ্ছে সাহিত্য ভাষায়, শুধুমাত্র খবরকে, ধারাবিরণীকে, সাহিত্য হিসাবে বাজার চালু করেছে মধ্যবিত্ত ষন্ডের দল। গদ্যে ও কবিতায়। বুর্জোয়া সমাজের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির শিকার হয়ে পড়ে ভাষা—সভ্যতার তাবৎ অসৎবৃত্তির প্রকাশ ঘটছে এই ভাষাতেই—শব্দগুলি ধারণ করে আছে এই ঘাতক সভ্যতার নিকৃষ্ট মূল্যবোধসমূহ। স্রষ্টা জানে এই ভাষাই তাকেও ব্যবহার করতে হবে এবং সে এও জানে ওই বহু ব্যবহৃত বিধ্বস্ত ভাষায় সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, এবং ওই ভাষায় সে মানুষের অন্তস্থলে পৌছাতে পারে না—এবং ওই ভাষায় সে মানুষের অন্তস্থলে পৌছাতে পারে না—সেই মুহূর্তেই সে সচেতন হয় ভাষার সৃষ্টি ও তার ক্রম-বির্বতন বিষয়ে। সে ওই ভাষাকেই নেবে নিজের করে এবং পুনরায় তাকে সকলের গোচরে নিয়ে আসবে। এজন্য দরকার হয় তার ওই ভাষাকে আক্রমণ করার ওই মৃত গলিত ভাষাকে পুনর্জীবন দান করতে হয় তাকে। প্রতিটি স্রষ্টাই এভাবে সৃষ্টি করে নেয় তার নিজ ভাষা, এবং প্রতিটি নূতন ভাষাই পাঠককে এক একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা দেয়। **এক একটি ভয়াবহ বিপ্লবের ফল হিসাবে দেখা দেয় এক একটি নূতন ভাষা। শব্দের আদিম জৈবতা নষ্ট করে তাকে বাজারি বেশ্যায় পরিণত করা হয়েছে। আজ এ কাজে সবচেয়ে অগ্রণী মধ্যবিত্ত ভাঁড়ের দল, যারা যেকোনো প্রকৃত সৃষ্টির উপর তাদের কলঙ্কিত বীর্য নিক্ষেপ করে তাকে ধ্বংস করতে চায়, শব্দ তারা ব্যবহার করে চলেছে তাদের কাম লালসাকে উদীপ্ত করার জন্য, ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দেবার জন্য—এই অবস্থা থেকে শব্দকে মুক্তি দিতে হলে, রক্ষা করতে হলে, কেবল ওই শব্দকে আক্রমণ করলেই নয়,—ওই শব্দকে আক্রমণ করার অর্থ তো, ওই শব্দ যাদের রক্ষিতা তাদেরই আক্রমণ করা, যা কিনা আজকের প্রচলিত সমস্ত মূল্যবোধ।** কেবল আক্রমণ করাই নয়, একে ধ্বংস করতে হবে, কারণ আক্রমণ যত বড়োই হোক তা থেকে আত্মরক্ষা করার কৌশল জানা আছে এই খুনির, তাই যতক্ষণ না ধ্বংস হয় ততক্ষণ আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। কোনো কম্প্রমাইজ করা চলে না, প্রচলিত কোনো বিশ্বাসকেই আশ্রয় করা সম্ভব হয় না—এই সচেতনতা স্রষ্টাকে সমূলে পীড়িত করে, তাকে বাধ্য করে শব্দের মূল তাৎপর্যে ফিরে যেতে। এই ফিরে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে নির্বাসিতের, বিচ্ছিন্নের গৃহ প্রত্যাবর্তন, নিজের হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করা, ভাষা তখনই এই প্রসেসের সঙ্গে আইডেন্টিফায়েড হয়ে যায়—সতর্ক প্রহরীর মতো প্রতিটি মুহূর্ত চোখ কান নাক ক্রিয়াশীল থাকে—**কোনো ফাঁক পেলে, সে পথেই ঢুকে পড়বে বেনোজল, ধ্বংস করবে জ্ঞান ও চৈতন্য, এক মধ্যবিত্ত ষাঁড়ে পরিণত করবে, যে বেঁচে থাকবে খাদ্যসংগ্রহ, সহবাসক্রিয়া ও প্রকৃতির জৈব ষড়যন্ত্রের নাটবল্টু হিসাবে।** সত্য ধরা যাবে না, মোটা চিনির কোটিংটা চেটে মিলবে বহুত মজা যা আজ দেশের অসংখ্য কবি লেখক নামধারী বাজারিদের মিলছে যে কমার্সের এরা অংশ হয়ে পড়েছে, যে বিটকেলে কামকেলির এক একটি পাত্র-পাত্রীতে এরা পরিণত হয়েছে, যে বেশ্যাখানার দ্বাররক্ষী হিসাবে এরা নিযুক্ত করেছে নিজেদের সেখান থেকে ক্রমাগত নষ্ট করে চলেছে ভাষাকে, যে জন্য এই মন্তব্য অতি

সত্য যে "আজকের ৯০ ০/০ বাংলা সাহিত্য পাবলিক ল্যাভেটারির মতো"

কমলবাবুও বলছেন এই ভাষাকে এটাক করতে হবে, আমরাও বলছি ভাষাকে এটাক করতে হবে। কেবলমাত্র ভাষাকে বাঁচাবার জন্যই ভাষাকে এটাক করতে হবে, এটা তাঁর অভিমত, ভাষা সামাজিক বস্তু, যদি কেউ এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চায়, করতে পারে, সমাজকে বাঁচাবার লোক থাকে, সভ্যতাকে বাঁচাবার লোক থাকে, আগুন লাগলে আগুন নেভানোর লোক থাকে,—আমার কাছে ও আমার বন্ধুদের কাছে ভাষাকে এভাবে বাঁচানোর কোনো অর্থ নেই, বস্তুতপক্ষে এভাবে ভাষাকে বাঁচানো যায় না, যারা সমাজকে বাঁচাতে চায় তারা আসলে সমাজকে সংস্কার করে তাকে রক্ষা করতে চায়—ভাষার ক্ষেত্রেও মূলত তাই, বিষয়কে বাদ দিয়ে ভাষাকে যারা বাঁচাতে চায় তারা আসলে রিফর্মার মাত্র, তাদের মিষ্টান্নে গেঁজলা উঠতে বেশি সময় লাগে না। কমলবাবুর বিশ্বাস আমার বিশ্বাস নয়। কমলবাবু ভাষাকে চিরাচরিতভাবে প্রয়োগ করেননি ঠিকই, কিন্তু শব্দের গদ্যরূপ পদ্যরূপ দিয়ে তাকে কবিত্বের বোঝা বইতে বাধ্য করছেন, প্রচলিত শব্দকে নষ্ট না করে তিনি ভাষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কবিত্বকে কবিতা ভুলে ব্যবহার করেছেন কিন্তু যে নিষ্ঠুর গদ্যরূপের মধ্য দিয়ে কবিতা একেবারে সত্যরূপে প্রকাশ পেতে চাইছে ও প্রকাশিত হচ্ছে, কমলবাবু তার উলটোদিকের পথিক।

কবিত্ব আমরা জানি মানুষকে পেছনের দিকে তাকাতে বলে, যা আছে, যা হয়েছে, তাকেই নানানভাবে সাজাতে বলে, তারই সূক্ষ্ম ধারাবিবরণী দিতে বলে। কমলাবাবু রোমান্টিক সত্যবাদী, ইতিহাস অর্থে সৎ—একথা বলার কারণ কমলবাবুর ঈশ্বর ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সৃষ্ট বাঙালি ঈশ্বর, তার সংসার ও মুক্তি, জন্ম ও পরজন্ম, নশ্বরদেহ ও অবিনশ্বর আত্মা সবই অতীতকালের বাঙালির ইতিহাস ; তিনি একজন প্রাচীন কবি, যিনি বাঙালির ইতিহাসের কতকগুলি বিশেষ দিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারই কাব্যরূপ দিয়েছেন, তিনি, তারই একান্ত পাঠকদের মতোই অতীত, ইতিহাসের শৃঙ্খলাকেই কি তবে তিনি সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁর রচনা এই মত সমর্থন করে, তার চেয়েও বেশি মনে করেন তাঁর উগ্র সমর্থকরা, যাঁরা বর্তমানকেও অতীতের কয়েকটি ছেঁড়া পাতার বিলম্বিত প্রক্ষেপ বলে ভাবতে ভালোবাসেন দেখা যায়।

ভাষার বিষয় অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলে কখনই আমার মনে হয় না। ভাষা বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে—বিষয় অবশ্যই স্রষ্টা নিজে, সে একটি চৈতন্যে রূপান্তরিত হলেই তখন নিজেই বিষয় হয়ে ওঠে—ভাষাকে ভাঙতে গেলে তবে বিষয়ের উপরও তখন আঘাত পড়বে, কমলবাবুর ভাষার এই বিষয় অতিরিক্ত কোনো সত্তা আছে কি, না, নেই—গোধূলি লগ্নে শূন্য প্রান্তরে "আয়, আয়" ধ্বনি সেও তো আমাদেরই মর-অভিজ্ঞতার কোনো বিশেষ অংশকে স্পর্শ করে, এবং জাগ্রত করে এমন এক অনুভূতি যাকে বিশ্বাস করা সম্ভব হয় না—যে সচেতন, ঈশ্বরহীন, তার কাছে এ মিথ্যা ধরা পড়ে, যে সংস্কার এবং অতীত তার কাছে এ হয় 'মায়া'। যা শুধুমাত্র অনুভূতি জাগায় তা আমার কাছে মিথ্যা—যা চৈতন্য জাগ্রত করে তা সত্য।

আমার কাছে ভাষাকে বাঁচানো হ'ল নিজেকে বাঁচানো—যদি কোনো চৈতন্য জাগ্রত হয়, তাকে কম্যুনিকেট করা। যে সহস্র সংশয় ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সে সত্যকে সেখানে পাবো তাকে প্রকাশ করার জন্য দরকার এমন এক ভাষা, যাকে সৃষ্টি করে নিতে হবে আমাকে। একটিকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্যটি সৃষ্টি সম্ভব নয়। কেবল সত্যকে প্রকাশই যথেষ্ট নয়, তার বিবরণ লেখা নয়, সেই ভাষা জড় মনকে আঘাত করবে, আমার ভাষার সন্ত্রাস অন্য মনের মধ্যে সক্রিয় হয়ে তাকে মুক্ত করবে, অতীত থেকে তাকে বর্তমানে নিয়ে আসবে, এই

জন্যই ধ্বস্ত ভাষাকে আক্রমণ করার কথা আমরা বলি। শিল্প, কবিত্ব এজন্যই আজ গুয়ের মতো অপ্রয়োজনীয় আমাদের কাছে, কবিত্বের মারাত্মক পরিণাম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ব্যর্থতার মধ্য দিয়েও লক্ষ করছি আমরা, সন্দীপনও রোমান্টিক, কিন্তু কমলবাবু যেভাবে বাঙালির সমস্ত হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসের সঙ্গে আইডেনটিফায়েড, সন্দীপনের মধ্যে সেরকম কোনো ব্যাপার না থাকলেও তিনি এক স্যুডো-রোমান্টিক কষ্টকে বিশ্বাস করে কোনো নূতন ভাষা আবিষ্কার করতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস রীতিতে যা এ শতাব্দীর ঘৃণ্য মধ্যবিত্তদের শেষ মূলধন। কবিত্ব আর কবিতা তার কাছেও সমার্থক। **কবিত্ব আর কবিতার দূরত্ব খুব বেশি কি? না। স্ত্রী শরীরে গুহ্যদ্বার আর যোনিদ্বারের মধ্যে যেটুকু, একটি মলত্যাগের, অন্যটি জন্মের সৃষ্টির দরজা।**

কমলবাবু আমাদের আত্মার কেউ নন। তিনি অতীত বিশ্বাস, তিনি শুধু সংস্কারগুলিই নন, কুসংস্কাগুলিও, তাঁর ঈশ্বর জীর্ণ, তাঁর ঈশ্বরের পচা শবের দুর্গন্ধ আমাদের মুগ্ধ করতে পারেনি, এটা হয়তো আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু যে শবদেহ তিনি গন্ধে, বর্ণে সাজিয়ে চলেছেন তাতে আর একটি কুসুম অর্পণ করা আমাদের মতো হতভাগ্য অবিশ্বাসীর পক্ষে অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি নিজের পূর্ণ সত্তাকে, আনন্দময় অবস্থাকে আবিষ্কার করা ছাড়া লেখার আর কোনো সার্থকতা নাই। কারণ আমাকে হয়ে উঠতে হবে—এবং হয়ে ওঠার পথে যে সমস্ত বাধা সেগুলিকে দূর করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, সংস্কার কুসংস্কার অতীতঈশ্বর সবকিছুকে সরিয়ে দিতে হবে, এগুলি আমাকে স্বস্তি দিতে পারে না, আমার মর-অভিজ্ঞতা একথা বলে, যাবতীয় ইতিহাস, সমাজ, মূল্যবোধ, রাজনীতি, ধর্ম সবকিছুকে সন্দেহ করতে, অস্বীকার করতে প্ররোচনা পাই আমি—আমি হয়ে পুনরায় ফিরতে চাই আমার আবিষ্কৃত নিজস্ব সত্যে, সৃষ্টির মূল চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনার যোগসূত্র স্থাপিত হলেই আমার উদ্ধার, আমি জানি। তাই অস্বীকারের মধ্য দিয়ে, আঘাতের মধ্য দিয়ে আমি পাবো আমার নিজস্ব চরিত্ররূপ। অনেকে এই প্ররোচনামূলক সৃষ্টিকর্মকে, এই আপাতবিধ্বংসী কাজকে বলছেন আইকনোক্ল্যাস্টিক, ঠিক, আমরা আইকনোক্ল্যাস্ট—কিন্তু আমার প্রশ্ন, রামকৃষ্ণও কি তথাকথিত হিন্দুসমাজের কাছে আইকনোক্ল্যাস্ট নন—আজকে ঘটনা হিসাবে ক্ষুদ্র হলেও সেদিনের সেই মারাত্মক কাজ তাঁকে করতে হয়েছিল, মুসলমানের হাতে তাঁকে অন্ন গ্রহণ করতে হয়েছিল, তাঁকে কেবলমাত্র ওই সংস্কারটিকে ভেঙে ফেলার জন্য, মুক্ত হবার জন্য—কারণ তাঁর চৈতন্য লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই সমস্ত সংস্কার। স্রষ্টার পথ আরও দুরূহ। তাঁকে কম্যুনিকেট করতে হবে—মৃত মন ও মস্তিষ্কে আঘাত করে ঢুকতে হবে ভাষা দিয়েই—সুতরাং যে ভাষা, হস্তারক সভ্যতার ভুল অর্থ বহন করে চলেছে, আর যে ইনহিবিশনগ্রস্ত সমাজ তাকে লালন করছে, উভয়কেই ভাঙার কথা, আক্রমণ করার কথা ভাবতে হয়। যে কেউ এ সত্য আবিষ্কার করতে চাক্ না কেন এ যুদ্ধ অনিবার্য। কারণ **যে দৃষ্টিতে আমি বস্তুকে গ্রহণ করি সমাজ ইতিহাস তা মানতে চায় না, তারাই আমাকে আক্রমণ করে এবং আমাকেই তারা আক্রমণকারী হিসাবে অভিযুক্ত করে, তারাই ভাষাকে ধ্বংস করে কিন্তু আমাকেই তারা ভাষার ধ্বংসকারী হিসাবে চিহ্নিত করে—মিথ্যা ন্যায় নীতির শোষক-শোষণ পদ্ধতিকে ওরা সত্য বলে জানে কিন্তু আমি তাকে মিথ্যা বলি, আমি যাকে সত্য বলি ওরা তাকে ধ্বংস করতে চায়। অনুভূতির রসালো পথে সুড়সুড়ি দিয়ে ওরা বেঁচে থাকে।**

আমি বুঝেছি যে ভাষা বুর্জোয়া সমাজ তৈরি করে (* ১) তাকে কেউ আক্রমণ করে নষ্ট করে দিক এটা সে সহ্য করে না। এতে সে যে কাচের দেয়ালের মধ্যে বাস করে তা ভেঙে যাবার ভয় থাকে। ভয় তাকে ক্রমাগত তাড়া করছে, ভয় আমাকেও তাড়া করে, কিন্তু সে ভয়ের

উৎসস্থল দেখার পক্ষপাতী নয়, তাতে সে আরও ভয় পায়, ভয়ের দাস হয়ে যায় এবং ক্রমে ভয়ের অস্তিত্ব ভুলে যায়, মনে করে নেয় মোটামুটি ভালোই আছে সে, প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কারগুলিকে আঁকড়ে ধরে পরম ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চায়, বেঁচে থাকার মিথ্যা ছলনা বজায় রাখতে গিয়ে জীবনের বিরুদ্ধাচারণ করতে শুরু করে (ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় সমাজেই এই বিরুদ্ধাচারণ চলছে) মানুষকে শেকলে বাঁধে এবং তাঁর প্রাণ নিতে কসুর করে না—সে ভাবতে অভ্যস্ত হয় যে এ ছাড়া আর সবই মিথ্যা, প্রতিটি নবজাতকের পায়ের নীচের মাটি সে সরিয়ে ফ্যালে ঘৃণা করতে শুরু করে জীবনকে, কতকগুলি মিথ্যা মূল্য সৃষ্টি করে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে—জীবন্তের সবচেয়ে বড়ো শত্রু সে-ই, ৪টি ঠুনকো কাচের দেয়ালের মধ্যে থেকে বাইরের জীবনকে দেখে, জীবনের নগ্ন প্রকাশ দেখে, বেঁচে থাকার স্বাধীন উল্লাস দেখে সে আঁতকে ওঠে—ও তৎক্ষণাৎ তার সহকর্মী পাপাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জীবনকে ধ্বংস করার বিরাট ষড়যন্ত্র করে—ভয় আমারও আছে কিন্তু আমি ভয়ের উৎসে যেতে চাই ও তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে চাই—এই পয়েন্টে যুদ্ধ শুরু হয় বুর্জোয়ার সঙ্গে। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যুদ্ধ, মিথ্যার সঙ্গে সত্যের যুদ্ধ।

আমি আমার অভিজ্ঞতায় বুঝি বুর্জোয়ার ভাষাকে আক্রমণ করার ফল কীভাবে হাতে নাতে পেতে হয়েছিল, আমাকে ও আমার বন্ধুদের—যে ভাষা এতদিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল তাকে বিনাপ্রলেপে চালু করে দিয়েছিলাম আমরা, যেসব চিন্তা ছিল নিষিদ্ধ তাকে প্রকাশ্য করেছিলাম—ফর্ম, যা মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার রুচিসম্মত ছিল তাকে ভেঙে দিয়েছিলাম আমরাই, লেখাকে জীবনের সমান সত্য ও জীবনেরই মতো উত্থানপতনময় করে তুলেছি আমরাই, ফলস্বরূপ বুর্জোয়ার আর্তস্বর আজও শোনা যাচ্ছে। ভাষাকে এটাক করার অর্থ আমাদের কাছে এটাই। একজন ব্রিটিশ লেখক Jeff Nuttal ১৯৬৯ সালে তার প্রকাশিত Bomb Culture গ্রন্থে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে পৃথিবীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আন্দোলন বলে স্বীকার করে বলেছেন, এ আন্দোলন Underground। উনি যা বলেননি তা হ'ল, আমাদের আন্দোলন। Underground-এ ছিল না বা এখনও নেই—কিন্তু যে সব চিন্তা>ভাষা>বিষয় ছিল Underground এ, যা গোপনে লুকিয়ে থেকে কাজ করে যাচ্ছিল প্রতিটি মানুষের মনে তাকে আমরা প্রকাশ করে দিয়েছিলাম, আজও দিচ্ছি। আমি মনে করি—

ভাষা=বিষয়=স্রষ্টা নিজে=চৈতন্য=সেই সময়ে সেই সমাজের যা কিছু গোপনীয়, নিষিদ্ধ হয়ে মানুষের দুর্ভাগ্য রচনা করে তাকে প্রকাশ্যে সংগঠিত ও সংঘটিত করা।

আমরা বুঝেছি সভ্যতা তার পাপ কর্মের ফলে যে দুর্ভাগ্যের জন্ম দেয় তাকে গোপনে লুকিয়ে রাখতে চায়, দুর্ভাগ্য যদি প্রকাশ্য সংগঠিত হতে চায় তবে তাকে গুঁড়ো করে দিতে চায়, আমি সেই গোপনীয় দুর্ভাগ্যকে প্রকাশ করে দিচ্ছি, সে দেখুক।

একমাত্র সমস্ত পৃথিবীকে শত্রু করে নিতে পারলে তাহলেও
দশবার শপথ করেও কাউকে ধ্বংস করতে পারলাম না
নিজে হয়ে গেলাম অনেকটা ধ্বংস—আমি ছাদে একা কাঁদছি না
ভালোবাসা ও সততার বদলে পৃথিবীর লাথি
চমৎকার—ভালো, খুবই ভালো, দারুণ পৃথিবী, মধুবয়, অমৃত,
পাপী ও বিশ্বাসঘাতিনীদেরও মধুময় বলে যেতে হবে নাকি?
আমি কি পাপী নাকি আমি দেবতা কি জানি কিছু একটা হবে

আবার নাও হতে পারে কিন্তু—চমৎকার!
আমি মৃত্যুর আগে শান্তি পাবো কি না জানলে লেখা ছেড়ে দেবো।

(সুবো আচার্য)

মা, তোমার গর্ভের চেয়ে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে সভ্যতা ব্লাস্টফার্নেস,
৭২ বর্গমাইল বালুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি, সময় চেতনাহীন পরস্পরের
শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে সার পদার্থ, কোনো অভিযোগ নাই, শয়তান গলা
টিপে ধরবে—আমার ১৬″, ১৬″—এই অবস্থায় আমি ভালো মানুষের
মতো বেঁচে থাকায় লিপ্ত হতে চাই, নিজেকে ঠকাতে চাই খুব,...
স্বপ্ন ডাইমেনশনে চিৎকার করতে করতে আমার গলায় রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে—
চেপে ধরেছি ফুসফুস—যা এই মাত্র চৌচির হয়ে গেল—মা, এসো
৩নং দেশি মদ ও ফিনাইলের ককটেল গিলে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে
পড়ি, তোমাকে এই অবস্থায় চালান করে দেয়াই আমার একমাত্র
প্রতিশোধ নেয়া পৃথিবীতে—কলকাতা কলকাতা—পৃথিবীতে আমার
পর জন্মের আর দরকার নাই—কোনো ইতিহাস এই লম্পটের কোনো
দাগ থাকবে না, ১০,০০০ বছর পরেও শেষ হবে না এই শতাব্দী, এর
ঝুল সরাতে সরাতে মানুষ একদিন বধির ও ক্ষমতা বিমুখ হয়ে যাবে।

(প্রদীপ চৌধুরী)

আমি গঙ্গার ধারের ছেলে
কালবোশেখীর রাতে বিদ্যুৎকে ডেকে বলেছিলুম
বিদ্যুৎ তুমি ঝলসে ওঠো—আমি তোমার নীলাভা দেখব
গঙ্গার বুকে আমি র‍্যাঁবোর চোরাই চালান বন্দুক আর
খ্রীস্টের ক্রুশ নিয়ে হেঁটে গেছি গান্ধী শতবার্ষিকীর দিন
সশস্ত্র বিপ্লবীদের মিছিলে গোমাংস খেতে খেতে করেছি হরিনাম
এখন মাথায় নেশা নেই দিবাস্বপ্ন নেই দুঃস্বপ্ন নেই—
দাঁড়িয়ে আছি চার্মিনার টানার উৎসাহ নেই
সঙ্গমের জন্য ফিল করছি না আর্জ
কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারে বসে আছি আমি এক নির্গ্রন্থ মানুষ
তুমি এখন যাও কিনে নাও বেলফুল অথবা কবিতার বই
মাসিকের রক্তামাড়া ন্যাকড়ার লেপ্টে থাকুক আমার স্মৃতি
তুমি আমার বন্ধুর দ্বারা গর্ভবতী হতে পারো এখন আমি
হবো না প্রতিহিংসাপরায়ণ এখন আমার ভেতর প্রেম নেই
তুমি যাও আমায় দেখতে দাও
এখন মানুষের জন্ম তার পিতা মাতার যৌনকামনার
ফল ছাড়া আর কিছু কি না?

(ফালগুনী রায়)

কেন আমি হারিয়ে যাইনি আমার মায়ের যোনিবর্ত্মে
কেন আমি পিতার আত্মমৈথুনের পর তার পেচ্ছাপে বয়ে যাইনি
কেন আমি রজস্রাবে মিশে যাইনি শ্লেষ্মায়
অথচ আমার নীচে চিৎ চোখ বোজা অবস্থায়
আরাম গ্রহণকারিনী শুভাকে দেখে ভীষণ কষ্ট হয়েছে আমার
এরকম অসহায় চেহারা ফুটিয়েও নারী বিশ্বাসঘাতিনী হয়
আজ মনে হয় নারী ও শিল্পের মতো বিশ্বাসঘাতিনী কিছু নাই

(মলয় রায়চৌধুরী)

মাংসের বাজার। সারি সারি ছোটো ছোটো দোকানে ছাল ছাড়ানো টাটকা খাসি, পাঁঠার মৃতদেহ ঝুলছে। মৃত দেহগুলির গর্দান থেকে ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। তাজা রক্ত। দোকানের পৈঠার উপর স্তূপীকৃত কালো কালো মৃত জানোয়ারের মাথা। নিষ্প্রাণ চোখের দৃষ্টি। চাপ চাপ রক্ত জমে আছে। রক্তের বোঁটকা গন্ধ, জানোয়ারের গায়ের বোঁটকা গন্ধ। আমার মাথা ঘোরে। আমার বমি আসে, বমি পায়। সিঁড়ি খুঁজবার জন্য টলতে টলতে আরও এগিয়ে যাই। আরও মাংসের দোকান। একটার পর একটা। গায়ে গা লাগিয়ে। আরও ছাল ছাড়ানো জানোয়ার। ছাল ছাড়ানো বিরাট বিরাট গরু, মোষ, শুয়োর, হরিণ...এমনকি হাতি পর্যন্ত। চোখ বন্ধ করতে চাই। চোখ বন্ধ হয় না। পায়ের নীচে রক্তে ভেজা পথ পিছল হয়ে ওঠে। পা পিছলে যায় বারবার: 'এইখানে হৈমন্তীর মাংস পাওয়া যায়।'—একটা দোকানের সাইনবোর্ড। আঁতকে তাকাই সেইদিকে। চামড়া ছাড়ানো একটি নারীদেহ ঝুলছে। রক্ত চুইয়ে পড়ছে লাল দগদগে শরীর থেকে। লম্বা কালো চুল রক্তে ভিজে জট পাকিয়ে গেছে। নীল শিরাগুলি বুঝি শরীর ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। তীব্র আর্তনাদ করে বসে পড়ি আমি। ডান দিয়ে আরও একটা দোকান। 'এখানে সুকুমারের মাংস পাওয়া যায়।' সামনে আরও একটা! 'এইখানে চম্পার মাংস পাওয়া যায়।' আচ্ছন্নের মতো চোখ মেলে তাকাই। দড়িতে ঝুলতে থাকা ছাল ছাড়ানো মানুষগুলি এইবার আঙুল দিয়ে চোখের উপর থেকে জমাট বাঁধা রক্ত মুছে নেয়। জিভ বার করে নিজেদের শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত চেটে খায়। তারপর সকলে একযোগে আমার দিকে তাকিয়ে খলখল করে হেসে ওঠে। সম্মিলিত কণ্ঠের সেই ভৌতিক হাসি অলৌকিক অট্টহাসি সমস্ত বাজারের দেয়ালে দেয়ালে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। আর থাকতে পারি না আমি। শরীরের সমস্ত নালী প্রণালী যেন পাক দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে সমস্ত দোকানঘর বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। সব আলো অন্ধকার হয়ে নেমে আসে চকিতে। শেষবারের মতো সামলাতে চেষ্টা করি নিজেকে। কিন্তু পারি না। বিয়ে বাড়িতে যা খেয়েছিলাম সব গল গল করে বেরিয়ে আসতে থাকে। ওয়াক, ওয়াক শব্দ তুলে আমি বমি করে যাই। বমি করে যাই রক্তাক্ত পথের উপরে। সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো জীবনভোর খেয়ে যাওয়া যাবতীয় মাংসের টুকরো আমি বমি করে উগরে বার করতে থাকি। বমির তোড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। আমি বমি করি।

(বাসুদেব দাশগুপ্ত)

এক-একদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, কুমারী keeler, মেরী মারমেইড দেখি গড়িয়াহাট থেকে গরানহাটায়, কলেজ স্ট্রিট থেকে ক্যামাক স্ট্রিটে, হাতের কাছে, চোখের পাশে, আমার হান্নার সামনে হাজার হাজার ভার্জিনিটি—ক্ষুধা গন্ গন্ করে...ক্ষুধা এই মারাত্মক বিশৃঙ্খলা, কে না

জানি, জানি না কি, তবে সহজে স্বীকার করি না অনেকেই, কেউ কেউ আবার প্রকাশে সাহস করি না, শাক ভাত খাই, টি.বি.র ওষুধ কিনতেও প্রস্তুত থাকি বরং—পরিয়ে দিন ক্ষুধার মুখে 'লুপ'...যদিও লুপের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত উদ্বেগের কোনোই কারণ নেই এখন, still অদ্ভুত এই ঠান্ডা যুদ্ধ, জটিল খাদ্যনীতি এই, এই স্ত্রী সহবাস, অজ্ঞাত কারণে আমার বেঁচে থাকা—

(সুভাষ ঘোষ)

শব্দ মানুষের সৃষ্টি, সে আদিতে ছিল না। যা আদিতে ছিল তাকে মানুষ বিকৃত করতে পারেনি। আকাশ আজও নীল আছে, জল ও বায়ু আজও বর্ণহীন আছে। ভাষা মানুষের সৃষ্টি বলেই, তার পরিবর্তনও হয় মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে, এক এক সময়ের ভাষা এক এক সময়ের মূল্যবোধকে ধারণ করে থাকে, সেই সময় পার হয়ে গেলে পরের জেনারেশনের কাছে ভাষা শব্দ তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। **ভাষাকে তখনই আক্রমণ করতে হয়, তার শক্তিকে পুনরুদ্ধার করার জন্যই, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় যা আরও তাৎপর্যময়, ভাষাকে আক্রমণ করলে ভাষাও হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক, সে ভাষা তখনই আক্রমণ করতে ছুটে যায়, কারণ তার শক্তিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল তাকে বলে দিতে হয় না নিজেই সে চিনে নেয়।**

ভাষাকে আক্রমণের অর্থ প্রকৃত ভাষাকে আবিষ্কার করা, ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ থেকে তাকে উদ্ধার করা, অর্থাৎ সত্য আবিষ্কার করা, এছাড়া লেখার অন্য কোনো মূল্য নাই আমার কাছে—কিন্তু কমলকুমার মজুমদারের ভাষারীতি শব্দসৃষ্টি কোনো আক্রমণের ফল নয়. ফলে কিছু ধোয়াসা সৃষ্টি হয়েছে, আমাকে কোনো সত্য বুঝতে সাহায্য করে না, আমাদের বিশ্বাস স্রষ্টা যাই রচনা করুক তাকে মানুষ, মানুষের চৈতন্য পরিধিতে আঘাত করে ঢুকে পড়তে হবে সোজাসুজি, যুক্ত হতে হবে সমগ্র মানবমণ্ডলীর সঙ্গে, কেউ গবেষণা গ্রন্থ লিখবে বলে নিশ্চয়ই সে কলম হাতে তুলে নেয় না!

আগেও বলেছি আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা কমলবাবুর মতো নয়, সাররিয়ালিস্টদের মতো নয়, অস্তিত্ববাদীদের মতো নয়, মরমী বীটদের মতো নয়—সাহিত্য তাই যা মানুষের অস্তিত্বের মূল সমস্যাকে পথ দেখাবে, গৃহহারা মানুষকে ভুল পথ থেকে টেনে নিয়ে নিজ গৃহে পৌঁছে দেবে—বিচ্ছিন্ন মানুষের ক্রন্দন রোল যা কিছু শান্ত করবে তার প্রয়োজন মানুষের আছে, থাকবে—মানুষ বস্তুর অতলে ডুবে গিয়েও কোনোদিন খুঁজবে এই সত্যকে, সেদিন স্রষ্টা জানে তার সার্থকতা—এই জন্যই সে পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করে এবং যা কিছু আবিষ্কার করে তাকে কম্যুনিকেট করার জন্য এক ভাষাও আবিষ্কৃত হয়। **আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে চাই** অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, বিচ্ছিন্নতা থেকে সংযুক্তিতে, যেভাবে গৌতম বুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, যেভাবে একজন রামকৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল, মিথ্যাকে অতিক্রম করে সত্যের নিষ্ঠুর রূপে শান্ত হতে চাই, ফলে আমার কোনো বিষয় থাকে না **আমিই বিষয় হয়ে যাই**—আর এই মিথ্যা, যাকে রামকৃষ্ণ দেখেছিল, চল্লিশ বছরের বুড়ি রাঢ়, ধামা পোঁদ, পড় পড় করে হাগছে, ওই গুয়ের মতো—মিথ্যা মোহ থেকে মুক্তি অবশ্যই দরকার। নাহলে আত্মবিষ্কার সম্ভব নয়। জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছিল নিজেকে, র‍্যাঁবো আবিষ্কার করতে চেয়েছিল নিজেকে, চেয়েছিল আর্তো, চেয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (তত স্পষ্টভাবে নয়) আমি আত্মীয়তা বোধ করি এদেরই সঙ্গে। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করলেন উপনিষদকে, কমলকুমার মজুমদার রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ ও বাঙালির সংস্কারাচ্ছন্ন ঈশ্বরকে। এঁদের প্রচেষ্টা আমার কোনো

কাজে লাগে না এখানে আধুনিকতার প্রশ্ন অবান্তর, কোনো রকম আধুনিকতা আমি স্বীকার করি না। আমার কাছে সারা পৃথিবীময় সমস্ত সৃষ্টিকাজ একই সুরে বাঁধা, আত্মার বন্দিত্ব ও তার মুক্তির প্রচেষ্টা,—তার ক্রন্দন, হতাশার গর্জন ও অভিশাপ থেকে আনন্দে যাবার, এটাই একমাত্র আধুনিকতা চিরকালের—এছাড়া মানুষের অন্য কোনো ইতিহাস নাই!

এই দুরূহ পথের যে স্বল্প পথিক অধিকাংশের কাছে তারা পতিত বলে গণ্য হয়—কিন্তু পৃথিবীকে এই মুষ্টিমেয়ের পতিত হবার স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। কারণ দেখতে পাচ্ছি একদিন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই এই পথের পথিক হবে, যতই বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী ক্ষুদ্রতর মানব গোষ্ঠী দ্বারা শোষিত, নিষ্পেষিত হতে থাকবে, দলিত হতে থাকবে ততই এই গোপন দুর্ভাগ্য প্রকাশ্যে সংগঠিত হতে থাকবে। জীবন যদি আনন্দ শক্তিতে রূপান্তরিত না হয় তবে তা ধ্বংস শক্তিতে রূপান্তরিত হবেই।

আমরা আপাদমস্তক ধর্ষিত হয়ে মায়াকে মিথ্যার নামান্তর বলে বুঝেছি কোনো ধারণাকেই অবিশ্বাস সন্দেহ না করে তাকে বংশগত ধারায় প্রাপ্ত বলে 'আমার', তা মানি না, কমলবাবু লিখে গেলেন 'ফলত কোথাও মায়া রহিয়া গেল'—হাসপাতালে মৃত্যুর আগে একজন কবি এরপর লিখে যাবে, 'ফলত কোথাও বেদনা রহিয়া গেল!' কারণ বেদনার আমরা সন্তান।

---

* "প্রতিবাদের সাহিত্যে"—এই লেখাটির "শিল্প ও সত্য"—নামে দেওয়া হয়েছে।—লেখক

* ১. বুর্জোয়া অর্থে কেবলমাত্র এক বিশেষ আর্থিক শ্রেণীকে বোঝাতে চাইছি না, সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তো এই বুর্জোয়ার গুয়ের গন্ধ শুঁকে আনন্দ পায়, বুর্জোয়া তারা সবাই যারাই জীবনের গতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় মৃত্যু রুখতে চেয়ে মৃত্যুর দাস হয়ে টিকে থাকে, এবং আরও ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য জঘন্য পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, জীবনকে যাপন করে না, জীবনকে নষ্ট করে হাহ কার উপর প্রতিশোধ নেবে।

ফালগুনি রায়

আমার বাইবেল আমার রাইফেল

শরীর বিনষ্ট হ'লে ব্যাধির প্রকোপ কীভাবে সম্ভব
সাড়ে বারোটার রোদ্দুরে ভোঁ বাজলে কারো টিফিন হয়—হয় কারো
রবীন্দ্রসংগীত শোনার সময়—কালাদের রবীন্দ্রসংগীত শোনার
দরকার পড়ে না—অন্ধদের দরকার পড়ে না ব্রাকপিকাসোর ছবি দ্যাখার
কাক্রমত না মর্কটক্রম—পূর্বজন্মের সুকৃতি না বর্তমানের কর্ম—কোন
ফলে আমি সিদ্ধ হব—কে বলে দেবে—হঠ ভক্তি জ্ঞান রাজ
কোন যোগী রয়েছে কোথায়—কোথায় মন্বন্তর শেষে আবির্ভূত মনু
যাঁর জামাতা মহামুনি কর্দম নিজের স্ত্রীর বক্ষোদেশ দেখে পেতেন
যৌন আকর্ষণ এবং তিনি রেচক পূরক কুম্ভক করে কুণ্ডলিনী শক্তিকে
করতেন জাগ্রত—বীর্যমোক্ষণের পর আমার জাগ্রত লিঙ্গ নেতিয়ে পড়ে খুব
তখন ভাবাই যায় না এটা অই 'ভাবে' দাঁড়াতে পারে—মেরুদণ্ডের
ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের আত্মপ্রত্যয়—তবু মানুষ কুঁজো হয়ে যায়
শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়ে কেউ পূণ্য সঞ্চয় করে—কেউ ভাইবোনের
যৌন সঙ্গমের সংবাদ পায় ওই ধর্মগ্রন্থ পড়ে—পোয়াতীর পেট থেকে
বেরিয়ে মেয়েরা ফের পোয়াতী—লিঙ্গদ্বারে প্রকাশেন্মুখ
মানুষের ভ্রূণ—ভ্রূণ তুমি কি কথা বলতে পারো—চিন্তা ক্ষমতা
আছে কি তোমার—হায় আমি আর পাবো না ফিরে আমার
ভ্রূণের জীবন হায় আমি আর পাবো না ফিরে আমার
হারানো জীবন হায় আমি আর পাবো না ফিরে আমার
শহীদ ভায়ের জীবন হায় আমি জীবনকে ভালোবেসে ভুলে যাই
মৃতদের—মৃতদের কথা ভাবতে জীবিতদের ভুলে যাই
একটি মেয়ের প্রেম পেয়ে ভুলে যাই আরেকটি মেয়ের প্রত্যাখান
এভাবেই বড়ো হই আমি বেড়ে উঠি—আমার আঁতুড় ঘরের আয়তন
বাড়ে না একটুও—এর ফলে ম্যালখাস থিওরি না জেনেই বুঝে যাই
আমি জমি বাড়ে না মানুষ বেড়ে যায় সংখ্যায়—লুপ্ত হয়
একশৃঙ্গ গণ্ডারের দল—ম্যামথের কথা আজ মিথ হয়ে গেছে
মানুষের কথা দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন পুরাণ—
হে চন্দ্রজয়ী শুক্রকীট মানুষ—শুক্রগ্রহের দিকে চলে গেছে তোমার

নভোযান—একদিন সূর্যের দিকে চলে যাবে কম্যুনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট
দেশের যুগ্ম-উদ্যোগ আর ভারতবর্ষের মার্কসিষ্ট ও লেনিনষ্টরা
গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থেকে মেহনতী মানুষকে করে দেবে আরও
বেশি বুরজোয়া তখন চারশো টাকা মাইনে পাওয়া
জুতোর দোকানের শ্রমিক দেড়শো টাকা মাইনে পাওয়া ইস্কুলের
কেরানিকে করবে তাচ্ছিল্য ও তারপর উত্তমকুমারের আত্মজীবনীসহ
কবিতাপত্রিকা বের করে ফেলবে কবি সম্মেলন
অগণন বাঙালি কিশোরের শহীদ বেদীর পাশ দিয়ে চলে যায় কলকাতায়
মারোয়াড়ি যুবকের আলো ব্যান্ড বাজিময় বিবাহ মিছিল—আরও যাবে—
বাংলাদেশের বাঙালিদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পড়তে পড়তে
পশ্চিমবাংলার হিন্দু বাঙালিরা খুন করে ফেলবে হিন্দু বাঙালিদের—এই
মন্বন্তরের ভেতর—মনু—কোথায় তোমার আবির্ভাব—আমরা
কেবলি কি আকুতি প্রসূতি দেবাহুতির পিতা বলে জানবো তোমায়
দুর্জনের নিধন সুজনের সংরক্ষণকারী কৃষ্ণ তুমি কোথায়—আমরা
কেবলি কি বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে যাবো পর্ণোগ্রাফির বদলে—

অথবা আমরাই উত্থানশক্তি—আমরাই হবো রেনেশাঁ ও রেজারেকশন—
আমরা যারা মহাযানী বৌদ্ধদের মতো প্রজ্ঞাপারমিতা ওরেফে নিজস্ব প্রেমিকাকে
করতে চাই শয্যা ও জ্ঞান সঙ্গিনী—আমরা যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের
কার্ড করাবার জন্যে যোগাড় করতে পারি না বাস ভাড়া—আমরা যারা
সিনেমায় ছাড়া আর কোথাও সমুদ্রকে দেখিনি এখনো এবং শেলী ও হার্ট ক্রেন
সমুদ্রে ডুবে মারা গেছিলেন জানবার পরেও আমরা যারা
সমুদ্রকে নিয়ে কবিতা লিখি—আমরা যারা মৃত্যুকে মৃত্যু না ভেবে
মনে করি ওটা জন্মান্তরের পাশপোর্ট—আমরা যারা জীবনকে একটা বিস্ময়কর
ঘটনা বলে অভিহিত করি—ও যৌন-জ্যামিতিক সূত্র আবিষ্কার
কবি প্রজননে—সূত্রকারকে আবিষ্কার করতে পারি না—আমরা
যারা কলমকেই বাইবেল ও রাইফেল হিসেবে ব্যবহার করি
এবং মৃত সন্তানের শোক ভুলে যাই কামোত্তজনায়—স্বার্থপরদের
কুম্ভীরাশ্রুতে ভিজে যাওয়া বিপ্লবীদের বারুদ আমরা যারা শুকিয়ে দিতে
চাই এবং কাউকে মারবেন না গাল দেবেন না এই শিক্ষা গ্রহণ করি
মাও সে তুঙের বই পড়ে—আমরা যারা এবারে ফিরাও মোরে পড়ে
কম্যুনিস্ট হয়ে যাই পরোপকার বৃত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বিপ্লবী

সেই আমরাই হবো কি রেজারেকশন—
অথবা পাড়ার বাবলিদের টিট্‌কিরি খেতে খেতে
গেঞ্জি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খেতে খেতে
আমরা শুনে যাবো নির্বিকার
রবীনঠাকুরের গান—

দেবী রায়চৌধুরী

আমাকে আরো কী কী করতে হবে

বিস্তৃত বিরাট নিখিল চরাচরে
নিষ্ঠুর সময় জীবনের ভেতর ১ জীবনের মধ্যে
জন্ম নেয় আর ১ জীবন
ধূ ধূ শাদা বালিময় দিগন্ত মাঠ—হাহাকার—স্লোগান মিছিল কোরাস্
চতুর ঈশ্বর—কখনো সাকার—নিরাকার কখনো
আমার দীর্ঘতর জীবন—
রৌদ্রের আলোতে ঝক্‌মক্ করে খোয়াই নদীর হাড়ের ঘুণ
রাইফেল হাতে গেরিলা কাশবনের ভেতর
কাঁধে হাত রাখে
মাথা উঁচু করে আছে সবুজ ঘাস
ঘাসের শিষ—লোমশ নীল আকাশ
বন্ধকী মুণ্ডু আমার
প্রজাপতির পাখনা মেলে পাতাবাহারের ডালে কোনো না কোনো ১ সময়
সময়ের পরতে পরতে হিংস্র হাসি নাচ
ডলপুতুল তাবৎ মানুষ হাতের প্লেয়িং কার্ডস্
রেকর্ডের সেই একই কথা জানা গেল পিন বদল করে
সংরক্ষিত এলাকায় কোনো সুর নেই
রাত্রি নেই—
দিনের আলোর বীভৎস অন্ধকার—
রাত্রি নেই—রাত্রি নেই—

ভয়ানক অস্থির আমি এক মানুষ—
হাজার হাজার সিকিউরিটি বন্ড প্রিমিয়াম
বিশেষ বিশেষ সেফ্‌এ পেতে চাই—লুকানো সম্পত্তি
ওইসব সেফ্‌এর চাবি নাই বলে
আমি ১ মানুষ ৭০ হাজারতম অলিম্পিকে চলে যাই
ইউনিয়ন চ্যাপেল-এ কখনো ফ্রিস্কুল পার্কস্ট্রিটএ
সাইকেল থেকে নেমে সটান নিমতলা—

লক্ষ মাইল লম্বা চৌরঙ্গীর রাস্তা রেড রোড
সব নিথর স্তব্ধ নিষ্পন্দ—
চাঁদের বুকে চান্দ্ররাত্রির অবসান হয় না
হায় লুনাখোদ—
তোমার রহস্য কি তুমি জানো—আমি কিছু বুঝেছি

পাশাপাশি হেঁটে চলেছি আমরা
অথচ কেউ কারোর দিকে তাকাতে পারি না
কথা বলতে পারি না—
তাকানোর চোখ ও কথা বলার ভাষা
কী অসময়েই না শেষ হয়ে গ্যালো—
এই নিয়তিতাড়িত শরীর নিয়ে আরও কতদূর কোনদিকে হেঁটে যেতে হবে
তরলসঙ্গমশোক ছাড়া আর কোনো সুখ শরীরে আছে নাকি
প্রতিটি লোমের উচ্ছ্বাসরস ছেনে চেখে আবারও জানতে ইচ্ছে করে
এই রহস্যের উৎস—

আমি অবিখ্যাত, অচিহ্নিত, থেকে যেতে চাই
আমার ভাষাকে লিপ্যান্তর করে আমার কী
খ্যাতিস্পৃহতা
শহীদের কাছে মৃত্যুস্ফলক জরুরি নাকি
কোনো স্মৃতিফলক—
আমার মাথার ভেতর এমন সবুজ ধুতরা ফুলের চাষ
শাল-ইউকেলিপটাসের ছায়া থেকে
ঢের ঢের অন্ধকারময় মহুয়া—ধুতরা বন
আমার শরীরে গিজ গিজ করছে এখন—
ঠান্ডা মাথায় দেখে যেতে হবে
গাছ কতটা বড়ো হলো
কতটা ফুল ফুটলো এবং
সেই ফুলের অমরতা—

পৃথিবীর চামড়ার উপর
নিরাময়হীন রোগে আক্রান্ত মানুষের বংশধর
আমি
নিরাময়হীন রোগাক্রান্ত ১ মানুষ—
অন্ডকোষের ভয়বহতা জরায়ুর হিংস্রতার কাছে কিছুই নয়
এই সত্য জানা হয়ে গেলে পর কেন কাঁদতে হয়—
নির্বাসিত উজ্জ্বল দ্বীপে বসে
আমি কাঁদছি আমি হাসছি

হাসপাতালের প্রতিটি বেড এ শুয়ে বুঝতে পেরেছি
আমার ক্যান্সার হয়নি—
নিরাময়হীন রোগাক্রান্ত আমি ১ মানুষ
আমার পরিত্রাণ নেই
বীভৎস-দিনের আলো আর অন্ধকারময় দিন

"আত্মার বিনাশ নেই—
পুরনো দেহ ছেড়ে নতুন দেহে চলে যায় আত্মা"
অর্থাৎ তুমি আর আমি
এক নই—
১ অদ্ভুত অন্ধকার দাবি করছে আমাকে
যেসব মহাপুরুষদের প্রত্যেকটি বাণী
মানুষের বংশধর আমি ১ মানুষের প্রতি মুহূর্তের বাণী
তাদের অর্থাৎ সেইসব মহাপুরুষদের চিতার আগুনের রং
আর আমার মা
অর্থাৎ হিংস্রজরায়ুধিকারী ১ সাধারণ মানবীর
চিতার আগুনের রং তো একই—
আমি মানুষের বংশধর
নিরাময়হীন রেগাক্রান্ত ১ মানুষ—
মার মৃত্যুতে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়েছিল কেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ
আর বামাক্ষেপা—????????????

এসবের পরেও আমি আমার শরীর,
এবং আমি ও আমার আত্মা এবং তার মাপ
সবই একই রকম থেকে গেল। কারণ
এই দাঁত আবারও ব্যবহার করতে হবে আমায়
এই নখ দিয়ে মাংস ছিড়তে হবে আমায়—
নিরাময়হীন রোগাক্রান্ত ১ মানুষ আমি
এই দাঁতনখময়শরীর নিয়ে আমি কী করবো
কে কোথায় আছো বলে দাও
এস.ও.এস-এ জানিয়ে দাও
আমাকে আরও কী কী করতে হবে

সুভাষ ঘোষ

শীর্ষ অভিযান

রেডিও কার্টুন

''এই ব্যবস্থাটা আমি বন্ধ করতে চাই বুঝলে, বড়ো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে...'

'বাজে কথা রাখুন! রাজাসাহেব আপনাকে ছাড়বেন না। চিন্তা নেই, আমার খুনিরা কৌতূহলীদের খতম করেছে...এ-খবরে নিশ্চয়ই আপনার চাঙ্গা হয়ে ওঠবার কথা!'

'এই যে ওরা খবর নিয়ে এসেছে...'

'তাঁর নির্দেশ : জনতার বীর্য ও অস্ত্র কেড়ে নাও—নির্বীজ ও নিরস্ত্রীকরণের পর সরকারি অস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করো...'

একটি শিশু টয়লেট প্যানের দিকে আধবোঁজা চোখে তাকিয়ে : আপনি কি এ দেশের মাননীয় প্রধান?

সঙ্গে সঙ্গে ৪৮ ঘন্টার নোটিশে দেশ ছাড়ার আদেশ হয় এবং এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে কি না, নরেস্টার ঝড চাপ বিদ্যুৎ, বিমান যথাসময় রান্ওয়ে ক্লিয়ার পায় না, ফলত বাহির ও আন্তর ডাকচলাচলে যা কিছু বিলম্ব...

'তাড়াতাড়ি সব পরিষ্কার করুন...উনি আমাকে শাপশাপান্ত করছেন আর আপনারা ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে আছেন...তিনি এইমাত্র আমাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছেন—প্রতি আধঘন্টা অন্তরই আমার জীবন বিষময় করে তুলেছেন—আমরা নাকি যথেষ্ট কঠোর হাচ্ছি না। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি, এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন আমরা যা কিছু করে যাচ্ছি ফল হচ্ছে বিপরীত...'

'ঠিক আছে, বল্, তুই জানিস সব...'

'না'

'চোপ রাও শালী! বল, মালপত্তর কোথায়?'

'বলেছি তো, ওসব জানি না আমি।'

'জানিস্ না মাগি? জানাচ্ছি তোকে। ডিউটি!'

পরদার আড়াল থেকে ডিউটি এগিয়ে এসে স্যালুট করে।

'নিয়ে যা মাগিকে। জমাদারনীকে মাল খাইয়ে তার হাতে ছেড়ে দে। খানিক দলাই মলাই করে নিয়ে যায়। দেখি কোন্ বাপ বাঁচায়।'

জমাদারনীর হাতে ঝাঁটা—যৌনশলা সেপাইয়ের সঙ্গে—

: 'স্যার এদের আর বিশ্বাস না—এরা প্রেক্ষাপট নিয়ন্ত্রণ করে—লোক পৃথক করে দল থেকে—খুন সংগঠিত করে—তাস হের-ফের করে—পাশার খুঁটি—প্ররোচকদের কাজে লাগায়—এবং দুই বিপরীত মেরুর সংঘর্ষ ঘটিয়ে বের করে এমন আগুন, শান্তির বাণী ও বন্দুকের নল যার উপশম নয়...।'

বিচারক : ঠিক আছে, ওকে ওর ঘরে পৌছে দাও—

তৎক্ষণাৎ আদালত ঘেরাও হয়—'বিচারকের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও...'

'আজ হচ্ছে গিয়ে স্বাধীনতা দিবস—প্রতিশ্রুতি পালন আমাদের করতেই হবে...'

প্রোগ্রাম : (১) রিসার্চ সেন্টার থেকে বেলুন ওড়ানো বেলুন ফাটানো

(২)...

'২, ৩-নয়, কোটি কোটি মানুষ জলমগ্ন...জলবন্দি...মেইন্ ল্যান্ডের জন্য পাগল...এদিকে ত্রাণকৌশল বিপর্যস্ত...স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে মজা জল ঢুকে পড়েছে...কোনো ডাক্তার নেই...'

যাই হোক, এখন প্রতি-বিশ্বের তুমি, আমাদের এখানের এসব রেডিও কার্টুন কি তোমার খুব একটা ভালো লাগবে? টি-বি ও ভি-ডি প্লাবিত আমাদের এইসব খবরাখবর! দেবনদীর এই পারে আমরা, কে জানে, আমাদের ধ্বনি প্রতিধ্বনি কতটুক্ পারাপার পায়...

মহাভারত

ঘুমোতে যাওয়ার আগে অ্যাট্র্যান্ডম মহাভারতের পাতা ওল্টাই—

...মহাভারত শুনলে স্বর্গকামীর স্বর্গ, জয়কামীর জয়, এবং...সমুদ্র ও হিমালয় যেমন রত্ননিধি নামে খ্যাত, মহাভারতও সেইরূপ...জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, দ্বিজোত্তম, আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা কত কাল স্বর্গবাস করেছিলেন?...ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন...তুমি যা দেখেছো তা ইন্দ্রের মায়া। তারপর আকাশগঙ্গার স্নান করে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করলেন।...যুধিষ্ঠির ভাবতে লাগলেন, দৈব একি করেছেন! কোন্ পাপের ফল এঁরা এই পাপগন্ধময় নিদারুণ স্থানে আছেন? আমি সুপ্ত না জাগরিত, চেতন না অবচেতন? এ কি আমার মনের বিকার না বিভ্রম?...ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দেবদূতকে বললেন—

তুমি যাঁদের দুত তাঁদের কাছে গিয়ে বলো যে, আমি ফিরে যাবো না, এখানেই থাকবো। আমাকে পেয়ে আমার এই দুঃখার্ত ভ্রাতারা সুখী হয়েছেন।...

...সহসা অন্ধকার দুর হলো, বৈতরণী নদী,...বিকৃত শরীর সকল অদৃশ্য হ'ল...

...যুধিষ্ঠির বললেন, যার জন্য পৃথিবী উৎসন্ন হয়েছে (তার) যদি এই গতি হয় তবে আমার মহাপ্রাণ সত্যপ্রতিজ্ঞ ভ্রাতারা কোথায় গেছেন?...তাঁরা যদি এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকবো না। আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ।...তাঁরা যে স্থানে গেছেন তা শুভ অশুভ যাই হোক আমি সেখানেই যেতে ইচ্ছে করি...

...ইন্দ্র : এখনও তুমি মানুষের স্নেহ ত্যাগ করছো না কেন? তোমার মানুষ ভাব রয়েছে কেন?...তুমি পরম সিদ্ধিলাভ করে এখানে এসেছো...অন্যেরা অধিকার পাননি...

যুধিষ্ঠির :

...দেবরাজ, যেখানে আমার ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গুণবতী শ্যামাঙ্গিনী নারীশ্রেষ্ঠা পত্নী আছেন, সেখানেই আমি যাবো।

স্বপ্নে টি.ভি চিত্র :

কখন ঘুমিয়ে পড়ি—৬৪-তলা এক খাড়া সিঁড়ি দেখি, দেখি তার টপে নাটের গুরু—ক্ষমতার সুপ খেয়ে যার ব্রেক্‌ফাস্ট ভাঙে—পরে চাই উটপাখির ডিম, রেশম কোমল হরিণ মাংস চাই—চাই পায়ের নীচে, গায়ের রোমের সমসংখ্যক নারী—

সে যেমন যেমন বোতাম টেপে গ্লোব নড়ে চড়ে তেমনি—তার বোতামের আজ্ঞায় বায়ু-মুখ ঘোরে—

'নাউ লিস্‌ন্ মাই বয়, বিশ্রামে যাওয়ার আগে সামান্য ২। ৪ কথা বলবো, আমার কোটেশান্ বই ফলো করো তোমরা—কভারেই অবশ্য ভূমিকা আছে, কী করে নাইট্ মেয়ার জয় করা সম্ভব—

সাতসমুদ্র তেরো নদীর জলেও হাতে রক্তের দাগ ওঠানো যায় না, কে বলেছে হে তোমাদের?'

ঘুম থেকে উঠে

ঘুম থেকে উঠে দেখি বালিশের পাশে একরাশ স্বপ্ন পড়ে আছে—মাথা অসম্ভব ফাঁকা—সেখানে সাড়া নেই, শব্দ নেই, ভার নেই, গান নেই কোনো—শরীর দুর্বল এত, নড়াতে পারি না—যেন সারাজীবনের রেতঃপাত একবারে ঘটে গেছে—ডাক্তার ডাকি—উনি পরীক্ষার পর :

'শারীরিক দুর্বলতার জন্যই হয় এরকম, কিছুদিন বিশ্রাম নিন যত্ন নিন্ ঠিক ঠিক মতো—আর এই টনিক—দু-দিনেই ঠিক হয়ে যাবে—'

ডাক্তারের সামনেই টনিক আছড়ে ভাঙি—আবার দুঃস্বপ্ন ফিরিয়ে আনার টনিক ওই, টনিক ছড়িয়ে পড়ে মেঝেয়, পাপোশে, এদিক ওদিকে—

তৎক্ষণাৎ পাখির ডানার শব্দ মাথায় ফিরে আসে—সাড়াশব্দ গান—শরীর দুলে ওঠে—ফিরে আসে পাখি—লাল নীল, সবুজ হলুদ—মাথায় ফিরে আসে নীল লোহিত থেকে প্রকৃতস্বপ্নের পাখি...

কী-হোল্

চিৎকার ঝাপটাঝাপটির শব্দে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ি—বাইরে যাই। চোখ রাখি কী-হোলে—

—বলো, কোথায় রেখেছো বলো?

—না—

—না! জানো হাতে এটা কী? বেছে নাও, 1...2...বলো...

—না—

—3...4...বলো...এ কি! আলো, আলো কোথায়! সুইচ? কে, কে ওখানে?

(মেইন জ্বলবে না...অপরিচিত গম্ভীর স্বর...)

—ওঃ ভগবান...এ-কি!...আলো!....আলো!!

মার্জারেও আলো চাই—শিশু চায় আলো—বৃক্ষলতা, ক্লোরোফিল্...'অন্ধজনে দেহ আলো...', 'আলো আমার আলো ওগো...'—ভোরের পাখি নাচে কেঁদে গায়—

মনিমেলা

ঘুরতে ঘুরতে কখন মনিমেলার কাছাকাছি। লক্ষ করি ওদের দেখতে সকলেই একরকম নয় কিন্তু ওরা সকলেই ব্যবহার করে :

সর্বাঙ্গসুন্দর মেক্আপ, 'আরো কথা বলো...,' 'একছিল কন্যা...', 'এক ছিল রাজা...', 'বাসর লগ্ন', 'অনুষ্টুপ ছন্দ', 'ললিত কলা', 'ললিতা প্রসঙ্গ', 'বারো ঘর এক উঠোন', 'প্রমীলা প্রকৃতি', কাঁচ পুঁতি হিরে, মেডেন ফর্ম, প্রচ্ছন্ন মহিমা, হাত পাখা, ন্যুটেক্স্ তোয়ালে, আইটেক্স্ কাজল, গাঁটছড়া, ধনু ফুল ও শর...

ওদেব দেখতে সকলেই একরকম নয়, ওদের সকলেই সর্বাঙ্গসুন্দর মেকআপ ব্যবহার করে—ওরা সকলেই ভালোবাসা ব্যবহার করে তো!

লেটারবক্স

অনেকদিন বাদে চিঠিতে ভর্তি বাক্স—কিন্তু তোমার নেই—কার এটি? '—ইতি তোমার সিদ্ধার্ত'। সিদ্ধার্তের চিঠি :

'...আমার টাকার অভাব নেই, পাকা চাকরি—তবু রানির মন ভরে না—রানির আশ্চর্য রূপ, তবু আমার মনে তৃপ্তি নেই—এত রূপ যে কেবলই ভয়, সর্বদাই মনে হয় রানি অন্যে আসক্ত—সত্য যে, বাবার পশুভাব আমি পেয়েছি, তবে তার উর্ধ্বে উঠতেই চাই—ওঠারই তপস্যা...

এই মনের দ্বন্দ্ব, এই কাঁটা...

আমার কাছে এমন নরুণ নেই যা দিয়ে ওর কাঁটা তুলি—তবে আশা

ভোলে বাবা

পার করে গা

'...ইমিডিয়েট...না জানলে চলে না...হ্যান্ডবুক পাঠাও...লাস্ট মিনিট্স্ সাজেস্‌সান...'

রামানন্দের চিঠির পশ্চাপট :

বিলুপ্ত হৃদয়, খোলা মন খোলা দরজা, দিশা, রাগনির্ণয় : ৩ খণ্ডে সংগীত প্রবেশ...

নির্জন মানুষ কেন হাটে? সংখ্যার হিসাব প্রকৃতপক্ষে বলে কী?

বলো আরও : কেন রূপ, কেন ফুটো?

ওর চিঠি ওকেই ফেরত পাঠানো চাই—"প্রিয় সুভাষ, এই যেসব বিজ্ঞাপনে দেখি, কালজয়ী, সামুদ্রিক উদ্বেলতা, সিন্ধুর আকুতি, অমৃতস্য...এসব কী?"

—একপ্রকার ফুটো, যার ভেতর দিয়ে সত্য, সততা, সরলতা, আন্তরিকতা, প্রকৃতগান লোপাট হয়—

এক মুঠো বিষণ্ণ মাছি

চিঠি টেবিলে পড়ে থাকে—এক মুঠো বিষণ্ণ মাছি—কানে আসে,

বিপদে চাই বন্ধু, ব্যথা বেদনায় চাই এমন প্রাপ্তবয়স্ক-মাত্রা যাতে ধীরে ধীরে আরাম, অবিলম্বে আরাম, উপশম ব্যস্...এখন চলি বন্ধু...একটু কাজ আছে...আবার পরে দেখা হবে...গুডবাই...

স্বীকারোক্তি

: আমরা সংখ্যায় অনেক। অনেকদিন বেঁচে আছি। কতদিন, ঠিক জানা নেই—যারা বাধা দিতে পারে না সেসব দুর্বলদের কাছ থেকে চুরি করি আমরা—

: এসব স্বীকার করছো? নোংরা ভীরুর দল!

: নোংরা নই স্যার! আমরা আমাদের নামেই পরিচিত—

আমাদের নেতা বলেন, দেশে যখন বিপর্যয়ের অভাব নেই, দুর্বল লোকের, তখন সবলের কাছ থেকে চুরি করা মুর্খতা...

: ঠিক আছে, যা খুশি করো তোমরা—আই অ্যাম গেইং—গুডবাই...

ঠিক দোতলা থেকে বেরোতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে আটক হই—পরিচিত মুখগুলিই কোন্ দিক দিয়ে সামনে আবার—'গোইং! কোথায় গোইং?'

যদি কখনো প্রতি-বিশ্ব থেকে এইখানে আসো, এলে কিছু নয়ামানুষ অনায়াসে দেখতে পাবে : বড়ো বড়ো চুল, কিছু অগোছালো, কান পর্যন্ত টানা জলদস্যুর জুলপি—চাপা প্যান্ট—

এদের মেয়েদেরও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য। খুব টাইট করে পিন এঁটে কাপড় পরা—ওরা বলে অ্যানাটমির প্রকাশই সৌন্দর্য—বলে, নেকেড কেম আই..., ভ্যারাইটি বাড়াও, উৎপাদন কমাও—খাদ্যে সমবন্টন ঘটলে সৌন্দর্য বিশৃঙ্খল হয়—

: আপনার মনে হচ্ছে না এসব খুব হট্?

'হট্ নয়' জেনে হটদর্শন প্রণেতাকেই গালাগাল করে—"জিও-পিও বাবারা কোথায়?"

তারা আরও কাছে এসে ঘিরে ধরে আমায়—কেউ কেউ জামা ধরে টানে, হাত ধরে টানে কেউ কেউ—প্রায় ধ্বস্তাধ্বস্তি—

: মাইরি, এ-মাল মেড ইন্ কোথায়? গোয়িং! কোথায় গোয়িং? ওসব মেজাজ দেখাবেন না—

এমন সময় ঈথার-তরঙ্গে বজ্র গম্ভীর নির্দেশ : ছেড়ে দিন—

সে-নির্দেশ পালন করতে হয়। দ্রুত নেমে আসি। কিন্তু মেন্ গেট আগলিয়ে ওরা কারা? ওদেরই মতো দেখতে যদিও, গেট বরাবর পা বাড়াই—

: ভাবগতিক তো সুবিধেজনক নয়—মনে হচ্ছে মাল খুব চেনা—

একজন তরতর এগিয়ে আসে—"পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করবেন না। আপনাকে আমরা চিনতে পেরেছি—তবু নিজেই বলুন, আপনি কে?"

নাম, পিতার নাম গোপন করি না। ওদের অনেকেই আমার চারদিক খুব ঘন হয়ে আসে।

: কিন্তু আপনার দাঁত কই? দাঁত রেখেছেন কোথায়?

ওদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ তাকাই। কবে পার হয়ে গেছে অন্নপ্রাশন আমার—যদিও জন্মদিন জানা নেই—জন্মের সঠিক বার মাস সাল—'দাঁত রেখেছেন কোথায়' বুঝতে পারি না—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি—ইতিমধ্যে ওদেরই একজন ২য় একজনের পকেট থেকে দুটো পাটি এনে খটাখট্ আমার মুখে লাগিয়ে দ্যায়—পকেট থেকে ছবি বের করে আর একজন—মেলায় আমাকে ছবির সঙ্গে—ছবির সঙ্গে মেলায় আমাকে—৪৫, ৯০, কখনো ১৮০ ডিগ্রি কোণ থেকে পরীক্ষা করে আমাকে।

—'হাঁ, ঠিক আছে, ঠিক লোককেই চিনতে পেরেছি স্যার...চলুন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে...'

—'একটা ইন্‌জেকশন্ নেয়া দরকার—'

—'উহুঁ, কোনো ইন্‌জেক্শন্ ফিন্‌জেকশন্ নয় এখন, দরকার হলে আমরাই ডাক্তার ডাকবো—চিন্তা নেই, চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই করা হবে—।

হঠাৎ উপর থেকে কথাবার্তায় কৌতূহলী হই—গা ঝাড়া দ্যায় ওরাও—ওদের সব চোখ কান উপরের দিকে তিড়িং তিড়িং লাফাতে থাকে, ও উপরে ক্রমাগত :

বন্ধুগণ, আমরা আছি আপনাদের পাশে—চালিয়ে যান! কিন্তু দেখবেন, রক্তপাত না হয়—তবে এসব বাইরে কখনই প্রকাশ করবেন না—বাইরের কেউ এসব যাতে কখনই দেখতে বা জানতে না পারে সেজন্য সদর বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—যেমন খুশি চালিয়ে যান—

হঠাৎ ওরা একসঙ্গে 'হুর্‌রা'...বলে ওঠে—যে যার পকেট থেকে রুমাল বের করে ওরা—যথেচ্ছ ওড়ায়—ওড়ায় ও লাফায়—পারিপার্শ্বিক ভুলে যায়—ওড়ায় ও ছোটে—এ তার ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরের দিকে, ছোটে ওই বক্তার দিকে—কোলাপসিবল গেটের ফোকর দিয়ে শিল্প করে বাইরে বেরিয়ে আমি দ্রুত—

সত্যিই কীসের জন্য যাওয়া হলো, কী হয়ে ফেরা গেল একটা সিগারেট কিনি। দড়ির আগুনে ধরাই। কয়েক টানেই ফিনিশ করি। তবু কিছুতেই মনে করতে পারি না, এ-ছাড়া অন্যকিছু, আমি আপাতত জামিনে খালাস দীর্ঘ মেয়াদী আসামী কেউ—পান খাই কিমাম দিয়ে—তখনও মনে হতে থাকে ওই--চায়ের দোকানে ঢুকে চা শেষ করি ৩/৪ চুমুকে, গুনগুন করে ও-ই তখনও—

কিন্তু আশ্চর্য যে, তোমার দেয়া ওই 'বিশ্বপরিচয়ে' কখনোই এমন কোনো নোট কোথাও দেখতে পাইনি—দীর্ঘকাল জামিনে খালাস আসামী মনে করতে পারছে, সত্যি সত্যিই সে যুক্ত—বা দীর্ঘ মুক্তির পর হঠাৎ একদিন, 'হাঁ, আমি কোনো আসামী, আপাতত জামিনে খালাস'—

আবহাওয়া চার্ট

'এই স্বীকারোক্তি' পেয়ে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারো, এইরকম আশঙ্কা হয়—মনে হয় আমার চলাচল, পা ফ্যালা, তোমার দেয়া আবহাওয়া চার্ট অনুসারে কোনোভাবেই ঠিক হচ্ছে না—তুমি তো স্পষ্টই সতর্ক করেছিলে :

"স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না, কী বিপদ আসতে পারে। বিপদ যখন আসে গুরুত্ব বোঝার মতো অবসর পাওয়া যায় না। তাই খুব সাবধানে এগিয়ে যাবে। আলোর লাল নির্দেশ অবশ্যইমান্য। বোকার মতো চটপট করবে না। ভালো আবহাওয়া না থাকলে অপেক্ষা করবে।

মনে রাখবে, চূড়ার কাছাকাছি হয়ে অনেকেই প্রলোভন থেকে নেমে আসতে পারে না—সামান্য এদিক ওদিক মানেই চলে যেতে হবে আইস্-লাইনের এমন জায়গায়, যেখান থেকে আর কেউ ফেরে না—তোমার পা ফেলার সতর্কতা, আর ভেবে চিন্তে এগিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভর করছে এমন সব...”

এমন মানুষ দেখলে, আমি তো আবার সব সময়েই কয়েক হাত তফাৎ যাই, যার মাথায় সর্বদাই বসানো ওয়েদার কক্—ঘরের মধ্যে ঘর যার—

তবে ‘ভালো আবহাওয়া’ বল্‌তে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলে—ব্যাপারটা এরকম কিছু কী :

সমস্ত আকাশ ফিল্টার করে মেঘ একদম সরিয়ে ফ্যালা হয়েছে—নীল আকাশ আর ঠাসাঠাসি রোদ—যখন বাগানের সব কুঁড়িই ফুল—গানে নিরন্তর পাখি—বসন্তের পাইপ থেকে গল্‌গল্ হাওয়া—পরণে তখন ঈপ্সিত পট্টবস্ত্র, রেশমের উত্তরীয় গায়ে—মঙ্গলঘট দর্শনান্তে শ্বেত যজ্ঞাশ্বে আরোহণ করলেন উনি—

তবে তোমার জানানো ‘জলহাওয়ার দুঃখ’ কখনো কখনো স্মরণ হয় :

“জলহাওয়ার দুঃখ”

...বর্তমান জলবাতাসের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া বড়োই উদ্বেগ হয়। জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও পদ্ধতির নানা দাবি, শুদ্ধতা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছে। হাজার হাজার বছর আগের সেই নদীটি, মানুষটি আজিও প্রবাহিত যদিও, কিন্তু তাহাতে সেই প্রাক্তন শুদ্ধতা নাই আর! এইরূপ কলুষ যুক্ততা হেতু আগামী দিনে ফলনশীল শস্যহানির প্রচুর সম্ভাবনা। জল ও মানুষ যেভাবে যুগ যুগ ধরিয়া কলুষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যদি বর্তমান হয়, শাঁস ও শস্য সার্বিক বিপর্যয় বরণ কবিতে বাধ্য হইবে, কখনই কলুষিত মানুষ তাহার প্রবাহ ও প্লাবন দিয়া ফলনশীলতাকে সাহায্য করিবে না, বরং অস্থি ও মাংসে অজস্র ও অভাবিত ক্ষয় রোগের প্রকোপ সৃষ্টি করিবে—

বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, ‘হায়, এই আমি আর নই সেই আমি’—‘হায়, সেই সহজ গুণ জলহাওয়ায় নাই আর’—

আরও এক ব্যাপার, ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে অরণ্য-পরিধি, ফাঁক ও ফাঁকা বাড়িয়া যাইতেছে—কী এক ক্ষুধা, অরণ্য আহারের পর কেবলই অরণ্য-বমি, অরণ্য-মল, অরণ্য-অবতার চক্ষুষ্মানেই গোচর হয়...

‘বিশ্ব-পরিচয়ের’ কয়েকটি পাতা

এই মুহূর্তে সামনে একের পর এক উলটে যাচ্ছে, তোমার দেয়া ‘বিশ্ব-পরিচয়ের’ আরও কয়েকটি পাতা :

...শুনেছি আই-আর খাতায় তোলা হয়েছে অন্তত নকোটির নাম...সন্দেহজনক এদের কণ্ঠস্বরও নাকি টেপরেকর্ড করে রাখা হয়েছে—এসবই জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে...

‘আমি বলতে চাই,...If you feed them know, You don’t have to interrogage them

later...'

অতিরিক্ত সোনার লোভই বিপদ ডেকে আনে...যা নতুন হচ্ছে কায়দা...শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আত্মা লুপ্ত...ওপরওলার কোনো মানেই নেই যদি না তার অধিকার থাকে শাস্তি দেয়ার...মানুষ কী পড়বে, মানুষ কী লিখবে, কী স্বপ্ন দেখবে—এসব ঠিক করে দিতে চাওয়া এখানকার একপ্রকার মজাদার মানুষের রেয়াজ...

উচ্ছেদ, কারাগার, বন্দি, বিনাবিচার—বাতাসের সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত তারই উপাদান আর এক রকম...যে-টনিক শুধু ক্ষিদে বাড়ায়, নিষিদ্ধ করতে হবে...

'সবকিছু সহজভাবে নিন!'

'তাই তো চেষ্টা করি, কিন্তু ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত ফাঁসটির দিকে তাকিয়ে জগৎ সংসারকে খুবই সহজভাবে নেওয়ার কথা চিন্তা করা যায়?'...

'কাকে কতটা সরতে হবে?'...

যে-যার অবস্থান থেকে একচুল সরে আসছে না...ফলত পর্যবেক্ষক দল বেকার হয়ে পড়লেন...এসব অভিজ্ঞতার জন্য কিছু কর দিতে হয়, কিছু খরচ করতে হয় বৈকি!...

মাথা অতিরিক্ত গরম হলে পীড়িত মানুষ চলে যায় হাসপাতালে...শীততাপ নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নেয় কেউ কেউ...কিছু বিশ্রাম, ব্যস...আবার হরিণ শিকার দলবলসহ বাদ্যযোগে...সঙ্গে কন্‌ভয়...

'স্বহস্তে জীবহত্যা পাপ'—এই সংরক্ষিত ধর্ম মাননীয় বলে প্রধান যিনি—

তোমরা হে বারুদ শাসিত নলই ব্যবহার করো...

এই হচ্ছে গিয়ে সত্যমেব জয়তে...তখন হাসপাতালগামী স্ট্রেচারে পীড়িত আত্মা...

নীচের চাপ বা ওজন-প্রভাব মণ্ডল বেশ গভীরে নেমে যাচ্ছে, আমরা যে যার অলক্ষ্যে পাতালগামী...নেড় এসব ঠেকাতে চাই আমি, বলতে পারো উপায় কী...

জি. পি. ও

'আল্‌লি বাবা'

'বলো মর্জিনা'

'আচ্ছা...'

এ যে দেখছি আসর শুরু হয়ে গিয়েছে, দ্রুত জামা কাপড় পরে নিই—দেরি হয়ে গেল কত—পা বাড়াই জি. পি. ও-র দিকে—আজই তো তোমাকে একটা ডেসপাচ পাঠানোর কথা—তোমার আগ্রহ ও অপেক্ষা বুঝতে পারি—তবে তেমন কিছু সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি কিন্তু কী করা—

তুমি জানো যে যুদ্ধপটভূমিকায় সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ সবসময় খুব সহজ ও মসৃণ নয়, এজন্য যে, লক্ষ্যণীয় রক্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখা রিজার্ভ পঞ্চমবাহিনীকে রণক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া হয়—তাদের চিহ্নিত ও নামকরণ বড়োই শক্ত—উদ্দেশ্য আর কি, পাখি বধ—উড্ডীয়মান পাখিদের বেলায় তো আর কোনো অসুবিধে নেই—সহজেই অনুমান ওরা কী পাখি, কোথায় বাস ওদের, স্বভাবের বিশেষত্ব কী, কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে—কোন্ সাগর থেকে কোন্ সমুদ্রে ওরা—কোন্ স্রোত ছেড়ে চলে এলো, যেতে চায় কোন্ স্রোতে—

কিন্তু গ্রাহক ও প্রেরক এলাকার কাছাকাছি এসে থমকে যাই—এতসব গোলমেলে ভিড়, দীর্ঘ লাইন এত...

'বলো কী হে...'—কার কথায় খট্ কান আটকে—

টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার, টেলিভিশান মারফত সমারোহে সংবাদ চিত্র প্রেরণ চলিতেছে—আসিতেছে—দেখিয়া মনে হয় একদল এলিসই যেন আজব দেশে পাড়া বেড়াইতে আসিয়াছে—যাহা দেখিতেছে তাহাতেই বিস্ময়ে তাহাদের চক্ষু দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায়—

বলিতেছে, 'দেখিতেছ ইহারা কেমন এক পায়ে হাঁটিবার কায়দা রপ্ত করিয়াছে, বেশ তো হাঁটিতে পারে! চার পায়েও পারে!'

কেহ, 'উহারা কথা বলিতেও পারে এবং সম্ভবত ভাষার মাধ্যমেই পরস্পর ভাব বিনিময় করিয়া থাকে'

—'আবহাওয়ার সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের দিকটি ইহাই, এখানেও বেশি শীত পড়িলে জল বরফে পরিণত হয়, এবং গরম জামা গায়ে দিতে হয়। তাজ্জব!'

আর একদল এই ভাবিয়া অবাক, "শুনিয়াছিলাম নরখাদক দেখিলেই এখানের সবাই, 'তবে রে পাগলা কুত্তা' বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, কই তেমন তো কিছুই দেখা গেল না। তবে কি বুঝিতে হইবে যাহারা উহা বলিবে, বলিবার কথা যাহাদের, তাহারা সবাই ওই..."

টেলিভিশানে মুলুকের সব আজগুবি খবর দেখিয়া অবাক বনিয়া যাইতেছে :

দৃশ্য এক : গাছ হাঁটিতেছে। তোতাপাখি কথা কহিতেছে! ভূত বেড়াইতেছে! রানির মাথা ভালুকের মতো!

দৃশ্য দুই : দেখুন; আজো ব্যবহৃত তিতে দেয়ালে হাজার বছরের পুরানো ঝামা

দৃশ্য তিন : শ্রমিকরা রাস্তা সাফ করিতেছে—ময়লা চাপা ন্যাকড়া সরাইয়া ফেলিতেছে, টয়লেট পেপার, কফ থুতুর পিকদানি, টি. বি/ভি. ডির রক্ত তুলা, বমি, গর্ভপাত, প্লেটে ত্যক্ত হাড়কাঁটা—টাকার ময়লা তুলিয়া বাবুকে ফেরত দিতেছে—সরাইতেছে জাঙ্গিয়া প্যান্টি শায়া তাকিয়া হইতে দাগ—ভোর হইতেছে, সিঁড়ি রাস্তা ধুইতেছে, কার্পেট পাতিতেছে, তাহারপর একপাশে সরিয়া দাঁড়াইতেছে—প্যান্ট টুপি ব্রায়ার পাইপ জাজিমের উপর দিয়া গট্ গট্...

'কই হে, তোমার সেলাম আজ এত সর্ট কেন? এই দিকে এসো তো!'

মুলুকের রমণীদের এখন ননদ জা সতীন লইয়া জমজমাট ঘর করিবার প্রথা নাই, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র এপার্টমেন্টের গণ্ডীর ভেতর বসিয়া একা একা এই বিস্ময়গুলি হজম করিতে গিয়া বিস্তর নোনতা বাদাম অথবা চিউইংগাম চিবাইয়া দাঁতের গোড়া নড়াইয়া ফেলিতেছে, ননদ জা ইত্যাদি লইয়া ঘর করিবার অভ্যাস থাকিলে, 'ওলো, দ্যাখ ভাই দ্যাখ' বলিয়া গায়ে গায়ে ঢলাঢলির ধুম পড়িয়া যাইত—

দুটি টেলিগ্রাম

ভিড় ঠেলে কোনোরকমে দুটো টেলিগ্রাম সারি, (১) "জল্লাদ চাই" (২) "নির্বাসিতের শোক"—উদ্দেশ্য যদি তোমাদের। ওখানেও বেকার জল্লাদ থেকে থাকে তাহলে তাদের কাজে

লাগুক, উভয় অঞ্চলে নির্বাসিতেরা যদি পারস্পরিক যোগসাধনের পর গান্‌বোট ডিপ্লোম্যাসির বিরুদ্ধে তৈরি করতে পারে কোন 'উদ্ধার স্কোয়াডের পরিকল্পনা'—

জল্লাদ চাই

কারা দপ্তরে অভিজ্ঞ জল্লাদ প্রয়োজন। পদ স্থায়ী। বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিধি অনুসারে। জল্লাদের কাজে অভিজ্ঞ প্রাক্তন কারা-অফিসারদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। দরখাস্ত দ্রুত পাঠান।

নির্বাসিতের শোক

দ্বীপান্তরিত হইয়াও নিষ্কৃতি নাই—বোঝা টানিবার চাকুরি হইতে রেহাই মিলিল না—প্রসঙ্গক্রমে, অবশ্য ইদানীং আর দ্বীপান্তরের বেদনা কাহারও মনে তেমন করিয়া বাজে না—জীবনের যে মূল ভূখণ্ড হইতে নির্বাসন, বস্তুত তাহাকে অনেকেই আদরিনী মনে করে কিন্তু তাহার সহিত যোগাযোগ কী একেবারেই হ্রস্ব নয়! চলাফেরা করিবার সময় কেবলই মনে হয়, গায়ে কী সব ডোরাকাটা, বেঢপ মাপের—

একটি একান্ত সাক্ষাৎকার

এই শীতেও ঘামে ভিজে উঠেছে কপাল। রুমাল বের করে মুছি। দাঁড়িয়ে সেই কখন থেকে—কোথাও বসা দরকার একটু—আবার ভাঙতে হবে সিঁড়ি ওই অত—দরজার কাছাকাছি ৩-নং কাউন্টারের বাইরে কী একটা কাগজের উপর মাথা গুজে দিয়েছে দুজন—একটা খালি চেয়ার ওদের পাশেই—এদিক ওদিক তাকিয়ে বসে পড়ি—

১ম জন : তুমিই পড়ো...

২য় : না তুমি...

আড় চোখে তাকাই—কোনো কাগজের ৪র্থ পৃষ্ঠায় চোখে পড়ে পুরু মোটা হেডি : একটি একান্ত সাক্ষাৎকার

১ম জন : **একটি একান্ত সাক্ষাৎকার**

একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আমাদের ভাবীকালের চিত্রটি দেখালেন :

...সে যুগ আজ অতিক্রান্ত, যেমন অতিক্রান্ত তুষার যুগ, অথবা বলতে পারেন সরীসৃপের যুগ—সূর্যে আর আমরা বিশ্বাসী নই বা নির্ভরও করা হবে না তার উপর—কৃত্রিমসূর্য ভাসিয়ে আলোকিতকরণে কাজ সেরে ফেলা হবে—সেই ভাবী কাল—যেখানে সমগ্র পৃথিবী ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে প্রায় একটি বিন্দুতে এসে গিয়েছে—এসব জেনে দুর্বলচিত্তের ব্যক্তিরা হয়তো ভয়ে কাঁপবেন, আতঙ্কে শিউরে উঠবেন—কিন্তু সত্যিই ভয়ের কোনো কারণ নেই—আয়না দেখে কি ভয় পাই আমরা, না প্রেমে পড়ি?

খাদ্য সমস্যার সমাধান, চূড়ান্ত প্রায়—পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হবে অঢেল মাংস—তৈরি হবে সংশ্লেষিত ভাত—সংক্ষিপ্ত শহর, কেয়ার ফ্রি লাইফ—এসব বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে—এছাড়াও, এতাবৎ পরিত্যক্ত, অপজিনিসগুলি দিয়ে তৈরি হতে পারবে খাদ্যবস্তু—সন্তান ভক্ষণ করে সন্তান উৎপাদন আর কোনো কল্প কথাই নয়—

এছাড়া রবোট আপনার সব কাজ করে দেবে—সে কাজ করবে, তার সমস্যা অন্য কোনো মানব-যন্ত্রকে জানাবে এবং দুইয়ে মিলে পরামর্শ করে সমাধান খুঁজে নেবে। আপনাকে কিছুই

ভাবতে হবে না—আপনার সামনে তখন প্রাচুর্য আর কর্মহীনতা, কর্মহীনতা আর অবসর, বামে দক্ষিণে সামনে পেছনে কেবলই ওই—'আমি ব্রাউন শার্টদের ক্রিয়াকলাপ উপভোগ করতে ইচ্ছা করি'—বোতাম টিপুন, অমনি টেলিভিশান স্ক্রিনে আসিয়া হাজির—'মাননীয় উপপ্রধান হরিণ শিকারে বের হয়ে গন্ডারের সঙ্গম দৃশ্যে লিপ্ত হয়েছিলেন—দেখিতে চাই তাহাই'—সামনে হাজির অমনি, বোতামের সামান্য এক খোঁচায়—।

'রাজা বাদশার হারেম চাই'	—	অমনি	বোতাম	টপলেই	ইচ্ছাপূরণ
'খোজাদের চাই'	—	,,	,,	,,	,,
'অ্যারেস্ট হিম্'	—	,,	,,	,,	,,
'কিস্ হিম্'	—	,,	,,	,,	,,
'চাই একঝাঁক বি-ফিফটি টু বোমারু বিমান'	—	,,	,,	,,	,,
'কিং মেকারের দর্শন চাই'	—	,,	,,	,,	,,

প্রশ্ন : 'স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে মাথার ভিতের'—অনুমান সম্ভব কি?

উত্তর : নিশ্চয়ই, এর জন্যই তো ক্যাপসুল ফর ইনস্টান্ট মেমারি।

অ্যাক্সকিউজ মি মিস্টার : বোরডম্ ও ইম্পোটেনসি ওভারকাম করার কি কোনো উপায় হবে?

উত্তর : রবোটই আপনাদের বলে দেবে সব—

কিন্তু এসবে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন আপনারা—একবার ভাবুন দিকিনি কি সাংঘাতিক ব্যাপার, আজকের মতো 'আবহাওয়া-আবহাওয়া' বলে আর চিৎকার করতে হবে না, আজকের মৃত 'হাওয়া বদলের'ও প্রয়োজন হবে না কিছুদিনের ভেতরেই আর—আপনার শহর, ঘর বাড়ি হাওয়ায় শূন্যে ভেসে বেড়াবে...'

যার যা ভূমিকা :

চোখের সামনে জি. পি. ও-র ওই বিশাল বোঁ-বোঁ ঘুরতে থাকে—তারই সঙ্গে তাল রেখে ঘুরতে থাকে—তারই সঙ্গে তাল রেখে ঘুরতে থাকে মাথা আমার—হাতলে ভর রেখে কোনোরকমে উঠে পড়ি—পা বাড়াই—কিন্তু স্টেপ পড়ে না ঠিক ঠিক—সামান্য হেঁটেই পিছিয়ে আসি চেয়ারের দিকে আবার—হঠাৎ কানের উপর প্রচণ্ড হাসির ঝাপটা—

'আরে বাইরে বেরিয়েই আবার ফিরে এলেন কেন? মনে হচ্ছে দুর্বল চিত্তের—আতঙ্কে শিউরে উঠছেন! নির্ভয়ে করিডর সিঁড়ি পেরিয়ে যান—বাইরে গিয়েই দেখুন না, সবকিছু তাতেই আছে...'

বাইরে বেরিয়ে দেখি, হাঁ ঠিক তাই—

ওই তো ১৪-নং বাসে অফিস যাত্রীরা যথারীতি বাদুড় ঝোলা হয়ে যাচ্ছেন—১২-নং ট্রামের গতি যা হবার কথা ঠিক তাই—ওই সেই বাড়ির উপর, মোরগের, হাওয়ায় যেদিকে মুখ রাখবার কথা, মুখ ঠিক সেই দিকেই—ট্রাফিকম্যান যেমন হাত তুলছে বাস লরি ট্রাম ট্যাক্সি কার সাইকেল ঠেলা গাঁ-মানুষ পেরিয়ে যাচ্ছে তেমনি—যখন বন্ধ করছে, বন্ধ হচ্ছে, পুলিশের যখন হাত পাতার কথা হাত পাতছে, ছেড়ে দেবার বেলায় ছেড়ে দিচ্ছে—

রিভালভার গুঁজে দিয়ে যখন আসামী বানাবার ইচ্ছা, বানাচ্ছে আসামী—ছেড়ে দেবার কথা যখন ছেড়ে দিচ্ছে—শূয়ার কী বাচ্ছা বলার ইচ্ছা হলেই বলে যাচ্ছে শূয়ার কী বাচ্ছা—'স্যার' বলার সময় হাঁটু গাড়তে কোনোই অসুবিধে নেই—

এখন শীত বলে গায়ে শীতের পোশাক—হট কফির দোকানে ভিড়—ম্যাড্‌হাউস তার নিজস্ব জায়গাতেই লক্ষ করছি—শহীদ মিনার, শহীদ মিনারেই, পাদপ্রদীপে যদিও বানানো অশ্রু কয়েক আঁজোল—

আর পানের দোকানে রেডিয়ো যথারীতি :

...আজকের বিশেষ বিশেষ খবর আর একবার পড়ে শোনাচ্ছি : জেইলে শুটিং...বাঁধা মুরগিতে পাল...হেলদি রাইজ ইন্ রেপ...যথারীতি যুদ্ধে জারজ জন্ম...গত ১০ মাসের যুদ্ধে ১ লক্ষ জারজের...

নিয়মিত লাউ গড়গড় রেস—গতকালের মতো আজও রঙিনের ছাতার নীচে :

রমণীর মন, গিনিসোনার গয়না, আসল গুপ্তধন দেহতত্ত্ব, গীতাবালী, চেতাবনী, কো-কে.-কো-লা...

সাড়ে তিন হাত মাংস-সীমা

হাঁটি, হেঁটে যাই—মুক্তাঙ্গনে পাতা ঝরে—হাঁটি, হেঁটে যাই—ওই অন্ধকার কোণে আজো সেই অন্ধ ব্যাঞ্জো বাজিয়ে—কে তার গান শোনে, কাকে শোনায় সে? হাঁটি, হেঁটে যাই—গলায় নেমে আসে, মণিকার হাতে থেকে অদৃশ্য ফাঁস—

'প্রেম চুরির শাস্তি'—'1, 2,...', 'স্টপ!!'—'প্রমাণ অভাবে আসমী বেকসুর খালাস,' 'হোল্‌লি হ্যায়...'

কিন্তু পা যে ক্রমশই ওই ৩-১/২ হাত মাংসের মধ্যে ডেবে যাচ্ছে—ওই সীমার মধ্যে কত যে জানার :

নানকের ওই সবশেষে একট্রে ফুল নাকি—প্লেটনিক লাভ, বিষাদ, ভয়েড ডিজিজ, প্রকৃতি দর্শন, বউটি কনটেস্ট, মিনি বিকিনি, টপলেস, হাইওয়ে বাবারি, 'হাউ টু বি এ সাক্‌সেসফুল সেল্‌সম্যান', রবোট, অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ—এ ছাড়াও আছে জানার :

মেয়ের বয়স—গায়ের রঙ ফরসা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা না কালো—মুখের আদল গোলাকৃতি না লম্বাটে—বুকের গড়ন : গোলকার চ্যাপটা না ছুঁচোলো—বাহ্যিক আকর্ষণ : সেক্সি, স্বাভাবিক লাজুক না নম্র—স্লিম বা স্থূলাঙ্গী—মা হতে রাজি থাকবেন, সন্তান পালনে—স্বামীর প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ততা—স্বামী সেবা পরিচর্যা—এ ছাড়াও গোত্র লগ্ন ঠিকুজি তিথি—

পুরুষ ও নারীর হস্তমৈথুন এবং তা থেকে রক্ষা পাবার উপায় কেন যৌনজড়ত্ব, নারীকে রতিতৃপ্ত করার গোপন কৌশল...কেন সমকামিতা—

ডি. এন্. এ, আর. এন. এ—কী?

কী জিন্ হরমনের কাজ? মস্তিষ্কের, হাতের বুকের হৃদয়ের...?

'ড্রপসিন্...ড্রপসিন্...ড্রপসিন্...সব জানা যায় না...'

ভুয়োদর্শীর প্রশ্নোত্তর : সবচেয়ে উঁচু কে?

: না-আত্মা, না-স্কাইস্ক্র্যাপার...

: ঈশ্বর পুরুষ না মেয়ে?

: ঈশ্বর মেয়ে—না, পুরুষ—না, মেয়ে—না, পুরুষ—না, মেয়ে—ঈশ্বর হিজড়ে—না, পুরুষ—না, মেয়ে—না, হিজড়ে—ঈশ্বর, না-পুরুষ-না-মেয়ে-না-হিজড়ে...।

: ভাগে, ভাগো হিয়াসে—

: কে, কে?

: ঘোড়া চড়ে রায়রায়ান—

সুপার মারকেট

হাঁটি, হেঁটে যাই—

মার্কেটের সামনে ক্রেতা, এজেন্ট বিক্রেতা—সোনার বাজার, চায়ের বাজার, রাণ্ডি ও চোরবাজার—কাছাকাছি সবজি ফল মাংস মুরগিহাটা—বিফ্ প্রতি কিলো ৩—খাসি সাড়ে ছয়—ভেড়া ৭—পালং ০.৩০—বেজায় চড়া আলুর দর—সন্ন্যাসীবাবুর ছেলের দর :

নগদ ৮ হাজার, সোনা ২৭ ভরি, টিসট্ ঘড়ি ১টি, আসবাব চাই ঘর ভর্তি—ফ্রিজার, জামা জুতো ছাতা, বাদামি পাম্‌সু তো আছেই—

ঢেড়স ১ কিলো ১—পটল বারো আনা—আপেল প্রতি কিলো সাড়ে পাঁচ—জনমজুর ২ প্লাস টিফিন—কলার ডজন দেড়—শালুক কলমি আট আনায় ১ আঁটি—৩০, মীরার প্রতি আওয়ার—লেটুস আড়াই—কাটা পোনা সাড়ে দশ—বেছে বেছে কিছু **'রিয়াল লাইফ্ স্টোরি'**র কপি সংগ্রহ করি—এসবের চাহিদা সর্বত্রই আজকাল দারুণ—হট্ কেকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে—ইচ্ছা আছে কিছু কপি তোমাকে পাঠানোর—অবসর ও বোরডমে বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠবার মতো—তাছাড়া অনুরোধের আসরেও অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়—

রিয়াল লাইফ্ স্টোরি :

ঘরের জন্য অলমারি

: তবে অন্য পৃষ্ঠার কথাগুলো একটু গোপনীয়, মান করবেন, প্রকাশ করা যাবে না—

...আমাদের বিয়ের আর মাত্র আড়াই সপ্তাহ বাকি, ভাবতেও রোমাঞ্চ হচ্ছে—কিন্তু সময় যেন আর কাটতে চায় না—এই, তোমার কি মনে আছে, আমরা যেদিন শোবার কথা ভাবছিলাম—ঘরে একটা আলমারির কথা? গতকালই বাড়ি পালিয়ে মনের মতো আলমারি দেখে এসেছি—যেমন মজবুত তেমনি কাজের, তোমার ওই ঠিক ইয়ের মতো—ভেতরে প্রচুর জায়গা, আমার তোমার অনায়াসে কাজ চলবে—এমনকি ভেতরে প্যাকার পর্যন্ত—জমিয়ে রাখার সব রাখা যায়—আমার তোমার গয়না অনায়াসে রাখতে পারবো আর আমাদের প্রেমপত্র...

বান্ধবীর কাছে

রিতা, তুমি হয়তো ভালোই আছ। আর থাকবে নাই বা কেন! তোমার যে রয়েছে এক সার্বভৌম জীবন!

এতদিনে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা হয়তো তোমার অজানা নেই—অতি গোপনে এই চিঠি লিখতে হচ্ছে—জানি না শেষ অব্দি পৌঁছুবে কি না—আর ধরা পড়লেই...

একদিন আমাদের বাড়িতে একদল লোক এসে আমাকে একটি জীপে তুলে নিয়ে যায়। কোথায় যাচ্ছি, জানি না। মুখ বন্ধ। পথে গাড়ির মধ্যেই অত্যাচার। কোয়ার্টারে জিপ পৌঁছল এবং আমায় একটা ঘরের তালা খুলে তার ভেতর ঠেল ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে দেখলাম আমার মতো আরও কয়েকজন।

কিছুক্ষণ পর একদল এসে সেখানেই আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করলো। দিনের পর দিন সন্ধায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভোরে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হয়। বাধা দিলেই অত্যাচার--রাবারের চাবুক দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটানো হয়। দিনে একবার মাত্র খাবার দেওয়া হয়। খাবার হলো কয়েক পিস রুটি ও ১ গ্লাস জল। দিনে মাত্রা ৩ গ্লাস জল দেওয়া হয়।

অত্যাচারী শ্বেতকায়, অশ্বেতকায়। ঠোঁট ফাঁক করলেই অত্যাচার। আমাদের মধ্যে অনেকেই আত্মহত্যা করেছে। প্রায় প্রত্যেকেই অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান জন্মাবার আগেই মারা গিয়েছে কয়েকজন। জন্ম দিয়েই কেউ কেউ। আমিও অন্তঃসত্ত্বা কিন্তু কী প্রসব করবো আমি?

"চিঠি...চিঠি...চিঠি"

কোথা থেকে চিঠিটা পেলেন? সোর্স বলুন! কার কথায় প্রকাশ করলেন?

ওটি আমাদের চাই। যদি না দ্যান তাহলে আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে পারবেন না।

...আমাদের লিখিত একটি বিবৃত্তিতে সই দিতে হবে, না দিলে আজ রাতে আপনাকে ডুবিয়ে মারব। কাগজে খবর বের করে আপনি আত্মহত্যা করেছেন।

আমাদের কথামতো ওটি ফেরত ও বিবৃতি না দিলে ৪ দিন পরে হত্যা করা হবে, কাগজে খবর হবে, জেলে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করেছেন, এতে ওয়ার্ডারের চাকরি যাবে, তবে তাকে রক্ষা করার অসুবিধে নেই।

সবকথা প্রকাশ করলে আপনাকে সরিয়ে ফেলব...

মিত্রতা কী যাত্রা

...হাঁ স্যার, মিত্রতা কী যাত্রার পথে যা সব কাঁটা ছিল, মোটামুটি উপড়ে ফ্যালা গিয়েছে—স্বাভাবিক আগের মতোই হাটবাজার রাস্তাঘাট, বাদবাকি সব প্ল্যান মাফিকই এগোচ্ছে :

বর্ণাঢ্য মার্চপাস্ট, অভ্যর্থনা তোপধ্বনি, জাতীয় সংগীত, রাখিবন্ধন, শপথবাক্য পাঠ, প্রাচীনপ্রথায় ৬ মিটার দীর্ঘ ৮টি অ্যাল্‌পাইন শিঙ্গার গুরুগম্ভীর নিনাদ—

ভালোবাসা ও জীবনবীমা, আচরণ বিধি : কেউ বাবা, কেউ মা, কেউ মেয়ে—নিয়মিত জেন্‌ডার জ্ঞান, বেশ্যামরণ পরদার গমন, পরপুরুষ সংস্রব, বিধবার গর্ভে সন্তান, কুমারীর গর্ভে সন্তান, অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি, খরায় নিয়মিত সাহায্য, ক্ষুধায় লুপ ও বুলেট, গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ

পাচার,

লেখাছাপা, বই প্রকাশ, বিধিবদ্ধ নায়ক নায়িকা, হঠাৎ দেখা', কাঠামো, স্টোরি প্লট, প্রতি-নায়ক মাকু চালাচালি, শেষ শুরু দাঁড়ি কমা, মায় সেমিকোলন অব দি—

এ সপ্তাহে 'A'—যদি আগামীতে নিশ্চয়ই 'U', ভাইস্ ভারসা—আছে, আরও আছে, বুক ব্যথায় অব্যর্থ বাম, ফুরিয়ে গেলে আবার—গ্রীষ্মবর্ষাশরৎহেমন্ত-শীতবসন্ত-সাইকল্ যথাযথে হাওয়া-অফিস্—ঘরে নিয়মিত রোজগারে ফূর্তিবাজ লোক—

নিয়মিত ৬টার সময় সংকেত, বন্দোমাতরম্, ৬-০৫ সুভাষিত ৬-১০ সংগীতাঞ্জলী ৬-২০ লঘুসুর ৬-৩৫ ঝাড়ু ৬-৩০ ঝি, বাসনকুশন পয়পরিষ্কার, উনান্ পরিষ্কার, মুখে আগুন ৬-৪৫ দেশবন্দনা ৬-৫৫ সানাই ৭-১০ বেডটি উইথ্ খেজুরে আলাপ ৭-১৫ আবহাওয়াবার্তা ৭-২০ ক্লিয়ার পেচ্ছাপ পায়খানা ৭-৩০ সংবাদ : হচ্ছে...হবে...খুন...হনন...হত্যা...গ্রেপ্তার... অভ্যর্থনা...তোপধ্বনি...অনামী আততায়ী...৮-১৫ বড়ো ব্যথা, চা বড়ো তেতো ৮-২৫ দাঁড়ি ছাঁটাই, বোগল ছাঁটাই ৮-৪০ দাঁত সাফাই ৯ স্নান ৯-১৫ উইথ গান পড়নে ধড়াচুড়া ৯-৩০ খাওয়া ৯-৪৫ দাঁত সাফাই ১০টায় হাজিরা সহি ১০-১০ ফাইল্ ইজ পুটু আপ...প্লিজ অ্যাক্স্পিডাইট...ফর ইয়োর কাইন্ড পেরুজাল...১০-৩০ ফর ইওর কাইন্ড পেরুজাল...ফাইল্ ইজ পুট আপ...প্লিজ অ্যাক্স্পিডাইট ১২-৩০ ফাইল ইজ পুট আপ...১২-৫০ ফর ইয়োর কাইন্ড পেরুজাল...১-৩৫ প্লিজ অ্যাক্স্পিডাইট ১-৪০ লাঞ্চ আওয়ার ২-৩০ মন্থর গতিতে কোল্ড কফি, ওই গতিতে ফেরিঅলা, লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি, ইং খবর, রিকশোঅলা ঠ্যালাঅলা, গলিতে কুকুর, মিট্রিঅলা, বেকার মন্থর গতিতে, হাত বুকপকেটে ৪-৫০ ফাইল্ ইজ পুট আপ...আমি যতদূর জানি সে সৎ, বিনয়ী কর্তব্যনিষ্ঠ...মে বি প্রোমোটেড ৫-০০ সময় সংকেত ৫-০৫ খেয়াল ৫-১৫ অবকাশরঞ্জন ৫-৩০ খেয়াল ৬-০৫ আবহাওয়াবার্তা ৬-১০ ক্লিয়ার পেচ্ছাপ পায়খানা ৬-৩০ চা উইথ খেজুরে আলাপ ৭-৩০ সংবাদ : ...হচ্ছে...হবে...গ্রেপ্তার...হনন...হত্যা...অভ্যর্থনা... তোপধ্বনি...অনামী আততায়ী...৭-৫০ বড়ো ব্যথা, চা বড়ো তেতো ৮-০০ সবিনয় নিবেদন ৮-১৫ একমুঠো ধুলো তুলে নাও ৮-২০ রাগপ্রধান ৮-৩০ বাণিজ্যবার্তা : চমৎকার, ধরা যাক দু'একটা ইঁদুর এবার ৯-০০ খেয়াল ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন ৯-৫০ বিচিত্রা ১০-০০ সংবাদ : হচ্ছে...হবে...হনন...হত্যা...গ্রেপ্তার...অভ্যর্থনা...তোপধ্বনি...অনামী আততায়ী...১০-১৫ খাওয়া বড়ো তেতো...ব্যথা বড়ো...১০-২৫ দাঁত সাফাই ১০-৩০ অনুরোধের আসর : মর্দন...মন্থন...রোমন্থন...চুম্বন...রমণ...১১-০০ ঘুম, সঙ্গে আবহাওয়া বার্ত।

সাগরে নিম্নচাপ...ঝড় বিদ্যুৎ, নিদারুণ সংকটের মুখে আলো ফোন তার বেতার...

বাবা, বহুদিন শোক নাই ব্যথা নাই, কেবল খরা, জল নাই, মেঘ নাই, বীজ ফসল নাই, শুকনো মাটিতে পা ফেলার জো নেই...রাতে বিশ্রাম নাই...আল্লা মেঘ দে...পানি দে...

একটি একাঙ্ক

[চরিত্র : একক, তবে তার দশ দিকেই খাড়া সঙ্গীনের মতো মাইক মাইক্রোফোন, মেগাফোন-- আলো : ভাসানো কৃত্রিম সূর্য থেকে ফ্লাড লাইট]

: আমি তো চাইনি, তবু কেন আমাকে স্ট্যান্ড বাই এই এদের মাঝখানে ড্রপ করা হলো? জানতে চাই আমি--ড্রপড মি, হু হ্যাভ...[জুতো ঠোকে সে] হু হ্যাভ...? [তৎক্ষণাৎ মাইক মাইক্রোফোনে : হো-হো, হা-হা, হি-হি—উপর্যুপরি হা-হা, হি-হি, হো-হো—হো-হো, হা-হা,

হি-হি—এসবের ধ্বনি প্রতিধ্বনি—তার দুই মাড়ি ফুলতে থাকে—চিবুকের রগ—সে একবার বাম দেখে, একবার দক্ষিণ—বাম ও দক্ষিণ, দক্ষিণ ও বামে কেবলই চোখ ঘোরায়]

: কিন্তু এরা টারগেট্ কে কার? এখন কেবল হুইসিল-এর অপেক্ষায় যদিও এই [বাম দিক নির্দেশ করে] ক্রমজটিল রকেট, রকেটলন্চার এল্ এম্..., ব্রেনস্টেন্ মেশিনগান্—রিকয়েল্‌লেস্, প্যাটন্ নাপাম্—শেষ সংস্করণের করাত ওই, ঘাসের ডগায় ফণা তুলে লিক্‌লিক্ করবে যে মাইন্...এবং সদ্য ক্রিজ ভেঙে মার্চ লাইনে দাঁড়িয়ে নিস্‌পিস করছে ওই ওরা...

: কী অর্থ এসবের—কে জাবাব দেবে—হু উইল্? মুখোমুখি কেনই বা? [আলোয় প্লাবিত বিশাল গ্রাউন্ড নিরুত্তর, কিন্তু তার প্রশ্ন ক্রমাগত হিট জেনারেট করে—অতিরিক্ত হিটে লাল হয়—কাঁপে—ফুলে ওঠে—হঠাৎ কী হয়, বাম লাইন থেকে একটা ব্রেনগান্ টেনে আনে হিড় হিড়—তাকে জাপটে ধরে—মাটিতে পেড়ে ফেলে তাকে—চলে ক্রমাগত কিল চড়, ঘুষি, লাথি—গল্ গল্ রক্ত বেরোয়—স্কাল্ ফেটে খিলু—হাজার হাজার তার কয়েল্—লক্ষ বছর জুড়ে রাখতে পারে এমন রিলে তার—আবারও লাথির ঘায়ে মাংস ছিটকোয়, বিশৃঙ্খল নার্ভের দড়ি—গোপন বীর্যস্থলী বার্স্ট করে—প্রস্রাব থলি—ফ্রেশ খাবার ও বদহজম হয়ে যা গোলমালের ঘোর—৭ সিট পাপ বেরোয়—৭ সিট পূণ্য—৯ সিট প্রেম—৯১ সিট অপ্রেম—স্নেহজাতীয় এক কৌটো—খোকায় আঁটা ফুল—কয়েক পাতা ভ্রমণ বৃত্তান্ত—গ্রহ নক্ষত্রের গুটি কয় পদচ্ছাপ—১ সিলিন্ডার অক্সিজেন—১ সিলিন্ডার ভয়—এক গোছা পাখির পালক—উদ্ভিন্ন পতাকা এক—ক্যষে হাঁকায় আরও এক লাথি—ছিন্ন শরীর আরও অংশে—ওইসবের একটায় মার দুধ লুকিয়ে রাখা ঝিনুক বেরোয়—চাঁদের সামান্য টুকরো—কাজলা দিদির ছোট্ট লিপি—লুকোনো শ্লোক—শোক—বাঁশি ছোট্ট কু-ঝিক্—সোনার টোপর মাথায় দিয়ে টিয়ে—অন্নপ্রাশনের ভাত কয়েকটা—বসায় লাথি আবারও—নাভিকুণ্ডের খিল্ ছিটকে যায়—ছিটকে যায় ঝাঁপি এক, ঝক ঝক...

তার চোখ থেকে টপটপ জল পড়ে—কিন্তু শরীর তবু ফোঁসে ও ফোলে, ফোলে ও ফোঁসে...হঠাৎ কয়েকটা স্টেপ বাড়িয়ে এক হ্যাঁচকায় টেনে আনে ডান দিক থেকে অ্যাটেনশান্ একজনই ওই ওদেরই—কয়েক টনের ক্রেন্ যোগে তাকে চচ্চড় উপরে তোলে, আছাড় মারে এমন শব্দে, কেঁপে উঠে বিশাল গ্রাউন্ড—কিছু আগের অ্যাটেনশান্ সে টুকরো হয়—বেরিয়ে পড়ে ব্র্যান্ড নিউ নিপীড়নের যন্ত্র কত—

নিভৃত আলাপ টেপ করার যন্ত্র—বারণের যন্ত্র, মুখোমুখি কথা বলার সময় মাঝখানে হাঁ বলে থাকবেন উনি, অর্থাৎ আমি কথা বললে, উনি গিলে ফেলবেন এইহেতু সে শুনতে পাবে না, সে বললে উনি গিলে ফেলবেন, শুনতে পাবো না তাই—

মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের বৈদ্যুতিক হোস পাইপ—পুরোপুরি ফ্ল্যাট করার যাদুদণ্ড—স্বীকারোক্তির পিন আলপিন—জাপটে ধরার সাঁড়াশি—লুটরাজের যন্ত্রহাত—ইন্‌ফ্রারশ্মি ক্যামেরা ফর আন্‌গারডেড্ ফটোচিত্র—অকথিতকে বের করার ডিভাইস্, কথিতকে বের করার ডিভাইস্, কথিতকে লোপ করার—

এমন ড্রিলযন্ত্র যার স্পর্শেই ডিটেক্ট হবে, কোথায় পাতা ইন্‌ট্যাক্ট চেয়ার উৎপাটনের জন্য রিফিউজড-মানুষের ডিনামাইট—

সে বাম দক্ষিণে অনবরত চোখ ঘোরায়—তার শরীর সঙ্কুচিত হতে থাকে ক্রমশ—কাঁপে থর্ থর্—শরীর দেখতে দেখতে সাদা—হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে।

: হা ঈশ্বর...
[তৎক্ষণাৎ মাইক, মেগাফোনে]
: হা-হা...হি-হি...হো-হো...হোহো...হাহা...হিহি...
[পর্দা নেমে আসে]

স্বাগতমে কার্পেট

পিওন আসে—বাকসে ফেলে যায় চিঠি—আজও কত কত, কিন্তু তোমার নেই—কত কতদিন নেই তোমার—অথচ কথা দিয়েছিলে (আমিও দিয়েছিলাম অবশ্য)—অন্য পৃথিবী থেকে হলেও আমাদের উপর গ্রহাদির প্রকোপের বিষয়ে নিয়মিত নজর রাখবে—নজর রাখবে নিয়মিত বায়ু ও স্বাস্থ্য চলাচলে, জরিপাদির কাজকর্মে—দরকারে গাইড আসবে—পরিষ্কারের ভার তোমার উপর, টিকা টিপ্পনী, কুটপ্রশ্নে যদি কখনো জটিলতা—পরিবর্তে আমিও পাঠাব আমার চলাচল ম্যাপ, চিঠি, তার—পরস্পর কথা হয়েছিল, প্রয়োজনে হাজার হাজার বছর ধরে লিপি চালাচালি করে যাবো, আশা, যদি কখনো, অপ্রতাশিতভাবে হলেও, অবিকল ইতিহাস খুঁজে পাই—

অথচ, অদ্যাবধি তোমার কোনো বিশদ সেই—যদি কখনো, কৌতূহল মেটে না—জানার ইচ্ছে হয়, তোমাদের ওখানে যারা, তাদেরও কি আমাদেরই মতো হাত পা, নাক, মুখ,—একটি মাত্র নাক কি মুখ দিয়েই তাদের শ্বাস প্রশ্বাস যথাযথ—কুঠারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কী—ওসবে ভর রেখেই আরোহণ বা অবরোহণ—

লোকশ্রুতি : সেখানে 'প্রতি-জল,' 'প্রতি-ফল,' 'প্রতি-যান', 'প্রতি-অম্লজান,' 'প্রতি-নারী'র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—শিশুর আবির্ভাব সেখানে খুবই সাধারণ ঘটনা—সাধারণের ঘটনা—এবং তার আগমনে কোনো বাবা মারই মাথা রক্তবমি করে না—তার জন্য প্রয়োজনও হয় না কোনো কারণেই কারোর রক্ত সাকিংয়ের—

এবং সংঘটিত বা নষ্ট হয় না দৈবসঙ্গম, ইউ-বি-আইতে ডিপোজিট বা "ডেথ্ ইন্‌সুরেন্‌স" মনে রেখে—

কিংবদন্তী আরও, সেখানে চেয়ার, চেয়ার পরিকল্পনা নেই, ফলত নেই আরোহণ, অবরোহণ, বা নির্বাসনজনিত হচপচ—

যাই হোক, তুমি আমার এতাবৎ পাঠানো ডেস্‌পাচগুলি কনফার্ম করো—এই তো সামনে তোমার দেয়া 'বিশ্ব-পরিচয়'—বই খোলা বটে কিন্তু পঠন শেষ হতে চায় না—সম্ভবও হয় না এড়িয়ে যাওয়া—এত দীর্ঘ, পাতা উল্‌টোলেই সঙ্গে সঙ্গে হাজির আর এক—কেবল উল্‌টিয়ে গেলেও এসে পড়ে না শেষ পাতা—হাই ওঠে—

জামা কাপড় পরি, বাইরে যাই—হাঁটি, হেঁটে যাই—

পাঞ্জাবীর বোতাম টোতাম আল্‌গা করি, গেঞ্জি ট্রাউজার—হড়হড় ঢেলে দিই ভেতরে এই জীবানুনাশক রোদ—সম্ভবত এইসব রোদেই গায়ের পুরোনো গন্ধ একদিন মরে যায়, দশ কৌটো চার্মিস্ মেখেও যা ঢাকা যায় না—মরে চাম উকুন, ৫ বোতল ডেপিল ফিনাইল সরাতে পারে না যাদের—পুরোনো চামড়ার ক্ষত সেরে যায়, ডাক্তার জানে না কী মলম, কী নাম তার—

চোখ উপরে তুলি, পাখি আর পাখি—খুব সম্ভব শীতল জল থেকে আজ এই রোদে ভর রেখে উঠে পড়েছে ওরা—জানে না, যাবে কোথায়, কীসের জন্য কিন্তু এই প্রকার এক একটা

রোদে উঠে পড়ে খুব জরুরি—জরুরি খুব চুল ঝাঁকানো ঘাস সবুজের পক্ষে—

হাঁটি, হেঁটে যাই—ওরা, মানে ওই শাদাচুল, পরিষ্কার মুখ, শাদা ট্রাউজার পাঞ্জাবীর ওই উনি ও পাশের ১৮/১৯-র কিশোর, খুব সম্ভব লক্ষই করে না আমাকে কিংবা দেখেও দেখে না—কিন্তু দেখি আমি আর তর্‌তর্‌ বেড়ে যাওয়া এই মাঠ, ঘাস সবুজ—শীতল জল থেকে উঠে পড়া ওই পাখি—জীবানুনাশক রোদ এই, উপরের নীল ওয়েভ দেখে—তাদের পাশে চঞ্চল ইজেল্‌ রং তুলি...

"কম্‌প্লিট?"

"হাঁ"

সে ইজেল সামনে বাড়িয়ে দ্যায় ওই পাকা চুলের মানুষের দিকে—সে দ্যাখে, দেখি আমিও ওই ছবি ও তার নাম :

"ভালোবাসা স্বাগতমে কারপেট পাতো"

হঠাৎ বিদ্যুৎ-লেখা আকাশ চম্‌কে তোলে—পুব থেকে পশ্চিম, পশ্চিম হরাইজন্‌ থেকে পুব হরাইজন্‌ :

ভা ল বা সা
স্বা গ ত মে
কা র পে ট
পা
তো

[অসমাপ্ত]

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের পর

আমি এখনও মাঝে মাঝে সেইসব সু-দৃশ্য কল্পনা করি,
মাছের মতো ভেসে বেড়াচ্ছো অন্ধকারে, রূপোলি উরু বেয়ে
ঝরে যাচ্ছে জলের কণা, শীতলতা — আর ওই গোলচাঁদ
লাফ দিয়ে নেমে এসেছে আমার টেবিলে! মোমবাতি জ্বাললে
আমার পেটে জাহাজের গল্প-সল্প উলসে ওঠে,
প্রচুর মদের কথা মনে পড়ে — জাহান্নামে যাও তোমরা সব,
এই ব'লে একদিন রেলিঙ থেকে দাঁড়িয়ে বমি করেছিলুম সমুদ্রের জলে।

আমি এখনও মাঝে মাঝে সেইসব সু-দিন কল্পনা করি,
দুঃখের আমার চোখের পাতা জুড়ে যায়, বৃষ্টির মধ্যে বিদেশি হোটেলে
ছাতের ঘরের ছবি ভেসে ওঠে — জানালা দিয়ে
ঢুকে পড়ছিলো নোনা বাতাস, ছুরির মতো শীত আর সেদ্ধ মাছের হাঁড়ি
ছিটিয়ে পড়েছিলো ঘরের এককোণে — শাদা চাদরপাতা ধ্যামসানো খাটে
আড়াআড়ি আমার হাত তোমার গোপনতায়, সরু একটা জলের রেখা
খালের মতো ঢুকে যাচ্ছে তোমার শরীরে। তারপরেই তো যুদ্ধ হলো,
হাত ছিঁড়ে গ্যালো করো, কারো বা পা — কমলালেবুর
বাজার ভারী উচ্চদামে একদিনে বিকিয়ে গ্যালো। বিপ্লবীদের
ইস্কুল তৈরি হলো ও ফের ভেঙে পড়লো মাটিতে, শুধু
রাতের অন্ধকারে একদেশের প্রধানমন্ত্রীর শুকনো ঠোঁটে চুরুট
ঘসে দিলেন অন্যদেশের প্রধানমন্ত্রী।

নার্সদের মধ্যে সমকামিতা নিয়ে এক পরিচালক একবার ছবি তুললেন
বিরাট — ভুঁড়িওলা, গোদা একজন যুবতী নার্স খটখট করে এগিয়ে
এসেছিলো সেদিন, পরিচালককে প্রশ্নে নাজেহাল করে দিয়েছিলো,
হাজার প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরেছিলো সে — শূন্যে।

এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়া বর্ণাঢ্য যুদ্ধের কথা আমি আজও মাঝে
মাঝে কল্পনা করি — পেটের ক্ষতস্থান থেকে আজও চাপ দিলে

চুঁইয়ে পড়ে রক্ত — যেভাবে বন্দর ছেড়ে এসেছি একদিন
তুমিও সেভাবে সরে গ্যাছো আজ অনেক দূরে,
দেশের ডাক ও তার বিভাগ আরও সচল হয়েছে — আমার কাছে
নীল খামে ক'রে একদিন সরকার থেকে পাঠানো হয়েছিলো
সরকারি শান্তিবাণী ও স্মারক। আমার নতুন বউ-এর
পেটে কিলবিল ক'রে নড়ে উঠছে আমাদের প্রথম বাচ্চা—এখন
সবকিছুই ভেবে নেওয়া আর সহজেই বাসে ক'রে
চলে-যাওয়া গ্রামের বাজারে — সস্তা খুঁজি,
আনাজপাতি সাজিয়ে মাঝে মাঝে আমাদেরও বনভোজন হয়
বৃষ্টির দিন — মাথাভর্তি কম্বল ঢেকে বিদেশিদের লেখা
বই পড়তে পড়তে আমি ক্লান্ত কুকুরের মতো জিভ বুলিয়ে
ঘুমিয়ে পড়ি।

কোনোদিন অদ্ভুত খিতে পায় আমার, ইচ্ছে করে দোকানের
ভেতরে ঢুকে চোখের খিদেয় খেয়ে ফেলি সমস্ত সাজানো খাবার,

ইচ্ছে করে তোমাকে দেখি — কেমন বন্য হয়ে গ্যাছো তুমি
গা ভর্তি চুল কীরকম উড়ছে হাওয়ায় — বাথরুমে ঢুকলেই
তোমার গলা হেঁড়ে হয়ে যায়, এখনও কি দোল খাচ্ছো মাথা নিচু করে?
বাঁশের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে শহর ভরে গ্যালো,
বনমানুষের মতো লোমভর্তি তোমার ল্যাঙটো পা বারবার
নিয়তির নির্দেশে ঠুকে যাচ্ছে ছাদে।

জর্জ ডাউডেন

কলকাতায় আমার কবি-ভাইদের সঙ্গে, ট্রেন ছিল সমুদ্রগামী

মাত্র কয়েক বর্গ ইঞ্চি নির্দিষ্ট আসনে বসে আছি, ভয়ঙ্কর হিম—হিম পাশের এই লোহার সিঁক, ট্রেনজানালা, সহযাত্রী এতসব দরিদ্র মানুষ—দারিদ্র যে হিম অসহ্য আরও—আমার আত্মা যেন এতক্ষণ বুড়ো ঘোড়ার মতো ঘাড় গুঁজেছিল—তখন বাঁশির আর বিশেষ দেরি নেই, তোমাদের দেখা মাত্রই আস্তাবল ছেড়ে লাফিয়ে বেরুলাম—প্রদীপ সুভাষ শৈলেশ তোমরা কবি, কবি বলেই ভাই আমার—ভাই ও বন্ধু—কবি-ভ্রাতা আমার—

আর অধীর আমি, আমি তখন ক্রমাগত খুঁজতে থাকি, গঙ্গার ধারে যা সব সেদিন রেখে এসেছিলাম—ওই সিঁড়িকে সেদিন পুত করেছিলাম আমরা—চিতার নিঃশেষ দেখেও আমাদের উত্থান ও জাগরণ, জাগরণ উত্থান—আর শ্মশানের ওই চুরি হয়ে যাওয়া সন্ন্যাস-বালক, ওই বালক সে তো আমাদের কারো হারানো খোকা কিংবা সে ছিল ডাউডেন, প্রদীপ বা সুভাষ, সুভাষ বা শৈলেশ্বর—

তোমরা এসেই বিস্ফোরণ ঘটালে—আঁজলে আমার টগবগ করছে গোলাপ, শাদা লাল—আমার গায়ে এখনও তোমার গা থেকে খুলে দেয়া সোয়েটার সুভাষ, কনক, ধন্যবাদ! গলায় আমার কম্‌ফরটার প্রদীপ, তোমারই দেয়া, ধন্যবাদ গৌরী—তোমাদের নেশাচালিত আত্মার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তর্‌তর্‌ বেড়ে উঠেছি কখন্‌—আমি এক কবি ও পর্যটক, আমার ভাই ও বোনেদের এইসব ভালোবাসা—বাঁশি বাজে—জানি আর কিছু বাদেই পকেটে চালান করবে ওয়েভি ফ্ল্যাগ্‌ ওই বেতনভুক গার্ড—কিন্তু আমার মাথার উপর তখন জাগ্রত নিশান—অতি দ্রুত কুড়িয়ে নিই ঝুলতে আমার, তোমাদের সহিত সেইসব পথ (যা কখনই Oh! calcutta নয়), ময়দান, আত্মার চালিকা ওই খালাসিটোলা—ট্রেন এগিয়ে যায়, প্ল্যাটফর্ম পিছিয়ে বা পিছিয়ে যায় ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম এগিয়ে—কিন্তু 'গুড বাই' বলি না আমরা...

[অনূদিত]

আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়োজিত কার্যক্রম

বাসস্টপেজে এসে দাঁড়াই। হিপ পকেটের উপর আলতো হাত ছুঁইয়ে দেখি কায়েদে আজম্ ছবি আঁকা ন্যাকড়া জড়ানো টাকাগুলো আছে কিনা! নিচু অনাড়ম্বর পাবলিকবাস অবহেলে ছেড়ে দিই আজ, ডবল ডেকার কাছে আসে—তাছাড়া অন্য রুটে অন্যভাবে যাওয়ার খুশিতে লাফিয়েই ফুটবোর্ডে—দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে সামনে এগিয়ে সিটে বসি। কণ্ডাক্টর পিছন পিছন তাড়া করে—'আদেখ্‌লে, গাঁইয়া...যত্তোসব'...বিড়বিড়িয়ে বলতে বলতে চিড়িক্ শব্দে টিকিটগুলোর উপর দিয়ে বুড়ো আঙুলের ছড় টেনে যায় তারপরেই গম্ভীর হবার চেষ্টায় বিতিকিচ্ছি রেখা ফোটায় কপালে-মুখে। বিরক্ত হই ১৫ পয়সা বাঁচলো না ভেবে। তাচ্ছিল্য করে দিয়ে দিই—দেখি হাউজিং এস্টেট্ স্টপেজ থেকে শশী ওঠে। দ্বিতল ফাঁকা—অসম্ভব ফাঁকা চলে আয়—ঝুঁকে পড়ে রুমাল শুদ্ধু হাত নাড়াই। পেছন সিটের এক ছোকরার কোল থেকে বেজে যায়—'বিজ্ঞাপনদাতাদের দ্বারা আয়োজিত কার্যক্রম' ক্রিং...ক্রাং...ক্রাং...ক্রিং...ক্যালোরিতে ভরপুর—আছে কোকো, মল্ট...সুবাসিত অ্যান্টিসেপটিক্ বোরোলিন—বোওওরোওলিইইন ক্রিং ক্রাং ক্রিং। আরও পুষ্টি বেশি দেয়—পুষ্টি বেশি দেয়—আরও পুষ্টি বেশি দেয়—ত্রিং ত্রাং...মাথায় আঘাত করে—আপদ যতো, মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শশীকে ডাকি—কী হাবার মতো দাঁড়িয়ে আছিস? চলে যায়। চেঁচিয়ে ডেকেছি কাউকে ভ্রূক্ষেপ না করে। রোগা ছেলেটাকে বলি—দাদা একটু সরে বসুন না, এ অনেকদূর যাবে। শশী এক পা ঝুলিয়ে থিতু হয়ে বসে—লাজুক হেসে হাতের কাগজমোড়া প্যাকেটটা দেখিয়ে বলে—একটু চোরামার্কেট যাবো এটা ঝাড়তে তারপর লটারীর দোকান, ওই যে এস্ পালের...শুনছিস্, একটা করে গান তিনটে বিজ্ঞাপন—তিনটে বিজ্ঞাপন একটা করে গান—যা ভালো লাগে না মাইরি বিজ্ঞাপন-কার্যক্রম।...টালা ব্রিজের'পর ১১নং বাস উঠছে হঠাৎ শশী জোরেই চিৎকার দিয়ে ওঠে—ওই দ্যাখ TARGET, নতুন বাজারে ছেড়েছে মাইরি for adults। তারপর ফিসফিসিয়ে কানের কাছে, প্রায়ই-না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি আয়েস করে সিগারেট টানছি—India King আর সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখলেই বড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়ি—কত ধরনের সিগারেট খাই তবু কেন যে এরকম হয় বুঝি না—ডাক্তার বন্ধু শুনে বলেছে, বিকৃতি এটাও এক ধরনের। ও এমন অনুযোগের ভাষায় বলে যায় যে আমি বিরক্ত হই—চোখ ফেরাই রাস্তায়। জানালা গলিয়ে দেখি, এক ঠেলাওয়ালা 'খবরদার্ খবরদার্' হেঁকে এক জেলে মাগির পোঁদে জোর লড়িয়ে দিয়েছে। গামছা ঢাকা চেঙারী, দাঁড়িপাল্লা আর কতকগুলো চুনোমাছ রাস্তায় ছিটকে পড়ে—আধাউলঙ্গ জেলেমাগিটা শুয়ে উপুড় হয়ে, রাস্তার গলন্ত পিচে তার কাপড় আটকে আছে—সে প্রাণপণে খিস্তি দিয়ে চলেছে আদ্যন্তকালের পথিকদের। একটা রোগাপটকা লোক তাড়াতাড়ি '(একি!)' অশ্লীল-অশ্লীল-জঙ্গল-জঙ্গল' বলতে

বলতে ট্রাম লাইন ক্রস্ করে যায়।

শশী ওর কথা শুনছি না দেখে পকেট থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজের কাটিং বের করে ঝুঁকে পড়ে। তাতে দেখি দুটো ছবি—পাশাপাশি একরকম। নীচে বাড়ির ছবি আঁকা অথবা ৫০, ০০০ টাকা। মায়ের কাঁধে হাত রেখে ছেলে স্কুলে যাচ্ছে ছবিটা এইরকম। একটার সঙ্গে মিলিয়ে অপরটার খুঁত বের করতে হবে।...তাকিয়ে দেখছি বুঝে ও বলে—কবে যে একটা হুন্ডা মোটর সাইকেল কিনব—শালা মাল তুলে তুলে সারা কলকাতা চক্কর-চষে বেড়াব। এই দেখ না, —'আমাদের প্রোডাক্ট ক্যানো আপনার ভালো লাগে?' ১৬ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভাষাটা, কী বলে, ঋজু, দ্রুতগতি মানে একটু চাবুকের মতো হওয়া দরকার তাই না? আমি ফিক্ করে হেসে ফেলি। পরক্ষণেই বলি, তুই একটা লোক হয়ে গেছিস মাইরি। ও সহজভাবে কথাটা না নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেয়—তুইও তাই—যত বুড়ো হবি তত কোথায় সস্তা সেকেন্ডহ্যান্ড খুঁজবি, ব্যাংকিং-ইনস্যুরেন্স বিজনেসগুলো ফাঁপবে—তত গ্যাম্বলিং'এর দিকে ঝুঁকবি ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ আমাকে আবাক করে বলে তুই ব্যাংকে চাকরির চেষ্টা করছিস না? এত লোক নিচ্ছে, সিকিউরিটি-ওভারটাইম-বোনাস...। এই মওকায় ওকে বলি—তাদের ব্যাংকেও তো লোক নেবে, একটু কাজিন ব্রাদার ট্রাদার বলে রেকমেন্ড করে দে না? কিংবা তোর বাবাকে শ'দেড়েক টাকার একটা যা হোক জুটিয়ে...আমাকে মাঝ পথে থাময়ে বলে, এখন সব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হয়—তোদের একদম কমপিটিটিভ মোটিভ নেই—আমরা যেভাবে ঢুকেছি ঢুকেছি—ব্যাকিং'এর দিন চলে গেছে।

শিয়ালদা এসে যায়। কনুই দিয়ে লোক গুঁতিয়ে ঠেলে নেমে পড়ার সময় আমিও দুবার 'জঙ্গল জঙ্গল' বলি। কেউ তাতে গুরুত্ব দেয় না। ফুটপাত বদলে ফেলি। যেদিকে টাকা বা ধাতুর চাকতি নাচানোর শব্দ হচ্ছে আশা করেছি সেদিকে আসি—খুঁজতে থাকি কে টাকা নাচাচ্ছে। চোরাটাকা কেন-বেচার এত চালু ব্যবসা কি এরা ছেড়ে দিলো? সবাই ভালো মানুষের মতো ব্যবসা করে—কী ব্যাপার! সহসা ইট পেতে একজন একগোছা টাকা কোলে করে বসে আছে দেখে জিজ্ঞেস করি—কী দাদা, আভি কেয়া ভাও? : পাকিস্তান না ইন্ডিয়ান?—(এ শালা লোকটা দেখছি বাঙালি!) পাকিস্তান আছে, কত করে দেবেন? ইন্ডিয়ান নেবো। : ২৫ টাকা করে দর পাবেন, কত আছে? কোত্থেকে সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন ছেঁকে ধরে আর থেকে থেকে চাকতি নাচায় সাড়ে ২৫, ২৬ টাকা দর ওঠে। শেষে এক যণ্ডামার্কা লোক ৩০ টাকা শো'য়ে দিব বাবু হুই যে হামার পান দুকান বলে 'চিড়িক্' মুখে শব্দ করে চোখ টিপে দেয়। আমার কাছে এখন নেই—আনতে যাচ্ছি—ঘন্টাখানেক পরে এসে তোমাদের কাছ থেকেই ভাঙাবো বলে অন্যদের কাছ থেকে ভেগে গিয়ে, হেঁড়ে গলায় ৩০ টাকা দরে যে বিহারিটা দেবে বলেছিল তার পিছু পিছু সরে পড়ার চেষ্টা করি। অন্যরা তবু আমার হাত-জামা এসব ধরে টানাটানি করে—বলে—বিহারিশালাকে বিশ্বাস করলেন! শীতলার দিব্যি গেলে বলছি, এই চোখ ছুঁয়ে বলছি শ'য়ে ৩০ টাকা বাঁটা দেয় তো শালা শিয়ালদা থেকে ওই মৌলালী পর্যন্ত ন্যাংটো হয়ে ঘুরে আসব। ওরা তখনও আমার পিছু ছাড়েনি। শেষে এক ছোকরা পাশ থেকে পিতলের চাকতি নাচিয়ে বলে ওঠে—ছেড়ে দে হাবুদা, তোর কী—মরুকগে, আচ্ছাসে বিহারি মোশলাটা পুঁটকি মারবে।

লোকটার পিছন পিছন দোকানে এসে দোকানটা ভালো করে দেখে আর বিহারি মুসলমানটার

লুঙ্গি থেকে মুখ অব্দি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে আমি চমকে উঠি। এই তো সেই লোক, সেই দোকান ঠিক তেমনি আছে—গতবার ৪০০ টাকায় ৪০০ হিন্দুস্থান টাকা দিয়েই—ওই যে পুলিশ আসছে, পুলিশ আসছে, গি্গির পালান শিগগির পালান—বলে ভয় দেখিয়ে বাট্টার দেড়শো' টাকা পুরো ঝেঁপে দিয়েছিল। আমি পালাইনি পরে চাইতেই ইয়া বড়ো এক চাকু নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। এই সেই লোক—আমার চোয়ালে চোয়াল এঁটে যায়। লুঙ্গি গুটিয়ে হোৎকা লোকটা মাচার মতো দোকানে লাফিয়ে উঠে বসলে আমি বলি—তুমি হিসেব করে দেখ পাঁচশো বিশ টাকা হবে—টাকাটা বের করো আমি পেচ্ছাব করে আসছি।—আরে বাবু দু-মিনিটের বেওপার—ও বলতে বলতেই আমি শিয়ালদা মার্কেটের মধ্যে অনেকটা ঢুকে যাই। সৌভাগ্যক্রমে বাজারে একটা খবরের কাগজের পাতা দেখতে পাই অন্যের অলক্ষ্যে সেটা কুড়িয়ে নিই। পেচ্ছাপখানায় এসে কোণের দিকে সরে গিয়ে হিপ পকেট থেকে ন্যাকড়া জড়ানো আড়াইশো পাকিস্তানের টাকা বান্ডিল থেকে খুলে হাতে মুঠো করে রাখি। প্রথমে পেচ্ছাপ করার চেষ্টায় কোঁৎ পাড়ি। উত্তেজনায় পেচ্ছাপ আটকে যায়। ১০০ আর ১৫০ দু-ভাগে মোট টাকাটা ভাগ করে নিয়ে ফালাফালা করে কাগজটা প্রথমে ছিঁড়ি তারপর ৪।৫ পরদে কাগজ জড়াই—ন্যাকড়াটাও ছিঁড়ে দু-ভাগে খুব কষে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধি যাতে টাকাটা গুনবার সময়ে খুলতে বেশ দেরি হয়। বাণ্ডিল দুটো দু-পকেটে রেখে হয় এসপার নয় ওস্পার—প্রস্তুত লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াতে, শুনতে পাই ভিতর বুকে শুধু ঢিপ ঢিপ শব্দ হচ্ছে। এবং চোয়ালে চোয়াল এঁটে গেছে—একবার যদি এই ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারি আর ধরতে পারবি? লোচ্চা, চোরচাট্টা, শুয়োরের বাচ্চা হয় তোর দুশো টাকা চোট করবো নয়তো তুই পোঁদিয়ে খালখিঁচে আমার আড়াইশো টাকা চোট দিবি। দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুই বান্ডিল স্পর্শ করে বলি—কই ৫২০ টাকা বের কর। : পহেলে টাকাটা তো দেন!—আমি তো বলছি ৪০০ আছে, তোমার আগে টাকা দিতে অসুবিধা কী? : অসুবিস্তা আপ্নারই কী হোলো? দিবেন-লিবেন বাস্।—তোমরা অনেক সময় টাকা হাতে নিয়ে কম দাও। পুলিশ টুলিশ আসছে বলে ঝামেলা করো। তুমি টাকা হাতে না দিলে টাকা দেবো না—ভাঙ্গাবো না টাকা চলে যাচ্ছি—বলে পা চালাই। তখনই · শুনিয়ে শুনিয়ে—এ বাবু এ লিন্—বলে তড়িঘড়ি চারখানা একশো টাকার নোট ঝুঁকে পড়ে সামনে মেলে ধরে। ফিরে আসি। দেখে বলি, চারশো—একশো কুড়ি আরও বের করো। : বাবু বিশ কুথা থেকে, আর একশোও পাবেন। কৌন আদমি আপনাকে তিরিশের দর দিবে? কাল একুশ দর চলছিল আজ তিরিশ? খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলি, ঠিক আছে তুমি পঁচিশের দরই দাও। বের করো আর একশো টাকা, টাকাটা দিয়ে চলে যাই। খানিক খ্যাঁচাখেঁচি করে—ব্যাওসাদারকো কোই বিসওয়াস কোরে না—বলে একশো টাকার একটা পাত্তি বার করে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ডানপকেটের বাণ্ডিলটা ওকে দিয়ে দিই। চোখ জ্বালিয়ে ন্যাকড়ার গিঁট খোলে কাগজের খোলস ছাড়ার অতঃপর ব্যাজার মুখে গুনতে থাকে বেশির ভাগই পাঁচটাকার নোট। চপপট গুনে বলে : এ বাবু এ তো একশো পঁচাশ। লিজিয়ে, ইসমেঁ ঢাইশো—বলে ওর মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি বান্ডিলটা ছুঁড়ে দিয়ে ঘাড় সোজা করে আড়চোখে পেছনের জনস্রোত কত ঘন দেখি—ন্যাকড়ার খোলস ছিঁড়তে শুরু করেছে—চাঁদ তারা মার্কা একটাকার সঙ্গে দু-চারটে পাঁচটাকার নোট মেশানো—গুনতে শুরু করেছে দেখেই নিঃসাড়ে দু-কদম পিছিয়ে গিয়ে সটাকে পড়ি জনস্রোতে মিশে যাই শিয়ালদার—আমি তো জানি আড়াইশো নয় মোটে একশো।

আড়াইশো দিয়ে পাঁচশো ইন্ডিয়ান হাতিয়েছি। যে কোনো মুহূর্তে, হেই রোক্‌কে রোক্‌কে—কুত্তিকে কে বাচ্চে—চৌর চৌর ভাগতা ভাগতা—শালেকো পাকড়ো হাঁক শোনার কথা। শিয়ালদায় ট্রাফিক জ্যাম, চলাচলের মধ্যে বাস ট্রামের আড়াল দিয়ে দিয়ে অধ্যাপক-পুলিশ-চোর-সাধু-মজুরের পাশে হেঁটে বিপ্লবী সূর্য সেন স্ট্রীটে এসে পড়ি। একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছি—পিছনে সর্বদা এক অজানা ভয় তাড়া করে ফিরছে। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো আজ খাতাপত্র যদিও কিছু আনিনি তবু এর পরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোথায় যাওয়ার আছে? কলেজ স্ট্রীট পার হবো। থমকে দাঁড়াই। আজকের মতো এমন দৃশ্য এই '৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রায়ই দেখা যায়। একটা কিছু ঘটছে—একটু খেয়াল করতেই দেখি গাড়িগুলো ঘুরে যাচ্ছে পারতপক্ষে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় আসছে না। দোকানপাট ঝাপাঝপ বন্ধ হয়ে গেছে—একটু আগে এক পশলা বোমাবাজি হয়েছে মনে হলো। ছেলেমেয়েরা চকিতে পালাচ্ছে, কেউ কেউ কলেজ স্কোয়ারের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, একদল ছেলে শুধু ভার্সিটির গেটের সামনে জটলা করে আছে।

যুদ্ধ চলছিল। এখন সাময়িক বিরতি যে জন্য কোনো শব্দ চিৎকার তৎপরতা আমি দেখছি না শুনছি না। ধূ ধূ ফাঁকা রাস্তা। চারপাশে এত লোক নিথর। আমি কিছুই বুঝি না—দুপুর একটার উজ্জ্বলবিষাদ সকলের চোখে মুখে ট্রাম লাইনে। রাস্তা পার হতে যাই বাহাদুরীর ভঙ্গিমায়। 'ধ্বু ম্ ম্ ম্' হঠাৎ পায়ের কাছে ভীষণ শব্দে কানে তালা ধরে যায় 'দ্বপ' করে আগুন জ্বলে ওঠে তারপরই গলগল ধোঁয়া বেরোতে থাকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া। দুড়দাড় সব পালায়। একজন পালাতে পালাতে চিৎকার করে আমাকে বলে, পালান—পালান দাদা বোম পড়ছে। পালাবো কি মাঝরাস্তায় নিচু হয়ে হাতে পায়ে বুকে পিঠে খুঁজছি ছুটন্ত স্পিলন্টার ঢুকলো কিনা। জ্বলন্ত পেরেকের টুকরো, নাট, ব্লেড ইত্যাদি বুকে পিঠে ঢুকে পড়লে আর দেখতে হবে না! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝতে পারি নেহাত ছোটো মাল ফেলা হচ্ছে। তখনই হাত খানেক দূরে আবার—'ব্বুম্‌ম'—বেশ বড়ো আওয়াজ—এক মুহূর্তে হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে মুখ চোখ ঝলসে যায় পরক্ষণেই গলগল ধোঁয়া এবার সহসা বুঝে যাই একটুও উণ্ড হইনি বরং ট্রাজিক-উল্লাসে আগুন ধোঁয়া ফুঁড়ে বের হই—প্রথম যে লোকটার কাছে আসি সেই বলে—স্মোক্ বোম, লোক তাড়াচ্ছে—নইলে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে বাছাধন মজা টের পেতে!

বিপদ কাটবার পরেই আস্তে আস্তে ভয় বাড়তে থাকে। আমাশাতে আবার ভয় পেলে বেগ বাড়তে থাকে। গেটের সামনে এসে দেখি বিশ্ববিদালয়ের মেন গেট্ বন্ধ করে দিচ্ছে। একজনকে জিজ্ঞেস করি—দাদা কী ব্যাপার। ভেতরে যেতে দেবেন না? খেঁকিয়ে তেড়ে আসে—খাতাপত্র নেই, কী জন্যে যাবেন ভেতরে? নেকাপড়া দেখাচ্ছেন? আবার জিজ্ঞেস করছেন কী ব্যাপার? যান্ ভাগুন্। আমি বলি—দাদা বড্ড পায়খানা পেয়েছে—আমাশা বুঝতেই পারেছেন—যদি একটু যেতে দেন।

: পেটে পাইপগানের থ্রি নট্ থ্রি ঢোকালে আমাশা কোথায় থাকবে? যান্ কফি হাউসে যান্ না? পাইখানা করার আর জায়গা পেলেন না? চাপতে চাপতে এগিয়ে যাই—কফি হাউস থেকে শুরু করে Y.M.C.A পর্যন্ত সব বন্ধ। আর কোথায় বেওয়ারিশ পাইখানা আছে মনে করতে পারি না—হ্যারিসন রোডে পুলিশ ব্যারিকেড করে রেখেছে। আবার ফিরে আসি প্রেসিডেন্সির কলেজের কাছে—ছোটাছুটি অবস্থা, মাঝেমাঝেই বেগ বাড়ছে কমছে। দুজনের সহজ সুরের আলাপ কানে আসে : কাল হয়ে গেল মেডিকেল ভার্সেস আশুতোষ বিল্ডিং আজ

প্রেসিডেন্সির সঙ্গে বেঁধেছে ইউনিভার্সিটির—নিত্যই লেগে আছে একই ব্যাপার। প্রেসিডেন্সির বাইরে কয়েকজন খোলা সোর্ড পিস্তল ছোরা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ছে—আবেএ, আয় শালা এগিয়ে! আবে শাল্লা! অবাক হই। এরাও বোধহয় এখানে পড়ে—কী জানি—মুখ দেখে চেনার উপায় নেই। আমার জন্যে কোনোদিন প্রেসিডেন্সির গেট তো খোলা ছিল না—আশা করো না আজ আর। আজ দেখি একটুখানি গেট ফাঁক করে তৎপরতা চলে। রেলিং'এর নীচে গেটের ওপাশে থরে থরে সাজানো তলোয়ার কুকরী, বোমা ডাঁই করা, কয়েকটা পিস্তলও রয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি ঝুড়ি করে বোমা আর ইঁটের টুকরো বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একজন ঢুকছে দেখে আমিও ঢুকি কিছুই দেখিনি বোমাবাজি আমার কাছে খুবই জলভাত এমন মুখভাব করে এগিয়ে যাই প্রেসিডেন্সির ভিতর। ফাঁকা কম্পাউন্ড। গাছগুলোর ছায়াও দেখি না—দাঁড়িয়ে আছে। বাঁকটার কাছে এসে পড়তেই একজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললো—লিস্টে নাম তুলেছেন? এ দুটো ধরুন তো, আমি গেটের কাছে যাচ্ছি—মনোহরকে দিয়ে দেবেন। আমি বিমূঢ় হয়ে নিই—প্রচণ্ড আমাশয়ের চাপ তলপেটে—কিছুই বলতে পারি না— সে ছুটে বেরিয়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকি সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—অস্বাভাবিক বড়ো আকারের দুখানি আকরিক হিরে যেন আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সে। প্রথম ধাক্কা সামলাবার পরেই আবার বেগ আসে চাপার চেষ্টা করি ক্রমাগত বেগ বাড়তে থাকে—দুই হাত জোড়া দুই বোমায়—চাপতে থাকি দমবন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে। তলপেটে হাত দিয়ে চেপে ধর্তে পারলেও হয়তো কিছুক্ষণ সামলে রাখা যেতো।—'আপনাদের মধ্যে কে মনোহর বলার আগেই তিন-চারজন বোমা হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। কেয়ারটেকার দারোয়ানদের ঘরগুলো বোধহয় ওদিকে—উঁকি মেরে দেখি ওপাশে লতানো গাছের আড়ালে ঘুপচি মতো একটা ঘরে একমনে রুটি বেলে চলেছে একটা অল্পবয়সী বউ নিশ্চিন্তে—বোধহয় দারোয়ানের কেউ হবে। চারদিক সুন্‌সান, একটা অজানা গাছের নীচে ডাঁই করা একগাদা বোমা। দোহাই! কী কর্তব্য সামনেই ল্যাট্রিন অথচ দায়িত্ব দুই হাতে দুই চিত্রবিচিত্র বোমা। দাঁতে দাঁত চেপে পাইখানা চাপার চেষ্টা করছি—ঘেমে যাচ্ছি—চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে আর সহ্য করতে পারি না। পুচ্‌ করে সামান্য একটুখানি গু আন্ডারওয়ারে লেপ্টে যায়—বুঝতে পারি তারপরেই প্রচণ্ড স্বস্তি—আঃ, চোখ দিয়ে আরামে জল বেরিয়ে আসে। হুররা, বেগ কমে গেছে আবার সবকিছু স্বাভাবিক মনে হয়।

ছেলেগুলো নিরস্ত্র ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। পরিষ্কার বুঝি ওরা কিছু লুকিয়ে রেখে আসছে। আমাকে দেখে একজন থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে : একি, পেট্রোলবোমাদুটো আপনাকে কে দিলো! অপরজন : দিন আমাকে। সাবধানে পেট্রোলবোমা ফিরিয়ে দিই। আরেকজন : একি আপনি কাঁদছেন কেন, কী হয়েছে? অন্যজন পকেট থেকে রুমাল বের করে সযত্নে মুছিয়ে দেয় আমার চোখের উপচানো জল। বলি—প্রচণ্ড পায়খানা পেয়েছিল—আমাশয় হয়েছে—একজন মনোহরকে এ-দুটো দিতে বলে গেলেন—কাউকে দেখলাম না—আন্ডারওয়ারে খানিকটা হয়ে গেছে—আমি হেসে ফেলি। ওরাও হেসে ফেলে : এই যে এই ঘরটার পরেই ল্যাট্রিন। জল আছে প্যান্ট ছেড়ে ধুয়ে নিন। যদি আর করেন তো করে নিন। সহসা তীব্র হুইশেল—হু ই ই ই ই পিঁ পিঁ ই ই ই প্‌। জোড়া জোড়া বুটের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ। ওরা ধীরে সুস্থে একটা ছেঁড়া চট এনে জড়ো করা বোমাগুলো ঢেকে দেয়। আমি অবাক হয়ে ওদের সহজ অনাবিল ব্যবহার দেখছি দেখে বলে : পুলিশেরা কম্পাউন্ডে ঢুকবে

না—ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে—ওরাও ঝামেলা করবে না আমরাও মালটাল সরিয়ে ঝামেলা মুলতুবি রেখে ভালোছেলে হয়ে যাবো এই আর কি।—আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন পাইখানা গেলেন না? আমি বলি—বেগ কমে গেছে তারপর পিছন ফিরে বলি দেখুন তো পিছনটা, মোটা টেরিকটের প্যান্ট ফুঁড়ে গু-তো আর দেখা যাবে না—আমার গাছাগলা কে আর বুঝতে পারবে? দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে? ওদের একজন বলে : না, তা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, হাঃ হাঃ।

গেটের কাছাকাছি এসে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে দেখি গাড়ি গাড়ি পুলিশ বাইরে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে। একজন কেষ্টবিষ্টু পুলিশ দারোয়ানকে ডেকে জোর ধমক লাগাচ্ছে—গেট কে বন্ধ করেছে তুম জানতা? গেট কৌন্ বন্ধ্ কিয়া তুম নেহি জানতা? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি—ওরা অনেকে বোমা তলোয়ার পিস্তল সরিয়ে ফেলছে পুলিশ দেখেও ভ্রূক্ষেপ করে না। তবু আমি গেট আর হওয়ার সুযোগ পাই না। আমি জানি ভিকিরিদের কেউ রেয়াৎ করে না। পাঁচশো টাকা পকেটে—আ খেলো যা—কাকে আবার পাকড়াই! খানিকবাদে সেই ছেলে চারটির একটিকে দলছাড়া পেয়ে যাই! হাত চেপে ধরি—দাদা আমাকে গেটটা পার করিয়ে দিতেই হবে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি বুঝতে পারছেন! : আমিও যাচ্ছি আসুন। ওরা কিছু বলবে না, আমরা তো ঝামেলা মুলতুবি রেখেছি—বুঝলেন, সমঝোতা! পুলিশ অফিসারের সামনে দিয়ে যেতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি। পুলিশও আমার নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত মুখ দেখে কটমট করে তাকায়। ওকে জিজ্ঞেস করে : একি তোমার সঙ্গে? ও বলে : না, না, পাইখানা করতে ঢুকেছিল—দেখে বুঝছেন না আমাশ'র রোগী! অফিসার হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাশের বোকাসোকা পুলিশটাকে জোর ধমক লাগায়।

ছেলেটা আমার সঙ্গেই আসছিল। মহাত্মা গান্ধী রোড ক্রস করে আসার সময় কথায় কথায় ওকে বলি—আমার মার একটু শুচিবায়ু আছে—জামা প্যান্ট আন্ডারওয়ার সব কেচে তবে ঘরে ঢুকতে হবে। সহসা ও সিরিয়াস হয়ে, বলে শুচিবায়ু টুচিবায়ুতে গুলি মারুন। এই যে বাস এসে গেছে, এই পাছাগলা অবস্থাতেই ধ্যাড়ধেড়ে ৩৪ নম্বরে চেপে এখন বাড়ি যান দিকিনি—

শৈলেশ্বর ঘোষ

বাস্তবতার পুনরারম্ভ

১

সবিতা মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি আর কি ভয়, সারারাত তোমার ঘরে গোপনীয়তা নীল বাতি জ্বলে, আমি চলে গেলে আবার সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াবে, শিশুর আকাঙ্খা অন্ধকারে চেঁচিয়ে বলে, "বাবা, বাবাগো, কোথায় গেলে তুমি, নিয়ে চলো'—তোমার বাড়ির চারপাশে অলিতে গলিতে আমি পেয়েছি সেই গন্ধ, সবিতা, একদিন সকালবেলা শুনতে পাবে তোমার জরায়ুতে ক্যান্সার—আমি কি জিজ্ঞাসা করবো, কী হয়েছে তোমার? হাঁটু মুড়ে তোমার বসা, তোমার ক্রোধ ও অবসন্ন নালী ব্যবহার করে বেঁচে থাকা—জানি, চিরাচরিত এই মাদক নিতেই হবে আমাদের, পাশের ঘরে আটক শিশুর গালে টোকা দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ একজন মহানুভবতা দেখিয়ে বলে যাবে, 'চিনতে পারিস আমাকে? তোর মাকে নষ্ট করেছি বলে ক্ষমা চাইতে হবে না আমাকে, ক্ষমা করার দরকার নাই তোরও, আমরা তিনজনে আকাশে যে অন্ধকার তাকে সত্য বলে জেনে গেলাম!'

২

আমার এই খোলা শরীর কোনো শীতাতপ নাই, আমাকে ধর্ষণ কর, নিয়ন্ত্রিত কামরায় মানুষ চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিস কেন? নড়ে বস, দেখ, এই আমার মেয়ে, একে এনে দিয়েছি তোদের হাতের কাছে—বেশ্যাবৃত্তি জানি না আমরা, চুরির কড়ি গোপন করার কাপড় নাই—তবে কি উদ্বাস্তু? জানি না তাও কোথা থেকে আসছি, জানি না—এই আমার খোলা শরীর কোনো কোনো শীতাতপ নাই, আমাকে ধর্ষণ করো বা নাও আমার মেয়েকে, ঠান্ডা মেঝেতে পায়ের কাছে একটু শোবার যায়গা দাও—মনে পড়ে, মনে পড়ে কি, কোথায় যেতে চাও? পয়সা আছে কি হা-ঘরে মাগী ফিরে যাবার, এই কি তোর গোটা পরিবার? মনে পড়ে না, যা কিছু হয়েছিল কিছুই মনে পড়ে না, তবু স্বপ্নে যা দেখেছিলাম—যাবার সময় আমাদের কেউ কিছু বলবে না, এটা নিয়ম, বলবো যখন নাও আমাকে বা আমার মেয়েকে, বলবে সবাই, বিরক্ত করিস না আমরা কাজের লোক, কাজ আছে।

অলীক গল্প

এক অলীক গল্পের কাল্পনিক চরিত্র হতে আমি রাজি হয়েছিলুম, সেই মানুষ আমি যে শরীরে সমস্ত অনুরোধ জাগরণরাতে পূরণ করে দেবো, বলেছিলাম, বোঝানো হয়েছিল আমার বিরুদ্ধবাদীকে ধ্বংস করে তবেই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে, নিতে হবে তার স্ত্রীলোক, নিতে হবে তার জমিন ও সোনা, মৃত্যুর সমান বিস্তৃত করতে হবে এই যৌন শরীর, যেভাবে আমার বাপদাদা চোদ্দপুরুষ কাজ করে গেছে, কামগ্রন্থের ভাঁজে লুকিয়ে রাখতে শিখেছিল তারা চাবি-গোছা, শরীরের অভি-অভ্যন্তরে চেতন-অবচেতন, হৃতসর্বস্বের দু'রকম কল্পনা জুয়ার দানের মতো কাজ করে গেছে, আত্মাভিমানী অস্বীকার করে এইসব পদ্ধতি ও নিয়ম—আমি সেই মানুষ যে ম'রে গিয়ে পুনরায় বাঁচার মন্ত্র শিখেছি মধ্যকপালে যে মাধ্যাকর্ষণ তাকে আমি স্বীকার করি, স্বীকার করি তাকে যে আমার শিশু-হাত কোমরের নীচে নামিয়ে নিয়েছিল, স্বীকার করি তোমাকে অবসন্নতা জীবন, জীবিতের দুর্ভাগ্য, বাঁ-পাশের বা ডানপাশে হেলে পড়ে, সত্য মাটি সত্য আলো সত্য অন্ধকারে, জানি আমার আর মৃত্যু নাই, মায়ের গর্ভে কন্যার গর্ভে—পুনরাবৃত্ত শরীরে প্রবেশ করে টুকরো টুকরো করে পুনরায় নতুন জন্মে আবির্ভাব, সত্য হয়ে আছি এই অন্ধকারে, নীরবতা হয়ে আছি, এককোষ কর্কট, দুর্বলের মতো অপেক্ষা কর সুযোগ সন্ধানী, ঘর্ষণের ক্ষত সংঘর্ষের তাপ, শুরু হবে কাজ—আক্রমণ কর, পচনের গন্ধে বাস্তব হয়ে ওঠো নিষ্ঠুর কল্পনা, অলীক চরিত্র—দরজার ফুটো দিয়ে নিজের বোনকে সত্য রূপে দেখে নাও, আকর্ষণ কাঞ্চন ত্যাগ করে কি মানুষ আমরা আজ? না, এ অভিজ্ঞতা দুঃস্বপ্ন শরীরের আক্ষেপ থেমে গেলে আমাদের কল্পনা ও পাশবিকতা দুই-ই নষ্ট হয়ে যাবে, তবে এ গল্প শেষ হবে না জানতে পারলেই ভালো লাগে—বাস্তবতার আরম্ভে আজ হাত দুটিই তাদের নিজস্ব নিয়মে কেবল ঝুলে আছে!

যৌন রূপান্তর

আমাদের যে রূপান্তর ঘটে সত্যি শরীর দীর্ঘদিন তার বিরুদ্ধতা করে, যে কোনো মেয়ে বা পুরুষের মানবিক ঐশ্বরিক বা ভৌতিক যৌন রূপান্তর দেখা দেয়, এইভাবেই আস্তাবলের চাকর একদিন তার মনিবের মেয়েকে লোভ করেছিল, রাত্রির সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় উঠে আসা তার নিষেধ ছিল বলে, বন্ধু আমাদের এই জীবনধারণ কখনো ম্লানমুখে ব্যর্থ হবে না, হতাশা আমরাও মানিনা, জানি জান অবসন্ন হৃদয় কখনো নেচে উঠবে কোনো নিস্ফলতা দেখে, যে অন্ধকার এখানে ওখানেও সেই অন্ধকার ধুক্ ধুক্ করছে শায়িতার বুকে, হাত দাও ওই অনুভূতি বুকে ভিখারীর প্রতি ভিখারীর ঈর্ষা ও নিষ্ঠুরতা জানে সে অস্ত্রোপচারে আমাদের ক্ষমতা ও আকার রূপান্তর ঘটে, দুঃখ কি তবে আর নিজের ভূমিকায় কোমর মেলে ধরেছো, একা এই আসনে উপবেশনে দণ্ডায়মান প্রস্তুত হও কারণ রূপান্তরের আগে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হয়, পুরুষের ভয়, হঠাৎ সকালবেলা যদি দেখে তার অন্ডকোষ ছোটো হয়ে যাচ্ছে—সে ভয় আমাদের নাই, কোনো ঘটনারই পূর্ববৃত্তান্ত নিয়ে আমরা বেঁচে নেই, যে তৃপ্ত অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা তা পুরুষ স্ত্রী নির্বিশেষে একই হয়, যে জন্য জন্মাবধি আমরা আনন্দ মোচনকালে শব্দ না-করতে শিখেছি!

আমরা, কারা?

সে : মানুষ কেন তুই মুখ নিয়ে জন্মালি?
আমি : না না না
তুমি : কেন ক্ষুধা তোর? পেট ও জঠর দুটো নাম শয়তান!
আমি : হা হা হা
আপনি : কীভাবে তুই ছাড়পত্র পেলি এই তোর অণ্ড নিয়ে?
আমি : ট্রা লা লা লা
উনি : কেন তুই তলপেটে জন্ম দিস, খাবার রাখিস তার উপরে? বন্ধ কর এ বুজরুকি!
আমি : হো হো হো হো
তাহারা : আমাদের শান্তি ভঙ্গ করে কে?
আমরা : এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়
তোমরা : আমাদের অন্ধকারে কে শালা তোমরা ভিখারি?
আমরা : নয় আট সাত ছয়
আপনারা : আমাদের বাথরুমে কে এসেছিস বর্বর?
আমরা : দশ দশ দশ
ওনারা : আনন্দের দিনে গুলি কর গুলি কর গুলি কর
আমরা : নয় ছয় হয়ে যায় ০
তেনারা : পুনরায় ফুল যদি ফুটে উঠিস তবে আরেকটি গুলির শব্দ, শোন্ ওই
আমরা : বুকে আমাদের কোনো দেবতার ছবি নাই

তারা সকলে সমস্বরে : ছুরিকাঘাতে তবে এর চেয়ে যোগ্য স্থান নাই, শব্দ হবে না—স্তব্ধ করে দাও ক্ষুধা আনন্দদায়ক বর্বরতা—মারো
আমরা সকলে সমস্বরে : পুরানো গল্পের মতো এর অধিকাংশই একদিন আমরা ভুলে যেতে পারবো হুজুর!

পরদার পেছন থেকে ঘোষকের ঘোষণা : তোমরা ধনী বলিয়া আমাদের দেখিতে পাওনা কিন্তু গরিব বলিয়া আমরা সব সময়েই তোমাদের দেখি।

সুবীর মুখোপাধ্যায়

অপরসায়ন

১

ইনি নির্গুণ নিরাকর সকল সুখ-দুঃখের অতীত বিপ্লবী-বাতিস্তা ফ্যাসানে জুড়ি নেই এঁর কেননা সমাজতন্ত্রের মূলভিতে এ প্রধানত কাজ করে চার রকম ভাবে সাবাস্।

সাবাস্ উনিশশো একাত্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার গাভাসকার সাবাস্ পিংপিং বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা সুন্দরী সুনন্দা পট্টনায়ক ছট্‌তানে গৈরিকপতাকা ফোটানোর দায়িত্ব এঁনাকেই দেওয়া ভালো মনে হয় কারণ আমাদের সীমান্তবর্তী চেক্‌পোস্টের সংখ্যা দুই বা তিনের অধিক কখোনোই নয় এবং দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগি দেখিয়া আমরা সনাতন পাঠকেরা অনুমান করি দালালের ক্ষমা নাই পক্ষান্তরে জঞ্জাল অপসারণের কাজে কর্পোরেশানকেও আজকাল ততখানি দায়িত্বশীল বলা চলে না অতএব আশঙ্কার কোনোই কারণ নাই রবীন্দ্রনাথ ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

এছাড়া দুগ্ধপবিবহণের পরিকল্পনাটির সার্বিক ব্যর্থতা আমাদের মুগ্ধ করে স্বাধীনতা ও বোমাবারুদে আমরা বিশ্বাস করি প্রিয়দর্শিনীর হাসির আনাচেকানাচে যৌনতা বিস্তর আমরা বিস্বাস করি এই বেঁটে মোটা মিনি পত্রিকা কেবলমাত্র বিবাহিতদের জন্য ও হাঙ্গামা দেখা গেলেই গুলিচালনার একান্ত প্রয়োজন কেননা সেই নীল ধ্রুবতারা মেষপালকই অবশেষে আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন অতএব শব্দের জগতের বন্ধুগণ গরমে চলুন হালকা পায়ে চলুন হাওয়ায় হাওয়ায়।

২

একদিন সমুদ্রে জেগে ওঠে রসায়নাগার দ্বিধাগ্রস্ত পাতনপ্রক্রিয়া জেগে ওঠে ব্যবসায়ী মানুষের মনে দলিল দস্তাবেজ ব্লুপ্রিন্ট খোঁজা হয় ফেলে রাখা পেরেক ও কাঠ নিয়ে জাহাজ গড়ে তোলা হয় আমাদেই ব্যাকুল বাতাসের কথা মনে রেখে এক-একদিন।

রসায়ন পর্যায়ে অস্ত্র নিয়ে কাজ চলে মানুষের রঙিন তরলে কেঁপে ওঠে লোম ও অ্যাপ্রন বিড়ালের হাঙরের শাদাপেটে ফুলে ওঠে চলে যায় আকরিক তামা ও লোহায় এবং জীবনের, জীবনেরই সম্মানরক্ষার কথা মনে পড়ে এক একদিন।

এক একদিন অভ্যাসতাড়িত পরমাণু, তার ফাঁকা চলাচল খুলে ফেলে ভ্রাম্যমাণ স্বপ্নের গিঁট, অলিন্দ-নিলয় থেকে জন্মসুর ভেসে আসে ও আবহাওয়াময়ূরের যান্ত্রিক সময় জুড়ে, নৈশে ও ক্ষমতায়, তার্পিন ঝরে পড়ে, তার্পিনশোধিত বিদ্যুৎ ঝরে পড়ে এক একদিন।

৩

তারোপরে লিপি ও সভ্যতা রমণকারী বিদ্রূপে ফিরে আসে অপমানবোধ বিষণ্ণ আলের পথে পড়ে থাকে ঝুঁটি ও সম্মান আমাদের ও তুমি, নির্মম অত্যাচার চালিয়ে জনজীবনে বিরোধসৃষ্টিকারী ক্ষেত্রচুম্বকের অনিবার্যতা, ব্যবসায়িক আর্তজালে ক্রমবর্ধমান নেগেটিভ্ ও পজেটিভ্ একই সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়াক্ষেত্রে বনতলে হান্টারছায়ায় ধারাবাহিক নখে পিন ফোটানোর খেলায় তোমরাই দেখা পাওয়া অকস্মাৎ এবার এপ্রিলের মধ্যরাত্রে পরোক্ষ দরোজাভাঙার শব্দে হে বকলমশোভিত অশরীরী, হে সামরিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অভিযানে বৈদেশিক নীতির মূলভিত্তি নিরপেক্ষতা ভয়াল হাসির অন্তরালে পোড়ামাটির ফলকের যৌথবিবৃতি, হে উপত্যকাবাসী মানুষের নৈশজীবনে নেমে আসা ধর্মবিশ্বাস, তোমাকেই, তোমারই দিব্যশক্তি, তোমারই কারাগারবন্ধন, তোমারই সূর্যকাচবৎ সন্তানের চিত্রচারী আকাশতত্ত্ব, তোমারই কৃষ্ণযোনি বিজেতার আলোকসামান্য আর্তনাদে পরিপূর্ণ আকাশ ও মাটি।

শঙ্খ ঘোষ

শব্দ আর সত্য

কবিতালেখার অপরাধে এই শহরের কয়েকজন যুবককে যে একদিন হাজতবাস করতে হয়েছিল, এটা আজ ইতিহাসের বিষয়। কবিতালেখার অপরাধে? না, বিজ্ঞ সামাজিকদের বিবেচনায় সে-লেখাগুলি একেবারেই কবিতাপদবাচ্য ছিল না, কেননা তার মধ্যে ছিল না কোনো শিল্পরুচির আভাস। অথচ এ-যুবকেরা প্রথমেই জানিয়েছিলেন যে শিল্প নামে কোনো অলীক কাণ্ড নেই কোথাও, ওটা আর কোনো দৈবসূত্রে-পাওয়া সাজানো-গোছানো বিলাসব্যাপার নয়, জীবনযাপনেরই সত্য প্রকাশ হলো কবিতা। প্রকাশের সেই ধরনকে নীতিবাহকেরা যে খুব একটা ক্ষমার চোখে দেখেননি সেদিন, সেটা হয়তো এক হিসেবে এদের জয়ই বুঝিয়ে দেয়, কেননা ক্ষমাহীন প্রত্যাঘাতের আয়োজন থেকেই ধরা যায় যে, আঘাতটা কোনোখানে পৌঁছচ্ছিল ঠিক। এঁরা যদি এঁদের চারপাশের মুখোশগুলিকে আঘাত করতেই চান, তাহলে প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি থাকাই তাঁদের ভবিতব্য। তাই সমাজের চোখে নিন্দনীয় হয়ে ওঠা বা খানিকটা জেলপুলিশ করে আসাটা বাইরের দিক থেকে অপমানজনক এবং দুঃসহ হলেও এর মধ্যে একটা জয় ছিল কোথাও। কিন্তু সেই সাময়িক জয় কি এই লেখকদের স্থির কোনো আত্মপ্রত্যয়ের নির্দিষ্ট ভূমিতে পৌঁছে দিয়েছিল সেদিন? 'নিজেকে নিয়েই কবিতা' কৃত্তিবাসীয় এই সিদ্ধান্তের পর খুবই ধারাবাহিক ছিল ক্ষুধার্ত এই যুবকদের আবির্ভাব, প্রায় যেন প্রত্যাশিত। কিন্তু এই আবির্ভাব কি বাংলা কবিতায় নতুন কোনো দিকবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে আজ?

পাঁচ বছর আগে ছাপানো মার্কিন দেশীয় এক পত্রিকার বিশেষ-সংখ্যা সামনে রেখে এই প্রশ্ন করছি আজ নিজেকে। এই যুবকদেরই প্রতিকৃতি এবং রচনা এবং জীবনতথ্যে ভরপুর সেই বিশেষ-সংখ্যা, বাংলাদেশের 'ক্ষুধার্ত কবিসমাজে'র এক বিশদ বিজ্ঞাপন। গিন্‌স্‌বার্গ বা ফার্লিংগেত্তির মতো মার্কিন কবিরা স্পষ্টই উত্তেজিত ছিলেন এঁদের রচনাকৃতির নমুনায়, হয়তো তাঁরা খুশি হচ্ছিলেন, এই ভেবে যে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখকদের একটা ঐক্যময় ভূমি তৈরি হচ্ছে এভাবে। সাহিত্যজগতে এঁরা যেন মজুরদল, তাই এঁদেরও কাছে 'ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্লড, ইউনাইট' ধরনের আহ্বানের একটা মানে ছিল হয়তো। তাই, এটা মনে হয় না যে নিতান্ত নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েই মার্কিন কবিরা বাঙালি ক্ষুধার্তদের এতটা প্রতিপত্তি দিচ্ছিলেন, অথবা এর মধ্যে অন্য পাঁচরকম রাজনৈতিক অভিসন্ধি লক্ষ করবারও মনে নেই কোনো, স্পষ্টতই একটা সমগোত্রীয় কাব্যজগতের উল্লাসে ছিল এঁরা, এইরকম বিশ্বাস করা যায়। যে ধ্বংস এবং মিথ্যার মধ্যে আমাদের অবিরত বেঁচে থাকা, তাকে কেবলই ভাবাবেগের মোহন কথায় সাজিয়ে দেখানো কেন? এই এঁদের অভিযোগ। এ-অভিযোগকে উপেক্ষা করবার আগে গোটা পৃথিবীর দিকে খোলাচোখে তাকাতে হয় একবার—যেখানে মানুষ একই সঙ্গে চাঁদে

উড়ছে আর অসহায় মাটিতে এমন বোমা ছুঁড়ে ফেলছে যার স্প্লিন্টার শরীরে ঢুকে গেলে এক্সরে দিয়েও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না আর, মানুষ তৈরি করছে ভব্যসভ্য সমাজ, চালচলনে নিখুঁত, যেন আনুষ্ঠানিকতার ঈষৎ স্খলন হলেই ধ্বসে যাবে সব—আর তার পাশেই সাপ্তাহিক টাইম্স্-এ খবর ছাপা হচ্ছে 'এ হেল্‌থি রাইজ ইন রেপ'—এ কি প্রহসন না সর্বনাশ? এ-দুয়ের মধ্যে সীমারেখা আছে কোনো? এই সত্যকে শিয়রে রেখে কবি আর চুপ করে থাকতে চান না আজ, তিনি ধরিয়ে দিতে চান এই ব্যভিচার, তিনি বুঝিয়ে দিতে চান যে একেবারে নগ্ন এবং অক্ষম হয়ে মানুষ এই উজ্জ্বল মিথ্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এখন, এর থেকে মুক্তি যদি না-ও থাকে তবু একে স্পষ্ট করে চিনে নেওয়া চাই আজ।

তাই সংঘর্ষের কথা, নগ্নতার কথা, আক্রোশ এবং উৎপাতের কথা কবিতার শরীরে অনায়াসে চলে আসে। এইসব কবিতার রচয়িতাকে অশিক্ষিত অথবা বর্বর বলবার আগে অল্প ধৈর্য নিয়ে বুঝে দেখা উচিত কেন এইটে আজ অবশ্যম্ভাবী এক পরিণাম। যেমন অতিবামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতিকে ধিক্কার দেবার মুহূর্তে ভেবে দেখতে হয় কোন্ অনিবার্য চাপে এর উদ্ভব হলো, যেমন এর বহিঃপ্রকাশগুলি ধরিয়ে দেয় যে সামাজিক পচন কোন্ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, কীসের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ,—তেমনি ক্ষুধার্ত ছেলেদের বিদ্রোহলক্ষণকেও বুঝে নেওয়া চাই তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যে। এই যদি হয় যে এতদিনকার শিল্পশাসিত কবিতাচর্চার অবসান হয়ে এলো আজ, এই যদি হয় যে রাজনৈতিক জগতের মতোই এই কবিতার জগতে এক তৃতীয় ভুবন জেগে উঠবার উপক্রম করছে আজ, তবে তার জন্য স্থিরভাবে প্রস্তুত হওয়াই যোগ্য কাজ হবে। আমরা, যারা অন্য ধরনের রচনায় দীর্ঘদিন অভ্যস্ত আছি, আমরা হয়তো সেই অভ্যাস ভেঙে বেরিয়ে আসতে ইতস্তত করবো আরও কিছুদিন, কিন্তু প্রবাহ তবু রুদ্ধ হবে না আমাদের এই অনিশ্চিত দ্বিধায়।

রুদ্ধ হবে না, যদি সেই প্রবাহে কোনো ভুল না দেখা দেয়, যদি আত্মপ্রত্যয়ের কোনো বেগ সেখানে কাজ করে আজও। কিন্তু করছে কি সব সময়ে? বাংলা কবিতায় এই সাত-আট বছর আগে যে-আন্দোলনের দাপট শুরু হয়েছিল, আজ তার কতটা চিহ্ন আছে? এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বাইরের পাঠকসমাজে সে-ঢেউ অনেকটা স্তিমিত এখন, আর তারও চেয়ে বড়ো কথা এই যে সেই কবিসমাজই এখন ভেঙে পড়েছে অনেক টুকরো হয়ে। এখানেও এর তুলনা হতে পারে অতিবিপ্লবীদের সঙ্গেই। যেমন একবার ভাঙন শুরু হলে বিপ্লবীরা ভাঙতে থাকে কেবলই টুকরোর পর টুকরোয়, আর যেমন তার এক টুকরো সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে দাঁড়ায় অন্য টুকরোর, হনন এবং প্রতিহননে মেতে ওঠেন সবাই, মূল লক্ষ্য যায় হারিয়ে—এখানেও প্রায় তেমনি ঘটছে আজ। মাত্র পাঁচ বছর আগে যেসব সরব অভিলাষ ছিল, সেসব উৎপাটন করে নিয়ে কেউ আজ দলছুট, কেউ-বা নির্বাক, কেউ-বা শুধু বচন ব্যাপৃত রাখেন পূর্বতন বন্ধুদের প্রতি বিষোদগারে, আর কেউ-বা হয়ে ওঠেন বারণহীনভাবে হতাশ এবং প্রতিষ্ঠানলোলুপ। এই অল্পদিনেই কেন এমন হলো? যাঁরা এখনও লিখছেন সমান বিশ্বাস আর তাপে, আর যাঁরা হয়তো ভবিষ্যতে লিখবেন এই ক্ষুধার্তদেরই বিষ বুকে নিয়ে, তাঁদের কাছেই এই প্রশ্ন আজ খুব জরুরি : কিছু কি ভুল ছিল কোথাও?

২

প্রতিষ্ঠানকে ভাঙতে চাওয়া যৌবনে ধর্ম। জীবনকে মৃত্যুর সামনে রেখে দেখা, মৃত্যুকে জীবনের সামনে রেখে দেখা যৌবনের ধর্ম। তিল তিল প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে লক্ষ করা, তাকে আঘাত করা, তার দ্বারা আহত হওয়া যৌবনের ধর্ম। কিন্তু এই যৌবনধর্ম যখন কবিতার মধ্যে প্রকাশ করতে চায় নিজেকে, তখন তাকে আরও খানিকটা ভেবে দেখতে হয়। কীভাবে সে সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানকে ভাঙবে? যদি এই হয় যে আজকের বাংলাসাহিত্য আত্মিকভাবে অবসন্ন আর ক্ষয়ে-ভরপুর বিপুল এক প্রতিষ্ঠান মাত্র, তবে নতুন লেখকের আক্রমণ হবে কোন্ পথে? সে কি কেবল আস্ফালন এবং আক্রোশ জানানো? সেই কি আক্রমণ? মৃত্যু জীবনের বিরোধী বলেই তার প্রচণ্ডতা জেনে নিতে হয়, অনড়-প্রতিষ্ঠান সজীব-কবিতার বিরোধী বলেই তারও ব্যাপকতা এবং জটিলতা জেনে নিতে হয় তরুণ লেখককে, জেনে নিতে হয় যে 'বিস্ফোরণ' শব্দটাই কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটায় না, জেনে নিতে হয় সে সমাজ নামক কুটিল এই অক্টোপাসের পেষণে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেকটা ক্ষীণ এবং দুর্বল। আত্মিকভাবে নয়, কিন্তু সাংগঠনিকভাবে। এই জেনে নেওয়া কি আমাদের অসহায় করে দেবে আরও? না, এই জেনে নেওয়াতেই আত্মশক্তির প্রথম পদক্ষেপ। এই জেনে নেওয়ার ফলেই আমি আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়তার দিকে এগোতে পারি এবং ক্রমশ সমবেত করে তুলতে পারি আরও এইরকম ব্যক্তিগত বন্ধুদল, যারা সকলে চুপচাপ একাগ্র প্রত্যয়ে দাঁড়াতে পারে রচনার অন্তর্গত যে-কোনো-রকম প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে। আত্ম-সংগঠনের মধ্য দিয়ে অল্পে অল্পে তৈরি হয়ে উঠবে পুঞ্জিত এক বিদ্রোহীদল, যারা ভিন্নভাবে কোনো আক্রোশ প্রকাশ করবে না আর, যাদের সমগ্র অস্তিত্বই হয়ে উঠবে আক্রোশের প্রকাশ, প্রতিবাদ ও বিস্ফোরণ।

এখানেও আমি রাজনৈতিক তুলনাটিকে টেনে নিতে চাই। এই যে আমাদের চোখের সামনে এক অবিরাম বিপ্লবের উত্থান এবং অপঘাত ঘটল, তার মস্ত একটা কারণ কি এই যে গ্রামবেষ্টনীকে ঠিকভাবে তৈরি করবার আগেই শহরকেন্দ্রে আঘাত এবং চিৎকার পৌঁছল খুব বেশি? যেসব যুবক অতিদ্রুত শহরের কাঠামোটাকে ভাঙতে চাইছিলেন তাঁরা ধরতে পারেননি প্রতিপক্ষেরও প্রস্তুতি আর প্রতিরক্ষার ধরনটা কতোদূর সর্বাত্মক হতে পারে। অন্যপক্ষের ক্ষমতার ঠিক-ঠিক হিসেব না নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়াটা আত্মহত্যার নামান্তর। কবিতার জগতেও কেউ যদি প্রতিষ্ঠান ভাঙতে চান তবে তাঁরও এই ধরনের অবিমৃশ্য ঝাঁপ দেবার মানে নেই কোনো। ছোটো ছোটো মুঠিতে প্রতিষ্ঠানের শালপ্রাংশু বুকে আঘাত তো প্রায় আদরের তুল্য, সে-মুঠো ভেঙে দেবার জন্যে প্রতিষ্ঠানকে তৎপরও হতে হয় না সব সময়ে, অনেক সময়ে উপেক্ষাই যথেষ্ট। তাই প্রয়োজন কেবল নিঃশব্দে সেইসব কবিতা লিখে যাওয়া, যা সামাজিকদের পক্ষে অনায়াসে ব্যবহার্য বা আস্বাদ্য নয়, যা গোপন পদসঞ্চারে ঘিরে ফেলবে সবাইকে। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বিদ্বেষ জানানোর ততটা দরকার করে না তখন, রচনাটি নিজে নিজেই তখন হয়ে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠানবিরোধী।

আর সেইজন্যেই, আরও একটু স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হয়, কবিতালেখকের পক্ষে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান কোথায়। কার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান? সে কি কোনো রাজনৈতিক সঙ্ঘ? সে কি কোনো প্রচারময় পত্রিকা? সে কি কোনো স্থাণু শিক্ষায়তন? অল্পবিস্তর হয়তো এরা সবাই, কিন্তু এইখানেই মূল বিপদ নয়। লেখকের পক্ষে মূল প্রতিষ্ঠান হলো সমসাময়িক জনরুচি। যে সত্যের কথা আজ বলতে চাইবেন ক্ষুধার্ত কবি, অথবা যে-কোনো সত্য কবি, সেই সত্যকে

সহজে মেনে নেওয়া কি সম্ভব এই পথচলতি জনতার পক্ষে? আমরা তো ভুলতে পারি না যে আমাদের প্রধান পাঠকজনতা বস্তুত এক মধ্যবিত্ত-জনপিণ্ড, স্বরচিত কিছু সংস্কার এবং মুখোশমালায় নিজেকে সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করছে যে জনতা। সে কেন সহ্য করবে তার মুখোশ ছিঁড়বার আয়োজন? সে কেন সহ্য করবে তার তৈরি-করা নিজস্ব মূল্যবোধের বিপর্যয়? তাই সত্যসন্ধানী লেখা তার কাছে ঘৃণা বা উপেক্ষার যোগ্য মনে হয়, নিজেকে দেখে ফেলবার ভয়ে সে ছুটে পালায়, সত্যের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয় তার বানিয়ে-তোলা আমোদ-কে। সব যুগের পক্ষেই একথা খানিকটা সত্যি, আর আজ মানুষের এই শেষ ভণ্ডতা দেখিয়ে দেবার মুহূর্তে সেকথা দ্বিগুণ সত্যি হয়ে উঠলো।

আমি বলছি না সে সমকালীন সমাজে এমন একজনও পাঠক থাকেন না যিনি নিজেকে খোলা চোখে দেখতে চান। অবশ্যই তেমন ব্যতিক্রম আছে পাঠকজনতার মাঝখানে, এক-একজন পাঠক বা পাঠিকা বসে আছেন অনাদৃত অজ্ঞাত কোনো কোণে, যিনি হয়তো প্রতীক্ষা করে আছেন এমন কোনো সত্যকথনের--আর তাঁকে মনে রেখেই ভরসা পেতে পারেন রাগী বা ক্ষুৎকাতর কবি, মানুষের মতোই সহজে মানুষের সঙ্গে কথা বলবার দু'একটা নিভৃত জায়গা হয়তো এখনও রয়ে গেছে কোথাও। কিন্তু সে জায়গা থাক বা না-ই থাক, কবিকে তবু বলে যেতে হয় তাঁর কথা, একেবারে নিজস্ব, ব্যক্তিগত উদ্‌ঘাটন, তাঁর হীনতা তুচ্ছতা পরাভব সুদ্ধ তাঁর উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা বেঁচে থাকবার কষ্ট আর উল্লাস—এমন ভাষায় তাঁকে বলতে হয় এসব যা পছন্দ করবে না তাঁর চারপাশের উদ্যত পাঠক, যারা পয়সা দিয়ে আরাম কিনতে চায়। যদি তা করত, তবে তো যে-কোনো প্রতিষ্ঠান তাঁকে সহজেই টেনে নিত বুকে, অথবা আমেরিকান গ্রোভ প্রেসের মতো সে নিজেই হয়ে উঠত উলটো ধরনের এক প্রতিষ্ঠান। কেননা এ তো হতে পারতো তার বাণিজ্যেরই সহায়। তা হয় না বলেই তিনি পড়ে থাকেন দূরে, এও তাঁর একটা গোপন জয়।

কবিকে তাই জেনে নিতে হয় যে সকলের কথা বলা আর সকলের জন্যে বলা এই জিনিস নয়। সত্যি সত্যি সকলের কথা বললে সে আর সকলের জন্য থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় কয়েকজনের জন্য। এই কয়েকজনের সম্প্রসারণের মধ্যেই আছে যোগ্য বিদ্রোহ, কিন্তু তার জন্য সময় চাই, ধৈর্য চাই, উপেক্ষা সহ্য করবার বিক্রম চাই।

আমি জানি, এইটেই সবচেয়ে শক্ত কাজ। 'সমস্ত ভণ্ডামির চেহারা মেলে ধরা' বা 'সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা' বা 'যা কিছু গড়ে তোলা হয়েছে তাকে সন্দেহ করা' শৈলেশ্বর-বর্ণিত এইসব প্রতিজ্ঞা যদি মেনে নেন কোনো মুক্ত কবি তাঁর নিজস্ব ইশতেহারে, তাহলে সেই সঙ্গেই তাঁকে তৈরি হতে হবে এই কঠিনতম আয়োজনে, চলতি পাঠকপ্রবাহ থেকে খানিকটা দূরে থাকবার আয়োজন। অথচ কতই নিষ্ঠুর সেটা! যেসব ভয়ঙ্কর অন্তর্লোক আমি উদ্‌ঘাটন করতে চাই, উদ্‌ঘাটিত হবার পর সে পড়ে আছে মানুষহীন বনভূমিতে একাকী গুল্মের মতো, অগোচরে—এর চেয়ে দুঃখ আর কোথায়? বড়ো কঠিন এই পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষার সামনে এসেই হেরে যান কেউ কেউ। এই পরীক্ষার পরেই কেউ কেউ সমস্ত অভিলাষ উৎপাটন করে দলছুট, কেউ-বা নির্বাক, কেউ-বা শুধু বচন ব্যাপৃত রাখেন পূর্বতন বন্ধুদের প্রতি বিষোদগারে আর কেউ-বা হয়ে ওঠেন রাবণহীনভাবে হতাশ এবং প্রতিষ্ঠানলোলুপ। আর, যাঁরা এসব কিছুই নন হয়তো, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত একটা মরিয়া চিৎকারে জানিয়ে দিতে চান তাঁদের বিক্ষত অস্তিত্ব, বলেন : দেখো এইখানে, আমি আছি।

কবি বলতে পারেন : কিন্তু তাই তো করতে চেয়েছিলুম আমি! আমি তো বলতেই চেয়েছিলুম

যে আমার অস্তিত্বকে সবলে জানিয়ে দেওয়াই আমার কবিতা, তারই মধ্য দিয়ে জেগে উঠবে আমার জীবনের ভয়াবহ সব সম্পর্ক, আমার গোটা জীবন আর অস্তিত্বের অবসেশন! ঠিক, কিন্তু কবিতারই মধ্যে সেই অবসেশন। যদি অস্তিত্বের আর্তনাদ বা ধিক্কার হয়, কবিতারই মধ্যে সেই আর্তনাদ বা ধিক্কার। কিন্তু অনেক সময়ে যেন তার বাইরে থেকে জাগানো হয় এই আর্তনাদ, এবং বাইরে থেকে চিৎকার ক্রমশ একেবারেরই বাইরে টেনে আনে কবিকে, কোন্‌টা সমগ্র কোন্‌টা অংশ, কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ—তার বোধেই দেখা দেয় সংকট। সেই সংকটেরই অতিদূর সূচনা ছিল 'সল্টেড ফেদার্স'-এর হাংরি-সংখ্যায়, তারই সাম্প্রতিক রেশ দেখছি আজকের দিনেও। এই সংখ্যার প্রকাশনে মার্কিন লেখকদের আগ্রহের কারণ অনুমান করা যায়, কিন্তু এর মধ্যে মলয় রায়চৌধুরীর যে উত্তেজনা বা আগ্রহ ফুটে উঠেছিল তার কোনো সঙ্গত কারণ দেখতে পাই না। যে-ভাষায় এখানে তিনি বলেন বাংলা কবিতার ইতিবৃত্ত, তার অস্পষ্টতা এবং অতিরঞ্জন আমাদের ভয় ধরিয়ে দেয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি যে এই হলো সেই শেষ মরিয়া চিৎকার আত্মপ্রত্যয়ের যোগ্য ভাষণ এ নয়। আর এই উদাহরণ ক্ষুধার্তদের চোখের সামনে জ্বলজ্ব রছে বলেই আজ তাঁদের পক্ষে আর চটুল বিজ্ঞাপনের ভুলে পা দেওয়া ঠিক হয় না। অথ., ক্ষুধার্তদের শেষতম সংকলন 'স্বকাল'-এর প্রথম সংখ্যাতেও এইসব ঘোষণা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ি আমরা : 'সাবধান! পুলিশের কালো ভ্যান তৈরি—কবি হিসেবে এক মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন প্রদীপ—এ সময়ের এক অসাধারণ গদ্য!' অথবা 'প্রদীপ চৌধুরীর উদ্ধার স্কোয়াড—বাংলা লেখালেখির জগতে আর-এক বিস্ফোরণ' অথবা 'সুবোকে অনুভূতির রাজা বলা যায়। ওর ভাষা অনুভূতি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জাত—একই সঙ্গে ইডেনের সাপ ও প্যারাডাইসের asphodel...যদি পথের পাশে কোনো পাঁড় মাতাল কিংবা অসহায় শিশু মুমূর্ষু পড়ে থাকে তাকে কোরামিন বা সেলাইন বা অক্সিজেন না দিয়ে খুব সূক্ষ্ম সিরিঞ্জে সুবোর কবিতা ইঞ্জেক্ট করে দিন—দেখবেন মানবসভ্যতা ও আমাদের এই শহর রৌদ্রে ঝলমল করে উঠবে!' সত্যি না কি? উক্ত অবস্থায় কোরামিন, সেলাইন বা অক্সিজেনের চেয়ে কবিতাই যে উপযুক্ত তারণ হতে পারে, সে যেমন কবিতাই হোক, এর চেয়ে মিথ্যে আশ্বাস আর কী হতে পারে জীবনের কাছে? কেন এই নির্মম স্মার্টনেস? ফাল্গুনী রায়ের জীবনযাত্রা রামকৃষ্ণ বা বুদ্ধের আন্‌-অ্যাকাডেমিক জীবনযাত্রকে লজ্জা দিচ্ছে কি না সেটা আমাদের প্রত্যক্ষত জানবার সুযোগ নেই ; কিন্তু কথাটা এই যে, এমন বিজ্ঞাপনের বহরে সেটা আমাদের জানবার প্রয়োজনও নেই। জীবনযাত্রাই জীবনযাত্রার পরিচয়, কবিতায় কবিতার পরিচয়। তার জন্যে এই ধরনের প্রচারভাষা ব্যবহার করে আমরা কি আবারও সেই একই প্রাতিষ্ঠানিক শব্দ চক্রের মধ্যে ঘুরে যাচ্ছি না? 'আকর্ষণীয় কভার! নতুন ধরনের সব অসাধারণ লেখা!!' এই বললে কি সত্যিই ধরা যায় যে এটা শারদীয় উলটোরথের বিজ্ঞাপন না কি সেপ্টেম্বর-সংখ্যার 'স্বকালে'র বিষয়ে পূর্বঘোষণা?

কারো আপত্তি হতে পারে এই ভেবে যে এখানে নিতান্ত এক তুচ্ছ প্রবণতাকে বড়ো বেশি ফাঁপিয়ে দেখছি আমি। বলা হতে পারে যে এসব ছোটোখাটো অলঙ্করণ উপেক্ষার যোগ্য, লক্ষ করা উচিত কেবল ভিতরকার সার, তার কথাচরিত্র। কিন্তু এইটেই আমি বলতে চাই যে আপাত-উপেক্ষণীয় এই প্রবণতাকে চিনে নেওয়া উচিত এখনই, আমাদের মনের একটা ভিতরকার দুর্বলতাকে এইভাবে সে প্রকাশ করে দিচ্ছে বলেই এর সম্পর্কে সমূহ সর্তকতার কথা ভাবতে হবে ক্ষুধার্ত কবিকে।

কেবল মনের এই অবসাদ নয়, বিজ্ঞাপনের এই ভাষা থেকেই আমরা পৌছতে পারি আরও একটা সমস্যায়, শব্দের সমস্যায়। অনেকদিন আগে মলয় লিখেছিলেন 'মহেঞ্জোদারো' পত্রিকায়,

'জীবনের সমস্ত কিছু কবিতার, কেননা বানানো শব্দসমষ্টি আর কবিতা নয়'। ঠিকই লিখেছিলেন। 'থুতুকে থুতুই বলা হবে আজকের কবিতায়, অধররস বলে গা ঢাকা দেবার ন্যাকামোকে প্রশ্রয় দেবার দিন-সময়-মেজাজ মানুষের এখন নেই' তাঁর এই কথা, অথবা শৈলেশ্বরের 'শিল্পনামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা' কিংবা 'সাধারণ কথ্যভাষাকে ব্যক্তিগত করে দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করা'র ইশ্‌তেহার শব্দ সম্পর্কে যে চেতনার পরিচয় দেয়, বিজ্ঞাপিত ওই ভাষা তার থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নিচ্ছে আমাদের। যে 'শব্দঘোঁটের' কথা উল্লেখ করেন মলয়, যা হয়তো ক্লিশেরই অন্য নাম, সেই 'শব্দঘোঁট' যে আরেক রকম ভাবে তৈরি হতে পারে তাঁদের নিজেদেরই হাতে, এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা এঁরা মনে রাখেননি ততটা। মনে রাখেননি যে এই বিজ্ঞাপনের ভাষায় যে মিথ্যার সূচনা, যে শব্দগত অতিচারণের প্রবণতা, তাই শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করতে পারে তাঁদের নিজস্ব কবিতাবলিকে, তৈরি করে তুলতে পারে শব্দে শব্দে ভরপুর প্রকাণ্ড এক ফুলন্ত ফানুস। যে-ধরনের কবিতার বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযান, তার সঙ্গে প্রভেদটা তখন হয়ে দাঁড়াবে মাত্র রঙের, সে হয়তো আরেক রঙের ফানুস, এই মাত্র!

অর্থাৎ, কবিতা লেখার চেয়েও কবিতার মধ্যে তাঁরা যেন কবিতার ইশ্‌তেহারই লিখে যান বেশি। ব্যক্তিগত জীবনকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষতায় মেলে ধরবার চেয়ে অনেক সময়েই সেখানে কাজ করে কেবল এই বোধটুকু যে কবি মেলে ধরতে চান নিজেকে। আর তাই তাঁর কবিতা ভিতর থেকে বাড়ে না কোথাও, জীবনের মতো সঞ্চারণশীল ওয়ে ওঠে না, সে কেবল বাড়তে থাকে বাইরের অবয়বে, শব্দের উপর শব্দের প্রয়োগে। প্রাতিষ্ঠানিক যে-জগৎ শব্দের মিথ্যেকে মুহুর্মুহু কাজে লাগায়, যে-কোনো সত্য উপলব্ধির উচ্চারণকে মুহূর্তমধ্যে টান দিয়ে নিয়ে যায় বিজ্ঞাপনের পরিভাষায় যা চটুল সাংবাদিকতায়, তার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য আজ শব্দের সব আলঙ্কারিক আয়োজনকে, তা চিৎকৃত অতিকথনকে ভেঙে ফেলবার দরকার ছিল, শব্দআড়ম্বর থেকে নিজেকে সেইভাবে স্খলিত করে নেবার মধ্যেই আছে এক বিদ্রোহ। প্রতীক আর প্রতিমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে কবিতায়, কেননা প্রতীকীকরণ মানে প্রাণকে জড় ক'রে দেওয়া, একের বদলে অন্যকে এনে প্রতিষ্ঠিত করা, একথা অনেকদিন আগে বুঝে নিয়েছিলেন এই কবিরা। ঠিক সেই সঙ্গেই কবি যদি ধরতে পারেন যে শব্দের অত্যাচারও কখনো কখনো জীবনকে ডুবিয়ে দেয় অনেকখানি, তাহলে হয়তো রচনায় প্রগল্‌ভ শব্দস্রোতে ভেসে যাবার সময়ে আরেকবার ভেবে নেবেন তিনি।

শব্দবাহুল্যর বাইরে দাঁড়িয়ে, বিজ্ঞাপনের বাইরে দাঁড়িয়ে, ভুল আস্ফালনের বাইরে দাঁড়িয়ে সত্যিই যদি নিজেকে, নিজের ভিতর এবং বাহিরকে, আগ্নেয় জীবনযাপনের বিভীষিকার সামনে উন্মীলন করে দিতে পারেন কবি, সেই হবে আজ তাঁর অস্তিত্বের পরম যোগ্যতা, তাঁর কবিতা।

৩

এমন নয় যে সেই দিকে পচচলা একেবারেই থেমে গেছে। এই সাত-আট বছরের অবসানে এখন আর সেই ক্ষুধার্ত কবিদল সঙ্ঘবদ্ধ নেই, থেকে গেছে তার দু-চারজন সদস্য, অথবা বলা যায় পুরোনো সঙ্ঘের অবসানে এখন আবার দেখা দিচ্ছে নতুন সঙ্ঘের সূচনা। এইরকমই হবার কথা। বিক্ষোভের কারণ যদি থেকে যায় তবে বিক্ষোভকারীরাও থেকে যাবে চিরকাল, এইটেই স্বাভাবিক। কেবল, চরিত্রগুলির হয়তো নামবদল হবে। কালকের বিপ্লবী আজকের প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে, আজ আবার জেগে ওঠে নতুন বিপ্লবী তারই বিরুদ্ধে : সিগফ্রিড সাসুনকে কবিতাপুরস্কার

পেতে দেখে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান নিতান্ত ভুল মন্তব্য করেনি যে 'টুডেজ অ্যাংরি ইয়ংম্যান ইজ নটোরিয়াসলি টুমরোজ রেসিপিয়েন্ট অব অনার্স!' এইরকমই হতে থাকবে সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক সমাজে। তাই হাংরি জেনারেশানের ইতিহাস, কবিতালেখার জন্য কয়েকজনকে যে হাজতবাস করতে হয়েছিল এই শহরে অথবা জীবিকা থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল উৎপলকুমার বসুকে, এই ইতিহাস মূল্যহীন হয়ে যায় না। সিমলা পাহাড়ের চুড়োয় বছর-বছর সমবেত হবেন ভারতীয় জ্ঞানীগুণীরা, ১৯৬৯ সালেও সেখানে প্রতিবাদহীনভাবে উচ্চারিত হবে যে ভারতে কোনো আন্ডরগ্রাউন্ড লেখক নেই আজ, বেশ আত্মতৃপ্তি নিয়েই ঘোষিত হবে যে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত 'নো রাইটার হ্যাজ বিন চার্জড ফর রাইটিং অ্যান্টি-গভর্মেন্ট অ্যান্ড নন্-কন্‌ফর্মিস্ট থীম্‌স্'! এইসব পণ্ডিতি ভাষণ সত্ত্বেও ইতিহাস অবশ্য থেকে যায়, আর এই ইতিহাসের অনেকটা অপচয় হয়ে গেছে সেকথা মনে রেখেও বিষণ্ণ হবার কারণ ঘটে না যখন একজন শৈলেশ্বর ঘোষের মতো কবি অবিচলিত থেকে কেবলই ভেবে যান জীবনের বিন্যাস, নিজের জীবনযাপনকে সমস্ত অর্থেই মিলিয়ে নিতে চান তাঁর কবিতার সঙ্গে। 'দশ পয়সার ম্যাজিক' বা 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তায়'য় যেভাবে কবিতার একটা আত্মদিগন্ত ধরতে পেরেছিলেন এই কবি, তাতে মনে হয় না যে শব্দের দ্বারা অতিলাঞ্ছিত হবার কোনো ভয় তাঁর ছিল। কিন্তু এমনকি সেখানেও, 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' নামে তাঁর ছোটো কবিতার বইটিতেও যতটা-বা নিস্ফল বিস্তারের ইশারা ছিল, তারও অনেকটা ক্ষয়িত হয়ে আসে তাঁর সাম্প্রতিক রচনাবলিতে। সম্প্রতি-প্রকাশিত টানাগাদ্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলিতে কেবল নিজেকে মেলে ধরবার প্রাথমিক উৎকণ্ঠাটুকু নয়, সেখানে দেখা দেয় তারও চেয়ে বেশি, নিজেকে ভিতর দিক থেকে খুঁড়ে নেবার নিমগ্ন অধ্যবসায়। এই ভিতরদিক কী নিজেও আমরা সব সময়ে জানি, চিনতে পারি স্পষ্ট! এই চিনতে পারার সাধনা থেকেই এক ধরনের রহস্যবোধ ও সত্য দার্শনিকতার সৃষ্টি হয়, শৈলেশ্বরের কবিতা এখন যার সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে প্রায়। এসব রচনার অংশ কখনোই পূর্ণের দ্যোতনা দিতে পারে না জেনেও উল্লেখ করতে ইচ্ছে হয় 'সন্ন্যাস' কবিতার এই টুকরো : '...এসো সন্ন্যাসী, তোমার

> সাধনা—গোপন ভয়ের কথা চিৎকার করে জানিয়ে দাও, গৃহ অভিমুখে এই যাত্রা মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে বেঁচে থাকা কান্নাশব্দ জীবরোল একবার মিথ্যা মনে করো, দেখবে শরীরের স্বভাব দরজা—কী বিষণ্ণতা ঘিরে রাখে আমাদের! বলো স্বদেশ অভিমুখে যাবার আগে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হবে না আর!'

তবে কি ক্ষুধার্ত রচনায় কোনো পরিণতির সময় এলো আজ? বাহুল্য চিৎকার ঝরিয়ে নেবার সময়? ঠিক এই সময়ে কেবল একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কবিতায় সে-সত্যের কথা বলতে চাই, তার আছে এক চির-পরিবর্তনমান অবয়ব। জন্ম আকস্মিক, মৃত্যু অনিবার্য, যৌনতা অমোঘ : এইসব নিত্য সত্যের ঘোষণাটুকুই কবিতার সব নয়। এইসব সত্যের উপর ভর ক'রে আছে যে জীবন, তাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে দেখাই কবিতার সত্য। সেই সত্যের সামনে কবির আমি আর তাঁর বাইরের সমাজ নিত্য মুখোমুখি হয়, নিত্য তার সংঘর্ষ, আর সেই সংঘর্ষ থেকে নিত্যই আরেকটি তৃতীয় সত্তার উন্মেষ। তাই, চলমান এই জীবনের সামনে কেবলই নিজের জীবনকে এনে রাখা, কেবলই গড়ে তোলা এবং কেবলই ভাঙা, তৃতীয় এই সত্তার অভিমুখে নিরন্তর আবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে চাই আজকের দিনের ক্ষুধার্ত-কবিকে, যিনি ঠিকঠিক বলতে পারবেন যে কবিতার কাজ হলো 'য সত্য তাকে সরাসরি বলা', নিজের যে সত্যের সঙ্গে নিজের কোনো কারচুপি চলে না কখনো।

প্রদীপ চৌধুরী

শব্দ ও গোপন সত্য

(অথবা কলিংবেল যাদের আতঙ্কিত করে)

শঙ্খবাবু, 'ক্ষুধার্ত'র বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত আপনার 'শব্দ ও সত্য' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। হা, খোলা চিঠি হিসেবেই এটা আপনার লেখার পাশে ছাপা হওয়া দরকার। দীর্ঘদিন, প্রফেসর ও কবি-ইন্টেলেকচুয়াল, আপনার সুনামের কথা শুনে আসছি। মনে হয় এখন প্রকৃতই সময় হয়েছে,—আপনার বাক্য ও রচনার স্ববিরোধীতা, আপনার মিডিওক্র্যাসি, আত্মাহীন আপনার অস্তিত্ব (আমি অবশ্যই খাবার টেবিলের কথা বলছি না) ও পদ্যরচনা—এসব সম্পর্কে পাঠক/জনগণের দৃষ্টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাছাড়া আপনার নিজেরও লাভ হতে পারে। হাংরিদের সঙ্গে তো আপনার কিছু কিছু যোগাযোগ আছেই। কিন্তু ওই যোগাযোগ যাতে সময় ও সীমা না ছাড়িয়ে যায় এ ব্যাপারে আপনার সচেতন থাকা দরকার।

আমি না ধরিয়ে দিলেও অধিকাংশ পাঠকই আপনার রচনাটির স্ববিরোধীতা ধরে ফেলতে পারবেন মনে হয়। ধরে ফেলতে পারবেন, আসলে এই প্রবন্ধ আপনি কোনো জাগ্রত অবস্থা থেকে লেখননি, আপনার 'কবি'-চরিত্রে যে আশঙ্কা, সতর্কতা, তারই টানাপোড়েন আপনাকে এ প্রবন্ধ লিখতে প্ররোচিত করেছে। আপনার ক্ষমাহীন অবচেতনা আপনাকে গোপনে আদেশ করেছে 'শব্দ ও সত্যে'র মারাত্মক ঝুঁকি নিতে। কবি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে আপনি যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছেন তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অর্ধসচেতন বলেই অন্তত দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে এ লেখা লিখেছেন। তাই নয়?

হাংরি লেখালেখি সম্পর্কে শিক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে আপনি উগ্রপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের যেসব এনালজি টেনেছেন, সেগুলি আমাদের লেখালেখি সম্পর্কে আপনার অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। সন্দেহ নেই, সমাজ ও সভ্যতার বিষাক্ত সাইরেন আমাদের হাড়ও কাঁপিয়ে তোলে, এবং এই অবয়বহীন শহরেই বসবাস আমাদের—কিন্তু আপনি কী করে ভুলে গেলেন এরই সঙ্গে মাখামাখি আমাদের ব্যক্তিগত সম ও অসমকামী নানা ধরণের ভিশান, গতব্যক্তি ঐশী জীবনের বিষণ্নতা, আনন্দ ও সন্ত্রাস-স্বপ্ন। এটাকে কোনো একমুখি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টের আপনি কিছুতেই ঢোকাতে পারেন না। আপনার এই স্থূল 'অ্যাপ্রোচ' হাংরি জেনারেশনের বিশাল আগ্রাস সম্পর্কে যথেষ্ট নয় মনে হয়। ওই একই ভুল দেখতে পাই (এই ইস্যুরই অন্য একটি আলোচনায়) দেবেশ রায়ও করেছেন। তিনিও হাংরি উত্থানের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে উগ্রপন্থী আন্দোলনের তুলনা করেছেন। উদ্দেশ্য, একই দুজনের—হাংরিদের সম্পর্কে নিজেদের অর্ধচেতন এটিচ্যুডকে প্রমাণ করা।

উগ্রপন্থীদের মতোই খেয়োখেয়ির মধ্যে হাংরি জেনারেশন ভেঙে যাচ্ছে—কোনো সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে এধরনের জেনারেলাইজেশনও খুবই স্থূল নয় কি? শুনেছি উগ্রপন্থীদের

কোর্ট-মার্শাল সিস্টেম আছে ; কোনো সিস্টেমই পাকস্থলীতে আমাদের ঢোকাতে পেরেছে কি? না, লেখকদের মধ্যে এধরনের কোনো আদেশনামা থাকে না। আমরা কোনো 'রিক্রুটমেন্টে' বিশ্বাস করি না। কাজেই হাংরি জেনারেশনের যে split-এর কথা আপনি বলতে চেয়েছেন, তা একান্তভাবেই আপনার ভুল এনালজিকে প্রতিষ্ঠা করার সুশিক্ষিত কৌশল মাত্র। কৃত্তিবাস বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান (হ্যা, কৃত্তিবাসকে একধরনের প্রতিষ্ঠান বলেই মনে হয় এবং আমরা যে কোনো প্রতিষ্ঠানেরই বাইরে) সম্পর্কে লিখতে গিয়ে "সঙ্ঘ ভেঙে" যাবার যে কথা আপনি বলেন, হাংরি জেনারেশনের সম্পর্কে আপনি তো তা বলতে পারেন না শঙ্খ।

ভুলে যাবেন না, বিনা চিঠিতেই দেখা হয়েছিল আমাদের—এবং দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়, সারাজীবনের শেষহীন ঘষাঘষি! আত্মা আমাদের জাগ্রতই ছিল, অপেক্ষা ছিল মাত্র কলোকশনের। আমাদের মধ্যে কোনো split কোনো দিনই হয় না, split—ঘৃণা ও আক্রোশ যা থেকে জেগে ওঠে। যদি কেউ সরে যায়, তার সরে যাবার কথা আমরা জানতে পারি অনেক পরে। এবং একসময় হয়তো বিভিন্ন স্তরগুলি উল্লেখ করি আমরা। যেমন মলয়। মলয়ের মৃত্যু সম্পর্কে শৈলেশ্বরের ঘোষণার আগেই কিন্তু সে সরে গিয়েছিল আমাদের কাছ থেকে। তারপর একদিন শুধু ব্যাপারটা যে প্রকৃতই এরকম তা আবিষ্কৃত হয়ে যায়। এবং এই চলে যাওয়ার কোনো Negative force নেই। এটা মৃত্যুর মতোই এক স্থির সত্য—পজেটিভ নিগেটিভের যাবতীয় সিদ্ধান্ত থেকে চ্যুত এক মর ঘটনা।

কাজেই (ধরা যাক একজন গোপন বিপ্লবী হিসেবে) আপনার সমর্থন যতই উগ্রপন্থীদের স্বপক্ষে থাকুক না কেন, সেই অবসেশন থেকে যদি হাংরিদের দেখতে যান তাহলে খুবই ভুল হয়ে যাবে। এধরনের তুলনা এনে আপনার বক্তব্যকে (ভুল ফ্যালাসি) প্রমাণ করা কি এক ধরনের সৌখিনতা নয়? পাঠকদের এভাবে বিভ্রান্ত করেছেন করছেন কেন? দেখলাম নিষাদ কাগজে উৎপলও এক উগ্রপন্থী বিস্ফোরণ করেছেন। অথচ নিজে তো লন্ডন বসে গাড়ি-বাড়ি কাঁটাচামচ, ফ্রিজ-টেলিভিশনে কেবল হলিউডেরই দিবাস্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন। উৎপল বসু একজন হলিউড গেরিলা, এরকম মনে হয়।

আমরা ইউনিকর্ন নই। আমাদের পরিণতি কোনো কমিটমেন্টের সঙ্গে যুক্ত নয়। আপনি সার্ত্র এবং সুররিয়ালিস্ট এমনকি গীনসবার্গের কবিতা আমাদের লেখার পাশাপাশি রেখে পড়ুন। একদিন কমিটমেন্টের এই প্রশ্ন থেকে সুররিয়ালিজম ভেঙে গিয়েছিল। অসহায় ননকমিটেড আর্তোকে এক নির্মম নাটকের নায়ক হয়ে কাটাতে হয়েছিল বছরের পর বছর পাগলাগারদে। আর সমগ্র প্যারিসময় নিন্দা, অপপ্রচার, এসব করে ব্রেতোঁগোষ্ঠী আর্তোর একটা বালও কাঁপাতে পেরেছিল কি?

আমরা কমিটেড নই, কিন্তু আর্তোর মতো উদ্ধারহীন এবং সাবজেকটিভও নই। জীবন ও সভ্যতার প্রত্যেক শিরা উপশিরার সঙ্গে আমরা অবশ্যই যুক্ত, (বলার যা অপেক্ষা রাখে না) এটাকে এক ধরনের engagement বলতে পারেন, জরায়ুর সঙ্গে শিশুর যে ধরনের engagement। Blake Baudlaire জীবনানন্দ থেকে আপনি পর্যন্ত—আপনারা সকলেই শহরের অলিগলিতে প্রচুর ঘোরাঘুরি করলেন। এর রঙ্গমঞ্চ, সুপারমার্কেট, নেপথালিন দেওয়া মূত্রাগারগুলি ব্যবহার করলেন। কিন্তু কিছুতেই মাঝরাতে স্প্ল্যানেডের পিচের ওপর আছড়ে পড়ে চুমু খেতে পারলেন না এর ভালোভাসাহীন আত্মাকে। আপনারা কবি তাই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত চেয়ারগুলিই অধিকার করে নিল আপনাদের।

ব্রথেল/হেভেন এ শহর আমাদের কাছেই প্রথম তার অচরিতার্থ ভালোবাসা ফিরে পেলো

(শহরের প্রতিটি লোকই হয়তো এজন্যেই আজ আমাদের পাঠক) হাংরি লেখা না হলে এ শহর বা শহরবাসী কারোরই অর্গাজম হয় না আর।

'স্বকাল'-এর আত্মবিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে আপনি যেসব point উল্লেখ করেছেন সেগুলি সত্যি আমাদের কাছে খুবই হাস্যকর বলে মনে হয়েছে (হয়তো জানতেন আপনিও তাই একটু 'ইয়ে' করে শুরু করেছেন)। মোটা রুলের ভেতর সুবো ও ফালগুনির সম্পর্কে যা লেখা হয়েছিল সেখানে আপনার অনধিকার venture ঘটেছে। আমরা তো আত্মবিজ্ঞাপনগুলি এভাবেই করে থাকি। এভাবে করেই সুখ আমাদের। তাছাড়া গত ৭ বছর ধরে আমাদের উপর যে কতধরনের প্রেসার কত রকম চেহারায় এসেছে তা কি আপনি জানেন না? কিন্তু আমরা যে এসবকে একেবারেই গ্রাহ্য করি না তা বোঝাবার জন্যই হয়তো নিজেদের পরিবর্তে স্পাইকসহ বুট কখনো কখনো ছাপি। এটা যে আমাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রবণতা থেকে জেগে ওঠেনি তার সবচেয় বড়ো প্রমাণ আমাদের লেখালেখি। জানেন আপনি তাই লেখালেখি থেকে এটা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেননি।

তাছাড়া সুবো সম্পর্কে আপনার কোটেশনটা কি অত্যন্ত মোটিভেটেড নয়? তা নাহলে যতটা হলে একটা সম্পূর্ণ কোটশন হতে পারতো ততটা 'কোট' কেন করেননি?

১। "ওর ভাষা অনুভূতি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জাত। একই সঙ্গে ইডেনের সাপ ও প্যারাডাইসের asphodel। আমাদের সকলের লেখার মতো ওর লেখাতেও, neo-metaphysical tone খুবই প্রবল। 'বিষকবিতার' অভুত্থান ওর ভাষায়। ওর শব্দের প্রভাব আমাদের আত্মায় এত প্রবল যে, ধরুন, যদি পথের পাশে কোনো পাঁড় মাতাল কিংবা অসহায় শিশু মুমূর্ষু পড়ে থাকে—তাকে 'কোরামিন' বা 'সেলাইন' বা 'অক্সিজেন' না দিয়ে খুব সূক্ষ্ম সিরিঞ্জে সুবোর কবিতা 'ইঞ্জেক্ট' করে দিন—দেখবেন মানব-সভ্যতা ও আমাদের এই শহর রৌদ্রে ঝলমল করে উঠবে।"

২। "ওর ভাষা অনুভূতি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জাত—একই সঙ্গে ইডেনের সাপ ও প্যারাডাইসের asphodel...যদি পথের পাশে কোনো পাঁড় মাতাল কিংবা অসহায় শিশু মুমূর্ষু পড়ে থাকে তাকে কোরামাইন বা সেলাইন বা অক্সিজেন না দিয়ে খুব সূক্ষ্ম সিরিঞ্জে সুবোর কবিতা ইঞ্জেক্ট করে দিন দেখবেন মানবসভ্যতা ও আমাদের এই শহর রৌদ্রে ঝলমল করে উঠবে!"

দুটোর অর্থ কি আপনার কাছে একই মনে হচ্ছে শঙ্খ? আর.. এর মধ্যে যা ছিল সেগুলি বাদ দেয়ারই বা মানে কী? শঙ্খ, আপনি যতটা চতুর আপনার বৈদগ্ধ্য ঠিক ততটা নয় বলেই মনে হয়! মনে রাখুন আরও বিজ্ঞাপনের মূল যে ৩টি উদ্দেশ্য—কমার্স, করাপশন এবং ডিহিউম্যানাইজেশন—আমরা এদের কোনোটাকেই প্রশ্রয় দিতে পারি না—আমাদের প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই বিজ্ঞাপিতকে ততটা stake করা হয়, যতটা না হলে ওই বদগুণগুলি থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় না। আমাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা আমাদের নিজেদেরই ভাষা।

"আকর্ষণীয় কভার! নতুন ধরনের সব অসাধারণ লেখা" আপনার কাছে এটাকে উলটোরথের বিজ্ঞাপনের মতো (বিভ্রান্তিকর) কেন মনে হলো বোঝা গেল না! স্বকালের কভার কি সত্যিই আকর্ষণীয় নয়? কভারটা যখন সত্যি আকর্ষণীয় তখন তাকে আকর্ষণীয় বলাই তো সঙ্গত। কিংবা অসাধারণ লেখাগুলিকে। উলটোরথের সঙ্গে তুলনার ব্যাপারটাকেই বরং আপনার "নির্মম স্মার্টনেস" মনে হয়। এবং খুব ক্লিশে। পরিষ্কার? 'উলটোরথ' ইত্যাদির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে স্বকালকে জড়িয়ে এ ধরনের Scandal সৃষ্টির করার প্রচেষ্টা আপনার 'শব্দ ও সত্য'র জঘন্যতম দিক বলে আমার মনে হয়েছে।

আর লেখালেখি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখা বাদ দিয়ে এই বিজ্ঞাপন প্রণয় আপনাকে কেন

আবদ্ধ করলো বুঝতে পারলাম না। দেখুন কীরকম 'স্ববিরোধ' আপনার! আপনি আমাদের আত্মবিজ্ঞাপনগুলি গবেষণা করে আতঙ্কিত হলেন (ভালো কথা), আবার ফালগুনি সম্পর্কে বলছেন, বাইরের আচরণ নয়, লেখালেখি থেকেই তার তিতিক্ষা স্পস্ট হয়ে উঠবে। এধরনের চিন্তা কি অস্বচ্ছ ও ডুয়ালিস্টিক নয়? আপনার মতো ম্যাচিওর লোকের এধরনের ভুলভুলি কেন? আপনার মিডিওক্র্যাসি এবং প্রতারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন শৈলেশ্বরের কবিতার দার্শনিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন আপনি—যখন দেখি দার্শনিকতাকেই পরিণত হাংরি কবিতার লক্ষণ বলে মনে করেন। কষ্ট হয়, যখন আমস্তকলিঙ্গপা ছুটতে ছুটতে লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি এসে, সেই গভীর তলার দিকে তাকিয়ে, ফিরে যেতে দেখি আপনাকে—কোথায় যাবেন জানেন না, হয়তো ঘরেও ফেরা সম্ভব নয় আর—চোখে পড়ে তৃতীয় কোনো ভুল রাস্তায় আপনার বিপন্ন প্রস্থান।

আপনার কতকগুলি ক্লিশে, যেমন, "আত্মদিগন্ত ধরতে পেরেছিলেন," "যতটা বা নিস্ফল বিস্তারের ইশারা ছিল" এসব এক্সপ্রেশন কি সত্যি আজ আর কিছু 'কন্‌ভে" করতে পারে? আমার তো মনে হয় শৈলেশ্বরের 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' অত্যন্ত সরাসরি ধরনের কবিতার বই। আপনার মেরুদণ্ড শক্ত হলে নিশ্চয়ই এতে 'নিষ্ফল ইশারা" (what does it mean actually?) দেখতে পেতেন না।

আপনি আসলে হাংরি কবিতা এখনও বুঝতে পারেননি। তাই 'শব্দ ও সত্য'র প্রথম অংশে আপনার যেসব আপাত-সত্য ভাষণ, আলোচনা ও উক্তি রয়েছে আপনি তাদের দায়িত্ব শেষপর্যন্ত বহন করতে পারেননি, তাই ২য় অংশে 'ঐতিহাসিক ফ্যালাসি', অকারণ অসূয়া এবং উপদেশ (যা শুনলেই বমি আসে)—এসবের মাধ্যমে প্রথম অংশের স্বীকারোক্তিগুলিকে নষ্ট করে পুনরায় সেইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে খুশি করার চেষ্টা করেছেন যাদের জন্য আপনি প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট।

এতসবের পর বুদ্ধদেব বসু সহ (সরাসরি নাম উল্লেখ করেননি) সিমলা সম্মেলন ইত্যাদিকে আপনার গালাগাল হাংরিলেখার প্রশস্তি এবং শৈলেশ্বরের কবিতায় দার্শনিকতা আবিষ্কার—নিতান্তই এক ধরনের হাস্যকর Smartness বলে ভাবতে বাধ্য হই। আপনি আসলে মিডিওক্র্যাসিরই ব্যাকড্রপ।

আপনি শব্দ ও সত্যের কথা লিখতে চেয়েছেন। কিন্তু শব্দের গোপন সত্যের কথা ভেবেছেন কখনো?

ক্ষুধার্ত

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

লিখেছেন :

অরুণ বণিক
অরুণেশ ঘোষ
অবনী ধর
ফালগুনী রায়
রবিউল
জামালউদ্দীন
দীপকজ্যোতি বড়ুয়া
সুভাষ ঘোষ
প্রদীপ চৌধুরী
উইলিয়াম বারোজ
অমিয়ভূষণ মজুমদার
আঁতোয়া আর্তো
শৈলেশ্বর ঘোষ
লুই ফার্দিনান্দ সিলিন
সুবীর মুখোপাধ্যায়
তুষার চৌধুরী
বাসুদেব দাশগুপ্ত
অমিতাভ দাশগুপ্ত
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের

ক্ষুধার্ত

৩য় সংকলন, ১৯৭৫

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

প্রকাশক : অরুণেশ ঘোষ
ঘুঘুমারী কোচবিহার

প্রচ্ছদ সজ্জা : পৃথ্বীশ শিকদার

মুদ্রক : পরেশনাথ গোস্বামী
শ্রী আর্ট প্রেস ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

যোগাযোগ : শৈলেশ্বর ঘোষ
১/৪এ ওলাইচণ্ডী রোড
কলিকাতা-৩৭

মূল্য : ৫ টাকা

১০ বছরের বেশি হ'ল হাংরি জেনারেশন আন্দোলন। ১৯৬৪-র পুলিশি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হাংরি জেনারেশনের তকমা আঁটা ভদ্রলোকেরা কেটে পড়ে এবং আজ তারা কে কোথায় কার সেবা করছে সচেতন পাঠক, ভালোই জানেন আপনি। এর পরেও দুচারজন ব্যক্তিগত লাভালাভ ও প্রচারের লোভে সরে গেছে—প্রতিষ্ঠিত হবার বুর্জোয়া চিন্তার মোহে পড়ে। হাংরি সাহিত্য আন্দোলন এখন বাংলা দেশের একমাত্র আভাঁগার্দ সাহিত্য আন্দোলন। হাংরি আন্দোলন কোনো সুনির্দিষ্ট ভাবনার ছকে আবদ্ধ নেই—ক্রম পরিবর্তনশীল এক ধারণা—এ ওয়ে অব্ লাইফ, জীবনের বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে আক্রমণ করাই হাংরি পদ্ধতি—আমরা মনে করি এক্ষেত্রে আমরা একা নই, আমাদের পাশে রয়েছেন সচেতন বিদ্রোহী পাঠক মণ্ডলী, যারা একইভাবে জীবন বিরোধী প্রতিষ্ঠানশক্তির আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন। আমরা আগেও বলেছি আমাদের কোনো প্রতিভা নেই—প্রতিভাবানদের দেখতেই পাচ্ছেন, পুরস্কারের মালা গলায় নিয়ে যারা ক্রমাগত উপরের তলায় চড়ে যাচ্ছেন। আজকের যারা তরুণ লেখক, সচেতন নবাগত, তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান, ফুরিয়ে যাওয়া ধূর্তদের উদ্দেশ্য প্রসূত কুৎসায় কান না দিয়ে, আসুন, আত্মপ্রকাশের ন্যূনতম স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এক সঙ্গে কাজ করি। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এছাড়া আজ আর অন্য পথ নাই।

অরুণ বণিক

কুকুর প্রণালী

চরিত্রলিপি :—

তিনটি বড়ো কুকুর ও তাঁদের সহচরবৃন্দ।
মহীতোষ—
পরিতোষ—
নিবারণ—

মহীতোষ পরিতোষ এবং নিবারণের স্ত্রী পুত্র ও পরিবারবর্গের কিছু কিছু সদস্যবৃন্দ এবং একজন অপরূপ সুন্দরী মহিলা মিসেস প্যাটেল বা মিসেস বাজাজও হতে পারেন অথবা নিদেন পক্ষে মিসেস বাসু।

পর্দা ওঠার আগেই (মিনিট খানেক) ভেতর থেকে তিনটি কুকুরের বক্তৃতার ঢংয়ে ঘেউ ঘেউ শোনা যেতে থাকবে মাঝে মাঝে অন্যান্য কুকুরদের সমর্থনকারী আহা উঁহু ধরনের সম্মতিসূচক আওয়াজ শোনা যাবে এবং ধীরে ধীরে পর্দা উঠতে থাকবে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোনো আবৃত্তি যেমন সব্যসাচীর 'বিদ্রোহীর' রেকর্ড বা অন্য কারো গলায় সুকান্তের লেনিন বা বোধন তাও না পাওয়া গেলে দু'একটা গানের রেকর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন "ঐ নূতনের কেতন ওড়ে...", বা যে কোনো বিদ্রোহাত্মক গানের রেকর্ডও ব্যবহার করা যায়। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে নির্দিষ্ট তিনটি স্পটে তিনটি বড়ো কুকুর একটা উঁচু যায়গাতে দাঁড়িয়ে (যেমন Lux সাবানের ছোটো এক গ্রুসের বাক্স লাল ঘুড়ির কাগজে মুড়ে নিলেই চলবে Lux ছাপটা দেখতে পারলে খুব ভালো হয়) বড়ো কুকুরদের জায়গায় পরিচালক ইচ্ছে করলে তিনটে হোঁতলা মতোন লোককে বহু বর্ণের কুকুরের মুখোশ পরিয়েও ব্যবহার করতে পারেন সহচরদের ভূমিকায় কিছু কিছু ১২-১৬ বৎসরের ছেলেকে ব্যবহার করা যায় এবং প্রত্যেকেরই পেছনে একটি করে দৃশ্যমান বহুবর্ণের ল্যাজ ব্যবহার করা উচিত ; বক্তা কুকুরদের ল্যাজগুলিকে যদি বক্তৃতার টেম্পো অনুযায়ী উঠানো নামানোর ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে নাট্যকার বুঝতেই পারছেন নাটক স্টেজে না জমে যায় না, আর পারা না গেলে খুবই মোহন ভঙ্গীতে লেজগুলিকে সাজিয়ে দর্শকের চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে পারলেও অনেকটা কাজ হয়। তিনটি স্পট থেকে লাল নীল এবং সবুজ আলো পর্যায় ক্রমে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে এবং বিচ্ছুরণটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই নিয়মমাফিক না পড়ে একটু এলোমেলো করতে পারলে আরও ভালো হয়। তবে টেক্‌নিসিয়ানের খুব বেশি অসুবিধে হলে নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর লাল নীল সবুজ চালিয়ে গেলেও কাজ হয় প্রথম প্রতিটি স্পটকে স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য খুব বেশি হলে প্রত্যেকটার জন্য ১ মিনিট করে সময় ব্যয় করা যায় এরপর শব্দ ও আলো

সহযোগে তিনটি স্পটই একসঙ্গে দেখানো যেতে পারে এই সম্মিলিত প্রদর্শনী খুব বেশি হলে ২। ৩ মিনিট রাখা যেতে পারে ; এরপর তিনটি বড়ো বড়ো কুকুর পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাবে ও তারা আবার যার যার দলের প্রতি ইঙ্গিত পূর্ণ চাহনি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাগণ খুবই সুশৃঙ্খল জনতার মতো লাইন ধরে প্রস্তুত হবে এবং বড়ো বড়ো কুকুরগুলি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে এবং জয়সূচক চলনভঙ্গী ও আনন্দসূচক ধ্বনি বা ধ্বনির অংশবিশেষ আবৃত্তি করতে করতে মিছিলের পেছনে পেছনে চলতে থাকবে ছোটো ছোটো কুকুরদের চলার ভঙ্গিতে থাকবে অসীম সাহস ও দৃপ্ত ভঙ্গিমার শিল্পসম্মত বলিষ্ঠ রেখার কাজ এবং এই অবস্থায় তারা কিছুক্ষণ স্টেজের উপর ঘুরতে থাকবে। স্টেজের উপর পটকা ফাটবে, C.R.P-র লাঠি চার্জের দৃশ্য। বড়ো বড়ো কুকুরদের সদর্পে পলায়ন ছোটো ছোটো কুকুরদের কুঁই কুঁই আওয়াজ ও পলায়ন এবং অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটির কুকুরটানা ট্রলির মতো একটি ট্রলি আসবে স্টেজে এবং মেথর জাতীয় দু'জন লোক আহত ও নিহত পাঁচ ছয়টি কুকুরকে সংগ্রহ করে গাড়ি ঠেলে ঠেলে "রাম করে বাগুয়া...হামারে ফুলোয়া..." এই রকম একটি চলতি হিন্দি গানের সুর ভাজতে ভাজতে চলে যাবে তাদের মুখে চোখে থাকবে নেশাগ্রস্তের চরম আনন্দের অভিব্যক্তি কিন্তু পদক্ষেপে কোনোরকম মাদকতা একেবারেই চোখে পড়বে না খুব বেশি হলে ২।১ মিনিট লাইট অফ থাকবে। এর মধ্যে মোটামুটি একটা মধ্যবিত্ত Drawing room cum bed room cum dressing room-এর আভাষ ফুটিয়ে তুলতে হবে অন্তত পক্ষে একটা ড্রেসিং টেবিল দু একটা চেয়ার, পারা গেলে নিদেনপক্ষে একটা সোফা স্টেজের উপর তুলে দিতে হবে আবার লাইট জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে মহীতোষ ফিটফাট ধুতি পাঞ্জাবী পরে খুব মনোযোগের সঙ্গে চুল আঁচড়াচ্ছে। আর অস্পষ্টভাবে গুনগুনিয়ে বৎসর দশেক আগের একটা খুব চলতি বাংলা গানের সুর ভাঁজছে এ-ব্যাপারে সতীনাথের পুরনো রেকর্ড খুব Helpful হতে পারে।

অরুণেশ ঘোষ

এই আমার শহর

১টি বেশ্যা পল্লি রয়েছে এই শহরে
আর আছে ১ জন সাধু
১টি মাত্র সরকারি পেচ্ছাপখানার পাশে
আড্ডা জমায় ১ দল গেঁজেল
ধ্বসে পড়া আর ভাঙ্গা ১টা সিনেমা হল
আর আছেন ১ জন ইন্টেলেকচুয়াল
পোস্টারে লেংটিপরা মেয়েছেলে
ভাটিখানার সামনাসামনি থানা
আর তিনি সন্ধেবেলা খুলে বসেন হাইডেগার
৪ তলা সেই আপিশ বাড়ি যার পাশেই
নেপালিদের বেআইনি চোলাই আর মাগীর ব্যবসা
১ জন প্রাক্তন বিপ্লবী বাস করে এই শহরে
যে একবার মাত্র ঢুকেছিল জেলে
আর ১ জন চোর, ১টা পকেটমার, ১ জন খুনে
যারা পরস্পরকে ঘেন্না করে একই কারণে
১টা বিশাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে ১জন বামন
জেলখানার ছাদ থেকে দেখা যায় বেশ্যাবাড়ির
রান্নাঘর
এখানকারও পাঁচিল টপকে পালিয়েছে ৩টি ছেলে
পুলিশের গুলিতে রাস্তায় ঘাড় গুঁজে পড়েছে
১টি কিশোর
যার গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে পশুর মতন
বোধ্য আওয়াজ
ভাটিওয়ালার সঙ্গে দারোগার তর্ক শুরু হয়ে যায়
বিনে পয়সায় মদ খাওয়া নিয়ে
বেশ্যার সঙ্গে তার খদ্দেরের
কেরাণী বাবুর সঙ্গে রিক্সাওয়ালার
প্রৌঢ়া মায়ের সঙ্গে যুবতী মেয়ের

ভিখিরির সঙ্গে বিধাতার
কনেস্টবলের সঙ্গে চোলাইওয়ালী নেপালি বুড়ির
দুধওয়ালার সঙ্গে বাসি মেয়েছেলের
কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে আবার ১ সময় শেষ হয়
এই আমার শহর, আমি ঘুরে বেড়াই এই শহরে
আয়নার ভেতরে গজিয়ে ওঠা ১ পানের দোকান
থেকে
হাত বাড়িয়ে কিনে আনি চার্মিনার
পোস্টার ছেড়ে নেমে আসে হিন্দি ছবির মেয়েমানুষ
তার যৌনাঙ্গ থেকে পেলাম, কুচি কুচি কাগজের স্বাদ
দুপুরবেলা আমার পকেটে রুমাল থাকে না
থাকে না দেশলাই
আমার বাপের রুমাল ছিল না অথবা তার বাপের
অথচ আমার মায়ের রুমাল ছিল এবং তার মায়েরও
অর্থাৎ রুমাল সভ্যতা এসেছে মেয়েদের কাছ
থেকেই
দুপুরবেলা ভাটিখানার বেঞ্চে বসে আমার হাসি পায়
মাসিকের সময় গুঁজে দেবার জন্য যে ন্যাকড়া
কোন শতাব্দীতে তার কোলে ফুলে উঠল
গোলাপ ফুল?
১ পাগল এই শহরের চূড়ায় উড়িয়ে দিয়েছে তার
লেঙ্গট
১ সিফিলিস রুগী পতাকা হাতে মিছিলের আগে
১ রোবট নিজেকে মনে করে আগামীকালের
শাসক
১ মূর্খ ঘুমিয়ে থাকে শহর-শুদ্ধ জেগে ওঠার সময়
১ অধ্যাপিকার যৌনাঙ্গে গজিয়ে ওঠে অশিক্ষিত
কালো ঘাস
আর ১ পাগল কবি দুপা ফাঁক ক'রে পেচ্ছাপ
করে দ্যায়
শীতের ভোর রাত্রে—মধ্যবিত্তের স্বপ্নহীনতার ভেতর
আমাকে দেখে হো হো হেসে ওঠে বেশ্যাপাড়ার
মেয়েরা
আমি দুপুরবেলা ঘুরে বেড়াই
১ বুড়ি আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নেয় তার জারজ
ছেলের চিঠি
১ প্রৌঢ়া আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয় তার
১১ বছরের লাইনে না-নামা মেয়েকে

১ নেতা আমাকে দিয়ে আনিয়ে নেয় তার
বাড়ির জন্য বাজার
এই শহর থেকে প্রতিদিন ১টা ট্রেন
আরও এক বড়ো শহরের দিকে ছেড়ে যায়
শহরময় ঘুরে বেড়ায় তার কালো ধোঁওয়া

সরাইখানার কুকুর

টেবিলের তলা থেকে মাঝে মধ্যে হাড় চিবানোর শব্দ
উঠে এসে স্তব্ধ করে দেয় মাতালের চিৎকার ও বেশ্যার হো হো
১ মুহূর্ত সবাই স্তব্ধ, শুধু ছড়িয়ে পড়ে শুধু জেগে ওঠে
শুধু পাক খেয়ে ওঠে
সরাইখানা ও সারা শহর জুড়ে হাড় চিবানোর শব্দ—আবার
আবার সরব হয়ে ওঠে সরাইখানা, গেলাশে মদ ঢালার ঝিন ঝিন
দুহাতে তলপেট চেপে ধরা লালচুল কিশোরের ওয়াক্
কোনের দিকে দোমড়ানো এক ছায়ার উপর দিয়ে ভেসে চলে
উরু সমেত পায়ের মিছিল
বুড়ো মাতালের ঢেঁকুর ও নীলাম ডাকার মতন বেশ্যার সঙ্গে দরদাম

তাড়িয়ে দিলে আবার ঘুরে আসবে, বার বার তাড়িয়ে ক্লান্ত
বুড়ো ভাটিওয়ালা এখন আর কুকুরটাকে কিছুই বলতে চায় না।
তবু তার দুই চোখ খুব সম্ভব আক্রোশবশত তাকায় আর
সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে
থেমে যায় তার খুচরো সোনার হাত, দ্যাখে দুই চোখ কুকুরের

তোমাকে

কালো কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে তোমার
নগ্ন সাদা পা, তোমাকে দুঃখিত করে না তোমার ঘুমন্ত মুখ
লালচে চুল তোমার মুখের উপর ওড়ে ভোর রাতের
মদো হাওয়ায়, সরাইখানার টেবিলের তলায়
তোমার গুটিসুটি শরীর, নীচু হয়ে দেখি তোমার
অপুষ্ট স্তনের বোঁটা আলগোছে ছুঁয়েছে মাটি।
তুমি স্বপ্ন দেখেছো আজ এই ভোররাতে, স্বপ্ন থেকে

তোমার আমূল শাদা পা বেরিয়ে আসে ধীরে
স্বপ্নের বাইরে তোমার একটি স্তন, আরেকটি ঘুমের
গভীরে একটু একটু করে বয়ে আনছে মাংস—
ফুলে উঠছে খয়েরী রোমে ভরা তোমার যৌনাঙ্গ
স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নের গভীরে তোমার উরুও নিস্তব্ধ
তোমার মুখ তোমার হাত তোমার গোলাপি মাংস আর
তোমার জরায়ুতে আমার শুক্রকীট টের পাচ্ছো?
টের পাচ্ছো সেই জীবন্ত পোকার তোমার থেকে
আলাদা ও ভিন্ন স্বপ্ন দেখা?

রান্নাঘরে

বেশ্যার রান্নাঘরে আমাকে কাটাতে হলো দীর্ঘ একটি রাত
পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য—মাঝ রাতের কয়েকটি
উলঙ্গ বেশ্যা আমাকে ঠেলে দিল অন্ধকার রান্নাঘরের মধ্যে
বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে তালা দেওয়া হলো আমারই
নিরাপত্তার জন্য
পুলিশের টর্চ বার কয়েক জ্বলে উঠেই নিভে গেল, বুটের শব্দ
ভারী পোশাকের থমথমে আওয়াজ বারান্দা ধরে হেঁটে গেল
উদাসীনভাবে
আর আমি পুরো ন্যাংটো দাঁড়িয়ে থাকলাম রান্নাঘরের
দেয়ালে ঠেস দিয়ে, তালা খুলে ওরা আমাকে বের করে
আনতে গেল আমার কথা ভুলে গিয়ে মাঝ রাতের তন্দ্রাচ্ছন্ন
বেশ্যারা ঢুকে গেল—ডুবে গেল যে যার ঘুমের মধ্যে, টের পেয়েও
আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম ঠান্ডা মেঝের উপর, আমার কাঁধে
আমারই স্তুপ করা জামা-পাজামা হাতে চোখ থেকে খুলে নেওয়া
চশমা
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে আমি ছুঁড়ে দিলাম সবকিছুই
ধরাবার মতন কোনোই সিগারেট থাকল না আমার কাছে—
কোনো দেশলাই

অবনী ধর

ভাতের জন্য শ্বশুরবাড়ি

দশটা টাকা জোগাড় করে দু'সপ্তাহ আগে রেশন তুলেছিলাম। গতকাল রেশন তোলার লাস্ট ডেট গেছে। ভাবলাম বউ-ছেলেমেয়েকে কয়েক মাসের জন্য শ্বশুরবাড়ি রেখে আসতে পারলে অন্তত দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। বউ কিছুতেই যেতে চায় না। গত বছর যখন বাপের বাড়ি গিয়েছিল, গায়ে গয়না ছিল না দেখে কত কথাই নাকি শুনতে হয়েছে। 'সোনা-লক্ষ্মী' বলে অনেক করে বোঝাতে বউ রাজি হলো। গাড়িভাড়া? বাসুর কাছ থেকে শুধু গাড়িভাড়া নিয়ে ভোরবেলায়ই রওনা হলাম। আমার টিকিট আর কাটলাম না। শিয়ালদা নেমে কিছু মিষ্টি কিনে আবার গাড়িতে উঠলাম।

গাড়িতে বসে বউকে বোঝালাম—কয়েকটা মাস বাপের বাড়ি থেকে যাও। দেখ, যদি ছেলেটার একটু চিকিৎসা হয়। বউ কোনো কথা বলছে না। আবার বললাম—এর মধ্যে নিশ্চয়ই আমার একটা কিছু হয়ে যাবে। মুখ শুকনো করে বউ বলে—'সবই তো বুঝি। বাবা রিটায়ার করেছে। দাদাদের উপর সংসার। কোয়াটারও দাদার নামে। তারপর এখনও চারটে বোন ঘাড়ে। আর দাদার যা মুখ, না খেয়ে মরি সেও ভালো...।' দশ পয়সার বাদাম কিনে বউয়ের হাতে দিয়ে বললাম—তোমার বাবাতো মাসে মাসে পেনশন পায়। তাছাড়া একসঙ্গে অনেক টাকাও পেয়েছে। তোমার দু'দাদাই চাকরি করে। অভাবতো আর নেই। বউ বাদাম খেতে খেতে বলল—'বাবা আগে বাড়ি করে বোনের বিয়ে দেবে তারপর...। দাদারা বলে দিয়েছে, সংসারের খরচ ছাড়া আর একপয়সাও দিতে পারবে না।'

মল্লিকপুর। স্টেশনের গায়েই দোতলা কোয়াটার। উপর-নীচে দু'খানা গুহা আর একটা ছোট্ট রান্নাঘর। সূর্যের আলো আসে না। খাটা পায়খানা। পেট থেকে কীরকম মল পড়ে তা ডাক্তারকে জানাবার সাধ্য নেই। কোয়ার্টারের চারপাশে কাগজের নৌকা ভাসছে।

বউ ছেলেমেয়ের পেছন পেছন ঘরে ঢুকলাম। গায়ে শুধু কাপড় জড়িয়ে বারান্দায় বসে শাশুড়ি কী যেন সেলাই করছিল। আমাকে দেখে মাথায় খানিকটা ঘোমটা টেনে দিল। গিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করলাম। ফ্রকপরা থলথলে ছোটো শালী এসে আমার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে শাশুড়িকে বলছে—'দেখ মা, বুড়ো কী রোগা হয়ে গেছে। আবার বউ-এর দিকে তাকিয়ে বলল—'খেতে দিস না, ইতিমধ্যে অন্যসকলেও এসে জড়ো হয়েছে। সেজ শালী ঠোঁট টিপে টিপে বলে উঠল 'তুই এখন খাইয়ে মোটা কর।' এইজন আবার বোনেদের মধ্যে ফর্সা। দু'বার ফেল করে এইটে পড়ছে। শ্বশুরমশাই আমায় বলেছিলেন—ওর জন্য বি, এ পাশ কুলিন ছেলে দেখতে। আমি ঘরে গিয়ে বসলাম। শুনছি, শাশুড়ি বউকে বলছে 'জায়গা নেই বাসা নেই, হুট করে চলে এলি—একটু আককেল বিবেচনা তো থাকা দরকার।' বউকে ইশারা করে মিষ্টির

ঠোঙাটা শাশুড়ির হাতে দিতে বললাম। বাড়ি থেকে না খেয়ে বেরিয়েছি। কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে ইশারা করে বউকে পেট থাবড়ে দেখালাম। চৌকির তলায় বাটিতে দুধ গোলা ছিল। আমার ছেলেটা কী করে দেখতে পেয়ে সোজা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল। শাশুড়ি দেখে কপালে হাত দিয়ে বলে উঠল—'হায় হায় কপাল আমার, চায়ের জন্য দুধটুকু রেখেছিলাম...'। সঙ্গে সঙ্গে এক শালী ছুটে এসে ছেলেটার হাত থেকে বাটিটা কেড়ে নিল। বউ বোধহয় ছেলেটার পিঠে দু'এক ঘা কষাল। চা—রুটি খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর শুনি, শাশুড়ি বলছে—'বিস্কুট তো ঘরে ছিল, দিলি না কেন।'

বউকে ইশারা করতে দু'খানা বিস্কুট এনে দিল। ছেলেমেয়ে দুজন তা কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিলো।

শ্বশুরমশাই ঘরে এলেন। গিয়েই একটা প্রণাম করলাম। আমার পা থেকে মাথা অবধি ভ্রূ কুঁচকে দেখে বললেন—'চেহারাটা দেখি একেবারে বাগদিদের মতো করেছো। এখন করো কী?' মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি 'হুম' বলে আবার জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার সোর্স অফ ইনকাম কী?' মিনমিন করে বললাম—নিল। ছেলেটাকে দেখে বলতে শুরু করলেন—'এটাকে তো একেবারে মেরে এনেছো। ডাক্তার-টাক্তার দেখাও না?' মুখ ফসকে বলে ফেলি—হ্যাঁ দেখিয়েছিলাম। মুখটা বাঁকিয়ে বলেন—'ওষুধ কেনার পয়সা নেই?' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন 'ওদের এখন রোজ একসের করে দুধ আর শিং মাছের ঝোল খাওয়াবা...।' বউকে ডাকলেন—'ও-সাধনা, আয় দেখি-একটু দেখি'। বউ এসে বাবাকে প্রণাম করে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'ওকে ডাক্তার দেখিয়ে একটা টনিক-ঠনিক ও কিনে দিতে পারোনি'? বউ চলে গেল। আড়াল থেকে ফর্সাশালী বাবাকে বলল—'তোমার তো আর টাকার অভাব নেই। এখন জামাই-মেয়ের চিকিৎসা করো। শ্বশুর এক ধমক দিয়ে বললেন—'চুপ থাক হারামজাদি।'

চৌকির তলায় সারিসারি চালের বস্তা। এক সময়ে বউকে দেখিয়ে বললাম—যদি এক থলে...। মুখ ভেটকি দিয়ে বউ চলে গেল। শ্বশুরমশাই কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে আমি চৌকিতে শুয়ে পড়লাম। সেজশালী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাকে বলছে—'দাদা বলে দিয়েছে—লাইটের বিল আর দিতে পারবে না। গত মাসে পঁচিশ টাকা মিটার উঠেছে দেখ দাদা ভীষণ গালাগালি করেছে।' বউ এসে ফ্যানটা বন্ধ করে দিল। বাইরে চড়া রোদ। ঘরের মধ্যে আলো না জ্বালালে পরিষ্কার কিছুই দেখা যায় না। কোথায় যাই? চৌকিতে শুয়ে নাকে যেন ফ্যানা-ভাতের গন্ধ এসে লাগে। রান্নাঘর থেকে না চৌকির তলা থেকে ঠিক বুঝতে পারি না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

শ্বশুরমশাই এসে ডেকে তুললেন। তার পাশেই খেতে বসলাম। খেতে খেতে শ্বশুর বলেন—'একটা ব্যবসাপাতিও তো কিছু করতে পারো। তোমার মামা ব্যবসা করে কেমন গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছে। লোককে বলেও আনন্দ পাই...।' খেয়ে উঠে আর যেন নড়তে পারি না। অনেকদিন পর পেট ভরে ভাত খেলাম। বউ সুপারি দিতে এলে বললাম—তোমার বাবার কাছ থেকে গোটা দশেক টাকা ম্যানেজ করে দিও। বাড়িতে মা রয়েছে...। বউ জিজ্ঞেস করল—'কী বলে চাইব?' বললাম—বলবে, ওর একটা চাকরি বাকরির ব্যাপারে..., যা হয় একটা বলে দিও। আর বললাম—আমি আজই চলে যাই। খানিক বাদে বউ এসে বলল—'মা আজ তোমায় থাকতে বলেছে। সন্ধের সময় কে এক সাধু আসবে, তার কাছ থেকে তোমাকে একটা মাদুলি নিয়ে দেবে। শুনে ভাবলাম—যাক্ তাহলে বউকে এখানে কিছুদিন এখানে কিছুদিন রাখবে

মনে হচ্ছে।

বিকেলে একা একা প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছি। স্টেশনের চারদিকে দেখি, লাল-নীল-কালো...কালি দিয়ে লেখা—'...বন্দুকের নলই—শক্তি...বিপ্লব...সশস্ত্র বিপ্লবই—মুক্তির—ঝাপ দাও...।' পড়তে পড়তে মনে একটু উত্তেজনা বোধ করছিলাম। একটা বেঞ্চিতে কয়েকজন যুবক বসে ইলেকশন নিয়ে তর্ক করছিল পরনে প্যান্ট-সার্ট। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। চোখ, গোল গোল করে ওরা আমাকে লক্ষ করছিল। আমি দূরে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। খানিক বাদে চাষাপানা একটা লোক এসে আমার পাশে বসল। দূর থেকে ওই ছেলেগুলো আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। মনে মনে হাসিও পাচ্ছে আবার একটু ভয়ও হচ্ছে। লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করল—

কোথায় থাকেন?

অশোকনগর।

আপনাদের ওখানে ইলেকশনের খবর কী?

জানি না।

সে কী! ইলেকশনের খবর জানেন না?

মানে, ঠিক ওখানে থাকি না—বাইরে থাকি।

খানিকক্ষণ টেরিয়ে টেরিয়ে আমার দিকে দেখে একের পর এক সমস্ত পার্টিকে খিস্তি শুরু করল। মুখ-চোখ শক্ত করে বলে উঠল—'এবার এখান থেকে একটা ভোটও বাক্সে পড়বে না। তবুও আমি কোনো কথা বলছি না দেখে একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল—'এখানে কোথায় এসেছেন?' রেল-কোয়াটারটা দেখিয়ে বললাম—ওইটে আমার শ্বশুরবাড়ি। 'ওঃ—আপনি অমুকের জামাই? তাই বলুন। আমি ভেবেছিলাম...। বোঝেনই তো, এখন যা অবস্থা, নতুন লোক দেখলেই সন্দেহ হয়। যাক আপনি তাহলে আমাদের দেশের লোক। একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলল—'খান' মুখটা বেজার করে লোকটা নিজে নিজেই বলতে শুরু করে—'এবার চাষের অবস্থা খুব খারাপ। যাওবা হয়েছিল, নিজেরা নিজেরা মারিমারি করে তাও শেষ করে দিয়েছে। বুঝলেন যে যাই বলুক, এইসব পাট্রিপুট্টি আমাদের মতো গরীবদের জন্য না।' ওই ছেলেগুলোর মধ্যে থেকে কে যেন সিটি মারল। 'আমার ডাক পড়েছে' বলে লোকটা উঠে চলে গেল ওদের কাছে।

সন্ধে হয়ে গেছে। কোয়াটারে গিয়ে দেখি, শালারা অফিস থেকে ফিরেছে। ছোটো শালা বই দেখে আমার ছেলেটাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়াচ্ছে। বড়ো শালা নোটবুকে হিসেব লিখছে আর ছোটো শালাকে বলছে—'চিনিতে তোকে কুড়ি পয়সা ঠকিয়ে দিয়েছে...।' আমি ঘরে ঢুকতেই থেমে গেল।

বড়োশালার সঙ্গে অনেকদিনই আমার কথা বলা বন্ধ। খাওয়া-দাওয়া করে উপরতলায় গিয়ে বসলাম। নীচ থেকে বড়োশালা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে—'...বলে দিও, এখন আর সেদিন নেই—গুষ্টিশুদ্ধ আসবে আর বসিয়ে বসিয়ে গেলাব। রোজগার করতে গাঢ় চিরে যায়।' বউকে বলল—'তোর বাচ্চাদের আলাদা শোয়া। ওই সব সর্দি কাঁশি ছোঁয়াচে রোগ। আমি আর ওষুধে টাকা খরচ করতে পারব না।' শ্বশুরমশাই বলে ওঠেন—'যাকগে এখন চুপ কর।' যাহা শোনা, আবার খেঁকিয়ে উঠে বলতে শুরু করে—'পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়ালে কী আর চাকরি পাওয়া যায়। লোকের হাতে-পায়ে ধরে তেল মাখাতে হয়। বাল ফেলার ক্ষমতা নেই...পোঙায় লাথি মেরে বার করে দিতে হয়।'

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল।...বউ আমার আগে উঠে পড়েছে। কলতলায় ঝি'রা বাসন মাজছে। আমি উপর বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ কানে এলো এক ঝি কাকে যেন বলছে—'—বড়ো সেয়ানা হয়ে গেছিস না? রস মেরে গুড় করে দেবো...।' শুনে ফিক করে হেসে ফেললাম। বলতে ইচ্ছে করছিল—সুপ্রভাত সুপ্রভাত!

বউ মুখ ধুয়ে এসে আমাকে বলে...'চলো সকালেই চলে যাই।

আমি বউ-র হাত দুটো ধরে বললাম—'লক্ষ্মীটি কয়েকটা দিন থেকে যাও। আমার জন্য একটু সহ্য করো। আরে আমাদেরও দিন আসবে...। কিন্তু কিছুতেই শুনবে না। আরও বুঝিয়ে বললাম ওদের কথায় রাগ করার কী আছে...কই আমি তো রাগ করিনি। আর যাইহোক ওরা তো আমাদের পর নয়। থেকে যাও লক্ষ্মীটি, কথা শোনো। থেকে যাও। কিছুতেই রাজি হয় না দেখে শেষে বউকে বললাম—'বাবার কাছে টাকাটা নিও।' শালারা যে যার কাজে চলে গেল। বউও গোছগাছ করে ফেলেছে। দেখলাম বউ বাপের ঘরে ঢুকল। আমার ফর্সাশালী দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখছে...বাবা দিদিকে কী দেয় বা বলে। আমি আহ্ আহ্ করে কেঁশে উঠতে শালীটা সরে গেল। খানিক বাদে বউ হাত মুঠো করে বেরিয়ে এলো। শালীটাও পেছন পেছন আসছে। বউকে ইশারা করছি, বুঝতে পারছে না। তখন শালীর নাম ধরে ডেকে বললাম...'যেও আমাদের বাড়ি, বেড়াতে।' বউ বুঝতে পেরে চলে গেল।

শ্বশুরই টিকিট কেটে দিল। গাড়ি ছাড়ার পর বউ হাসতে হাসতে আমাকে বালতি ব্যাগের তলাটা দেখায়। হাত দিয়ে দেখি চাল। বউ চৌকির তলা থেকে সরিয়ে এনেছে। ইচ্ছে করছিল, বউকে সাপটে ধরে চুমু খাই। অত লোকজনের মধ্যে কী আর তা হয়! বউকে হাতটা শুধু চেপে ধরে বললাম...'সাবাস সাবাস!'

ফালগুনী রায়

সাইট্রোনিক কবিতা

হে আমার আত্মা অনন্ত নক্ষত্রের চাঁদোয়ার নীচে তুই শালা গান গাস
গাঁজা খাস চুপচাপ চাঁদের পাথর দেখতে দেখতে তোর মনে পড়ে
ঠিকঠাক চাঁদ দেখে পৃথিবীর লায়লামজনুদের গান

অনন্ত সময় পেরিয়ে বুদ্ধ মহাভিনিস্ক্রমণের আগে যখন
দেখছিলেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের মুখ বুঝতে চেষ্টা করছিলেন
মায়ারূপ যৌন সৃষ্টির স্বরূপ অথবা যে সময় রামকৃষ্ণ সারদামণিকে
বোঝাচ্ছিলেন সংগমহীন দাম্পত্য-আত্মা আমার সেই সেই
সময়গুলো বহুশতাব্দী দশাব্দী বৎসর মাস দিন ঘণ্টা মিনিট
সেকেন্ড পেরিয়ে আবার আমার শরীরে ঢুকে ক্রিয়াশীল হয় তখন দারুণ সেক্সি
মেয়েও ব্যবহারহীন হয়ে ওঠে গ্রন্থ বা নেশা কোনোকিছুই আকর্ষণ করে না
তখন আত্মরক্ষার রাইফেল ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছে যায় নদীতে
কিন্তু এ সমাধি মাত্র কয়েক মিনিটের
তারপরই জেগে ওঠে পুরুষাঙ্গ নেশার জন্যে হাড় মাস রক্ত ঘিলু শুরু করে
কান্নাকাটি
মনের বৃন্দাবনে পাড়াতুতো দিদি বোন বউদিদের সঙ্গে শুরু হয় পরকীয়া প্রেম
আত্মরক্ষার জন্যে খুন পর্যন্ত করতে রাজি হয়ে যাই
যে নদীতে ডুবে মরেছে আমার ভাই আমি সেই নদীরি রূপ
দেখতে পাই

প্রিয় প্রদীপ এই আমার কবিতা আমার চিন্তাপ্রণালীর সার্বভৌম ক্রিয়াকলাপ
দুঠ্যাঙের লাফালাফিকে নিয়মবন্দী করে লোকে বলে নৃত্যকলা
হাত ছুঁড়তে পারার ক্ষমতার রূপান্তর করে মানুষ বনে যায় ক্রিকেটের বোলার
আমার চিন্তা করায় ক্ষমতার রূপান্তর করে আমি বানাতে পারলুম না কবিতা
চাকরির ধান্দায় হারিয়ে গেল আমার রবিঠাকুরের গান শোনবার ফ্যাসিনেশন
আত্মঅনুসন্ধান চুলোয় গেল আমার ব্যর্থতা হো হো করে
হেসে উঠল তাবৎ সফলতার প্রয়াসের কাছে—কেবল মধ্যরাতের
আমোঘ যৌনতা জানালো সে আমায় ছেড়ে যায় নি এখনো

আমার আত্মা কত ফুর্তিতে থাকে প্রদীপ নিরামিষ খেয়ে
কৈ তপসে আসে পাতে তবু আমি কৈ সুখী হতে পারি না তো
আত্মা আমার সদ্‌ব্রাহ্মণ—শূয়োরের বাচ্চাদের চিৎকার অনায়াসে
তাচ্ছিল্য করে আর আমি চণ্ডালের অধম শুয়োরদের
ঘোৎঘোতানি ভয় পাই খুব
প্রিয় প্রদীপ এই আমার কবিতা
অথবা আমার আত্মার কাঠামো

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা

বৈশাখ তোমার খরাক্রান্ত ফাটা মাঠে আমার হৃদয়ের ছাপ—হৃদপিণ্ডের নয়
শীতের কুয়াশায় আমি মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করি বিনা সিগারেটে
নারীহীন বিছানায় আমি ভোরবেলা লিঙ্গোত্তেজনা বোধ করি
কার পেটে আসবে আমার সন্তান
আমি যার পেটে ভাত যোগাবো তার?
দলীয় পতাকা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি মেয়েমানুষের
ভালোবাসা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি সাড়েবারোটার
রোদ্দুরে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার জন্যে আমি বেঁচে আছি
না আমি রবীন্দ্রনাথ হতে চাইনি কোনোদিন না আমি সুমিতাকে ভালোবাসতে
চাইনি কোনোদিন তার শরীর চেয়েছিলুম না আমি মিতার শরীর
চাইনি কোনোদিন তার ভালোবাসা চেয়েছিলুম কিন্তু কিছুই হয়নি আমার
অবশ্য বাংলাদেশ থেকে খান সেনা টঙকিঙ উপকূল থেকে মার্কিন মাইন
এবং কলকাতার বালির বস্তার আড়াল থেকে সি. আর. পি. রা সরে গেছে
চীন নিক্সন ট্রিটি হয়ে গ্যাছে চাঁদে জিপ ভারতে গম ভিয়েতনামে সৈন্য
ও অলিম্পিকে প্রতিযোগী পাঠিয়েছে শাদা কালো আমেরিকা
হিন্দু বাঙালিরা
হিন্দু বাঙালিদের
মেরে ফেলেছে
কলকাতায়—তারপর
নেতাজী
লেনিন ও
গান্ধির স্ট্যাচুর
পাদদেশে সভা করেছে শহীদমিনারের শোভাযাত্রীরা—অর্থাৎ—
অনেক ঘটনা ঘটে গ্যাছে কিন্তু আমি তবু চাকরি পাইনি
তাই বউ পাইনি
হিহিহিহিহি

টাকা না দ্যাখালে বেশ্যার দালাল ও পাত্রীর অভিভাবক
কেউই তাদের মেয়েদের ছেড়ে দ্যায় না আমাদের হাতে
কিন্তু এই গণিকা সভ্যতার ছাই গায়ে মেখে আমরা কি সবাই
ল্যাঙটের তলায় লিঙ্গ গুটিয়ে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে যাবো?
শহীদদের জন্যে শোকাশ্রু ফেলে মন্ত্রী হয়ে যাবো?
ভোট দিতে গিয়ে একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে আমি মরে যেতে দেখেছিলুম
ভোটের লাইনে কিন্তু তার নামেও প্রক্সি পড়েছিল ও তার র‍্যাশন কার্ড
বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ভালো পথ্য চিকিৎসা পেয়েও আমার বাবা মারা
গেছিলেন এবং তাঁর র‍্যাশন কার্ড ও বাজেয়াপ্ত হয়—আমি দেখে ফেলেছি
শোকের ভেতর গরিব বড়োলোক বা বুরজোয়া কম্যুনিস্টের কোনো পার্থক্য নেই
তবু কারো মৃত্যু পাখীর চেয়ে হালকা
তবু কারো মৃত্যু পাহাড়ের চেয়ে ভারী
হায় ভারতবর্ষ! আমার মৃত্যু ভারী বা হালকা হবে
হায় ভারতবর্ষ! আমি শব না শহীদ হবো—অথবা মৃত্যুর কারণ জানতে গিয়েও
বুদ্ধদেব যে রকম মারা গেছিলেন আমি কি তেমনি মরে যাবো?
মৃত্যু—তুমি কি কেবলি বিনাশমাত্র না কি তুমি জন্মান্তরের পাশপোর্ট?
কে বলে দেবে আমায় প্রকৃত পথ কোথায়?
হৃদপিণ্ডে কে দম দিয়েছে—হৃদয়ের দাম কে দেবে আমায়?
কবিতা লেখার জন্যে কাগজকলম কে দেবে আমায়?
অসুখ হলে পথ্য চিকিৎসা কে দেবে আমায়
খিদে পেলে খাবার কে দেবে আমায়!!
প্রেম জাগলে নারী কে দেবে আমায়?
রাষ্ট্র কি সব কিছু দিতে পারে—
লাস্ট বয়কে ফার্স্ট বয় করে দিতে পারে সাম্যবাদ?
বাজে কবিকে ভালো কবি করে দিতে পারে সমাজতন্ত্র?
তবুও বৈদিক স্তোত্র সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং ইত্যাদির মানে
আমাদের গতি এক হোক
আমাদের ভাষা এক হোক
আমাদের চিন্তা এক হোক...এই হায়ার কমিউনিজম
মার্কস জন্মাবার চার হাজার বছর আগে ভেবেগ্যাছে ভারতীয়েরা
আমাদের আহার এক হোক
আমাদের বসন এক হোক...চমৎকার চমৎকার
কিন্তু এই শুনে যদি কেউ বলে ওঠে তবে আমাদের স্ত্রীও এক হউক তখন
মানে মানে আমি কেটে পড়বো কারণ নারী সংগম আর গরুকে
পালখাওয়ানো আমি কিছুতেই এক ভাবতে পারি না
তাই মায়ের দুধ খেয়েও আমরা মায়ের মাংস খাবো না কোনো দিন
কিন্তু গরুর দুধ খেয়েও আমরা গরুর মাংস খেয়ে ফেলেছি।

সাইট্রোনিক কবিতা

২

হায় আমাদের যোনিহীন রেতঃপাত নদীতে পড়ে করে না সৃষ্টি পুরান কাহিনি
আমাদের চামড়ার খোলের ভেতর লুকানো থাকে আমাদের জ্ঞান প্রেম
প্রতিহিংসা
চে গুয়েভারার গেরিলা বাহিনী কাঁধের ওপর বহন করে তার গৃহ অস্ত্রাগার—
আমি দেহহীন হলে
আমার অস্ত্র বস্ত্র বাড়ি কিছুই লাগবে না—সুতরাং চামড়ামাংসরক্তহাড়
নাভি লিঙ্গ পা পায়ু
ইত্যাদির সংরক্ষণে সভ্যতা বানালো সজ্জীক্ষেত স্মল ও লার্জস্কেল ইন্ডাস্ট্রি
বোনাস শ্রমিক ধর্মঘট
যিনি মায়ের হাত ধরে বুদ্ধমন্দিরে যেতেন বালকবেলায় তিনিই বড়ো হয়ে
বুঝেছিলেন
কীভাবে রাইফেল শক্তির উৎস হয়ে যায়
হায় কয়েদি তোর প্রাপ্ত অবসর আমি সদ্বব্যবহার করি কবিতা লিখে নিজের
মৃত্যুদিন
উদযাপন করলুম জীবিত বন্ধুদের সঙ্গে বেশ্যাগমন চন্দ্রগমন দুটোর সুযোগ এলে
কাকে ফেলে ধরবো কাকে এ বিষয়ে রয়ে গ্যাছে দ্বিধা রক্তচাপ বেড়ে
যাবার ভয়ে
কাউকে খুন করতেও দ্বিধা হয় আমার বনিকপুত্ররা পাড়াতুতো
প্রেমিকাকে দ্যাখাতে নিয়ে যাচ্ছে ববি—আমি কীরকম কবি—জমিদার বাবুর
বড়োছেলে
বউ পর্যন্ত ঘুষ দিচ্ছে গুণ্ডাদের ছোটোভাইকে সরাবার জন্যে—আমি কীরকম
কবি—শীতের
দুপুরে তাস পিটে সময় কাটাতে ভালো লাগে না আমার আমি গাণিকাগমন
মনে করি না গর্হিত
বিবাহিত চরিত্রহীন ও হীনাদের জন্যে আমার নেই কোনো রাগ কোনো করুণা
আমি সন্ত ও সাপ—এখনো নই কোনো ছেলের বাপ বরং বোধ ও নিরোধ
নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি চুপচাপ—ব্যাটসমান তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে
মানে ব্যাট না চালালে
শূন্যের কোঠা তুমি কীভাবে করবে অতিক্রম এক পা না হাঁটলে আমি
হাঁটতে পারি না
হাজার মাইল চাঁটিল-কে চাঁটি মেরে আমি লিখিনি কোনো চর্যা নতুন শুধু
মাগীবাজ
ছেলেদের পোঁদে লাথি মেরে লিখতে চেয়েছি কিছু কবিতা যা আমার নিজের

স্বরূপ

আমার স্বরূপ আমি খুঁজে পাইনি দাস ক্যাপিট্যাল বা বাইবেলে—
বেদে বা কোরানে
আমি খুঁজেছি নিজেকে ব্যর্থ ক্রন্দনে দেখেছি আমার পুরুষাঙ্গের লাম্পট্য
এবং সন্ন্যাস
আমার ইন্দ্রিয় সমূহের সাক্ষীপুরুষ আমার অন্তরাত্মা আমি লিপ্ত হই সংগমে
তিনি করেন নিরীক্ষণ আমি লিপ্ত হই ধ্যানে—তিনি করেন নিরীক্ষণ
ইন্দ্রিসমূহের আমি জানি না কিন্তু আমার সাক্ষীপুরুষ জানেন
রবীন্দ্রনাথের দাঁড়িতে কোনো কাব্য ছিল না কবিতা ছিল রবীন্দ্রমননে
মানুষের জন্মে তেমন রহস্য নেই আর সব রহস্য শুরু হয় মানুষের মৃত্যুর দিনে॥

রবিউল

ঘটনাদ্বয় ও তাদের সাজসজ্জা

যে কোনো দুইটি অন্তরঙ্গ অনুভবের মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদাই স্থায়ীত্ববাসে, সেইসব অনুভবের মধ্যে লুক্কায়িত অন্তর্লিন সময়, তারা বিভিন্ন কৌশলে মিশেল বিভিন্নায়তনে ঘটনার ঘনঘটা প্রসব করে।

এক নং ঘটনা :

মেয়েটি গহনা পরে না
হার দুল চুড়ি নথ মল কোমরবিছা কিছু না
শুধু হাসে বলে
ইহাই আমার একমাত্র গহনা

দুই নং ঘটনা :

কেউই তার প্রকৃত চেহারায় নেই
আসলে সবার চেহারাই একরকম
বিকালে সকালে ভয়ে আর কঙ্কালেই প্রকৃত চেহারা

উপরোক্ত দুটি অনুভবের মধ্যে অজুত সমুদ্র। তার ভিতর থেকে উৎসারিত বিশাল দৈত্যবৃন্দ—জলপরীর ভ্রাতৃবৃন্দ। নিমেষে সূর্য আড়াল ছায়ারা প্রাসাদে বিকেল নিয়ে আসে অথচ তখন নিদাঘের খররৌদ্রে রেডিয়োর গান, পাশের বাড়ির হৈ চৈ, রবীন্দ্রনাথ নামক একজন প্রাচীন কবির গানসর্বস্ব বর্ষাবিষয়ক কবিতাবলীর প্রাকৃতিক ভূচিত্রসমূহ, তার ভিতর ছেলেদের ভেজা ঘুড়ি ওড়ানো-সুতোর টানা কাগজের দ্বি-মাত্রিক পাখি, দুপ্‌দাপ্‌ অস্থিরতা, ভেজা ঘুড়িপাখি বৃষ্টির অরণ্যে মেঘের খড়কুটো আর বৃষ্টির শলাকা দিয়ে বাসা বাঁধে। মনে মনে ভোর রাতের রং নীল ব্যথা। মুখে গন্ধ, শরীরে ঘুমের অবসাদ, তলপেটে যৌনউত্তেজনাহীন উত্থিত লিঙ্গ, প্রস্রাব ও মলবায়ুসমূহ। দিবারাত্রি জাগরণে নিরাময়তার প্রতিটি স্তরে জীবনের প্রয়োজনীয়তা, তার শিকড় উপড়ানো খেলাধূলা :

যেমন স্বল্পকালীন সেই স্মরণযোগ্য যুদ্ধের সময়কার কথা তার হাত নেই যে হাতে ভাত খাওয়া, শরীরের সুদৃশ্য ভারসাম্যতা, ছোটোবেলা থেকে মুঠি পাকিয়ে তালুতে মানচিত্র, রবিরেখা, বৃহস্পতিতে ক্রস্‌ চিহ্ন, সমুদ্রযাত্রী, হস্তমৈথুন, স্তনস্পর্শে যৌনউন্মাদনা, ছোটোবোনের গালে আদুরে চড়মারা, নাম সই করা ইত্যাদির স্মৃতিদণ্ড। এবং সর্বোপরি সেই যে লেখা খেলা লেখা শব্দে শব্দে সঙ্গমক্রিয়া, প্রসববেদনা তারপরে কবিতাকন্যা, গল্পপুত্র, উপন্যাস-পরিবার কিন্তু সেইসব সাবলীলতা, অনুপমতা, পরিবারপরিকল্পনার চিন্তাভাবনায় অবিশ্বাসী পারঙ্গম সব্যসাচী।

যেমন লেখার খাতা উলটিয়ে আরম্ভ নমুনা নং এক : রাত গভীর অসভ্য। কালো আঁধার সরিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েটির পেচ্ছাপের শব্দ আলোর মতো বিচ্ছুরিত। কুকুরের তুমুল ডাক।

আঁধার আলোতে কায়াহীন অবয়ব অবিকল আগন্তুক। পেয়ারা গাছের বাতাস একটা পাকা পেয়ারা ফেলে দিল। নিউটনলীন গাছতলা। কিছু কিছু রাস্তার আলো মিন মিন বৃষ্টিতে রোদের ভিতর ভিজছে। চিক চিক বৈদ্যুতিক তার। আকাশের গায়ে বিভক্তির চিহ্ন। দিগন্ত বিভাজ্য এককেন্দ্রিক দূরত্বে। সম্প্রসারিত এবং কৌনিক মৎস্যচক্ষুবৎ লেন্স নেই। এখন কী ধরনের কতটুকু কেমন সময়। মঙ্গলগ্রহের সময়েরা পৃথিবীগ্রহের চেয়ে কি ভারী। সত্যিই কি সেখানে উড়ন্ত উড়ানজাহাজের ভিতর ছাড়া কেউই কোথায়ও যৌনসঙ্গম করে না।

যেমন আরম্ভ নমুনা নং দুই : সেদিন আর নেই। মশা আর ওড়ে না। তাদের গানে সুর নেই শব্দ নেই। পাখায়ও জোর নেই। মাটিতে সাপের গর্ত থেকে ইঁদুর আর বের হয় না। পিঁপড়েরা মিছিল করে আর একসঙ্গে এগোয় না। টিকটিকি আর শব্দ করে না দেয়াল ঘড়ির পাশে। যে ছাদে উপুড় হয়ে আর হাঁটতে চলতেও পারে না। উপর থেকে মাকড়সা তার সুতো বেয়ে আর সার্কাস দেখায় না। তার জালের শক্তিহীনতা কাউকেই আর আটকিয়ে রাখতে পারে না। রক্তচোষা আশেপাশে রক্তচক্ষু মেলে না। ঘন ঘন সাপের মতো জিহ্বা নিয়ে এদিক ওদিক তাকায়ও না। আরশুলা ওড়ে না। তার লম্বা এন্টেনা নিয়ে চিত হয়ে গেলেও আর নৌকা চাওয়ার মতো জলহীন শূন্যে পাগুলো আর নাড়ায় না। কালো গোল একটি কয়লার টুকরো যেন শূন্যে উড়ছে। গুবরে পোকা। এরকম আর দেখি না। পায়ে স্প্রিং সংযোজিত ঘাসফড়িং আর অত লাফায় না। প্রজাপতিরা কাঁধে দুটো রঙ্গীন প্রাচ্যদেশীয় পেন্টিং-এর মতো পাখা মেলে বাতাসে সাঁতরায় না আর। সেই দেশে যেতে হয় যেখানে ন্যূনতম তিনটি সূর্যের ত্রিমাত্রিক ছায়া এবং প্রতিটি প্রজাপতির পাখায় আধুনিক ত্রিমাসিক বিমূর্ত ছবির ক্যানভাস। ছায়া পড়লে দেহের, সেখানে, দেহ চলে যায় ছায়া পড়ে থাকে এবং একটু পরে ছায়ারা একা একা সারাজীবন তাদের প্রকৃত দেহটি খুঁজে বেড়ায়।

অথচ হাতহীন এখন। কাগজ কালি কলম আর লেখা আর কোনোদিন একসঙ্গে হবে না। হাঁটতে বা দৌড়াতে গেলে শরীরের ভারসাম্যতা হয় না। নার্সবোনটি ভাত খাইয়ে দেয়, হাসলে তার গালে আবার টোল পড়ে, খাতায় নতুন বন্ধুর ফোন নম্বর আর বন্ধুদেশের বন্ধুদের ঠিকানা নতুন বছরের পকেটডাইরিতে লিখে দেয়, কাপড় পরিয়ে দেয়, প্যান্টের চেন টেনে মুচকি হাসে, কোটের হাত গলিয়ে ডানাকাটা পরী হয়ে গেলেন যে বলে, পরীর পুংলিঙ্গ পরই হয় সাদামাটায় যে বলে। মাঝপথে থামিয়ে দেয়। আর নেই। অন্যহাতে একা একা অন্যহাতের হাতধরার চেষ্টা করে। পায় না। মাঝে মাঝে ভুলে যায় সে নেই, তখন কনুইয়ের উপরে স্পর্শাতীত এক সোনালি স্পর্শ দেয়, ছুরির দাগে ডাক্তারের হাতের ঠিকানা, যে কোথায় চলে গেছে, হাড়ের কাঠামোতে শাদা খৈ ফোটে।

কিছু নয় হঠাৎ গুলি আসে। অনেকরাত বোঝা যায়নি। সার্চলাইট, হুইসেল—একি বিপরীত আজানের ধ্বনি, বাতাসের শরীর চিরে সুতীব্র শব্দ, হাতে সুঁই ফোটাল কে, গোলাপের কাঁটা আঁধারে, গোলাপ বাগানে হুমড়ি খেয়ে উলটে যেয়ে নষ্ট দূর্বা, সৌখিন বাগানবাড়ি, মালীর হাত থেকে দুবেলা মেঘহীন বৃষ্টিঝরা জলসজ্জা।

: পালা পালা

: ইস্...স্...স্...স্...

: ঠিক তোর কোথায়ও লেগেছে ইস্ করে উঠলি যে

: কোথায় বুকে

: বুকে নয় বোধ হয় কাঁধের মাংসে

: মুক্তো লুকিয়ে আছে মাংসের শহরে

: কবিতা লাইনটা সুন্দর ভালোই হলো

: কেন

: গুলি ফুরিয়ে গেলে ওই মুক্তো দিয়ে শুয়োরের বাচ্চাদের চোখ উপড়িয়ে ফেলব, মুক্তি ছিনিয়ে আনব, এইই আমার হাত ঝুলছে বাতাসে, আশ্চর্য রক্তের স্রোত, সব যে ভিজে গেল, ওহ্ কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা, মা-বোনদের কাছে গেলে কি ব্যথা কমে যাবে, মা—বোন তোমরা কোথায়, কারুণ্য—প্রদর্শনী প্রেমিকা, খুব ভালো বাবা আমার কোনো প্রেমিকা নেই তাহলে বেচারির...ইস্...স্...স্...আমার হাতটা সত্যিই ঝুলছে, একটানে ছিঁড়ে দে না—

: পাগল অস্থির হোস না দাঁড়া

: তা হলে আস্তে করে আমার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দে ব্যথার বর্ণনা নেই ওহ জলতেষ্টা রক্ত চাটি রক্ত চুষি নোনা রক্ত এত গরম আমার রক্ত এই যে গরম চা গরম চা

: তোর সোয়েটার শাদা ছিল এখন লাল হয়ে গেছে হ্যা ভালো কথা তোর রক্তের গ্রুপ কি রে

: আমার রক্তের কোনো গ্রুপ নেই O আশ্চর্য সেও এক গ্রুপের নাম ওহ আর পারি না হে অজ্ঞানতা আমাকে উদ্ধারিত করো সচেতনার প্রচণ্ড বৈভব থেকে সর্বভীরুতার জয় সর্বমূর্খতার জয় সবঅচেতনার জয় হোক আমাকে উদ্ধারিও—

আবার শব্দ। শব্দের বাগানে শব্দরা অজস্র ফুল হয়ে ফোটে, শব্দ যেন প্রচণ্ড ফুল হয়ে ফেটে পড়ে রাইফেলের ট্রিগারে।

এবম্বিধ বিস্তারিত বিবরণ সাপেক্ষে, প্রথম অনুভবে চেহারার সারাংশ সুখের নিগড়ে মনে হয় সত্যিই হাসিই গহনা; হাসিই প্রকৃত চেহারা, সবার সুখ নিজস্বতা আমিত্বই বোধহয় আসল আনন্দ। দ্বিতীয় অনুভবে মনে হয় সত্যিই কোনো চেহারাই চেহারা নয়, কঙ্কালই সবার আসল চেহারা, দুশ্চিন্তা ভয় মৃত্যুই সবার আসল চেহারা।

এই দুইটি অনুভবের মধ্যে সমুদ্রসময়। ভিতরে জল, ঢেউ, তিমি মাছদের সমুদ্রমৈথুন, সমুদ্রে বীর্যত্যাগ, বীর্যনির্বাসিত সুবাসিত মূল্যবান এ্যাম্বারগ্রিস ঢেউদের সুগন্ধিমুকুট এবং তীরে রৌদ্রকরোমূলে সমুদ্রস্নানের মতো দলে দলে আত্মহত্যায় তাদের প্রাণদান, সমুদ্র গভীরে আত্মহন্তারক কোন সে সংগীতজ্ঞের নিষ্ঠুর সংগীত, সমুদ্রকম্পে উদ্ভাসিত বোতলে আঁটা ভাসমান আমার আত্মাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও বার্তার সঙ্গে কিছু অতীতের সময় বন্ধ বাতাস বন্ধ। খুললেই আপাতত প্রতীয়মান ধূম্রজালে জড়ানো ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর একজন দৈত্যভৃত্য—

: আপনার গোলাম আকা কি হুকুম যা বলবেন যা চাইবেন জীবনে তাইই হাজির—

: ......

: হ্যা হুজুর যা আপনার ইচ্ছা ও কল্পনার পরিধিতে যা আপনার হুকুম গোলাম হাজির

: ......একটি সিগারেট

: হুজুর......ঠিক আছে হুজুর তথাস্তু

একটি সিগারেট। পাঁচ বছরে একটি টিভি সেট। দশবছরে একটি গাড়ি আর বিশ বছরে সিগারেট খেতে খেতে সারা দুনিয়া একবার চক্কর দেব।

বাতাস স্তব্ধ। অবাক হঠাৎ মেঘের আকাশ-কাঁপানো অট্টহাসি। তারপর সে কী বৃষ্টি।

রাতে পৃথিবী ঘুমোয় কালো রেশমি কাপড়ে বৃষ্টি হলে পরদিন প্রত্যুষে মনে হয় সে ঘুম থেকে উঠে একাকী বিশাল এক ঝরনার জলে দিগম্বর প্রাতঃস্নান করে।

জামালউদ্দিন

অরণ্য অথবা কষাইখানার মাঠ

পাশের বাড়ি থেকে মোরগের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ভেসে আসে অসহ্য হিম ঠান্ডা অন্ধকার ছিঁড়ে, ফাঁক করে মাতাল হাওয়ায়—হাওয়ায়...শরীর থেকে কখন পালক খসে যায় তার চমকিত অথবা বিষণ্ণ হয় না সে, সমস্ত পাপড়ি ঝরে গেলেও সে তার খোঁজ রাখে না। খোঁজ রাখে না মানুষের যাবতীয় সম্বন্ধ সভ্যতারও। সে হাসে ও গান গায়। গান গায় ও ছুটে বেড়ায় বিশাল মৃত্যুশালায়

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে সে এক ফুল
এই গ্রহের আবহাওয়ায় ফোটে ও এক আদিম গানের স্রোত হাঁটে
—অরণ্য অথবা কসাইখানার মাঠ!

তুই সেই ফুল

তুই কি সেই ফুল বিশাল হা—এর মাঝখানে
অহরহ প্রবল আকর্ষণে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে আনো
অজস্র চুম্বনের ইচ্ছাও আলোড়নময় স্বপ্ন স্রোত
উলঙ্গ মাতাল তুমি,
তোমার আদিম হাত-তালিতে নারীরা পোশাক খুলে হেঁটে আসে
তুলি ও ক্যানভ্যাস কাঁপে ছায়ায়, অসহ্য
মিলনোন্মুখ পায়ের শব্দে দরজা-জানলা, ছাদ থেকে ঝরে পড়ে
হো—হো—হো...যেতে যেতে...ক্লান্ত তুমি তৃষ্ণার্ত—পশমের জঙ্গলে
ক্রমশ তোমার হা—লম্বা জিহ্বায়
অজস্র পিঁপড়েরা ভীড় করে।

আমি

অসম্ভব ক্ষুধার্ত ও চিৎকার আমি
আমি বিশ্বাসঘাতকও ইয়ার্কিও অজস্র "না" এর সমার্থক
আমি কফ ; থুথু, পেচ্ছাপ ও পায়খানা
আমি ড্রেন ও মগজ ও নাড়িভুড়ি
আমি কঙ্কাল ও মাংস ও জল

আমি স্বপ্ন ও বাস্তব
আমার বিশাল হা—আমার অস্তিত্ব।
আমি তোমাকে টেনে হেচ্‌ড়ে নখ ও দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলি ও চিবোই,
চিবোই ও হজম করি
হজম করি ও আমার রস রক্ত অস্থি মজ্জা মাংস শিরা উপশিরায় ঠেলেদি
তোমাকে ঠেলেদি আমার বিষাক্ত উনানটায়।
প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ঢেঁকুর তুলে "ফু" এর ভিতর মিশেছি
আমার সামনে শুধু বেলুন আর বেলুন
আমি সশব্দে লাথিমারি ও ফাটাই
মানুষের হাজার বছরের সভ্যতা ও চেতনা দু'হাতে ফাঁক করে
বাবা ও মায়ের লোভাতুর সংকীর্ণ গলি ও পথ থেকে লাফমেরে
বের হই আমি। আমি বের হই ও হাঁপাই,
হাঁপাই ও হাঁটি, অসম্ভব যন্ত্রণা ও ক্ষুধায়, ধু ধু...মাঠ শুধু

বেশ্যার ঘরে আমি

বেশ্যার ঘরে আমি। বেশ্যা নগ্ন। সে তার শূন্য বোতলগুলি একে একে
দেখায় ও পরে সে তার সমস্ত রকম নাচ শুরু করে দেয়। তার নূপুর বাজে
ও সমস্ত ঘর ভরে যায় ধোঁয়ায়। আমি বসে থাকি চুপচাপ।
সে তার শরীর এগিয়ে দেয়। আমি চুপচাপ।
সে তার কাপ প্লেট ডিস আয়না চিরুনি ব্লেড এগিয়ে দেয়।
আমি চুপচাপ। সে তার নিঃস্তব্ধ উনান এগিয়ে দেয়।
আমি চুপচাপ। আমি চুপচাপ। আমি অসম্ভব চুপচাপ। চুপচাপ,
চুপচাপ আমি পথ খুঁজি ও পাই না।
সে হাসিতে ফেটে যেতে যেতে...মানবীর মতো হঠাৎ দাঁড়ায়। অর্থাৎ ফিরে দাঁড়ায়।

ঘুম ভেঙ্গে গেলে

ঘুম ভেঙ্গে গেলে জেগে ওঠে ক্ষুধার্ত শরীর ও শৈবালেরা
ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ে ও লিঙ্গে আমাকে বেধে দেয়
তারা। পা থেকে চুলের মাথা পর্যাপ্ত টালমাটাল কাঁপে
অভুক্ত আমি কাঁপতে কাঁপতে ভেসে যাই বেশ্যা ও কসাই-এর ড্রেনে,
ইঁদুরের গর্ত থেকে চুরি করে নিয়ে আসা শাদা কাগজ, কলম,
দোয়াত হাতে আমি ; তোমাকে চিঠি লিখতে চাই,
অসহ্য শব্দগুলি—লিখতে চাই।
প্রতি মুহূর্ত হলুদ পাণ্ডুর অনিচ্ছাকৃত টুকরা টুকরা বিষণ্ন শব্দ
—আমি, ভেসে যাই,
ভেসে যাই শূন্য হ'তে দীর্ঘতম অন্ধকার শূন্যে।

দীপকজ্যোতি বড়ুয়া

দৃশ্য পরিক্রমা

[আমার ইচ্ছে এই ঘটনাগুলো অভিনীত হোক। যদিও নাটকের মতো সাজিয়ে লিখতে পারি না। তাই ক্রমিকভাবে দৃশ্যগুলো তুলে ধরা।

নায়ক নায়িকা কোনো পোশাক পরবে না—সময়ের সুবিধার জন্য নায়িকারা বিকিনি ও নায়কেরা Swimsuit পরতে পারে। stage সবসময় অন্ধকারে থাকবে।

নায়ক নায়িকারা সবসময় খুব শাদা রং মাখবে। নায়ক নায়িকার গায়ে অন্ধকারে ঝকঝক করে এমন কোনো প্রলেপ দেবে। নায়ক নায়িকারা গায়ে radium প্রলেপ দিতে পারে।

সব অবস্থায় মনে রাখতে হবে অভিনেতাদের গা থেকে নীল ফসরাস রং বিচ্ছুরিত হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়।

খুব ভারী গলায় পপ গান সব সময়েই গাইতে হবে। অভিনেতার কোনো কথা শোনবার সময় গান আসে আস্তে থেমে আবার ধীরে না বেড়ে সবসময়েই দুম করে বন্ধ হবে বা শুরু হবে। যখন কোনো কথা চলতে থাকবে তখন ঢাকের খুব বন্য শব্দের তালে বলতে চেষ্টা করবেন। যখন কোনো ঘন মুহূর্ত সৃষ্টি হয় সব শব্দ বন্ধ করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। আর অভিনেতারা গলার কাজ দেখায়। এক্ষেত্রে কোলাহল থাকতে হবে—দেখুন কথা শোনাবার জন্য নায়ক নায়িকার প্রাণান্ত চেষ্টা গলার শিরা ফুলিয়ে দেয়—নাকের ফুটো বড়ো করে দেয়, চোখ ঠিকরে বার করে দেয়—অন্তত চিৎকার ও কোলাহল ছাপিয়ে নিজের গলাকে পৌছে দিতে হবে দেহকেও বিকৃত করে।

দর্শক হুবহু বুঝে নেবার চাইতে বিরক্তিপূর্ণ কল্পনায় যা বোঝে বুঝুক।]

আমি আহত, নিহত নই, তবুও কবর খুড়ে আমাকে বেরিয়েই পালিয়ে আসতে হয়েছে। পতিতাদের প্রেম প্ররোচনা এড়িয়ে আসতে হলে আকণ্ঠ পান করতে হয় ওরাও হৃদয় নিয়ে নিতে জানে। ওদের সঙ্গে ঘর করা যায় কি?

রেলের দরজার হাতল ধরে মুখটাকে ঠেলে ধরে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় স্নায়ুগুলোকে ধুয়ে নিচ্ছিলাম, একটা পপ গান মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল।

যুবক কাধে ঝুলে চুল, পাথুরে পাহাড় ধাপে দাঁড়িয়ে সামনে ঢাউস ডালিয়া—টবে ফুটে—মুখের সামনে। হাতে Electronic guiter—Sound Box-এর তারগুলো কিলবিল করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেছে দূরে। কোনো Box পৃথিবীতে নেই সব অন্যগ্রহের মানুষেরা নিজেদের এলাকায় নিয়ে গেছে। এদিকটায় একই রকমের নির্জনতা—মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে পপ গান

Which kid is my kid
Who can tell me
Which kid which kid
Who can help me-find him out

কয়েকশত সহস্রলক্ষ বছর ধরে এই সুরের ঝমঝম দুরপাল্লার রেলগাড়ি রেকর্ড লম্বা সেতু পার হচ্ছে। কোনো নদী নেই খুঁজলেও পাওয়া যায় না কোনো চর তবুও দুটো পার আছে সেতু বন্ধনও আছে।

চারপাশের মানুষ মুখগুলো থেকে নির্গত হচ্ছে দুর্ঘটনার বর্ণনা। চিরকাল এরা শুধু দুর্ঘটনা রচনা ও বর্ণনায় ব্যস্ত—খুঁটিনাটি ঘটনা ঘটায়। দুঃখ করা অন্তত বলা আহতের জন্য নিহতের জন্য নিখোঁজের জন্য—সংবাদপত্রের মতামতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নিজস্ব মতামত। পাশের বাড়ির পাশের মহল্লার পাশের দেশের, পাশের মহাদেশের, পাশের গ্রহের—ছেলেটা আহা মেয়েটা আহা সেই বৃদ্ধটা আহা সেই মহিলা আহা এক নবজাতক আহা নববধূ জামাতা আহা সব মনমোচর গল্প। আচ্ছা এটা কি কোনো জংশন?

না হ্যাঁ দেখি।

কতক্ষণ থামবে?

জানি না কিছুক্ষণ ছাড়ল।

আমি নামবো এটাই বোধ হয় সেই স্টেশন—

Destination—Destiny

আবার একটা দুর্ঘটনার ঝাপ। আমার কামরা ফাঁকা ভিড়ে কাউকে বলতে পারিনি। আমিও দুর্ঘটনায় জীবিত নায়ক মৃত আহত জীবিত জীবিত মৃত পলাতক এদের ধরেও আমি একটু অন্য জাতের। আহত মৃত চেতনা আহত। চলমান যানে মৃতদের মৃতদের সঙ্গে চলেছি। মাঠের প্রান্তরে মৃতদের সঙ্গে কবরে, উপরে Tonton মাটি গুমগুম শব্দে যানটা ফিরে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করি নখে। আচড়ে অনেক দেহ মাটির মতো ঝুর ঝুর করে পড়তে থাকে। এবার তারা দেখা যায়। দূরে বিজলি বাতি, দম ফিরে পাই। প্রথমে ছুটেছি তারপর হেঁটেছি এরপর হামাগুড়ি সবশেষে পিঠে লাঠির ঘায়ে চমকে উঠি।

উপজাতির পাহারাদার হাবিলদার অসীম নিষ্ঠানুগত্যে মৃতদের পাহারা দিয়ে কোথাও সৎকারের ব্যবস্থা করবে। মৃতদের মধ্যে জীবিতদের দেখে ভয় পেয়ে গেছে অথবা ও জানে মৃতরাও মাঝে মাঝে এঁকেবেঁকে উঠে আবার Tonton মাটি ঠেলে পালিয়ে এসেছি। যারা দুর্ঘটনার কথা বলে

তদন্ত করে
সমীক্ষা করে
কমিশন ডাকে

তাদের সামনে গিয়ে এতগম্ভীর তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ শুনে মনে হয় আমার ঘটনা আমারই কল্পনাপ্রসূত অবৈধ সন্তান। আর বলতে পারি না নিজেকে গুটিয়ে চলে আসি; জামাটা খুলে লাঠির দাগ ও ঘা যার শেষ প্রান্ত মাথা ঘুরিয়ে আয়নায় দেখা যায় বাদ বাকিটা হাত দিলে অনুভব করতে হয়—কোনো কোণ থেকেই আয়নায় ধরা যায় না।

শহরের ধাতব উদাসীনতা মানুষের সব Smartnessকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমার পুরোনো প্রখর দিনগুলো নেই। গড়িয়া শ্যামবাজার সুদীর্ঘ সহবাস সেরেও সামনের মেয়েটাকে নামার সময় ভিনগ্রহের বা বোন বলে মনে হয়। ওই বুক মিশরের মমির ওই যোনিও। টেলিফোন

ডাইরেকটরির আকার বিকার দেখে ভয় হয়। সবাই আমার প্রশ্নের ওই উত্তর দিতে অন্য প্রান্তে বসে আছে। Communication কি দ্রুত বাড়ছে ভাই?

সামাজিক ডবল ডেকারের মাথায় আমি সবেমাত্র চড়েছি—পুরীর সমুদ্রের সমুদ্রে অনেক ঢেউ আমার মাথা পার হয়ে পিঠ বেয়ে গড়িয়ে গেছে। তেমনি মাংস গন্ধ চিৎকার ঘাম রক্ত হাট বাজার পুস্তক পঞ্জিকা ঘরবাড়ি ঢেউ আমার পিঠ বেয়ে নেমে যেতে লাগল।

সামলে দাঁড়িয়ে ট্রামের তারে গাঁথা সূর্যের পেটে তামার রং দেখছি। লাইট পোস্টের পরিত্যক্ত কাকের বাসার চারপাশে কয়েকটা সদ্য লটকে যাওয়া ঘুড়ি। বাসাটায় একটা অশ্বত্থ গাছ গজাবার চেষ্টা করছে। অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে চোখ হৃৎপিণ্ডে দ্রুত।

বেসামাল ধাক্কা সামলে নিয়ে পড়তে পড়তে—সাঁতার না জানলে খড়কুটো ধরতে হয়—উড়তে জানি না বলে কী যেন ধরে ফেলেছি। আমার সামনে জ্বলজ্বল করছে "স্ব" দেখতে দেখতে চোখ গেল গলে নাক গেল থেবা হয়ে পাঁজরে বসে যাচ্ছে—কেটে কেটে বসে যাচ্ছে—ওষ্ঠাগত প্রাণ শান্তিতে ফিরে যেতে চায়—হাত ছেড়ে দেই পতনের সময় দেখতে পাই "সু—স্ব—আগতম—স্ব—স্বামী—স্ব—রূপানন্দ"।

নিশুতি রাতে চশমা খুলে রাখার মতো চোখ দুটো সন্তর্পণে ট্রাম লাইনের ফাঁকে রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। ফিটনের শব্দ টুনটুন খুব দূর থেকে কাছে এসে থামে। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ঘোমটা টানা কঙ্কাল মেয়ে। আমার চোখ দুটো তুলে নেয় ফিটনের মেয়ে কোটরে ভরে মানান মানান ভাব ধরে উঠে যায় সামনের চিমনী বেয়ে বেয়ে ভেসে ভেসে ধোঁয়ায় কাসতে চাঁদের এক ধারে বসে সেঁতসেঁতে হাসি ফাগুনের বাতাসে বিছিয়ে দিল—বয়ে নিয়ে যেতে হবে ফাগুনের বাতাসকে।

সারাজীবন "বন্ধনহীন সন্তের" জীবন
মৃত্যুর গন্ধেরও
"বন্ধন সন্তের কাছে" কেঁদে কেঁদে বলছে
আমাকে বন্ধন রাখী দাও।
যৌবনদেহবিগত পুরুষ ও নারীর মাঝে
আমরা যুবক যুবতীরা বেশীদিন যৌবন নিয়ে ঝুমঝুম
করব না।
তবুও তারা ভয়ে আমাদের ছুরিগুলো
কেড়ে নেয়
চুরি করে
জলে ফেলে দেয়
যুবতী বান্ধবীরা যৌবনদেহবিগত পুরুষদের কাছে চলে যায়
যুবক বন্ধুরা যৌবনদেহবিগত নারীদের কাছে চলে যায়
ছুরিগুলো জলে পড়ে আছে
শীতলে
গভীরে
আমার ছুরি আগুনে
আগুনে শান হয় না
এই গ্রহটা ওই গ্রহটা সেই গ্রহটা বিচ্ছুরিত আলোর

তরঙ্গ পদ্ধতি।

কসাইয়ের সব ছুরিগুলি বৃদ্ধ শানপাথরওয়ালা শান দিয়ে দেবে। গ্রহগুলো শান পাথরের মতো আলো বিচ্ছুরিত করে।

ঢেউ একটা ঢেউ আরেকটা ঢেউ ঢেউয়ের পর ঢেউ ঝড়ো বাতাস।

লাল সূর্য কুমারীর প্রথম মাসিক শ্রাবের মতো কুমারীর মুহূর্তকে অন্তঃসত্ত্বা করে।

নামঅবয়বসত্ত্বাহীন—নাম—ভালোবাসা

কোনদিন

কোনখানে

কোনক্ষণে

বীর্যবিক্রয়

সাঙ্গ করে কুমারীমাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে

প্রতীক্ষা করে

আরও আরও ঢেউ

ট্রাম লাইনে হাতড়ে বেড়াচ্ছে আমার চোখ—ফিটনের সেই মেয়ে।

এইসব দুঃখের দিনেও পুরোনো দুঃখের দিনরাত্রি যেন সুখের স্মৃতি।

আমাদের সন্তানসন্ততিদের আমরা ভক্ষণ করি না। মাছের সন্তানভক্ষণের গল্প শুনি।

কার্নিশের গোলা পায়রারা রক্ষা পেয়ে যায়। অলিগলির যুবক সন্তানেরা পার পায় না।

তাদের পিতামাতার নাম তাদের

ঠোঁটেই থেকে যায়

গৌরব পায় না।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় পিতারা

বলতে পারে স্নেহভরে

"এরা কথা শুনে"

বারোয়ারি পূজামণ্ডপ পরিত্যক্ত রেখে যুবকেরা সব উধাও। নির্জনতার চিহ্ন রেখে যেতে প্রতিবেশী পোশা দেশি কুকুর মূত্রপাত সারে ডানপা তুলে সাজানো ঘটে।

পরিত্যক্ত দেবশিশুরা

মানবশিশুরা

পিতামাতারা সন্তান ভক্ষণ করে না বলেই বেঁচে থাকে। দেবতাকে ঘিরে অদৃশ্য ঢাকের শব্দে নাচ শুরু করে ; প্রপিতা পুরুষদের মতো।

সঙ্ঘবদ্ধ চাঁদা আদায়ের দেবতা শিকারের পর আর কিছু করার থাকে না যে, মানবস্রোত থাকে আনন্দ সন্ধানে নিরানন্দবাহী কোনো স্রোত একই সময়ে বিপরীতে যায় না।

পিতামাতারা সন্তান ভক্ষণ করে না

তবুও শিশুরা কেন যেন

থাবা খাওয়া

কামড় খাওয়া

দেহ

ঝড়ঝাপটা

ভূমিকম্প সওয়া

স্নেহভালোবাসা বিপর্যয়মাখা
দুঃখ ভয় ক্রোধ ঘৃণা
মন
নিয়ে দেবতাশিকার করে
দেহ ঘিরে নাচ করে
ঢাকীরা ঢাক বাজায়
স্রোত স্রোতে ঘাম শেষ হয়
আমরা সন্তানসন্ততিদের ভক্ষণ করি না
মাতাপিতারা সন্তানসন্ততিদের ভক্ষণ করে না
পরিত্যক্ত শিশুরা দেবতা শিকার করে॥

সুভাষ ঘোষ

শীর্ষ অভিযান

('শীর্ষ অভিযান' এই গদ্যের কিছু অংশ 'ক্ষুধার্ত' ২য় সংকলনে
ছাপা হয়েছিল। বাকি অংশ এখানে রাখা হলো)

বেগম বাহার লেন

হাঁটি হেঁটে যাই—

ডান দিকে টার্ন নিয়েই বুঝতে পারি হাঁ, ক্লু যথার্থই দিয়েছিল শিশির, এই হচ্ছে গিয়ে '**বেগম বাহার লেন**'—এইখানে ভালোবাসার অনেক নাম, আছে আছে, এইখানেই আছে ড্রিম ফ্লাওয়ার্স—বাম দক্ষিণের বৃক্ষে আছে প্রথম নবীন কলি, তাতেই শিঙ্গার কুম্‌কুম্‌ এবং মোহিনী আড়াল—

ধ্বনি প্রতিধ্বনি বলে, আমরা হে এইখানে বাবু আর বিবি, আমরা হে বসতি সেই আমি, সেই তুমি—এইখানে দি লাইফ ডিভাইন—

ক্রমশ বুঝতে পারি আরও, এইখানে জল পড়ে, জল পড়ে এবং তৎকারণে পাতা নড়ে—প্রভুর আজ্ঞায় রাত ভরে বৃষ্টি সম্ভব হয়—প্রত্যেক দ্বন্দ্বই মধুর এইখানে—ফুলশয্যার রাতে অমর প্রেম এখানে এসেছে, আসে, আসবে কিন্তু দাবি তস্য এমন আকাশ ছোঁয়া যে কষ্‌ গাল বেয়ে না পড়া অব্‌ধি কোনোই নিস্তার নেই—

এখানের যে কোনো বাড়ির নেম্‌প্লেট বুঝিয়ে দেয়,

ওই ঘরে আছে ।ইমোলাক্‌স্‌, এই ঘরে জপসাধন মারণ-স্তম্ভন-উচাটন-বশীকরণ, সেই ঘরে তান্ত্রিক গ্রহরত্ন, ফ্রেজকো শোভিত টপ্‌রুমে আছেন নি-খাকী মা—

উপাধিসিদ্ধ গৃহে আছেন :
লাইফ ইনসুরেন্‌স্‌ ফর সিকিউরিটি
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন
ওভারসিজ ব্যাঙ্ক বই

বিজ্ঞাপন ছাদে শীর্ষে—

পৃথিবীর সর্বত্রই আজকাল খুব নিরাপদ এনাসিন, মাথা ছাড়ার বড়ি আবেদন, সাইকেল রোভার বরকে দিন রোভার সে জিতুক একটি স্কুটার—নিরাপদ

বিকশিত বক্ষসৌষ্ঠবে ডারমাকেয়ার—পীন গরিমায় ভরিয়া উঠিল যেখানে যা ছিল অপূর্ণতা...সোনার কোটোরি কুচযুগ গিরি কনক মন্দির লাগে...

চাই,

এর মধ্যে ঢাক ঢাক গুর গুর নেই,

চাই মেয়ে মানুষের গোঁফ—

চাই, ড্যুলাকস পেন্ট ওপরকার দাগ চাপা দিতে ধুলোময়লা কয়েক পোঁচেই ফিনিশ বছরের পর বছর রঙের বাহার বজায় রাখতে, যৌবন যা চায়—

শিকাকাই ওকাসা হাডেনসা, শাহী শিরোপা—

ওই ডান পাশে জাতীয় পশু খচিত বাড়ি, কত যে নম্বর কিন্তু টরেটক্কা আসে যদিও ওই সব ধরে ফেলার ব্যাপারে খুব অ্যাকিউরেট দীপকেরই রিসিভার—ওইখানে সেরা সেরা রাঁধুনীদের তলব হয়েছে আজ, অনেকগুলি ভোজ খেতে হবে অতিথিদের—বহু পদ বাছাই করে রচিত হয়েছে তালিকা যাতে প্রথম দিকে বেশি খেয়ে ফেলে অতিথি শেষের দিকের পদগুলি বাদ দিতে বাধ্য না হয় সেকারণে উপদেষ্টা থাকবে—

প্রটোকল বাঁচিয়েই যদিও করা হবে সব, অবশ্যই জীবন মৃত্যুর প্রটোকল্ বাঁচিয়ে—

পানীয় নিয়েও সমস্যা থাকবে—সেরা পানীয় 'প্রেম' যা তরল আগুন, পরিবেশন করা হবে কি না, সমস্যা থাকবে কিন্তু বার বার ভরা পাত্র স্বাস্থ্য কামনায় তুলে ধরা হবে, খানাপিনার সঙ্গে ঐকতান,

"প্রেম! Oh! Ask me not"

নিজস্ব বসার চেম্বার ছাড়া, তিন তিনটে লাগোয়া ঘর নিয়ে শিশিরের কারবার—'দাঁড়া দাঁড়া, বোস, তোর তো হাতে এখন কাজ নেই কোনো, চা কফি খা, এই নে সিগারেট...আর কতক্ষণ...ফ্রি হলাম বলে...।'

এক প্যাকেট...দু প্যাকেট ক্যাপসটেন হাতে গুঁজে দেয় শিশির—চা কফি'র অর্ডারের জন্য সামনে দাঁড়িয়ে থাকে দাঁতহীন আন্ডার ক্যালোরিড ওরই বেতনভুক বেয়ারা—

সিগারেট এক দেড় প্যাকেট ফিনিশ করি—কফি বার চার—টের পেতে থাকি ক্রমশই এখন কেন, আজ কেন, কাল পরশু কেন, শিশির ফ্রি হতে পারবে না আর জীবনে কখনই কোনোদিনই...উঠতে চাইলেই, বোস্, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, গল্প আছে...

পাশের রুম থেকে কিন্তু কানে একসময় ব্যস্ত শিশিরের কথা আসে,...হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়া, প্ল্যাটফরম্ পাওয়া আশুবাবুর কথা...জমির দালালের সঙ্গে কথা...বিয়ের, মার্কেটের, রাণ্ডির দালালের সঙ্গে ওইসব—

মাথা ঘামালেও, ঘাম ছাড়া আর কিছুই ছাড়ে না মাথা—সত্যিই ওরা আছে বলে এরা অথবা এরা আছে বলে দালালেরা...কিন্তু আবারও কথায় কণ্ঠস্বরে ভারী হয়ে ওঠে মাথা,

ম্যানেজ করো...ম্যানেজ করো...হিঁয়া করো, হুঁয়া করো, মাগী মানুষকো বলাও, ইনস্পেকটর সাহেবকো করো শূন্যকে সংস্থিত বানাও সংস্থিতকে শূন্য করো,—খানা বলাও...রূপেয়া বলাও...কই রিবেল হ্যায়? বানাও দছ্ বিশ হাজার...ফোন বলাও...ওহিকে লিয়ে দোস্ত হাম...হামকে লিয়ে ও-হি...ফিফটি ফিফটি—ফিফটি ফিফটি...

কিন্তু আমি ক্রমাগত কখনো চা বিস্কিট কফি খাই—দেখি শিশির কথা বলে, টেথিসকোপ

নাড়ানাড়ি করে—নাড়ি—আমি একসময় ওর শেল্‌ফের বই নাড়ি—মোটা ধেড়ে পেরিয়ে যাই কত—কত কত খটমটে দিশিবিদিশি...হঠাৎ নীচের তাকে আটকে যাই—

'তুরুপের তাস', 'লালোয়ানী খুনের মামলা', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'অধ্যাপিকার ডায়েরি', 'হাই সোসাইটি', 'নিশিকুটুম্ব', 'পাতাল থেকে আলাপ', 'রূপসী প্রতিবেশী', 'যৌবন যা চায়', 'লীলাচ্ছলে', 'রমণীর মন' 'ভানুমতীর নবতরঙ্গ', 'একটি পেরেকের কাহিনী', 'বিবাহিতের বন্ধু পত্রিকা', 'অচল টাকা চলছে', 'ফক্কর তন্ত্রম।'...

একসময় হাই তুলে পাতা ওলটাই টেবিলে রাখা শিশিরের ডায়েরির—

'...চাই আমার ফিকশান, ফ্যাশান, ফ্লাওয়ার্স, ফুড, ফেম, ফান, ফ্যাকটস...ডেকোরাল বালা'...

'নারী রূপে রূপে...গন্ধে চাই জি-এগারো যুক্ত সিম্বল সাবান...চারামিস চাই—'

শিশিরের পায়ের শব্দে ডায়েরি বন্ধ করি—তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ওর নিজস্ব চেয়ারে বসে পড়ে ও—'যা হোক একটু পালিয়ে এলাম, কতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোকে ওঃ...ডনট্‌ মাইন্ড অবকোর্স...মাঝে মধ্যে পুরোনো বন্ধুদের দেখতে ইচ্ছে করে এমন—আগে আগে যখন তোদের পাড়ায় সাঁতার কাটতে যেতাম, ওঃ, সেসব কী দিন...কত কত কথা...তোর সঙ্গে বোধ হয় আমার সেই লাস্ট দেখা—মাসিমা কেমন আছেন বল...বৌবাজারে ছানা খেতে গিয়েছিলাম...তুই ব্যাটা বাস স্টপে...আচ্ছা মেয়েটার কী যেন নাম...ব্যাটা ওকে বিয়ে করলি না...যখন বাইরে ছিলাম না, এমন মনে হতো তোর কথা...

কিন্তু এখন? এখন আর সেসব নিয়ে অ্যাসিড-অ্যাল্‌কালি—অ্যালক্যালি অ্যাসিড করে নষ্ট করার মতো সময় কই শিশিরের!

কেননা তার পেসেন্ট—তাদের দাবী আব্দার, অনুরোধ উপরোধ—'কি আর বলি ভাই, রাতে ফিরে দেখি ঘরে, টেবিলে ফ্রিজে ঢাকা খাবার—বউকে দেখি নিশ্চিত ঘুমে পাশ বালিশ জড়িয়ে—'

হাঁ, আমি ওই মহিলার ঘুম স্পষ্টই দেখতে পাই—পাশ বালিশ থেকে রাগমোচন আদায়ের পর গভীর নিশ্চিত যে ঘুম—

তা পাশ বালিশ জড়িয়ে থাকুন উনি কিন্তু শিশিরের দাবী লক্ষণ সে ধরে ফেলেছে, শনির প্রবেশ পথ জেনে গিয়েছে শিশির—না, সন্দেহের কোনো কারণই থাকতে পারে না, কেন না যথার্থ সংকেত পৌঁছে গিয়েছে তার দু কানে...

লক্ষ্য এখন, **'বিপন্ন মানব ও প্রয়োজনীয় উদ্ধার'**—এই থিসিসের স্বীকৃতি আদায়—টিক পাক আর নাই পাক, শিশির চালিয়ে যাবে—কেননা বিশেষজ্ঞ শিশির তার পরীক্ষিত সত্যে অবিশ্বাস রাখতে পারে না—তার মুঠির ভেতর আমাদের মুল ট্রাবল, নেমেসিস এসে গিয়েছে :

১. দাঁত ২. চুল ৩. চামড়া ৪. কিডনি ৫. ক্ষুৎপ্রণালী ৬. তস্য দাবি প্রয়োজন উচাটন সমূহ ৭. তাবৎ হজম সমস্যা.

উদাহরণ? উঁকি দিয়ে দেখ না হাঁটু গাড়া পেসেন্ট আমার পাশের রুমে—

আমায় বাঁচাও ডাক্তার, আরও বেশি কার্যকরী দাঁত দাও, পড়ে পাওয়া বত্রিশ পাটি নবীকরণ করত ফেরিয়ে দাও ভাই—দাও টেকসই অল প্রুফ চামড়া—আরও লাবণ্য যুক্ত মসৃণ ত্বক দাও মহাশয়—স্থায়ী চুল চেকনাই দাও—ধমনীতে আরও ওজঃগুণ বীরোরস দাও ভাই—প্রয়োজনীয় এসেন্স পাউডার পমেটম দুর্গন্ধে দাও...

শিশির এমনভাবে তুলে ধরে তার, তার ও তার পেসেন্টদের কথা, মুহূর্তে কেমন ম্লান তুচ্ছ হয়ে যায়—

বেথেলহেমে কোনো হাঁটু গাড়া ভক্ত খ্রিস্টান,

গৃহত্যাগী রাজা বুদ্ধ
নৃমুণ্ডাসনে তান্ত্রিক কোনো
দ্বীপান্তরিত মানুষ কেউ
শৃঙ্খলে গর্জমান হাত

বা সমুদ্র পাড়ে ভিক্ষারত সোমেন পালিত—

সম্ভবত সে আমাকে কিঞ্চিৎ অন্য মনস্ক লক্ষ করে, তাই শুরু করে আবার আগেও চেয়েও বেশি উৎসাহে—

যদি আমি এতটুকু সচেতন মানুষ হতাম তাহলে শিশিরের কথার পর টেবিল চাপড়ানোই আমার উচিত কাজ হতো—

যদি শিশিরের কিঞ্চিৎ কান ও চোখ থাকত আমার, তাহলে নিশ্চয়ই তার কথিত পেসেন্টদের রাজপথ জনপথে দেখতে পেতাম, যেকোনো কালারফুল মিছিলে, ইদানীংকালের মাসমেডিয়া গুলোয় :

দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিকে, সিনেমা স্লাইডে, ফ্যাসানপ্যারেড গুলোয়, আনন্দ লোকে,

লাঞ্চ ভ্যারাইটিতে
সুন্দরীর বিষণ্ণতায়
পুরুষের মেলানকলিয়ায়

শিশির কথা বলে, বলে যায়—কেন আমাকে ডাকা হয়েছিল, কী কথা আমার সঙ্গে, কোনো কিছুই এখন পর্যন্ত উল্লেখ করে না—তবে এই মুহূর্তে বিরক্তি ও আক্ষেপ তার, দু'দুখানা গাড়ি নিয়েও সে কেন সময়কে ধরতে পারছে না—কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয় সে, দরকারে ১০ খানা গাড়ি সে লেলিয়ে দেবে—১০ x ৪ = ৪০ হুইল পায়ে লাগিয়ে সময়ের শীর্ষ মুঁছড়ে দেবে শিশির—

তবে, এসব ওকে আর বলা হয়ে ওঠে না, যদি তাতেও দেশান্তরি সময়ের পাখা পালক ছোঁয়া না যায়? তখন?

ভয়ানক মাথা ধরেছে শিশির,
ফেটে যাচ্ছে মাথা...

শেষ করেই দ্রুত বাইরে বেরিয়ে পড়ি—ওর অফার, অ্যানাসিন আবেদন গ্রাহ্য করি না—

হাঁটি হেঁটে যাই—

দূর কোথাও থেকে, মাইক থেকে গান—অর্থ দাঁড়ায় :
হায়, আমাদের ভালোবাসা গেল...আমাদের ভালোবাসা গেল...
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ ঝরে গেল...

হ্যান্ডস্ আপ্

হাঁটি, স্বপ্ন, স্বপ্ন সত্য, সত্যবাস্তবের ভেতর হেঁটে যাই—কিছু অনুধাবন করার আগেই মুখোমুখি হয়ে পড়ি অকস্মাৎ—

: আপনি দীর্ঘকাল আমাদের পিছু নিয়েছেন, কিন্তু স্যাডো করছেন কেন?

ম নিরুত্তর—

: ইঁদুরের মতো ভয়ে কাঁপছেন দেখে খুবই হাসি পাচ্ছে—এইটুকু যোগ্যতা নিয়ে এতবড়ো কাজে হাত দিয়েছেন? বলুন, স্বীকার করুণ, স্যাডো করছেন কেন? আপনার কোমরে লোকোনো ওই ছাড়ুন...

: ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা তৈরি করে নিই

তাহলে আপনারাও আমার পিছু নিয়েছেন বলুন এবং দীর্ঘকাল ধরেই—

: মানে?

: বলছেন, দীর্ঘকাল আপনাদের স্যাডো করছি, আমাকেও স্যাডো না করলে বুঝেছেন কী ভাবে?

: নিজেকে খুবই চালাক চতুর ভাবেন দেখা যায়...?

: আমি নিরুত্তর।

: সময় কম, বলুন, আপনি কাদের হয়ে কাজ করেন?

: আমি এই আমারই হয়ে (দু চোখ অ্যাকটিভ তুলির মতো সারা শরীরে বুলিয়ে দিই)।

: সবচেয়ে বিপজ্জনক পেশা!! এই জায়গাটা দেখ কী সুন্দর কিন্তু এইসব আপদ জিইয়ে রেখে টিঁকে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক—

চটপট বলুন, কী করেন আপনি?

For whom you are working?

: মুখ খুলি না তবু

: কথা যদি নাই বলেন...কী করেন, তাহলে আমাদেরই সব বলে যেতে হয় দেখছি...

শুনুন তবে—

আমাদের হুইলের উঁপর সর্বদাই নজর আপনার—আমাদের হাতের উপর—ওঠা নামার সিঁড়িতে—পুশিংডোরে—খাবারের প্লেটে, টাবে, বাতে—আমাদের কী-হোলে কড়া নজর আপনার—অ্যান্টিচেম্বারে—জিন, কোড চেয়ারে—

ওই তো আমাদের চেয়ার আপসেটের ব্লু প্রিন্ট কোমরে আপনার—চেষ্টফটো বুক পকেটে—আমাদের কোড সাইফার...

ওঃ এই কুত্তা আমাদের অকসিজেন কানেকশান নষ্ট করার ধান্দায়...মুঠিখুলুন—প্যান্ট জামা—হ্যান্ডস্ আপ্!!

রিমুভ হিম...ফিনিশ হিম...কিল হিম...লিন্চ হিম...

হঠাৎ ওরা খোলা শরীর নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে আমার দিকে—আমিও এগিয়ে যেতে থাকি ওদেরই দিকে—ওদের হাত ছুটে আসতে থাকে আমার গলার দিকে—আমারও কিলবিল আঙুল ওদেরই দিকে—

মুহূর্তে মাটি আকাশ ফুঁড়ে তীব্র হুইসিল বেজে ওঠে...হুইসিল বেজে ওঠে...

দেখি, বিনয় বাদলের সঙ্গে কখন মিলে গিয়েছে হাত আমার—দীনেশ দীপকের সঙ্গে—দীপক অনুপমের সঙ্গে হাত, অভিরামের সঙ্গে ঝটিতে হাত যুক্ত হয়ে ফুঁসে উঠে—

ছায়া পিণ্ড অদৃশ্য হয়।

বন্ধুরা, লেট আস মিট টুগেদার...

মিট টুগেদার...

মিট টুগেদার...

এই কোরাস গাইতে গাইতে আমরা এক অতি আলোর দিকে—

বেডরুম রহস্য

হাঁটি, সুপার মারকেটের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাই—নিয়ন রাস্তা করে—এইখানে ফ্লুরেসেন্ট গায়ের রং পালটে দেয়—হাঁটি, ২।৪ মিনিট বাদেই বুঝতে পারি বেডরুম রহস্য-এর জন্য এখানের বাতাস উন্মাদ হয়েছে—'ওই, রহস্য সুন্দরী চা-ই আমার, তাহলেই ব্যস্...' এই ফ্যাসিস্ট ফতোয়া—

'এই হচ্ছে গিয়ে মেয়েমানুষ'—কোনো কোনো লেখকের এই চরম ফতোয়ার পরও কিন্তু দেখা যায়, কোন মা-জোনোনি সানকি হাতে থ্রি-স্টার হোটেলের নীচে—'দেখুন, ওই ইচ্ছে গিয়ে পুরুষের মূল,—নির্বীজকরণ করত মাঝরাতে কপাল চাপড়ায় কোন পুরুষ মানুষ—

আমি নিজে এই দৃশ্য দেখেছি অবশ্য :

এই আমার গ্রন্থ, এইখানে ধরেছি আমি টোটালিটি অব্ লাইফ...।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মড়মড় শব্দ হয়, তাঁর নায়ক নায়িকা হুড়মুড় করে কম্বল কাঁথা বালিশ ছেড়ে উঠে পড়ে। চোখের কেঁজুল মুছতে মুছতে ঘিরে ফ্যালে তাঁকে—

: আপনার ওইসব ফস্টিনস্টি চাই না মহাশয়, যদি পারেন দিন পাখা আমাদের, সুস্থ পাকস্থলি দিন, দিন ভূমি ও ভূবিষয়ে সম্যক ধারণা, আবহাওয়া বিষয়ক ম্যাপ চার্ট দিন, প্রকৃত ওষুধ ও ওষধি জানিয়ে দিন মহাশয়, দুধু পুকুরের সঠিক নিশানা বলুন, বলুন কবে আসে ধানের বুকে দুধ—বরুণ বিষয়ে যথাযথ তথ্য দিন ভাই, মানুষ আমরা, বলুন কোথায় ঘটে মানুষ নামের লীলা...

হাঁটি, খোলা বাজারে, খুচরো মানুষের পাশে হেঁটে যাই—

ওরা কেউ বা খোকার হয়ে বেলুন কেনে, বাঁশি ছবি কেনে—নিজের কারণে জলছবি—বিশেষ আড়কে ডুবিয়ে প্রকৃত ছবি আসবে আশায়—যে বার আগে পারে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সদরে ঢুকবে এই আশায় ক্রসিং-এ আসে—

কিন্তু পথ রোধ করে লাল কর্কশ আলো—কানে কানে বলে,

'ওহে, অত উদ্বেল হয়ো না, আছে, আছে, পাহারাদারের বজ্র কঠিন দৃষ্টি আছে, আছে ওয়াচ টাওয়ার, কুকুরের চোখ আছে, আছে আলোর পাহারা, তিন থাকে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে...'

খুবই আশ্চর্য হয়ে ভাবি, ওইসব খুচরো মানুষ কেন বলে না,

'আছে, আছে, আছে হে আছে, আমাদেরও মূল সন্ধিতে দিব্য রকেট আছে, যে কোনো সময়েই পালটা বিস্ফার ঘটাতে পারি—আইদার রাস্তা ক্লিয়ার করো, অর্ ফেস্...'

কুকুরের জন্য ইজের

কাগজ খুলি। পাতা ওলটাই, উলটিয়ে যাই—

জানতে পারি, এখন চলেছ সেল বাড়াও সপ্তাহ—বিবাহ বিচ্ছেদের সুফল ফলছে—সুফলাই আসলে সোনা ফলায়—আমরা ক্রমশই দারিদ্র সীমার নীচে চলে যাচ্ছি—হিমঘরে একদার সেইসব নাম—ফিকশানে তচনচ...

জন্তুদের সভ্য করার কাজে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে—তাই কুকুরের জন্য ইজের ঘোড়ার

জন্য নেংটি—গরুর জন্য আধা পায়জামা—

একটি ক্যাপসানে পড়ি, **'এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই'**—বাসকেটে ছুঁড়ে দিই কাগজ—বহুদিন বাদে তোমার দেয়া **'বিশ্বপরিচয়'** আবার হাতে তুলে নেই—মধ্যবর্তী ও তৎপরবর্তী অংশ বার বার উৎপাত করে—মাছি তাড়িয়ে দিই—আবার বসে পড়ে—বসে পড়ে তাড়িয়ে দিই বিষণ্ণ মাছি...

'...কেবলই চোখে আমার দুঃখের এক অনন্তবাহি নদী—ইহার শুরু কোথায়, জানা নাই—শেষও দেখিতে পাই না আমি—কূলে বাজায় কে অন্ধের বাঁশি, সুর ধরিয়া কোথাও পৌছাইতে পারি না—বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য করুন আত্মা এক কেবলই ধুঁকিতেছে—কে বলিবে, ইহার পুনশ্চ উত্থানে কী ঘটিতে পারিত!

আমি দেখিতেছি :

নিরন্তর এক যুদ্ধভূমি—সেই নায়ক নায়িকায় সংঘর্ষ, নায়িকা-নায়িকার, নায়ক-নায়কে—নায়কে অস্ত্রে, অস্ত্রে নায়কে, অস্ত্রের সহিত অস্ত্রেরওবা—লক্ষ্য যুদ্ধ, উপলক্ষ্য ভূমি, জল, আসন—নারী (উহ্যে নারীমাংস)—আমি ভাবিয়া পাই না, এইসব দৃশ্যমান শরীরই একদা চাঁদ, শিশু ছিল! বাল্য কখনো আউটিং হইত—তখনই জানা গিয়াছিল, তারা ঝিকিমিকি, আলো ঝিলিমিলি...

এখন প্রতিনিয়ত কত কিছু পরিবর্তিত হইতেছে—খাদ্যের রুচি, খাদ্যের ব্যবহার, টেরির বাহার, পোশাকের রূপ, রূপের ধারণা, প্রকৃতি-পরিচয়, শব্দের ধ্বনি, বানান, বুদ্ধির চেহারা, কৌশলের স্বরূপ, হাসির ব্যাখ্যা, অস্ত্রের চাকচিক্য হৃৎপিণ্ড পাকস্থলি—

ঘটিতেছে যৌ-ধর্মের রূপান্তর—এমনকি আজিকালের পায়ের নীচের সরণির নাম বানান পর্যন্ত—কিন্তু একদার প্রাইম পিরিয়ডেরসরণি-স্বরূপ কই?

দেখি, জনমনুষ্য বাড়ে, লীলাভূমি সংকুচিত হয়, পা বাড়ে ময়দান উদ্যান-এলাকা বর্ধিত হয় না—রকম স্ফীত হয়, বৈভব হয় না—দৃষ্ট হয় কেবল কায়া অনুপাতে দীর্ঘায়িত ছায়া—তরু ছায়ার নীচে তেমন পাখি পর্যটক আর আগের মতো দৃষ্টি হয় না—কই, পর্যটন প্রিয় সেই পাখি সব—? আমি কখনই পর্যটক হই নাই, মা জোনোনি মাতৃভূমি ভিন্ন অন্য কিছুই এতাবৎ জানি নাই, দেখি নাই,—বিদেশ বিভুঁই—ওই যে চরণ রেখার ওইপারে নোম্যানসল্যান্ড, তাহার পরে যে ভেদ রেখা—তাহার পর স্থিত যে ভিন্নভূমি—যাহা বিদেশ, বিভুঁই—তাহা কখনই জানি নাই—

কিন্তু আমি দেখি আমার এলাকা পরিধি ঘিরিয়া নিরন্তর দুঃখবাহিনী নদী এক—খোকা, জানি না, উহার গতি পথ ঘুরাইবে কে?

আশঙ্কা হয়, 'ওই তো পিতার রাখিয়া যাওয়া অর্গল বদ্ধ সিন্ধুক, উহাতে নিশ্চয়ই গুপ্তধন, তৎনির্দেশক তালিকা কোড ঠিকুজি রহিয়া গিয়াছে, যাউক, অতঃপর আমার পথ সরল, কোনো কাঁটা কুঞ্চিকা ডালপালা নাই—আজ আশঙ্কা হয়, খোকা, শেষপর্যন্ত তালাচাবি নাড়িয়া হয়তো দেখিতে পাইবে ওইখানে কিছু কঙ্কাল—এতাবৎ সব সভ্যতারই আলমাইরাতে কিছু কিছু যাহা তোলা রহিয়াছে—

কিন্তু আমি বলিব, তুমি সর্বদাই তোমার ব্যক্তিগত নিশানের (একই সঙ্গে যাহা স্বজন সমর্থিত) সংকেতই মান্য করিবে—দেরীতে হইলেও আমার বর্তমান উপলব্ধি এ-ই...

এবং অকপটে আজ এ-ও স্বীকার করি, মানবের প্রকৃত মনোভঙ্গী আমি ধরিতে পারি নাই—কেননা, মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই জানিলাম :

খুনীরা অন্তরঙ্গতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদেরকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়াছিল—এবং

দলবদ্ধ খুনীরা কঙ্কালের লোভেই নাকি দুই-দুইটি মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে—কারণ এক একটি নরকঙ্কালের চলতি বাজার দর নগদ একশত পাঁচ টাকা—

জানিতাম, মরামানুষের হাড় আর জীবিত মানুষকে কঙ্কাল হিসাবে কল্পনা করার মধ্যে পার্থক্য অনেক—যদিও ইহাও জানা ছিল শীর্ষদেশের একপ্রকার মানুষ মানুষকে ক্রমশই কঙ্কালসার করিবার কৌশলে নিয়ত তৎপর, কিন্তু বোধ হয় কঙ্কালের দামে মানুষের দাম ধার্য করিল ইহারাই, এ-ই প্রথম—

হইতে পারে চারিদিকের খুনের হাওয়া ও নিশিপ্রাপ্তি তাহাদের এই সরল সংক্ষিপ্ত পথে উৎসাহিত করিয়াছিল, মুণ্ডহীন দেহ তো যত্রতত্রই হামেশা মিলিতেছে—কে আর তলাইয়া দেখিবে!

তবে এখন হইতে ইহা মনে রাখিতে হয়, প্রত্যেকের দেহের ভিতরে রহিয়াছে এক একখানা কঙ্কাল, প্রত্যেকেই আমরা অন্তত এক শত পাঁচ টা-কা—

নরবলীর কথা শুনিলে আমাকে বরাবরই আঁতকাইয়া উঠিতে হয়—

হে কাঁপালিক তুমি থিতু পাও!
হে নবকুমার, তুমি স্থিত হও!

...ইদানীং 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' বলিয়া একটি কথা মাঝে মধ্যেই কানে আসে—এমন এক একটি ডায়েবলিক ঘটনা তরঙ্গ, মাতৃ-প্রতিমা ভুলিয়া যাইতে হয়, অথচ একদা ওইসব প্রাসাদে অন্যস্ব মানুষ থাকিত—যদিও উহা আগের মতোই সব ঠিক ঠিক সাজানো—ফুলদানি, বাতিদান, দেয়ালচিত্র, পর্দা—এখন শুধু বদলাইয়া গিয়াছে কক্ষে বসা চরিত্র সমূহ—এখন পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত কক্ষসমূহে বোতাম-চরিত্র অনবরতই কার্যনির্বাহক নির্দেশ পাঠায় :

'যা বলছি শোন...যা আগের আগের নির্দেশও বলা হয়েছে...রক্তপাতহীন ট্রিটমেন্টই কাম্য...অপারেশন ওই চাঁদসী পদ্ধতিতেই চালিয়ে যেতে হবে...

আর রকেট ধারা ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় এমনভাবে প্রয়োগ করো যাতে কোনোভাবেই ঝড়, ঝটিকা-কেন্দ্র ঘনিভূত হতে না পারে...

হ্যালো, শোনো, কড়া নজর রাখো ফ্রিনজ এলাকায়—যখন যেমন দরকার সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে দাও...'

ফ্রিনজ এলাকার ব্যাপারটি আমি সঠিক অনুধাবন করিতে পারি নাই—কোথায় বা ওই এলাকা, কাহারাই বা অধিবাসী উহার—জটিলতা কেনই বা, উৎঘাটন করিতে পারি নাই আমি...

চেয়ার দখল

আমি নিজে ওই নিয়ে সামান্য সন্ধান চালিয়েছিলাম অবশ্য এবং আমার অভিজ্ঞতার কিছু অংশ টেলিপ্যাথি যোগে তোমাকে জানানো যায় :

...আসলে সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে আরও এই জন্য যে, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ চেয়ার দখল—ফলে স্থায়ীভাবে যিনি বসেছিলেন তাঁর মাথায় হাত—

এক প্রশ্নের উত্তরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলেন :

এই কাজ সম্পূর্ণ বে-আইনী—কর্তৃপক্ষ একে জবর দখলী বলেই মনে করেন—এবং ঘটনা স্রোত এরকম চলতে থাকলে আইনের শাসন ভেঙে পড়ে এবং আইন তার নিজের পথ বেছে

নেবে এজন্যেই—তাই উগ্রপন্থা কঠোর হাতে দমন করা হলো—

: তাই বলে আত্মতুষ্টিরও কোনো হেতু নেই।

তিনি বলেন, 'যেকোনো সময় যে কোনো এলাকায় ওরা আবার সমবেতভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ভারচুয়ালি কোথাও কোথাও ঘটছেও তাই—'

তাঁর অভিমত : ওরা কাছাকাছি কোথাও আত্মগোপন করে আছে—তাই ওদের গতিবিধির উপর চোখ রেখেছি—শক্তিশালী রাডার সেট বসিয়েছি এবং ফ্রিনজ এলাকায় দু-একটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটছেও—এসব বন্ধের জন্য উভয় জোনের কর্তৃপক্ষ মিলিত উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছেন—

অবশ্য এই কাজ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে আমাদের নিজেদের ভেতরেও যৎসামান্য গণ্ডগোল আছে—ছোঃ, যেমন ভাবছেন গোলমালটা কিন্তু আসলে সেধারার নয়—এই যেমন ধরুন :

ফ্রিনজ এলাকায় কেউ ধরা পড়ল অমনি এ-জোনের অনুরোধ ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক—অপর জোনের তৎক্ষণাৎ পালটা দাবি, ও আসলে আমাদেরই প্রাপ্য, তাছাড়া আমাদের অ্যাক্‌সপারট্‌দের হাতে এখন তেমন কাজও নেই, ওকে আমরাই ট্রিট করতে চাই—'we are keen to interrogate him—'

'গত সোমবার ওই ফ্রিনজ এলাকার কজন চেয়ার দখল করেছেন বলে শনিবারে সদর দপ্তরে খবর আসে। এর আগে কোনো অভিযাত্রী ওইসব এলাকায় শীর্ষে কখনো অভিযান চালায়নি—অভিযানে দল নেতা ছাড়া আরও ৪ জন ছিলেন।'

'ওই গত সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় তিন নম্বর এলাকা থেকে ওঁরা রওনা হন এবং আমাদের সমস্ত খাড়া চোখ কৌশলে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যান। নেতা শীর্ষের ১৯৭০ ফুট নীচে অসুস্থ হয়ে পড়লেও বাকিদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না।'

রিপোর্টে প্রকাশ, ওরা ১৫ মিনিট অবধি আসন দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল এবং ব্যক্তিগত ও দলীয় পতাকা উড়িয়ে দিতে পেরেছিল ওরা।

: ওদের সঙ্গীরা গত বছরেও দখল অভিযানে গিয়েছিল অবশ্য, কিন্তু আমাদের তরফে প্রবল হিমবাহ পাঠানোর দরুন ১৯৭২ ফুট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে।

: এবারেও গত ৪ অক্টোবর শীর্ষের ১৯৭৪ ফুট নীচের থেকে আমাদের সময়োপযোগী তৎপরতার দরুণ ফিরতে বাধ্য হয়। ১ জন মারা যায়। কয়েকজন সাংঘাতিক আহত হয়ে পড়ে। তবে এখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পুনরায় তৎপর বলে খবর এসেছে। যে কোনো বাধা ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় প্রস্তুত তারা।

: প্রস্তুত আমরাও...

: তাহলেই দেখুন সংকট কিন্তু থাকছেই—থেকেই যাচ্ছে...বিশেষত আসনের তুলনায় যখন বেশি দাঁড়িয়ে থাকার সংখ্যা...

: দেখুন সেসব আমরা জানি না—ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোও পছন্দ করি না আমি। চেয়ার খালি হলে বসবে বইকি, নিশ্চয়ই বসবে, কিন্তু ডন্ট ডিস্টারব ইনট্যাক্ট চেয়ার...আমাদের ডিউটি ওই আসনে নজর রাখা—কোনো ট্রেস্‌পাস্‌ বা জবরদখল বরদাস্ত করা হবে না—যা করার প্রপার চ্যানেলে করো!

: কিন্তু তুলনায় কটাই বা খালি চেয়ার?

: প্লিজ নো মোর কোশ্চেন...আমাদের কাজ টু চেক প্রপার কোয়ালিফিকেশান, প্রপার চেয়ার, চেয়ার নাম্বার, প্রপার পারসন্‌...ব্যস...

: বাকিরা সব অ্যাবসট্রাক্ট তাহলে? এই ধরুন যারা বাইরে আছে...আসছে...এসে পড়ছে?

: এসব অবাঞ্ছিত প্রশ্ন। হোয়াট ডু ইউ মিন, এসে পড়েছে...আসছে...ডাকা হয়েছে...? একি মশায় খোলা মদের আড্ডা? আহূত অনাহূত রবাহূত যেমন খুশি আসো...এসে পড়ো...মহোৎসবে যোগদান করো...যেমন ইচ্ছে খাও দাও...নাচোকোঁদো...?

বলুন দিকিনি এই সেদিন ২৫০০ হাজার বছরের পুরোনো সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা উৎসবে নির্দিষ্ট ছাড়া, উপস্থিত ছিলেন বাইরের কে-ই বা?

: এই দেখুন না...

একগাদা কাগজ সে ঠেলে দ্যায় সামনে আমার, লাল নীল পেনসিলে দাগ কাটা অজস্র কাটিং...চোখ বহুক্ষণ আটকে থাকে লালে আটকানো একটি দ্বিতীয় বন্ধনীর ভেতর :

...with 8 kings, 13 Presidents, and assorted Primeministers, Sultans, and King's personal Friends in residens, the living in the royal enclosure was tastefully in line with what a top boarder might receive the **White House or Buckinghum Palace...**

দাগ অনুসরণ করে পড়ে যাই আরও কীভাবে ওইসময় এই দ্বিতীয় আরব্য রজনীর কাছে প্রথম আরব্যরজনী পরাভব মেনেছিল—নানা অভিমত অনুসরণ করে যাই—আলোচনা গুঞ্জন—মণি না মানুষ? —মানুষ না মুক্তো—মণিমুক্তো না মানুষ—কে বেশি নির্ভরযোগ্য—আদরনীয়—লালন গ্রহণ, নিকটে রাখার যোগ্য? —সময়ের কাছে ফেভার সব চেয়ে বেশি কার—

হঠাৎ বুক পকেট থেকে উনি সামনে আমার টুক করে একটি ধাঁদা ফ্যালেন—

সিংহাসন উজ্জ্বল করে কে বেশি—মণি না মানুষ—মানুষ না মুক্তো—একটি মুক্তো, যা ২৫০০ বছর আগে ও ২৫০০ বছর পরে মুকুট একইভাবে উজ্জ্বল রাখে—?

আমি ওঁর দিকে 'কিন্তু...' এই চোখ তুলতেই তৎক্ষণাৎ উনি হলঘরের বিপরীত দিকে একটি চেম্বার দেখিয়ে দ্যান—আমার কলস এখনও পূর্ণ না হয়ে থাকলে অনায়াসে ওইখানে যেতে পারি—কেন না দেয়ার মতো সময় এখন আর ওঁর হাতে নেই—'ইট ইজ লানচ টাইম...'

একপা, দু পা এগিয়ে যাই—ঘরের সামনে পৌঁছে দেখি পুশিংডোর অনড়, একটি খিল OUT এবং IN-এর মাঝখানে দেখি—

উনি আছেন কিংবা নেই, নেই কিংবা আছেন—বোঝার অপেক্ষায় বহুসময় কেটে যায়—জেনে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করে যেতে থাকি—কিন্তু কারোরই দেখা পাই না—

এক পা দু পা করে পিছিয়ে আসি—লক্ষ্য করি লাঞ্চ সেরে উনি ফিরে আসেননি এখনও—বসে পড়ি আগের চেয়ারে আবার। নাড়াচাড়া করতে থাকি সামনে ঠেলে দেয়া ওইসব কাগজ কাটিং, কত কত টাইপ-কাগজ...

পাঞ্চ করা কিছু কাগজে চোখ বোলাতে গিয়ে কয়েকটা কোটেশানের সামনে আটকে যাই। পড়তে পড়তে মনে হাতে থাকে এসব নিশ্চয়ই ডায়েরি ওই ফ্রিনজ এলাকার কোনো না কোনো অভিযানকারীর—স্বগতোক্তি কারো কারোরবা—

'...বন্ধুরা, ভাইরা আমার, মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদের যাত্রা বিরতি প্রয়োজন...মনে হয় আমাদের প্রথম গাইড গুপ্তঘাতকের কাজ করেছিল...এখন স্পষ্টই দেখা যায় আমরা আমাদের প্রকৃত শীর্ষ অভিযান থেকে ৯০° বিপরীতে এসে পড়েছি...কম্পাস কাঁটা কি ভুল নির্দেশ করেছিল?...ওইখানে কেনই বা ঢুকে পড়তে চেয়েছিলাম আমরা...বসে ওইখানে ওরা কারা—অতসব তুষার-মানব?

'...বন্ধুরা তাঁবু ফেলো...তাঁবু ফেলো...তাঁবু ফেলো...প্রত্যেকে প্রত্যেকের কম্পাস কাঁটা পুনর্বার

বের করো...ম্যাপচার্ট, আমাদের ভেতর কে বিশ্বাসঘাতক হয়ে প্রথম হতে চেয়েছিল...?'

চোখ তুলি। সামনের চেয়ারে দেখতে পাই ওঁকে। কী আশ্চর্য, কখন কোন ফাঁকে ম্যাজিসিয়ানের মতো নিঃশব্দে বসার কাজটি সেরেছেন টেরই পাইনি। যাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল আমাকে, দেখা মেলেনি, জানিয়ে দিই।

কিন্তু ওঁর হাতেই বা কোথায় কথা বলার মতো সময়? এত কাজ। এত রাশ। এতক্ষণ যখন অপেক্ষা করেই যাচ্ছি, সেখাতিরে ২।৪ মিনিট আর স্পেয়ার করবেন।

: আসলে কী জানেন, এই চেয়ার সমস্যাটাই খুব জটিল। এ-নিয়ে অবশ্য আমরা বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ করছি...কারা বসবে, কোথায় বসবে...কিন্তু এই ফাঁকে কাউকে কাউকে যে একেবারে এলাউ করা হচ্ছে না, এমন নয়...কিন্তু মজার ব্যাপার, শুধু দর্শনেই কেউ প্রীত নয়...আসতে দিলেই বসতে চাইবে...বসতে দিলেই খেতে...খেতে দিলেই শুতে... কিন্তু ওই ওদের কেউ কেউ যে ছদ্মবেশি নয়, কী করে বলা যায়? তাছাড়া জীবাণু ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে না এমন গ্যারান্টি কই? ব্যস, তাহলেই ঝাড়ে বংশে সর্বনাশ...! আর এই জন্যেই তো এত কাঁটা তার, চেক সান্ত্রীপ্রহরী সার্চলাইট...তাই আমাদের গজে কাটিতে ১০০% মিললেই কেস, বিবেচনা করা হয়...

হঠাৎ ক্রিং বেজে উঠতেই ডানপাশে তিনখানা ফোনের ভেতর একখানা তুলে কানে গোঁজে—সেকেন্ডে মুখের রং পালটে যায়—গম্ভীর স্যাড়্—রেখে দেয় ফোন—দাঁড়িয়ে যায় দ্রুত—

: অ্যাকসকিউজ মি, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হচ্ছে—

: মানে?

: খুবই স্যাড—আমাদের ব্যুরোর অন্যতম চিফ্ এই একটু আগে কর্মরত অবস্থায় স্ট্রোকে মারা গেলেন...

কথা শেষ করেই একটানে ড্রয়ার খোলে শরীর একটু ঘুরিয়ে—একটা শিশি সামান্য উপুড় করে দু চোখের পাতায় গ্লিসারিন জাতীয় কী মেখে নেয়—পাশের ড্রেসিং রুমে ঢুকেই বেরিয়ে আসে—কালো পোশাক পরনে তখন—আবারও ঢোকে অন্য এক চেম্বারে—বেরিয়ে আসে ফর্সা মুখে কালো নিয়ে—তর্জনী ও মধ্যমা যোগে টেবিল ঠোকে বার কয়—হঠাৎ একটানে বের করে পাশের শেলফ্ থেকে এ্যাঁইয়া মোটা ভল্যুম এক—বুক কভার ভালো পড়তে পারি না—দর্শনের উপর কী ট্রিটিজ—ফটাফট্ উলটিয়ে যায় কয়েকটি পাতা—মুখের উপর বুলিয়ে নেয় গোটা চার পাঁচ পাতা ওই গ্রন্থের—

: প্লিজ অ্যাক্স্কিউজ মি...

বলেই টেবিলের উপর ধপাস ফেলে দেয় বই ওই—পর্দা ঠেলে বেরিয়ে যায় গটগট—

আমিও তার পেছন পেছন—কিন্তু তালে তাল রাখতে পারি না—লিফটে চড়ে ততক্ষণে নামতে থাকে সে—নেমে যেতে থাকে—কত নীচে নেমে যায়—উঁকি দিয়েও তল খুঁজে পাই না—

লিফ্টের অপেক্ষায় দাঁড়াই—দাঁড়িয়ে থাকি—বোতাম টিপে যাই—আলোর তীর কখনো নীচ নির্দেশ করে, কখনো উপর—কখনো উপর, নীচ কখনো—

কিন্তু তবু কোনো লিফ্টম্যান গেট খুলে বলে না, 'বন্দেগী জনাব...বান্দা হাজির...

দাঁড়াই, দেয়ালে হেলান দিয়ে—সিগারেট ধরাই, মনে পড়ে আবার ওদের কারোর ডায়েরির বা স্বগোতোক্তির অংশ বিশেষ :

...আমরা হলাম গিয়ে সেইসব মানুষ, যাদের ডেকে কেউ কখনো কুশল জিজ্ঞেস করে না——সেকেন্ড হ্যান্ড মাল ব্যবহার করতে করতেই জীবন কেটে যায় আমাদের—হাতে সময়

সেকেন্ড হ্যান্ড—করমর্দনে কেটে যায় সেকেন্ড হ্যান্ড প্রেমিকার হাত...
আমাদের উপস্থিতিতে কখনই কোনো তোপধ্বনি 'স্বাগতম' বলে না—
গাওয়া হয় না কখনোই আমাদের উদ্দেশে প্রভাত ফেরী...কোনো চারণ কবিই আমাদের নিয়ে গান রচনা করে না—শকথেরাপিতে কখনো সোজা হয় না জটিলতা আমাদের—
পথ আমাদের সর্বদাই সুড়ঙ্গ যদিও কিন্তু কোনোদিনই তা আলোকিত করে না ২৮০ ক্যারেটের বৈদুর্যমণি...
হায়, আমাদের ঘিরে নেবু পাতা গন্ধে ভরে ওঠে কিন্তু কোনোদিন প্রবেশ চায় না ভ্রমর-অতিথি...
আর এই যে বাবা আমাদের, এঁকেও মনে হয় সেকেন্ড হ্যান্ড এই ইনি...
সেইসব ফ্রেশ্‌ ব্যাচলটের মাল প্রকৃতপক্ষে কোথায়?
সেইসব বাড়ির নক্‌শা, পজিশান খুঁজি, খুঁজে ফিরি...

তাকাই এদিক ওদিক—কেউই লক্ষে আসে না—একসময় পায়ে পায়ে ওই পুশিং ডোরের দিকে এগিয়ে যাই—

হাত রাখি দরজার গায়ে, যদি খুলে যায় তাহলে অনায়াসে ওঁর ঠেলে দেয়া ওইসব কাগজ কাটিং, পাঞ্চ-কাগজ, টাইপ-পেপার, ফাইলপত্র নিয়ে কেটে পড়া যাবে...কিন্তু কোনো রেস্‌পন্স্‌ হয় না—দরজা ঠেলি আবারও—না—শরীরের সমস্ত ভর শক্তিতে রূপান্তরিত করে চাপ দিই, না, তবু না...

একদা যেসব হাতি দিয়ে বন্ধ দুর্গের খিলান লোপাট করা হতো, সেসব প্রয়োগেও ইপ্সিত ফল পাওয়া যাবে কি না, এই মুহূর্তে সন্দেহ জাগে—

অথবা ওই দুয়ার যিনি বন্ধ করেন তিনিই শুধু তা খোলার যাদু জানেন

লিফ্‌টের কাছে ফিরে আসি—

দাঁড়িয়ে থাকি লিফ্‌টের গোড়ায় এবং একটু বাদেই কর্মরত অবস্থায় ওই ওয়ান অব দি চিফকে দেখতে পাই—

সামনে ওঁর ম্যাপ, পেছনে ওই, বামে দক্ষিণেও ম্যাপ—বিশাল টেবিল চেয়ার চেয়ার সামনে—টেবল্‌ গ্লাসের নীচেও ম্যাপ্‌—সামনে তাঁর বিবেচনার অপেক্ষায় ফ্যাকটস ফিগার কত—কত কত গ্রাফ্‌ প্লট্‌ সমীকরণ, ডাটা—ডাটা অনুসারে আদেশ নির্দেশ—আবার ডাটা ফিগার—সেই বুঝে নতুন নতুন নির্দেশ আদেশ আবার :

অমুকের অমুক ব্যাপার, তাহলে তার উপর প্রয়োগ করো এই-এই পালটা ব্যাপার—তমুকের তমুক অসুখ, তাহলে তাকে দাও ওই-ওই ওষুধ—এই সমস্যা? নাও না এক্ষুনি এই ব্যবস্থা—ট্রাবল ওই? তাহলে এই মুহূর্তে লাগাও দাওয়াই নতুন এই—

কি, ১০টি প্রবলেম? তাহলে নাও এই ১০টি সমাধান—১০ ডিফারেন্ট প্রবলেম্‌? তাহলে দিচ্ছি নাও ১০ × ১০ = ১০০টি ডিফারেন্ট সমাধান—১০০টি ডিফারেন্ট? নাও না তাহলে এক্ষুনি ১০০ × ১০০ = ১০০০০টি সমাধান ডিফারেন্ট—আনো না হাজার সমস্যা ডিফারেন্ট—হাতে নাতে পেয়ে যাবে ১০০০ × ১০০০ = ১০০০০০০টি সলিউশান আমারই কাছে ডিফারেন্ট...

: আছে হে আছে, মাথায় সব লোড্‌ করা আছে...

এতসব একজনের একটি মাথায় লোড করা আছে বলে, ওভার লোডিংও আছে, আর অতিরিক্ত লোডিং. ওভার লোডিং-এর ফলে শিরা উপশিরা ওঁর চাপে তাপে বার্স্ট করে

গ্যাছে...অকস্মাৎ, **'পুয়র বাস্টার্ড'** এই দৈববাণী ঘটে—

লিফ্টের অপেক্ষায় থাকি না আর। সিঁড়ি হয়ে হয়ে নামতে থাকি। আমাকে, আমার ছায়া ও শব্দ ছাড়া পথে আর কারোরই সাক্ষাৎ পাই না। গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌঁছেই অ্যাকসট্রিম্ দক্ষিণে কাঁচে ঘেরা টেলিফোন্ অ্যাকসজেন-এর উপর নজর পড়ে—ওইখানে বসার একটিই আসন দেখতে পাই—দুজন মানুষের জন্য মাত্র একটিই চেয়ার—এই নিয়ে কোনো বিবাদ বিসংবাদ চোখে পড়ে না বরং একে অপরের কোলে স্বর্গ সুখ ভোগ করে—

সম্ভবত আমার পায়ের শব্দেই মেয়েটি মুখ তোলে হঠাৎ—আমার উপর চোখ পড়তেই ফিক্ হেসে কাঁচের খোলা দরজা হাত বাড়িয়ে টেনে দেয়—

অভিযান

এই সিনে পৌঁছামাত্রই মনে হতে থাকে ছবির শেষ দৃশ্য শুরু হয়ে গিয়েছে—

: ...এইখানে কেউ উঠতে পারবে না, এই এত উঁচুতে, সে যেই হোক...

: এই হলো গিয়ে গুহা-পথ, এই হলো আমাদের লিফ্ট—এবার আমরা উপরে উঠব...

: এটাই একটু শব্দ হয়—

: কী আর করা?

: এতক্ষণ উলটো পালটা বকছিলাম, তাই না? কিন্তু আসলে ওই 'চিহ্ন' ওই চিহ্ন দেখা মাত্রই স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়—নাউ অলরাইট...

: ওঃ, ওদিকে কর্তা অপেক্ষা করছেন, গুড্ বাই... গুড্ বাই...

: মাঝে মাঝে শিখর অভিযানে হয় এরকম, কি আর করা...

: কিন্তু ওই আবার কীসের শব্দ?

: ওই সেই শব্দ...ওঃ...

: সামাল...সামাল...

হল থেকে বাইরে আসি—ভিড় ঠেলে হাঁটি, হেঁটে যাই—

এই ভিড়ে সামান্য চোখ রেখেও দেখতে পাই, গোপনে প্রকাশ্যে মুহুর্মুহু হ্যান্ডবিল বিলি হচ্ছে কত—

'এইখানে সাড়ে বিশ টাকায় জ্যান্ত মানুষের মুণ্ড মেলে...'

'বাঘের দুধের কফি মোহর ফেললেই পাওয়া যায়...'

'বাক্য বাগীশের বাণী...তিলকে তাল করার যন্ত্র...'

'বিপ্লব রোধে বিপ্লবীর স্টাচু...'

'সৃজন রোধকারী ঔষধ'

'কড়ির বিনিময়ে লাল ত্রিকোণ'

'পোস্টারের বিনিময়ে আদর্শ'

'তবে সস্ত্রীক কাবুলীওয়ালা বড়োই দুর্লভ—কিন্তু অবশ্যই প্রাপ্য নৈবেদ্যর উপর কাঁঠালি কলার মতো খল নায়ক'—

'এইখানে ইতিহাসের নায়ক ঘোরনিদ্রায় নিমগ্ন...'

হাঁটি হেঁটে যাই—অন্ধকারে বিলীন প্রায় দেয়াল পোস্টার পেরিয়ে আসি কত, কত কত

লিখন :

'This man is not welcome. We do not want this man here. He is not welcome here. There is too much blood on his hand.'

'আমাদের যে রক্ত, স্নেহ এবং সম্পত্তি শত্রুরা চুরি করেছে, সেগুলি তারা ফিরিয়ে দিক...'

'অতি বাড় বেড়ো না,
পুলিশের হাতে যেয়ো না'

'ব্যানিশ্ আন্ওয়ান্টেড্ হেয়ার—
ব্যানিশ্ আন্ওয়ান্টেড্ ম্যান—
ভ্যানিশ আন্ওয়ান্টেড্ পূয়র—'
হাঁটি, হেঁটে যাই—রাজপথ, জনপথ হাঁটি—
ঢুকে যায় কালো ঠুলির ভেতর আলো—
রাঙি ভাই বহিনদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়—
অজ্ঞাতবাসের ভাইয়েদের সহিত—তাহাদের কোরাস শুনি—কলববে আমোদিত হই—
কত কতর ফিস্ফাস শর্ট হ্যান্ড করি :

: আমি বড্ড ভয় পাচ্ছি, কর্তার ভাবগতিক মোটেই সুবিধের ঠেকছে না, মনে হচ্ছে তোমার আমার মরণ বাঁচনে তাঁর কিছু যায় আসে না, তাঁর যাবতীয় ভাবনা শুধু তাঁকে নিয়েই...

: শুনছি আবার আমাদের বশে আনার জন্য ট্র্যাংকুইলাইজার বন্দুক ব্যবহার করা হবে...

হাঁটি, হেঁটে যাই—সামনে অজ্ঞাত লিপি এসে পড়ে কত—কত কত পার হই—ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী—প্রাকৃত মাগধী—অপভ্রংশ সার্চ করি—দূরতম পুরুষ আমার, নিহিত কোড্—

হাঁটি, হেঁটে যাই—পায়ে, অসমাপ্ত কার্পেট ঠেলি কত—ঘাসে ধুলোয় মিশে যাওয়া স্বজন—উপর থেকে কালপুরুষের ধারাবিবরণী শুনি :
'আপনাকে আর জনগণ চায় না...
চায় না জীবন এমন মানুষ কই...'
স্টাচুর গায়ে পড়ি কত হৃদয় উৎসার কচি কাঁচা কবির :

'ববি দেখো, সাট্টা খেলো,
ঢুক্ ঢুক্ পিও, যুগ যুগ জিও'

হাঁটি, হেঁটে যাই—

ওঁদের একজনকে ফেলে আসি বাঁমে, যিনি দক্ষিণে দৃষ্টি রেখেছেন—দক্ষিণে একজন যাঁর চোখ উত্তরে—পশ্চাতে, এইমাত্র যাঁকে রেখে এলাম, তিনি পূব গার্ড করছেন—দেখা যায় সামনেও একজন, যাঁর ভার পশ্চিমের উপর—এদিক ওদিক খুচ্খাচ্ আছেন আরও কত যে, ঈশ্বর প্রদত্ত দশদিকেই মনে হতে পারে যাঁদের কড়া নজর—

সত্যি বলতে, আগে আগে যখন এসব এলাকায় এসে পড়া যেতো, তৎক্ষণাৎ রক্ত তোলপাড়—বেলুন, রুমাল উড়িয়ে দিতাম যে কত—তখন অনবরত অজ্ঞাত মাইক্রোফোন্ থেকে,

: পথিক তুমি পথ হারাইয়াছো?
কিন্তু এখন যেমন খুশি বিচরণ করো, ভয় নাই—

হাঁ, তখন এমত ভরসা ছিল—যদি কখনো আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত শক্তি শেল্, নিশ্চিত এঁদেরই কেউ তা পালটা গোলায় থমকিয়ে দেবেন—ফ্রিজ হবে এঁদেরই মুঠিতে আমার জানা অজানা শত্রুর নট থ্রি নট—এঁদের হলুদ পোড়ায় ছাই শত্রুর বশীকরণ, বাণ তুকতাক—

ওঁদেরই কে একজন গলায় সাড়া তোলেন অকস্মাৎ—কান একটু বেঁকিয়েই সোজা করি আবার—হাঁটি, হেঁটে যাই—হঠাৎ পেছন থেকে ডাক নাম আমার—দাঁড়াই না তবু, হাঁ, গলা বুঝতে পারি—

এই তো কদিন আগেই, মৃত্যুর পর ৩০ বছর পেরিয়ে এলেন উনি—জন্মের ১১৫ বছর—কিছুকাল আগে অবশ্য মাঝে মধ্যে বসা যেত পিছু ডাকেই পাদপ্রদীপে ওঁর—নিয়মিত তখন চরণে ওঁর ফুল, গলায় ভোর ভোরের মালা—মাথায় বাহ্যে পাখি সবের দিনরাতে—উদ্দেশ্য বেলা অবেলার গল্প, খোশ গল্প—আজও ইচ্ছে সেইসব নিশ্চয়ই—কিন্তু একটা ব্যাপার উনি সেদিন কিছুতেই বুঝতে চাননি, এই আমি আর নই সেই আমি—

বুঝতে চাননি, পারেননি আসলে—পাথরে পাষাণে হয়ে যাওয়ার এই এক অসুবিধে—

একদা শিরোনামায় থেকে যাওয়ার, দিনের বাণীতে চলে যাওয়ার বিপদ এই—প্রতিদিনের কাজে কর্মে নাড়িতে, শরীরে শরীর হয়ে যুক্ত না থাকার—

কিন্তু পিছু ডাকে উনি তবু, কই ভায়া, এদিকে আসা প্রায় ভুলেই গেলে যে, কালে কালে কী যে হয়ে যাচ্ছো তুমি, সেই গায়ের রঙ কই তোমার, ঠোঁটের লাল, চুলের কালো, শরীরের কচিকাঁচা...

কেবলই তোমার ব্যাকসিটে জায়গা খোঁজা, চলাচল লিফট ছাড়া—

কিছু মনে করো না, তোমরা হলে গিয়ে আমার নাতির বয়সি নাতি, নাতির নাতি—তোমার সেই বান্ধবীটির কী খবর বলো? তুমি যে আর কতদিন পাশে আমার নীলখাম পড়ো না, ছেড়ো না, মুড়ি হও না যে কতকাল, বন্দনামূলক গান আর গাও না—আচ্ছা ভাই, সেই ব্যাপারে কি আমাদের উপর রাগ করেছো? তবে বিশ্বাস করো,

যদি আমার এই হাত পাথর না হতো, নিশ্চিত জেনো রক্ষায় এগিয়ে দিতাম, সেদিন মুছে দিতাম তোমার চোখের জল...

পয়েন্ট অব অরডার...

আমার আজ কিছু করার নেই, যে-হাত, হাত হয়েও পাথর—

যে-মাথা মাথার কাজ ভুলে যায়—
পা, পায়ের কাজ
বুক, বুকের কিংকর্তব্য,
যে হৃদয়, হৃদয়ের সহজ জল ভুলে যায়
যে-সিংহাসন কেবল ভর সর্বস্য—

তাকে নিয়ে কী করার থাকে? পাথরের উদ্দেশ্যে আজ আমার জিন্দাবাদ বলার থাকে না—

এসো আমার অজ্ঞাতবাসের বন্ধুরা, আমার, মিলিত হই—এই গোরস্থানেই ফেলা যাক আমাদের মিলন ও অভিযানের প্রথম কেন্দ্রিয় তাঁবু—

সোনারূপো চাঁদ কখন মেঘে-মেঘে কালো—পায়ের পাতা দেখা যায় না—হাত স্পষ্ট—হাঁটি হেঁটে যাই—পায়ের তলায় নরম ঠেকছে কী? স্পর্শে অনুমান, ফুল, ফুলমালা—

: কি ভাই চলে যাচ্ছ নাকি? যাও, কিন্তু যদি ইচ্ছা করো, কোনো বাধা নেই, যত খুশি, পায়ের নীচে ফুল তোমার, কুড়িয়ে নাও, ফুল ফুলমালা— কিন্তু বিনিময়ে নাকে আমাদের গন্ধ ফিরিয়ে দাও—

এই পাথর-পেশীতে স্নায়ু—

শরীরের তাপ

হাসির ভাস্কর্যে প্রকৃত হাসি
হাতে সৃজন
পায়ে আমাদের চলৎশক্তি ফিরিয়ে দাও ভাই—
: হা, ঈশ্বর!
হাঁটি, হেঁটে যাই—
থমকে যাই হঠাৎ পায়ের তলায় কর্কশ স্পর্শে—
: 'কিরে, আমায় চিনতে পারছিস না?' তৎক্ষণাৎ হিম আমি।

: অমন করছিস কেন? আমি তোদের অমিয়রে, দাস বাড়ির অমিয়—অমিয় দাসরে সুভাষ—কু-ঝিক খেলার সঙ্গী সেই, ভুলে গেলি সব?

দেখতে দেখতে মাথায় আমার তাবৎ রক্ত ভিড় করে—কে হে তুমি? পায়ের নীচে কেন? আমি তো কখনো দাস-ব্যবসায়ের ট্রেডকমার্স করিনি!

: সত্য, কিন্তু আমি তোদের বন্ধু অমিয়, অমিয় দাস...

মুহূর্তে দশদিকে দশ লাখ বিদ্যুৎ বাহিনী পাঠাই—খবর চলে আসে ১...২...ঝটিতি...পাথর ফাটিয়ে ঝরনা—কু-ঝিক...চলরে ভাই স্বর্গে যাই...টিলা, বাজারতলা...

নীচ থেকে উপরে আমরা—অমিয় সবার সামনে—ওর কোমর আমার হাতে, আমার কোমর ওর হাতে—আমার উপর অমিয়র চুল—

অমিয়র চুল সবার উপর
সবার উপর তার হাইট—
গায়ের রং

বাল্যের বীরত্ব, কথা উপকথা, সবকিছুতে প্রত্যেকের আগে ডাক তার—সবার আগে গোঁফের রেখা—রেখা, মোচড়, তা—সর্বপ্রথম আয়ত্বে তারই হুইল, হুইল স্টিয়ারিং—আমাদের সব্বাইকে ছেড়ে একদিন হর্ন বাজিয় সে কোথায় যে!

তখন কিছুটা প্রকৃতিস্থ আমি। এত দ্রুত সে কোথায় কোনো অ্যাকসিডেন্ট ঘটালো, জানতে চাই এত তাড়াতাড়ি তার গথিক স্ট্রাকচার ধূলোমাটি কেন—শুনতে চাই তার পতনের কারণ আমি—

: কাল আমার রূপ, রূপই কাল আমার—আমি ভাবতাম, আমার চেয়ে রূপবান কেউ নেই...

তৎক্ষণাৎ প্রটেস্ট লজ করি—ওর কথা সঠিক হলে, কবে তো ধুলোমাটি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এই আমারই—রূপের মোহ চুল পরিমাণও নেই, এমন মানুষ কই? কত কতদিন, বসন্তের মারণশীকার করুণা আয়নার সামনে আওয়ার্স টুগেদার চূড়া বাঁধে—অ্যাংগল করে মুখ দ্যাখে, মটকা মারে—রূপের তারিফে গান বাঁধে—তবে কেবল, কেবলই যখন আত্মরতি, শাস্তি ইহার জানা নাই—

অমিয়কে সত্য কথনের জন্য পীড়াপীড়ি করি—

পক্ষপাতের দোষ ছিল আমার।
পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ছিলাম বলেই
এত দ্রুত ভূপাতিত আমি...

ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরি পায়ের টো দিয়ে দ্রুত। স্বীকারোক্তি ঠিক ঠিক না হলে এই মুহূর্তে কবর খননকারী ডাকা হবে, শাসাই—তোমাকে কবরের শান্তিও পেতে দেয়া হবে না ছেলে...

কেননা বাম ও দক্ষিণের প্রশ্নে আমাকেও যে শেষ পর্যন্ত একটি পক্ষ বেছে নিতেই

হয়—শোষক ও শোষিতের প্রশ্নে যথাযথ একটি টিক থাকে আমার—স্বজন ও শত্রুতে—মণিকা ও করুণার ভেতর করুণাকেই বেছে নিতে হয়েছে এই আমাকেই—বাবাকে, বাবা ও মার ভেতর—ভালোবাসা ও স্বাধীনতার দিকে পক্ষপাত আমার কেবল, কেবলই ঝুঁকে পড়ে—

পক্ষপাত গ্রহণ দোষের যদি, তাহলে কেন এতদিনেও অমিয়র পরিণতি ঘটে যায় নি আমার—কী করে এখন, এই মুহূর্তেও কথা বলি টানটান, এই আমি—

আমি ওর কথায় দৃকপাত করি না দেখে শুরু করে আবার—

: প্লিজ সুভাষ, এবার আমায় ছেড়ে দে ভাই, আর আমায় খোঁচাস না—বলছি শোন : আমি অত্যন্ত লোভী ছিলাম। বিলাসী, ভোজনবিলাসীও ছিলাম বটে—অন্যের বল না জেনে নিজ বলের গর্ব করতাম—ভাবতাম একদিনেই সর্ব শত্রুর মুখ বন্ধ করব—সব সময় সহযোগী ভাই ও বন্ধুদের অবজ্ঞা অস্বীকার করতাম—

ওর কথা শেষ হতেই ক্রমশ অগাধ খোলামুখ হাইড্রেনে ডুবে যেতে থাকি—'আঁআঁ—ক' শব্দে সামলিয়ে নিই নিজেকে হঠাৎ—কোট করে যাই সামনে ওর নানা সময়ে লেখা ডায়েরি আমার—

...খাদ্য ক্ষুধার্তেরই চাই—লোভ তার প্লেট গুদাম খোলা—খাদ্যের স্নিগ্ধ বিলাসেও লোভ তার—মৃতের কখনো ক্ষুধা নাই, প্রেরণাও নাই—ক্ষুধা নেই, জীবনও নেই—মৃতের বিলাস আছে, উদ্যোগ প্রেরণা নেই—জীবন ক্ষুধার্তেরই স্বপক্ষে তাই—পবিত্র, ক্ষুধার্তেরই খাদ্যে লোভ...

তাছাড়া লোভ শুদ্ধ কারণ হলে ধরণীর বহুকাল আগেই দ্বিধা হয়ে আমাকে গুম করে দেয়া উচিত ছিল—পরিবর্তে আমি এই এখনও, 'বন্ধুরা লেট আছ মিট টুগেদার',—এই তরঙ্গ বাতাসে তুলতে পারছি—দেখছি বলছি আমি, লোভ আমার—

রাজপথ, জনপথ
যে-বাছুর নাচে কোঁদে জীবনে প্রভাতে প্রথম
লোভ আমার :
জনতা-যোনী
জনতা-জীবন
জনতা-মিছিল
জনতা-খাবার
জনতা-শিশু

জনতা-ট্রেন—রোড—

অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হই আমি—স্ববলে ওর মূল মুচড়ে ধরি—

: শূয়ার কী বাচ্চা, সাচ্ বল। মুরগী তৃতীয়বার ডাকার আগেই সত্য বল শালা—

: ছাড়, বলি বন্ধু শোন তবে—

আমার গল্পের কোথায় শুরু, শেষ কোথায়, আমি নিজেই জানি না— তবে সুন্দরীর কল্পনায় থেকে গেছি আমি, বস্ত্র হরণের নায়ক ছিলাম এই আমিই—কত কত সুন্দরীর রহস্যে রোমাঞ্চে ছিলাম যে!

আমি ওঁদের পক্ষভুক্ত সারাক্ষণের এক সক্রিয় কর্মী—কত কত
বছর যে আমি ওঁনাদের সহিত!
দরকারে মানুষকে উদ্বাস্তু করি—
নয়তো ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দিই—

নতুন নতুন কফিন কারখানার
সাইট নির্ধারণে নিয়ত সাহায্য করি আমি—
প্রয়োজনে সেকস-বডি সংগ্রহে অভিযান চালাই—
সত্য-নিধনে ক্যামুফ্লেজ নিই—বাধা দিলেই হত্যা করি—
পেট কেটে ফেলে দিই শত্রুকে কখনো অন্ধ কূপে...
অসম চুক্তিতে সর্বদাই পুষ্প বৃষ্টি করি আমি...

যদি আমাকে তোরা সেই রহস্যময় কালো গাড়ির উপাখ্যানের মধ্যমণি বলতে চাস, নিষেধ নেই—যত্রতত্রে সেই হুণ্ডাগাড়ির প্রবেশকারী ছিলাম এই আমিই·-

আমাকে অনেকেই নরহন্তারক বলে বটে, কিন্তু একটুকরো নরমাংসও কখনো ভক্ষণ করিনি—আমি যে 'ম্যান-ইটার' এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরও সন্দেহ আছে—তাই নিয়মিত নরহত্যা ঘটিয়ে থাকলেও আইন কখনই আমাকে হত্যাকারী বলে না—

আমি ছিলাম নিশিডাকের এক বিশেষজ্ঞ—

আমারই অমোঘ টোকায় সন্তান পিতার জন্য খিল খুলে বেরিয়ে আসত, কিন্তু সন্তানকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না—

বাবা ছেলের ডাকে বেরিয়ে, নিজে কোথায় নিখোঁজ হতো—মেয়ে মায়ের ডাকে বেরিয়ে কোথায় লোপাট হয়ে যেত—

আমারই ভোজবাজিতে ভাই ভাইয়ের জন্য হাত বাড়িয়েও ভাইয়ের সহিত মিলিত হতে পারত না—

বন্ধু বন্ধুর সহিত

পথিক কখনই তার প্রকৃত পান্থ খুঁজে পেত না—কিংবা প্রকৃত হোস্ট তার প্রার্থিত অতিথি—

এইসব হতে থাকা কালে একদিন দুম এসে পড়ে কতক কালো ভূত শয়তান হুণ্ডাগাড়ির সামনে আমার—ওরা 'হলট...' বলে—ওধারার অমোঘ আওয়াজ মান্য করতে হয় বলে তৎক্ষণাৎ করি। ওরা মুহূর্তে ঘিরে ফেলে আমায়—পটাপট প্যান্ট বোতাম খোলার চেষ্টা করে—আমি এলোপাথাড়ি নখ দাঁত পা চালাই—এই সময় ওদেরই কে এক বলে, 'ফুঃ...'

দেখতে দেখতে ফ্রিজ আমি—কার পকেট থেকে কে এক নিউ-বরণ ব্লেড আনে—একটানে ফেঁড়ে ফ্যালে বোতামে আটকানো পোশাক আমার—

এক হ্যাঁচকায় যুগল অণ্ডকোষ ছিঁড়ে নেয়—

এক ধাক্কায় ফেলে দেয় মাথা থেকে স্বস্তিকা ক্যাপ—ঝটিতে মস্তিষ্কের তার সংযোগ ছিন্ন করে—খুলে নেয় নখ আঙুল থেকে—কোটর থেকে আমার দুই চোখ উপড়ে নেয়—

এরপর ওরা 'ওঁং স্বহা'...বলতেই, দেখি আমি, আমি চলে এসেছি কখন ৬ × ২১/২ ফুট মাটির নীচে—এইখানেই ধুলো আর মাটি আমি—ঘাস এখনও, জানা নেই কেন, এখানে জন্ম নেয়নি—

আরে শাললা, এ যে দেখছি মহাস্থবিরের রীতিমতো জাতক কাহিনি—

: শোন ব্যাটা, সময় কম, গপ্পো শর্ট কর—

: সংক্ষিপ্তই শোন তবে—

: ক্ষমতায় আমার লোভ ছিল
বহু-আত্মা ক্রয় বিলাস ছিল
ওজনে আকাঙ্ক্ষা ছিল

সিংহাসন উপাস্য ছিল...
আ মেন!...ইন্‌শাল্লা!!...
হাঁটি, হেঁটে যাই—

তাকাই উপরে—

সাতটি তারার তিমির—

পা ঠিক ঠিক পড়ে না—জড়িয়ে যায় পা কখনো—

কে বলবে, এই একটু আগেই হয়তো কত কত রহস্যের উপর দিয়ে হেঁটে এলাম—কিছু আগেই হয়তো ভেঙে গিয়েছে পায়ের চাপেই আমার, শিশুর ইমেজ কোনো—বা তার হাত—তার খেলনা কোনো—আমার গোড়ালির ঘায়ে কোনো যুগল-মিলন ছিন্ন হয়েছে—

আবার মনে হয়, এই মুহূর্তে, এ-ও, হাঁ, আমি, আমিই সেই কারণ, আমারই চাপে প্রেসারের বেরিকেড্, বেরিয়ার ছিঁড়ে গেল, 'স্বাগতম', 'স্বাগতম', হু-হু ছুটে আসছে হাত-পতাকা নেড়ে অজ্ঞাতবাসের বন্ধুরা...

হাঁটি, কিন্তু শ্বাস নিতে কষ্ট হয়—বাতাসে অকসিজেন যাত্রা কমে আসে, কী-কারণ, কে বলবে, অতি-উচ্চস্থানে বা কবরস্থানে...

হাঁটি, বড়ো বড়ো পা ফেলে হেঁটে যাই—

কেন্দ্রীয় তাঁবুর কাছাকাছি ফ্লাডেট লাইটের ভেতর আবিষ্কার করি নিজেকে কখন—

দেখি বিনয় সেখানে অলরেডি এসে পড়েছে। সে দিঘির পাড়ে শাল তাল মহুয়ার উপর চাঁদের মুখে ইঙ্গিত মধু খুঁজে পায়নি—

ওইখানে বাদল ক্রমাগত বোঝাচ্ছে কাউকে, টাওয়ারের মাথা কোনো নিরাপদ জায়গায় নয়—

দীনেশ তাঁবুর সামনে অনবরত বকে যাচ্ছে—'আসলে নেশার দ্বারাই আত্মা চালিত হয় শেষপর্যন্ত, ডাইনিং হলে ফ্রেজকো কিংবা মোজাইক কোনো ব্যাপারই নয়—'

অকস্মাৎ মার্চ হলট করে অনুপম,

আমাদের আদি নিবাস কারা Black Fever, মড়ক ছড়িয়েছে, বিলম্বে বিপদ আরও, ভাই, ভাইসব উদ্ধার স্কোয়াড দাও—

তখন চারিধারে, তাঁবু ফাটিয়ে, ঘণ্টি পাগলা ঘণ্টি—
ওই ঘণ্টি ছাপিয়ে চিৎকারে অভিরাম—
শোন, শোন, Be alert, be ready, আমি ক্যানসার গ্রোথের মূল
খুঁজে পেয়েছি, মুহূর্তে প্রস্তুতি, অভিযান চাই...

আবহ সংগীত তখন
আবহ সংগীত তখন
আবহ সংগীত তখন

কদম কদম...
কদম কদম...
কদম কদম...

প্রদীপ চৌধুরী

কাটলেট কাটা চামচ মশলাপ্রধান কথাবার্তা ক্লান্ত গুডবাই, বিদায়...কিছুতেই মন থেকে গভীর চক্রান্তের সম্ভাবনা ঝেড়ে ফেলা যায় না

...কাছাকাছি কোথাও অমিতাচার মানুষ
ঘাম-জবজব শব্দহীন গর্ভপাতে ব্যস্ত
৭ দিন অনাহারের পর সে প্রথমেই যা
দাবি করে তা বিষতুল্য মাদক
...এখানে গ্রহের বিভ্রান্তির মধ্যে একা
টার্মিনাসে মাতৃহীন রাখাল
...এবং মীরামালতি
সবিতাবেবি ডানা মেলে পুরুষ বীর্যের
গন্ধহীন দেশে উড়ে যেতে প্রস্তুত
...পরিচালিত করি নিজেকে, সেদিকে
এগোই...অদৃশ্য কালো রাস্তা

হাজত
(অংশ)

এক

রহস্যময় ঘরে চরম উত্তেজনার মুখোমুখি...গিসগিস উত্তেজনা...সারাঘর, ঘরের চারপাশ...এ গ্রহের সব ভ্রাম্যমান পুরুষের পায়ের ছাপ, বীর্যও প্রস্রাবের একত্রিত অ্যাসিড

এই ঘর এমন এক ধরনের আতরের গন্ধ নামহীন কিন্তু যা সকলেই চিনতে পারে...প্রধান হয়ে ওঠে নিজেরই শরীর, একক ও সমষ্টিগত...এইসব সারিবদ্ধ দ্বীপান্তর...শেষ শহর সংস্করণ সহ আমরা আসি এখানে...এখানে কোনোদিন কালো ব্লাউজ পরিহিত মীরাকে দেখা যায়, কোনোদিন শান্তি বা শেফালি...মীরা নেই...সিল্ক ও নিওন মাখামাখি জীবনে প্রথম নেশা...পাল তোলা সময় সারামাঠে...কোনোদিন বহু অপেক্ষার পর বোঝা যায় বেবিকে আজ আর পাবার উপায় নেই...উদভ্রান্ত চোখ দরজায় ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় স্থির হয়...প্রকৃত মুখ...চোখ থামে...শরীরের আরোপিত শিহরণ এড়ানো যায় না...আজ এখানেই সূর্য অস্ত যাবে...দেখা হবে কম্পাসের কাঁটা উত্তর দক্ষিণে কতটা নির্ভুল চৌকাঠ পেরিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় নিজেকে

খুব সহজে আবিষ্কার করি...বেশ কিছু শব্দ...পারম্পর্যহীন ধারাবাহিকতা...আমি পরিচিত স্বগতভাষণে জড়িয়ে পড়ি

...মিনু (শান্তি, শেফালী)

...কতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা নেই শালা

...ছায়াহীন বান্ধ তোমার

...বাঃ অসাধারণ আমেজ আছে তো তোমার ঘরে

...মিনু (বেবি ও মীরা)

...আঃ কী এত লজ্জা পাবার কি হলো

...কী ব্যাপার, শালা কাছে আসছ না কেন

...না এইসব খুলে ফেলতে হবে

...খুব সামান্য কিছুর বিনিময়ে কিছুটা...

...এখানে চুমু খাওয়া এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়

...কাল তোমাকে কখন পাওয়া যেতে পারে

...সারা দুপুর থাকব

...না, না বসার কোনো ঘটনাই নেই

...মিনু (মিনু ও) জাস্ট...

আঞ্চলিক পরিশ্রমের মধ্যেও পিরামিডের গভীর তল...পৃথিবীর নিজস্ব এ ঘর...অন্ধকারে এ নিয়তি নির্দিষ্ট জলোচ্ছ্বাস...মানুষ এভাবে দু-একবার নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবতে চায়...

বুঝতে বাকি থাকে না শহর এখন অনেকটা কেলিয়ে গেছে...দুর্বল স্মৃতি মানুষ...সম্প্রদায়...যান্ত্রিক হাতের অধীন দাস মাত্র...

বাইরে বিশেষ আমোদিত কথাবার্তা...আমি সব বুঝতে পারি...যে কোনো সংকেতই উদ্দেশ্যপ্রবণ মানুষের হাতে অর্থহীন হয়...আমার জন্যে কোনো সংকেতের দরকার নেই...অপেক্ষা না করেই আমি নীচে দাঁড়িয়ে আবার তাকে দেখতে চাই...চিনে রাখা দরকার...

কে এরা? কে এরা? (আপনারা কে?)

কালো বাঁশি...বুঝতে অসুবিধা হয় না আমি কোথায়...সামনে তৎপর হাতকড়া...সভ্যতার মৃত বাহুবিস্তার...

দুই

—স্যার আমাদের ছেড়ে দিন স্যার আমাদের যাবতীয় অনুরোধ ওই উদাসীন পুলিশের শাদা চোখের কাছে খুবই অর্থহীন—শীত লাগছে মেয়েলি হাতে বোনা সোয়েটারে আর কোনো উত্তাপ অবশিষ্ট আছে মনে হয় না,

—সুভাষ দারুন ক্ষিদে পাচ্ছে

—চুপ কর শালা

এক সময় আমি ও সুভাষ একজন সাব-ইন্সপেক্টর সহ দুজন পুলিশ ও আরও কিছু ইনফর্মারের অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের কাছে সম্পূর্ণ শব্দহীন দাঁড়িয়ে থাকি। রাত সত্যি বেড়ে যেতে থাকে—লাল বাজার থেকে নির্ধারিত কালো গাড়ি আরও কিছু অপরিনামী হতভাগ্য সংগ্রহে ব্যস্ত—এখান থেকে আমাদের উঠিয়ে নিয়ে সোজা থানায় চলে যাবে।

সুভাষ জানে থানার দূরত্ব তেমন কিছু নয়—সুভাষ আরও অনেক কিছু জানে—আমি এসব অবস্থায় সুভাষের ক্ষমতাকে সত্যি বিশ্বাস করি

—শালা ছেলেটার তিন ডিগ্রি জ্বর দেখে এসেছিলাম—যদি রাত তিনটায় ছাড়া পাই যাব কোথায়—শালা তোমার অতিরিক্ত ভোগ লালসার ফলেই আজ এ অবস্থা।

সুভাষ আমাকে যত অভিযোগই করুক আমার কিছুই বলার নেই—হয়তো দোষ সত্যি আমারই আমার পরিপূর্ণ খালি মাথা কিছুই কাজ করে না—আমি জানি আমাদের কিছুই হবে না—শহরে এধরনের ঘটনা এমন সাংঘাতিক কিছু নয়—একদিন না একদিন মাঝরাতে থানায় আমাকে যেতে হতোই—আজই সেইদিন, ধরা যাক—খুবই স্বাভাবিক—

আমি সুভাষের চোখে মুখে ছেদহীন বিরক্তি উপেক্ষা করে পরবর্তী ঘটনার জন্যে উৎসুকভাবে অপেক্ষা করতে থাকি আমি জীবিত তাই আমি অপরাধপ্রবণ—আমি জীবিত তাই আমি একা রাস্তায় বেরোতে ভয় পাই—আমি একা, জানি সহজে দুর্ঘটনা আমার জীবনে ঘটা অসম্ভব—কেউ আমার বাল কাঁপাবার জন্য উঠে পড়ে লাগেনি—কিন্তু কখনো কখনো রাস্তায় নিজেকে খুব অসহায় লাগে—আমাকে নিশ্চিত কেউ চোখে চোখে রাখছে—কোনো কালো শত্রু—একথা বার বার মনে হয় মাঝে মাঝে—আমাকে যে কোনো সময় মঞ্চ থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নেওয়া হবে—কোনো নরকে—নীচের তলায়, কেউ জানতে পারবে না প্রকৃতপক্ষে আমি পৃথিবীতে ছিলাম কোনোদিন! আমি জীবিত তাই মৃত হাতের কারসাজীকে ভয় না করে আমার উপায় নেই—

আমি ভীরু ও চূড়ান্ত বোকা—নিজের গুহ্য নিজে ফাটানো সম্ভব! আমার তাই করা উচিৎ—হা, তাই করা উচিত

তিন

থানায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে লক-আপে ঢুকিয়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না—মধ্যবর্তী সময়েই এক বাস্তব ও সাংকেতিক নাটক শতাব্দীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে—থানার সঙ্গে লক-আপের কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে—

এখানে বহু সময় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—আমাদের কেন্দ্র করে ওদের নিজেদের মধ্যে প্রচুর নাটক, নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়—এইসব একঘেয়ে দৃশ্য আর ভালো লাগে না—আমরা সহজেই এসব ঘটনায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি—বার বার একই দশ টাকা (বিশ টাকা, তিরিশ টাকা...) এগিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় না—আরোপিত ভয় ও উত্তেজনা রেখে তবু প্রাণভিক্ষা কেনার জন্যে উঠে পড়তে হয়—

কোনো দৈব কারণে ওদের নাটক শেষ হবার আগেই যবনিকা নেমে এলে আমাদের ফিরিয়ে নেবার সময় থাকে না—আমরা স্বাভাবিক বোধ করি—পাণ্ডুলিপি ডিউটি পুলিশের পরিশ্রান্ত হাতে তুলে দিতে হয়। চলুন, লক আপ কোন দিকে!

দক্ষিণ। বাম। খোলা। আবদ্ধ। উপরে নীচে ঢোকার রাস্তা ওইটা বেরোবার রাস্তা। ভেতরে। বাইরে...এইভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে একদিন আমার আত্মা— অসুখী দানব, বুকে নয়, হাজতের রেলিং চেপে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য মানুষের এই তীর্থ যাত্রা থামাবার চেষ্টা করার সময় আর নাই। শহরের সব গোয়েন্দা পুলিশই সহযাত্রী আমাদের।

এই ভুল মানুষের সঙ্গে আমিও একদিন মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে যাই। মৃত্যু এমনই এক সরলরেখা যা আমাদের কাছে ধরা দেয় শব্দে। আমাদের ইচ্ছামতো আমরা তাকে ছোটো বড়ো কেটে নিতে পারি।

চার

পাঠক, এখনও বহু কথা বলার আছে...ঘটনা সম্পূর্ণ হবার আগেই মাঝরাতের কারাগার থেকে আসামী খালাস ঘোষিত হয়...খুনীর হাতে হাত রেখে ভাঙা করমর্দন...অসুস্থ ও অস্ফুট প্রতিজ্ঞা...

সারারাতের

পায়খানা ও ভালোবাসা—পূর্ণ

আমরা

পুনরুদ্ধারকৃত

কয়েকজন

আমাকে যারা ভুল বুঝেছিল ও ঘৃণা করেছিল...অদ্ভুত সহানুভূতিতে এগিয়ে দিয়েছিল।

একবালতি জলের জন্য

গারদের রহস্যময় অন্ধকারে

সে হত্যাকারী ও যুবক

তাই সে আমার অপরাধহীনতাকে ঘৃণা করেছিল, এবং পরে করমর্দন করেছিল আমার অর্ধজাগ্রত ভাই, আমি আসবো

আমি নিশ্চিত দেখা করবো ওর সঙ্গে পরে সারপেন্টাইন লেনে একদিন একসঙ্গে ভাঁড়ের চা খাব আমরা...আবার—

প্রকৃত ক্রোধহীন বিদায়...

নামহীন, ভবঘুরে

আমরা জানি, তবু যথাস্থানে দরদামসহ রফা করতে হয়, আমার নিজস্ব অপরাধ পয়সার বিনিময়ে আরেক ঘুমন্ত ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হয়।

পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে আমরা স্বাভাবিক হই আমরা ওই হাজতের বিভক্ত শরীরে চুমু খাবার জন্যে নিচু হই ও ঘুরে দাঁড়াই—

অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা—

পুনরুদ্ধারের মতো কোনো ঘটনা দেখতে পাচ্ছি না।
শরীরও একদিন শৃঙ্খলাহীন দাবীগুলিকে
"অসংযত দাবি" ভেবে নিয়ে
উত্তেজিত মুহূর্তে ঠিকঠাক কাজ করতে চায় না।
হাতের কাছাকাছি চলে আসে মূল্যবান খাদ্য
ডানলোপিলো চেয়ার সামান্য আনুগত্য দাবি করে
আমি কোনো সদুত্তর দিতে পারি না।

একে এক করে সারিবদ্ধ রমণীর মুখ,
ওদের নাক আমার মুখ পর্যন্ত তুলে এনেও
নিঃশ্বাসের গরমসহ ফিরিয়ে নেয় শরীর
আমার ঐশ্বর্যময় অধঃপতন স্পষ্ট হয়ে উঠে

গঙ্গা

গোধূলিতে পৃথিবী বহুবার এখানে দাঁড়িয়ে
হত্যাকারীর হাতের উত্তেজনা ও রক্তাক্ত ঘটনা
নিজের বুকে শুষে নিয়েছে এবং
আধঘণ্টা পরে ক্ষুধার্ত রাত্রির কাছে
উন্মুক্ত করেছে অন্তর্বাস—
এখানে দাঁড়িয়ে বহুবার আমি
একাকী সিগারেট টেনেছি, ভেবে গেছি,
আমার কল্পিত প্রেমিকাদের
ছোটোখাটো প্রকৃত অসুবিধার কথা—
মাসিকের মরা নদীর কাছে ওদের অসহায় সমস্ত জীবন—
এখানে দাঁড়িয়ে একদিন ভয়াবহ সূর্যাস্ত
অভিপ্রেত মনে হয়েছিল...

স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য—১

তোমার শরীরে যে অতুলনীয় গর্ত
আমি দেখেছি (এক জায়গায় অন্তত)
এবং আমার সন্ত্রাসবাদী বিবেক
(তুমি তাকি সম্পূর্ণ দেখেছো?)—এরপর
মানুষ হিসেবে আমরা আর কোন নতুন সর্বনাশে ভয় পাবো?
ওই গর্ত আছে জেনেও
সারাজীবন তোমার দিকে তাকাবো
স্বাভাবিকভাবে ; তুমিও
জলের ওপর ঘুরপাক খেয়ে
ফিরে আসবে আমার অবয়বহীন
ক্ষুধার্ত শরীরের কাছে ;
মানুষের কোষের অধঃপতনের স্বাদ
আমরা জেনেছি—
সমগ্র শরীরে এই অধঃপতন
বারবার না ঘটিয়ে আমাদের উপায় নেই
অবশিষ্ট প্রজন্মও এই মরণশীলতার মধ্যে চলে যাবে।

স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য—২

এই অভিপ্রেত নির্বাসন কেন মেনে নেয়া হয়েছে কে জানে?
শীততাপ অনিয়ন্ত্রিত কারাগার—
কেন দাবার চাল ফেলে রেখে পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি
জীবন্ত পাথরের মতো অনিবার্য!
মনে পড়ে—১ম ভ্রুণহত্যার পর ভয়ে কয়েক রাত ঘুমুতে পারিনি
২য় বারও সেই ভয় কাটানো যায়নি
৩য় বারের আগেই আমরা
জেনে নিয়েছিলাম "উঠিয়ে-নেয়া-পদ্ধতি"
সারা জীবনই কি এইভাবে চূড়ান্ত
সময়ে উঠিয়ে নিতে হবে?
হয়তো তা-ই ; এবং যথাসময়ে আমাদের
ছেলেকেও এই পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে হবে।

উইলিয়ম বারোজ

সাক্ষাৎকার

[উইলিয়ম সেওয়ার্ড বারোজ এখনও বেঁচে, কীভাবে তা তো বুঝতেই পারছেন। নর্মান মেইলারের মতে বারোজই বর্তমান আমেরিকার সম্ভবত একমাত্র প্রতিভাবান লেখক (যদি অবশ্য প্রতিভা শব্দ ব্যবহারের আর কোনো মানে থেকে থাকে) অপরাধী আমেরিকার আত্মা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন তিনি। বয়স ষাটের বেশি। কণ্ঠ সুরেলা। হাসি শুষ্ক। মুখে একফোঁটা অতিরিক্ত মাংস নেই।]

প্রশ্ন : কখন এবং কেন আপনি লিখতে শুরু করেন?

বারোজ : ১৯৫০ সাল নাগাদ প্রায় ৩৫ বছর বয়সে লিখতে শুরু করি। লেখা শুরু করার পেছনে কোনো বড়ো কারণ ছিল বলে মনে হয় না। সরাসরি সাংবাদিকতা ঢংয়ে মাদকাসক্তি ও মাদকাসক্তদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাগুলি লিখে রাখার একটা ব্যাপার দিয়ে শুরু।

প্রশ্ন : এই অভিজ্ঞতাগুলি লিখে রাখার প্রেরণা বোধ করলেন কেন?

বারোজ : না, ঠিক কোনো প্রেরণা নয়, সে সময়টায় কিছুই করার ছিল না লেখাই প্রতিদিনের কাজ হয়ে পড়ে, দারুণ কিছু হচ্ছিল আদৌ তা নয়। Junkie সঠিক অর্থে গ্রন্থ নয়, লেখার বিষয়ে তখন আমি খুব কমই জানতাম।...আমি মেক্সিকো চলে গিয়েছিলাম কারণ তখন আমেরিকায় নেশা সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল, এবং নেশা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই পুলিশে-আইনে খুব জটিল হয়ে পড়ে—মেক্সিকোতে নেশা সংগ্রহ করা ছিল সহজ এবং আইনের কড়াকড়ি একেবারেই ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি নেশা করতে শুরু করেছিলেন কেন?

বারোজ : গতানুগতিকতা, একঘেয়েমি ও ক্লান্তি থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম! বিজ্ঞাপন বিভাগের সফল বড়োবাবু হতে মন চায়নি। ১৯৪৪-এর দিকে আমি নেশাসক্ত হয়ে পড়ি এবং আইনের জালে জড়িয়ে পড়ি—আরও অনেক কিছু ঘটে সে সময়, বিয়ে করে মেক্সিকো চলে যাই।

প্রশ্ন : তখন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে মাদকাসক্তি নিয়ে চলছিল রীতিমতো হুল্লোড়—সাহিত্যজগতে তো মাদকের প্রতি ছিল একেবারে অচলাভক্তি—আপনার মধ্যেও কি এই ধরনের মনোভাব—

বারোজ : না, আমার মধ্যে তেমন কিছু ছিল না। নেশা আর হৈ হুল্লোড় সমস্ত ব্যাপারটাই অতীব বাজে। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মেটাবলিক পরিবর্তন আনে বলেই হয়তো

এইসব মাদকের কিছু গুরুত্ব। একজনের মেটাবলিক পরিবর্তন ঘটলে তার বাস্তবতারও (reality) পরিবর্তন ঘটে যায়।

প্রশ্ন : Hallucinogens এবং নূতন Psychedelic drug L. S. D.—25 সম্পর্কে আপনার মত কী?

বারোজ : আমার মতে এরা মারাত্মক ক্ষতিকর—হেরোয়িনের চেয়েও ক্ষতিকর। এরা সর্বগ্রাসী উদ্বেগ-অবস্থা সৃষ্টি করে। আমি এমন লোককে জানি যে নেশার প্রভাবে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। নেশা না পেলে এদের ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়—আবার অতিমাত্রায় নেশা করার ফলও ভয়াবহ। আমি প্রায় সমস্ত রকম Hallucinogen জাতীয় নেশা করেছি, সৌভাগ্যবশত কোনো উদ্বেগ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। L.S.D. আমাকে কিছুটা অতিরিক্ত সচেতনতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে অবশ্য—ধরুন একজন দরজার নবের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে দেখতে পেল ওটা ঘুরতে শুরু করল, সে জানে ওটা মাদকগ্রহণের ফল (আপাত বাস্তবকে অতিক্রম করা যায় এই পদ্ধতিতে এবং মস্তিষ্কের ও চিন্তাপ্রণালীর সীমাবদ্ধ অবস্থাও অতিক্রান্ত হতে পারে)...মাদকের ফলে ভ্যানগগ জাতীয় রং বিচ্ছুরিত হতে থাকে চোখের সামনে। আমি নেশা করে চলে যেতাম বাইরে ও হাঁটতাম...মাদক আসলে অসুস্থ করে ফ্যালে এবং শরীর ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়...নানান ধরনের বিচিত্র ফল আমি পেয়েছি কিন্তু আর সেইসব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি আমি চাই না, সেইসব চূড়ান্তভাবে অসহনীয় শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে।

প্রশ্ন : মাদকজনিত দর্শন এবং শিল্পের দিব্য দর্শন কি এক?

বারোজ : না। মাদক হয়তো একটা দর্শন-অবস্থা সৃষ্টি করে—একধরনের অবস্থা, কিন্তু মরফিন বা ওই জাতীয় নেশা ক্রমশ আভ্যন্তরীন সচেতনতা, চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়। মাদক যন্ত্রণা নষ্ট করে নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু সৃষ্টিশীল কাজের পক্ষে মাদক সম্পূর্ণ অনুপযোগী। হেরোয়িন থেকে একধরনের উদভ্রান্ত মায়া-দর্শন আমার মাদকাসক্তির প্রথম দিকে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আসক্তি যতই বাড়তে লাগল আর কোনো দিব্য-দর্শনই হলো না, শেষে তো স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার।

প্রশ্ন : মাদক গ্রহণ বন্ধ করলেন কেন?

বারোজ : ১৯৫৭ সে সময় আমি ছিলাম ট্যানজিয়ারে। একমাস কাল নেশা করে একটা কুঠরীতে নিজেকে আটকে রেখে শুধু তাকিয়েছিলাম নিজের পায়ের গোড়ালির দিকে—হঠাৎই মনে হলো আমি আসলে কিছুই করছি না, আমি মরছি, মরতে বাধ্য হচ্ছি। সেখান থেকে সোজা লন্ডনে Dr. Dent-এর কাছে চলে এলাম। তার অ্যাপোমরফিন চিকিৎসার বিষয়ে আগেই শুনেছিলাম। মরফিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে জ্বাল দিয়ে অ্যাপোমরফিন তৈরি হয়। এতে আমার মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া সুস্থিত হয়। মজার ব্যাপার হলো, হাজার হাজার ডাক্তার, সমাজকর্মীর মাদক বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক পুলিশের মতো।

প্রশ্ন : আপনার আসক্তি অবস্থা ফিরে এসেছে আর কখনো?

বারোজ : হ্যাঁ, দুইএকবার, অল্পসময়ের জন্য। কিন্তু অ্যাপোমরফিনে আবার সব ঠিক হয়ে

গেছে। হেরোয়িন এখন আর আমাকে প্রলুব্ধ করে না। বস্তুত আমি আর কোনোই আকর্ষণ বোধ করি না। চারিদিকে প্রচুর পাওয়া যায় ওসব জিনিস, কোনো ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয় না আমাকে। Dr. Dent সব সময় আমাকে বলতেন ইচ্ছাশক্তি বলে কিছুই নাই। আসলে সেইরকম এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যেখানে কোনো কিছুর জন্য আর অভাববোধই থাকবে না।

প্রশ্ন : মাদকাসক্তিকে আপনি অসুস্থতা বলে মনে করেন কিন্তু তাকে মানবজীবনের এক কেন্দ্রিয় সত্য ও নাটক বলেও মনে করেন?

বারোজ : নিশ্চিতভাবেই তাই। দেখুন ব্যাপারটা কত সহজে ঘটে। একজন মদখেতে শুরু করে তারপর মদ পছন্দ করতে শুরু করে এবং আসক্ত হয়ে পড়ে। কিছু লোককে আমি জানতাম, যারা হেরোয়িন নিত, তাদের সঙ্গে আমিও নিলাম, বেশ আরামবোধ হলো—আরও নিতে শুরু করলাম, শেষে আসক্ত হয়ে পড়লাম। মনে রাখবেন যদি এসব বস্তু সস্তায় প্রচুর পাওয়া যেত তবে মাদকাসক্তের সংখ্যা হয়ে যেত অনেক অনেক বেশি। কিন্তু মাদকাসক্তি একটা মানসিক অসুস্থতা এ ধারণা একেবারেই হাস্যকর। এটা ততটাই মানসিক রোগ যতটা ম্যালেরিয়া।

কত রকমের মাদক রয়েছে। ধর্মমাদক, অতিন্দ্রিয়তা মাদক, ক্ষমতা মাদক। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যা করা যায় তা অন্যভাবেও করা যায়। বহু পুলিশ ক্ষমতা মাদকাসক্ত। এরা দুর্বল অসহায় মানুষের উপর ঘৃণ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাজনীতিকরাও এর বাইরে নয়। এই ঘৃণ্য ক্ষমতাসক্তিকে আমি বলি শ্বেত মাদক। এই সমস্ত লোকেরা সব সময় সঠিক, সঠিকতা এদের দাবি। ক্ষমতা একবার হারালে এরা মারাত্মক মাদকশূন্যতার যন্ত্রণায় ভোগে। রাজনৈতিক ক্ষমতা যারা ভোগ করে, ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ যাদের আছে—তারা ক্ষমতা হারাবার কথা ভাবতেই পারে না—ক্ষমতানেশা এদের জীবনমরণ।

প্রশ্ন : অধিকাংশ লেখক যে যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে, সচেতন প্রক্রিয়ায় তাদের উদ্দেশ্যকে চালনা করেন, আপনি তা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন...

বারোজ : আমি জানি না উপন্যাস ঠিক কোন উদ্দেশ্যে যেতে চায়, আমি কিন্তু সরাসরি একেবারে স্বপ্নে চলে যেতে চাই কিন্তু প্রশ্ন হলো স্বপ্ন কী? শব্দ ও ইমেজের বিরুদ্ধে অবস্থানই স্বপ্ন—আমি পরীক্ষা করে দেখছি কীভাবে শব্দ ও ইমেজকে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে এক জটিল আবহসংযোগ তৈরি করা যায়।

প্রশ্ন : Nova Express-এ আপনি বলেছেন যে নৈঃশব্দ এক অতি আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা—

বারোজ : অবশ্যই অতিশয় আকাঙ্ক্ষিত। এক অর্থে শব্দ ও ছবির মিলিত ব্যবহার এই নৈঃশব্দ সৃষ্টি করে। আবার সময়-ভ্রমণ এমন এক জিনিস যা চৈতন্য সম্প্রসারিত করে। শব্দ, যেভাবে তাকে আমরা ব্যবহার করি শারীর-অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার পথে তা বাধা হয়ে যায়। শরীরকে পেছনে ফেলে যাবার সময় আমাদের এসেছে।

প্রশ্ন : আপনি মনে করতেন হেরোয়িনের দরকার আছে এইজন্য যে, তা মানবশরীরকে এমন অবস্থায় রূপান্তরিত করে যার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়—কিন্তু এখন আপনি বলছেন শরীরকে আদৌ সেরকম অবস্থায় রূপান্তরিত করতে আগ্রহী নন।

বারোজ : না আগ্রহী নই। মাদক চৈতন্যকে সংকুচিত করে। লেখক হিসাবে আমি বেশি

ফল পেয়েছি মাদক ত্যাগ করে। আসলে নেশায় কতদূর কী হয় তাই দেখতে চেয়েছিলাম। পারিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। বেকেট চেয়েছিল ভিতরে ঢুকে যেতে। আমার উদ্দেশ্য উলটো, বাহিরের দিকে।

প্রশ্ন : ভিতরের স্বর নীরব রেখে আপনি কি সময়ের কোনো অংশকে ইমেজে ধরতে পেরেছেন?

বারোজ : আমি ধীরে ধীরে এই ব্যাপারটায় রপ্ত হয়ে উঠছি। শব্দ ও ইমেজের মধ্যের যোগকে প্রকাশ করে দিচ্ছি। ধরুন একটা অনুচ্ছেদের অর্থ বেশ ভালো করে স্মৃতিতে তুলে নিলেন, তারপর ওটা পড়তে শুরু করুন দেখবেন আপনার মনের কানে তা আর কোনো সাড়া জাগছে না। অসাধারণ অভিজ্ঞতাগুলি স্বপ্ন পর্যন্ত বাহিত হয়ে যায়। আপনি যখন ইমেজে ভাবতে শুরু করছেন, মনে করবেন তখনই আপনি ঠিক পথে চলেছেন।

প্রশ্ন : শব্দহীনতা আকাঙ্ক্ষিত কেন?

বারোজ : আমার মনে হয় বিবর্তনের এটাই শেষ ধাপ। মনে হয় শব্দ নিয়ে কাজ করাটা গরুর গাড়িতে পৃথিবী ঘোরার মতো ব্যাপার। শব্দ একটা অতীব বাজে হাতিয়ার, আমরা যত শীঘ্র ভাবছি হয়তো তার আগেই শব্দকে বাতিল করা হবে। প্রচণ্ড গতির যুগে এরকমই কিছু একটা ঘটবে। অধিকাংশ লেখকই টেকনোলজির সঙ্গে তালমেলাতে চাইছে না—তাদের শুধু ভয়। আমি কোনোদিনই তাদের ভয়ের কারণ বুঝতে পারি না। টেপ ব্যবহার করার কথা তারা ভাবতে পারে না। সাহিত্য রচনায় কোনোরকম যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়াটাকে তারা পাপ বলে মনে করে। কাট-আপ সম্পর্কে আপত্তিও এইখানে। শব্দের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রদ্ধা এখনও বর্তমান। আমি দেখেছি যারা লেখক নয়, যেমন ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও খোলা মনের লোকেরা কাট-আপ লেখাকে বেশ সহজেই গ্রহণ করছে।

প্রশ্ন : আপনি কাট-আপ প্রকরণে আগ্রহী হলেন কীভাবে?

বারোজ : আমার বন্ধু ব্রাইঅন জিসিন কাট-আপ প্রকরণ উদ্ভাবন করেন। তার কাট-আপ কবিতা 'মিনিটস টু গো' বি. বি. সি. থেকে পঠিত হয়। সে সময় আমি প্যারিসে ছিলাম। তখন ১৯৬০ এবং নেকেড লাঞ্চ বেরিয়ে গেছে। এই সময় আমি কাট-আপে উৎসাহী হই ; মনে হয় এতে প্রচুর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কাট-আপ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে নাম করতে হয় এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যান্ডে"র—ওয়েস্ট ল্যান্ডই প্রথম মহৎ কাট-আপ কোলাজ, আবার ট্রিস্টান জারাও এ-বিষয়ে কিছু কিছু ভেবেছিলেন। কাট-আপ আমার কাছে এক বিরাট আবিষ্কার হিসাবে দেখা দেয়।

প্রশ্ন : কাট-আপ পাঠকের এমন বিশেষ কী দিতে পারে যা চালু বর্ণনা ধর্মীলেখা দিতে পারে না?

বারোজ : বর্ণনামূলক কোনো রচনাংশ, যার মধ্যে কবিতাধর্মী ইমেজ আছে, তার অনেক রকম পরিবর্তন সম্ভব—এর প্রত্যেকটাই নিজ বলে সিদ্ধ হবে। ধরুন র‍্যাঁবোর একপৃষ্ঠা কাট-আপ করা হলো, পাওয়া গেল সম্পূর্ণ নূতন সমস্ত ইমেজ—সেগুলিও র‍্যাঁবো-ইমেজ কিন্তু নূতন।

প্রশ্ন : ইমেজের পর ইমেজ গড়ে তোলা আপনার পছন্দ নয় কিন্তু আবার আপনি নূতন

ইমেজ খুঁজছেন?

বারোজ : হ্যাঁ, যে কেউ শব্দ এবং ইমেজ নিয়ে কাজ করছে এটা তার সামগ্রিক কূটাভাসের একটা অঙ্গ। কাট-আপের ফলে বিভিন্ন ইমেজের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত যোগসূত্র আবিষ্কার হয়ে যায় এবং একজনের দর্শন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

প্রশ্ন : আপনার মনে হয় এমন এক পাঠকমণ্ডলী গড়ে উঠবে যারা কাট-আপ লেখা পড়ে সাড়া দিতে পারবে?

বারোজ : অবশ্যই। সময়-প্রবাহ ব্যাপী যে মানস-অনুভব পদ্ধতিটি বয়ে চলে কাট-আপ তা উন্মুক্ত করে দেয়। একজনের চারপাশে কী ঘটে চলছে এবং ওই সময় সে নিজে কী কী ভাবছে, এই দুটি জিনিস-এর পাশাপাশি অবস্থানই কাট-আপ। রাস্তা হাঁটার সময় এই জিনিস আমি অভ্যাস করি, এইভাবে হাজার হাজার পৃষ্ঠার নোট তৈরি করি, এছাড়াও রাখি ডায়েরি—এটাকে বলি *সময়-ভ্রমণ*। বেশির ভাগ মানুষই তার চারপাশে কী ঘটছে তা দেখতে পায় না। লেখকদের এই কথাই বলতে চাই—চোখ খোলা রাখুন, চারপাশে কী ঘটছে দেখুন। একদিন বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলুম জিজ্ঞেস করলুম, "এইমাত্র যে লোকটা পাশ দিয়ে চলে গেল, তাকে কি দেখেছ তোমরা"—না তারা কেউই লক্ষ করেনি।

প্রশ্ন : যে ভাষা ভিত্তির উপর কাজ করতে হয় সেইটাই কাট-আপের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা, এইভাষা ক্রিয়াবহুল এবং ঘোষণামূলক। কাট-আপ কি এই ভাষাকে পালটাতে চলেছে?

বারোজ : হ্যাঁ। দুর্ভাগ্যবশত সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তাপদ্ধতির সেই 'হয় এটা নয় ওটা' এই শেকলে বাঁধা পড়ে আছে। এই চিন্তাপদ্ধতি একেবারেই সঠিক নয়। এইভাবে কোনো কিছুই ঘটে না—আমি নিশ্চিন্ত যে এই অ্যারিস্টটলীয় চিন্তা ভিত্তি সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বেঁধে রেখেছে। কাট-আপ এমন এক আন্দোলন যা একে ভেঙে দেবে।

প্রশ্ন : উপন্যাসে প্লটের কী হবে?

বারোজ : চরিত্রগুলিতে পরিচালনার জন্য প্লট আছে, থাকবেও কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে, যেমন কাট-আপে দ্রষ্টার সামগ্রিক দৃষ্টিক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে, এর ফলে শিল্প-অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হবে—পরিধি বাড়বে।

প্রশ্ন : আপনার নোভা এক্সপ্রেস কি অনেক লেখকের কাটআপ?

বারোজ : হ্যা, সেখানে জয়েস আছে, শেক্সপিয়র আছে, র‍্যাঁবো আছে লোকে নামজানে না এমন সব লেখকও আছে। কেরুয়াক আছে। জাঁ জেনেকে আমি সবচেয়ে বড়ো লেখক মনে করি। যদিও তার গদ্য, ধ্রুপদী ফরাসি গদ্য। এছাড়াও কাফকা এলিয়ট এবং আমার অতিপ্রিয় জোসেফ কনরাড। একটা উদাহরণ দিই : আমি ট্যানজিয়ার থেকে যাচ্ছি জিব্রাল্টার। ডায়েরির তিন কলামে এ যাত্রার সবকিছু আমি নোট করে নিই। একটা কলমে থাকবে শুধু আমার যাত্রার বর্ণনা, কী ঘটল, এয়ার পোর্টে এলাম ও কেরানি কি বলল, প্লেনে কী কানে এলো কোন হোটেলে উঠলাম। পরের কলামে থাকবে আমার স্মৃতি অর্থাৎ ওই সময়গুলিতে আমি কী ভেবেছি ইত্যাদি। তৃতীয় কলামে থাকবে ওই সময় যে বই পড়ছিলাম তার থেকে উদ্ধৃতি।

প্রশ্ন : এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২৫ বছরে উপন্যাসের কী ঘটবে?

বারোজ : আমি মনে করি বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই শিল্প সৃষ্টি পদ্ধতি পরীক্ষা করতে শুরু করেছে এবং আমার মনে হচ্ছে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যের যে সীমারেখাটি তা ভেঙে যাবেই, এবং আমার আশা বিজ্ঞানীরা হয়ে উঠবে সৃষ্টিশীল এবং লেখকরা বিজ্ঞানভিত্তিক।

প্রশ্ন : এর ফলে কি সাহিত্যের ম্যাজিক নষ্ট হয়ে যাবে না?

বারোজ : না, আদৌ না। বরং বাড়বে। ...অনেকে আমাকে বলে লেখাটা তো ভালোই কিন্তু তুমি তো কাট আপ করে লেখাটা তৈরি করেছো। আমি বলি কীভাবে লেখাটা আমি লিখেছি সেটা বড়ো কথা নয় আদৌ কোনো কথাই নয়। যে কোনো লেখাই তো কাট-আপ নয় কি? আমিই বাছাই করি লেখার বিষয়গুলি। একহাজার শব্দের মধ্যে একটিই মাত্র বেছে নিই।

[আমার কিছু কিছু চরিত্র আমার কাছে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আসে। যেমন ড্যাডি লং লেগস। একবার এক ক্লিনিকে, স্বপ্নে একটা লোককে দেখি, স্বপ্নেই নামশুনি ড্যাডি লং লেগস। সব সময় আমি আমার স্বপ্নগুলি লিখে রাখি। বিছানার পাশে এজন্য নোট বই রাখি।]

প্রশ্ন : একটা, কোনো একটি বিশেষ দিনের কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

বারোজ : ৯টায় ঘুম থেকে উঠি। প্রাতরাশ চাই। প্রাতরাশ খাওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করি না। ২টা বা ২১/২টা পর্যন্ত কাজ করি। এ সময় একটা একটা স্যান্ডউইচ ও একগ্লাস দুধ খাই, এতে দশ মিনিট লাগে। ছটা বা সাতটা পর্যন্ত কাজ করে যাই। তারপর বাইরে যাই লোকজন দেখি কিছু পানীয় গ্রহণ করি, ফিরে আসি, কখনো সামান্য পড়ি এবং শুতে যাই। বেশ সকাল সকাল শুতে যাই। নিজেকে আর কাজ করতে দিই না। আসলে আমি চাই ঘরে একেবারে একা থাকতে, নিশ্চিত হতে চাই কোনোভাবেই এতে কেউ ব্যাঘাত ঘটাবে না—ঠিক আট ঘণ্টা সময় আমি চাই—স্বর্গীয় ব্যাপার!

প্রশ্ন : আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী?

বারোজ : ঈশ্বর? ঠিক বলতে পারি না। অসংখ্য দেবতা রয়েছে। এই পৃথিবীতে আমরা যাকে ঈশ্বর বলি সে আসলে এক উপজাতি দেবতা যে ভয়াবহভাবে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই মানব চৈতন্যের মধ্যে এমন সব শক্তি কাজ করছে যারা ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু এই লেখকদের বেলায়, এই বিশাল ইমেজ আবর্জনা স্তূপ দিয়ে এই শক্তি কী করতে চায়?

প্রশ্ন : আপনার লেখায় প্রায়ই যৌনতা ও মৃত্যু একীভূত হয়ে যায়—

বারোজ : এটা হলো জৈব অস্ত্র হিসাবে যৌনতার ব্যবহার এই ধারণার প্রসারণ। অন্যান্য মানবশক্তির প্রকাশগুলির মতোই যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নোংরা করে অবমূল্যায়ন ঘটান হয়েছে, বা একেবারে অমানবিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সমস্তই ছ্যুৎমার্গীয় ব্যাপার। কবে যে আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে যৌনতাকে বুঝতে পারব, কবে আমরা বিষয়টাকে তদন্ত করতে পারব। এ সম্পর্কে যেমন ভাবাও হয় না, লেখাও হয় না। আর রীখ (উইলহেলম্) সম্পর্কে ওইটাই সবচেয়ে মজার। সেই হলো বিরল মানুষদের অন্যতম যে যৌনতা বিষয়ে—যৌন

জগৎ বিষয়ে কিছু তদন্ত করার চেষ্টা করেছিল, একটা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে। যৌন বিষয়ে একাধারে রয়েছে ছুৎমার্গীরা, অন্যদিকে প্রচণ্ড ভয়। আসলে আমরা যৌন বিষয়ে কিছুই জানি না। এটা কী? এটা আরামদায়ক কেন? আরাম কী? যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়া? সম্ভবত।

প্রশ্ন : আপনি কি বিংশ শতাব্দীর প্রতি অসম্ভব ক্রুদ্ধ?

বারোজ : একেবারেই না, নানা ধরনের নানা প্রকৃতির অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে আমি জন্মাই এটা কল্পনা করতে পারি। সম্প্রতি একটা স্বপ্ন দেখেছি, যেখানে আমি পুরোনো বাড়িতে ফিরে গেছি, কিন্তু আমার বাবা ভিন্ন লোক—এবং বাড়িটাকেও কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু বাবা ও বাড়ি দুটোই চেনা মনে হলো।

প্রশ্ন : মেরী ম্যাক্কার্থী তো আপনাকে একজন ইউটোপীয়ান রূপে চিত্রিত করেছেন...

বারোজ : হ্যাঁ, আমাদের সময়ের প্রকৃত অপরাধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাই তো কাজ। আমার সমস্ত রচনা তাদেরই বিরুদ্ধে যারা বোকামি দিয়ে শয়তানি দিয়ে এই গ্রহটাকে উড়িয়ে দিতে চায়। ঠিক ওই বিজ্ঞাপনের তৈরি করা মানুষগুলোর মতো। আমি আমার পদ্ধতির সাহায্যে উপযুক্ত শব্দ ও ইমেজ পেতে চাই, তৈরি করতে চাই নাট্য—বাইরে বেরিয়ে একটা কোকাকোলা কিনে সময় নষ্ট করতে চাই না, পাঠকের চেতনান্তরের গতি পরিবর্তন করতে চাই, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি এক মরুদ্বীপের বাসিন্দা কিনা, এবং জানি কিনা, কেউ কোনোদিন আমার লেখা ছুঁয়েও দেখবে না, তারা জানতে চায় আমি তবু লিখেই যাব কিনা? আমার উত্তর—হ্যাঁ, অবশ্যই লিখব। আমি একা, আমাকে এইজন্যই লিখতে হবে। কারণ আমি কাল্পনিকের স্রষ্টা এবং কল্পনার জগতেই আমি বাস করতে চাই।

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সাক্ষাৎকার

[অমিয়ভূষণ মজুমদারের বয়স ৬০-এর উপর। তিনি মনে করেন নজরুল নয় কবি হিসাবে বিপ্লবী জীবনানন্দ। তিনি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার শ্রমিক বা কৃষক নন, তিনি লেখক, এজন্য তিনি গর্ববোধ করেন। কারণ লেখকই মানব-অস্তিত্বের ৭৫ ভাগের সঙ্গে কমুনিকেট করতে পারেন আর কেউ পারে না। তিনি বলেন, যদি তাকে একটি নির্দিষ্ট ছক দিয়ে বলা হয় এর বাইরে যেতে পারবেন না তবে তিনি বিদ্রোহ করবেন। তাঁর প্রচার কম এজন্য এতটুকু হতাশা তাঁর নেই। তাঁর বিশ্বাস ৫০ বা ১০০ বছরেও তাঁর লেখার ধার কমে যাবে না। তিনি বলেন, 'যখন দেখি আর এক জনের ছেলে উদোম গায়ে রাস্তায় ভিক্ষে করছে তখন আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে।' তিনি মনে করেন, সমাজের বড়োলোক শ্রেণি ফিলিস্তাইন, তারা রবীন্দ্রনাথ কেনে কিন্তু পড়ে না, আর নীচের তলায় যারা, যাদের মনের স্ফুরণ হয়নি, তাঁদের সঙ্গে কম্যুনিকেশন হয় না, এদের মাঝখানে আছে বুর্জোয়া সমাজ। এরাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়—তিনি ও এই সমাজেরলোক, তিনি এদের জন্যই লেখেন। ১৯৬৭-৬৮ পর এই প্রথম আমি অমিয়ভূষণের কাছে গেলাম। তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। তাঁকে আঘাত করতে চাই কিন্তু পারি না। হঠাৎ এতটা কাছে আসেন যে আঘাত করার জন্য যে দূরত্ব দরকার তা থাকে না। বা হঠাৎ এতটা দূরে চলে যান যে আঘাত ততদূর যায় না। বিভিন্ন বিষয়ে তাকে কতগুলি প্রশ্ন করি, উত্তরের সঙ্গে আমি একমত না হলে কী হয়, পাঠকের তো জানা উচিত অমিয়ভূষণ কী বলেন—*অরুনেশ ঘোষ*]

প্রশ্ন : আপনি কেন লেখেন? লেখার কোনো উদ্দেশ্য আছে কি—থাকলে তো কী?

উত্তর : যখন আমি প্রথম লেখা শুরু করি এবং এখন যখন আমি লিখছি এই দুই আমি এক। কিন্তু এই দুই আমির মধ্যে তফাৎ হলো এই প্রথম যখন আমি লেখা শুরু করি তখন লিখেছি স্বীকৃতির জন্য আজ লিখি আনন্দের জন্য—যে আনন্দ আমি আর কোথাও পাই না। অত্যন্ত দামি মদ খেলে কিন্তু মাতাল না হলে যে অনুভূতি হতে পারে কলম হাতে আমার চরিত্রগুলোর মধ্যে আমি যখন চলতে থাকি তখন, আমার সেই অনুভূতি হয়। কখনো মনে হয় মাথায় একটা পদ্ম আছে যা থেকে মধুস্রাব হচ্ছে এবং সে মধু অ্যালকোহলের চাইতেও তীব্র আনন্দে আমাকে ভরে তোলে।

প্রশ্ন : সাহিত্য রচনা কি সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ না একান্তভাবে ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া?

উত্তর : সাহিত্য রচনা হয় সমাজে যেমন মানুষের সব শুভকাজ সব অপরাধ সমাজেই হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে সাহিত্য কর্ম সামাজিক কর্ম কেননা লেখক ও পাঠক এই দুইয়ে মিলে এক সমাজ আছে যেখানে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাহিত্য একটা Communication.

নিঃসঙ্গ মানুষের কোনো Communication নেই।

প্রশ্ন : ঠিক ভারতীয় সাহিত্য বলে নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় কী?

উত্তর : আর ৫টা দেশের মতন ভারতবর্ষও U. N. O.-এর সদস্য, আর ৫টা দেশের মতোনই তার নানান সমস্যা—এদিক থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতিগত দিক থেকে ভারতবর্ষের আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টি করেন সংস্কৃতিবান মানুষ সেহেতু ভারতীয় সাহিত্য বলতে আলাদা কিছু রয়েছে।

প্রশ্ন : সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য বলে কোনো সাহিত্য হতে পারে কি?

উত্তর : 'সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য' এই সংজ্ঞাটা একটু গোলমেলে। আমরা কি ক্রিশ্চিয়ান সাহিত্য ইসলামি সাহিত্য বা হিন্দু সাহিত্যকে সংজ্ঞা হিসাবে ধরে নেব? তা যদি ধরে না নিই তাহলে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য সংজ্ঞাটিও ব্যবহার করা উচিত হবে না। কেননা এইসব ফর্মুলায় সেই বস্তুই ধরা পড়বে যা এইসব ধর্মের গোঁড়ামিকে ধরে রাখে। সমাজতন্ত্র যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসে তখন অন্য যে কোনো ধর্মের মতোই উদারতা মানবতা প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু গোঁড়ামিকে তার দূত হিসাবে আনে। ফলে সাহিত্য হয় না, ধর্মপ্রচার হয়, গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠা হয়, মানুষের সুরে কথা না বলে রাজনীতির সুরে কথা বলা হয়, এর একটা ভালো উদাহরণ আছে : Tasso তার কাব্য গ্রন্থ 'জেরুজালেম উদ্ধার' যখন লিখেছিলেন তখন তার কবিমন কাজ করেছিল। এবং তার কাব্য সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান ধর্মযাজকেরা, পণ্ডিতেরা সেই কাব্যে খ্রিস্টানির কিছু অভাব দেখলেন, Tasso কাব্যকে নতুন করে লিখলে সেটি কাব্য হলো না কাব্যের আকারে খ্রিস্টানি হলো। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য-যখন সেই ধর্মের যাজকদের কার্ডিনালদের যারা সমাজতন্ত্রের ভাষায় পলিটব্যুরো কিংবা প্রিসিডিয়ামের মেম্বার তাদের কথায় বা চোখরাঙানীর ভয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন বা ধরে নেওয়া যাক সেই ধর্মীয় সাহিত্যিক সেই ধর্মকে মূল্য দেওয়ার জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেন যেমন Tasso করেছিলেন নিজের কবিপ্রাণকে বন্দী রেখে—ধর্মীয় আত্মার প্রেরণায়, তাহলে সেই সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য Tasso-র পুনর্লিখিত কাব্যের মতোই নিষ্ফল হয়।

প্রশ্ন : আধুনিক সাহিত্য বলে কোনো সাহিত্য আছে কি? থাকলে তার চরিত্র কেমন?

উত্তর : আধুনিক সাহিত্য এই সংজ্ঞাটি সাহিত্যের ইতিহাসে যে কোনো মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়। যে কোনো দেশের সংস্কৃতি দশকে দশকে নতুন পোশাক পরে কিন্তু তার পুনর্জন্ম হয় হাজার হাজার বছর পরে, সাহিত্যের ট্রাডিশান পুনর্জন্ম নেয় ৫০০/৭০০ বছরে। কিন্তু যুগ থেকে যুগে তার ধরণ ধারণে চালচলনে পরিবর্তন আসতে থাকে। আমরা ভারতীয়রা মূলত 'পেগান' সংস্কৃতির লোক। কালিদাসের আমলে যে 'পেগান' ভদ্রলোক ছিলেন আর আজকের কলকাতায় যে 'পেগান' ভদ্রলোক আছেন, মানুষ দুটি মূলত এক হলেও তাদের কথাবার্তা সামাজিক পরিস্থিতি চিন্তা অভীপ্সা এগুলিতে পরিবর্তন হচ্ছে। সাহিত্য সৃষ্টি করে একজন বর্তমান মানুষ, সাহিত্য—সাহিত্যের উপাদান সে সংগ্রহ করে তার বর্তমান জীবন থেকে। এই বর্তমান মানুষ সব সময়েই আধুনিক। এবং বর্তমান জীবনও কখনোই অনাধুনিক নয় সেজন্য সব যুগেই আধুনিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে। আমার মনে হয় ওই আধুনিকতার স্বরূপ কী তা না বললে এ প্রসঙ্গ শেষ হয় না : পর পর দুটি মহাযুদ্ধ

সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্য বলতে বর্তমানদিনে মুখ্যত যে সাহিত্যকে বুঝি তা ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সাহিত্য। ভারতীয়, জাপানি বা চিনা সাহিত্যে এই ইউরোপীয় সাহিত্য এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে তাকে অর্থাৎ শেষোক্ত কয়েকটিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের Complimentary ছাড়া বেশি কিছু বলা যায় না। এই ইউরোপীয় সাহিত্যের এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি ছিল ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম বিশ্বাস। এ বিশ্বাসটা প্রায় মুছে গেছে। তাদের জীবনের উপাদান ছিল ইউরোপ আফ্রিকা এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ছড়ানো কলোনিগুলি থেকে আদায় করা সহজলভ্য সুখ এবং আয়াস। সেই জমিদারি এখন নেই। ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে জীবনের উপাদানে বিশ্বাস না রাখতে পেরে কলোনিচ্যুত আলবেয়ার কামুর মতোই সাহিত্যিকরা জীবনের স্বরূপ খুঁজতে প্রশ্ন তুলে চলেছেন। এটা সমাধানের যুগ নয়, সেজন্যই আধুনিক সাহিত্যের মূল সুর 'অ্যাবসার্ড', যখন তা নয় যখন অন্য সুর প্রাধান্য পেতে চেষ্টা করে তখন অবিশ্বাস প্রশ্ন ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ পেতে পারে। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : গত ১৫ বছরের দুটি প্রধান সাহিত্য আন্দোলন হাংরি জেনারেশন ও কৃত্তিবাস সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আমি কলকাতা থেকে অনেক দূরে বাস করি সুতরাং এইসব সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলতে হলে যতটুকু জানা দরকার তা আমার পুরো জানা হয়নি। আমি লক্ষ করেছি এই দুটি আন্দোলনই পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের লিখন ভঙ্গি এবং দৃষ্টি ভঙ্গির প্রভাবকে দূরে রেখে নিজের কথা নিজে বলবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। নিজের ব্যক্তিত্বকে যে খুঁজে পায়নি, সে আর যাই হোক সাহিত্যিক হয় না। 'কৃত্তিবাস' এবং 'ক্ষুধার্ত' এই নাম দুটি এই দুটি আন্দোলনের মূল পার্থক্য বুঝিয়ে দেয় বলে আমি মনে করি। 'কৃত্তিবাস' সেই পুরোনো বাঙালি কবির নামই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং কৃত্তিবাসের আধুনিক লেখকদের শিল্প ও কাব্যের ঐতিহ্যে বিশ্বাস আছে। তাঁদের প্রশ্ন আছে তাঁদের মনে একটা আশ্বাস আছে যা 'কৃত্তিবাস' নাম প্রতীক হতে পারেন 'ক্ষুধার্ত' পুরোনো পৃথিবীতে যেন এক বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিক. যার কাছে বিশ্বাস বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। যাকে 'ভ্যালুজ' বলা হতো সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে সবকেও তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না, করতে চান না। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এঁরা Essence-এর চাইতে Existenceকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। anguish বা angst এখনও ততটা দেখা দেয়নি। তাহলে বলতাম এরা Existentialist মতের দিকে এগিয়ে চলেছেন। যার শেষ পরিণতি absurd সাহিত্য। আমরা এই আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে দেখতে চাই।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় হাংরি কবি লেখকদের রচনা সাহিত্য?

উত্তর : আমি আগেই স্বীকার করেছি 'ক্ষুধার্ত' প্রজন্মের সাহিত্যিকদের লেখা আমি বেশি পড়িনি। সেগুলো সাহিত্য হয়েছে কিনা তা বলার ব্যাপারে আমি পুরাতন পন্থী, আমি বলতে পারি তারা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। সাহিত্য হিসাবে তা কত খানি স্থায়ী হবে তা বলার সময় এখনও আসেনি। কল্লোল যুগে অনেক লেখাই সাহিত্য বলে মনে হয়েছিল। এখন দেখছি তখন ভুল করেছিলাম তার অনেক লেখাই

সাহিত্য ছিল না।

প্রশ্ন : প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত সাহিত্য সম্পর্কে আপনার মত কী? প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা থেকে জন্ম নিচ্ছে প্রতিবাদের সাহিত্য এবং এই এখন বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত সাহিত্য, আপনি কী তা মানেন?

উত্তর : এ প্রশ্নটার জবাব আমি অন্য কথায় আগেই দিয়ে ফেলেছি। ধর্ম একটি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক শক্তি একটি প্রতিষ্ঠান তেমনি ব্যবসাও একটি প্রতিষ্ঠান, আমি তো এর আগেই বলেছি হিন্দু সাহিত্য ইসলামি সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য বলে যেমন কিছু হয় না তেমনি ব্যবসায়িক সাহিত্যও সাহিত্য হয় না। সাহিত্য তো এক দিক দিয়ে একটি সংস্কৃতিবান আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ। প্রতিষ্ঠান সব সময়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিরোধী। এজন্যেই প্রত্যেক যুগে নতুন সাহিত্যিকরা ছোটো ছোটো নতুন পত্রিকাকে অবলম্বন করে আত্ম-প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত পত্রিকাগুলো সব সময়ে সেইসব সাহিত্য প্রকাশ করবে যা পরীক্ষামূলক নয় যা সহজগ্রাহ্য যা নিও-লিটারেটদের বোধ্য এবং যার সমাদর করে ফিলিস্টাইন এবং 'ফোর ম্যানেটি' ('ফোর ম্যানেটি' শব্দটি হিউম্যানেটি শব্দের কাছাকাছি বা অমিয়ভূষণের নিজস্ব শব্দ, তিনি তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'নিউ ক্যালকাটা'য় এই ফোরম্যান সমাজের কথা বলেছেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে এমন বেশ কিছু লোকের উদ্ভব ঘটেছে যারা নানান সূত্র থেকে প্রচুর পয়সা কামায় এবং দামি স্যুট বউয়ের দামি শাড়ি গয়নার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও কিনে থাকে। কিন্তু মূলত এরা মূর্খ কারখানার ফোরম্যানদের মতোই। এটা যে আক্ষরিকভাবেও কতখানি সত্য তা দেখা যাবে দেশ ও কৃত্তিবাস পত্রিকার চিঠিপত্রের বিভাগের পাতা ওলটালে। রুরকেল্লা ভিলাই দুর্গাপুর জামশেদপুর ইত্যাদি কারখানার বাঙালি ফোরম্যানরা চিঠি লিখে শুধু ব্যবসা-সাহিত্য কে সমর্থনই করে না সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী ও পরীক্ষামূলক সাহিত্যকে বিদ্রূপও করে। বাঙলা সাহিত্যের বাজারে এরাই এখন প্রধান খদ্দের।) সুতরাং প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত পত্রিকা নতুন সাহিত্যকে কখনই স্থান দিতে পারে না। কিছুদিন ধরে ছোটো ছোটো অখ্যাত পত্রিকায় লিখবার পর যখন কবিকে কিছু সংখ্যক পাঠক বুঝতে শিখেছে তখনই এইসব প্রতিষ্ঠান বা বড়ো পত্রিকা তাদের লিখতে আহ্বান করে। সুতরাং নতুন কবিকে তরুণ সাহিত্যিককে সৃষ্টির তাগাদাতেই ছোটো ছোটো পত্রিকায় নিজের সুরে কথা বলতে হবে। তাতে প্রতিবাদ থাকবেই।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন গদ্য এবং কবিতা দুইয়ের মধ্যে কোনো মূল পার্থক্য আছে?

উত্তর : যাকে ইংরেজিতে ফর্ম বলে এই সমস্যাটা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটি তীক্ষ্ণধার ছুরি যা পেশোয়াজে লুকিয়ে রাখা যায় আর একটি দামিস্কের তরোয়াল যা কিংখাবের কোমরবন্ধ থেকে ভেলভেটের খাপে চলার সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে এ দুই-ই অত্যন্ত ভালো স্টিলের তৈরি। অত্যন্ত ধার। এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। কিন্তু দুই-ই কী এক? উদ্দেশ্য শত্রুবিনাশ হলেও দুইয়ের গড়নে এবং প্রয়োগে পার্থক্য রয়েছে। দামিস্কের তরোয়াল খুব ধারালো হলেও তার কোথাও যদি মর্চে পড়ে থাকে কিংবা ধার কিছু ভোঁতা হয়ে থাকে তবু তার কার্যকারিতা নষ্ট হয় না। কিন্তু পেশোয়াজের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সেই ছুরিটিকে আমরা প্রতি সেন্টিমিটারে তীক্ষ্ণধার দেখতে চাই। গদ্যে আয়তন আছে দু-চারটি শব্দের অপপ্রয়োগে লেখকের

কম্যুনিকেশন মার খায় না কিন্তু একটা কবিতায় একটি শব্দ কিংবা একটি যতি চিহ্নের গোল মাল হয়ে গেলে গোটা কবিতাই মার খেতে পারে। কবিতায় অল্প কথার অনেক বেশি প্রকাশ করতে হয়। সেজন্যে কবিতার শব্দ চয়নে এবং গদ্যের শব্দ চয়নে পার্থক্য রয়েছে। এবং এ পার্থক্য সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে। এবং ভবিষ্যতেও থেকে যাবে। এখানে কিন্তু একথা বলা হচ্ছে না যে ডিক্সনারিতে গদ্যের জন্য একসারি আর কবিতার জন্য আরেক সারি শব্দ থাকবে। একই শব্দ গদ্যে ও কবিতায় ব্যবহার করা যায়। কবিতায় শব্দ চয়নের যুক্তি গদ্যের শব্দ চয়নের যুক্তি থেকে পৃথক। এই শব্দ চয়নই সেই ম্যাজিক যা একটা ইস্তেহারকে একটা কবিতার পরিণত করে।

প্রশ্ন : শরীর বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব শূন্য কিন্তু শরীর প্রসঙ্গ লেখায় স্পষ্টভাবে উপস্থিত হলে অনেকে (লেখক ও পাঠক উভয়েই) শিউরে ওঠেন, এদের আমরা ভণ্ড বলি—এ বিষয়ে আপনার মত কী?

উত্তর : বিষয়টা দর্শনের এবং Aesthetics-এর। আমরা যদি ভালো করে মানুষকে দেখি তাহলে বুঝবো তার শরীরটা সামনে থাকলেও ও তার শরীরটা বাদ গেলেও সে থাকে না এরকম সিদ্ধান্ত আপাতত যুক্তিগ্রাহ্য বোধ হলেও মানুষ বলতে তার শরীরকে বোঝায় না। আমি অন্য জায়গায় বলেছি মানুষের শরীরটা তার সেই অংশমাত্র যা আমাদের চোখে পড়ে, যেমন আইসবার্গের বেলায় হয়। মানুষ তার শরীর বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সে তার মনও। শরীর নিয়ে লজ্জা করার কিছু নেই। তা নিয়ে কারোকে আঘাত দেওয়ার কিছু নেই। তার উল্লেখে আঘাত পাওয়ারও কিছু নেই। শরীর সম্পর্কে যদি সাহিত্যের ভয় এসে থাকে তবে তা এসেছে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রভাবে। সেকালে গ্রীকরা এবং আমাদের সেকালের ভারতীয়রা শরীরকে ভয় পেতেন না। পুরীর মন্দির দেখে থাকবে তার দেয়ালে অজস্র মূর্তি আছে যার সম্বন্ধে 'অশ্লীল' শব্দ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সেই মন্দিরের মধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত তিনি সমস্ত দেহের উর্ধে অবস্থিত এক সত্তার প্রতীক। মানুষের জীবনকে কিংবা গোটা মানুষটাকেই পুরীর মন্দির মনে করতে পারো। সুতরাং সাহিত্যে শরীর কতটা দেখা দেবে তা নির্ভর করছে সাহিত্য কোন সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার উপর। শিবলিঙ্গ নিশ্চয়ই দেখেছো তা কারোর কাছে কামজ বাসনার প্রতীক হতে পারে অন্য কারো কাছে মহাজীবন ও মহামরণের প্রতীক হতে পারে। তুমি কি সাহিত্যে এমন একটা Conceptionকে তুলে ধরতে চাও? তবে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করো আপত্তি নেই। সাহিত্যে, ধরো আমার উপন্যাসে আমি তো জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাই কিন্তু উদ্দেশ্যটা আলো, শুধু আগুনটা নয়, এই প্রশ্নটা জটিল বলে আমি এত কথা বলছি। প্রেম মানুষের আবিষ্কার, তাকে কৃত্রিম বলতে পারো যেমন অন্য অনেক ভ্যালু কৃত্রিম কিন্তু তা গোটা মানুষটার অংশ, যদি সাহিত্যে এই প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শরীর আনতে হয় তাতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। 'ঋতুসংহারে'র কবি কালিদাস 'কুমারসম্ভব'কে স্পর্শ করে অবশেষে 'শকুন্তলায়' পৌঁছলেন। আমার নিজের ধারণা যতক্ষণ কবি তার যজ্ঞে আলো আবিষ্কার করাকেই উদ্দেশ্য বলে মনে রাখেন ততক্ষণ সেই যজ্ঞে কতখানি সমিধ ও কতটা মেধ দগ্ধ হলো তা নিয়ে রসবেত্তা মাথা ঘামায় না।

প্রশ্ন : নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে লেখক যেতে পারেন কি? যদি যান তবে তা কি মিথ্যা হবে না?

উত্তর : নিজের অভিজ্ঞতা বলতে যদি একটি মাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বোঝায় তবে সাহিত্য সৃষ্টিতে অহরহই তার বাইরে যেতে হয়। আমাদের জানা কখনই শুধু একটি মাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নয়। আমরা বই পড়ে জানি যাতে অন্যের অভিজ্ঞতা লেখা থাকে, আমরা বন্ধুদের কাছ থেকে জানি যা অন্যর অভিজ্ঞতা। এমনকি আমার পাঁচ হাজার বছর আগের পূর্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে থেকে যায়—এই বৈজ্ঞানিক সত্যে আমি বিশ্বাস করি। আমি যখন লিখি ও যখন দেখি তখন আমার বইগুলি আমার বন্ধুরা আমার পূর্বপুরুষ সবাই এসে দাঁড়ায় আমাকে সাহায্য করে সেজন্যে যখনই কালজয়ী কোনো লেখা ভূমিষ্ট হয় তখন পাঠকের চোখে তা এক অভিনব ব্যাপার কেননা তাকে তারা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে সবটুকু মেপে উঠতে পারে না। আমার তো মনে হয়, প্রতিভা অন্য অনেক বিষয়ের মধ্যে সেই ক্ষমতাও যা বহুর অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে একজন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে অভিজ্ঞ করে তুলতে পারে। প্রতিভাবানের এই অভিজ্ঞতাকে যদি তুমি তার 'নিজের অভিজ্ঞতা' বলে থাকো তাহলে অবশ্য কবি নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : স্রষ্টা যদি কিছু সৃষ্টি করতে চান তবে তাকে বহু ব্যবহৃত শব্দকে ও তার পরম্পরাকে নষ্ট করতেই হয়—এবং পুরোনো মূল্যবোধকেও—আপনার মত কী?

উত্তর : এ প্রশ্নটার উত্তর আমি অন্য কথায় ইতি পূর্বেই ইশারায় এনেছি। কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এক নয়, যদি কবি নিজের কথা নিজে বলতে চায় তখন সে আদি কবির মতোই একেবারে নিঃশব্দ, স্বনির্ভর। তার কথা যদি কেউ আগে বলে থাকে তবে তার লেখার কোনো সার্থকতা নেই। কাজেই প্রত্যেকেই নিজের হয়ে শব্দ চয়ন করতে হয়, নিজের Aesthetic Value থেকে শব্দ চয়ন হয়। যার ফলে প্রচলিত বাগ্‌বিধি যাকে Contemporary বলা যেতে পারে তা থেকে সরে আসতে হয়। প্রতিষ্ঠিত কাব্যের ভাষা থেকে তো বটে এবং তাকে নতুন 'কোড অব ভেল্যুজ' তৈরি করে নিতে হয়। নতুবা সে কবি প্রেসের থেকে বেরুতে না বেরুতেই বাসি খবরের কাগজ। কিন্তু যেহেতু কবির অভিজ্ঞতা বর্তমানের এবং অতীতের অন্য অনেকের অভিজ্ঞতার এবং তার নিজের অভিজ্ঞতার যোগফল তেমনি কবির শব্দচয়নে তার সৃষ্টি ভ্যালুজের মধ্যে অন্য অনেকের অভিজ্ঞতার ভ্যালুজের পুনর্জন্ম দেখতে পায়।

আঁতোয়া আর্তো

আত্মহত্যা কী কোনো সমাধান?

অনুবাদ : শৈলেশ্বর ঘোষ

তুমি বেঁচে থাকো এবং তুমি মরে যাও। এর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছার কোনো সম্পর্ক নাই। যেভাবে তুমি স্বপ্ন দেখ ঠিক সেইভাবেই তুমি নিজেকে হত্যা করো। আমরা যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি তা নীতিগত নয় :

না, আত্মহত্যা এখন পর্যন্ত একটা অনুমান মাত্র। আমি অবিশ্বাসী হওয়ার অধিকার দাবি করি ; বাস্তবের বাদবাকি অংশ সম্পর্কে আমি যেরকম অবিশ্বাসী। এই মুহূর্তে এবং ভবিষ্যতেও একজনকে ভয়ংকরভাবে অবিশ্বাসী হতেই হয়, এবং সকলেই জানেন সে অবিশ্বাস অস্তিত্বকে নয়, বরং এক আভ্যন্তরীন উত্তেজনাকে, বস্তু, ক্রিয়া ও বাস্তবতার গূঢ় অনুভূতিকে। আমার চিন্তার মহাজাগতিক নাড়ী যা স্পর্শ করে না তা আমি বিশ্বাস করি না যদিও আমার মনের অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড এখন অকেজো হয়ে পড়েছে। অন্য লোকগুলির অস্তিত্বের কালোছাপ আমাকে উত্যক্ত করে—এবং আমি সমস্ত বাস্তবকে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে ঘৃণা করি। আত্মহত্যা স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মানুষদের এক সুদূর বিজয় কাহিনি এবং এক উপকথা মাত্র, এর বেশি নয়। কিন্তু অস্তিত্বের মূলাধারের এক অবস্থা হিসাবে আত্মহত্যা আমার কাছে অতিশয় দুর্বোধ্য। একজন অক্ষমের আত্মহত্যার কোনো প্রতিনিধিমূলক মূল্য নাই কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মহত্যার পরিকল্পনা করে, তার আত্মার অবস্থা থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যন্ত বিবেচনা করলে যে মুহূর্তটিতে সে ওই কাজটি সম্পন্ন করে, সেটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। প্রত্যেকটি বস্তুরই প্রকৃত চেহারা আমি জানি না, কোনোরকম মানব-অবস্থা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাও নাই। এই পৃথিবীর কোনো কিছুই আমার নয়, আমার ভিতরে কিছুই প্রবেশ করে না। বেঁচে থেকে আমি ভয়াবহভাবে কষ্ট পাচ্ছি। আমি অস্তিত্বের কোনো অবস্থাতেই পৌঁছতে পারিনি। এবং নিশ্চিতভাবেই অনেক আগে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাকে আত্মহত্যা করানো হয়েছে। যে আত্মহত্যা অস্তিত্বের মূলবিন্দু থেকে এক দূরবর্তী অবস্থা,—যা আসলে আমাদেরকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে যায় না, বরং ফিরিয়ে নিয়ে আসে অস্তিত্বের দৃষ্টি সীমার মধ্যে—সেই হতো একমাত্র আত্মহত্যা, যার কিছু অর্থ আমার কাছে আছে। মৃত্যুর জন্য কোনো ক্ষুধা আমি বোধ করি না। আমার একমাত্র ক্ষুধা যেন আমি কখনই নপুংসকতার, অস্বীকৃতির, পরিত্যাগের ভোঁতা সম্পর্কগুলির আবর্জনা যা আঁতোয়া আর্তোর সচেতন সত্তা গঠন করে বা তার চাইতেও দুর্বল, তাতে পরিণত না হই বা তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত না হই। এই যাযাবর বিকলাঙ্গ সচেতন সত্তা, যার ছায়াটিকে সে অনেকবার সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছে, তার উপর সে অনেক আগেই থুথু দিয়েছে। এই যে সত্তা ক্রাচের

উপর খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলে যা প্রকৃতই এক অসম্ভব সত্তা, তাও এই বাস্তবতারই এক অংশ আর কেউ তার মতো নিজের দুর্বলতাকে অনুভব করতে পারেনি, কিন্তু তার দুর্বলতাই সমস্ত মানবজাতীর অতি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা। ধ্বংস হয়ে যাওয়াই তো অস্তিত্বহীনতা।

সাধারণ নিরাপত্তা...(অংশ)

দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা বর্তমান।

সরকারি চিকিৎসাপদ্ধতি মনে করে মরফিনের চেয়ে প্লেগ শ্রেয়, জীবনের চেয়ে নরক শ্রেয়। এবং এখানেই কিছু কিছু কদর্য পণ্ডিতের নোংরা হাত বেরিয়ে যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিয়ে নেয়—

: সর্বসাধারণের মঙ্গলই তাদের উদ্দেশ্য!

যে তুমি মরীয়া, যে তুমি শরীরে আত্মায় নির্যাতিত, রক্তাক্ত, যার কোনো আশা নেই, তুমি নিজেকে খুন করো। এই পৃথিবীতে তোমার আর কোনো উদ্ধার—আশ্রয় নাই। তোমার কবরের উপরই পৃথিবী টিকে থাকবে।

যে তুমি কমনীয় উন্মাদ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত, ক্যানসার আক্রান্ত, ক্রণিক মেনিনজাইটিস আক্রান্ত—পৃথিবীতে তোমাকে কেউ বুঝতে পারবে না, এবং আমার মতে এই ব্যাপারটাই তোমাকে রক্ষা করে, তোমাকে রাজসিক, খাঁটি এবং অনন্যসাধারণ করে মর্যাদা দেয়।

তুমি জীবনের বাইরে এবং জীবনের উর্ধে। তোমার এমন তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে যা সাধারণ মানুষ জানে না। তুমি সাধারণের সীমা অতিক্রম করো তাই মানুষ তোমার বিরুদ্ধে—তুমি তাদের তুচ্ছশান্তিকে বিষাক্ত করো, তুমি তাদের স্থৈর্য শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করো! তোমার রয়েছে অকল্পনীয় ও নিরাময়ের অযোগ্য যন্ত্রণা, যার সার সারার্থ হলো যে তারা মানুষের জ্ঞাত যে কোনো অবস্থার সঙ্গেই খাপ খাওয়াতে অপারগ, কোনো ভাষাতেই এই যন্ত্রণাকে প্রকাশ করা যায় না। বারংবার তুমি এই শেষহীন যন্ত্রণায় আক্রান্ত, এই যন্ত্রণা চিন্তার অতীত এবং অমর ও অপরিবর্তনীয়—যন্ত্রণা শুধু শরীরের নয় বা নয় শুধু আত্মার—উভয়ের। আর আমি, আমি তোমাদের অসুস্থতায় অংশ গ্রহণ করেছি, আর বলি, এই যন্ত্রণা উপশমকারী ঔষধের মাত্রা ঠিক করার দুঃসাহস কার আছে? তারা কী আমাদের চিনতে পারে, যারা দৈব-আলোকের নামে সবকিছু করি, চিনতে পারে এক আত্মা যেমন যেমন আরেক আত্মাকে চেনে, আমরা যারা সমস্ত জ্ঞান, স্বচ্ছদৃষ্টির মূলে প্রবেশ করেছি, চিনতে পারে তাদের? আর এইজন্যই তো আমরা যন্ত্রণা পেতেও চাই। যন্ত্রণা আমাদের আত্মার গভীর অন্তরে যাত্রা করায়, যেখানে আমরা খুঁজে পেতে চাই এক শান্তির অঞ্চল, চাই এক অপরাধমূলক জগতে স্থিরতা—যেখানে অন্যেরা তথকথিত মঙ্গলের মধ্যে এসব খুঁজে মরে। আমরা উন্মাদ নই, আমরা অনন্যসাধারণ চিকিৎসক ; আত্মার জন্য অনুভূতির জন্য, চিন্তার জন্য প্রয়োজনীয় ডোজ কতটা তা জানি। আমরা চাই না আমাদের শান্তি বিঘ্নিত হোক, যে অসুস্থ সে শান্তিতে থাকতে চায় আমরা মানুষদের কাছে কিছুই চাই না শুধু রোগের উপশম চাই। আমরা বেশ ভালোভাবেই আমাদের জীবনের মূল্যমান যাচাই করে দেখেছি, অন্যদের, বিশেষ করে নিজেদের মুখোমুখী এই জীবনে কতটা বাধা রয়েছে তাও জানি। আমরা জানি, কোন ইচ্ছাকৃত স্থূলতা. কোন আত্মঅস্বীকারের প্রবৃত্তি, সুস্থ চিন্তার কোন অসারতা রোগ প্রতিদিন আমাদের তাড়না করে চলেছে। আমরা সরাসরি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করছি না এখনই—ততক্ষণ অন্তত আমাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক।

শৈলেশ্বর ঘোষ

আত্মখাদক

এক ভিক্ষুক ভিক্ষাপাত্র সামনে বসে আছে, এক এক করে পরীক্ষা করে দেখছে প্রতিটি মানুষের মুখ এবং চোখ দেখে সে বুঝতে পারে অলীক ভালোবাসা তার থেকে কতটা দূরে কে কে তার ভিক্ষাপাত্র ছিটকে দেয় পা দিয়ে, তারা তো ভালোবাসে বাবুদের এবং ভিক্ষুকের মুখের দিকে তাকাতে ভয় পায়—জানে সে ঘৃণা বা অবহেলা নয় সুস্পষ্ট পরিচয় বর্জন করার পর এই ফিরে যাওয়া, সন্ধেবেলা সন্তানতুল্য শিশুটিকে খাদ্যসমেত জানাবে ভালোবাসা, প্রতিশোধপরায়ণ হাত দিয়ে তুলে দেবে এই উত্তরাধিকার—বাবুদের দৃঢ়তা ও আত্মস্থ হয়ে বসার সুযোগ চাই আমরাও যদি হই অপরাধী তবে এই জেলখানায় বসেও স্বপ্ন দেখে যাব, যদি পাপবিদ্ধ বুকে ইন্দ্রিয় না জাগে, যদি সংবেদনশীল যৌনাঙ্গের প্রতি নপুংসকতার শাপ বর্ষিত হয়—অতিপ্রাকৃত শরীর কৃতজ্ঞতার কোনো চিহ্ন পৃথিবীতে রেখে যাবে না, অন্ধ যে দেখে হাতে, অন্য যে দেখে পায়ে, অন্ধের তো বিলুপ্তি নাই, কেন্দ্রিয় চরিত্র আমরা কেন্দ্রবিচ্যুত বলেই খাদ্যে অধিকার নাই আছে ছোট্ট কথা, অর্থহীন গান অনুশোচনা ও পরিতাপ, পরিতৃপ্ত হবার জন্য চাই হৃদয়রহস্যের পুনরাবিষ্কার, আমরা দেখি হৃদয়হীন অনুষ্ঠানে ক্রোধ ও বেদনার জগতে সস্তায় মানুষ ও মেয়েরা বিক্রি হবার জন্য দাঁড়ায় অন্ধকারে, শরীরের গন্ধ ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে চলে আর সেইসব ছেলেরা ঘুম থেকে জেগে উঠে হঠাৎ স্বপ্নবশত ভালোবেসে ফেলে মাটির এই পৃথিবীকে, ক্ষুধা ও কামনায় আমাদের রোমাঞ্চনা লোমকূপে ভেসে থাকে, কেবল স্তব্ধতা অবহিত হবার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়ব হাতে টাকা কাঁধে বন্দুক হৃদয়ে হল্লা ও বুকে ঘৃণা নিয়ে, মাতৃশরীর ক্রমাগত শিশুকেই প্রশ্ন ক'রে, "বল তবে তুই আমাকেই ভালোবাসিস।" ভিক্ষুক হিসাবে বলি, 'যদি পেলে, কিন্তু কী করবে তুমি ভালোবাসা দিয়ে' ভিখারির ভিক্ষাপাত্র জানতে চায়, চাইবে চিরকাল, 'ভালোবাসা চাইলে তোরাও ভিখারি হয়ে যাবি, স্ত্রী-পুরুষ বা শিশু, আত্মখাদকরূপে তোদের পিপাসা শূন্য এই ভিক্ষাপাত্রের মতো মুখের সামনে নাচতে থাকবে, অথবা ক্রমে সে নিজেই শূন্য হয়ে মুখব্যাদান করবে ক্ষুধা ও ক্ষুধার্তকে।

সেন্ট্রাল জেল

বাস্তব থেকে সেই স্বপ্নে এই ঘর—চিরসত্যের পাশাপাশি সেন্ট্রাল জেল মাকড়সা ও টিকটিকির আনাগোনা, এক শতাব্দীর পুরানো পেচ্ছাপখানার দেয়ালে লক্ষ আরশোলা, দেয়াল টপকে যাবজ্জীবনের কয়েদি পালিয়ে যাবার কাহিনি আমাদের মুখে মুখে, এখানে এই ঘরে আজ আমি

জন্মান্তরের ঐশ্বর্য ভাগ করে নেবো—দস্যুগণ প্রিয়গণ পণ্যলোভী নাশকের দল নির্নিমেষ স্মৃতি আমাদের গোপন পথ, তবে যারা সামান্য অপরাধী তাদের পায়ে একটি শিকল থাকলেও পরাও আর একটি, এবং এই স্বাধীনতার রাত্রি আতর গন্ধ বাবুদের টেনে আনে শহরের গোপন গলিতে, আমরা তো নয় সুখের ভিখারি, বেঁচে থাকার ভাষাহীন মুহূর্তে আত্মকুহর ফেটে যাক নৈঃশব্দে সরঞ্জাম ফেলে দিয়ে একটি স্ত্রীলোক ও দুটি পুরুষ আয়নায় নিজেদের উলঙ্গ চোরা মূর্তি দেখি ও ভাবি 'মনে করতে পারি না আমরা কে কার পায়ে দিয়েছি শেকল'—যৌনচারণের পরেই মনে হয় নিঃস্ব নই বলেই কোনোদিন আত্মদান করতে পারব না, তবু আছো যারা যৌনাচারী, আশ্রয়প্রার্থী খরিদদার ছুরিকা যাদের মুঠিতে মানিয়েছে ভালো আত্মরক্ষায় ও আত্মবেদনায়—কেবল তোমাদেরই চোয়ালের হাড় সৌরমুখমণ্ডলে জেগে থাকবে, এই ঘরে যারা রাত্রে গোপনে শুতে আসে তারাও বিচলিত হবে না, অন্ধকারে ভাগ বাটোয়ারা সেরে নিই আমরা, গর্ভিনীর জরায়ুর মতো বেড়ে উঠছে অন্ধকার আমাদের ভালোবাসার টানে চুম্বনে টাকা-পয়সার রণরণিতে, রোমাঞ্চকর গৃহ্যদ্বারে বুকভরা স্ত্রীলোকের গ্রাসে, আনন্দের মধ্যেও থাকবে দুঃখের আনন্দ সজ্ঞানে খুনীকে হৃদয়ের কাছে দেখার আনন্দ, আমাদের অপরাধের গোপন কাহিনি একদিন ভালোবাসা হিসাবেই গৃহিত হবে—বুকখোলা পাৎলুনে নিষিদ্ধ সীমানা ডিঙানো, ভুখ মিছিলের অংশীরা সকলেই তো মিছিলে আসেনি, দুঃস্বপ্ন নগরীর দেয়ালে দেয়ালে হেলান উদ্বাস্তু শিশু, কখন সূর্য অস্ত যায় ওগো তোমাদের এই দেশে, কখন তোমরা পরচুলা পরো, কখন তোমাদের পেছনের চরটি শব্দহীনতা দিয়েই সাবধান করে দেয় তোমাকে, তবু আমাদের চোখে পড়ে সৌন্দর্য নষ্ট হয় কুকুরের মূত্রপাতে—কেন্দ্রিয় আঙুলে চিহ্নিত হয়ে যাবার পর আমরাই তো হয়ে যাবো তথাকথিত, ভিক্ষাপাত্র কারও হাতে, ভিক্ষা দেবার ৫ পয়সা কারও হাতে—আমরা দুরাচারী ও বশীভূত শয়তানের খেলায় ঈশ্বরের মতোই খুশি, জানি জানি হে আমাদের রূপ ও রূপা জগতের দেবতাগণ প্রেমের এই পাপ সহ্য কর না।

যাঁড় একনায়করূপে আমরা তোমাদের মুখোমুখি হই কিন্তু দুষ্কৃতিকারী মহারাজ! শাস্তি পাবে না তুমি আমাদের প্রত্যঙ্গহীনতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না তোমাকে? বলতে হবে না অন্ধকারে ফুল কেন ফোটে না, জল কেন আর আগুনেরর বিরুদ্ধাচারণ করে না, নৈশ অভিযানে স্পষ্ট বুঝেছি ভিক্ষুকও তোমার বেশ্যাও তোমার চোরও তোমার পুলিশও তোমার, জীবনে ও মরণে আস্তিক ও নাস্তিক অনুভূতি, আছে ঈশ্বর—আছে চাক্ষুষ ভ্রান্তি, আছে আবির্ভূত-কল্পনা, নিমজ্জিত পিপাসা তড়িতাহত আসক্তি—সছিদ্র ও সচিত্র জীবনে তাই ভালোবাসার দরকার হয়েছিল সবচেয়ে বেশি—তবু প্রত্যাখ্যাত হয়েই চেয়েছি চুম্বন চিৎকার করে চেয়েছি আর এক রাত্রির আশ্রয় অন্তর্নিহিত হাজতখানা-পায়খানার গন্ধে পূর্ণ শোবার ঘর এই তো সময় কয়েদিকে দিয়ে যেমন খুশি বিবৃতি লিখিয়ে নাও,—ভবিষ্যৎ সে তো কেবলই যৌনবিলাস, স্বপ্নে আমাদের মাংসে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাদক, চাই অর্থপূর্ণ শেকল বারবনিতার শুদ্ধতা শরীর এবং সেই ঘর যেখানে সবার সামনে মাতাল হয়ে ঢুকে বলব, নে তবে দুঃখ তোর, জীবনব্যাপী ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের হা অন্ন হা অশ্রু ভয়ে প্রসারিত অন্তরাত্মার অবৈধ আনন্দ, স্ত্রীলোকের পাশে শুয়েও স্বমেহন করে আত্মসংলগ্ন থাকা, তাই মনে হয় মাতৃগর্ভে যে খুন হয়ে গেল তার চেয়ে হয়তো একটু বেশি ভাগ্যবান ছিল পুলিশের গুলিতে নিহত কোনো এক সরল বাউরি।

বুক থেকে মাথায়

নিষিদ্ধ এলাকায় কার এ মুখ ঘৃণায় প্রত্যক্ষ
ভালোবাসায় মৃত, ৩৫ বছরে যে শৈত্য নিয়েছে
শরীর আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, এখানে
জন্মমুহূর্তে নিজের ছায়াকে প্রশ্ন করেছিলাম 'কী
তোর নাম?' তোমরা যাকে বলো হাসপাতালে সে
আজ মরে গেল, আসলে সে মরেনি এক
অন্তরাল বেছে নিয়েছে কারণ যে ঝুলে
পড়েছিল সিলিং থেকে সে আশা করে
মুখমণ্ডলের পরিবর্তন দেখে সকলেই বলবে,
'শালাকে যতটা ভালোমানুষ ভাবা গিয়েছিল
আসলে ব্যাটা তা নয়'—এ মুখ তবে কার?
আত্মসেবিকা, তোমাদের গৃহস্থালিতে দাঁতালো
হাসিতে গণিকার স্বাধীনতায় প্রাপক হাতে
স্বপ্নহীন উরুতে বুকে—একটা চামচিকে ওড়ে
মাথার উপর, ঝুলে পড়া দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে
ছোটাছুটি করে ইঁদুর, পিঠের লোম চেটে খায়
আরশোলা, নাক ও কান দিয়ে বেরিয়ে আসা
রক্ত দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে, এ আর কোনো
শব্দ করতে পারবে না, শ্মশানে ভগবানের নাম
শুনে চমকে উঠবে তোমরা, ভয়ে উবু হয়ে
পেচ্ছাপ করতে বসবে শেয়ার বাজারের দালাল
পুত্র, জরা নাও তুমি, দীর্ঘ জীবন দাও এই প্রার্থনা,
জন্মদেবার কষ্ট ভুলে যাবার আগে মা বলে, পেটেই যে
মারিনি তোকে কৃতজ্ঞ থাকিস সেজন্য চিরকাল,
কৃতজ্ঞতা থাকে বলেই হৃদয় পিচ্ছিল হয়ে ওঠে
মেয়ে মানুষের মুখ দেখে এবং বাইরে
থেকে মরণশীল শব্দগুলি ছুটে এসে নষ্ট
করে দিয়ে যায় ঘুম, গাঁয়ের গরীব চাষা
মূলধন হিসাবে জুটিয়ে নেয় একটি ক্ষুধার্ত শিশু
একটি একটি পয়সা চেয়ে নেয় সকলের কাছে
শিশুটির বাবাও একটু দূরে বসে থেকে বিড়ি টানে,
কাজ শেষ হলে শিশু ও তার ভাড়া নিয়ে
যাবে—এরপর বাবুদের চেয়েও দ্রুত তারা
হজম করে নেবে ভাগের কড়ি এবং হজম শক্তি
ভালো বলে সকালবেলা হাত দিয়ে বুঝে নেবে
নিজেকার স্বচ্ছ মুখ, এইভাবে নিষিদ্ধ শহরে

জেগে থাকে চাঁদ, বেশ্যাপল্লীর ছোটো মেয়েটি
অপেক্ষা করে কখন তার মায়ের আরেক প্রকার
ভালোবাসার সময় হবে—পাশের বাড়ির
দাসীরা জানতে চায়, 'এত বড়ো ঘটনার পরেও
কান্নাকাটি নাই কেন?'—এ সময় ফাঁকা রাস্তায়
দাঁড়িয়ে স্পর্শ করি বুক, সচেতনভাবেই
সে কুঁচকে ছোটো হয়ে যায়, চলমান ব্যথা
বুক থেকে ছাড়া পেয়ে কেবলই মাথায় যেতে উৎসুক!

রক্তচিহ্ন

এই যে জীবন আমাদের কখনো হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রবাহিত কখনো শরীর থেকে শরীরে কখনো ভালোবাসা চায় স্ত্রীলোকের মতো কখনো শিশুর মতো রাত ১২টায় যখন আমরা ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, অবগুণ্ঠিত শরীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চোখ নিপীড়ন শ্রুতি এই যে রাস্তার পাশে আমরা পড়ে আছি আমরা যে মিছিলে অন্তরীণ নই বা আমরা যে লঙরখানার সেবক নই, বেঁচে থাকা আজ আমাদের বড়ো দীর্ঘ মনে হয় ; না, ঈশ্বর তোর নাম করে আমরা আজ আর ভীত নই, বা যার যার প্রতি রূঢ় হয়েছি তার তার কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেবো না, এ হলো প্রকৃতির লোহিত ঋতু—কোনো পায়ের শব্দই তত স্পষ্ট নয় বা ধাতুমাখা নয়—শব্দকে বেছে নিয়ে শব্দহীনতাকে বর্জন করেছি আমরা, এই প্রলাপ শুনে পাথরের বিগ্রহ তোরাও চমকে উঠবি আলয়ে ও জঙ্গলে, অসময়ে পরস্পরের উরুর মধ্যে হাত দিয়েছি আমরা, ভয় হয় সন্তানের মুখ দেখে, মনে পড়ে না আর কী খেলা বাকি থাকে তার সঙ্গে, সামনে আমাদের আর কী আছে? কুয়াশাচ্ছন্ন এই শহরে কুষ্ঠরোগীর গান ও মেয়েদের শীৎকার, আশ্রয় প্রার্থীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সারারাত জেগে থাকার চেষ্টা—এই যে খ্রিস্টের প্রেম নিয়ে বড়োদিন এলো আকাশের পাখি তা জানতে পারে না, এই যে নির্বাণ নিয়ে বুদ্ধের আলোক—পশু তুমি তা জানতে পারো না, এই যে ক্ষুধায় জেগে ওঠে ইন্দ্রিয়পরায়ণ আত্মা আমাদের, ভালোবাসা করি মানুষ ও মানুষী, টাকা দিয়ে ও নিখরচায়, নূতন ভিখারি দেখে পুরানো ভিখারির ভয়, সাধু যে সাধুকেই সন্দেহ করে, এসো আমরা এই তামাসাকে সমাচ্ছন্ন করি—পরাজয়ের গ্লানি ছাড়া আমাদের পাওয়ার কিছু নাই, অন্তত এইটুকু বিশৃঙ্খল করি, বড়োলোকের খাবার সময় খাদ্য চেয়ে বাইরে থেকে কেঁদে উঠি, ভরহীন পা দুখানিকে এখন কত বিধ্বস্ত মনে হয়—অলিতে ও গলিতে এইসব অসার্থক ঘোরাঘুরি, অর্থ থেকে আসা অর্থহীনতায়, অভীপ্সা ও উপাচারে কণ্ঠরোধ হবার পর এখানে যে ভালোবাসা আমাদের তার শুধু রক্তচিহ্নই পড়ে থাকবে!

স্বপ্নসূচি

আমি এক পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবীতে ঘুরে
বেড়াই যেখানে আকাশের রয়েছে ভার, আলোর
নৈরাজ্য, ভালোবাসা রক্তের চেয়েও অন্ধকার, গোধূলি
বেলায় জেগে ওঠে ভয়ার্ত প্রাণ, শোণিত কামনা শেষ
হলে তবে করুণ হৃদয় বলে ওঠে, 'দাও জল, জল দাও'
এখানে সেখানে যে বেদনা পাবো বলে আশা করি
মদির ঈশ্বর তাও প্রত্যাখ্যান করে, আদেশ করে
শক্ত হও এবং নরম মাংস হলে খাঁচার ফাঁক দিয়ে
বেরিয়ে এসো—বঞ্চনা সীমাবদ্ধ, আর রুক্ষ এই
কারাগারে কান্নাও শোভা পায় না, নিজের
মলমূত্র কল্পনা ও স্বপ্নসূচি নিয়ে সুখী হও!

উপসংহার

পাঠকগণ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভোটদাতাগণ, **স্বাধীন কবি লেখকগণ, গণতন্ত্রের জোঁয়ালবাহীগণ,**—এই কটি লেখার পর মনে হচ্ছে *একটি উপসংহার* দরকার, কারণ আপনারা সব কিছুরই উপসংহার দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছেন, আপনারা মনে করেন সবকিছুই *শুরু হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে, যেভাবে* পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে ও *ভাঙ্গে রোজ* সকালে খবরের কাগজে বেশ কিছু খুন রাহাজানি, ধর্ষণ, পুলিশ, মন্ত্রী, সোনার দর, রবীন্দ্রনাথের খবর পড়তে পড়তেই মনে পড়ে দাঁড়ি কামিয়ে *এক্ষুনি অফিসে ছুটতে হবে* আপনারা ট্রাফিক পুলিশের হাত ছাড়া জীবনে আর কিছু দেখতে পাননি, সকাল ৯টার সাইরেন ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনতে পান না আপনাদের *কোনো দুঃস্বপ্ন* নাই ঘামতেল মাখা মুখ আপনাদের, **সহানুভূতি আছে আপনাদের, —আপনাদের জীবনে কোনো ছিদ্র নাই নিজেদের কৃত্রিম** ছবিটি ছাড়া জীবনে আর কোনো চিত্র নাই, বেশতো যদি সময় পান কোনোদিন *এসব কিছু না বুঝলেও অন্তত* এই অভিযোগগুলির উত্তর দেবেন, যদি পারেন, কিন্তু আমি ভালোভাবেই জানি, আপনারা *তা পারবেন না*, পারবেন না তারও কারণ খুব সোজা **যখন প্রকৃত ঘটনাগুলি ঘটে** (অফিস আওয়ারে তা অবশ্যই ঘটে না) **তখন আপনারা ঘুমান বা বউয়ের সঙ্গে সহবাস করেন** সহবাস করার স্বাস্থ্যসম্মত সময় ও নিয়ম দুই-ই আপনারা সবচেয়ে ভালো শিখেছেন **বা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের কথা ভাবেন বা ছেলে মেয়ের নৈতিক স্বাস্থ্য** রক্ষার কথা চিন্তা করেন, যাক এই তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, লাভ নাই কারণ **অনেকদিন থেকেই তো এসব শুনে যাচ্ছেন,** কীটনাশক স্প্রের মতো এগুলি ছড়ানো হচ্ছে আপনাদের উপর, ফলে এই বিষ সহ্য হয়ে গেছে, মরবেন না, একটু যন্ত্রণা হলেও ভাববেন, একশ্রেণির অপদার্থ, অক্ষমের উক্তি এগুলি : সুতরাং এসব অভিযোগ নয়—আপনাদের অভিযুক্ত করার মতো সময় এখন আর আমাদেরও নাই। তাই এই উপসংহার, নিশ্চয়ই উপসংহারটিকে চিনতে পাচ্ছেন, সেতো শেখাই আছে, জীবনের উপসংহার কী দেখেন নি? **মৃতপ্রায় দরিদ্রকে, ভিক্ষুককে ভিক্ষাপাত্র হাতে, আকাঙ্ক্ষাশূন্য বেশ্যাকে, সর্বহারা কবিকে,**

গুলিবিদ্ধ বিপ্লবীকে—দেখেননি খরার সময় যারা জল চেয়ে মরে, ফ্যান চেয়ে মরে, আপনাদের সেবা নিতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ন্যাংটো পিলে মোটা শিশু *এরা চিরকালই পার্লামেন্টের অধিবেশন কক্ষের* **বাইরে ঘোরাফেরা করে ও অলক্ষে ছায়ার মতো মিলিয়ে যায়, এরাই উপসংহার, জানি আপনি সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেছেন, এটুকু জানার পর কী করবেন? সাবধান, উপসংহারে ঢোকা মানেই মৃত্যু!**

সিলিনের শেষ ইন্টারভিউ

[সিলিনের প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার মধ্যে পোশাকি/ইন্টেলেকচুয়াল কোনো ব্যাপার নেই, জীবনের পরিণত বছরগুলি সিলিন বিরোধী প্রতিষ্ঠানের নির্মম পাশাচালাচালির মধ্যে কাটিয়ে গেছেন—দেশী-বিদেশী কারাগার, ছেদহীন দারিদ্র, মিডিওকার ফরাসি সাহিত্যের আধুনিক দলপতি ও দালালদের (এঁদের মধ্যে সার্ত্রর, ম্যারিয়াক এবং লুই আরাগঁও রয়েছেন) অমানবিক বিরুদ্ধাচারণ ও ঘৃণা—সিলিন জীবনের শেষ দিন অব্দি ঠান্ডামাথায় অতিশয় জাগ্রত সেন্সিবিলিটি নিয়ে এই জটিল নাটকে নানাভাবে অংশ গ্রহণ করে গেছেন। —প্রদীপ চৌধুরী]

প্রশ্ন : আপনার উপন্যাসগুলিতে প্রেমের কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে কি?

সি : কোনো স্থানই নেই। থাকা উচিত নয়। উপন্যাসকারের লজ্জাবোধ থাকা উচিত।

প্রশ্ন : আপনি তাহলে আরও কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি সম্পর্কে কথা বলার পক্ষপাতী?

সি : চলুন কাজের কথায় আসা যাক, লেখালেখির কথা। সত্যি সত্যি গণ্য করার মতো এটাই একমাত্র ব্যাপার। এমনকি এটাও আমাদের যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান দাবি করে! এ বিষয়ে কোনো কিছু বলতে গেলে অতিরিক্ত প্রচার-এর প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা হয়ে পড়েছি প্রচারের বিষয়বস্তু। এখন প্রকৃতই সময় হয়েছে রোগ নিরাময়ের জন্য মানুষ বিনীত হতে শিখবে। সবকিছুর মতো সাহিত্যেও আমরা প্রচারধর্ষিত হয়ে নষ্ট হচ্ছি। এটা অপমানজনক। আমি বলি : নিজের কাজ করো এবং চুপ করে থাকো, এটাই একমাত্র পথ। মানুষ তা পড়বে কী পড়বে না সেটা তাদের ব্যাপার। লোকচক্ষু থেকে পালিয়ে থাকাই লেখকের একমাত্র কাজ।

প্রশ্ন : লিখে আনন্দ পান, আপনি কি সেজন্য লেখেন?

সি : না, নিশ্চয়ই না। যদি আমার পয়সাকড়ি থাকত তাহলে আমি একটা শব্দও লিখতাম না। আমার মূল নিয়ম এটাই।

প্রশ্ন : ভালোবাসা বা ঘৃণা নিশ্চয়ই আপনার লেখার কারণ নয়?

সি : অবশ্যই না! ওইসব ভাবপ্রবণতায় জড়িয়ে পড়া না পড়া সেটা আমার ব্যাপার, জনগণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : সমসাময়িকদের সম্পর্কে আপনার তো কৌতূহল রয়েছে?

সি : আ, না, কোনো কৌতূহলই নেই। একদিন আমার আগ্রহ ছিল ওদের সম্পর্কে, আমি ওদের যুদ্ধ থেকে বিরত করতে চেয়েছিলাম। এটা সত্যি, যুদ্ধ এরা করেনি, কিন্তু ওরা ফিরে এলো জয়গর্বে আচ্ছন্ন হয়ে। এবং তারপর তারা আমাকে ছুঁড়ে দিল

নর্দমার পাশে। নিজের ব্যাপারেই মনোযোগী হওয়া দরকার ছিল আমার।

প্রশ্ন : আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে আপনার সর্বশেষ বইগুলি আপনার গোপন জীবনের কিছুই প্রকাশ করে না?

সি : গোপন জীবন? না এক্কেবারে না। হয়তো একটা ব্যাপার, এবং মাত্র একটাই, তা হলো এই যে আমি জীবনকে উপভোগ করতে জানি না। আমি বেঁচে নেই। এই চেতনা, অবিরল যা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে, আমাকে তাদের চেয়ে বেশ খানিকটা উপরে ভাবতে সাহায্য করে। আপনার তা অস্বীকার করার উপায় নেই কারণ তারা জীবন উপভোগ করে যাচ্ছে। জীবন উপভোগ করা মানে হচ্ছে খাওয়া, মদ গেলা, ঢেকুর তোলা, চোদা, অর্থাৎ সেইসব ব্যাপার যা মানুষকে শৃঙ্খলাহীন পিণ্ডে পরিণত করে। আমি ভাগ্যবান কারণ আমি এই লাম্পট্যে যাইনি। কী করে মাল চিনতে হয় আমি জানি, কিন্তু যেরকম একজন রোমান বলেছিল, বেশ্যাবাড়িতে যাওয়াই লাম্পট্য নয় নয় সেখান থেকে ফিরে আসা। জীবনভর আমার বেশ্যাখানায় গতায়াত, কিন্তু আমি ঠিক বেরিয়ে এসেছি। আমি মদ খাই না, খাদ্যখাবারের ব্যাপারে সেরকম উৎসাহী নই। সেসব জিনিস আমাকে বিরক্ত করে। আমার অধিকার এটা, কী বলেন? কেবল একটাই বাসনা আমার। আমি ঘুমুতে চাই, আমি একা থাকতে চাই—যা সত্যি হয়ে উঠছে না।

প্রশ্ন : আপনাকে ওসব জিনিস থেকে বিযুক্ত মনে হচ্ছে। এবং তথাপি শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ লোক আপনিই।

সি : হ্যাঁ, কিন্তু আর না তারা আমাকে প্রচুর ধর্ষণ করেছে। ঢের হয়েছে। আমি একা সময় দুঃখিত হতাম, কিন্তু আর নয়। এখন আমি উদাসীন, তারা আমাকে বিরক্ত করে।

প্রশ্ন : আপনি কি বলছেন আপনি একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন? ফিলসফিক্যাল? কনটেমচুয়াস?

সি : না, না, একেবারেই না। সে অনেক কথা। আমার শব্দকোষ সেসবে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নির্ভেজাল গু। কী করে টেবিল উলটাতে হয় আমি তা জানি। অন্যেরা জানে না।

প্রশ্ন : আপনি কি নিজেকে এখনও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক মনে করেন?

সি : না, মোটেই না। শ্রেষ্ঠ লেখক...বিশেষণে কী দরকার আমার? প্রথমত দরকার হেঁড়ে গলায় চেঁচানো। হেঁড়ে গলার চিৎকার শুনে ওরা শ্রেণিবদ্ধ করে। প্রথমে যা দরকার তা হলে মরে যাওয়া।

আ : আপনি কি বিশ্বাস করেন ভাবীকাল আপনার প্রতি সুবিচার করবে?

সি : বাঞ্চোৎ, না, আমি অবশ্যই তা মনে করি না। একদম না! কে জানে ফরাসি নামক দেশটাই থাকবে কিনা? হয়তো কোনো চীনাম্যান খুঁড়ে বের করবে আমাদের পুঁথি—সংগ্রহশালা, এবং তারা আমার নেশাধরানো সাহিত্যে, আমার লেখার অসাধারণ ভঙ্গী এবং আমার তিন ফুটকি (...) সম্পর্কে কোনো আগ্রহই দেখাবে না। এর জন্যে কোনো প্রতিভার দরকার হয় না। সাহিত্য বিষয়ে আমি বহু আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। 'ডেথ অন দ্য ইনস্টলমেন্ট প্ল্যান, এর পর আমার যা বলার সবই বলেছি, যা খুব বেশি ছিল না।

প্রশ্ন : আপনি জীবন ঘৃণা করেন।

সি : দেখুন আমি বলতে পারি না যে, একে আমি ভালোবাসি। না। আমি এর সঙ্গে মানিয়ে চলছি কারণ আমি জীবিত এবং আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তা নইলে আমি অনেকটাই নিরাশাবাদীদের দলে।

প্রশ্ন : আপনার দৃষ্টিভঙ্গি দেখছি একেবারে হতাশাপূর্ণ।

সি : কোথায়? একেবারেই তা নয়। হতাশা-ফতাশা আবার কী? এর দ্বারা এই বোঝায় যে আমি কোনোকিছু আশা করছি। আমি কিছুই প্রত্যাশা করি না। যদ্দুর সম্ভব কম কষ্টভোগ করে মরতে চাই আমি। আর সবাই-এর মতো। এইমাত্র। এবং আমি চাই কেউ যেন আমার জন্যে না ভোগে, আমার ব্যাপারে, অথবা আমার কাছাকাছি। কেবল নীরবে মরতে চাই আমি। যদি সম্ভব হয় মৃত্যু থ্রম্বোসিসে অথবা হয়তো আমি নিজেই শেষ করে দেবো আমাকে। সেটাই হবে সবচেয়ে সোজা। ক্রমশই ব্যাপার কর্কশ থেকে কর্কশতর হয়ে উঠছে। আগের তুলনায় আজ আমার পক্ষে কাজ করা অধিকতর কষ্টকর, আগামী বছর আরও কষ্টকর হবে এ-বছরের চাইতে। এই হচ্ছে গোটা ঘটনা।

সুবীর মুখোপাধ্যায়

বসন্তের প্রাথমিক ক্ষুর

অফুরন্ত আশ্বাসের ফিসফিসে গলায়
আমি তাকে বললাম
দ্যাখো, এটা একটা বাংলা ছুরি মাত্র
আর আজ উনিশশো পঁচাত্তর সাল
সত্তরের দশককে যারা
মুক্তির দশক ইত্যাদি ব'লে
আমি তাদের মধ্যে গণ্য হ'বার
যোগ্য পর্যন্ত নই,
আমি আজও চায়ে চার চামচ চিনি খাই
যে কোনো সন্দেহ প্রবণ সুখতলা
সতত বদলে ফেলি,
এটা একটা আদর্শের প্রশ্ন,
এই ছুরিটারও কোনো প্রতিহিংসাপরায়ণ
হাত পর্যন্ত এগোবার ক্ষমতা নেই,
ক্ষমতা নেই কোনো সান্ধ্যবাতাসে
গুঁড়ি মেরে হাঁটবার
এমনকি সেই ইচ্ছে পর্যন্ত নেই যে
একজন শহীদের সঙ্গী হ'য়ে
নরক কিংবা মূর্খের স্বর্গে পৌঁছবে,
নেহাৎই আপেল-টাপেল
অথবা সবুজ উড্-পেন্সিল অবধি, ব্যাস—

সে তবুও আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক্,
একজন সাচ্চা জাতীয়তাবাদীর
প্রবল সন্দেহ নিয়ে
ফিরে গেল
কোথায় গেল?
কবিদের স্বর্গ খালাসিটোলায়,

অথবা তার পড়ার টেবিলে
যেখানে 'মানুষ আমার ভাই—কৃষ্ণ কৃপালিনী' ইত্যাদি?
বড়ো আশঙ্কা হয় ওর জন্যে
আরও কত হাজারবার মশারির দড়ি
টাঙাতে হবে,
অনন্ত দাড়ি কামানের কথা ভেবে
একদিন ক্লান্ত কী হ'য়ে পড়বে না ও,
এছাড়া,
দুজন মানুষের মধ্যে
যে পাহাড় প্রমাণ দূরত্ব রয়েছে
তারই বা কী হবে!

নষ্টভূমি

এক

সেলুলয়েডের বুকে তুরপুন ও ঠাসা সমুদ্র স্নানের গল্পও ক্রমে পুরোনো হ'য়ে আসে বেদনা জলের দাগে ঢেকে যায় অধরা দুঃখের বীজ, সন্তাপ, শেওলার মতো টলে পড়া ত্রিপাদ ভূমির মতো পুরুষেরই দুর্ভাগ্যরেখার মতো যতকিছু ফেলে যাও তুমি, ক্রন্দন, পিঙ্গল পাসপোর্ট ছবি, তাও একদিন নিশ্চিত, নিশ্চিত—

ছিল শৃঙ্খল, (তোমার অসীমে প্রাণোমনো লয়ে) উনিশশো সাতষট্টির স্মৃতি, ন্যূনতম মৃত্যুর ছায়া তাকে ভেঙেছে শ্যামলেন্দু চকোলেট বোমায়?

বয়স রেখেছে তাকে হাতে হাত ধরে, বালি ও ঘাসের নীচে, অপেক্ষায়—
ওগো তুমি কিছু দিয়ে যাও।

দুই

ওগো তুমি, তুমি শিখে নাও জায়া ও জননীর যোগ্য প্রতিদান, আজ উগ্রী কী গম্ভীর, করতলগত সিগারেট ফেলে দিয়ে তুমি ওই ব্যাকুল ঝরনার কাছে যাও, কাতর নুড়িপাথরের পাশাপাশি হাঁটো

আহা তিরিশ বছর ধরে—
কেবলই কী জুতো ব্যবসায়ীদের
তুমি হয়েছো শিকার!

আমার শহর

আমার শহরের মাথার ওপরে একটা শানদার আকাশ
নীচে খোঁয়াড় আর চন্দনধূপের
মস্ত বিজ্ঞাপন সমেত রেডিয়ো,
গণতান্ত্রিক রেকর্ডমেশিন আর
প্রতিদিন ঘুম ভাঙার মুহূর্তে
ছত্রিশ রকমের
হাহাকার ভরা টাটকা অক্ষরের পাহাড়,
শিল্পের
সুঠাম
মাথা
হাতুড়ির মতো গুড়িয়ে দিয়ে
সারি সারি খরামিছিলের ভিড়।

আমার শহর
কারা যেন কেবলই খুঁড়ে যাচ্ছে
আর বোজাচ্ছে না কিছুতেই
কিছু বল্‌তে গেলে
আঙুল তুলে দেখাচ্ছে
'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহবার্তায়...,' এইসব।

মাকে হেমন্তের গান

আর তখন আমাদের শৈশবস্মৃতির ওপরে হঠাৎই ঝুঁকে পড়ত লম্বা টুপিওলা মানুষের ছায়া সতর্ক পায়ের, শব্দ মার্কাস অ্যাভেনিউর লম্বা অ্যাসফল্ট ভরে জেগে থাকত অনাদি মনিব ও কুকুরের ঐতিহাসিক সখ্যতার টান।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়তে লড়তে ক্লান্ত কী আমি আজ মা, শোক মিছিলের পেছনে আকাশ আজও তো তেমনি নীল কিন্নর আগুনও দহমান তত, আমার নিজস্ব ক্ষমতার দৌড় জানা নেই তাই কর্তুজ, বারুদ ও পোস্টকার্ড পাঠানো দূরত্বে রেখে যাচ্ছি কি তাকে, ওই চিরপুরাতন বীজ, হয়তো কোনো হঙ্কাই ছুঁতে পারবে না আর, হয়তো এতটা আশঙ্কারও কিছু নেই—

তবু কিছু কিছু বারান্দার নীচে আত্মনাশা লোকালয় গড়ে উঠছে, পারস্পরিক সংযোগসাধন বলতে আমরা কেবলি বুঝিয়ে যাচ্ছি আত্মসমর্পণ, নিজের চৌকাঠের বাইরে এলোপাথাড়ি বেরিয়ে পড়তে ভয় পাচ্ছি আমরা, গ্রীষ্মের দিনের সম্ভাবনা থেকে অনেক দূরে গজিয়ে উঠছে অদ্ভুত অদ্ভুত রাত আর বাথরুমের ঘসঘসে মেঝেয়

সন্তর্পণ হাঁটাচলার শব্দ, রহস্যযুদ্ধের চোরাচানের শব্দ, দুর্ভেদ্য ও জটিল বাতাসে আলগা হয়ে আসছে শেকড়ের মাটি আমাদের কলঙ্কলাঞ্ছন ছোটোমামা ফিরে আসছে না কিছুতেই

তুষার চৌধুরী

এপ্রিল, ১৯৭০

১৯৭০-এর এপ্রিল আমি বিমান সেবিকার
হাতের প্লাস্টিক থালা থেকে টফি তুলে নিই প্রথম
ভালোবাসা বিষয়ে কবিতা লেখা দরকার মনে হয়েছিল জরুরি ছাতা
নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম মনোরম ভূগোল নক্সার
ওপর পেট পুরে বাতাস খেয়ে আমার যৌবন ঝরে যায়
পাজামার বীর্যরসের মতো সর্বনাশের মানচিত্র নেই বরফের
দেশে ফিরে যায় অতিথিপাখিরা ওড়ে ও মুখ থুবড়ে
পরে এরোপ্লেন জ্বলে যায় বিমানসেবিকার পরচুলা শাড়ি
শায়া যৌনচুল এভাবে ক্রমশ পোড়ে স্তন মাংস হাড়
প্লাস্টিক থালা টফি পড়ে থাকে অ্যালুমিনিয়াম ছাই শুধু

লেবু মেশানো দিশি মদের মতো সন্ধেগুলো টকে যায়
মেয়েমানুষ ভালো নয় আমার পক্ষে লিঙ্গের অসুখ
সারাতে সবেধন আংটিও খরচ হয়ে যায়
বাঁচানো যাবে কি কিছুই গর্ভ খালাস করে
কুমারী যেমন সাহসী হয়ে পড়ে আমি চক্ষুলজ্জাবিহীন
ফেরেব্বাজ জোচ্চোর দু-নম্বর দালাল ও কবি
বন্ধুদের চমকে দিতে বাবার লিংগোত্থান বিষয়ে
কবিতা লিখে ফেলি বেশ্যা ঈশ্বর পুলিশ বিষয়ে
শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়েই চলেছে
কিছুই খোয়া যায়নি বিশ্বাস প্রেম প্রীতি মায়ামমতা
উপচিকীর্ষার আদাজল খেয়ে লেগে গেছি
রাজনৈতিক নেতার আমরণ অনশনের মতো খাঁটি
ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন চাই পুঁজিপাটার গায়ে
আঁচড়টি যেন না লাগে আত্মার রঙ গৈরিক হয়ে উঠুক।
সর্বোদয় সার্বিক বিপ্লবের মতো আমূল
মাখনের মতো উপাদেয় কিছু করণীয় রয়ে গেছে
আ. বা. পত্রিকার মতো নিঃস্বার্থ সেবাবৃত্তি

বারদুয়ারীতে বসে আছি আমি বোকার বেহদ্দ বাচাল
হাসিখুশি লিখে ফেলেছি কবিতা কেন কে জানে
বুকের বোতাম খুলে ফুসফুস ক্ষত দেখানো যাবে কি
প্যান্টের বোতাম খুলে দিলে পেচ্ছাপের ফোয়ারায়
গলে যায় ন্যাপথালিন বেসিনের নল দিয়ে
গোপনসুখ ও সিফিলিস ছড়িয়ে পড়ে কবিতা
লিখতে গিয়ে লিখে ফেলি কুকথা
দাবাড়ুর মতো বিচক্ষণ কখনো হতো না বালিকার
ননীঅঙ্গে আদর খেতে গিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছি আজ আমি
আমার হয়ে অলিঙ্গ স্বপ্ন ও মাদকতা চাই

এককোটি উঁইপোকার বিজবিজে চিন্তা ও চর্মকুষ্ঠ নিয়ে
দিন কাটাচ্ছি হে শূন্যের তেজস্ক্রিয়তানিরোধক চাঁদোয়া
ফুরসৎ আছে কেলোর কীর্তি করি খাই ও ডিগবাজি খাই
হে প্রতিপালক ভ্যান অ্যালেন বেল্ট
পুড়ে ছাই হতে দেবে না দমকল।

চাঁদের মাটিতে একদিন ট্রাক্টর মেসিনে
চাষ করবে গম নয়া নয়া উপনিবেশের
স্বপ্ন ঝেড়ে ফেলতে পারেনি মানুষ দু'একটা
নমপেন ও সায়গন যথেষ্ট নয়
ফোর্ড রকফেলারের ডিনার টেবিলে
মুর্দার কাফন যোগাতে সেবাধর্মে প্রতিষ্ঠানের গাড়ি
তৎপরভাবে ছুটে আসে মানুষ মরে গেলেও
মানুষের হাড় কত মুল্যবান সমুদ্র ডিঙিয়ে চলে যায়

টাকাকড়ির স্বপ্ন লুকিয়ে রেখেছি মাথার বালিশের তলায়
ঘুমের ভেতরও হাত কত সতর্কভাবে ঘোরাফেরা করে
কৌপীন পরে ঘুমোয় না কোনো যোগীও
যতটা সংগম করে মানুষ ততটাই ঝরে পড়ে তরল

বাসুদেব দাশগুপ্ত

বাবা

পরিতোষের স্কুল আজ ছুটি।

সকাল থেকে তার ছেলে পাবলো তাকে তাড়না করে—বাবা, বেড়াতে যাবে...চলো না...। শীতকাল। তখন বেলা বেশ চড়ে গেছে। তপ্ত রোদের মধ্যে পরিতোষ ছেলের হাত ধরে বেড়াতে যায়। সদর রাস্তায় পা দিতেই এক বোঁটকা গন্ধ নাকে লাগে। রাস্তার পাশেই ঝোপের মধ্যে কারা একটা মরা কুকুর ফেলে রেখে গেছে। তাকিয়ে দেখে আর একটা কুকুর সেই অর্ধগলিত শবের মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে পাবলোর নাক একহাতে চেপে দ্রুতপায়ে হাঁটে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সে জায়গাটা পার হয়ে যেতে চায়, তবুও বমি পায়। এঃ, গোটা ছুটির দিনটাই মাটি! দমকা হাওয়ায় এই বদগন্ধ আজ বাড়িময় ছড়াবে।

—বিশ্রী গন্ধ পাবলো, তাড়াতাড়ি হাঁট...।

—তি গন্ধ...?

—বিচ্ছিরি গন্ধ...তুমি পাচ্ছো না...?

—তৈ, নাতো?

আড়াই বছর বয়সের ছেলে পাবলো কোনো গন্ধ পায় না। সম্ভবত পচা গন্ধ কিংবা মিষ্টি সুবাস এ সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা ওর হয়নি। স্কুলে যাবার জন্য ওর মা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে, দূর থেকে হাসিমুখে হাত নাড়ে। কাছে গেলে বলে—দুষ্টু কোরো না কিন্তু, নিজে নিজে ঘুম করবে, ঠাম্মা দিদার কথা শুনবে...বুঝলে...আমি তোমার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে আসব...। পুকুর পাড় ধরে অমিয় বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে এগিয়ে আসে। কিছুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। শরীরের কত জায়গায় কতগুলি হাড় ভেঙেছে তা ঠিক পরিতোষ জানে না। তবে ট্যুইস্ট নাচের ভঙ্গিতে শরীর দোলালেই হাড়ে হাড় লেগে খটখট খটাখট অদ্ভুত সব শব্দ হয়। বাস আসে। পাবলোর মা বাসে উঠে পড়ে। পাবলো খানিকক্ষণ বাসের পেছনে তাকিয়ে দেখে, তারপর আবার পরিতোষের হাত টেনে বলে—চলো বাবা,...চলো না...। অর্থাৎ এগোও, আরও সামনে। সে বেড়াতে চায়। সামনেই নতুন কলি করা কমলালেবু রং-এর বাড়িটা নজরে আসে। কয়েক মাস আগেও বাড়িটার দেয়াল আলকাতরায় লেখা শ্লোগান-এ ভরা ছিল। এখন আবার বাড়িটার চেহারাই পালটে গিয়েছে। ভদ্রলোক বোধহয় ভেবেছেন, আপাতত কিছুদিন দেয়াল লিখনের উপদ্রব আর হবে না। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে পরিতোষের মজা লাগে। ঠিক শাদা ক্যানভাস একখানা, আবার নতুন আঁকিবুকি কাটার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়েই আছে সে। পাবলো আবার অধৈর্য হয়ে হাত টানে—এই বাবা, চলো না...। পরিতোষ ছেলের হাত ধরে এগোয়। বাতাসে দুর্গন্ধ আরও ছড়িয়ে পড়ে।

কখনো বিকেলে একা একা বাসরাস্তা ধরে সোজা হেঁটে যায়। লোকালয় ছাড়ালেই একটা ছোটো পোল, পোলের একপাশে রেলিং ধরে পরিতোষ দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে দিগন্তজোড়া মাঠ, এবড়োখেবড়ো জমিতে বড়ো বড়ো মাটির ডেলা, নীচে স্থির কালো জল। একটা সাপ নিথর হয়ে ভেসে থাকে। সমস্ত চরাচর এসময় পরিতোষকে লক্ষ করে বলে তার ঘাড় হেঁট হয়ে যায়। এই সৃষ্টির যোগ্য সে নয়, সে ব্যর্থ। এখনও সে কত দুর্বল, ভয়ঙ্কর এই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রকৃত সাহস খুঁজে পায় না—কত বড়ো নির্বোধ সে এখনও জীবনের বাহ্যিক পরিবর্তনের কথা ভাবে—কত বড়ো অহংকারী সে, এখনও মানুষ বা সমাজের উপকার করতে চায়। অহংকারকে সে তৃপ্ত করতে পারে না কখনো, একা একা শুধু হতাশায় মরে। মাঠের আলের পথ ধরে একটা ন্যাংটো ছেলে হেঁটে যায়। পরিতোষ সেদিকেই নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। পদ্মর হাত ধরে পরিতোব আলের পথ ধরে হেঁটে যায়, হাওয়ায় তার শাড়ির আঁচল ফুলে ওঠে, মুগ্ধ হবার মতো তার শরীরখানা পরিতোষ বার বার ফিরে ফিরে দেখে।—জানো, আমাদের পরিচিত একটি বেশ্যা ছিল...আমরা যেতাম মাঝে মাঝে আর কি...তারও নাম ছিল পদ্ম...নীরেনের সে আবার প্রেমিকা...ওপাড়ায় গেলে পদ্মর কাছে তার যাওয়া চাই-ই...আমাদের জোর করেই টেনে নিয়ে যেত...

পর্দা উঠে যেতে থাকে...স্বপ্নের মধ্য দিয়ে উৎসব-নগরীর কলকোলাহল ভেসে আসে। পরিতোষ সিগারেট ধরায়।—আচ্ছা, আমি ওদের মতো পারছি তো?...তোমায় আরাম দিতে পারছি তো...?—বিশ্বসুন্দরীদের মাপ আর তোমার মাপ প্রায় এক...। পরিতোষ ফিতে গুটিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তার মুখে হাসি।—এই, আলোটা নিভিয়ে দাও...। আঃ, আর একটু থাকো, তোমায় দেখি...। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রমথ জিজ্ঞেস করে—তারপর...চারবছর তো হয়ে গেল...পদ্ম কী এখনও তেমন সুন্দরী আছে...? পরিতোষ হাসে, কোনো জবাব দেয় না। বিয়ের পরে সকালে পরিতোষের ঘুম ভাঙত পদ্মর প্রগাঢ় চুম্বনে, টাটকা ভাঙা শাড়ির মাড়ের গন্ধ...পাউডারের গন্ধ...আমি স্কুলে যাচ্ছি বুঝলে...তাড়াতাড়ি ফিরবে...চোখ মেল...তাকাও কী ঘুম রে বাবা...আরও কত অস্ফুট কথা...কত সোহাগ...শেষ হলে আয়নার সামনে প্রসাধনের শেষ পর্বটুকু সেরে নেয়া...তারপর রিক্সা চলে যাবার আওয়াজ...। এখনও পদ্ম আদর করে—পরিতোষকে নয়, পাবলোকে—সাবধানে ছেলেকে চুমো খায় পাছে জেগে না যায়—আলতো করে ওর কপালে মাথায় হাত বুলায়—মান্টু সোনা...আমার সোনামনিটা...আমার বাবামনিটা...। পরিতোষ ছেলের পাশে চুপ করে শুয়ে থাকে, সব শোনে। কখনো পিটপিট করে তাকিয়ে দেখে দুজনকে। অবশেষে একদিন চিরাচরিত রসিকতাটা করেই ফ্যালে—এখন যে ছেলেই সব নিয়ে নিচ্ছে, বাবার জন্যে তো কিছুই রইল না।—আহা-হা, তুমিও তো আমাকে আদর করো না, পুরোনো হয়ে গেছি...তাই না? রাতে পদ্মর বুকে হাত দিয়ে কাছে টানতে গিয়ে পরিতোষ থমকে যায়। পদ্মর স্তনে পাবলোর লালা লেগে আছে। তার যাবতীয় উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গে কেমন মিইয়ে আসে।...আকাশে লাল শুকিয়ে কালো হয়ে এলে পরিতোষ বাড়ির পথ ধরে। ফেরার সময় নজরে পড়ে শ্মশান—মানে, ঘনসবুজের মধ্যে ইতস্তত কয়েকটি পোড়া কাঠ, ভাঙা হাঁড়ি ও কলসী। অন্যমনস্কভাবে অনেকটা দূর চলে আসার পর বাঁক ঘুরতেই বাড়িটা দেখা যায়। তার বাড়ি, তার সংসার, সেখানে তাকে স্নেহে, মায়ায়, মমতায় ভরিয়ে তোলার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার স্ত্রী তার সন্তান তার মাসিমা এবং মা।

—সকাল আটটায় লক্ষ্মীর আসা আমাদের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িতে সহ্য করত না...

—এই দীপু-উ-উ, ডালের বাটিটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে দিয়ে যা...
—একেবারেই অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে গেছি, নইলে ঝি ফি সব তুলে দিতাম...
—এখানে তো লক্ষ্মী আরামের চাকরি করে...
—আর কী বিচ্ছিরি কাজ! ...করে কী কোরে?...
—পাশের বাড়ির মাসি লক্ষ্মীকে কাল ডেকেছিল...
—বোধহয় রাখতে চায়...
—তবেই হয়েছে...আরও ফাঁকি দেবে...
—উঁহু...ওখানে খাতির চলবে না...দরকার হলে তিনবার বাসন মাজাবে...
—সাহাদের সঙ্গে মাসির আজকাল খুব খাতির...
—কত খাতির দেখলাম...আগে তো আমার এখানে চা বাঁধা ছিল...
—তুমি সকলের জন্য করেই গেলে...
—ছেলের বউদের জন্য কম করেছি...
—এখন তো বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হচ্ছে...
—বউদের হাতের রান্না খাওয়া?...সে আমার ভাগ্যে নেই...

প্রতিদিন সকালে পরিতোষ তার মা, মাসিমার এই জাতীয় কিছু কথপোকথন শুনতে শুনতে কলে মুখ ধুতে যায়। এইসব ভদ্দরলোকের ভাষা, কাঁচা খিস্তি নয়—যা কিনা আসলে এক ভণ্ডামীর ভাষা, শুনতে শুনতে পরিতোষের আবারও বেশ্যাদের কথা মনে পড়ে। যৌন আকর্ষণ ছাড়াও আর কী যেন তাদের...কি যেন...? হ্যা, ভালো সাজার কোনো চেষ্টা বেশ্যাদের নেই। অন্যকেও সে সুযোগ তারা দেয় না। এই কারণেই কী তাদের কাছে এত স্বস্তি পাওয়া যায়? মুখ ধুতে ধুতে পরিতোষ দেখতে পায় রান্নাঘরের পিছনে ঝি তার সকালের বরাদ্দ রুটিটুকু নিয়ে খাচ্ছে। ভাগের আশায় মাকে ঘিরে গোল হয়ে তার তিন ছেলেমেয়ে। কয়েকটা কাক যেন রুটির টুকরো নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছে। পরিতোষ জানে খাবারের বাসি, পচা, পরিত্যক্ত অংশটুকু ঠিক ঠিক ওদের পাতে চলে গেছে। এ ব্যাপারে বাড়ির মেয়েদের কখনই কোনো ভুল হয় না। পরিতোষ চোখমুখে ক্রমাগত জলের ঝাপটা দেয়। যত তার চোখ পরিষ্কার হয় ততই সে স্পষ্ট দেখে ললিতার পেটকাটা ব্লাউজের তলা দিয়ে থলথলে চর্বি একখানা মৌচাকের মতো থপ করে ঝুলে পড়ল—এত বেশি যে তার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—ইস্-স্-স্। ললিতা পরিতোষের পছন্দমতো রেকর্ড বাছছিল, চমকে সে ফিরে তাকায়। পরিতোষ লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়।

—অর্ঘ্য সেনের 'বিরহ মধুর হলো আজি...' এটাই চালাচ্ছি, কেমন?

পরিতোষ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ১৫ বছর আগের স্মৃতি এই মুহূর্তে পীড়ার কারণ হয় বলে তার কষ্ট আরও বেড়ে ওঠে। সেদিনের সমস্তটাই হয়তো তার এক গড়ে তোলা স্বপ্ন ছিল...স্বপ্ন কী সত্য?...নাকি মানুষ স্বপ্নই দেখতে চায়, আর অন্যের কাছেও দাবি করে—তুমি স্বপ্ন দেখাও—তুমি আমাদের স্বপ্ন দেখাও! ১৫ বছর আগের ওই স্বপ্নের মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তাহলে এই যে ললিতা কামানো বগল দেখিয়ে মাথার উপর দু'হাত তুলে হাই তুলছে—এ-ও একইরকম সত্য। তবে পরিতোষ অহেতুক কষ্ট পায় কেন?

একটু পরেই রেডিয়োগ্রাম গমগম করে ওঠে। গান, গানেরসুর, পরিতোষের কান দিয়ে ঢোকে বটে কিন্তু পর্দায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—গানের কোনো অর্থ, কথাসুর কিছুই সে ধরতে পারে না—শুধু একটা চিৎকার মাত্র। ললিতার ছোট্ট মেয়ে কোথা থেকে দৌড়ে এসে ঘরে ঢোকে। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে ললিতা বলে—যাও মা, পট করে এসো। মেয়ে ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে যায়—মায়ের উরুতে একবার মুখও ঘষে না।—কাল রাতে আর বাড়িতে খাইনি...চাইনীজ রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম...ওর পাল্লায় পড়ে সামান্য একটু...। ললিতা পরিতোষের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসে।—এখন গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে...। পরিতোষ আস্তে ওর পাশে এসে শুয়ে পড়ে, ওর সুডোল স্তনে হাত বোলায়, বার বার চুমু খায় কপালে গালে আর ঠোঁটে, কোমার অবধি শায়া-শাড়ি সব তুলে ফেলতে চায় কিন্তু ললিতা শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরে।—এই তো বেশ, শুয়ে থাকো না, কেবল দুষ্টুমি...। লক্ষ্মীটি...একটু...একটু...।

—ঘুমোও না, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি...।—ঘুম আসবে না এখন...।

—আঃ, ছাড় না...কি যে করিস...দূর...।—এসব ন্যাকামির কোনো মানে হয় না...।—দাঁড়া, দেখি, দরজা জানালা সব বন্ধ আছে কিনা...।—এই সর...সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ...।—দূর...ওতো পাশের বাড়ির ছাদে আওয়াজ...। তবু ললিতার মুখ থেকে ভীত, ত্রস্ত ভাবটি যায় না। এবার পরিতোষ নিজেই উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলে দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে ভেজিয়ে রাখে। ললিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তারপর ওর পাশে শুয়ে শুরু হয় গল্প...কত গল্প...সবই এক অন্তহীন রূপকথার টুকরো অংশ...১৫।১৬ বছরের সুঠাম মেদহীন শরীরের এক কিশোরীর পাশে শুয়ে পরিতোষ Little Mermaid-এর গল্প বলে চলে। ওর মা কখন যেন নিঃশব্দ চরণে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করেন। ওরা তখন আর এ জগতে নেই—ওরা তাকে দেখেও দেখে না। উনি কিছুক্ষণ চুপ করে সোফায় বসে থাকেন, তারপর মন্তব্য করেন—মেয়েটা তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকতে কী ভালোই না বাসে! তাকে, বইয়ের পেছনে, কনডোমের প্যাকেটের ওপর কেবলই ধুলো জমে আর ধুলো জমে। এইভাবে কেটে যায় বছরের পর বছর। দিনদিন ললিতা আরও সুন্দরী হয়। তারপর একদিন ওর বিয়ে হয়ে যায়।

—ললিতা. তোর মনে আছে সব? মনে পড়ে...?

—হুঁ-উ-উ, সব মনে আছে...প্রতিটি দিনের কথা মনে আছে...।

—কী করে মনে রাখিস?...আমি তো অনেক ভুলে গেছি...।

—মেয়েরা এত সহজে ভোলে না বুঝলি...অত সহজে ভোলে না...।

শরৎচন্দ্রের বইয়ের পাতা থেকে সংলাপ উঠে আসে, তবু ভাঙা স্বপ্ন আর জোড়া লাগে না। পরিতোষ ললিতার মুখের দিকে অন্যমনস্ক তাকিয়ে থাকে।...বিয়ের দিন দশ আগে একমাথা আগুন নিয়ে পরিতোষ ললিতার সঙ্গে দেখা করে।

—আমাকে তুই ফাঁকি দিচ্ছিস।

বাড়িতে কেউ নেই। ললিতার বাবা মা বিয়ের বাজার করতে গেছে। পাশের ঘরে ছোটোভাই পিন্টু শুধু পড়ছে। সেই সময় একলা ঘরে ললিতার দু'কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পরিতোষ হিংস্র হয়ে ওঠে।

—আমাকে তুই ফাঁকি দিচ্ছিস...আমি কাল .তোকে নিয়ে সিনেমায় যাবো...ওটা বাড়ির লোকের জন্যে...আসলে যাবো একটা হোটেলে...সেখানে ঘণ্টা চারেক থাকব...শুধু আমি আর তুই...।

ললিতা দু'পাশে চুল ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে। পরিতোষ জোর করে ওর থুতনি তুলে ধরে বলে—কী...বল.. তুই বল কিছু...রাজি তো...? ললিতা মুখ তোলে, কিন্তু দু'চোখ বুঁজে থাকে। কেমন একটা সিনেমা সিনেমা ভাব। কিন্তু পরিতোষের ওইসব দিকে আজ আর নজর দেবার মতো অবস্থা নেই।

—কাল আমি আসব...ঠিক দুপুর ১টার সময়...তৈরি থাকিস...।

—বাইরে যাবার কী দরকার...বাড়িতে আয় না...মাকে বলব...কাল দুপুরে এখানেই খাবি...।

—না—আ—আ! পরিতোষ প্রায় গর্জন করে ওঠে—আমি স্রেফ তোকে একলা পেতে চাই...এ্যাকেবারে একলা...এখানে এলে তো বসে বসে তোর বিয়ের গপ্প শুনতে হবে। একটু থেমে পরিতোষ বলে—আমি উঠি...নীচে আয়...দরজাটা বন্ধ করে দে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে—মনে থাকে যেন, আগামীকাল দুপুরে...ঠিক দেড়টার সময়...তৈরি থাকিস...বাড়ি ফাঁকা, তবু পরিতোষ ললিতাকে একবার চুমু খায় না, জড়িয়ে ধরে না একবারও—এখন সে শুধু একভাবেই ভালোবাসা জানাতে পারে।...সেই রাত্রে পরিতোষ হোটেলে সিঙ্গল বেডের একটি ঘর ভাড়া নেয়। মাংসভাত খেয়ে নরম গদির বিছানায় তোফা ঘুম দেয় একখানা। সকালবেলা চা খাবার সময় হঠাৎ ঘরের মধ্যে লটকানো নোটিশটা নজরে আসে। উঠে গিয়ে সে দেখে। 'ঘরের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ...বাইরে থেকে কোনো মহিলা নিয়ে হোটেলের ঘরে প্রবেশ নিষেধ...ঘরের ভিতর স্টোভ জ্বালানো চলবে না...'এইধরনের হরেকরকম নিয়মকানুন লেখা আছে সেই নোটিশে। পরিতোষ কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করে হোটেলের চাকরটিকে ডাকে এবং তার কাছ থেকে জানতে পারে যে, কিছুদিন আগেই এই হোটেলে নারীসংক্রান্ত একটি কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে—কাগজেও বেরিয়েছিল, তারপর থেকেই কড়াকড়ি বাইরে থেকে কোনো মহিলা...আত্মীয়া, বান্ধবী যাই-ই হোন না কেন উপরে নিয়ে আসা চলবে না—নীচের ওই ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলতে হবে।

বাঃ, আমার বোন থাকে হোস্টেলে...সে আজ দেখা করতে আসবে...তার সঙ্গে নীচে বসে ওই পাঁচজনের মধ্যে কথা বলব? পরিতোষের বাড়িয়ে দেয়া কড়কড়ে টাকাটি পকেটস্থ করতে করতে লোকটি বলে—ঠিক আছে, তাকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাবেন।

পরিতোষ আর সময় নষ্ট করে না। নীচে এসে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর অন্য আরেকটি হোটেলে গিয়ে ডাবল সীটের একটি ঘরভাড়া নেয়। ম্যানেজারকে জানায় যে, তার স্ত্রী দুপুরের ট্রেনে আসছে সুতরাং দুটো মিল যেন রেডি থাকে। পরে প্রমথর মেসে গিয়ে তাকে সব কথা বলে তার জামাকাপড় ভর্তি সুটকেশটি ধার চায় কয়েকঘণ্টার জন্য। সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত হবার পর রাস্তায়, চা-এর দোকানে অর্থহীন এক ছটফটানি বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার পর বেলা একটার সময় সে ললিতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। গিয়ে দেখে দোতলার ঘরে বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ললিতা—তার পাশে মা। চোখ দুটো ঈষৎ লাল, জ্বলজ্বল করছে, মুখ শুকনো—কপালে জলপট্টি।

—কী ব্যাপার?—এই দ্যাখ না...দু'দিন বাদে মেয়ের বিয়ে...জ্বর বাঁধিয়ে বসল...। —কত...?—সকালে যখন ডাক্তার এলো...তখন ১০১°, এখন আবার দেখব...। ললিতার মা উঠে গিয়ে টেবিল থেকে থার্মোমিটার নিয়ে আসে...সেই দশ সেকেন্ডের ব্যবধানে ললিতা শুধু কাতরভাবে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে থাকে। এইসব চাহনিকেই বোধহয় চোখে চোখে কথা কওয়া বলে...কিন্তু পরিতোষের তখন চোখের ভাষা পড়ার ক্ষমতা একেবারেই লোপ পেয়েছে। নিয়মমাফিক পরিতোষ ললিতার কপালে একবার হাত বুলায়। কিছুটা প্রেমিকের হাবভাব আনার চেষ্টা করে। কপালে হাত দিয়ে মনে হয়, জ্বর আরও বেশি। ললিতার মা থার্মোমিটার দেয়...জ্বর দেখে...একই আছে।—আমি তাহলে উঠি...টিকিট দুটো আবার বিক্রি করতে হবে...।—বোস না একটু...। ললিতা এতক্ষণবাদে কথা বলে। হাঁ, ধৈর্য ধরে এখন ললিতার পাশে বসে থাকতে পারলে ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘরটা ফাঁকা পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পরিতোষ বুঝতে পারে না—একি যৌনকামনা? নাকি যৌনকামনা নয়? এই কি ভালোবাসা? নাকি ভালোবাসা নয়?

এসব তবে কী? পরিতোষের যে কী চাই, কী যে তার দাবি, শেষপর্যন্ত ললিতাকে তা বোঝাতে পারল কি? বুকের মধ্যে শুধু দাউ দাউ করে পুড়ে যাবার একটা অনুভূতি হয়।—না আর বসব না...চলি রে। ললিতার মা জিজ্ঞেস করে—কী সিনেমা? পিন্টু যেতে পারে না?—না...ইরেজি সিনেমা...ও কিছু বুঝবে না।

প্রমথর মেসে ফিরে আসে পরিতোষ। সব কিছু শোনার পর প্রমথ হাসতে হাসতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। পরিতোষের পাংশু মুখের দিকে চেয়ে যতই ও হাসি থামাবার চেষ্টা করে ততই ওর অট্টহাসি আরও বেড়ে চলে। প্রমথর হাসাহাসিতে সমানভাবে যোগ দিতে না পেরে পরিতোষের কষ্ট আরও বাড়ে। সে ঠিকই বুঝতে পারে এমন তামাশা মানুষের জীবনে একটার বেশি দুটো ঘটে না। প্রমথর দিকে সে তাকায়—দ্যাখে হাসতে হাসতে প্রমথ এবার দু'হাত দিয়ে তার পেট চেপে ধরেছে—ধীরে ধীরে এবার পরিতোষের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে—হাসতে হাসতে হাতের সিগ্রেট সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে—যত্তো সব বোগাস!

—তোর ব্রেসিয়ারের মাপ এখন কত রে?—তা দিয়ে তোর কী দরকার, অসভ্য!

—বল না, আমার কাছে লজ্জা কী।—আটত্রিশ।—বাপরে! বিয়ের আগে বোধহয় বত্রিশ ছিল, তাই না? তোর কী আর কোনো কথা নেই?—যোগাসন করিস না কেন? পেটে কী বিশ্রী চর্বি হয়েছে!—আর আসন! দু'দুটো বাচ্চা হয়ে গেল।—তুই কী হয়ে যাচ্ছিস রে দিনকে দিন, কেমন থলথলে ম্যাড়মেড়ে...। পরিতোষ হঠাৎ থেমে যায়। সে বোধহয় বুঝতে পারে ললিতাকে সামান্য যৌনসুড়সুড়ি দিতে গিয়েও তার কণ্ঠস্বরে সেই পুরোনো ক্ষেদই প্রকাশ পাচ্ছে। এবার সে কথা থামিয়ে ঠান্ডা চা চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করতে থাকে।...চায়ে চুমুক দেয় আর খবরের কাগজ দেখে। পড়ে না অবশ্য। তখনও কানে ভেসে আসতে থাকে মা, মাসিমার কথাবার্তা...নালিশ আর নালিশ...অভিযোগ আর অভিযোগ...। বেশ্যাদের বোধহয় কোনো নালিশ নেই...কোনো অভিযোগ নেই...অনেকদিন অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে কাটাবার পরও পরিতোষ কাউকে বলতে শোনেনি—হায়, আমার কপাল!...পাবলো প্লেটে করে রুটি আর আলুসেদ্ধ নিয়ে এসে বলে—বাবা, খাইয়ে দাও। পরিতোষ পাবলোকে রুটি খাওয়ায়। পাবলো বকবক করে চলে...পরিতোষকে সে গল্প শোনায়...তার নিজের ছোট্ট জীবনের স্বপ্ন আর কল্পনা...জানো বাবা আমার ধোড়াটা না পুতুরে গেছিল...মাছ খাচ্ছিল...পুলিশ গিয়ে তখন ধোড়াটাকে ধরল...ধোড়াটা পাখা মেলে উড়ে গেল...আকাশে...হ্যা...। ধোড়াটা আবার চলে এসেছে...ওই দ্যাখ...খাটের তলায়...হ্যা...। বাইরে তখন শোনা যায়—

'অ দীপু, বাবা কাল বাড়ি এসেছিল?

ঝিয়ের রোজগার সম্ভবত মাসে ত্রিশ টাকা। স্বামী নাপিত। তিনটি ছেলেমেয়ে। স্বামী প্রতিদিন সকালে বাক্সটি হাতে বেরিয়ে যায়। যেদিন রোজগার হয় সেদিন বাড়ি ফেরে, যেদিন হয় না বাড়ি আসে না।

অ দীপু...তোর বাবা কাল বাড়ি এসেছিল?

—না...আসেনি।

—রাত্রে খেয়েছিস?

—হ্যাঁ...খেয়েছি।

—কী খেয়েছিস?

—চার আনার মুড়ি এনেছিল মা...।

—সেকি রে...চার আনার মুড়ি চারজনে...! সত্যি দিদি...ওদের কথা ভাবলে এত কষ্ট হয়...কী

যে করা...।

সত্যি কিইবা করতে পারি আমরা। করতে গেলে যে নিজেদের সামান্যটুকু নিয়েও টান পড়ে। বাইরে গেটের কাছে ভিখারির চিৎকার ভেসে আসে।

—দুটো ভিক্ষা দাও গো মা...।

পরিতোষ ব্যাগ থেকে একটা দু'পয়সা বার করে। হ্যাঁ, ভিখারিদের জন্য দু'পয়সা, তিন পয়সা...বড়োজোর পাঁচ পয়সা—তার বেশি নয়। পয়সা নিয়ে সে পাবলোর দিকে এগিয়ে দেয়...ছেলেবেলা থেকে দেবার অভ্যাসটা তৈরি হোক...আর কিছু নয়...পরে তো...। কিন্তু পাবলো আজ পরিতোষকে অবাক করে দিয়ে বলে ওঠে—হাত জোড়া...এখন ভিত্‌থা হবে না।

পরিতোষ বিস্মিত হয়ে বলে—এটা কবে শিখলি রে...?

স্কুলে যাবার সময়ে চৌরাস্তার মোড়ে বাস থামলে জানালা দিয়ে পরিতোষ মোহনকে দেখতে পায়। মণ্টুবাবুর দোকানে বসে সে দাবা খেলছে। মুখে হাসি—পরিতৃপ্তির ছাপ। গতকালই সে পরিতোষের কাছ থেকে রেশন তোলার টাকা পেয়েছে। প্রায় গত ছ'বছর ধরে এই ৪০ বৎসর বয়স্ক বেকারটিকে সে আর্থিক সাহায্য করে চলেছে। শুরু করার পর মোহনের মা, বউ, ছেলেমেয়েদের কৃতজ্ঞ হাবভাব দেখে পরিতোষ খুবই খুশি হতো। তখনকার সেই গর্বিত হাসি পরিতোষ আজও টের পায়। সত্যি সে করছে একটা কিছু...অনাহারীর মুখে অন্ন তুলে দেয়া...একি কম কথা? পরে কখনো মোহনের বাড়ি গিয়ে তাদের হিসেব করে রুটি খাওয়া...ট্যালটেলে ডালের জল দিয়ে খুদের জাউ খাওয়া...এসব দেখে লজ্জায় তার মাথা নিচু হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যতটুকুই সে দিক না কেন প্রয়োজনের তুলনায় তা কত সামান্য। সে যা দেয় তাতে মোহনের নিশ্চয়ই সংসার চলে না—কিন্তু কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে মোহন সংসার চালায়, সেকথা পরিতোষ সংকোচে কোনোদিন তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। অনুমানে বুঝে নেবার চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু আজ...? এক নিমেষে পরিতোষের মধ্যে কেমন একটা ওলটপালট হয়ে যায়। অর্থ সাহায্য করে সে কী মোহনের সত্যিই উপকার করেছে? বাসের জানালা দিয়ে পরিতোষ মোহনের মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে। মোহন খেলতে খেলতে পাশের ভদ্রলোকের কাঁধে চাপড় মেরে কত হাসাহাসি করে। আর পরিতোষ গত ছ'বছর অর্থ সাহায্য করে মোহনের কতটা ক্ষতি করল তার পরিমাপ করতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বাস ছেড়ে দেয়।...সন্ধ্যার পর পরিতোষ ওদের দাবা খেলার আসরে গিয়ে বসে। ওকে দেখে দু'একজন চেয়ার ছেড়ে দেয়। তবে মোহনের মুখটা কেমন শুকিয়ে আসে। পরিতোষ বুঝতে পারে, আর বুঝতে পারে বলেই আবহাওয়াটা মোহনের কাছে সহজ করে তোলার চেষ্টায় ও বলে—নিন...এ দানটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন...এরপর আমি একহাত খেলব। একসময় পরিতোষ খেলার মেতে যায়। আসর ভাঙে রাত দশটায়। মণ্টুবাবু দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করেন। মোহনের সঙ্গে পরিতোষ বাইরে বেরিয়ে আসে। চলতে চলতে মোহন চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মোছে। একটু ইতস্তত করে বলে—এই খেলাটা ছিল বলে বেঁচে আছি...নইলে বাড়িতে আর...কে জানে মোহনের আজ বাড়িতে হয়তো খাবার নেই...রেশনের চাল গম সবই হয়তো পাড়া প্রতিবেশীদের ধার শোধেই চলে গেছে...কিংবা এই যে এভাবে বলা, বলতে শেখা...এটাই হয়তো পরিতোষের সঙ্গে মেলামেশার ফল। যেমন পরিতোষ বলে—বইপড়ার নেশাটা ছিল বলেই বেঁচে আছি। ধার করা কথা দিয়েই একটা মানুষ সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে। পরিতোষ আজ আর অবিশ্বাস করে না।...চায়ের দোকানটা তখনও খোলা। দুজনে সেখানে গিয়ে বসে।—কিছু সুবিধে হলো আপনার?

—আগামী বুধবার যেতে বলেছে...দেখা যাক...মনে তো হয় হয়ে যাবে। দুজনে চা খায়।—মাসখানেক ঘোরাঘুরি করে কলকাতায় অবশ্য শ'দেড়েক টাকার একটা চাকরি জোগাড় করা যায়...তা আমার অর্ধেক টাকাই বেরিয়ে যাবে যাতায়াত আর টিফিনে...বরং দেখি কিছুদিন...এখানে তো যা হোক এদিকওদিক করে চলে যাচ্ছে...অনেকে অবশ্য অনেক রকম বলে...পানের দোকান দাও পোলট্রি করো...আরে টাকা না থাকলে কোনো ব্যবসা হয় না...চারপাঁচশো টাকা দিয়েও কিছু হয় না...উপদেশ দেবার বেলায় সব ওস্তাদ...। এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। চা শেষ হয়। তারপর মোহন সলজ্জভাবে বলে—মৈত্রবাবুর আজ একটা চিঠি পেয়েছি...লিখেছেন এই অক্টোবরের পর থেকেই আমার ভালো সময় আসছে...। এরকম অক্টোবর যে বেশ কয়েকটা চলে গেল সে কথা পরিতোষ আর মোহনকে মনে করিয়ে দিতে চায় না। আপন মনে অনেক কিছুই ভাবে পরিতোষ। এখানে বেকার বসে মোহন যে টাকাটা পায় তার কতটুকুই বা পরিতোষের, আর কতটুকুই বা অন্যের?...অন্যের কাছ থেকে যে সাহায্য ও পায় সেটা কী নিয়মিত!... নিয়মিত না হলে এর উপর ভরসা করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়া যায় কি? কিংবা যে পদ্ধতিতে এখানে ও টাকাটা রোজগার করে সেটাই ওর ভালো লাগতে শুরু করেছে কি?...নাকি ও সেই অক্টোবরের জন্য অপেক্ষা করে আছে যখন ওর গ্রহের সমস্ত দোষ যাবে কেটে, এক নিমেষে ফুলেফলে ভরে উঠবে গাছ...আকাশ দেবে সুবাতাস...ফসলে ফসলে ছেয়ে যাবে প্রান্তর, জল হয়ে উঠবে আরও স্বাদু...সেই অক্টোবর...যখন ও মুঠো ভরে ধুলো নিলেও হয়ে উঠবে সোনা...

—বিপ্লব কী অমনি হয়...Objective Condition...পারিপার্শ্বিক অবস্থা...সব কিছু বিচার করে দেখতে হয়...বুঝতে হয়...যখনতখন ঝুঁকি নেয়াটা মুর্খের কাজ...যদ্দিন না উপযুক্ত সময় আসে—

—হ্যাঁ, যদ্দিন না উপযুক্ত সময় আসে, ততদিন হাত তোলো...মিটিং করো...মিছিলে হাঁটো...হাগো...মোতো...কাপড়চোপড়ের ভাঁজ ঠিক রাখো...ঘুমাও আর অপেক্ষা করো...।

আপনি ঠাট্টা করতে পারেন, কিন্তু আমরা বসে নেই। আমাদের ক্যাডাররা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে...জনগণের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে...তাদের সুখদুঃখ বোঝার চেষ্টা করছে...তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে...। বলতে বলতে বিজয়ের কেমন একটা বক্তৃতার ঢং এসে যায়।

—আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না...কিন্তু আপনার কখনো কখনো কি মনে হয় না আমরা কেবল অপেক্ষা করছি...অপেক্ষাই করছি... উপযুক্ত সময় আর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা নিশ্চয়ই দরকার, তবে সেটা যেন নিজেদের আলস্য আর নিষ্ক্রিয়তা ঢাকার একটা ছুতো হয়ে না দাঁড়ায়।

—বিচারটা করবে কে? বিনয় হেসে প্রশ্ন করে।

—আপনিই করবেন...নিজের দিকে তাকান না...।

ক্লাশে যাবার ঘণ্টা পড়ে। লাইব্রেরীর একটা আলমারিতে তালা লাগাতে লাগাতে পরিতোষ মুখ না ফিরিয়েই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, 'সুসময়' বলে কোনো কিছু আছে কি? নাকি এসব আমাদের চোখের দোষ...কিংবা যেমন আপনার নাক টিকালো আমারটা বোঁচা...তাতে কিছু যায় আসে কি...?

—অ, ভাববাদী দর্শন!...উঠি, ক্লাশ আছে।

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে পরিতোষ আর মোহন দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। সিগ্রেট কিনতে গিয়ে মোহনের সঙ্গে আবার কিছুক্ষণ কথা হয়। মোহন ওকে ভবিষ্যতের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলে—যেগুলো সফল হলেই অজস্র টাকা, হাজারে হাজারে টাকা...তখন আর

দেশি নয় প্রতিদিন বিলাতি...প্রতিদিন পার্কস্ট্রিটের রেস্তোরাঁ...হোটেল...বার...বেশ্যা...ক্যাবারে... শহরটাকে একেবারে নিংড়ে ছিবড়ে করে ফেলব...আগে একবার বেরিয়ে পড়া দরকার...গাড়ি করে একটা লম্বা টুর—এই একটা সময় যাচ্ছে...লুটেপুটে নেবার এই হলো সুযোগ...অলিগলি দিয়ে কত মানুষ লাখপতি হয়ে যাচ্ছে...আঃ, নিজের যদি হাজার কুড়ি টাকাও থাকত...ব্যাঙ্কলোন বার করে ব্যবসা...পয়সা করার এমন ফাসক্লাশ সুযোগ আর কখনো দ্যাখেনি মোহন...অনেকেই পারে না, পারছে না,...কিন্তু মোহন পারত...দরকার একটু সাহস আর বুদ্ধি...। এসব কথা নানাভাবে মোহনের কাছে পরিতোষ বহুদিন শুনেছে। তবু যতবার শোনে ততবারই রোমাঞ্চিত হয়। বর্ণনার গুণে মনে হয় তাড়া তাড়া টাটকা নোটের বান্ডিল নিয়ে কেউ তার নাকের সামনে আঙুল বুলিয়ে ফর্ফর ফর্ফর শব্দ করছে।...মোহনকে বিদায় দিয়ে পরিতোষ একা বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে। সকাল থেকে কত কাজই তো করল। ক্লান্তিতে শরীর নুয়ে পড়ে। তবু মনে হয় কোনো কাজই সে করেনি। গোটা দিনটা বৃথা গেল। রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। পাবলোরও আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। খাটের পাশে মেঝেতে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে একখানা বইয়ে চোখ ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে সময় যেন দৌড়তে থাকে। যত পাতা ওলটায় গোলমাল তত বাড়ে। হতাশ হয়ে বিড়ি ধরায়। পরিপাটি বিছানা থেকে পদ্ম ডাকে—এবার শোবে না, রাত অনেক হলো।...মশারির মধ্য থেকে পদ্মর নগ্ন শরীর কালো পাইথনের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে।—এই তো যাই...বিড়িটা খেয়েনি।...বিড়ি শেষ হলে আবার বইয়ের পাতায়।...কখনো দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। তাঁতকলে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং...। বাইরে দেখে সে নীল আকাশ, চাঁদ, চাঁদের আলো, দমকা হাওয়ায় গাছের পাতারা ঝিলমিল কাঁপে—সকলেই যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, সে টের পায়। সে ঠিক শুনতে পায় সকলে বলছে—তুমি দেখ...তুমি আমাদের দেখ...তুমি এত ছটফট করছো কেন...আমাদের দিকে ফের...তাকাও...। কী দেখতে বলে তা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু সে শোনে। তারপর ঘরের ভিতরে এসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।...কিছুদিন হলো পরিতোষের বড়দা এসেছেন। তিনি অবশ্য অধিকাংশ সময় আক্ষরিক অর্থেই ঘুমিয়ে থাকেন। সকালবেলা ছ'টার সময় ঘুম থেকে ওঠেন। আটটার মধ্যে জলখাবার খাওয়া শেষ। তারপর স্নান। তারপর আবার বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে থাকেন, ঝিমোন। পরিতোষ বাজার করে এসে দেখে বড়দা ঝিমোয়, স্কুলে যাবার সময় দেখে ঝিমোয়। স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে ঘুমোয়। মা ধাক্কা দিয়ে বলে—খোকা, লুঙ্গিটা ঠিক করে নাও। বউমার ফেরার সময় হলো।...আরও আধঘণ্টা পর পেচ্ছাপ করতে গিয়ে সশব্দে দু'টি বাতকর্ম, তারপর নস্যির ডিবে আর চা নিয়ে বড়দা বারান্দায় বসে। চা খেতে খেতে বলে—মা আজ কপির তরকারিটা বড়ো ভালো খেলাম। বড়দার টি. বি হয় তিরিশবছর বয়সে। সেরে যায়। আবার বছর দশেক বাদে রিলাপস করে। ফের সেরে যায়। পাঁচ বছর পর নিজেই, বিবাহ করেন। এখন দু'টি সন্তানের পিতা, বেকার, বয়স পঞ্চান্ন বছর। বউদি মফঃস্বলে হেলথ সেন্টারের নার্স। তার আয়েই চলে যাচ্ছে। বড়দার বিবাহের সংবাদে পরিতোষের দিদিমা খুবই উল্লাস প্রকাশ করে বলেছিলেন—দেখবি তোরা...এবার খোকার মতিগতি ফিরবে...। আর পরিতোষ উঠেছিল শিউরে...একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে একজন নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছে...কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখেশুনে পরিতোষ কেমন বোকা বনে যায়, মাকে বলে—বড়দা কিন্তু বেশ আছে, তাই না? দিব্যি নিশ্চিন্ত, শান্ত, সুখী...আমরা অযথা তার জন্যে ভেবে মরছি। মা বিড়বিড় করে বলে—এটা কী একটা জীবন...এইভাবে দিন কাটানো...দূর...। বড়দা কোনোদিন রোজগারের

চেষ্টা করেনি। বউদি হেলথ সেন্টারের কাছে একটা চায়ের দোকান দিয়ে দিতে চেয়েছিল। যা হোক দু'পয়সা আসবে। বড়দা রাজি হয়নি, সম্মানে লাগে। ...সন্ধ্যা হলে মোড়ের একটি মিষ্টির দোকানে গিয়ে বড়দা বসে থাকে। তার কোনো বন্ধু নেই। বড়দা কারো সঙ্গে কথা বলে না কিংবা কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। যাতায়াতের পথে পরিতোষের প্রায়ই নজরে আসে বড়দা চুপ করে বসে আছে। বসেই আছে। একখণ্ড পাথরের মতো একপাশে পড়েই আছে। এই পাথরখণ্ডেও যে সাড়া আছে সেটা পরিতোষ ভালোবাবে জানতে পেরেছিল তার বিয়ের পর। তার বিয়ের পর বড়দা, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল। স্থানাভাবের ফলে তাদের বিছানাটা একসঙ্গে হয়নি। কিন্তু রাত্রে বড়দা মাসিমার বিছানা টপকে বউদির দিকে যাবার চেষ্টা করায় অন্ধকারে মাসিমার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সেটা আবার বউদি হি হি করে হাসতে হাসতে পরদিন পদ্মকে সবিস্তারে বলেছিল। শুনে পরিতোষ পাক্কা পনেরোদিন যৌনসংসর্গ বন্ধ রাখে। তার ইচ্ছে করত না। বড়দার পঞ্চাশ বছর বয়সের শরীর, পাকা লোম আর থলথলে ভুড়ি আর বউদির রোগাপ্যাকাটে চেহারা...এসব সে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখত। কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারত না।...রাত নটার ঘণ্টা বাজলে বড়দা গুটি গুটি বাড়ি ফেরে। হাত মুখ ধোয়। তারপর কাঁধের উপর গামছা ফেলে বলে—মা, খেতে দাও। ডাল, ভাত, তরকারি সব চেটেপুটে খায় আর বার বার বলে—বড়ো ভালো খেলাম, আঃ, বড়ো ভালো খেলাম। তারপর ঘুম। ...দ্বিতীয় সন্তানটি হবার পর বড়দা কিছুটা টলে যায়। তখন প্রায়ই এসে পরিতোষকে বলত—চিনুকে এবার এখানে রাখ। ওখানে থাকলে একেবারে অমানুষ হবে। সাঁওতাল ছেলেরা গরু চরাতে যায় তো, আর ওই মেয়েটাও তাই দেখে গামছা পরে কঞ্চি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়...বলে গরু চরাই। ...ওখানে থাকলে ও মেয়ের কিসস্যু হবে না। —তোমাদের ছেড়ে এটুকু বয়সে থাকতে পারবে? —কেন পারবে না? কাকা-কাকীমার কথা তো সব সময় মুখে লেগে।...পরে একবার বড়দা চিনুকে নিয়ে আসে। চিনু তার বাবাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করে না। পনেরো দিন বাদে 'মার কাছে যাবো' বলে কান্নাকাটি শুরু করে। বড়দা কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মা বলে—কিরে, দেখা হলো তো! এবার মেয়েকে মার কাছে নিয়ে যা।—এই যাবো...ব্যাঙ্কের কাজটা সেরে নিই।... পরিতোষকে নিয়ে বড়দা ব্যাঙ্কে আসে ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙাতে। সার্টিফিকেটটা ছিল বড়দার নামে। বহুদিন আগে মা এটা বড়দার নামে করে রেখেছিল। সেটা বাড়তে বাড়তে হাজার তিনেক টাকা হয়েছে। এখন আবার তার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এবার ভাঙিয়ে বড়দা নিজের আর বউ-এর নামে করে নেবে।

—এই ব্যাঙ্কেই নিজের নামে করে রাখো না? আবার এত টাকা নিয়ে...।

—নাঃ, এখানে নয়। বড়দা বিশেষ একটি ব্যাঙ্কের নাম করে বলে—ওখানে সবাই চেনাশোনা...ওখানেই সুবিধা...।

বড়দার প্রতিমাসে সই পালটায়। সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে টাকা নেওয়া হয়, ফর্ম ফিলআপ...বিভিন্ন কাউন্টারে যাওয়া...টাকা নেয়া ইত্যাদি মিলে যতক্ষণ ধরে কাজটা হয় ততক্ষণ বড়দা উৎকণ্ঠিতভাবে ক্রমাগত পায়চারি করে। পরিতোষ বলে—বসো না বেঞ্চে...। এই বসি। দাদা বেঞ্চের দিকে এগোয়, কিন্তু বসে না। আবার পরিতোষের চারপাশে ঘুরঘুর করে। টাকাটা নিয়ে পরিতোষ হাতব্যাগের মধ্যে রাখে। ব্যাগের হাতলটাকে কাঁধ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে এসে ব্যাগটাকে বগলদাবা করে বলে—চলো...। বড়দা সতর্ক চোখে সব লক্ষ করে, বার বার বলে—দেখিস...সাবধান...।...বাসে করে পরিতোষ বড়দাকে নিয়ে তার চেনাশোনা ব্যাঙ্কে যায়। সেখানে গিয়ে সবে এক ব্যাঙ্কে কর্মচারীর সামনে বসে বউদির সই করা ফর্মটি ফিলআপ করতে

শুরু করেছে, এমন সময় বড়দা কাউন্টারের বাইরে থেকে পরিতোষকে ডাকে। পরিতোষ কাছে এলে বলে—এই টাকাটা তোর আর আমার নামে রাখব।—কেন?—এমনি...মেয়েমানুষের নামে না করাই ভালো।—এর আগে তো কয়েকটা ভাঙিয়ে তোমার আর বউদির নামেই করেছো।—হুঁ, করেছিলাম। তবে এই টাকাটা তোর আর আমার নামেই...।—কেন? হঠাৎ তোমার এ মতি হলো কেন? এর আগের বার এসে ফর্ম নিয়ে গেলে...বউদিকে দিয়ে সই করিয়ে আনলে? পরিতোষ এবার ভ্রূ কোঁচকায়।—মা...মাসিমা কেউ বুদ্ধি দিয়েছে নাকি?—না...না, মা মাসিমা কেউ কিছু বলেনি—আমিই বলছি...।—না, তোমার আর বউদির নামেই হবে...।—না, আমি বলছি...তোর আর আমার নামেই কর...।—কেন?...কী ব্যাপার বলো তো...? —আয়...বোস এখানে। বড়দা এবার পরিতোষকে হাত ধরে পাশে টেনে বসায়।—আসলে ব্যাপারটা কী জানিস...তোর বউদির মতিগতি এখন আর ভালো ঠেকছে না...।—তার মানে? পরিতোষের মনে হয় এইবার তার মাথার খুলি বোধহয় ফেটেই যাবে। সে তার মাথার খুলির ভেতরে চড়াৎ চড়াৎ শব্দ শুনতে পায়। রাগে পরিতোষের নাক থেকে যেন আগুনের হলকা বের হয়।—তোমাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন? বড়দা কোনো উত্তর দেয় না।—বছর বারো হবে...নয়...? তা, এর মধ্যে সংসার খরচের জন্যে বউদিকে কখনো কোনো টাকা দিয়েছো? পরিতোষের বড়দা চুপ করে থাকে।—তাহলে এই বারো বছর ধরে সে তোমার সম্পূর্ণ ভরণপোষণ করেছে, নয় কি? বড়দা ঘাড় নাড়ে।—আর এই দশ বারো বছরে তুমি শুধু তাকে দু'টি সন্তান উপহার দিয়েছো...তাই না? তা এই সন্তান দু'টির কথা ভেবে ওটাকা তোমার আর বউদির নামেই করা উচিত, বুঝলে...? বড়দা পরিতোষের দিকে ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে—ও যদি শেষে আমাকে তাড়িয়ে দেয়...তখন...?

এখনও মাঝে মাঝে পদ্ম পরিতোষকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। কখনো পদ্মর হাতখানা ভারী হয়ে পরিতোষের গলার উপর চেপে বসে। দম যেন আটকে যায়। পরিতোষ সন্তর্পণে হাতখানা নামিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে পরিতোষ ওর নগ্ন শরীরে হাত বোলায়। পদ্ম আরও কুঁকড়ে ওর বুকের কাছে সরে আসে। গোটা শরীরে হাত বুলিয়ে পরিতোষ আতিপাতি করে খোঁজে...নাঃ, কোথাও যৌনতা পায় না। বিন্দুমাত্র উত্তেজনাও সঞ্চারিত হয় না পরিতোষের শরীরে...।

তাড়াতাড়ি সব ফুরিয়ে গেল কি?

কখনো পদ্ম রাতে ছটফট করে...পরিতোষ কোনো সাড়া দেয় না...গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে পদ্ম...যৌন সংসর্গের শারীরিক শ্রমটাই পরিতোষের কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়...মনে হয় আর পারবে না...আর কোনোদিনও পারবে না...স্তন, পাছা, ঊরু দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে পদ্ম একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।...বাইরে বের হবার জন্য জামাকাপড় পরে পরিতোষ। প্যান্টের বোতাম আটকাতে আটকাতে দ্যাখে পদ্ম ধুনুচি নিয়ে ধুনোর ধোঁয়া দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় পরিতোষ পদ্মর হাত ধরে টানে—পদ্ম কাছে এসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়—

—অনেকদিন আমাদের ওইসব হয় না...তাই না?

—কী সব? ধুনুচি নিয়ে পদ্মর হাত ঘোরানো বন্ধ হয়।

—ওইসব...। পরিতোষ এবার চোখের ইঙ্গিতে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে।

—আচ্ছা!...খুব যে দেখি...! পদ্ম প্যান্টের বোতাম-ঘরের উপর দিয়ে একবার হাত বুলিয়েই পালিয়ে যায়।...সিগারেট ধরিয়ে পরিতোষ রাস্তায় নামে। হাঁটে আর ভাবে। এই ক্লান্তি, এত অবসাদ—এর কারণ কী? মানুষের জীবনে যৌনক্রিয়ার একটা বিশাল ভূমিকা আছে। সেদিক

থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বলেই কি ও এত অলস আর অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে—নাকি পদ্মই দ্রুত পুরোনো হয়ে গেল—আর একটি আনকোরা টাটকা নারীশরীরের পাশে ও আবার নতুন করে জেগে উঠতে পারবে কি? নাকি অন্যকিছু, যা ওর ভেতরটা ক্ষয় করে চলেছে—অথচ ও টের পাচ্ছে না কিছু?...দু' একদিনের মধ্যেই বড়ো শ্যালকের চিঠি আসে...'স্কুল তে ছুটি হয়ে গেল...এখানে কয়েকদিনের জন্য ঘুরে যাও না।' চিঠিটা পরিতোষ মাকে দেখায় আর পদ্মকে ছোট্ট সুটকেশটা গোছাতে বলে। মাত্র কয়েকদিন আগে পদ্মর শরীর খারাপ হয়েছে। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ! সে একপাতা ওরাল কনট্রাসেপটিভসও কিনে আনে।...রিক্সা করে স্টেশনে গিয়ে দেখে এইমাত্র সাড়ে চারটের ট্রেনটা চলে গেল। রিক্সাওলা রতন তখনও গামছা দিয়ে ঘাম মুছছিল। পরিতোষের চোখে মুখে বিরক্তি দেখে জিজ্ঞাসা করে—যাবেন কোথায়?—শ্বশুরবাড়ি।—চলুন না, আমার রিক্সায়...।—সেকি, রিক্সা করে অদ্দূর?—ভাড়া নিয়ে বনগাঁ পর্যন্ত চলে যাচ্ছি...আর আপনার শ্বশুরবাড়ি তো কাছেই।—নেবে কত?—সে দেবেন, যা আপনার ইচ্ছে..। পরিতোষ আর কথা না বাড়িয়ে রিক্সায় উঠে বসে। পাবলোর ফূর্তি দেখে কে! বার বার সে রতনকে বলে—প্যাঁ পুঁ তর না...তর তো! রিক্সাওলা হর্ন বাজায়। লোকালয় ছাড়াবার পর পরিতোষ এক অন্য জগতে চলে আসে—রাস্তার দুপাশে বিশাল বিশাল বট অশ্বত্থ—ভাঙা বাড়ি, ইঁট বার করা দালান, চায়ের দোকানে নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চি, ঝাঁকা মাথায় কাঁচা কলার কাঁদি নিয়ে কোনো হাটুরে—তারপরই ওদের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সবুজ আর সবুজ—কেবলই ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত—কত রকমারি সবুজ আর তার ক্লোরোফিল...পরিতোষের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি স্নিগ্ধ আর সতেজ হয়ে ওঠে। শুরুটা ভালোই হলো, তাই না—পরিতোষ হেসে পদ্মর দিকে তাকায়। পাবলো মনের আনন্দে নিজস্ব সুরে গান গেয়ে চলেছে। সে-ও আরও সবুজ, ক্রমাগত সবুজ দেখতে দেখতে শেষপর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একসময় পরিতোষের কোলে নেতিয়ে পড়ে।....

শ্বশুরবাড়ি পৌঁছনোমাত্র গোটা বাড়িতে সাড়া পড়ে যায়—বাড়ির বাচ্চারা পাবলোকে নিয়ে মুহূর্তমধ্যে উধাও—পরিতোষ, রতনকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দোতলায় উঠে আসে—শ্যালিকারা দ্রুত এসে ঘিরে ধরে—পদ্ম এসে বলে, বউদি বলছিল...রতন এখানে খেয়ে যাক...দাদা অনেক বাজার করেছে।—ঠিক আছে...ওকে যেতে নিষেধ করো।—করেছি।—বাঃ...আর জিজ্ঞেস করা কেন...মন যা চায় করে যাও—বলে পরিতোষ ডলিকে দরাজ গলায় হুকুম করে—এক কাপ চা...শিগগির—এই সামান্য রসিকতাতেই খিল খিল হেসে লুটিয়ে পড়ে সব—ছোটোশালা তার ঘর থেকে একবার মুখখানা বাড়িয়েই পরিতোষকে দেখে দরজা বন্ধ করে দেয়—দে, শালা...আমার তাতে ছেঁড়া গেল—পরিতোষ দুই শ্যালিকার হাত ধরে ওর ঘরের জানালার সামনে দিয়েই বারান্দা পার হয়ে গিয়ে শাশুড়ির ঘরে ঢোকে—এবং তার প্রিয় কোনার দিকের জানালার চৌকাঠে গিয়ে বসে—জানালার পাশে একটা লিচুগাছের ডাল নুয়ে বেঁকে এসেছে—নীচ থেকে পাবলোর চিৎকার, হই হই...সকলের মিলিত কলরব শুনতে পায় পরিতোষ—মায়া চায়ের জল চাপায় স্টোভে—ডিমের মামলেট দেব...পরিতোষদা।—দাও।—শাশুড়ি এসে খাটের উপর বসেন—হার্টের রুগী—বছর দু'য়েক আগে একটি বড়ো অপারেশন হয়ে গেছে—অপারেশনটা অবশ্য ডাক্তার করেছে—কিন্তু শাশুড়ির ধারণা উনি তার জামাইয়ের জন্যই বেঁচে ফিরে এসেছেন—জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে আম, জাম, কাঁঠালের বাগান নজরে আসে—আলো মরে এসেছে—গাছের শাখায়, পাতায় পাতায় অন্ধকার জমে উঠছে—পরিতোষ সেদিকে তাকিয়ে তারিয়ে তারিয়ে মামলেট খায়—মিনি বলছিল...তোমরা এলে একবার খবর দিতে...ও তাহলে

কয়েকটা দিন তোমাদের সঙ্গে থেকে যেত—চায়ে চুমুক দিয়ে পরিতোষ বলে—বেশ তো...আমি গিয়ে না হয় নিয়ে আসব। বছর খানেক হলো শ্যালিকা মিনির বিয়ে হয়েছে—কাছেই শ্বশুরবাড়ি।—আপনার শরীর এখন কেমন?—ভালোই তো...দেখি কদিন ভালো থাকি। পরিতোষ চা শেষ করে উঠে পড়ে—যাই...মিনির ওখান থেকে ঘুরে আসি...দেখি না অনেকদিন। নীচে নেমে আসতেই পাবলো চিৎকার করে ওঠে—এই দ্যাতো...ধোড়া চড়ি...বাবা ধোড়া চড়ি—পাবলোকে পিঠে নিয়ে একটা ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—পদ্ম রান্নাঘরে ওর বউদিকে সাহায্যে ব্যস্ত—পরিতোষ ইশারা করে ওকে ডাকে—কাছে এলে বলে, শোনো...রতনকে পেট ভরে খাইয়ে দিও...ও নাকি কোনোদিন পেটভরে ভাত খায় না...বলছিল একদিন।—তোমাকে তা আর বলতে হবে না—পদ্ম হেসে চলে যাবার উপক্রম করতেই পরিতোষ হাত ধরে টানে।—আঃ...ছাড়ো...কি হচ্ছে সকলের সামনে।—এই...বেশ লাগছে...তাই না?—হুঁ...পদ্মর চোখমুখে এক উজ্জ্বলতা—কয়েকটা দিন বেশ কাটবে মনে হচ্ছে...তাই না—পদ্ম সম্মতির হাসি হাসে—পরিতোষ বাইরে এসে দেখে রতন রিক্সায় বসে আছে—চল রতন, একটু ঘুরে আসি।

মিনি রান্নাঘরে বসে আটা ছানছিল। পরিতোষকে দেখে আটা মাখা হাতে উঠে আসে—কী ভাগ্যি...অ্যাদ্দিন বাদে মনে পড়ল তাহলে...সত্যি, আসেন না কেন...ভুলে গেছেন...তাই না? মিষ্টির হাড়িটা হাতে দিয়ে জুতো খুলতে খুলতে পরিতোষ জিজ্ঞেস করে—তোমার শাশুড়ি কোথায়? তোমায় নিতে এসেছি।—আছেন ও ঘরে...বসুন না...ডেকে দিচ্ছি। মিনির শাশুড়ি এলে পরিতোষ তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলে—আমরা এসেছি...থাকব কয়েকদিন...এসময় ও যদি গিয়ে ক'দিন থাকত...ভালো লাগত। মিনির শাশুড়ি বিশেষ খুশি হন না, বিরস বদনে বলেন—উনি তো বাড়ি নেই...বাজারে গেছেন...আসুন উনি, দেখি!—তাহলে আমি একটু ঘুরে আসছি। পরিতোষ তখনই উঠতে চায়। কিন্তু মিনি হা হা করে ওঠে—একটু চা খেয়ে যান...বসুন। খানিকবাদে মিনি প্লেটে করে দুটি রসগোল্লা, দুটি বিস্কুট আর চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। তোমার কর্তা কোথায়? —কলকাতা গেছে...কাল আসবে। মাত্র কুড়ি বছর বয়স, এর মধ্যে দিব্যি কেমন গিন্নীবান্নী হয়ে গেছে। মিনি চা রেখে বেরিয়ে যায়। একটু পরে আবার ঘুরে আসে। পরিতোষের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলে—কানের দুলটা লাগিয়ে দিন না...খুলে গেছে। মৃদু হেসে পরিতোষ দুলটা লাগিয়ে দিতে দিতে বলে—এখনও কী এসব আমার করে দিতে হবে? মিনি মুখে হাসি মেখে চোখ বুঁজে বলে—উঃ, লাগছে—আঃ! ...চা শেষ করে পরিতোষ উঠে পড়ে—ঘণ্টা দুয়েক বাদে আসব, তৈরি থেকো। মিনির শাশুড়িকে বলে ও বেরিয়ে যায়, উড়তে উড়তে গিয়ে পৌছয় বড়ো শ্যালকের ধান ভানাই-এর কলে। ঝকর ঝক ঝকর ঝক কল চলার আওয়াজে আর কিচ্ছু শোনা যায় না। বড়োশালা চোখে, মুখে, মাথায়—জামাকাপড়ে, ধানের কুঁড়ো মেখে বসে আছে। চিৎকার করে বলে—কখন এলে?—এই কিছুক্ষণ। অদূরে কয়েকটি বুড়ি কুলোয় করে চাল ঝাড়ছে—কলের চোঙ্গার মুখে বস্তা বস্তা ধান ঢালা হচ্ছে—আশে পাশে বস্তার উপর বস্তা—প্রায় ছাদ ছুঁয়েছে।—সিজন এখন ভালোই যাচ্ছে...অ্যাঁ...কী বলেন? বড়োশালা মিটি মিটি হাসে।—জিলিপী খাবে...গরম জিলিপী...? ...এই খোকা...পাঁচুর দোকান থেকে দু'শ জিলিপী নিয়ে আয় তো। টেবিলের ড্রয়ার খুলে একগাদা নোটের মধ্যে থেকে সে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে। পরে পরিতোষের কানের কাছে মুখ এনে বলে—তাড়ি খাবে?...টাটকা তাড়ি? ব্যবস্থা আছে।—নিশ্চয়ই...আজ একটু নেশা দরকার...মনের কথাটা ঠিক ধরেছেন...।—তবে একটু বোস,...ফাঁকা না হলে...বুঝলে না, লোকেই বা কী বলবে...জামাইকে তাড়ি খাওয়াচ্ছি হাঃ...হাঃ। রতনকে জিলিপী খাইয়ে পরিতোষ বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।—ও

খেয়েদেয়ে চলে যেও রতন...নইলে আবার ফিরতে রাত হবে।

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে মানুষের পায়ে তৈরি পথ দিয়ে যেতে যেতে অবশেষে পরিতোষ একটা ভাঙা দালানের পিছনে গিয়ে হাজির হয়। একটা টিনের দোচালা, এদিক ওদিক কয়েকটি খাটিয়া পাতা—বড়োশালা দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ে—রামু...আছিস তো? আর কিছু বলতে হয় না। দুজনে খাটিয়ার উপর থেকে তেলকুটে লুঙ্গিটা সরিয়ে বসে পড়ে। ছোট্ট এক ভাড় তাড়ি এসে যায়, সঙ্গে নুন ছোলা—চাঁদের আলোয় পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ নীল আকাশে হু হু হাওয়া বয়—যেন সমুদ্রকূল থেকে বাতাস ছুটে আসে বেগে।—একটা গ্লাশ যে, আপনি খাবেন না...।—নাঃ, নেশাটা ছাড়বার চেষ্টা করছি...।—ভালো, ভালো...ক'মাসের জন্য?—না...সত্যি...এবার ছেড়ে দেব।—দেয়াটা কিছু কঠিন নয়...এতদিনেও কেন পারেন নি সেটাই আশ্চর্য!—বুঝবে না...যাদের সঙ্গে মিশতে হয়...বন্ধুরাই আমাকে নষ্ট করল।—এসব তো শুনে বলছেন...আমিও বলি, বাড়ির লোকেরাও বলে, তাই বলছেন...আসলে আপনি পারেন না...।—দেখবে...এবার দেখবে...রবির উপর কলের ভার ছেড়ে দিয়ে এবার কেটে পড়ব।—সে কী! আপনাদের ভায়ে ভায়ে ঝগড়া মিটে গেল?—অই মিচকেটার সঙ্গে আবার ঝগড়া কী? মা বোনদের ঠিকমতো দেখবে...ব্যাস—আর আমার কিছু দেখার নেই, বলার নেই। সেসব না করে যদি আবার নিজের পুঁজি বাড়াবার চেষ্টা করে তো ঘাড় ধরে বার করে দেব।—আপনি নিজে করবেন কী?—ভাবছি ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে একটা টাটার লড়ি বার করব...দুখানা লড়ি যদি করতে পারি...ব্যাস...বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলে পয়সা...।—হিঃ হিঃ...পায়ের উপর পা তুলে...অ্যাঁ...বেশ বলেছেন...পায়ের উপর পা তুলে...। কথাটা পরিতোষের কানে যেন গেঁথে যায়।—পয়সা করতে গিয়ে তো কম টাকা জলে দেননি।—লাক, বুঝলে হে স্রেফ লাক...লাক ফেভার করলে এতদিনে লাখপতি হয়ে যেতাম। পরিতোষ উঠে ঝোপের ধারে গিয়ে পেচ্ছাপ করতে শুরু করে।—আর লাক...এত বড়ো একটা পরিবার আপনার মুখ চেয়ে... ছেলেমেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখান...বোনদের দেখেশুনে বিয়ে দিন...অনেক কাজ বাকি আপনার।—ওসব কিছু না...ওদের ভগবান ঠিক দেখবে।—হোঃ হোঃ...হাঃ হাঃ...বেড়ে বলেছেন তো...ওদের জন্য ভগবান আর আপনার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক...অ্যাঁ...কী বলেন? বাপঠাকুর্দার তৈরি বাড়ি...ইঁটের পাঁজা বেরিয়ে পড়ছে...তৈরি ব্যবসা, ধার দেনায় এমন ডোবান ডুবিয়েছেন যে বেসামাল হলে ভাত জুটবে না...আপনার ভয় করে না।—নাঃ, ভয়ডর নেই আমার—আমার উপর গুরুর আশীর্বাদ আছে। অনেক বড়ো বড়ো বিপদ আমি কাটিয়ে উঠেছি।—বলেন কী? গুরু আপনাকে আশীর্বাদ করতে যাবে কেন? কী করেছেন?—বুঝবে না, বুঝবে না...ওসব তুমি বুঝবে না...জগতে সাধুপুরুষ আর কটা? সবই তো আমার মতন পাপীতাপী...তারা তো দিব্যি হেসেখেলে বেড়াচ্ছে...দোতলার উপর তিনতলা হাঁকছে...।—হুম্, তাদের গুহ্যদ্বারের ফুটোটাও ক্রমশ বড়ো হচ্ছে...জামাকাপড়ে ঢাকা থাকে বলে দেখেন না।—দূর...কী সব আজেবাজে বকছো...খাও খাও...তোমার সঙ্গে একবার খালাসিটোলায় যাবো...বুঝলে?—যাবেন...ভালো কথা...মিনির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওকে নিয়ে আসবেন, আমি বলে এসেছি...তাড়ি খেয়ে আমি আর যাব না।—মিনি আসবে? বাঃ বাঃ...খুব ভালো খুব ভালো। বেশ জমবে...না? আমি ঠিক এইরকম চাই...হই হুল্লোড়, ফূর্তি...বাড়িতে কেউ গোমড়া মুখে থাকে, একেবারে ভালো লাগে না...অথচ তোমার বউদি...গেলেই খেঁচাখেঁচি...। এবার পরিতোষ হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করে—আমিও চাই উৎসব...প্রতিটি দিন উৎসবের দিন, কেবল হাসো আর আনন্দ করো...মুখের হাসি যেন নিভে না যায় বাওয়া...।—আঃ, আস্তে...আস্তে...। সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষ সামলে নিয়ে

বলে—বুঝবেন না দাদা, আপনি বুঝবেন না...আমার যে আজ কীরকম লাগছে...আমার দুটো পাখা গজিয়ে গেছে...।—তোমার ভাইয়ের অবস্থা এখন কেমন?—একটু ভালো। জানেন, কদিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল, আমি মরেই যাচ্ছি। কিন্তু আজকে যে কী ভালো লাগছে...এই রিক্সা করে আসা...মিনির শ্বশুরবাড়ি...তাড়ি খাওয়া সব ভালো...সবই ভালো...আ-া-া ঃ, আমি আবার বেঁচে উঠছি। ফাঁকা ভাড়টাকে এবার পরিতোষ পা দিয়ে ঠেলে গড়িয়ে দেয়।

কখনো কখনো এরকম হয় না কী যে গোটা রাত একটা সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল—সকালে ঘুম ভাঙল—বোঝা যায় না কোথায় আছি বা না আছি—পরিতৃপ্ত মন আর নৈশ সুখস্মৃতি নিয়ে কুঁচকি চুলকাতে গিয়ে হঠাৎ টের পাওয়া গেল লিঙ্গটি দাঁড়িয়ে আছে—পরিতোষের ঠিক সেরকম হলো। প্রথম সে বুঝতে পারে না, কোথায় আছে। নিজের বাড়ি কি? সে বোকার মতো চারিদিকে তাকায়। চোখ একটু থিতিয়ে এলে সে বুঝতে পারে—এটা তার শ্বশুরবাড়ি। তার বাঁদিকে পদ্ম শুয়ে আছে, তার পাশে পাবলো...পাবলোর একটি হাত ছড়ানো স্তনের উপরে...শাড়িটা দলা পাকানো, পায়ের নীচে...পরিতোষ মনের সুখে আলতো আঙুলে নাড়াচাড়া করে...কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত থেকে থেকে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ...সে এবার পদ্মর হাতটাও টেনে আনে। পদ্ম তবু অঘোরে ঘুমায়। এবার সে পদ্মকে আস্তে আস্তে ছেলা মারে। প্রায় ১ মিনিট ৪ সেকেন্ড অতিবাহিত হবার পর পদ্ম জেগে যায়। তার ঠিকমতো সাড়া দিতে লাগে ৫০ সেকেন্ড। তারপর আরও ৫ মিনিট। তারপর পরিতোষ পদ্মকে বুকের নীচে টেনে নেয়। এইভাবে আরও ১০ মিনিট। পদ্মর চোখ আবেশে মুঁদে আসে। তখন পরিতোষ আরও ১০ মিনিটের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। এবং আরও ৫ মিনিট কাটার পর পদ্ম গোঙাতে শুরু করলে একসময় মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায় পাবলো তাদের দিকে চেয়ে আছে—আর চোখে সম্ভবত বিস্ময়। এবার পরিতোষ কিছুটা বিব্রত—বুঝতে পারে না, সে এখন কী করবে। তার গতিবেগ কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। আর তারই মধ্যে সে মা ও ছেলের নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনতে পায়।

—এই মা?

—কি বাবা?

—তাছে আছো, আছো না...।

—শুয়ে থাকো, বাবা আমার...সোনামনিটা একটু শুয়ে থাকো...। গদগদ স্বরে মায়ের উত্তর হয়।

—ননা খাবো...ননা দাও...আছো...তাছে আছো না...।

—এসো...বাবাটা, এই তো...নাও। মা একহাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে স্তনের বোঁটা মুখে গুঁজে দেয়। অন্যহাতে চেপে ধরে ছেলের বাবাকে, যাতে তার অবস্থানের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটে। কিন্তু পরক্ষণেই পদ্ম হতাশ হয়ে বলে ওঠে—কী হলো? হয়নি কিছুই। শুধু লিঙ্গটি কখন ছোটো হতে হতে যোনির মুখ থেকে খসে বেরিয়ে এসেছে। পরিতোষ গড়িয়ে নেমে যায়।

সকাল নটা। পরিতোষ তার প্রিয় জানালার কোনটিতে বসে। লিচু গাছের ডালটা বাতাসে কাঁপছে। পরিতোষের একবার চা খাওয়া হয়েছে। একতলার রান্নাঘর থেকে লুচিভাজার গন্ধ আসছে। কিছুক্ষণ আগে পদ্ম একটি বড়ো গলদা চিংড়ি দু'আঙুলে ঝুলিয়ে এনে তাকে দেখিয়ে গেছে। নীচে পাবলোর হুল্লোড় আর চেঁচামেচি। পরিতোষ সিগারেট টানতে টানতে অলসভাবে বাইরে তাকিয়ে আছে। হয়তো মনে মনে ভাবছে সকালের অসমাপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডটি দুপুরে কোনো

ফাঁকে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে কিনা—এমন সময় মিনি লুচির থালা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

—নিন, ঠান্ডা হয়ে যাবে...তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।

—দূর, তোমাদের এখানে এলে কেবল খাওয়া আর খাওয়া...। পরিতোষ সিগারেটটা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেয়।

—আহা, কী এমন খাওয়াচ্ছি...নিন...ভাজা লঙ্কা দেব?

—দাও,...রাতে ঘুম হয়েছিল?

—কেন হবে না?

—অজয় পাশে ছিল না তো...তাই বলছি...।

—ঢং রাখুন তো...আমার অত ইয়ে নেই।

—সেকি? এই একবছরেই পুরোনো?

—নিন, খান তো এবার...যাই, চায়ের জলটা দেখে আসি।

—বসো না, আমাকে আর একেবারেই ভালো লাগে না বুঝি?

—আহা, আমার ভালো লাগা না লাগায় কত আপনার আসে যায়!

—কী যে বলো...তোমরাই তো আমার সব।

—আচ্ছা আচ্ছা, জানা আছে...সব বুঝি, এখানে আসেন মাঝে মাঝে...খবর পাই...অথচ আমার ওখানে একবারও যান না। ...ভুলে গেছেন, তাই না?

এরপর পরিতোষের হয়তো বলা উচিত ছিল—অল্পদিনের জন্য আসি তো, ঠিক সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু সকালের যৌনমাদকতার ঘোর তখনও তার শরীরে লেগে, তাই সে মিনির হাত ধরে এক হ্যাঁচকায় কাছে টেনে আনে—আঁচল লুটোয়, ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ বেরিয়ে যায়, পরিতোষ সবে ওর বুকে গুঁজে 'তোমাকে কী ভোলা যায় মিনি' এইধরনের কিছু একটা বলতে যাবে—ঠিক তক্ষুনি বাড়ি কাঁপিয়ে এক গলা ফাটানো চিৎকার শোনা যায়—গ্যাল, গ্যাল, ধরো ধরো, পরমুহূর্তে শিশুকণ্ঠের এক তীব্র আর্তনাদ। একলাফে পরিতোষ ঘরের বাইরে আসে। পাবলো কাটা ছাগলের মতো ছটাচ্ছে, লাফাচ্ছে, দাপাদাপি করছে বারান্দায়। স্টোভের উপর সসপ্যানে চায়ের জল ফুটছিল, পাবলোর পায়ের ধাক্কায় উলটে ওর গায়ে পড়েছে। পরিতোষ দৌড়ে গিয়ে ওকে জাপটে ধরে। প্যান্টের বাঁদিকটা ভেজা। সঙ্গে সঙ্গে ইলাসটিকটা দু'আঙুলে টেনে নিমেষে নামিয়ে দেয়। দেখা যায় বাঁদিকের উরুর চামড়া কুঁচকে গেছে। ইতিমধ্যে ভিড় জমে যায়। শাশুড়ি এসে উপর থেকে খানিকটা স্পিরিট ছিটিয়ে দেন। পদ্ম কখন দৌড়ে এসে ওকে কোলে তুলে নিয়েছে। পরিতোষ পাটা টান করে ধরে রাখে—পাছে চামড়ার ঘষা না লাগে। পদ্ম যন্ত্রের মতো বলে চলে—হায় আমার একি হল...ওমা আমার একি হলো। মায়ার গলা শোনা যায়—সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছি...তড়বড়ে ছেলে...উঠেই আমার হাত ছেড়ে দৌড় লাগিয়েছে। পরিতোষ বলে—বার্নল...বার্নল! বার্নল খুঁজে পাওয়া যায় না—ততক্ষণ শুধু পাবলোর তারস্বরে চিৎকার। গলার শিরা ফুলিয়ে এমন চেঁচান চেঁচায় যে, মনে হয় এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। মিনিট খানেকের মধ্যে আলুবাটা আর বার্নল দুই-ই চলে আসে। পরিতোষ বলে—তুলো...তুলো লাগবে। টিউব টিপে পোড়া জায়গাটায় মোটা করে সে বার্নলের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। ব্যান্ডেজ করার জন্য তুলো সাইজ করে কাটে। তার উপর আরেকপ্রস্থ বার্নল লাগায়। তারপর সেই তুলো চেপে লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয়। কে যেন বলে—তুলো আবার লেগে যাবে না তো? পরিতোষ মুখ তুলে তাকায়—ছোটোশালা। আবার আরেকজন বলে—না, না, যা বার্নল দেয়া হয়েছে...। পরিতোষ মুখ তুলে তাকায়—ছোটোশালার বউ।...ঘণ্টা খানেক বাদে পরিতোষ আবার নিজে

জায়গায় ফিরে আসে—জানালার বাইরে তখনও লিচুগাছের ডাল—থালার লুচি বাড়ির হুলো বেড়ালটা খেয়ে চলেছে—আর মিনি মুখ শাদা করে বসে আছে—পরিতোষ কাছে গিয়ে বসতেই মিনি ফিসফিস করে বলে—আমি যদি তখন চায়ের জলটা দেখতে যেতাম তাহলে আর এই অ্যাকসিডেন্টটা হতো না—পরিতোষ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে—এখন এক কাপ চা খাওয়াও, নীচ থেকেই করে এনো—

বিকেলে পাবলো কিছুটা সহজভাবে ঘুরে বেড়ায়। পরিতোষ একটু নিশিন্ত বোধ করে। ব্যান্ডেজটা একবার খুলেও দেখে সে। বড়ো বড়ো ফোস্কা পড়ে গেছে বাম উরুর বাঁ দিকে। পিঠে কোমরের কাছেও দু'একটা। পাবলো তাকিয়ে বলে—আলু...বাবা, দ্যাতো আলু...। সন্ধ্যার সময় মিনির বর অজয় আসে। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে সে সকালের এই দুর্ঘটনার বিবরণ শোনে। মিনি কাপড় গুছিয়ে অজয়ের সঙ্গে চলে যায়। যাবার আগে অজয় বলে—দেখুন তো, কী কাণ্ড—দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে...।—মিনি যাচ্ছে কেন?—কী জানি? বললাম তো থাকো দু'দিন ..তা আজই যেতে চাইছে। বোধহয় এরপর আর ভাল্লাগছে না...তবে পাবলো খুব বাঁচা বেঁচে গেছে...আরও সাংঘাতিক হতে পারত।

পাবলোর পরিচর্যা করে আরও দু'টো দিন কাটে। কয়েকটা ফোস্কা ফেটে জল বেরিয়ে যায়। আরও একটা বার্নলের টিউব কেনা হয়। পোড়া জায়গাটাকে এখন আর ততটা ভয়ানক দেখায় না। চতুর্থ দিন সকালে পরিতোষ পদ্মকে বলে—আজ একবার ছোড়দাকে দেখতে যাব।—এই তো কিছুদিন আগে দেখে এলে।—তা হোক...বড়ো দুশ্চিন্তা হচ্ছে...কী জানি।—যাবে যাও, তবে কাল যেও...আমার বড়ো ভয় করে।—খুকুমণি, এতেই এত ভয়? দাঁতে দাঁত চেপে পরিতোষ চোয়াল শক্ত করে—আরও অনেক ভয় পাবে...বুঝলে খুকুমণি...আরও অনেক, অ-নে-ক ভয় পেতে হবে। —ওমা, এত রাগের কী হলো? ঠিক আছে, যেও।—না, যাব না। বলে পরিতোষ জামা গায় দিয়ে বেরিয়ে যায়।...আপন মনে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ পেছন থেকে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ শুনে একপাশে সরে যেতে না যেতেই সাইকেল তার পাশেই এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে।—কোথায় যাচ্ছেন? পরিতোষ, তাকিয়ে দেখে অজয়।—আপনার কথাই ভাবছিলাম। অজয় সাইকেল থেকে নেমে পড়ে।—উঠুন সাইকেলে...উঠুন না...।—আরে...কোথায় যাব?—শুয়োরের মাংস খাবার নেমন্তন্ন আছে,...চলে তো?—কোথায়...কার বাড়ি?—আপনি চিনবেন না...কালীপদ...আমার বাবার খাতক...শুয়োরের ব্যবসা করে...আমি বলেছিলাম ওকে একবার মাংস খাবার কথা, আজ বাড়িতে এসে চুপিচুপি বলে গেল—বোঝেনই তো, মা শুনলে অ্যাকেবারে কুরুক্ষেত্র।—আমি যাব না, ইচ্ছে করছে না, তুমি যাও—যাঃ, তা কী হয়, একা এসব জমে না। অজয় বিমর্ষ হয়ে বলে—চলুন না, আমি খবর পাবার পর আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।—কতদূর?—বেশি দূর নয়। সাইকেলে মিনিট কুড়ি।—ফিরিতে রাত হবে?—না, না, তাড়াতাড়িই চলে আসব...নিন উঠুন। অজয় উৎসাহে ফুটতে থাকে। পরিতোষ আর কথা না বাড়িয়ে কেরিয়ারে উঠে বসে। অজয় সাইকেলে প্যাডেল করতে করতে বলে—জানেন, কালীপদ আগে ডাকাতি করত।...পথ আর শেষ হয় না। মিনিট ২০/২৫ বাদে পরিতোষ জিজ্ঞেস করে—আর কতটা।—এই তো এসে গেছি। চারিদিকে অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের রাত। অসমান পথের উপর দিয়ে সাইকেল ক্রমাগত লাফায়, পরিতোষের পাছা ব্যথা করে। লোকালয় ছাড়িয়ে অনেক দূর তারা চলে এসেছে, খুন করে পুঁতে ফেললেও টের পাবে না কেউ।...আরও মিনিট পনেরো কাটার পর অজয় বলে—ওইতো, এসে গেছি! দূরে মাঠের প্রান্তে একটা আলোর বিন্দু মিটমিট করে।...বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন লোক বসেছিল।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে গাট্টাগোট্টা, আবলুসের মতো কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুলঅলা লোকটি একসারি কালো দাঁত বার করে হেসে বলে—আসেন দাদাবাবু, আসেন। সাইকেল থেকে নেমে অজয় বলে—জামাইবাবুকেও নিয়ে এলাম। পাকা বাড়ি। টিনের চাল। হারিকেনের মলিন আলোয় উঠানের পাশে একটা বাঁশঝাড়ের অস্তিত্ব শুধু টের পাওয়া যায়। সেখানে থেকে থেকে জোনাকি জ্বলে। বাতাস নেই, ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ নেই—এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা। অজয় কালীপদকে বলে—কতক্ষণ?...দেরি হবে না তো?—একটু বসেন...এই চাপানো হলো...হাত মুখ ধোবেন তো?...হাত, পা ধুয়ে ওরা বারান্দায় পাতা একটা চৌকির উপর বসে। অল্পক্ষণ পরে দু'কাপ অখাদ্য চা আসে। বারান্দায় যে লোকগুলো ছিল, তারা ভিতর দিকে চলে যায়। তাদের টুকরো কথাবার্তা শুধু শোনা যায়। পরিতোষ বারান্দায় বসে থাবড়ে থাবড়ে মশা মারে। আর একটা পরিচিত গন্ধ তার নাকে ভেসে আসে। অজয় পরিতোষের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই জমে না।...প্রায় আধঘণ্টাটাক বাদে কালীপদ এবং তার সঙ্গীসাথীরা পাশের ঘরে এসে ঢোকে। বারান্দার দিকের জানালা দিয়ে ওরা সব দেখতে পায়। ভিতরে একটি কাঠের সিংহাসন—তার উপর সম্ভবত কিছু ঠাকুরদেবতার ফটো। হ্যারিকেনের আলোয় ঠিক বোঝা যায় না? লোকগুলো ঘরে ঢুকে খোল বাজিয়ে এবার তেড়ে গান গাইতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে তাদের সংগীতচর্চা। পরিতোষ আর সামলাতে না পেরে বলে—এবার চলো অজয়। কিন্তু এতদূর এসে এতসহজে অজয় ফিরতে রাজি নয়। গান শেষ হলে ওরা এবার একযোগে চেঁচাতে শুরু করে—বোন্দে পুরুষোত্তম...বোন্দে পুরুষোত্তম...। তারপর শুরু হয় পাঠ। ছোট্ট একটি বই থেকে একজন জোরে জোরে পড়তে থাকে, শুনতে শুনতে পরিতোষ অজয়কে বলে—কথাগুলো তো বেশ...কী বই...জানো নাকি?—ঠাকুরের বই। অজয় উত্তর দেয়। পাঠ শেষ হলে ওরা আবার সকলে বারান্দায় এসে বসে। মাঝখানে হ্যারিকেন। কালীপদ বলে—জামাইবাবু এখানে আসেন। পরিতোষ চৌকি থেকে নেমে ওদের মধ্যে গিয়ে বসে।—দেখি বইখানা...যেটা পড়ছিলেন। ছোট্ট বইটি হাতে নিয়ে কালিমাখা হ্যারিকেনের আলোয় দেখে—'সত্যানুসরণ'।—পড়েন না, পড়েন না...আপনারা শিক্ষিত লোক...শুনি একটু।—গাঁজা আনুন, পড়ছি। কালীপদ থতমত খেয়ে বলে—খাবেন? গাঁজা? তারপর ভিতর থেকে ছিলিমটিলিম সব নিয়ে আসে। এতক্ষণ পরিতোষ এই গন্ধটাই পাচ্ছিল। আসবার সময় কালীপদ ঘরের রেডিয়োটা খুলে দিয়ে আসে।—বোঝালেন জামাইবাবু, দশহাজারী ভদ্দরলোকের বাড়িতেও এমন রেডিয়ো দেখবেন না। কথাটা সত্যি! এমন ভরাট, গম্ভীর, প্রচণ্ড আওয়াজ যে, মনে হয় টিনের চালটা বোধহয় উড়ে বেরিয়ে যাবে। ওদের মধ্যে একজন ছিলিম বানিয়ে পরিতোষের হাতে দেয়। পরিতোষ চোখবুঁজে প্রাণপণে টান মারে, খকখক কাশে, নাকমুখ দিয়ে খানিক ধোঁয়া বেরিয়ে যায়—পরিতোষ দম বন্ধ করে থাকে কিছুক্ষণ—তারপর ছিলিমটা কালীপদর হাতে দেয়। কালীপদ সেটা আর একজনের হাতে দিয়ে বলে—নাও হে সব, একে একে...। পরিতোষ এবার ঝুঁকে পড়ে বইটা পড়ার চেষ্টা করছিল। এমন সময় কালীপদ ওর হাতখানা টেনে নেয়—দেখি জামাইবাবু, আপনার হাতটা...। কিছুক্ষণ দেখার পর বলে—দিদির সঙ্গে আপনার তেমন বনিবনাৎ নেই...তাই না? পরিতোষ কোনো কথা বলে না। অজয় পরিতোষের দিকে তাকিয়ে। কালীপদ আবার হাত দেখে।—আপনার মা তেনার বউমাকে তেমন পছন্দ করেন না...কেমন...ঠিক বলিনি? ভেতর থেকে ডাক আসে—জায়গা হয়েছে। পরিতোষ হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নেয়। কালীপদ উঠতে উঠতে বলে—জামাইবাবু, আপনি একটা আকন্দগাছের শেকড় মাদুলি করে ধারণ করেন...ফল পাবেন...নিয়েই দ্যাখেন না...আপনারা তো বিশ্বাস করেন না...।

অল্পবয়সী একটি মেয়ে পরিবেশন করছিল—কালীপদ সামনে বসে—গোটা ঘরটা অপরিচ্ছন্ন এবং বিশৃঙ্খল—কিছু একটা গোপন ব্যাপার, চাপা রহস্য যেন লুকিয়ে আছে আনাচে কানাচে—হতে পারে পরিতোষের এটা মনের বিকার—হ্যারিকেনের ভৌতিক আলো দামি রেডিয়োর বার্নিশের উপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে—পরিতোষ একেবারেই স্বস্তি পায় না।—এটি আমার তৃতীয় পক্ষ। কালীপদ অল্পবয়সী মেয়েটিকে দেখিয়ে বলে। মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিকফিক করে হাসে।—কী করব বলেন, এতবড়ো সংসার...রান্না কেমন হয়েছে? —ভালো, খুব ভালো। অজয় চাকুম চুকুম মাংস চিবোতে চিবোতে উত্তর দেয়। বাইরে মেঘের গুরু গুরু ডাক শোনা যায়।—বৃষ্টি আসবে নাকি? কালীপদ বাইরে বারান্দায় যায়। ফিরে এসে বলে—মেঘ হয়েছে বেশ আকাশে।—তাড়াতাড়ি হাত চালাও অজয়।—আরে আস্তে খান, আরাম করে খান...বৃষ্টি হলে না হয় থেকে যাবেন।—নাঃ, বাড়িতে জানে না কিছু...চিন্তা করবে। কালীপদর তৃতীয় পক্ষের আবার ফিকফিক হাসি শোনা যায়।—করলই বা চিন্তা...একটা রাত্তির তো! বাইরে আবাব মেঘের গর্জন। মাংস মুখে দিলেই গলে যাচ্ছে। সঙ্গে মোটা চালের ভাত। কাঁকর আর ধানের জন্য পরিতোষকে কয়েক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে উঠে পড়তে হয়।—একি! কিছুই তো খেলেন না দিকি...খান আরেকটু...।—আর নয়...খুব ভালো খেলাম। পরিতোষ মুখ ধুতে বারান্দায় চলে আসে। কালীপদর তিননম্বর বউ বদনা হাতে আঁচাবার জল ঢেলে দেয়। জল ঢালে আর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিকফিক করে হাসে। পরিতোষ হাসির কারণটা বোঝার জন্যই বোধ হয় একবার চোখ তুলে তাকায়। গায়ে জামা নেই। পুষ্ট স্তন দুটি আঁচলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে। চোখে মুখে এক মদির হাসি। এমন সময় সমস্ত আকাশ ফালাফালা করে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। পরিতোষ মুখের জল ফেলে আকাশের দিকে তাকায়, আর কানের কাছে মৃদু গলায় শুনতে পায়—থাকি যান না আজ। আতঙ্কে পরিতোষের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে।...মিনিট দশেকের মধ্যেই কালীপদর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে ওরা বেরিয়ে পড়ে। ততক্ষণে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অজয় তার সাধ্যমতো দ্রুত সাইকেল চালায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে। সাইকেলের আলোয় মাঠের মধ্যে একটা আটচালা মতো দেখে ওরা সেদিকে দৌড়ে যায়। কড়কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ে কোথাও। আটচালার তলায় দাঁড়িয়ে অজয় ভীত গলায় বলে—আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল...কখন যে বৃষ্টি থামবে!—সিগ্রেট আছে?—দাঁড়ান, একটু গাঁজা এনেছিলাম...দেখি তো। অজয় পকেট থেকে পুরিয়াটা বার করে।—ধেত্তেরি, এক্কেবারে ভিজে গেছে।...একতলায় দরজার সামনে সিঁড়িতে বসে পরিতোষের বড়োশালা অপেক্ষা করছিল, পরিতোষকে দেখে উঠে দাঁড়ায়।—ইস্...ভিজে সপসপে...গিয়েছিলে কোথায়? আমরা সব ভেবে মরছি...পদ্ম বলছিল, তোমার ছোড়দাকে নাকি দেখতে গেছ...? পরিতোষ সংক্ষেপে সব বলে।—আরে, কালীপদর ওখানে...শুধু গাঁজা...হাঃ হাঃ...ওর বাড়িতে তো নেশার সব জিনিস মজুত থাকে...ওর আসল ব্যবসা কী জানো?...শুয়োরের রেকটামের মধ্যে সোনার বাট পুরে বর্ডার পার হয়ে চলে আসে...।—পাবলো কেমন?—ভালোই...আমি ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি।—লোডশেডিং নাকি?—হ্যাঁ, সেই সন্ধে থেকে...। কথা বলতে বলতে দুটো ছায়ামূর্তি অন্ধকার পার হয়ে আরও অন্ধকারে ঢুকে যায়।

বাস থেকে নেমে ছোড়দার বাড়ি না ঢোকা পর্যন্ত পরিতোষ মনে একটা গভীর উদ্বেগ বোধ করে। প্রতিবারই এরকম হয়। নিজেকে কিছুটা সহজ করে নেবার জন্য সে একটা সিগ্রেট ধরায়, তারপর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, আর যেতে যেতে সমস্ত কিছুর জন্যই সে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার চেষ্টা করে। কড়া নাড়লে বউদি দরজা

খুলে দেয়। পরিতোষ জুতো খুলে ভিতরে যায়। ছোড়দা বিছানায় শুয়ে। সমস্ত জানালায় পর্দা টানটান—তাই আলো কিছুটা কম। সম্ভবত ছোড়দা তার দুর্ভাগ্য বাইরের কোনো লোককে দেখতে দিতে চায় না।—আয়, বোস...মা, মাসিমা সব ভালো? পদ্ম, পাবলো ভালো আছে?—ভালোই সব...তুমি কেমন? পুঁজ পড়া কমেছে একটু?—ওই আর কী! ছোড়দা হতাশভাবে ঠোঁট ওলটায়।—কখনো বেশি কখনো কম। তবে মনে হয় ঘায়ের মুখগুলো ছোটো হয়ে আসছে। ছোড়দার বোন টি. বি—কোমরের কাছে রাইট ফেমার নেক-এ অপারেশন হয়েছে দু'বার। প্রায় একবছরের উপর শয্যাশায়ী। ঘা এখনও শুকোচ্ছে না, পুঁজ পড়ে।—আমাকে একটু বসিয়ে দিয়ে যাও তো। ছোড়দা এবার বউদিকে ডাকে। বউদি রান্নাঘর থেকে উঠে আসে। ছোড়দা দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলে বউদি ডান পাটা ধরে চৌকি থেকে নামিয়ে দেয়। একাজটা অবশ্য ডাক্তার তাকে নিজে নিজেই করতে বলেছিল। যতটা অঙ্গচালনা সম্ভব, ততটা করা। কিন্তু এখনও উঠে বসার সময় বউদি পাটা ধরে নামিয়ে দেয়, বিছানায় শোবার সময় আবার পাটা ধরে তুলে দেয়।—আঃ, নীচের রবার ক্লথটা কুঁচকে গেছে...ঠিক করে দাও। ছোড়দা বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকায়। বউদি ঠিক করে দেয়।—বিড়ির কৌটোটা দাও। বউদি টেবিল থেকে দেশলাই আর বিড়ির কৌটো দেয়।—আজকাল হাঁটার অভ্যেস করছো একটু?—ওই সকালে একটু...সন্ধের পর মশা, গরম...লোডশেডিং...আর হয়ে ওঠে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ। ছোড়দা পৃথিবীর দুঃখীতম লোকটির মতো মুখ করে বসে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—আর কোনোদিন হাঁটতে পারব মনে হয় না...ইনভ্যালিড পেনশন...তাই-ই কপালে আছে। পরিতোষ কোনো কথা বলে না। (গত একবছর ধরে তার ভাইকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে শোনাতে মুখ পচে গেছে, এখন স্রেফ সে ভয় দেখাতে পারে। হাঁ, ভয়! তাছাড়া সে বুঝতেও পারে না কোনো আশার বাণী শুনিয়ে এ পঙ্গু লোকটিকে চাঙ্গা করা যেতে পারে। তখন ছোড়দা তার কাছে। সাহায্য বিনা বিছানায় উঠে বসে না, হাতের কাছে থাকলেও জলের গ্লাসটা ধরে দিতে হয়। সেইসময় একদিন সকালে সে প্রবল উত্তেজনায় নিজে নিজেই বিছানায় উঠে বসে। পরিতোষ ঘরে এলে কাগজ-খানা বাড়িয়ে দেয়—পড়ে দ্যাখ। সরকারি কর্মচারীদের কিছু ডি. এ. বাড়ার সংবাদ ছিল সেদিন খবরের কাগজের হেডলাইন। পরিতোষ ভাবতে থাকে যে, সে বলবে কিনা, সত্যিই তুমি আর কোনোদিন হাঁটতে পারবে না কিংবা ইনভ্যালিড পেনশন ছাড়া তোমার আর কোনো গতি নেই।)

ছোড়দা : দাদাদের সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?

পরিতোষ : নাঃ, যাইনি অনেক দিন।

ছোড়দা : (দীর্ঘশ্বাস) এখানে তো কেউ আসেনি এখনও। দু'মাস হতে চলল তোর ওখান থেকে এসেছি—একটা খবরও কেউ নেয়নি।

পরিতোষ : আমি এরমধ্যে সেজদাকে ফোন করে জানিয়েছি সব।

ছোড়দা : জানালেই বা কী! আমাকে নিয়ে কারোরই মাথাব্যথা নেই। (এবারও পরিতোষের বলতে ইচ্ছে করে, সত্যিই তোমাকে নিয়ে কারোর কোনো মাথাব্যথা নেই। তুমি বেঁচে থাকো কী মরে যাও, তাতে কারোর কিছু এসে যায় না। কিন্তু সে চুপ করে থাকে। বলার মতো সাহস তার হয় না। সে বলতে পারে না কিছু। চুপ করে একটা বই-এর পাতা ওলটায়।)

ছোড়দা : আমার অবস্থা তোরা কেউ বুঝবি না...কী যে কষ্ট...।

পরিতোষ : (বই থেকে মুখ তুলে) তুমি অন্যেরটা বোঝো?

ছোড়দা : (একটু থেমে) হয়তো তাই...আমিও বুঝি না, কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েদের যদি

এরকম হতো...তাহলে?

পরিতোষ : এর একটাই উত্তর আছে। ছেলেমেয়েদের মতো তোমাকে তারা অতটা ভালোবাসে না।

(পরিতোষ এবার বুঝতে পারে ছোড়দা চটে গেছে। মুখটা তার সামান্য লাল। সহজ সত্যটি হজম করতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। ছোড়দা চুপ করে থাকে। বোধহয় ভাবতে থাকে ভাইদের আর কোনোভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় কিনা।)

ছোড়দা : হয়তো আমি কিছুটা বোকা...তবে ধারণা ছিল, ভাইরা যত দূরেই থাকি...আলাদা থাকি...বিপদে আপদে নিশ্চয়ই সবাই পাশে এসে দাঁড়াবে। (পরিতোষের এবারও বলতে ইচ্ছে করে, তুমি তো খুব আশাবাদী দেখছি। কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না। চুপ করে থাকে। শেষে বিড়ির কৌটো থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়। তার মনে হতে থাকে—এবার ওঠা দরকার।) কড়া নড়ে ওঠে। বউদি দরজা খুলে দেয়। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢোকেন। পরিতোষ ছোড়দার মুখের দিকে তাকায়! মুখশ্রীর কী অদ্ভুত পরিবর্তন! শক্ত চোয়াল, মুখ গম্ভীর, ঠোঁট চাপা, ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত, তারই মধ্যে কোনোক্রমে কটি কথা ছিটকে আসে—বসুন। ভদ্রলোক খুবই কাচুমাচু হয়ে চেয়ারে বসেন।

—কেমন আছেন?

—এই আছি আর কি...।

তারপর আবার চুপচাপ। কোনো কথা নেই। ছোড়দা মনোযোগের সঙ্গে জানালার বাইরে কী এক দৃশ্য যেন অবলোকন করে। কিছুতেই চোখ ফেরায় না সেদিক থেকে। কে বলবে, এই লোকটাই কিছুক্ষণ আগে দাদাদের সহানুভূতির জন্য হেদিয়ে মরছিল।

—কোনো দরকার টরকার হলে বলবেন...কাছেই আছি তো!

—বলব।

এই প্রতিবেশিটিও যে কোনোদিন তার প্রয়োজনে লাগতে পাবে সেটা বোধহয় ছোড়দা এখনও বুঝতে পারছে না।

—আমাদের অফিস লাইব্রেরিতে বই আছে অনেক...যদি পড়েন তো এনে দেব।

—এখন দরকার নেই।

এবার পরিতোষ উঠে দাঁড়ায়—চলি আজ,...বুঝলে...আগামী সপ্তাহে ডাক্তারের কাছে যাব তোমার অবস্থা বলতে...তার আগে আসব আবার...।

বলতে বলতে পরিতোষ একলাফে ঘরের বাইরে এসে জুতো পায়ে দেয়। বউদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে—সে কী, চা খেলে না?—নাঃ, কলকাতা যাব একটু। কাজ আছে। চিত্রাকে দেখলাম না তো, কোথায়?—কাছেই গেছে, বন্ধুর বাড়ি।—এ মাসে টাকা পয়সা আর কিছু...?—না, এ মাসে আর লাগবে না। পরিতোষ দরজার বাইরে পা দেবার আগে একবার ঘরের ভিতর তাকায়। ভদ্রলোক সংকুচিতভাবে তখনও বসে। বোধহয় বুঝতে পারছেন না এখনই উঠে পড়াটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে কিনা!...ট্রেনে করে পরিতোষ কলকাতা চলে আসে। রাস্তা দিয়ে হাঁটে আর ভাবে—প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কেন সে ছোটদাকে দেখতে আসে? কেন? একি শুধুই উদ্বেগ আর দুঃশ্চিন্তা? নাকি অই পঙ্গু লোকটির মধ্যে সে নিজেকে, নিজের ভাগ্যকেই দেখতে পায়। তাই বার বার এই ছুটে আসা! আর যতবারই আসে ততবারই সে বুঝতে পারে—বিছানায় ওই যে মানুষটি শুয়ে আছে সে পরিতোষ নয়।...হাঁটতে হাঁটতে পরিতোষ কলেজস্ট্রিট চলে আসে। কোনো বন্ধুর সঙ্গে এখন দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তবু পরিচিত জায়গাগুলি টুঁ মেরে

দেখে। না, কেউ নেই। শেষপর্যন্ত খালাসিটোলায় চলে যায়। ভিতরে একবার চক্কর দিয়ে দেখে কেউ আছে কিনা। নেই। কোনার দিকে পরিচিত কয়েকজন পিপের উপর বোতল রেখে খাচ্ছে। ১০ বছর আগেও পরিতোষ এদের একই জায়গায়, একই ভঙ্গিতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করতে দেখেছে। আজও তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। (হয়তো কাছে গেলে শোনা যাবে সেই ১০ বছর আগের একঘেয়ে কথাবার্তাই এখনও তারা বলে চলেছে। রামের জায়গায় শ্যাম হয়েছে...শ্যামের জায়গায় রাম।) এদের অনন্ত যৌবন, এরা কোনোদিন বৃদ্ধ হয় না—দাঁত পড়ে, চুল পাকে, বাল পাকে না। পরিতোষ বেরিয়ে সোজা স্টেশনে চলে আসে। তারপর ট্রেনে চেপে শ্বশুরবাড়ি।

পরদিন দুপুরবেলা পরিতোষ খেয়েদেয়ে শুয়েছে। ঘুমিয়েই পড়েছিল। এমন সময় পদ্ম এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়।—এই...শোনো...পাবলো কেমন করছে...এসো এঘরে...। পরিতোষ ধড়মড় করে উঠে বসে। গিয়ে দেখে পাবলোর জ্বর—জ্বরের ঘোরের ছটফট করছে। পদ্মকে জিজ্ঞেস করে—কখন টের পেলে?—এই তো একটু আগে, খেয়েদেয়ে যখন শুয়েছি তখনও ভালো, গা ঠান্ডা...এই খানিক আগে হাত দিয়ে দেখি গা পুড়ে যাচ্ছে।—কটা বাজে দেখ তো?—তিনটে।—শিশু-হাসপাতাল তো এখন খোলা...তাই না?—ওতো রাতদিন খোলা থাকে। ডলি বলে ওঠে।—তাহলে তোমার দাদাকে ডাকো, আমাদের সঙ্গে যাবে। একটু পরেই বড়োশালা লুঙ্গির গেরো দিতে দিতে ঘরে ঢোকে—কী ব্যাপার?—পাবলোকে নিয়ে একটু হাসপাতাল যাব।...চারজন যখন হাসপাতালে পৌঁছায় তখন বেলা চারটে। বড়োশালা সাইকেলে পিছন পিছন আসছিল। পদ্ম আর পাবলোকে নিয়ে পরিতোষ রিক্সায়। একবার পদ্ম—আমার বড়ো ভয় করছে—ব'লেই কান্নার মতো হেঁচকি তুলে সামলে নেয়। খানিকটা পথ এগোবার পর পরিতোষ বলে—পাবলোকে একবার আমার কোলে দাও তো? পাবলোকে কোলে নিয়ে পরিতোষ ওর জ্বরের উত্তাপ নিজের শরীরে শুষে নিতে থাকে।...হাসপাতালে পৌঁছে বড়োশালা ভিতরে চলে যায়। ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে ডাক্তার আসে। ডাক্তার পরীক্ষা করে নার্সকে ডেকে পাঠায়। নার্স এলে তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে কী সব যেন বলে। পরিতোষ কিছু শুনতে পায় না, বুঝতে পারে না। কানের মধ্যে কেবলি একটা ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। নার্স তাদের ডেকে নিয়ে একটা ঘরে বসায়। কিছুক্ষণ পরে ট্রেতে করে জল নিয়ে আসে, তার মধ্যে হলুদমতো একটা লোশন মিশিয়ে তুলো দিয়ে ঘায়ের চুমড়িগুলো পরিষ্কার করতে থাকে। পাবলো চেঁচায়। বড়োশালা এবং পরিতোষ শক্ত করে ওর হাত, পা ধরে থাকে।

—ঘা তো প্রায় শুকিয়ে গেছে। পরিষ্কার করতে করতে নার্স বলে উঠে।

—জ্বরটা হলো কেন? এতক্ষণবাদে পরিতোষ কথা বলতে সাহস পায়।

—ইনফেকশন থেকে..ভয়ের কিছু নেই। পরিষ্কার করা শেষ হলে নার্স বলে—আর ব্যান্ডেজের দরকার হবে না...দেখুন স্কিন গজিয়ে গেছে। এরপর একটি ইনজেকশন দিয়ে দেয় নার্স।...ফেরার সময় মাঝপথে বড়োশালা বলে—তোমরা যাও তাহলে, আমাকে আবার কলে বসতে হবে। পাবলো ইতিমধ্যেই ঘামতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, পাখি উড়ে যেতে দেখে সে হাততালি দিয়ে বলেও উঠেছে—ওই দ্যাতো, কী সুন্দর এ্যাততা পাখি! একটা মিষ্টির দোকানের সামনে পরিতোষ রিক্সা থামায়। পদ্মকে বলে—নামো একটু, চা খাব। রিক্সাঅলাকেও সে সঙ্গে আসতে বলে। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে—ভালো রসগোল্লা আছে?—আছে। —তিনজায়গায় চারটে করে দিন আর একজায়গায় দুটো।—পেছনের বারান্দায় গিয়ে বসুন। ভালো জায়গা আছে। পেছনের বারান্দায় গিয়ে পরিতোষ মুগ্ধ হয়ে যায়। বারান্দায় টেবিল চেয়ার

পাতা, লালটালির ছাদ অনেকটা বাড়ানো—তারপরেই ছোট্ট নদী। ইচ্ছে করলে বারান্দা থেকে নেমে সোজা হেঁটে নদীর পাড়ে চলে যাওয়া যায়। রসগোল্লা আসে, পরিতোষ কেবলি মুগ্ধ হয়ে নদীর দিকে তাকায়—নদী, নদীর জল, জলের উপর পড়ন্ত বেলার আলো। পাবলোকে পদ্মর আদর করে রসগোল্লা খাইয়ে দেবার দৃশ্যও সে পরম প্রীত হয়ে দেখে।

—বেশ লাগছে, তাই না? পদ্ম হেসে ঘাড় নাড়ায়।

—নদীর পাড় পর্যন্ত যাবে একটু...?

—চলো...।

নদীর পাড়ে পৌঁছবার পর বাঁদিকে তাকালে পরিতোষ শ্মশানটা দেখতে পায়। নদীটা ঠিক তার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে। ওই শ্মশানটা পদ্মদের পূর্বপুরুষদের তৈরি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পরিতোষের মনে হয়, পাবলোকে নিয়ে আজ যদি তাকে ওখানে যেতে হতো...তবে...? বুকটা মুচড়ে ওঠে তার। তখনও এমনই সোনালি আলোয় নদীর জল ঝিকমিক—সেকি তখনও এইভাবে মুগ্ধচোখে অইসব প্রকৃতির ছবি দেখতে পারত—পারত না। যদি পারত...যদি পারত...যদি! সে দুঃসাহসের কথা ভাবতেই পরিতোষ মনে মনে শিউরে ওঠে।—ফিরে এসে পরিতোষ মুখ বদলাবার জন্য গরম সিঙাড়া আর চা খায়। খাওয়া শেষ হলে পাবলোকে কোলে নিয়ে বাইরে আসে। ক্যাশবাক্সের সামনে দোকানদারকে টাকা দেয়। দোকানদার খুচরো পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে পাবলোকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে।

—পুড়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—পুরুষাঙ্গটা খুব জোর বেঁচে গেছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শৈলেশ্বরের বিড়ম্বনা—তার জয়

সুরস্রষ্টা মেন্ডেলসনের কথা মনে পড়ে যায়। ইহুদি বাখের সোনাটা প্রচার করার জন্য যখন তাকে সোপর্দ করেছিল হিটলারের পূর্বপুরুষের জার্মানি, তখন প্রধান বিচারক পোপ (কত নম্বর?)—এর দিকে চোখ তুলে তিনি বলেছিলেন—আমি জানি না কোন সুর-গান হেরাটিক্যাল বা নন-হেরাটিক্যাল, ক্রিশ্চিয়ান বা অ্যান্টি-ক্রিশ্চিয়ান—আমি জানি, দুনিয়ার স্রেফ দু-জাতের মিউজিক আছে—ব্যাড মিউজিক আর গুড মিউজিক।

ক্ষুধার্ত বা হাংরি লেখকদের লেখা-লিখি নিয়েও এই-ই আমার কথা—তা গত এগারো বছর ধরে এই একই। লেখা হলে গু-মুত নিয়েও হয়, না হলে আস্ত, আখাম্বা মেয়েছেলে নিয়ে হামলাহামলি করলেও হয় না। ফলে, শেষ অব্দি—সবকিছু করেও লেখা হলো কী—এখানেই সমস্ত প্রশ্ন একপায়ে দাঁড়িয়ে যায়।

খুব নিরাসক্ত হয়েই আমি পড়ার চেষ্টা করি শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা। অবশ্য 'কবিতা' শব্দটি নিয়ে ক্ষুধার্তদের প্রবলেমের অন্ত নেই। তাঁরা বহুবার সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন যে, উক্ত ধনতান্ত্রিক শব্দটিকে তাঁরা স্বীকার করেন না—অর্থাৎ, কোনো ফর্মই তাঁদের মান্য নয়। আর, সত্যিই তো, 'কবিতা' বললেই কোনো না কোনোভাবে অনিবার্য ফর্মের কথা এসে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে লিখেই যান কবিতায় বই, শৈলেশ্বর[১] তো স্পষ্ট এহেন অভিমত জানিয়ে দেন—গোটা আট-দশেক কবিতার জনক জীবনানন্দ—মাঝখানে বড়ো ফাঁক—তারপর যা লিখেছে, সে ও তার বেরাদাররাই, এই যা-টাও কবিতা নয় কি?

নতুন বিগ্রহের পুজো জমাতে গেলে অবশ্য খানিকটা ঢাক ঢোল পেটাতেই হয়, হয়-কে নয় করতে হয়, এলোপাথাড়ি কটু-কাটব্যও করতে হয় অন্য বিগ্রহদের নিয়ে, বলতে হয়, "কৃষ্ট খৃষ্ট কেটে গেল, বাকি রইল যিশু।" তবু একসময় বাদকের হাত ক্লান্ত হয়, গলা। প্রথম চমক কেটে গেলে লোকে ক্রমশ অভ্যস্ত, অবশেষে উদাসীন হয়ে আসে। আর, আজকের অকহতব্য সময়ে, পশ্চিমবাঙলায় যখন দু-দুটি যুক্তফ্রন্টের পতন, সি পি আই এম-এল-এর করুণ ব্যর্থতা, লুম্পেনদের ক্রমশ উর্দি বদল করতে করতে এখন রাজ্যময় গারগানতুয়ার চেহারায় আত্মপ্রকাশের কালে, যখন রাতের শো-য় বউকে নিয়ে সিনেমা দেখে সেফলি বাড়ি ফিরে আসাই মানুষের কাছে চূড়ান্ত স্বাধীনতার চেহারা—এই নিশ্চরিত্র, ভাবনাবিমুখ, তাৎক্ষণিক জীবনযাপনের কালে কে আর মন দেয় ভাঙা আবছা-কালো লেডের বিষ মাখা আর হলুদ কাগজে উগরে দেয়া কয়েকটি তরুণের অবিরাম শোনিতস্রাবে?

কিন্তু দু-চারজন মনস্ক পাঠকও যদি ক্লান্ত না হয়, যদি ডুয়ার্সের পাহাড়তলিতে ডিনামাইট ফাটানোর ক্লান্তির পর একজন ইঞ্জিনিয়ারের শ্রান্ত হাতও ক্যাম্পের হাজ্যাকের নীচে খুলে বসে সেই রক্তস্রাবী পৃষ্ঠাগুলো, তবেই তো এক জন্মের গ্লানি কাটিয়ে আশাতীত পুরস্কার পেয়ে যান

কিছু লেখক, যাঁরা কাঁচের বাসনের মতো নিজেদের অস্তিত্বকে ছুঁড়ে দিয়ে হার অনিবার্য জেনেও অহরহই আত্মখনন করে যেতে চান। উল্লুক পুলিশ একদিন হাংরিদের পেছনে পেছনে ছুটেছিল। এ ব্যাপারটা আমাকে একদম ভাবায় না। ভাবায়, সম্পূর্ণ শৈত্য ও উদাসীনতাকে উপেক্ষা করেও কোন শক্তিতে এঁরা আজও যৎসামান্য সঙ্ঘের শক্তি ও নিজেদের জীবনচর্চাকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কবিতা লিখে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের কারো কারো সমস্যা, দুর্গতি, দারিদ্র্যের কোনো তুলনা নেই।—নির্ভরযোগ্যভাবে আমার কাছে তা জানতে পারেন। এঁদের সততা, এঁদের দুর্জয় প্রয়াস আমাকে বিস্মিত করে, খানিকটা বা বিব্রত-ও। একদম জাগতিক অসফলতা নিয়ে কীসের জোরে, এঁরা লড়ে যাচ্ছেন এবং লড়েই যাচ্ছেন—এ ব্যাপারটা আমার বুঝতে বুঝতে বেলা পড়ে যায়—বোঝা হয়ই-না বস্তুত।

তাহলে কি সমস্ত আপাত নৈরাজ্য, আপাত-যৌন ক্লিশে, আপাত-বিশৃঙ্খলার ঝড়ের ভেতরে কোথাও কেন্দ্র ছিল, কোথাও ছিল সেই ভয়াবহ, সকরুণ, সর্ব-নির্যাতনকারী সত্যি? যার স্বাদ একবার পেয়ে গেলে কোনো কিছুই আর বাজে না?

এ-সব কথা আমার মনে প্রথম উঁকি দিয়েছিল শৈলেশ্বরের ‘জন্মনিয়ন্ত্রণ’ পড়তে পড়তে, যা এখন প্রায় বিশ্বাসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, কারণ অনুতাপীর গ্রন্থের মতো আমার টেবিলের উপরে খোলা রয়েছে তার নতুন ‘অপরাধীদের প্রতি’। হাংরিদের লড়াইকে রচনায়, কবিতায়, কেউ যদি সত্যিকারের বয়স্ক ও তাত্ত্বিক রূপ দিয়ে থাকে সে শৈলেশ্বর, আমি মলয় রায়চৌধুরীর কিছু অনবদ্য গদ্য রচনার কথা স্মরণ রেখেও এমন উক্তি করছি।

শৈলেশ্বরের আছে সেই চোখ, যা ‘*বেশি ও গোপন কিছু দেখেছিল*’ (বড়ো দাগ আমার)। আমি জানি, কী বিচিত্র, এক নির্বাসিত বন্দীর জীবন যাপন করে শৈলেশ্বর। আশির নখর আমি জেনেছি তার গার্হস্থ্য-জীবন, তার দণ্ডাজ্ঞা বহনকারী অক্ষরমালা। বিদিশিদের সঙ্গে তুলনা করতে আমি ভালোবাসি না, শৈলেশ্বরকে আমি অননুকরণীয় শৈলেশ্বর হিসাবেই দেখি। আমাকে ভীষণ ভাবে জাগায় তাঁর শেষতম বইয়ের নাম-কবিতার অমোঘ পংক্তিগুলি, “একহাতে রিভলভার ও তিনটি আওয়াজ—মৃতদেহদুটি পাশাপাশি পড়ে, একটি সেই যুবকের যে সকলকে পরীক্ষা করতে এসেছিল—আশাতীত নির্জনতায় হত্যাকাণ্ড হবার পর পকেট থেকে একটুকরো কাগজ পড়ে গেছে,

এসো, রমণশীল মানুষ, সূত্র ধরে খুঁজে যাও তোমার বংশানুক্রমিক অপরাধীদের।” ঠিক এভাবেই চোখ-মাথা সাফ রেখে আমি পড়ে যাই তার—“আমি কবি নই/কারণ আমার আঙুল বেঁটে ও মোটা—তবে/এই পরিচয়ই বহন কর সর্বহারা, হৃদয়হীন হও,/মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দাও, মিষ্টি কথা বলতে শেখ,/প্রয়োজন দেখা দিলে মাথা নিচু কর, ডান দিকে যাও, বাঁ দিকে ফের ; /ঘৃণা কর, ঘৃণা কর এবং ঘৃণা কর,/এ অরণ্যে একি ঘোষণা বাঁচো এবং বাঁচতে দাও/এ মরুতে ইতিহাস কী? এ বেশ্যাখানায় ভালোবাসা কী?”

আলটিমেট-কে জেনে যাওয়ার যে সর্বনাশ ওঁৎ পেতে থাকে, শৈলেশ্বর কীভাবে যেন সেই অনিবার্য খদের কাছে পৌঁছে যায়, নিজেকে চূড়ান্ত নিপীড়ন করে চলে যেতে চায় সেই আদিম অথচ শেষতম সত্যে, যেখানে পর্দার আড়াল থেকে ঘোষক বলে ওঠে, “তোমরা ধনী বলিয়া আমাদের দেখতে পাওনা কিন্তু গরীব বলিয়া আমরা সব সময়েই তোমাদের দেখি!” আমাকে ভয়ঙ্করভাবে সন্ত্রস্ত করে, “কোথায় তুমি মধ্যরাতের ঈশ্বরী, উরুর মধ্যে মুখ/ডুবিয়ে ভালো লাগছে না কেন? ভয়?”

আমি কমিউনিজমে বিশ্বাসী, কমিউনিস্টরাই পৃথিবীর শেষতম কথা বলে না। স্বয়ং মার্কস কোনো অবিশ্বাস্য অন্তিমের ফতোয়া জারি করতে চাননি। শৈলেশ্বর যে বিশ্বাসে ন্যস্ত, অর্থাৎ

আগ বাড়িয়ে বলা, সর্বহারার হারার বা জেতারও কিছু নেই—এই জয় বা অ—জয় বলতে সে কী বোঝাতে চাইছে, তার সম্যক প্রমাণ পেতে আমাদের অবশ্য মেথুসেলার আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তবু জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য-সন্ধানে নিবিড় শৈলেশ্বরের নাচিকেত প্রচেষ্টা—আমার রাজনীতির শিক্ষার এক্তিয়ার সম্ভাবনা-ভুক্ত না হলেও—সৎ বলে মনে হয়। এবং মনে হয়, তাই চ্যালেঞ্জের যোগ্য, যা অসৎ, মানে ছেঁদো নয়।

শৈলেশ্বরের কবিতা ভূতগ্রস্ত—এক-একা, বুঝি বা রীতিমতো সূক্ষ্মতায় চলাফেরা করে—তার মাথা প্রথমে নিচু হয়ে, তারপর ভেঙে ঢুকে গেছে বুকের মধ্যে। তার কবিতায় আছে সেই ভয়ানক। কারণ সে যা দ্যাখে, কবিরা তা সাধারণত দ্যাখে না। কিন্তু, ভয়ানক এই কারণে যে তার দৃষ্ট-বিষয়ের ওপর সে কবি বা পাঠকদের অনভ্যস্ত চোখ টেনে ফিরিয়ে নেয়—ফলে শেষোক্তদের আমূলে পৌঁছে যায় তুমুল অসহায়তা। সে-অর্থে হয়তো তার কবিতার বোধ 'জ্ঞানের ভেতরে জ্ঞান' হয়ে থাকার কাজ করে।

'অপরাধীদের প্রতি' গ্রন্থে শৈলেশ্বরকে আমার সত্যপরায়ণ বলে মনে হয়েছে। না, কোনো আপ্ত বা নীতিবাক্য উচ্চারণ করছি না আমি—খুব ভেবে চিন্তে 'সত্যপরায়ণ' শব্দটিকে তার মূল অর্থে বসিয়েছি। অর্থাৎ শৈলেশ্বর যা বলে, তা এমনভাবে বলে, যা নিজের জোরে দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়িয়ে যায় যাবতীয় অহমিকা খণ্ডনের পর প'ড়ে থাকা ভীতির ওপর। যখন সে বলে, "দীর্ঘস্থায়ী নিঃসরণের ফলে ধাতুকলিজাও শূন্য হয়ে গেছে, আবার দেখা যায় সূর্যেরও নিরুত্তেজ দগ্ধ অসুস্থতা, কাম ও নির্বিকার শৃঙ্খল, ডাইনির মুখে মায়াপাশ, বাবুদের অমানুষী হাসির শব্দে উপরতলার যাদের আমরা খান্‌কি বলে জানি এবং যে অবাঞ্ছিত খাপগুলি কাগজ চাপা দিয়েও ধর্মান্ধ মধ্যযুগ প্রতিরোধ করা যায়নি—এই একটি কারণেই প্রেম ও ধ্যানবিকার ছাড়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অভিজ্ঞতা ফাটা চিহ্নের মতো চৈতন্য জেগে ওঠে—ধূ ধূ ময়দানে আমরাই তো একা শুয়ে থেকে গুলি খাই...জানি মানুষের মতো কেবল সন্তানভক্ষণকারী জন্তুরাই বেঁচে থাকবে" অথবা "...নই কর্তাভজা স্বাধীনতা-সেবী—রুশচীন বহ্ন্যুৎসবে আমার/কোনো আহুতি নাই—ইন্দিরা কেন গান্ধী হয়ে গেল এ নিয়ে/ভাবনা নাই, গ্রামের বিক্ষোভকারীরা শহরে এসে দেখল সেখানে/বিক্ষোভ জমা হয়ে আছে—গ্রামের শান্তিবাদীরা শহরে/এসে দেখল সেখানে শান্তি বিরাজ করছে—"তখন যে উৎসকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, মৃত্যু, ক্রোধ, খাদ্য, কামনা ও অনিরাপত্তার সেই মূল কেন্দ্রেই আবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় শৈলেশ্বর। এত গভীরভাবে এত ভেতরে বসে চিন্তা করতে পারে সে, যা এখনকার প্রসারিত অথচ শিকড়হীন ভাবনার নামে ঢালাও তারল্যের কালে শুধু অসম্ভব নয়, বর্জনীয় বলে মনে হয়। অন্তত মনে করতে পারলে সংকীর্তনে নিশ্চিতে গলা মেলানোর আর কোনো বাধাই থাকে না। সুখদ সান্ধ্য রমণীয়তায় নির্বিঘ্নে হেঁটে যাওয়া যায় মায়াবি রুমালে মুখ মুছে। আর আমাদের মতো কোনো মূঢ়, কোনো আত্মসুখী-ই বা কান পেতে শুনতে চায় সেই সতর্কীকরণ, "যে অস্ত্র হাতে পেলে আমরা প্রবল হই তা পাওয়া যায় না বলেই অসভ্যের নখ বসে যায় বুকে...।" প্রশ্নের অতীত এই কষ্ট কি অমানুষের?

মরা মেয়েকেও মা ছেঁড়া আঁচলে কাঁধে ঢেকে লঙ্গর খানায় নিয়ে যায় দু-বাটি খিচুড়ি পাবে বলে। যাকে সে রক্ষা করতে চেয়েছিল, তার সমাজ-ব্যবস্থা-তাকেই ধ্বংস করে দেয়। তাই ছত্রখান আকাঙ্ক্ষার পোড়ামাটির ওপরেই চলে প্রাণহীন, জঠরসার হা জীবনযাপন—এবং এখান থেকেই তৈরি হয় শৈলেশ্বরের কবিতার ব্লু প্রিন্ট। সাম্প্রতিক কালের কবিতায় দুর্বল, উদাসীন ও অস্থিরমতি আমাদের দোদুল্যমানতার ওপর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ দাঁত বসাতে পেরেছে শৈলেশ্বর—এ বিষয়ে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি শুধু আশা করব, পৃথিবীর সব সমাজব্যবস্থাকে সে এক করে

দেখছে না এবং তার উপলব্ধি তার দেশকালের পরিধি ছাপিয়ে যত্র তত্র বিরাজ করার মূর্খ অহঙ্কার দেখানোর ঝুঁকি নেয়নি। তবু যদি সে বলে, আর কোনোরকম আত্মিক, জাগতিক, মানবিক অভ্যুত্থানে বিশ্বাস নেই তার, যদি সে বলে, তবে খুব নম্রভাবে কমরেড লেনিনের গ্রন্থাবলীর নবম খণ্ডের ৩৬৭-৬৮ পাতা থেকে উদ্ধার করে দিতে চাই নীচের পংক্তিগুলো—

"অভ্যুত্থান একটা বড়ো কথা...বড়ো কথাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সাবধানতার সঙ্গে। এ গুলিকে বড়ো কাজে লাগানোর অসুবিধেগুলি ভয়ানক।"

যে আম বিক্রি করে, আমি তার কাছে আম-ই চাই, কাঁঠাল নয়। কিন্তু শৈলেশ্বর যখন সবকিছুর গোড়া ধরেই টান দিতে চায়, তখন তাকে আন্তরিকভাবে আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে যে সেকি জেনে গেছে—আমাদের জয়েরও কিছু নেই হারানোরও কিছু নেই? এই উপলব্ধির সমর্থন সে কোথা থেকে পেয়েছে? সে কি বিশ্বাস করে, আমরা শুধু চেষ্টা করে যাই, এই করে যাওয়াটাই চূড়ান্ত, সত্যি সত্যি অর্জনযোগ্য কিছু নেই, সবই পরিণামবিহীন? জীবন ও বোধের সাধারণ পরিধির বাইরে কোনো গোপন সত্যকে আবিষ্কার করা যদি কবির কাজ হয়, "স্বপ্নেই আমরা সত্য হয়ে থাকি"—একথাই যদি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে শুধু এই কথাটাকে ঘোষণা করার জন্য কী বেঁচে থাকা? যাবতীয় জিগজাগ সত্ত্বেও মানুষের অগ্রগতির মানে কি শুধু এই।

আমরা জানি, নিষ্ঠুরতা ঘটে গেছে। শৈলেশ্বর বলেছে, 'প্রমাণ দিতে হবে ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের'—আত্মার, সমাজের, মানুষের এই মহতি বিনষ্টির স্বাক্ষরও আমরা আদি প্রস্তর যুগ থেকে একাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বহন করে আসছি। তার কথা ধার করেই বলতে পারি, মুনাফা কেন্দ্রিক সভ্যতা "আশাতীত নির্জনতায় হত্যাকাণ্ড" সমাধান করেছে। কিন্তু যখন শৈলেশ্বর বলে, "ক্ষতিপূরণের জন্য বেঁচে আছি", তখন প্রাক্তনের পাপের লাশ কাঁধে বহন করে নিয়ে যাওয়ার বেশি কোনো সজীবতা, অস্তিত্বের অর্থ আমার কাছে জাগে না। আলটিমেট রিয়্যালিটি কী তা শৈলেশ্বরও জানে আমিও জানি—কোনো মোহন মিথ্যেতেই আমরা আর আশ্বস্ত নই, জানি "হুজুর ঢুকলে আমাদের সকলকে দাঁড়িয়ে থাকতে" হয় আজও, কিন্তু খালি পূর্বতন ভুল ও অপরাধ শুধরে নেয়ার মধ্যেই কি আমাদের সামগ্রিক ইতি কর্তব্যের শেষ হয়? মূর্খ অলীক আশায় আমরা বিশ্বাসী নই। অবিরল স্খলনের শোচনীয় ইতিহাস দেখতে দেখতে উদভ্রান্ত বলেই আমরা পুরোপুরি সব কিছুকে পালটাতে চাই। কিন্তু শৈলেশ্বর কথিত হত্যাকাণ্ডের দায়ভাগ যেমন বহন করি আমরা, তেমনি ঐতিহ্যের ইতিবাচক অর্জনগুলোকেও অস্বীকার করি না। যদি শৈলেশ্বর মনে করে যে, না, সে জাতীয় কোনো অর্জনই নেই—তাহলে ওই বিন্দু থেকেই তার আর আমার লড়াই। আপাতত 'পরমায়ুহীন বিদ্রোহী'র মতো 'নকল দাঁত' খুলে রেখে ঘুমোতে চাইছে শৈলেশ্বর, একই সঙ্গে চাইছে, 'সিফিলিসের বিষ' ও 'বাঁচার ওষুধ'—এমনকি বলেও ফেলছে, "যেমন দণ্ডাজ্ঞা চাই এবং মুক্তির স্মারক লিপিও চাই।" আমি আমার মতো করে এসব কথাবার্তার একটা মানে করে নিই। আমার মানেতে শৈলেশ্বরের আপত্তি থাকতে পারে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কারণ সে সেইজাতীয় বিরল কবি যে নিজের অগোচরেই নিজের কবিতায় একটির পর একটি ডাইমেনশন তৈরি করে চলে এবং তার ইপ্সিত খাঁচায় কবিতাকে ঢোকাতে চাইলেও অসহায়ভাবে হঠাৎ একটি হাত, একগুচ্ছ চুল বা রিবন ফ্রেমের বাইরে বেরিয়েই থাকে। এই বহুমাত্রিকতাই শৈলেশ্বরের বিড়ম্বনা। তার জয়।

১। "গোটা আট দশ কবিতার জনক জীবনানন্দ—মাঝখানে বড়ো ফাঁক"—এটুকু আমার, কিন্তু তার পরের সংযোজন অমিতাভ দাশগুপ্তর—শৈলেশ্বর।

শৈলেশ্বর ঘোষ

প্রদীপের চর্মরোগ

তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক হস্তীজননীর মতো যেন বুদ্ধি স্খলিত দাঁতালো সন্তানদের প্রসবে প্রসবে পৃথিবার ফুটপাত ও ময়দান ভরে ফেলেছে।

প্রদীপের চর্মরোগ বিষয়ে কিছু বলার প্রেরণা যে আজ আমি বোধ করছি তার উপকরণ যে সেই ১৯৬৪-৬৫-৬৬তে যখন বইটি লেখা হয় তখন এবং এখনও আমরা সকলেই সেটির নায়ক। কিন্তু প্রদীপ যে পার্ট প্লে করেছিল তা-ই প্রদীপের দৃষ্টিতে তার এবং আমাদের সকলের চর্মরোগ। পৃথিবীর চামড়ার উপর সবচেয়ে বড়ো অসুখের নাম মানুষ। ওই ক্ষুদ্র বইটি নিয়ে যে আজ এতদিন পরে কিছু লিখছি তার প্রধান কারণ, বইটি রচিত হবার ১০ বছর বাদে দেখা গেল সেটি একটি বহুতল বিশিষ্ট কৃস্টাল হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আরও, প্রদীপ তার, আমাদের ও মানুষের স্বপ্ন কল্পনা ও মৃত্যুকে এই ক্ষুদ্র বইটির ৭টি রচনাতে (কবিতা বা কবিতা নয় এসব কূটতর্ক আমাদের নয় কারণ কবিতা বলতে আমরা বুঝি আত্মার এক বিশেষ অবস্থার প্রকাশ) যেভাবে উপস্থিত করেছে, তা পড়ে চমকে উঠতে হয়। স্বভাবতই সে যখন হস্তীজননীর বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে যায়—তখনই কবির জগৎ ভিন্ন এক অর্থ পায়—বস্তুত সেই সত্য জগৎ, যা সে যন্ত্রণা, দুঃখ, অপভ্রমণ, আত্মবিস্ফোরণ ও আত্মঘাতের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে। বুকের অন্ধকারে চিরে তাকে দেখতে হয় অগ্নিসূর্য, তখনই তার সমকামী আত্মায় সিটি বেজে ওঠে। এ কথা তো ঠিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবনব মৃত্যুশব্দ ভীতিশব্দ রক্তশব্দ জয় করে তবে তাকে উঠে দাঁড়াতে হয়—চেনে কি তখন তাকে কেউ, বাবা মা স্ত্রী পুত্র কন্যা আলোচক, সমালোচক বন্ধু বা গণিকা, কেউ—কারণ যাত্রা শুরু করে সে 'বাবা আমার বর্বরতা তোমার বর্বরতাকে ধর্ষণ করেছে।'—এই ঘোষণা দিয়ে। তার আবিষ্কৃত সত্য তাকে এরপর ঘাড় ধরে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। জীবনানন্দ আত্মগোপন করতে গিয়েও এই জন্যই আত্মহত্যা করে। এ হচ্ছে সেই পথ, যে পথে অনেকটা এগোলে মার ভূত প্রেত দানব মুখ খিঁচিয়ে আসে পিছনে ফেরার কোনো উপায় থাকে না, অভীপ্সা তার স্বপ্ন, স্বপ্নেই সে সত্য, বাস্তব থেকেই যার আভাষ সে পায়—তীব্র চিৎকার করে উঠে সে—আর শোনা যায় বাঁধন ছেড়ার পটপট শব্দ, যারা ছিঁড়ে গিয়ে পেছনে পড়ে তাদের উদ্দেশ্যে সে কী বলে শুনুন :

মা তোমার গর্ভের চেয়ে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে সভ্যতা ও ব্লাস্টফার্নেস ৭২ বর্গমাইল বালুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি, সময় চেতনাহীন, পরস্পরের শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে সার পদার্থ, কোনো অভিযোগ নেই, শয়তান একদিন শয়তানের গলা টিপে ধরবে—আমার ১৬‴...স্বপ্ন ডাইমেনশনে চিৎকার করতে করতে আমার গলার

রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে—চেপে ধরেছি ফুসফুস—যা এইমাত্র চৌচির হয়ে গেল—মা এসো—৩নং দেশি মদ ও ফিনাইলের ককটেল গিলে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, তোমাকে এই অবস্থায় চালান করে দেওয়াই আমার একমাত্র প্রতিশোধ নেওয়া পৃথিবীতে—পৃথিবীতে আমার পরজন্মের আর দরকার নাই...কোনো ইতিহাসে এই লম্পটের কোনো দাগ থাকবে না, ১০,০০০ বছর পরেও শেষ হবে না এই শতাব্দী, এর ঝুল সরাতে সরাতে মানুষ একদিন বধির ও ক্ষমতা বিমুখ হয়ে যাবে।

তার দেখা শেষ হওয়া মাত্রই সে ভয়াবহ ঘোষণা করে, এই দেনা পাওনার জগতে, লাভক্ষতির পাটাতনে সে তো কোনো পক্ষে নেই, (তবে সে কি এতই নিষ্ঠুর? হ্যাঁ, সে নিষ্ঠুর, তবে নিজেরই প্রতি। আর মূর্খরা একেই তার স্বার্থপরতা উদাসীনতা এবং অহংকার বলে মনে করে) সে জানে দেনা পাওনার সঙ্গে সে আর যুক্ত নয়, কেবল সে যুক্ত সত্যের সঙ্গে। লাভ লোকসানের সঙ্গে যুক্ত নয় বলেই কি পৃথিবী তাকে অস্বীকার করতে চায়? তবু সম্পূর্ণ বিযুক্ত নয় সে, বিযুক্ত হতে পারে না—তার মতোই যারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, তাদের জন্য তার অন্তরে থাকে সেই বেদনা, যা তাকে পরিশুদ্ধ করে আরও। শুধু তার প্রতি যে অসম্ভব অবিচার হয় তার বিরুদ্ধে কিছু বলার থেকে যায় : "আদালতে একদিন তার জন্ম মঞ্জুর হয়েছিল বলে—তার প্রতিশোধ নিচ্ছে সে" চর্মরোগের কবিতাগুলিতে প্রদীপ প্রচণ্ড ও তীব্র—সোজাসুজি সে তার অনুভূতিকে জোরগলায় বলে, এজন্য অনেকেই ভিরমি খায়, আমি জানি। কিন্তু এটাই প্রদীপের পদ্ধতি।

মানুষের কোষের অধঃপতনের স্বাদ আমরা জেনেছি—সমগ্র শরীরে এই অধঃপতন বারবার না ঘটিয়ে আমাদের উপায় নাই অবশিষ্ট প্রজন্মও এই মরণশীলতার মধ্যে চলে যাবে।

মানুষ কি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে? না। মানুষ পারে না, জন্তুও পারে না, কবি পারে। সভ্যতা লালিত মিথ্যাচারকে, অন্যায়কে, পীড়নশক্তিকে সেই চেনে স্পষ্ট এবং তাকে আঘাত করে, সভ্যতাও তাই কবিকে অভিযুক্ত করে। প্রায় নিয়মের মতোই কাজ করে চলেছে বহুদিন থেকেই এটা। বারবারই সেই হাজত গুলিতে প্রবেশ করতে হয় এবং লৌহকপাট চুরমার করে বেরোতে হয়। এটা কিংবদন্তী, গালগল্প নয়। সে ছিঁড়ে পড়ছে এক বিশৃঙ্খলা ও অর্থহীনতায়—সূচীভেদ্য অন্ধকারেই তাকে কাজ করতে হয়, পেতে হয় আত্মশৃঙ্খলা ও সৃষ্টির মূল নিয়মের ইঙ্গিত।

দারুণ ঐশ্বর্যের মধ্যে মা আমি তোমার অবিশ্বাসী মুখ দেখতে পাচ্ছি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে বিশ্বাস করতে পারছো না তুমি, আমিও, ভাবতে পারি না তোমার হাজার গণ্ডা মৃত্যুর পর কী করে আমার জন্ম হলো, পৃথিবীর ৫২ গুজবে এই বর্বর আবিষ্কার একাকার হয়ে যায়, তোমার পায়ের নীচে আমি সেই অগ্নিপিণ্ডের দহন দেখতে পাচ্ছি না আমার আতুর ঘরের বোঁটকা গন্ধ শুঁকতে পারছি না তোমার মাংসের ভিতর, কী করে তুমি পালিয়ে থাকবে আমার গায়ে-কাঁটা দেয়া থেমে গেলে, "প্রদীপ চৌধুরী বলে কাউকে চিনি না তো" খাঁটি বেশ্যা যখন চিৎকার করে উঠবে?

প্রশ্ন, সন্দেহ, দুঃখ ; আমাদের চিন্তার অভি-অভ্যন্তরে টপ টপ করে জল পড়ে। মানুষ ও অমানুষে সহবাস হয়—জননী, জায়া—এইসব জীবন রহস্যের খিলান পার হতে হতে মাথা আর মাথার মতো থাকে না, স্থানচ্যুত হয়, শুরু হয় তথাকথিত শরীরের বিকার, অভিশপ্ত শরীর পোকারা কুরে কুরে খায়, তখন নৃত্যানুষ্ঠান মরণের। স্বপ্ন ছিল জীবন, স্বপ্নভঙ্গেই মৃত্যু—মরণের নাচ। যে সভ্যতা থেকে পশু ও পাখীরা গভীর জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সেই সভ্যতার

স্রষ্টা মানুষ এই নৃত্যই ভয় পায়—স্বপ্নহীন রূপান্তরহীন তাদের জগতে তারা কিলবিল করতে থাকবে চিরকাল : প্রকৃত ঘটনাটি প্রদীপ বলে

পুনরায় অপেক্ষা করতে করতে কখনো জামা কাপড় নষ্ট করি, দমবন্ধ করে বীর্য আটকে রাখতে চাই কমপক্ষে পাঁচমিনিট ফলে বহু চেষ্টার পরও সারাদিনের ভালোবাসা আর ফেরানো যায় না—এই হলো প্রকৃত ঘটনা।

সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায় এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায় কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়—মনে হয় এই সমস্ত জিনিস অনেকদিন পর্যন্ত হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রলোক পর্যন্ত কোথাও রয়ে যাবে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার

[দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশের একজন খ্যাত গল্প লেখক। নূতন রীতির অন্যতম প্রবর্তক। তাঁর কয়েকটি রচনা তখনকার দিনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। 'ঘাম' গল্পটি এরকম একটি। তারাশঙ্কর তাঁকে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট এবং 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি ছোটো পত্র-পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশ করতে চান, কিন্তু এমনও আবার বিশ্বাস করেন যে বড়োপত্রিকাকে নিজের উদ্দেশ্য ব্যাবহার করে নিতে পারে লেখক। হাংরি রচনাতেও যৌনতার বাড়তি কিছু ছিল বলে মনে করেন। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পুতুল নাচের ইতিকথা-কে একটি শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক এবং সরীসৃপ-এর মতো গল্প তার কাছে অস্বস্তিকর। তার মনে হয় মানিকের দেখাটা হয়তো ভুল ছিল। এসটাবলিশমেন্টের দেয়া মিহি ভাত কাপড় নিয়ে লেখকের অপমৃত্যু বরণ করার চেয়ে দুঃখবরণ করাই এই সমাজ ব্যবস্থায় লেখকের প্রকৃত কর্তব্য তার মতে।] —সুভাষ ঘোষ

প্রশ্ন : আমাদের এখানে লিটারারি এসটাবলিশমেন্ট মনোপলি এরকম কিছু আছে কি? কেউ কেউ এটা অস্বীকার করতে চায়। আপনার মতামত জানতে চাই—

দী : এসটাবলিশমেন্টের বিশাল কালো হাত নিশ্চয় আছে। আর এ নিশ্চয় হঠাৎ আবিষ্কারের ব্যাপার নয় এবং আমরা কমিউনিস্ট প্রগতিশীলেরা এর বিরুদ্ধে সবদেশে সব সময়েই লড়ছি। সব ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেই ওরা একটা ভিসিয়াস সার্কল তৈরি করেছে—উদ্দেশ্য মুনাফা—এই সমাজ ব্যবস্থাটাই আসলে শোষণের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যে কোনো উপায়েই হোক মুনাফাই চরম লক্ষ্য তার, এই কারণে বিশাল জাল সে বিস্তার করে কখনো কঠিন, রঙচঙে কখনো, উদ্দেশ্য, ব্যাপক পাঠক গোষ্ঠীকে করায়ত্ত করা—এবং মুমাফা লোটা, এবং কখনই পাঠককে শ্রেণি ও শিল্প সচেতন করা নয়, তার মনোরঞ্জন করা [এই ভাবেই তো সে রোবোট পাঠক কুল তৈরি করছে] এই কাজ করতে হলে তাকে শ্রেণি চাতুর্য অবলম্বন করতে হয়। [কমার্স ও করাপসান দুই-ই চালায় সে] একচেটিয়া পুঁজি জাতীয় মেরুদণ্ড ইনটেলিজেনসিয়াকে পচন ধরিয়ে দিতে পেরেছে বলেই আমি মনে করি। এসব কাজে লেখক ও লেখাই তো তাদের মূলধন এবং অনুরূপ কারণে কিছু লেখক তাদের সংগ্রহ করতে হয়। বানাতে হয় লেখক, ভাড়া করতে হয় লেখক, একই উদ্দেশ্যে কখনো তারা মুকুট পরিয়ে দেয় কারো মাথায় আবার নামিয়েও নেয় কখনো ব্যবসায়িক কারণে।

[এই সব লেখকরা বুর্জোয়ার spectacle এর অংশ আর এই spectacle দিয়েই চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তার পাঠককে। বুরজোয়া এসটাবলিসমেন্ট সমাজের মস্তিষ্ককে চালনা

করে—সমরেশ বসুর লেখাগুলিকে সে দিব্বি গিলিয়ে নেয় তার পাঠককে এবং সমরেশ বসুর বিরুদ্ধে, হাংরিদের বিরুদ্ধে যে রকম, সে রকম কোনো সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দেয় না, তার কারণও এই নয় কি? একথা অস্বীকার করা যায় না যে এসটাবলিশমেন্ট ফতোয়া দিলে অনেক গণ্যমান্য পণ্ডিত, লেখক কবি একহাত নয় দুই হাত তুলে দেয়। আমরা ভুলতে পারি না হাংরি আঘাতে এসটাবলিশমেন্ট এতটা বিচলিত হয়েছিল যে সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা খবর রটনা করেছিল যাতে এই লেখকরা জীবিকাচ্যুত হয়ে শায়েস্তা হয়—যারা হাংরি রচনাকে যৌনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল এবং এখনও করে তারা কিন্তু সমরেশ বসুর তৃতীয় শ্রেণির লেখাগুলিকেই বেশ গেলে]

প্রশ্ন : এসটাবলিশমেন্টে যেসব লেখক ঢুকে পড়েছে বা পড়বে তাদের বিষয়ে আপনি কী বলেন?

দী : একজন লেখক স্বাভাবিকভাবেই পাঠক চায়। লেখককে কাজে লাগানো যাবে মনে করলে এসটাবলিশমেন্ট তাকে আহ্বান করে গ্রহণ করে, উৎসাহ দেয়। পরোক্ষে উপদেশও দেয়। আত্মপ্রকাশের বড়ো ময়দানে বিচরণ করতে লেখকের আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্রমশ তাকে দেয়া হয় জীবন যাপনের প্রয়োজনের বাড়তি জিনিস, সেই বাড়তি জিনিসটাকে সে শেষ পর্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করতে থাকে। একদিন সেই লেখক দেখে কখন সে প্রতিক্রিয়া ও মুনাফা শিকারীদের জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার আর উপায় নেই, সে আর বেরোতে পারে না। ফলে লেখক ও তার ভোগের উপকরণের আহরণকারী উভয়েরই উভয়কে দরকার হয়ে পড়ে। একজন বিলাসে বাঁচতে চায় আর একজন তার বিলাসী মনের বিষিয়ে ওঠা উপাদান দিয়ে সমাজে পচন ধরিয়ে দিতে চায়—সমাজের শ্রেণি সমূহের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন না হওয়া গেলে মানুষের পক্ষে সমূহ বিপদ কারণ শুধু আমাদের দেশেই নয় সব দেশেই* প্রতিষ্ঠান চায় সমস্ত রকম স্বাধীন অভিব্যক্তি, প্রকৃত সত্যের প্রকাশ বন্ধ করতে, আর তাদেরই হাতে মাসসিডিয়াগুলোও, তাই তাদের অসীম ক্ষমতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়।

*১৯৭০-এ আমেরিকার এসটাবলিশমেন্ট বিরোধী লেখক সম্মেলনে প্রায় অপরিচিত এই লেখকের উক্তি থেকে ওই দেশের অবস্থাটা বোঝা যায় কিন্তু রুশ বা ওইরকম আরও উন্নত দেশগুলিতে এসটাবলিশমেন্টের কী অবস্থা, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জানার আগ্রহ রয়েছে।

Hugh Fox : I wanted to make a statement as a writer, an unknown writer, and talk about two different kinds of repression. Now 'political' repression does't bother me because I'm not on any side. But what bothers me is the "Cultural" repression that exists in this country which is I told you-is the truth. I don't heve a job right now and I am trying to make my living by writing. So I am writing short stories, you know, like ten pages a day. And so what happens is this, that I can publish in the *Cimmaron Review*. they don't pay. I write an article which I think might good for *Esquire*, but the title is *'Coronary'*. And so then I can't send it to esquire because some of their reader might have coronary problems. I write an article about woman and some how my woman are either too liberated or not liberated enough with cloth Fetishes. But cloth fetishes are not librated enough for Evergreen Review. So here I am at 38 and I'm in the same condition as you know people like F. Scott Fitzgerald. Now F. Scott Fitzgerald ruined himself by publishing for *Post*. He destroyed himself. He was a prostitute. That what happened to F. Scott. Fitzgerald, and that is what happened to a lot of other writers in this Country.

ANY SEED SYLLABLE OF MANTRA PRONOUNCED ALTERS THE ENTIRE MOLECULAR STRUCTURE OF THE UNIVERSE.

প্রশ্ন : লেখাকে প্রফেশন হিসাবে নেয়ার বিপদ কি এই?

দী : শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বলতে পারেন খানিকটা তাই। কিন্তু অনেক লেখক আছেন, যাঁরা চাকরি করেন ও নিয়মিত লেখেন—তারাও কি সব সময় ভালো লিখছেন? সুতরাং সর্বক্ষণের লেখক হলেই খারাপ বা ভালো লেখক হয়ে যাবেন—এ কথা বলা যায় না। আসলে এই সমস্যাটা সব সময় চাহিদা, যোগান, লেখা ইত্যাদির সম্পর্কিত থেকে যায়। লেখকের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা তাঁর লেখার আয় থেকেই হওয়া উচিত। এই সমাজ ব্যবস্থায় লেখাকে জীবিকা করার ক্ষেত্রে কোনো কোনো দিক দিয়ে বিপদ আসে—(১) লেখককে বাজারি কাগজ, প্রকাশক ও বুদ্ধিহীন পাঠকের চাহিদা মেটানোর জন্য লিখতে হয়। (২) ইচ্ছামতো লেখা তাঁর পক্ষে বাস্তব কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁকে বহু চাপ ও বাধ্যবাধকতার শিকার হতে হয়। (৩) অকপট সত্যি কথা লেখার উপায় তাঁর থাকে না। কারণ একটি অসত্য ব্যবস্থাই তাকে রুটি ও রুজি জোগায় এবং সে লেখকের আনুগত্য দাবি করে। এই প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রথম পর্বের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে এসে যায়। সস্তা যশ ও কাঁচা টাকার লোভী না হয়ে যথেষ্ট কষ্ট-দুঃখের ভেতর দিয়ে তারা লিখে গেছেন। তরুণতর মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকদের ভেতরেও আপোশহীন সাহিত্য রচনার জন্য এই দুঃখবরণের উদারহণ যে দেখা যায় না, তা নয়।

প্রশ্ন : এটা তো মনে করা খুবই সঙ্গত, একজন লেখক শ্রেণি বিভক্ত সমাজে খুব সচেতন শ্রেণির একজন?

দী : খুবই সত্যি কথা, আসলে একচেটিয়া কাগজের অধিকাংশ লেখকই এসটাবলিশমেন্টের ভিসিয়াস সার্কলে পড়ে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের দেয়া সুখ আরামে প্রচার মাধ্যমে গুলিয়ে ফেলেছে নিজেকে। এসটাবলিশমেন্ট নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নাই। আমি বরাবরই কম লিখতাম, এখন তো প্রায় লিখিই না। ভবিষ্যতে যদি কিছু লিখিও তা যদি কোনো ছোটো কাগজে ছাপা হয়, তার মধ্যে সার পদার্থ থাকলে ভবিষ্যতের কোনো না কোনো পাঠক নিশ্চয় তা খুঁজে পড়বে, যেমন আমরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অস্বীকৃত অনেক লেখকের লেখা খুঁজে খুঁজে পড়ি। সত্য ও স্বাধীনতায় আস্থা থাকলে সে কখনই সুখ ও আরামের ভেতর গেঁথে যায় না। প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা তার পক্ষে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে উঠে।

প্রশ্ন : যেসব লেখক এসটাবলিশমেন্টকে সাহায্য করছে তাঁরা কি সমাজের আর দশটা কোরাপসন ফ্যাকটরের অন্যতম—তারা তো সাহিত্য যা মানুষকে খানিকটা সঠিক জীবন যাপনের নির্দেশ দেয় তা নিয়ে ভণ্ডামি করছে, করছে ক্যারিয়ার?

দী : আপনার কথা আমি অনুধাবন করতে পারছি...কিন্তু কথাটাকে এক ব্র্যাকেটের মধ্যে ফেলতে কোথায় যেন আমার সামান্য বাধা আছে। অপ্রতিষ্ঠানিক জগতের কি কিছুই

দায়িত্ব ছিল না? সত্যিই এসটাবলিশমেন্ট মারাত্মক...শুধু সাহিত্য কেন? গান সিনেমা নাটক সব কিছুর উপর তাদের থাবা বিস্তার হয়েছে কিন্তু নন এসটাবলিশমেন্টই বা এর বিরুদ্ধে এগোতে পেরেছে কতটা? অধিকাংশ তথাকথিত লিটল ম্যাগাজিন বস্তুত বড়ো কাগজের বাণিজ্য সফল লেখকদের স্তুতিপত্র হিসাবে কাজ করে এবং সম্পাদকেরা চায় কর্তাদের ভজনা করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে। হ্যাঁ, আমি স্পষ্টই বলছি, সাহিত্যে বাজারি লেখকদের মতো এরাও সততাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

প্রশ্ন : তাহলে আজকের এখানকার প্রকৃত কবি লেখকদের কর্তব্য কী?

দী : তাকে লিখে যেতে হবে, তার লেখার পাঠক সংখ্যা অতি অল্প জেনেই সেই মুষ্টিমেয় সচেতন পাঠকের মধ্যে দিয়েই তাকে ধীরে ধীরে পৌঁছাতে হবে তার ইপ্সিত জায়গায়।

প্রশ্ন : এই মুষ্টিমেয় পাঠকের কাছে পৌঁছানোই কি হবে পরবর্তী জেনারেশনের সৃষ্টি?

দী : এই মুষ্টিমেয় অথচ সচেতন পাঠকের সংখ্যা বাড়তে বাধ্য এবং তা বাড়ানোর দিকে লেখকেরও সতর্ক প্রয়াস থাকা দরকার।

প্রশ্ন : ইদানীংকালের বাংলাভাষার বাজারি লেখক ও তাদের লেখা সম্পর্কে কিছু বলুন—

দী : গ্রন্থের সংখ্যা ও ওজন দিয়ে সাহিত্যের বিচার হয় না। ইদানীং দেখা যায় একজন কমার্শিয়াল লেখককে বছরে ৩।৪টি এমনকি তারও বেশি উপন্যাস লিখে যেতে হয়। তার অবস্থা অনেকটা ফিল্ম হিরোর মতো। কিছুকাল অনুপস্থিত থাকলেই জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়—প্রতিষ্ঠান তাকে জনপ্রিয় করেছে, এই ইমেজ বজায় রাখতে গিয়ে সে মরীয়া হয়ে লিখে চলেছে কিন্তু তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে. ফলে লেখাকে তরল করতেই হয়, হয়ে যায়। ওই লেখা হয় তরলমতি পাঠকের অবসরের সঙ্গী। লেখক এইভাবে জীবিকা সমাধা করে। প্রতিষ্ঠান পুঁজি শক্ত করে তাছাড়া আজকের অধিকাংশ সমালোচককেও কী ক্ষমা করা যায়? কই কাউকেই তো বলতে শুনলাম না "ওহে তোমার আর দরকার নাই, তুমি আর লিখো না—," তারা এক-একজন জ্ঞানপাপীর ভূমিকা নিয়েছেন। এ ধরনের লেখক ও সমালোচক দুজনেরই দুজনকে দরকার।

প্রশ্ন : অনেকে বলে এসটাবলিশমেন্ট কথাটা ক্লিশে হয়ে পড়েছে।

দী : কথাটা কিছু পরিমাণে সত্যি বটে। অনেক ভেকধারী লিটল ম্যাগাজিন আছে, তারাও এসব বলে আজকাল, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত ওই সস্তা যশ আর কাঞ্চন কৌলিন্য। শব্দ ব্যবহারে ব্যবহারে ভোঁতা হয়ে গেলেও তার নিহিতার্থ কিন্তু নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন : একজন এসটাবলিশমেন্ট বিরোধী লেখক কি এসটাবলিশমেন্টের ডাকে সাড়া দিতে পারে? দিলে সে কি লাভবান হয়? না লাভ হয় ওদেরই?

দী : খুব কঠিন প্রশ্ন, কিন্তু আলটিমেটলি এসটাবলিশমেন্ট সেই লেখককে ব্যবহার করতে পারলে লাভবান হয় বলেই অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ কমার্শিয়াল মনোরঞ্জনী লেখাগুলিই তো অধিকার করে আছে বিশাল পাঠক শ্রেণিকে। আবার একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে একচেটিয়া কাগজে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণির রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। [তাও কি এসটাবলিশমেন্ট তার প্রয়োজনেই করেনি? এবং লেখককে ব্যবহার করে নিজের জঘন্য উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে না—প্রলুব্ধ করাই তো তার কাজ] আসলে এসটাবলিশমেন্ট সাধারণত সিরিয়াস লেখকদের লেখা কখনো কখনো ছেপে একই সঙ্গে পাঠককে ধাঁদায় ফেলে ও নিজের ইমেজ বাড়িয়ে নেয়

কিন্তু তার মূল চরিত্রকে সে পালটায় না কখনো। অন্যদিকে সিরিয়াস বিপ্লবী চরিত্রের লেখকদের ক্রমাগত প্রভোক করে—তাকে তার মূল রস থেকে সরে আসার জন্য চাপ দেয়।

বড়ো প্রতিষ্ঠান তার আওতার বাইরে সৃজনধর্মী বড়ো এক লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব পছন্দ করে না ব্যবসায়িক কারণেই। তবে মনে রাখতে হবে কার্লমার্কস ও মাণিকবাবুর অনেক লেখা বড়ো কাগজে ছাপা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২।১ জন লেখক এমন আছেন যাঁরা কখনো এসটাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে—খুবই বিপ্লবী বলে জাহির করতে চায়—পরক্ষণেই এসটাবলিশমেন্টের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়। তারা—

দী : আমাদের স্বাধীনতা উত্তর জীবনের অসঙ্গতি, পেটি বুর্জোয়া স্খলনের পরিণতি হিসাবে এ ধরনের উলটো পালটা ব্যাপার ঘটা বিচিত্র নয়। যাঁরা এই পরিণতিতে আসেন, তাঁরা ট্রাজিক নন। নিছকই ট্রাজি-কমিক চরিত্র। তবে এই প্রসঙ্গে বলি আপনাদের কারো কারো সম্পর্কে আমার কিছু কিছু আপত্তি আছে। কিন্তু আপনাদের দু'তিনজনের নিজ বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে প্রতিষ্ঠানের কাছে এখনও মাথা না নোয়ানোর মনোভাবের আমি প্রশংসা করি।

প্রশ্ন : বর্তমান পর্যায়ের 'কৃত্তিবাস' সম্পর্কে কী বলেন?

দী : সাম্প্রতিক কৃত্তিবাসের মাত্র ২।৩টি সংখ্যা পড়েছি। এতে তথাকথিত মিনি বিজ্ঞাপন ও ওই জাতীয় আরও এমন কিছু বিরক্তিকর বাজে ব্যাপার আছে যা কাগজটি সম্পর্কে কোনো প্রীতি জাগায় না। যদিও তাতে কিছু ভালো লেখাও হয়তো আছে।

প্রশ্ন : আপনি লিখতে শুরু করে কি কোনো হস্টাইল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন?

দী : আমার লেখক জীবনের শুরুতে আমি বিপুল স্নেহ ও অভ্যর্থনা পেয়েছি। পরে বিরোধীতাও জুটেছে বই-কী! নানান অভিযোগ আনা হয়েছিল আমারও লেখার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক কারণ তো আছেই তাছাড়া সাহিত্যে নতুন নতুন নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে গিয়ে সহযোগীদের সঙ্গে—এমনকি একবার অশ্লীলতারও।

প্রশ্ন : প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং বড়ো বড়ো সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সৃজনশীল নতুন লেখক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথমেই অশ্লীলতার অভিযোগ আনে, এর কারণ কী মনে হয় আপনার!

দী : এটা খানিকটা জেনারেশন গ্যাপের ব্যাপার—পুরানো জেনারেশনের মূল্য বোধের সঙ্গে নতুন জেনারেশনের ভাবনার সংঘাত। কল্লোল গোষ্ঠী, পঞ্চাশের দশকের কোনো কোনো লেখক এবং হাংরি জেনারেশনের বিরুদ্ধেও অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অশ্লীলতার জন্য অশ্লীলতাও ঘটেছে। যৌনতা জীবনের সব নয়, শুধু মাত্র যৌনতা নিয়ে কেউই টিকে থাকে না—জীবনের আর পাঁচটা জিনিসের চেয়ে বেশি গুরুত্ব একে আমি দিতে রাজি নই।

[*আমরা মনে করি এটা ভিরিলিটির প্রশ্ন। আগের জেনারেশন তখন সৃজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন নতুন ক্ষমতা দেখে তারা ভয় পায়। নিজেদের নপুংসকতাও ধরা পড়ে যায় তাদের—সুতরাং যৌনতার বিন্দুমাত্র উল্লেখেই তারা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে—মুখে অন্য দশটা জিনিসের সমান করে দেখতে চাইলেও মনে মনে বেশি গুরুত্বই দেয়। সবাই বলে তুমি যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছো, কিন্তু কই কেউ*

বলে না, তুমি খাওয়া নিয়ে বা খেলা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছো।]

প্রশ্ন : কল্লোল গোষ্ঠীর এবং পঞ্চাশের অনেক লেখকের লিমিটেশান আমরাও জানি। আসলে এসটাবলিশমেন্টই তো যৌনতা নিয়ে কারবার ফাঁদে। বিপ্লব নিয়েও তারা ব্যবসা করে—বিগত কয়েক বছরের বড়ো বড়ো কাগজের শারদীয় সংখ্যা দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু হাংরিরা কি যৌনতার জন্যই যৌনতার আমদানী করেছে?

দী : সাহিত্যে যৌনতাকে কেউ পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে। কারো কাছে আবার যৌনতাই অস্তিত্ব। এই দুটোই বর্জনীয়। আসলে জীবন ধর্মী সাহিত্যের জন্যই সবকিছু—কোনো কিছুই উদ্দেশ্যমূলক বা অন্ধকারে সাহিত্যে উপচে পড়া বাড়তি জিনিস নয়—এটুকু মনে রাখা দরকার। আপনাদের প্রথম পর্বের লেখালেখি সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রে আমার ঘোরতর আপত্তি ছিল এই জায়গাতেই। এখনকার লেখা সম্পর্কেও কখনো কখনো। আর বিপ্লবকে পণ্য করা? সে তো আরও নোংরা ব্যাপার।

[শুচীবাইগ্রস্ত সমাজে গেল গেল রবটা বেশি। যৌনতার জন্যই কোনো লেখক লিখতে পারে না। অন্তত তার জন্য কোনো আত্মত্যাগ স্বীকার করে না, সে জন্য জীবনযৌবন জাতীয় জিনিস আছে বা থাকে। সুতরাং যৌনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করার আগে এই কথাটা ভাবা দরকার বলে আমরা মনে করি। আজ যা যৌন দোষে দুষ্ট বলে মনে হয় আগামীকাল তাই হয় সহজ গ্রাহ্য। আমাদের অভিজ্ঞতাই বলে সেদিন যে সমস্ত লেখার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ আঘাত এসেছে, আজ প্রচুর লেখা হচ্ছে এরকম কিন্তু সহজভাবেই ঘটছে ব্যাপারটা। আসলে আমরা অনেক দিনের বন্ধ করে দেয়া একটা খিড়কি দরজা হঠাৎ খুলে দিয়েছিলাম, যার জন্য আক্রমণ হয়েছিল বিরাট ও তীব্র। বুরজোয়া যেমন বিপ্লবকে স্বীকার করে না, বহু মানুষ তেমনি যৌন ব্যাপারেই আঁতকে ওঠেন। কী সমাজতত্ত্ববিদ, কী বিপ্লবী, কী দার্শনিক, কী ধর্মগুরু কেউই যৌন ব্যাপারের কোনো সমাধান সূত্র আজ পর্যন্ত দিতে পারেননি। সকলেই অনেকটা পাশ কাটিয়ে যান। আধুনিক পৃথিবীতে যৌন বিপ্লব এক অপরিহার্য ঘটনা। যৌনতার রহস্যকে সভ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দি জামার নীচে লুকিয়ে নিয়ে চলেছে—বিজ্ঞানই এর সমাধান করবে। কোনো নৈতিক প্রশ্ন এখানে খাটবে না। পোপ পুরুতের যুগ শেষ হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে যতসংখ্যক পরমানু বোমা জমা আছে সে কথা ভেবে ভয় হয় না, হয় আজও যৌনতার উল্লেখ নিয়ে—যৌনতা সেই অভাবনীয় শক্তি যা মানুষের জীবনের ডাইমেনশনের পরিবর্তন ঘটায়।]

প্রশ্ন : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' গল্প দুটি কি খুব মূল্যবান মনে হয়?

দী : অবশ্যই। সেই সঙ্গে অস্বস্তিকরও বটে।

প্রশ্ন : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসগুলি মনে হয় আপনার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য?

দী : নিঃসন্দেহে 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'অহিংসা'।

প্রশ্ন : এসটাবলিশমেন্ট-জগৎ ওঁর প্রথম দিকের লেখাগুলিই উল্লেখযোগ্য মনে করে—আবার অন্যপক্ষ ওঁর শেষের দিকের...

দী : আরও একটা পক্ষ আছে—সেটাই বড়ো পক্ষ, যাঁরা মনে করেন আগেও তিনি বড়ো লেখা লিখেছেন, পরেও।

প্রশ্ন : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' পর্যায়েই লেখা শেষ করতেন,

তাহলেও কি ওঁকে শ্রেষ্ঠ লেখক ভাবতেন?

দী : ভাবতুম, যেমন তারাশঙ্করকে ভাবি। কিন্তু পরের পর্বগুলি বাদ গেলে বাংলা সাহিত্য মাণিক বাড়ুজ্জ্যেকে পেত না।

প্রশ্ন : আপনি যে মতবাদে বিশ্বাসী সেই দিক থেকে কী 'পুতুল নাচের ইতিকথা' সমর্থনযোগ্য?

দী : কেন নয়? মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব কি কালো অন্ধগলি?

প্রশ্ন : আপনি কেন লেখেন?

দী : আমি আমার সময়কে ধরে রাখতে চাই—আমার কিছু বলার আছে যা মানুষকে জানানো দরকার—যদিও হঠাৎ এভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খুবই বানানো হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন, হাংরিদের লেখা তৃতীয় শ্রেণির আমেরিকান সাহিত্যের নকল—

দী : আমি তৃতীয় শ্রেণির আমেরিকান সাহিত্য কিছুই পড়িনি—ফলে আমার পক্ষে এ-বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : লেখায় ফর্মের প্রাধান্য কি স্বীকার করেন?

দী : কখনোই না। আপনাদের মধ্যেও অনেক সময়ই এই ভ্রান্তি দেখেছি। তবে আরেকটি তরুণ গোষ্ঠী 'এই দশক' এ ব্যাপারে আপনাদের থেকেও অনেক বেশি আঙ্গিক সর্বস্ব। হয়তো এজন্যই আপনাদের দু'তিনজনের লেখা অনেক সময় অনেক বেশি পজেটিভ মনে হয়—

[*ফর্ম সর্বস্বতা হাংরিরা কখনই মেনে নেয়নি। ফর্ম সর্বস্বতার বিরুদ্ধতা হাংরি পদ্ধতির মধ্যেই পড়ে। তবে লেখামাত্রই তো শেষপর্যন্ত কোনো না কোনো রকম ফর্ম পেয়ে যায়, যা আসলে ওই লেখকের দৃষ্ট জীবন ও জগতের স্বরূপ মাত্র। মনে হয় এখানেই দীপেনবাবু একটু গোলমাল করেছেন। আমরা মনে করি ফর্ম সর্বস্বতা স্রষ্টার মৃত্যুকূপ। এর মধ্যেই ক্রমে বুর্জোয়া ভাইরাস ঢুকে পড়ে। ফর্মের বন্ধন নয় বরং ওপেননেস-ই হাংরি রচনার বৈশিষ্ট্য। ফর্মকে আমরা একেবারেই মূল্য দিই না কিন্তু 'এই দশক' ফর্মকেই সাহিত্যের মুখ্য 'ভ্যালু' বলে মনে করেছিল, এখানেই তারা বিপদে পড়ে। বিদ্রোহী রচনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য কি এই নয় যে সে সব সময়েই সবরকম বন্ধনের বিরুদ্ধতা করবে?*]

প্রশ্ন : 'ক্ষুধার্তদের' লেখা বিষয়ে কিছু বলবেন? এদের রচনা কেমন লাগে আপনার?

দী : আপনাদের লেখা সম্পর্কে আমার মৌলিক আপত্তি আছে...তাহলেও আপনাদের ২। ৩ জনের লেখা আগের থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, যা লক্ষে এসেছে আমার...আপনাদের ক্ষমতাকে আমি অস্বীকার করি না—এখনও পর্যন্ত আপনারা আপনাদের সাহিত্য প্রয়াসকে মুনাফার শিকার হতে দেননি, একথা আমি অবশ্যই বলব। কিন্তু একটা অনুরোধ : কেবল এসটাবলিশমেন্ট বিরোধীতাতেই যেন আপনাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা কেন্দ্রীভূত না হয়, জীবনকে যেন আপনারা খোলা চোখে গোটাভাবে দেখতে পারেন। এসটাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম আপনারা করেন, সেই সংগ্রাম আপনাদের সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর সংগ্রামে এগিয়ে দিক। তা নইলে বিপদ আছে।

[*মৌলিক আপত্তির কথা ব্যাখ্যা করতে বলা হলে, উনি এ-প্রসঙ্গে বিরত থাকতে চান আপাতত জানিয়ে দেন—পাঠক হয়তো লক্ষ করবেন, গোটা সাক্ষাৎকারের ভেতর অবজেক্টিভ রেফারেন্স নেই বললেই চলে—উনি যদিও আলোচনা, কথাবার্তার সময় অবজেক্টিভ রেফারেন্স সবিশেষভাবেই উল্লেখ করছিলেন কিন্তু লিখিত ভাষায় সেসব*

রাখতে চাননি, ওঁর কথা, উনি একজন লেখক সত্য, কিন্তু ওঁনার রাজনৈতিক পরিচয়ও একটা আছে। আর আমরা জীবনকে খোলা চোখে দেখতে চেয়েছি বলেই তো আক্রমণ এসেছে আমাদের উপর সবচেয়ে বেশি—বিপদও বেড়ে গিয়েছে ততোধিক মাত্রায়—বৃহত্তর জনমণ্ডলীর চেতনা শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই আমাদের কাম্য—তাছাড়া একজন লেখক যে-মুহূর্ত থেকে আক্রমণ করতে থাকে সেই মুহূর্ত থেকেই তার একটি চরিত্র নির্দিষ্ট হয়ে যায়—লড়াই না করে তার আর উপায় থাকে না—আবার এই লড়াইয়ের মধ্য থেকেই এমন সব সত্য তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়, যা সে আগে বুঝতে পারেনি—তাই প্রকৃত অভ্যুত্থানের কারণেই তাবৎ প্রতিষ্ঠান ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে যাওয়া...]

ব্রাকেটের অংশগুলি আমাদের—সম্পাদক

হাংরি জেনারেশনের ক্ষুধার্ত

হাংরি জেনারেশনের ক্ষুধার্ত

হাংরি জেনারেশনের ক্ষুধার্ত

প্রদীপ চৌধুরী অরুণেশ ঘোষ
ফালগুনি রায়
রবিউল পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
অরুণ বনিক
শৈলেশ্বর ঘোষ সুভাষ ঘোষ
বাসুদেব দাশগুপ্ত
সুবীর মুখোপাধ্যায় সুভাষ কুণ্ডু
সুভো আচার্য

লিখেছেন :

প্রদীপ চৌধুরী

অরুণেশ ঘোষ

রবিউল

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

অরুণ বণিক

সুবীর মুখোপাধ্যায়

ফালগুনী রায়

সুবো আচার্য

সুভাষ ঘোষ

বাসুদেব দাশগুপ্ত

সুভাষ কুণ্ডু

শৈলেশ্বর ঘোষ

প্রদীপ চৌধুরী

মৃত্যু-প্রণালী বিষয়ে আপনি কি বলেন?

আজ রাতে বহু সময় আক্রমণকারীর বুকের নীচে
চিৎ হতে চলে এসো যুবক, যুবতী-প্রধান বন্ধুগণ!
অভ্রান্ত ঘাতক
তুমি আর ইতিহাস, ঘটনা-পরম্পরার অধীন নও
তোমার গুহ্যদ্বার দিয়ে সরাসরি বেরিয়ে গেছে
পাৎলা পায়খানা—
ঐতিহাসিক দুর্গন্ধ!
একটি পাখি বহু চেষ্টার পরও স্বপ্নে পাখা
বিস্তার করতে পারে না—

মানুষ, এজন্য সাংঘাতিক দাম দিতে হবে তোমাকে
অসুখ সারাবার জন্য গুহ্যনালী সম্পূর্ণ
উন্মুক্ত করতে হবে
দগদগে ক্ষতসহ কোটরাগত চোখ
সরাসরি ঝুলিয়ে রাখতে হবে শয্যাপ্রিয়
প্রেমিকার চোখের সামনে—
এরপর এক সার্বজনীন ঘৃণা,
তীব্র ঘৃণার মধ্যে হাসপাতালে তোমার মৃত্যু—

এবং আমার এসব কথা যারা শুনবে না
কালা হাবা সেসব বাঞ্চোৎ

প্রজন্মের প্রিয় সন্ত্রাস
ভালোবাসাহীন বিনিময়ের পরবর্তী পুঁজ
অনভিজ্ঞ ভিখারি-যুবার চিৎকার
চারদিকে শ্রেণীবদ্ধ মাইক
আমাদের আত্মহত্যার পাশাপাশি দুর্ঘটনা
একই সমুদ্রে দুরকম জাহাজাডুবি

এবং প্রকৃত মৃত্যুর বাইরে সেসব মারণ-উৎসব
দেয়ালী রাতের আতসের স্ফুট বিস্ফোরণ
তোমার বিষণ্ণ মুখের কাছে ম্লান মনে হয়
শরীরের গুপ্ত শূন্যতাগুলি
মলমূত্রে ভরে থাকে

এসবই শতাব্দীর নির্ভুল দুঃস্বপ্ন
"আমাদের" সমিতিভুক্ত শিল্পের বাগান
"ভাই ও বোনেরা" আপনারা কোন
খরগোসের পেছনে দৌড়ুচ্ছেন?
ও নাপিতের সমকামী নৈরাজ্যবাদী
তুমি তোমার কর্মপ্রণালী চূড়ান্ত করার আগে
হস্তমৈথুন করছো
পৃথিবীর কসাইখানাগুলিতে চলছে মাগীসহ
মদ ও হুল্লোড়
ধর্মপিশাচের মাতৃহত্যা তখন সম্পূর্ণ
ওর গলিত আঙুলের দিকে তাকিয়ে
একটি বালক ভাবে সে কিছু কবিতা লিখবে

এই মৃত্যু-প্রণালী বিষয়ে আপনি কী বলেন?

ব্যক্তিগত ৪

এই ক্ষতস্থান অনেকেই ব্যবহার করেছে,
সংকুচিত নালী
দ্বিখণ্ডিত সূর্যাস্ত
মানুষের প্রণালীতে এনে দিয়েছে
ব্যবহারের অস্পষ্টতা
সাময়িক, তবু বিভ্রান্তি
আমি কখনো আমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাই না।

ব্যক্তিগত ৫

অনেক সময় প্রকাশ্যে যা কিছু
গোপনীয়তা
খোলখুলি সামনে এসে
করমর্দন অথবা হাতকড়া
বাড়িয়ে দেয় অনেক সময় প্রকাশ্যে
আমি কোনো বিপজ্জনক মহিলাকে ডেকে ফেলি, 'হ্যালো'-

একটু বাদে বিপদ শুরু হয়

অনেক সময় সারাক্ষণ
চুপচাপ
এবং হঠাৎ বাড়াবাড়ি করে ফেলি
বাহুবিস্তৃত অন্ধকারে সারিবদ্ধ গাছের আড়লে
হত্যাপ্রিয়
বন্ধুদের দেখতে পাই না
যাকে ভালোবাসি উলঙ্গ শরীরে
তার কাছে গিয়ে স্তন-লোভী নাইলন-বল্কল
খুলে দেই—
নষ্ট পৃথিবী, এ আমি!

ব্যক্তিগত ৬

এই ধাতুসূর্যের নীচে সম্পূর্ণ পৃথিবী
আমি এর প্রতিটি গলি ও
অন্ধ-গ্রন্থিতে উন্মত্ত অপভ্রমণ করেছি
আমি নিজের কাছ থেকে কোনো সাহায্য
পাইনি, অনুপ্রেরণা পেয়েছি কুয়াশা-সকালের
দেয়াল ভেদ করে
নরকচুল্লির কাছে পৌছে যেতে

নির্মিত আগুন! এই উপগ্রহ!
ভারসাম্য রাখার জন্য লিভারযন্ত্রের
দিকে অনাবশ্যক হাত বাড়াতে হয় না।

আমি নাগরিকের দায়িত্ব
ও কর্তব্য
জরুরিকালীন ঝটপট প্রস্রাব
হাসা, পুরোনো ঠোঁটে চুমু খেয়ে
নূতনভাবে যুদ্ধ ঘোষণা
এবং রহস্য জন্ম-নাটক থেকে
একদিন সত্যি সত্যি মাকে আঁতুর
ঘরে রেখে আসা

আমি সবকিছুর জন্যে তৈরি
সবকিছু কাছে পেয়েও

তাকে কাছে পাবার উত্তেজনায় কেঁপে উঠি
ভালোবাসা, আমার লুপ্ত রোমহর্ষগুলি
এই প্রচণ্ড জখম থেকে আবার শুরু হয়

ব্যক্তিগত ৭

মাটির রহস্যময় শরীর
সর্বাগ্রে রহস্যময় কাম দাবি করে
দাবি করে খুনির রক্ত
ও খুনি যাকে খুন করেছিল
তার শেষ চিৎকার
ভালোবাসাহীন অন্তিম ক্ষুধা
জৈবপ্রণালীতে সে মানুষকে
পশু ও পাশবিক হতে বলে
এবং একমুখের পাশে আরেকমুখ
রেখে দিয়ে
অভ্যস্থ স্বামীকে অকারণে
জারজ ছেলের ঝুঁকি নিতে প্রলুব্ধ করে।

ব্যক্তিগত ১২

অতবিস্তৃত জীবন ক্রমশ
মানুষী হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে
এখানে কেউ কাঁদে না, ঘৃণা করে
অথবা নির্ভুল শতাব্দী'র বয়ে আনা উপদংশ
ভালোবাসার পাজামা পরে
কেবলই গোপন ক্ষত সৃষ্টি করে

অধিকাংশ শিল্প এসব ক্ষতস্থানের পুঁজ
রক্ত চুঁইয়ে পড়ার মতো শিল্পের উল্লাস
অপরাধপ্রবণতা, আমি তাকে মুক্তি বলি
দূর থেকে শোনা যায় খচ্চরের হাসি

যকৃৎ ২

...কেউ আপনাকে
হাসপাতালের বহির্বিভাগে টেনে নিয়ে যায়
কিন্তু সেখানে যকৃৎ কিচ্ছুতেই চেতনা তার
আসল স্বরূপ দেখায় না—শুধু একছেলের
মা'র শরীর থেকে কচ্ছপের তেলের গন্ধ
নাকে লাগে এবং গুটিয়ে দ্রুত
ঢুকে পড়ে শরীরের যকৃৎ-প্রবাহে।
প্রতিটি সুবিধা অসুবিধার মতো মনে হতে থাকে
অসুবিধাগুলি আবিষ্কারের দিকে চলে যায়
প্রতিক্রিয়াশীলতার উর্দ্ধে যকৃৎ—
টয়লেট পেপার এক অপরাধীর হাতে
জীবনের তাৎপর্যময়গন্ধ ধরা পড়ে—
কুমারী গোলাপ
মিউকাস থেকে অভ্যুত্থানের গান, লালফিতার
বাঁধন মুক্ত সর্বাধুনিক মুক্তি—
কিন্তু স্বাধীনতা নয়—স্বাধীনতা প্রধান যকৃৎ—

স্বাধীনতা, আমার একাকী প্ল্যাটফর্মময়
রাত্রিহাটা, সিগারেট জ্বালা ও নেভানো—
স্বাধীনতা, পুরুষভাগ্যের সঙ্গে তীর্থ-সাহারা
স্বাধীনতা, প্রথম যকৃৎ—

আরেক ধরণের যকৃৎ (এবং বেশিরভাগই সেরকম)
যেখানে পুরুষানুক্রমিক ভাগ্য
মানুষকে এক উলঙ্গ রতি বিলাপের মধ্যে টেনে নেয়
প্রতি শিরা থেকে যে রস চুঁইয়ে পড়ে
অথচ যা চোখের জলের মতো নাটকীয়
কিংবা স্থূল নয়—
যা শব্দ ধ্বংস করে (শব্দের যকৃৎ?!)
এবং যা জমা হতে হতে ক্রমশ পচতে শুরু করে
(অর্থাৎ মিউকাস)
কোনো ক্ষরণই যাকে শরীর থেকে আলাদা
হতে দেয় না
টয়লেট কাগজে লেখা আত্মজীবনী—

অরুণেশ ঘোষ

মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ

একতলায় সোনার দোকান, দোতলায় ব্যাঙ্ক
তিনতলার ঘরে কমিউনিস্টপার্টি অফিস, প্রকাশ্য ও আনন্দময়
উৎসবের কালো কালো মাথাগুলো থেকে উঠে গ্যাছে
সোজা ও সরল পতাকা—ওড়ে, লাল, মধ্যবিত্তের ফেস্টুন
এখানে খাদ্যের দাবিতে আর মাইনে বাড়াবার লোভে নড়ে ওঠা
বিপ্লবের ভ্রূণ দুই হাতে ছাড়িয়ে এনেছে, রক্ত ঝরতে দিয়েছে দর্শক
মৃত্যু অবধি—এ শবযাত্রায় নিয়ে আসা দুরান্তর থেকে দিন মজুরের মুখ
কৃষকের রক্তিম ও ঘোলাটে চোখ ভিক্ষে করে ভাড়া করে প্রতারণা করে
নিয়ে আসা এই কপট ও শৌখিন মিছিলের শোভা বর্ধনের জন্যে...

সোনার দোকানের পাশ ঘেঁষে সিঁড়ি উঠে গেছে, দুপাশে দেয়াল
দু'দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ব্যাংকের দরোজায়, যেখানে ছোট্ট চাতাল
যেখানে টেনে দেওয়া ও অল্প ফাঁক লোহার দরজার সামনে তেপায়া টুল পেতে
বসেছে সে, যে আমাদের গল্পের নায়ক হতে চেয়েছিল
সমস্ত শরীর জুড়ে যার আড়াআড়ি বুলেটের মালা
রঙচটা নীলচে ইউনিফর্ম—ফুল হাতা, খোলা পায়ে লোহার জুতোর দাগ
পাথরের কাছে লজ্জিত শাদা মুখ, একটু খাড়া নাক আর
কোঠরাগত দুই চোখ দিয়ে খুব আস্তে খুব অন্যমনস্কভাবে রুটি চিবোয়
দুহাতের আঙুলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দেয় সে—ব্যাংকের পাহারাদার
তার পাশেই দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখা—হেলান দেওয়া নির্বিকার বন্দুক
যা তাকে দেওয়া হয়েছে এক অজ্ঞাত কারণে
আমি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠি, জামার হাতায় মুছে নিই কপাল
কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে না আমার, তার দিকে আমার চোখ আটকে থাকে শুধু
স্বাভাবিক কারণেই ভ্রূক্ষেপবিহীন সে, ঘাড় কাৎ করে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে
শুধুমাত্র তার একটি পা সামান্য এগোয়, এগিয়ে যায় তার পরিত্যক্ত বন্দুকের দিকে
পায়ের বুড়ো আঙুলে সে ছুঁয়ে থাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখা বন্দুক
হাঁ-এই তো তার জেগে ওঠা—আরও জেগে ওঠার কোনো দুঃখ তার নাই
সে কোনো প্রতীক নয়, নয় কোনো উপমা অথবা গদ্যপদ্যের ঘসঘসে কাগুজে মানুষ

বস্তির একটি ঘরে তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ের পাশে কাৎ হয়ে পাখা নাড়ছে
সেও দুহাতে উন্মোচিত করেছে রমনীর উরু, কোলে তুলে নিয়েছে হাঁটুর কাছ থেকে শিশুকে
বুকের উপর আড়াআড়ি বুলেটের মালার ঝনঝন শব্দ ছাপিয়ে সে আরও
গাঢ় করতে চেয়েছে তার চুম্বন
বিশ্বাস হয় না, সে সঙ্গম সময়ে লোহার দরোজার থেকে বন্দুকের থেকে
বুলেটের থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে চোখ
বিশ্বাস হয় না, তারও রয়েছে লিঙ্গ যা বহন করে শুক্রবীজ—বিশ্বাস করে নাই মানুষ
তারও চোখ জ্বলে উঠতে পারে, লাফিয়ে নেমে আসতে পারে প্রতারণাময় এই
তিনতলা বাড়ি থেকে—শেকল ছেড়া বন্দির মতন
তুলে ধরতে পারে ওদের দেওয়া অস্ত্র ওদেরই নির্মান ও ব্যবস্থার দিকে
অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর এই গালগল্প—যা ফিসফিসানির মধ্যে শেষ হয়ে যাবে
এই বিশ্বাসের গম্ভীর ও বুট পরা পায়ের সারি উঠে গেছে তাকে মাড়িয়ে
সে কোনো প্রতীক নয়, নয় কোনো উপমা নয় গদ্যপদ্যের ঘসঘসে কাগুজে মানুষ
তবুও নিচু হয়ে জলের গেলাস তুলে নেবার সময়, দেখি :
তারই কাঁধ থেকে উঠে গেছে সেই তিনতলার পার্টি অফিসের ঘরে যাওয়ার
গাঢ়নীল রঙের কাঠের সিঁড়ি
ক্লিষ্ট মুখে সে বসে আছে...

আমি দাঁড়িয়েছি আজ তেতলা বাড়ির মধ্যে, সার সার খুঁড়ে রাখা কবরের পাশে, আমাদের জন্যে এই হা-মুখ সমাধিগুলি, আমাদের দপদপে—জ্বলন্ত মুখের জন্য সার সার শান্ত মুখোশগুলো দেয়ালে ঝোলানো, পেরে নাও কে আছো দাঁড়িয়ে কে দ্বিধাগ্রস্ত কেই বা মাথা নিচু করে ভেবে নিতে চাও, তোমার ভাবনার মূল্য তোমার চিন্তার দাম কানাকড়ি নয়, হাস্যকর তোমার সততা আত্মপ্রতারণা তুমি শেখো নাই—অযোগ্য মানুষ শিখে নাও আমাদের দেখে...

রবিউল

উষসীর প্রতিবেশে এক উর্বর সসেমিরা

এক.

আমার একটিই মানুষনামীয় নাম। অন্যান্যদেশের তিনশত সাড়ে বিরানব্বই কোটি আর এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সবার নামই মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পৃথিবীর বয়স চারশো কোটি বছর। অর্থাৎ প্রতি এক বছরে একটি করে মানুষ শূন্যতার অকল্পনীয়তাকে কল্পনায় প্রতিনিধিত্ব করে। এর ভিতর আবার সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে এপর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ হাজার পাঁচশো বার ছোটোবড়ো যুদ্ধ হয়েছে। তাতে প্রায় চারশো কোটি মানুষ আবার মারাও গেছে। রে পাষণ্ড পাপীপিশাচ তবুও জন্মাচ্ছিস্ নির্লজ্জ নীলামে। তোদের জন্মপ্রবাহ ধাবিত হোক এবং অবগাহিত হোক পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমেডার বিশ লক্ষ বছর পরের উজ্জ্বল আলোকবন্যায়। তোদের এই জন্মক্লান্তিই জন্মবিনাশের কারণ হবে। তাই যে কোনো যৌনসঙ্গমের সততা ও নৈয়ায়িক তৎপরতা আমাকে প্রবলবান মুগ্ধ করে; এবং সেই ক্রিয়াকর্মের জন্মফলশ্রুতি মানুষনামক জীব এবং সেই মানুষের সবার নামই মানুষ।

কেউ চুংচি মিকি বব হ্যারিস গোখলে মঞ্জু প্রিয়ংবদা অশোক শাহজাহান রায়হান কবীর নাতাসা মৃদুলা কেউ রবিউল কেউ কতকিছু। এইসব গুণাঙ্কের জন্মসংখ্যার ভিড়ে নামকরণে সুবিধাজনক পরিচয়ই মুখ্য কথা। সহজে চেনাজানাই হল আসল ঘটনা। রবিউল একটি মানুষের নাম। রবিউল একটি সর্বরোগহরণ মহৌষধের নাম নয়। হলেই ভালো হতো প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা পর পর গলাধঃকরণে কোনো মারাত্মক অসুখ নিরাময় হতো। হয়তো প্রতি শিশি মাত্র পাঁচ টাকা আশি পয়সায় কোম্পানি রেটে এবং একদরে বিফলে মূল্য ফেরতভাবে সুন্দর বিকিয়ে যেত। একটি আলাদা সার্থকতা আসত। আসলে একজন মানুষের চেয়ে এক বোতল ঔষধ অনেক উপকার করে। সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার রবিউল আছে এবং একটি রবিউল অন্য রবউল নয়। প্রত্যেকটিই আলাদা রবিউল। তাই কেউ আমাকে রবিউল বলে ডেকে উঠলেই ওইসব রবিউলের কথা এমনিতেই মনে পড়ে যায় এবং সাড়া দিই। বলা যায় না একই নামকরণযুক্ত মানুষেরা অচিরেই সমিতি গঠন করে পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখের সঙ্গী হওয়ার প্রতিজ্ঞ-মহড়া নিতে পারে। বস্তুত জীবন ও পৃথিবী একটি আদি ও অকৃত্রিম বিপুল মহড়াক্ষেত্র। মানুষকে মানুষ বলে সম্বোধন করার অধিকার একমাত্র জীবজন্তুরই। তাই বোধ হয় একটি মানুষ অন্য একটি মানুষকে এই যে ভাই মানুষ বলে ডেকে উঠলে সে অপমানিত বোধ করে। নাম। শুধু নামকরণের খেলা। মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছে নামকরণের ভিড়ে। গোরুর বদলে নিয়মিত মানুষ নামীয় রচনা

লেখা অনেকাংশে মানুষকে এই নিয়ত হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। মানুষ জীবনের কাছে হাজির হয়ে সোচ্চারে বলে উঠবে জীবন হাজির হুজুর।

দুই.

শরীরের সবাই যখন উত্তুঙ্গে তখন সবই দরকার। জ্ঞানত ক্রমশ বোধের খোলাপথ বিভিন্ন ভ্রমণের ব্যাপক ক্রিয়াকর্মের নিষ্ঠাবান কর্মী হয়। তিনিই উচ্চৈঃকণ্ঠে আজানজানান দেন অতঃপর। এমনিতরো বহুদিন সাপেক্ষে নিজেকে মনোহর ও সুখ সুখ সুখ চাহিদায়। দুপাশে ফুটপথের মতো বিছানো হাঁটাপথ। মধ্যে উড়ান দিয়ে সময় হত্যাকালীন সৌভাগ্যবানদের চলাপথ। বস্তুত বলা চলে আপনি কোন্‌পথে চলে থাকেন। ফুটপথে না মাঝপথে। বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত পাঁতিবিত্ত প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি ধরনের মানুষের শ্রেণীবিভাগ না করে বরং রাজপথেরা বিভিন্ন ধাপে আপনার চলাকালীন শ্রেণীই আপনার আসল সামাজিক শ্রেণী। এবং সবারই ফুটপথ থেকে রাজপথের মাঝে একান্ত আপনার করে যাওয়া আসা করার ইচ্ছা সারাজীবনের কাম্য। ওই উত্তরণের পথেই যত যুদ্ধ সংগ্রাম অথবা জীবনের সহজ বানান।

এখন নাবালক দিন সূর্য দিগন্ত রেখায়।
এখন নাবালক রাত সূর্য দিগন্ত রেখায়।
অতএব বাল্যকাল সর্বদা দিগন্তে বাস করে এবং
দিগন্তেই জন্মমৃত্যু হয়।

এই দুইজন সময়ের মধ্যে আমাদের জীবনের প্রতিটি সুচারু পরদা পৃথিবীর বহমান বাতাসে দোল খায়। ভাঁজে ভাঁজে মৌমাছির মতো অসংখ্য মানানসই উড়ানবাদ কামকেলীতৎপর রহস্যআঁধার দুঃখগভীরের শোক অস্থায়ী আনন্দ নৃত্যতৎপর নাটকীয়তা জীবনের খণ্ড খণ্ড খণ্ডতা। ভাঁজ ভেঙে গেলে পর যেন কোন্ অদৃশ্য কারুশিল্পী ঠিক ঠিক সাবলীল কারুকার্যে সেইসব সহজিয়া মুক্তোরাশি নিয়ে আবার চিরায়ত। জীবন হাজার হুজুর। আপনার কেনা গোলাম। ও বড্ড অসহায়। ওর কেউ নেই। আপনিই ওর মা বাপ। ওকে একটু দেখবেন হুজুর।

সামনে বিস্তৃত প্রকৃতি। প্রকৃতির অনুসরণ অথবা দারুণ অভিমানে প্রকৃতির অমান্যকরণ এই দুইটি শিবিরের একই শিল্পীকুশলী বিভিন্ন প্রকাশ ইচ্ছায় লালিত পালিত। জল মাটি পাথর বৃক্ষ ফসল পাখি ও জীবজন্তু। আকাশ সূর্য নক্ষত্র ও বিশাল শূন্যতা। প্রকৃতির বৃহৎগ্রন্থে এরাই পৃথিবীর আদি বর্ণলিপি। তার ভিতর অসহায় অথচ গর্বিত মানুষ। তার বোধ ইচ্ছা ও স্বপ্ন। তার কষ্ট দেশ রাজনীতি অভিযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাকার।

* কেউ কাউকে মানুষ করতে পারে না। জীবন তার আপন ইচ্ছায় বেড়ে ওঠে বড়ো হয় মানুষ হয়। অমানুষ হলেও মানুষ মানুষই থাকে!

* প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশ দেওয়ার রীতিনীতি রপ্ত করে শরীরের বয়স-সময় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা বাড়ন্ত হলেই তাকে মোটামুটি তথাকথিত মানুষ হওয়া বলে। আসলে পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে। তথাকথিত মানুষ আর মানুষ। এই দুইয়ের ভিতরের সংগ্রামই আসল শ্রেণীসংগ্রাম।

* পিতামাতা একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম। স্নেহমমতাই এখানে লগ্নি খাটে।

* পুত্রকন্যাই এদেশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবনবীমা।

* পরস্পর স্বার্থরক্ষার অপর নাম প্রেমপ্রীতিস্নেহভালোবাসা।

* বিশুদ্ধতা শূন্যতার মতোই পবিত্র।
বস্তুতঃ পবিত্রতা শূন্যতারই আরেক নাম।
এবং শূন্যতার শূন্যবিন্দুতে শূন্যহীন পবিত্রতা থাকে।

* জলজীবন হে বিচ্ছিন্ন হও উদ্‌জানে বিধ্বংসকারী হও
বিভক্ত হও
শূন্যে অম্লজানে অগ্ন্যুৎপাদনের
বিস্ফোরকের স্ফটিক সাহায্যকারী হও

* পিতঃ হে কবরের কাদা শুকিয়ে গেছে। মৃত্যুর প্রথমবর্ষায় আপনার দুগ্ধ কাফনের লাশ পূর্ণকবরের কৃষ্ণসাগারে ডুবো জাহাজ হয়েছিল। হাতের আঙুলগুলো একে একে ঝরে গেলে বাহুমূলে পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত ছিল। বক্ষপিঞ্জর থেকে যে দীর্ঘশ্বাসী ফণীমনসার দীঘল বৃক্ষটি কবরের বংশদণ্ডাচ্ছাদনকে পিছনে রেখে দিগন্তে উঁকি দিচ্ছিল এবং তার উপর যখন কবরের গা বেয়ে বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে এবং যখন ফণীমনসার বৃক্ষমূল আপনার বক্ষপিঞ্জর আঁকড়িয়ে ধরে থাকে অশোক স্বাক্ষরে তখনও কি আপনার মননহ্রদের পঙ্কিলকর্দম থেকে স্বপ্ন নামক বুদবুদি মৃণালপদ্মের জন্মপ্রতিশ্রুতি দেয়। রক্তক্ষরণে মনের ভিতর কীভাবে যে একটি রক্তঝর্ণার সৃষ্টি হয় এবং সেই রক্তক্ষরণে কীভাবে যে মানুষের আয়ু কমে কমে শূন্যবিন্দুতে পৌঁছায়।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে একটি রক্তমন্দির আছে একটি রক্তহ্রদের তীরে একটি রক্তবৃক্ষ আছে তার বিশাল চত্বরে ঈশ্বর ও শয়তান সদাসর্বদা লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে।

জীবন হাজির হুজুর।

সেই দধিচির পুণ্যবান উপাসকগণ একজন উষসী-মানুষীর প্রতিবেশে অবাক সসেমিরা।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই চৈতন্যের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাওয়া। তারপর বিছানায় যৌনবোধহীন অথচ প্রস্রাবচাপে উত্থিত লিঙ্গ অবলোকন করে উলঙ্গতাকে লুঙ্গি উঁচিয়ে ঢাকা দিয়েও অন্যান্য দৈনন্দিন আবশ্যকীয় বোধ বা অনাসৃত অভ্যাস হানা দিল যেমন প্রস্রাব মলত্যাগসমূহ ইত্যাদি। টয়লেটে মানুষের আদিগঙ্গা গতদিন রাতের হলুদাভ শিবাম্বু তরল পদার্থের নির্গমন চীনামাটির পাত্রে আছড়িয়ে পড়ামাত্রই শরীরের অন্য অপ্রয়োজনীয় হলুদবর্ণের মলত্যাগের শুভারম্ভ। সেইসব মাছভাত ডালডিমের আশ্চর্য ও অবধারিত রূপান্তর।

এক ঠোঁটে-ঢাকা জিহ্বাকেন্দ্রিক মুখগহ্বর থেকে কোথায় সেই কণ্ঠনালী অন্ত্রনালী পাকস্থলী মূত্রনালী পায়ুনালী।

যেন কোনো গ্রামের কোনো মানুষের মুঠোধরা ধানেরবীজ ছড়িয়ে আদিগন্ত শস্যভূমি ঢেউয়ে দোলানো ধানের মাঠ কিষাণ-বউয়ের ঢেকির পাড় থেকে গঞ্জের বস্তাবন্দি চালের বাজার থেকে আবার বাড়ির রান্নাঘরে অগ্নিস্নাত হয়ে খাবার ঘরে এসে ধুঁয়ার পতাকা উড়িয়ে সেইসব চেনাজানাপথ পেরিয়ে একজন সাদা চীনামাটির গহ্বরে এসে চার ইঞ্চি ব্যাসের লোহার পাইপ বরাবর নিরুদ্দেশ যাত্রা অতঃপর। শরীর কর ভার মুক্ত চোখের কোণে জমানো পিচুটি অপসারণ মুখের গর্তের গন্ধবিতাড়ন হস্তপদ গুপ্তমুখাদি প্রক্ষালন ইত্যাদি এ সদাসর্বদার পরিচ্ছন্ন আন্দোলন বস্তুত জীবনযাপনের প্রধান অংশ।

আবার সেই গলধঃকরণ ক্রিয়ার শুভারম্ভ। আসলে বেশ্যাবৃত্তি নয় জীবনবৃত্তিই প্রতিটি রাতের ব্যবহারের পর আগেকার মুনিঋষির অলৌকিক শক্তির মতো প্রতিভোরেই কুমারিত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই যে কোনো প্রথম পরিচয়ের নরম ব্যবহারের মতো কিছু কিছু প্রাতঃরাশনামীয় ভোরের

সূর্য পিরিচের কোলে অসহায় ডিম্ব। গেলাসে বন্দি দুধজল সিদ্ধকরা শাকসবজি গমরুটি ফলমূল ধূমায়িত চা ইত্যাদি জীবনকে কে যেন উৎকোচ দিল। আমাকে একটু দেখবেন হুজুর।

পোশাকের ঘরে রঙিন জাঙ্গিয়া কেন্দ্রতম যৌবনকে ঢেকে অন্যান্য পরিচ্ছদ এগিয়ে দিল। আয়নাতে সেই অসহায়ের মুখ জীবনকে তোষামোষ করে চলেছে যে চিরকাল। আমাকে দেখবেন প্রভু হে অদৃশ্য রক্তস্রোত হৃদয়ের ডুগডুগি সাপুড়ে বিষদাঁতহীন অথচ বিষময় বিস্ময় সমস্ত অবয়ব তার। জীবন হাজির হুজুর।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

সমস্যাসন্তান

কেবল মৃত্যুর পক্ষে সবকিছুই চমৎকার, দম্পতির রাজদৃশ্য থেকে
একাবোকা ভিখিরির পয়সা হারানো, রেড রোডের পথে
মধ্যবিত্ত অন্যমনস্কতা, অর্থসচেতন রাস্তা পার হতে যাওয়া,
মুমূর্ষু শিয়রে ব'সে সেবকের ধর্মপ্রাণ কুসংস্কার, জীবিত যুবার কাছে
তরুণীর বুড়োমানুষের বুদ্ধি—সব চমৎকার, স্বাদুলেহ্যপেয়—
শিশুর মতন মৃত্যু প্রত্যেক জিনিস নাড়ে, বাঁশবনে প্রায় ডোমকানা
আনন্দে জড়িত হতে হতে ছুটে যায় এদিক ওদিক, তৃপ্ত শ্বাস নেয়
ঠান্ডা রাতে—উষ্ণ দিনে অতিভোজনের জন্যে ঘামে ;
বিধাতাবিধাত্রীদের তার জন্যে চিন্তা নেই, তাঁরা তো জানেন
দামালউদ্যোগী ছেলে সর্বদাই লক্ষ্মীলাভ করে।

কিন্তু তারি ভাই থাকে ঘরকুনো, বাড়ির সংলগ্ন মাঠটিতে
ক্বচিৎ বেড়াতে আসে, নরম ঘাসের পরে রোদের শরীরে
চিন্তিত রতিবিহার দেখে একটু শীর্ণ হাসে, তৎক্ষণাৎ আকাশ প্রখর—
তৎক্ষণাৎ পুত্রের উপরে কর্তৃত্ববাসনায় অধীরাবিধাতানারী
এসে ডাকে : কী রে, তোকে যে বলেছি তুই
বাইরে আসবি না? ঘরে যা—ঘরে যা—এসব কি তোর সহ্য হবে?
আর তার স্কিজোফ্রেনিয়ার স্নায়ু পাগলঅভাগ্যে দুলে ওঠে,
দুরে, কাছে আরও বহু বিধাতা-বাড়িতে, কোনো কোনো ছোটো জানালায়
তারি মতো কিছু কিছু মুখ নীলশিরাবিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে
অল্পক্ষণ, কেননা তারাও
অন্যান্য বিধাতাদের স্নায়ুরোগী রুগ্‌ণ আর অধ্যয়নপর পুত্র,
তারাও বাড়িতে থাকে, বেশিক্ষণ জানালা খুললে তাদেরও বিধাত্রী মায়েদের
গলার ঝংকার শোনা যায় :
হয় এই ভয়ে, কিংবা একই চেহারার সঙ্গীরা কখনো আসবে না এই জেনে
অথবা, নিজেকে ঠান্ডা খুন করাবার নিগূঢ় শালীনতায়
মৃত্যুর রোগা ভাই টলতে টলতে ওঠে, ক্রূরমহীয়সী
মা'র চোখের সামনে দিয়ে, উচ্চপদস্থ বিধাতাপিতার উদ্বেগ বাঁপাশে রেখে
খেলাশূন্য পড়বার ঘরে ঢুকে যায়।

সুবীর মুখোপাধ্যায়

শহীদ

ফিরে যাবো ব'লে আসিনিতো : তুমি নিঃশব্দে,
অন্তর্লীনে
কিছু যোগাযোগ মেলে দিয়েছিলে, দুঃখের মতো
খেজুরিয়াঘাট স্টেশনে উনিশশো বাষট্টির
সন্ধ্যা হয় হয় দিন, তীব্র হুইসিল
সে সমস্ত বুকের মধ্যে
কেবলই কপাট ভাঙার শব্দ,
বোঝা না বোঝার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া শুধু
আছড়ে পড়া, তাই,
আর কিছু নয়, না-ঘটনা না-দুর্ঘটনা
এমনকি নিরপেক্ষ চোয়াল ক্রমশ
বুকের ওপরে নেমে আসার ভেতরেও
যে গভীর নাটকীয়তা রয়েছে, তাও নয়।

মাত্র আদেশ পালনের,
বাতাসের, বিচ্ছিন্নতা-জীবনের অবধারিতকে
মেনে নিতে গিয়ে
গোপনে পাপের চেয়ে আরও ঘোর স্পষ্ট করুণায়
লিপ্ত হয়ে আছি,
ফিরে যাবো।
বলে
আসিনিতো।

ফালগুনি রায়

আমাদের স্বপ্ন

আমাদের প্রেম পরিণামহীন জৈব-হৃদয়
খেলা করে আমাদের যৌন অবিমৃষ্যকারীতায়
আমাদের হাহাকার অশ্রু ও গান চোখের গ্ল্যান্ড আর
কণ্ঠনালীর লারিংসের মাংসময় উপত্যকা থেকেই নির্গত
আমাদের ছন্দহীন কবিতাগুলো হতে চায়
বিষয় গরবে গর্বিত—আমাদের অহংকার কুঁকড়ে থাকে
পয়সাহীন জীবনের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার ভেতর
আমাদের অজ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেয় বিস্মৃতি
আমাদের জ্ঞান স্মৃতি ও অনুভবের মাঝামাঝি জায়গায় থমকায়

আমরা ভোটের জন্যে রাজনীতির বদলে চেয়েছিলুম
রাজনীতির জন্যে ভোট—বুলেটের ব্যবহারে
আমরা দেখেছি সৈনিক ও খুনি দুজনই দক্ষ সমান
যৌনতার নীচে হাঁটু গেড়ে বুঝি গণিকার থেকে প্রেমিকার গুরুত্ব কত বেশি
আমাদের ব্যর্থ কবিতাগুলি জানায় আমাদের
আমরা স্বপ্ন দেখেছিলুম সফল কবিতার—ব্যর্থ প্রেম জানায়
আমরা স্বপ্ন দেখেছিলুম সফল প্রণয়ের—ব্যর্থ জীবন জানায়
আমরা স্বপ্ন দেখেছিলুম সফল জীবনের—এখন
কেবল ব্যর্থতাগুলিই সফল হল জীবনে—মূল সফলতা
শব্দটি রয়ে গেল অভিধানে...

সত্যের পথ

মিথ্যা মোহ থেকে মুক্তি চাই আমি
সত্য তুমি বলো রয়েছো কোথায়
হাড়ে ও মাংসে কেমন সংঘাত সৃষ্টি হয়
প্রাণে প্রথম স্পন্দন—কে তুমি অতিথি
দেহের ভিতরে শুনছো বসে দিন মৃত্যুর
কে তুমি সৈনিক হনন ক্লান্ত পাচ্ছ শিরোপা রাষ্ট্রের
কে তুমি খুনি হে রণশ্রান্ত পাচ্ছ কেবলি শাস্তি
কে তুমি প্রেমিক হে যৌন তাগিদে বুঝছো কার নাম ব্যভিচার
খুঁজি গে কোথা পথ সত্যের?

প্রহসন

মৃতের ইতিহাস লিখি পরীক্ষার খাতায়—জীবনের ইতিহাস নয়
জীবনের ইতিহাস খুঁজে ফিরি সাহিত্যের পাতায় পাতায়
দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যের ভিতর আছে যার বিকাশ ব্যাপ্তি ও ক্ষয়

কেন তুমি চেয়েছিলে নির্বাণ গৌতম বুদ্ধ হে বোকা কোথাকার।
কামনা উধাও হলে কাম্যের প্রতি আসে নিঃশর্ত অনীহা
এই তত্ত্ব নিয়ে জন্মান্তর বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ধ্যান
কৃশ তনু উজ্জ্বল চোখ চুলে জটা পরনে গেরুয়া চলেছো কোথায়
তোমরা কোন অনির্দেশ নিয়তির টানে নিয়েছো সন্ন্যাসে—কেন?

পেয়েছো কি অনল প্রভাবে কেন বাষ্প হয় সলিল তার
বৈজ্ঞানিক উত্তর
ভগবানের নাম গান করে
কী করে তরল বীর্য রূপান্তরিত হয় শব্দ ও স্বাদময় জিহ্বায়
জেনেছে কি এসব যোগাভ্যাসে
অণ্ডভাণ্ড ভেঙে ফেলে উড়ে গেলে পাখি নীল জীবনের দিকে
যে জীবনে আছে শীত বৃষ্টি ঝড় নীড় ভাঙা ভয় পিতৃত্ব ও সন্তানধারণ
মানুষের জীবনের মতো
মানুষের জীবন যে রকম
দেহভাণ্ড ভেঙে ফেলে উড়ে যাবে না কি ফের
আরও এক অনাগত আগামীর দিকে
সেখানেও পৃথিবীর পাখিদের মতো
সে জীবনে আছে শীত ক্ষিদে বৃষ্টি পিতৃত্ব
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু তবুও
শান্তি আছে বলে দিয়ে
পরাধীন ভারতের শহীদ-বেদীর চেয়ে স্বাধীন ভারতে
যদি আরও ঢের বেশি শহীদ-এর সংখ্যা
বাড়ানো যায় তবে বিশ্ব কবি ও সুন্দরীদের দেশ
ভারতবর্ষে আর কে চায় নির্বাণ
লর্ডবুদ্ধ-অহিংসার বদলে আমরা চাই
রাইফেল শান্তির উৎস হয়ে যাক—

শৈলেশ্বর ঘোষ

আমার নগ্নতা

সূর্য কি আবার জেগে উঠবে তোমার বুকে, অবাঞ্ছিতের
যাত্রা শেষে এই জলের ধারে, স্তব্ধতা—তোমার দিকে
পরিজনহীনেরা ক্রমশ এগিয়ে যায়, কথা বলা তুমি, কথা বলো,
ঘৃণায় এই সমুদ্রের বুকে একটা পাখিও ওড়ে না,
একটি পশুও ভয়ে নিজের নগ্নতা নিয়ে আসছে না
এদিকে, উত্তর দাও, কে আমি? কেন এই শরীরের
ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করেছে সকলে, মনুয়া, ওরে
মনুয়া, বাড়ি ফিরিসনি বলে কি তোর বাবা আলো
হাতে খুঁজতে বেরিয়েছে তোকে? জল কি তোকে টানে?
এই স্তব্ধ শহরে কোন মেয়েমানুষের ঘরে তুই লুকিয়ে ছিলি?
ওই তো ভোরের পাখি ডাকে, মনুয়া তোর
চোখের কালি কে মুছে দেবে! পথে বা বিপথে
ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে কাদের সংসারের সামনে
দাঁড়িয়ে পড়েছিলি, বল দেখি, কী দেখেছিস?
প্রবঞ্চিতেরাই কেবল ভালোবাসা নিয়ে এসেছিল
পৃথিবীতে! হায়, হায়, শব্দকে অবিশ্বাস করে
তবেই পেলি স্তব্ধতা, ভালোবাসাকে অবিশ্বাস করে
তবেই পেলি জীবন, গানকে অবিশ্বাস করে
তবেই পেলি ক্রুরতা ও প্রলাপ ; মনে হয়েছিল
একদিন সত্যি ফিরে যেতে হবে, কিন্তু না, কালো
রাত্রিতে শিকারি জন্তুর মতো লুকিয়ে থাকার
অভ্যেস হয়ে গেছে তোর, পরিত্যক্ত বেশ্যাদের
বিছানায় ঘুম কি তোর ভাঙবে না কোনোদিন?
আরেকদিনের ক্লান্তি ও শূন্যতা যৌনতা হয়ে জেগে উঠবে,
এই যে পারাপারহীন জলরাশি, এই যে
ইঁদুরের মতো মানুষেরা খাবার সংগ্রহ করে দ্রুত সরে
পড়ছে গর্তে, এই যে যৌনছেদনের গোঙানি, এই যে
অস্বীকার ও মৃত্যু, এরপর আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে?

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো এটাই তোর শেষ গাড়ি
অবাঞ্ছিত হিসাবে এ শহর ত্যাগ করার এটাই তোর
শেষ সুযোগ, যে গান শেষ হয়ে গেছে তার জন্য
দুঃখে না করে বুক ভরে এই নির্মম বাতাস টেনে নে!

ক্ষুধা

মহাশয়গণ, এবার আমাকে বলতেই হচ্ছে কেন বেঁচে থাকি,
কেন বেঁচে আছি, কীভাবে বেঁচে আছি তা নিশ্চয়ই বলার
দরকার নাই—আপনাদের মতো আমিও এক ক্রোড়পত্র
শুধু উগ্র উত্তেজনা, প্রতিমুহূর্তের অস্থির আত্মঘৃণা,
অতিদীর্ঘ ছায়া, আড়ালে শারীরিক স্তব্ধতা, গুল্মের
মত প্রকাশ ও বিকাশ, শতাব্দীর কারখানায় ভোঁ-বাজার
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাবা মার মতোই আমাদেরও
অন্তঃকরণ নুনজলে ভরে ওঠে, এখানে অপচয় আছে
বলে আততায়ী ছুরি ফেলে নিশ্বাস নিতে চায়,
বায়ু দিতে চায় প্রাত্যহিক হৃদয়, কেন যে হয়নি
আত্মবলিদান, আমি নিজেরই হাতে তৈরি
করেছি মনের মতো প্রিভি ও বাথ- আমি যে
আঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্যেও ছিলাম প্রজননশীল,
ভারতবর্ষের মানচিত্রের ত্রিকোণ আকার মধ্যরাতের
সমুদ্রগর্জন, মা ও ছেলের কামনার পৌনঃপুনিক
বিলাপ, এইভাবেই হারিয়ে গেলাম প্রতীক্ষায় বুভুক্ষায়
লালসায়, উপস্থিতকে বর্তমান বলে প্রতীয়মান
হয় বলে সর্বনাশা মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে আসে
শীতল্ল দড়ি, তবে তুমি এক বালতি জল তুলবে বলে?
চমৎকার, মাতামহী আমাদের, চমৎকার গল্প তোমার
শোন এই গল্প কিছুটা মৃত্যু গোধূলিতে অতৃপ্ত
রতিক্রীড়া, বাস্তব ও স্বাধীন চেতনার
অগোচরে নশ্বর ও নিশ্চল প্রবাহ, জামার বোতাম,
ডান হাতের তর্জনী, ঝিল্লী, বিষ্ঠা, লেজ এবং
ওভারকোট, কুলিকর্দম, টয়লেট, মদখাওয়া,
মোহপাশে উদ্বৃত্তটুকু গোপনে চোষা,
ক্ষুধার্তের ভগবান তুমি ধনীর গোপনঘরে কখন প্রবেশ কর—
তোর দিকে এগোবার কোনো চেষ্টা নাই আমার,
মহাশয়গণ রূপকথার এই গর্তটির মধ্যে উঁকি মারুণ
উপরের কথামালা যদি কামার্তের বিশুদ্ধ
ভালোবাসা বলে মনে হয় তবে চুলদাড়ি সমেত

নভে, লোমে, সূর্যে সমুদ্রে মিলিত ব্যর্থতার
ভাষাহীন শব্দে, ফুলতোলা জীবন এই মাংসে
গুরুভার হ'লে, মুর্খ যতটা বোঝে গূহ্যতত্ত্ব,
উপায়বিহীন প্রাণ, নেমে এসো—যেখান থেকে
আমি ডাকছি, সৌন্দর্য আগুন ও ক্ষয়কে
গ্রাস করব বলে

অপব্যবহার

পর্যবেক্ষক ও যথেচ্ছাচারীদের সঙ্গে অত্যাবশ্যক মালপত্র
নিয়ে আমরাও এসে পড়েছি এখানে, হাতে আভ্যন্তরীণ
দৃশ্যের ছবি, ভুলে গেছি নগ্ন গণিকার বুকে কী সৌন্দর্য সুখ
আশা করেছিলাম,—এখন নৈরাশ্য ও বিরোধীতায় আমি
আমুল পালটে দিতে চাই তোমার বিক্ষোভ আন্দোলন
দায়িত্বজ্ঞানহীন উপবাস, রাস্তায় রাস্তায় যেসব ভিক্ষুক
বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল তাদের
তো বাস্তবিক কোনো কার্যসূচী ছিল না, স্ত্রী পুত্র ছিল না,
বাড়িঘরের সমস্যা ছিল না—পুলিশের চোখে,
ধুলা দিয়ে এরা বেঁচে থাকে এবং সহবাস করে,
সন্তান এদের কামনার সামগ্রী নয়—সমুদ্র তুমিও
আমাদেরই মতো পর্যবেক্ষক ও যথেচ্ছাচারী, তোমার
মুদ্রাস্ফীতি নাই, প্রথম দিন থেকেই তোমার
প্রতিবাদ একই রকম আছে, ভাবপ্রবণ দৃশ্যে আমরাই
কেবল স্বাধীনতার বিপজ্জনক রীতিনীতি লুকোচুরি
বিনিয়োগ বুঝে নিয়েছি—সেইসব মৃত্যু,
ভালোবাসাহীন রাত্রি ও দিনের অশ্রু ও শব্দমোচন
নিজেদেরই সম্মতিতে ব্যক্তিগত হত্যা বা আত্মহত্যা
শীতল বৈপরীত্যে তবু আজ আমরা মুখোমুখি
—অবিশ্বাসী হৃদপিণ্ড তোমার কাছে কিছু
উগ্রপন্থী সংস্কার শিখে নিয়ে
যাবে—যদি অপব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়!

আভ্যন্তরীণ ঘটনা

কালো-হৃদয় নীল-শরীর হলুদ-চোখ
লুপ্ত হাত আগুনচুল স্বপ্নে দেখা মুখ
নৈরাজ্য-ভালোবাসা, সমুদ্র-গম্বুজ
জীবন-ঘুম আত্মহত্যাখুন, সবুজ

মৃত্যু, বর্তমানই স্মৃতি ভিখারির ধন
হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে আছে যে জন
ক্ষুধা যদি কামনা, ঈশ্বর-অন্ধকার
সমকাম-আত্মকথা, কবিতা-বিকার
মেয়েমানুষ-যোনি, পুরুষ-শূন্য
ঘাস-অহংকার, দাস-পরিপূর্ণ
এপাশে ঘর ওপাশে ঘর মাঝখানে
দরজা, আমরা তো বন্ধ করি
ছাদ থেকে যদি ঝোলে একগাছা দড়ি
যে দেখেছে মধ্যরাতে সেই শুধু জানে
বুলেট-ফুল এই হারিয়ে যাওয়া মানে!

অরুণ বণিক

শারীরিক অভিযান

প্রতি রাতদু'টোতেই আমর পেঁচারা জেগে ওঠে আমায় টিটকিরি দ্যায় আমার আঘ্রাণের কাছে জয়ন্তী বিধবার মতো নষ্ট চাঁদ আধখানা চুপচাপ অপেক্ষা করে অপেক্ষা করি আমিও মাত্র পাঁচ মিনিট চারদিকে অন্ধকার ঝুলের মতো ঝুলতে থাকে কখনো গলে গলে পড়ে সারা শরীরময় এই আঁধার আমার নাকের কাছে এই ঝুল বুকের ভেতর ঠেলে ওঠে দুই মুখ খোলা কেনেস্তারার গান সমস্ত চরাচর কমোডের উপর আছড়ে পরে মিউকাসের সঙ্গে আমার কোনো অতীত মানি না আমি আমার কোনো ভবিষ্যৎ—

প্রতিসন্ধ্যায় বুকে হাত দিয়ে এই পাশব শরীর আমার প্রতি সন্ধ্যার একাকীত্বে যখন ধূ ধূ চৌরাস্তায় জ্বলে ওঠে রাত্রির প্রথম লাইটপোস্ট শরীরময় উইটিপির জীর্ণ কাঁথা ও অন্তরালে হতাশায় মত্ত কীটের দল সারিবদ্ধ নীরব নিঃশব্দ ক্ষয়যুদ্ধে রত তখনই আমার সময় হয় তোমাদের সঙ্গে দেখা করার তোমাদের বুকে যখন বাল বিধবার হতশ্বাস ঠেলে ওঠে যখন তোমাদের মিথ্যা রঙিন অতীত জেগে ওঠে জীর্ণ পাঁজর ঠেলে যখন তোমাদের সময় হয় ওইসব উপকথা বলে আমাকে তুচ্ছ প্রমাণিত করার বা বর্ণিত পুংউদ্যোগের অতিরিক্ত কিছু আমার দ্বারা সম্ভব কিনা এসব যখন তোমাদের চোখে ভাসমান ধূর্তামি হয়ে ভাসতে থাকে তখনই গভীর অরণ্যানীর ভীতিকর রাত জেগে ওঠে মগজের কোষে ইচ্ছা অনিচ্ছার মই ফেলে বারবার মেপে নিতে হয় নগদ বিদায়ের তীব্র নোটিশের উপর কতক্ষণ ভেসে থাকবে পরিত্যক্তদের ব্যক্তিগত গালগল্প যার ত্রিসংসারেও কেউ নেই তারও আছে অমোঘ ক্ষুৎনালীর ও লঙ্গরখানায় হানা দেয়ার কলাই ওঠা থালা এবং পাতলা দাস্তের মতো খিচুড়িতে শরীরের কিছু কিছু অংশ যে একেবারেই ২য় বা ৩য় ক্ষুধার জন্য অন্তত একবারও অক্ষম গর্জন করে উঠবেন না এটা লঙ্গরখানার বাসিন্দারা সবাই অস্বীকার করে না তাই ভিক্ষুকেরাই থালায় হাত বাড়ায় ২য় ভিক্ষুক নগদ লেনদেন না হলে নেহাৎই দুঃখের অজীর্ণ অম্বলে কেই বা বুকজ্বালা ডেকে আনতে চায় এরকমই ঘটছে প্রায় প্রতিদিন এবং ভদ্রলোকদের ১০০ কবিতা বিক্রি করেও একটি স্বাধীন বেশ্যাকে পাঁচ মিনিটের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে না—তাই বোধ হয় কবিতার নাম অপচয় অপচিত যৌবনের নাম কবিতার গুমোট গলিপথে অন্ধকারে একবার পা বাড়ালে কুষ্ঠাক্রান্ত মস্তিষ্ক এবং প্রথম শিশিরে আচ্ছন্ন মধ্য বয়সী নিম গাছ হৃদয় বলি তোকে—ট্রামের তলায় থেঁৎলে যায়।

সুবো আচার্য

ভূয়োদর্শন

রাক্ষসী শূন্যতায় উলটোমুখে হাঁটছিল তিনজন,
অথবা সম্মুখ—
মাঝে মাঝে দিক্‌ভ্রান্তি, ভয়,
ভ্রান্তি নয়, ভ্রম নয়, মায়া নয়, স্পষ্ট কুয়াশা
শীত, কাতর বাতাস, জনতায় নির্জনতা, কোলাহলে স্রোতশব্দ
নারীর শরীরে অপ্রেম, অবিশ্বাস, বীর্যগন্ধ
বুকের ভিতরে চলে অন্ধ ভাঙন বাহিরে নিশ্চিত শান্তি,
সমাজ সংসার, জীবনের প্রতি রূপ, রূপান্তর,
স্মৃতি ও বিস্মৃতি, খেলা
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত মাংসে—মাংসের ভিতরে হিংস্রতা,
হাত মোচড়ানো ক্ষোভ—
এরই মধ্যে হেঁটে যেতে হবে একজীবনের অনন্তকাল!
ভাবলো একজন, ভেবে জলে ডোবা মানুষের শেষ
দৃষ্টিপাতের মতন তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো,
অন্যজন চমকে উঠে মিশে গেল গড্ডল প্রবাহে
চোখের পলকে,
তিন-নম্বর লোকটি একটু হাসলো
দুঃখে কিনা স্পষ্ট বোঝা গেল না
তারপর একা একা হাঁটতে লাগলো শান্তভাবে

সমুদ্রের কাছে

চূড়ান্ত জ্যোৎস্নায় আজ খেলা করে উত্তুঙ্গ সাগর
তরঙ্গবিভঙ্গ দেখে মনে হয় সে পেয়েছে সৃষ্টির নিশ্বাস
যেন বা জেনেছে অপার রহস্যভরা অনামী
আস্বাদ তমসার—
আমরা কী পেয়েছি বলো?
শুধু ঘাম রক্ত অশ্রু থুথু মাটির উচ্ছিষ্ট ছাড়া

পেয়েছি কি কিছু? ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে যতোটুকু চেনা যায়
এই মর্ত পৃথিবীর তার বেশি কী পেয়েছি বলো?

অন্যত্র যাওয়ার কথা মনে হয়
জ্যোৎস্নার আছাড় দেখে অজানা দেশের কথা মনে পড়ে
এই রুক্ষ ক্ষুধার্ত নগর ছেড়ে চলে যেতে হবে—
চলে যেতে হবে জানি
তবু মানবজীবনের এই অসম্পূর্ণতা রেখে যেতে
কিছুতে পারি না
করতলে ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা হয়
সমুদ্রের এত কাছে দুই চোখ ভীষণ শুকোয়—

আপাতস্তব্ধতায়

রাত্রি আজ সমুদ্রের মতো গাঢ় হয়ে আছে
জানা অজানার সমস্ত কিনারে
পোকার তীক্ষ্ণ শব্দ নিস্তব্ধতা কুরে খায়
কোথাও এখন কোনো অপ্রয়োজনীয় কোলাহল নেই, যুদ্ধ নেই
জেগে থাকার মার ধুন্ধুমার নেই—
একটি রাতজাগা ইঁদুর নর্দমা থেকে বেরিয়ে সটান
রান্নাঘরে ঢুকে যায় মানুষের সভ্যতা চিবোবে বলে
একজন ধূর্ত তস্কর গর্ত থেকে উঁকি দেয়া সাপের মতন
মাথা তোলে
আমি আপাতমৃত্যুর মতো রাত্রির ভিতরে বসে থাকি,
উঠি, গ্রন্থ নাড়াচাড়া করি, জলপান করি, সিগারেট
হাতে মনে পড়ে কবেকার কথা, অদ্ভুত ক্লেশের ভিতরে
ঘাম ও রোমাঞ্চের ভিতরে ঘটেছিল জাগরণ
কবেকার কথা কবে কবে যেন সুদূর সমুদ্রতীরে
জন্মেছিলাম, শব্দহীন সাগরের ফেনা মেখে আমার
শরীর ভেসে এসেছিলো
জননী শরীর ছিঁড়ে আমার বাস্তবেরা মুখোমুখি
অসহায় মার ধুন্ধুমার
ভয়াবহ আরতির বাহিরে দাঁড়ানো একা যেন বা
রোমশ জলের মধ্যে পিতৃতর্পণের ছলে
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মা চুরমার করে জেগে ওঠা
জাগরণ, মৃত্যু ও সৃষ্টির মাঝখানে আগুনের গোলার
মতো ছিটকে পড়েছি যেন বত্রিশ বছর ধরে

বত্রিশ'শো সময়ের অনন্তে কেবলই দেয়ালের
মুখোমুখি, স্তব্ধতার মুখোমুখি
সভ্যতাকে হাত নেড়ে চলে আসি
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মার কাছে—সে যেন জলের অতল
নিম্নে আরও জল
বুভুক্ষায় জেগে আছে হাজার বছর

ধরে থাকি

হাতের মুঠোয় ধরি কলকাতা,
ধরে রাখি
ধরে রাখি এই একরত্তি শহর
যা আমার করতল কামড়ে ঝুলে থাকে
এই ছোটো শহর—CMDA-র মাটি কাটা থেকে
কলকাতা করপোরেশনের মশক উৎপাদনের চমৎকার
পরিকল্পনা কিংবা অনির্বচনীয় রূপসীরা, যারা
স্বপ্নে দেখা দেয়ার মতো হেঁটে যায়,
যাদের যাবতীয় রহস্য রিজার্ভ ব্যাংকের করুণার দিকে
চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকে বলে আমি গ্র্যান্ড
হোটেলের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পাই
ধরে রাখি সব, করতলে, হাতের মুঠোয় আমি
ধরে রাখি এই বিদীর্ণ কলকাতা, থ্যাঁতা ইঁদুরের
মতো রক্তমাখা মুখ, কিংবা ওইসব মানুষেরা
যাদের হৃদয় আমার হৃদয়ের মতো, তবুও হৃদয় নেই
নেই বলে আদর্শকে ঘৃণা করে, ঘৃণাকেই ভালোবাসে
অজ্ঞানের মতো, স্বপ্ন দেখে কাঁদে আর পুনরায়
স্বপ্ন দেখতে চায়, প্রতিমুহূর্তে পরোক্ষ নরহত্যায়
জড়িয়ে যায়, পাকস্থলী আছে বলে ফসলের স্বপ্ন
দেখে ক্লান্ত হয়, পুরুষানুক্রমে যারা জীবনকে ভুলে
যেয়ে জীবনেরই বন্দনা করে স্বভাববশত
পচে যায়, গলে যায়, ছিঁড়ে ফেটে একাকার হয়ে
মাটি হয়ে যায়
সংস্কৃতির মঞ্চে উঠে হুড়োহুড়ি করে আর
ঘুমপাড়ানির গান শুনে জীবন কাটাতে চায়
সব ধরে রাখি আমি করতলে, হাতের মুঠোয়
প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাঙ্ক মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে
শুরু করে জীবনের প্রত্যেক রূপ,
রূপহীন এই দশকের বাঙালি জীবন

মানুষের ত্রস্ত চিৎকার, ভয়, মৃত্যুর মুখোমুখি উদাসীনতা,
যেখানে বিকাশ হয়নি কোনো মানুষের, রাস্তার পশুর
মতো যারা মরে যায়, যারা ভেবেও পায় না কেন
হোলো সিফিলিস, কেন যে যৌবনেই মৃত্যু দেয়
উঁকি, বন্ধুত্বের মূল্য যারা ২৩০০০ টাকায় নিরূপন করে.
ধরে রাখি করতলে সব ধরে রাখি
সৃষ্টি ও স্থিতির খেলা ধরে রাখি
প্রতিবাদে কেঁপে ওঠে অস্তিত্বের ভিতরে আঁধার
প্রতিবাদে কেঁপে ওঠে অস্তিত্বের ভিতরে আঁধার
প্রতিবাদে কেঁপে ওঠে
বারবার কেঁপে ওঠে

জীবনকাহিনি

মাঝে মাঝে সিগ্রেট নীরবে জ্বলে চোখ নীচে নেমে যায়
বহিরাগতের মতো একা একা ঘুরি
যেন ছদ্মবেশে, অজ্ঞাতবাসের মতো পৃথিবীতে বাস
যেন জলের অনেক নীচে একা ঘোরা, একা একা একা বলা,
বহুদূর পরিব্যাপ্ত অমোঘ ভুবনে আমার আশ্চর্য ভ্রমণ
একা একা, বুকভরা সঞ্চিত আগুন ক্রমশই নিভে আসে
বুকের ভিতরে, মাথা ও যৌ-ক্ষেত্রে তবু দারুণ দহন,
চুরুট নীরবে জ্বলে, মাথা নীচে নেমে যায়
বহিরাগতের মতো একা একা ঘুরি

মাঝে মাঝে মনে হয় সবই ভ্রান্তি, আসলে কোথায় কোন্
মরুভূমি বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে ভরে থাকে, ছায়া দেয়,
এ জীবনে এ বিশাল পৃথিবীতে—ভূমিধ্যশরীরে—দাঁড়িয়ে
থাকাই শুধু হতে থাকে, ঘটে যেতে থাকে, নামহীন মন্ত্রপরম্পরা
চেতনাশৃঙ্খল খুলে বার হয়, চাঁদ ডুবুডুবু রাতে মনে পড়ে
কত কথা, কত স্বপ্ন, কতশত সোনার পাখির শব্দ
ঝরে যেতে থাকে, পথ থেকে অন্যপথে, একঘাট থেকে
আমি আঘাটায়, স্বপ্ন বাসি হলে অন্যস্বপ্ন, মৃত্যু খুব
একঘেয়ে মনে হলে দেখি অদ্ভুত গাধার পিঠে
বসে আছে শরীরী বাস্তব, দলে দলে মানুষেরা
দৌড়োচ্ছে স্ত্রী-দ্বিধায়, এছাড়া কোথাও কোনো স্বপ্ন নেই,
এছাড়া কোথাও কোনো আনন্দ নেই, হৃদয়ের মধ্যে আছে
অতল গহ্বর, ক্ষুধা, ভয়
অনিবারণীয় রৌদ্রে মনে পড়ে আমার জন্মভূমি, বিষণ্ণ স্বদেশ,

কঠোর দুচোখ জ্বালা করে ওঠে
ফিরে যেতে চাই
সুবাতাসে ফিরে যেতে চাই

মাঝে-মাঝে অন্যমনস্কের মতো, ভূতগ্রস্ত, তাড়নায় যেতে থাকি
এক মাটি থেকে অন্য মৃত্তিকার দিকে, সুবর্ণমুদ্রায় নাকি পৃথিবীতে
নারী পাওয়া যায়—তবে সে কেমন নারী, তবে তার কেমন হৃদয়
ভেবে কপালের খুলি শিউরে ওঠে, ক্রোধ নেই ততটা লোভও নেই,
শুধুই অনাদিঅনন্ত কাম আমাকে ঘাসের গোড়ায় যেতে বলে
যেন মাথার ভেতরে নেভে আলো—যেন আত্মায় নৈরাশ্য,
বিশৃঙ্খলা, শেকলের ধারাবাহিক শব্দ,
সভ্যতা ক্রমেই আরও ডুবে যায় কুয়াশায়
ভাঙে বেদব্যাসের মুখশ্রীপ্রস্তর
উত্থানপতনময় রাস্তায় আমি পাই বেদনার ভিতরে তামাশা,
আমার নাভির ভিতরে শুধু হাসি খলখল করে, মোচড়ায়,
আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে স্পর্শ করি গোমাংস
আমি দেখি প্রাসাদের বাহিরে একা নারী দূরদেশে যাবে,
যাও নারী, আমার ভালোবাসার জন্য খুব একটা চিন্তা হয় না,
একটি তর্জনী তুলে আমি বলে যেতে পারি প্রেমভালোবাসার
প্রত্যেক ধারণা ভুল, খুবই ভুল,

মাঝে মাঝে অনেক নিক্ষপ্ত ছুরি ছুটে আসে আমার দিকেই,
তামাশাজনিত হাসির সঙ্গে আমার করুণাও হয়,
অপার্থিব নিস্তব্ধতায় এসে দাঁড়ালেই নিজেকে চিনতে পারি না,
মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে জল নেই, জলের ভিতরে স্নিগ্ধতা নেই,
বায়ু নেই, বায়ুর ভিতরে পরিতৃপ্তি নেই, অগ্নি নেই
অগ্নির ভিতরে দহন নেই, মাটির ভিতরে মা নেই,
চোখ নেই, চোখের ভিতরে দৃষ্টি নেই, জেগে ওঠা নেই, জেগে
ওঠার ভিতরে জাগরণ নেই, শুধু ঘুম শুধু চা মাংস মদ কফি
টাকাপয়সা যৌনক্রিয়া জীবনসংগ্রাম ও হায় হায় করতে করতে
মাটিতে লুটিয়ে পড়া
যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে-মাটির সঙ্গেও
তার কোনো সম্পর্ক নেই—একথা না জেনেই
মানুষ মাটিতে লুটোয়—
তবু সুবাতাসে ফিরে যেতে চাই, ফিরে যেতে চাই ;

সুভাষ ঘোষ

সন্তান সন্ততি

একটি মাত্র সন্তানের এক নাবালক পিতা আমি—আমার ছেলের বয়স ৩—

পটলের সন্তান পটল হয়—আলুর সন্তান নিখাদ আলু—কুকুরের সন্তান আদ্যন্ত কুকুর এক—মানুষের সন্তান মানুষ কি না আমি আজো ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি—

আমার ছেলের জন্মের তৃতীয় বার্ষিকী আজ পেরিয়ে যাচ্ছে—

পেরিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে টানা রিল আমারও সামনে দিয়ে :

রঙিন ন্যাংটা, ইজের আমার—ইতস্তত পা—জন্মদিনের লাল শালু—কোমরের লোহা ও কড়িযুক্ত ডোর—রেশমচুল মাথার—ইঁদুর গর্তে একে একে দুধদাঁত—কত কত বাসান—পুবে আমারই আবির পাতাকা—পশ্চিমে গৈরিক—দক্ষিণে রঙিন মাফলার আমার—উত্তুরে পালকযুক্ত টুপি—

প্রথম দাঁড়িগোফ আমার কোন্ ফাক্‌সা সেলুনে চলে যাচ্ছে—সন্ধিস্থলের প্রথম উদ্গাম—আমার সনাক্ত করণের প্রথম সাক্ষীরা কালো শাম্‌লা পরে হারহাইনেসের কট্টর চোয়ালের দিকে—

গেঁয়ো সুভাষ যাচ্ছে ভদ্রের উকুনের দিকে—

এই মুহূর্তে সামনে দিয়ে

একটি লোক, লোকের দিকে—

প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার কাছে—

জনপ্রিয়, জনপ্রিয়তার পোঁদে—

মাকাল, মাকালের কাছে—

প্রগতি, প্রগতির লেজে—

বোয়াল ধাওয়া করছে চুনোপুঁটি—

মৃত্যুর হাঁ-র দিকে ধাবমান বীমা—

ভানুগুন্ডার লাল গোলাপের দিকে ভীত মানবক এক—

: প্রিয় রবি, কী করি?

: জান্‌লা দরজার ভালো চাস্ তো এক্ষুনি জব্বলপুর কাঠের খোঁজে যা—

সেই কখন চলে গিয়েছে ১২-৪৭র শেষ গাড়ি—সেই থেকে যে যার জায়গায় খোঁড়া হয়ে এই ছোট্ট শহরে চাকা ও মানুষ—রাত উগ্র এখন আমারও বিছানায় ঘরে—ছেলে ও মার ঘুমের শব্দ কানে শুধু—বালিশে চিত আমি—মশারির বাইরে মুখ, সিগারেট টানি—আমার ডান পাশে করুণা, করুণার ডান পাশে ছেলে তার—ওদের নাকের শব্দে অতল গহ্বর কানে আমার—

ছেলের পা কচলানোর শব্দে মাথা ঘোরাই—চোখে পড়ে চিত করুণা—করুণার উরু সন্ধির কাছে উল্টানো শাড়ি শায়া—আরও দক্ষিণে ছেলে চোখে পড়ে—চুল তার, দেবদ্বিজের বুজোনো চোখ—কপাল, নাক, মুখের ম্যাপ, রঙ্—

তার টুটু বালিশের পাশে ন্যাট্‌বিমানের আকৃতির খেল্‌না বিমান চোখে পড়ে—

পাইপ্‌ মুখে কলের গরিলা—কার দেয়া খেলনা পিস্তল—মোরগমুরগীর প্লাস্টিকের ঝগড়া—তার মিলিটারি মেসোর দেয়া অলিভ্‌ রঙের প্যান্ট শার্ট—

'পশু-পরিচিতি' সমৃদ্ধ ছবির অ্যালবাম্‌ এক—'যন্ত্রে-দুনিয়া '—ইঁদুর বেড়ালের ছবি ঝল্‌সানো ছড়াছবির বই—

এই ৩ বছরে আমি লক্ষ্য করে আসছি বরাবর, বড়রা ছোটোদের সহিত মানবেতর প্রাণী নিয়েই কথা বলতে বেশি ভালোবাসে—চারপেয়ে প্রাণী নিয়ে—(মার্কেটের সঙ্গে আর পারা যায় না—২ হাত, ২ পা নিয়ে)—তাদের ডাক, অভ্যাস, রঙ—তাদের রকমফের সে কতটা আগে আগে বুঝতে পেরেছে তার উপরেই নির্ণয় করতে চায় ছোটোদের মেধা প্রতিভা...

দ্রুত তারা শিশুদের, সন্তান সন্ততিদের চারপেয়েদের সহিত বই কথা ইঙ্গিত শাসন মারফত পরিচয় মিলন ঘটাইতে চায়...

আজ তো পরপর অনেকেই মুখেই :

: এই তুই চিড়েখানা দেখেছিস?

: কি কি দেখেছিস্‌?

: ওমা! আজ যাস্‌নি?

: বাব্বা! আজ দেখাওনি!

: তোমরা যেন কীরকম! নিয়ে যেও না একদিন, মজা পাবে...

এসব নিয়ে করুণার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি ২/৪ বার, কিন্তু তাতে ছেলেখেলাই প্রশ্রয় পেয়েছে...

: পশুরা সরল সুন্দর এক-রেখ্‌ তাই আমরা মানুষরা তাদের সঙ্গে ছেলেপুলেদের দ্রুত পরিচয় ঘটাতে ভালোবাসি...?

করুণা : কী যে বলো!

: আমরা সচেতন পশু বলে প্রকৃত প্রাণের সঙ্গে প্রকৃত মানুষের চেনাজানা করাতে চাই?

: এত কথা বলো আবোল তাবোল...

: আমরা মানুষ বলেই কি মানবেতর বিষয়ে আগে আগেই শিশুদের সাবধান করি?

: বাজে কথা ছাড়ো তো!

: 'শিশু'/'পশু'...এরকম বিপরীত অর্থের অথচ এত কাছাকাছি ধ্বনিযুক্ত শব্দের উদ্ভব কে করেছে, বলতে পারো?

: প্লিজ...

: আমরা জন্ম পাপী, তাই অবচেতনে চাই,
আমার সন্তান যেন থাকে নিষ্পাপ হয়ে...

: একটু চুপ করো ; ঘুমোতে দাও

: আমরা বাঁকা চক্র, হচ্‌পচ্‌, ওদের ঘাড় মটকে নিজেদের ঢাকি, দাঁড় করাই...বিনিময়ে ফুটপাত চাই...

: বাজেসব কথা নিয়ে এতো মাথা ঘামাতেও পারো, ভাল্‌লাগে না...

এই ৩ বছরে দেখে আসছি, কথার পেছনে আস্ত কথা যোগালে ছেলেখেলাই বেড়ে যায় কেবল—ছেলেখেলা আজও হয় :

স্মৃতিদি বার ৩ তুক্ ফেলে : যাই বলিস্ করুণা, তোর ছেলেকে দেখে কিন্তু কোনোভাবেই ৫ বছরের নীচে ভাবা যায় না। একটু আধটু শেখাচ্ছিস্ তো?

: মুখে মুখে আমি ওর বাবা যেটুক্...ও কখনো বাংলা ইংরিজি বই যা আনে ২/৪ খানা...

বীথি উৎসাহ পেয়ে : বল্‌তো ডোডো রাইনোসেরস্ মানে কী?

ডোডো : গণ্ডার

: পিগ্ মানে?

: শূয়োর

: শূকর বল্‌বি তো! কী ভাষা তোরা শেখাচ্ছিস্‌রে বাবা!

ভয়াবহ উৎসাহে মীরা : ব্যাট্ মানে?

ডোডো : বাদুড়

: ক্যাট্ মানে?

: বেড়াল

: র‍্যাট্ মানে?

: ইঁদুর

কোরাসে : গুড্ গুড্...

'সুন্দর, সুন্দর' বাথরুমে, কানে আমার, 'গুড্ গুড্' ধ্বনি প্রতিধ্বনি, ছেলে আমার 'র‍্যাট' 'ক্যাটের' অন্য শব্দ বলেছে, ভাগ্যিস্ ইঁদুর বেড়ালের খেলা কাকে বলে বলেনি,

: সাবাস, সাবাস! লাগাও হাত তালি...

প্রধান অতিথির আসনে ওঁকে বসাও...উনিই আমাদের আসল লোক...

আমাদের পুরষ্কার বিতরণি সভায় চাই ওঁকেই...

যৌথভাবে সান্ত্বনা ও মীরা : দেখিস্ করুণা ও একটা কিছু হবে, এত স্মরণ শক্তি...

বাথরুমে আন্ডার ওয়্যারের গিঁট বাঁধতে বাঁধতে সুভাষ, সুভাষের কানে : ও কী হবে?

ঠোঁট থেকে সিগারেট টানি, মেঝেয় ঘষে আগুন নেভাই—মশারির ভেতর বিছানায় বসি একটানে—হাত বাড়িয়ে ডোডোর বালিশের পাশে, 'পশু-পরিচিতি' নিয়ে আমার বালিশে চিত হই আবার, পাতা ওল্‌টাই...পাতা ওল্‌টাই...

গভীরতর সারল্যে সৌন্দর্যে...আদি মাতার কাছে মাথা হেঁট আমার...'বই' বুজিয়ে পাশে রাখি কখন...'বন্যের', 'বনানীর' সৌন্দর্যের আমি কেউ নই, এই বোধ মাথা আমার বালিশের উপর ঠেঁসে রাখে কত সময়...

কখন্ ডান হাত বাড়িয়ে ডোডার বালিশের পাশ থেকে টেনে আনি 'যন্ত্রেদুনিয়া'...

দেখি, দেখে যাই...

পাতা, পাতা ওল্‌টাই...

হেডিং কত কত পড়ি...পড়ি : ভাষা—

'ইনার জনক ইনি'—'ওনার জনক উনি'
জানি, ইনি ওনার সন্তান, উনি ইনার—

ডোডো	জনক	বিষবাষ্পের
,,	,,	আরও উন্নত ন্যাট্ বিমানের
,,	,,	বীজাণু বোমার
,,	,,	নোজ্ গ্যাসের
,,	,,	মুনাফা কৌশলের
কুকুর ব্রিডিং-এর		স্পেশালিষ্ট ডোডো—

আত্মা ক্রয় বিক্রয়ের আদিমতম পেশার ইনি সেরা গুণী সবচেয়ে—

"ইনার সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, বেঢপ মানুষকে কেটে ছেঁটে শেষ পর্যন্ত উপযোগী মানুষ বানাতে পেরেছেন প্রথম ইনিই, তাই নোবেল বর্ণিত এবছরের শান্তি পুরস্কার ইনাতেই বর্তানো হলো॥"

সাংবাদিক : পিতা হিসাবে কিছু বলুন?
করুণা : মাপ করবেন, ওঁর হার্টট্রাবল, চিকিৎসকের নির্দেশে কথা বলা বারণ—

হঠাৎ ডোডোর নাক ডাকার বড়ো শব্দে ডান দিকে মুখ ফেরাই—চোখ থেমে যায় ওর মুখ নাকের উপর—কপালের উপর চোখ থমকে যায়—চুলের উপর—চোখের ভুরু ও চোখের পাতায়—ওর গোটা অবয়বে চোখ আটকে যায়—

যদিও এখন অবধি ওকে আয়নায় আমার সঙ্গে যেকোনো অবসরে মিলিয়ে দেখিনি, কিন্তু, পুরবীদির কথা সঠিক হলে, ও, 'লাইক ফাদার, লাইক সন্'—

বাংলার বিথ : বাপ্‌কা ব্যাটা...

অর্থাৎ, ওদের চোখে, ওর ভেতর অবিকল্ আমি এক—

ওঁনাদের বিচার ঠিক হলে এই অধম আমি, আমি এক কারো ভেতর চুলের উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি, চোখের, ভুরুর, ঠোঁট, ঠোঁট বিন্যাসের, চিবুক, গায়ের রঙের, হয়তো বা কপালের—বল্‌লে বলা যায়,

উত্তরাধিকার আমার :

গায়ের চামড়া	চামড়ার অসুখ
চোখ	চোখের কূট
কপালের বাহার	ভাগ্যের অধঃপতন
চুল	চুলের নিশিডাক
মুখ	মুখের মুখোশ
পা	পায়ের ভুল সঙ্কেত
দেবতার অবয়ব	কিন্তু নিখুঁত দানবের

আছে, আছে, আরও আছে, পুরবী বা বীথি তোমরা জানো, বা জেনেও জানো না, বিশাল এক পিতৃজিঞ্জিরে আবদ্ধ পিতা হিসেবে রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার আমার :

যাগ্ যজ্ঞ,
সোপান নির্মাণের বা
অতিক্রমণের ব্যক্তি গুহ্য

স্বজন পীড়নের কোড্
জলে না ভিজে সন্তরণ বিধি
নাইট্ ল্যাম্প
ঘোলা জলে মৎস্যশিকার
ম্যানেজ পদ্ধতি
ভাষার প্রতারণী শিল্প
ফুসফুস্ উন্নতির আয়োজন
বুক বাড়ানোর যন্ত্রকলা
SELF DEPOSIT VAULT
রোম্য যৌনঘরানা এক
তৎসন্নিহিত কলা
উত্তেজক যুদ্ধ পুস্তক
লেডিজ ছাতার নীচে বেশ্যা পদ্ধতি

প্রার্থনা : নিত্য রবিবাসরীয়,
হে মা, শ্মশান কালী, আমার পূজা নাও তুমি,
জ্যোতিষার্ণব পাথর দাও,
মোহনীয় আংটি দাও যাদুকর—
জয় সন্তোষি মা, ইচ্ছা পূরণ করো—
নির্বিচার যৌ ধর্ম দাও পশুরাজ—
শনিরাজ, আমায় দাসেদের রাজা করো!

প্রচণ্ড ফ্ল্যাশ্ হয় অকস্মাৎ—সারাশরীরে কেঁপে উঠি—নাড়ি খুঁজতে থাকি কার্য কারণের—'দাড়াও, পথিক বর...' কিছু বাদেই বিট্‌সমেত উনি ধরা দেন নিজেই :

ওহে অন্ধ, এখনি সিন্
ড্রপ্ করো না—সীতা
এইখানে, এই আমারই সন্তান...

: আমার, আমারই অমর সন্তান
ত্রিপিটক...

: কী ব্যাপার, সাম্যের এই আমি,
তুমি আমায় নোট্ করছো না?

: 'ক্রাইম্ ও পানিস্‌মেন্ট,' হাঁ,
আমার, এই আমারই আবিষ্কার...

: "হৃদয় শীর্ষের জনক" এই আমি,
তোদের সুতীর্থ...

সিন্ যতদ্রুত উঠেছিল, পড়ে যায় ততোধিক দ্রুত—
দ্রুত এনট্রি লাইট নিভে যায়, এক্‌জিট্
লাইট—আমি খাবি খেতে থাক—অন্ধকারে

অ্যাট্র্যান্ডম্ অ্যাম্বুশ্ চালিয়ে যাই—একটি
সোনার নদীর খোঁজ পেতে চাই আমি—একটি
সরল রেখ্ নদী...

বালিশে পাগল মাথা ছট্‌ফট্ করে—মাথা বাঁ কান বালিশে রাখে—ডান কান রাখে—নিরেট বালিশও বলে :

পটলের সন্তান পটল হয়
আলুর সন্তান খাঁটি আলু
কুকুরের সন্তান আদ্যন্ত কুকুর এক,
মানুষের সন্তান মানুষ কি না
আমি আজও ঠিক বুঝে
উঠতে পারিনি...

বাসুদেব দাশগুপ্ত

আলপনার জন্য

"শ্যামবাজার থেকে বিটি রোড ধরে মাইল দেড়েক দূরে...স্টপে নেমে একটু এগিয়ে বাঁ-দিক জুড়ে একটা মস্ত পাঁচিল, ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচিলের মতন একটানা নিষ্ঠুর শাদা।"

'এখন আমার কোনো অসুখ নেই' উপন্যাসটি শুরু হয় এইভাবে। 'ফায়ারিং স্কোয়াড' এবং 'একটানা নিষ্ঠুর শাদা' শব্দ দুটো যেন ঠিক জজ-সাহেবের কাঠের হাতুড়ি হয়ে টেবিলে ঠকাস্ ঠকাস্ আওয়াজ তুলেই থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সতর্ক এবং একাগ্র ওয়ে ওঠে। একটি প্রকৃত উপন্যাস পাঠের জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত করে নেয়।

কিন্তু হায়! উপন্যাসের প্রথম অংশটি শেষ হয় এইভাবে—'ও হোঃ সে (প্রতুল) আজ টাকার জোগাড় করতে পারেনি। আজ হয়ে থাকলেও কাল তাদের বাড়িতে রান্না হবে?' এবং ২নং অধ্যায়টিও শেষ হয় ওই একই প্রকার আদিক্যেতায়—"লোক কতরকমের হয় ; রোগা, দাম্ভিক, জোচ্চর, খচ্চর, কামুক, লোভী, উদাসীন, আমোদগেড়ে, বোকা ও ধীমান, বক্তা বা যে নীরব—জীবিকা, সমাজ, প্রকৃতি-ভূগোল ও বায়োলজির দিক থেকে লোক তা লক্ষরকম—কিন্তু যতদূর দু'চোখ যায় দু'পয়সার সেই ছোট্ট মুদ্রা অবধি টাকা নেই এমন লোককে তিন তিনটে দিন কেন, তিন মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করা যায় কী?"

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোকের দৈনিক গড় আয় যেখানে ২০/২২ পয়সা, তখন প্রতুলের এই উক্তিটি অশ্লীলতা নয়, বলার সহাস্য ভঙ্গী মাত্র।

তবে গ্রন্থকার নিজেও সম্ভবত বুঝতে পারেন যে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। তাই ৮নং অধ্যায়ের আরম্ভেই একটু সাফাই গেয়ে নেয়া হয়...'সকালে দুধ আসবে, আরও ভোরে বারান্দায় পাকানো কাগজ এসে পড়বে ঝুপ করে। চা হবে। পাঁউরুটি আসতে পারবে না। তবে চায়ের পর সিগারেট না আসার জন্যে অসুবিধে হবে না, কিছুটা তামাক ও কাগজ আছে। চাল, ডাল আছে মনে হয়। একটা কিছু খিচুড়িমিচুড়ি হবে বেলা করে। আলপনার স্কুল কামাই হবে। প্রতুল পারবে না অফিস যেতে।...এভাবে প্রায় তিনদিন, সোমবার বিকেল পর্যন্ত চলবে। সোমবার সন্ধেবেলা (প্রতুল মাইনে পাবে) হেভি বাজার করে ব্যতিব্যস্ত করে দিতে হবে আলপনাকে। আর ঝিমিকে ভুলিয়ে দিতে হবে মাংস এনে বাপের নাম।' এরপর ২৪ নং অধ্যায়ে পড়ুন—"সকালে দোকানে কাগজ বিক্রি করে যে পাবে কিছু সে সম্ভাবনা এ-বাড়িতে নেই। পাঁচ মাস কাগজ বন্ধ।" সুতরাং ভাবতে ভাবতে ছ'ছটি রুটি স্রেফ চচ্চড়ি দিয়ে খেয়ে অবশেষে প্রতুল আবিষ্কার করে তক্তপোষের নীচে বিক্রয়যোগ্য দু'টি পেতলের কল। এরপর সত্যিই বলতে ইচ্ছে করে—ধন্য তুমি প্রতুল! ধন্য তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! কিন্তু তার আগেই পাঠক একটু গোলমালে পড়ে যায় অই কাগজের ব্যাপারটা নিয়েই। এই যে একবার বলা হলো ভোরে বারান্দায়

কাগজ এসে পড়বে ঝুপ করে, আবার বলা হচ্ছে পাঁচ মাস কাগজ বন্ধ। কেসটা কী?

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি আপনার ছন্দীপনদাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে উনি মিহিন সুরে আপনাকে ধমকে দিয়ে বললেবন—"এটা Tale-tell নয়। ব্যাটাছেলের কাছে মেয়াছেলে থাকে, মেয়াছেলের কাছে ব্যাটাছেলে থাকে, হাড়ির ভিতর কাউয়া ডাকে কুউ কুউ কুউ...এ নয়। খালি নারকোল তেলের টিন নয়।"

আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলব, বিগত দশবছর ধরে ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতির ফলে সন্দীপনবাবুর ফাঁকিবাজী এখন বড়ো বেশি স্পষ্ট ধরা পড়ে যাচ্ছে। শুধু শব্দের ব্যায়াম, ভাষার পারিপাট্য বা শস্তা ফিল্‌মি ঢং-এর কাট-আপ দিয়ে আজ আর পাঠককে মাতানো যায় না। সন্দীপনবাবু গল্প বলেন কিনা জানি না, তবে যা বলেন, তা সবই অসার এবং আবারও মনে করিয়ে দেয়—ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ ক্-ত্-তো বেশি!

তাই উপন্যাসটির মধ্যে বোম্বাই ঢং-এ চলে পকেটমারের ফেলে যাওয়া মানিব্যাগ প্রাপ্তির রোমহর্ষক কাহিনি, চৌধুরী কেবিনে বসে প্রতুলের বইয়ের প্রথম অধ্যায় মুখস্থ বলার মতো কেরিকেচার, রাজকর্মচারীদের জীবন ট্রাজেডি,...এমনকি লেখককে বাঁচাতে শেষপর্যন্ত মনোজকেও সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহনন করতে হয় (ওরে মনোজ! তুই মর, আমি এট্টু কাব্যি করি।)...তবু শেষ রক্ষা হয় না, চুলে চেরির গন্ধ মেখে মার্থা আবার প্রতুলের বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে (বড়ুয়ার বুকে যমুনা?)...আর বোধহয় লেখককে বিপদগ্রস্ত দেখেই শতবার্ষিকীর বৎসরে শরৎচন্দ্রের প্রেতাত্মা একটি মারাত্মক প্রতিশোধ নিয়ে বসে, তাই ঝিমির মাটির আম ভাঙার মতো একখানা মাল জিনিস দিয়ে পাঠককে অশ্রুসজল করে তোলার চেষ্টাও অবশেষে তাকে করতে হয়।

হেনা বলেছিল না,

"তোমার শব্দগুলোও হাসে, তুমি জানো প্রতুল?"

ওগো প্রতুল, তুমি কি জানো তোমার শব্দগুলোও আজ তোমাকে দেখেই হাসে?

তাছাড়া, পাঠক! গোটা উপন্যাসটি পড়ে আলপনার সঙ্গে প্রতুলের এডজাস্ট করতে না পারার রিয়াল কোনো কারণ খুঁজে পেলেন কি? (খবর্দার! লেখককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে যাবেন না। তাহলে আবার আপনাকে কামড়াবার জন্য কুকুরের পিছনে দৌড়তে হবে।—'রিয়ালিটি হ'ল একটা কুকুর বুঝলে নটবর? মনোজই তো বলত 'কামড়াবে বলে মানুষ তার পিছু পিছু ছুটছে।' পাঠক কিছু বুঝলেন?) অথচ উপন্যাসটি পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়, প্রতুল দিব্যি নিজেকে সুরক্ষিত রেখে সব দায়-দায়িত্ব, সব বোঝা আপনার উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাকে ঠেলে দিচ্ছে একগলা জলের মধ্যে। হাঁ, ফুলারিটাঁড়ে আলপনা অবশ্য খুনির মতো নিষ্ঠুর গলায় প্রতুলকে বলেছিল—"আর কতক্ষণ তোমার বাকতাল্লা চলবে!" কিন্তু প্রতুল ভেবে দেখেছে কি, দিন পনেরো উন্মাদ ভালোবাসাবাসির পর কেন আলপনা ও কথা বলতে গেল? "পথ জুড়ে তখন চাঁদের আলো একটু-একটু-একটু এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। তরুশ্রেণী পথের উপর বিছাতে থাকে মরীচিকা জাল।" যখন স্রেফ চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কিছু করতে, বলতে, শুনতে আর ভালো লাগে না ; ঠিক তখন, ঠিক তখনই প্লাবিত জোৎস্নায় বন্ধুপত্নী শিপ্রাকে দেখে প্রতুলের মনটা হঠাৎ ছোঁকছোঁক করে ওঠে। সে সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে দেয় তার একান্ত নিজস্ব টেপরেকর্ডার। ৫ মিনিট, ১০ মনিট...আলপনা বুঝতে পারে পুরো একদিন না বেজে এ টেপ থামবে না। এদিকে "প্রতুল অবাক হয়ে দেখল প্রখর জ্যোৎস্নায় মাইনাস সাতের মধ্যে শিপ্রার চোখদুটো ফেটে গেছে! তাই নাকি, এত ভালো লাগছে নাকি শিপ্রার! শিপ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে আলপনাকে প্রশ্ন করতে ভুলে গেল প্রতুল।" বেশ, ভালো কথা! কিন্তু পাশে বসেই সত্যবান যে অনেকক্ষণ

থেকে উস্‌খুস্‌ করছে, কামনা-আবেগে তপ্ত অধীর প্রতুল সেটা একবারও কী খেয়াল করে? কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমতী, সতীসাধ্বী রমণীটি বোঝে যে, এই মুহূর্তে প্রতুলকে না থামালে সত্যবানই হয়তো বলে বসবে—'এবার ওঠ প্রতুল, খিদে পেয়েছে।' বন্ধুর হাতে স্বামীকে অপমাণিত হতে দিতে সে চায়নি। আলপনার দোষ হয়েছিল।

"এত যে কাঁদায় প্রতুল আলপনাকে, সে তো মুছিয়ে দেবে বলেই। এত যে মোছায়, সে তো কাঁদাবে বলেই।" কথাগুলি কী সুন্দর করেই না প্রতুল নিজের দিক থেকে বলে। অথচ সে কি একবারও ভাবে না, 'চাটনি করব' আর 'বাকতাল্লা'—দুটোই একই টাকার এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র। কিংবা উন্মাদ ভালোবাসাবাসির পরই বলা হয় বাকতাল্লা, আবার বাকতাল্লা বলার পরই...যদি উন্মাদ ভালোবাসাবাসি না হয়—তবে সে জন্য কি আলপনা দায়ী?

"কাল রাতে শোবার আগে কতবার চুল আঁচড়েছি জানো? প্রথমে ২০০ বার। হাত পালটে আবার ফের ২০০ বার। অ-ত-বা-র আমি প্রতুল, প্রতুল, প্রতুল, প্রতুল, প্রতুল, প্রতুল বলে গেছি। আমার দু'হাতে ব্যথা।"

হেনা বলে।

হাতদুটো পালা করে একবার গরমজলে আর ঠান্ডা জলে চুবিও। সেরে যাবে।

না। চল্লিশ বছরের দামড়া প্রতুল এসব কিছুই না বলে দু'বার চুল তুলে হেনার ইয়ারিঙে দুটি চুমু খায়, কানের লতিও কামড়ে দেয় যা ১৫ বছরের কিশোরকেও লজ্জায় চোখ নামাতে বাধ্য করে। তা, আলপনার পক্ষে এখন হেনার মতন ঘুঘুপাখিটি হয়ে এসব নেকুপনা করা সম্ভব কি? প্রতুলের বোঝা উচিত, ওসব একধরনের মেয়েরা বিয়ের আগেই পারে এবং করে। নাকি এসব 'নারীদের' কেতা?

হায় আলপনা! হায় হতভাগিনী!

তোমার দুঃখ আমি বুঝি। হেনার মতো কুমারী দেহের সে ঐশ্বর্য আজ তোমার কোথায়? তাই স্বামীর দিনের স্বপ্ন ও রাতের কামনা থেকে তুমি আজ নির্বাসিতা।

অবশ্য হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে কোনো এক রাতে প্রতুল আলপনার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী এভাবে একটা লম্পটের আহ্বানে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে না। তাই সে "কে, কে ওখানে! বলে আঁতকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে," এবং ধর্ষিত হবার আতঙ্কে "ও মাগো...বলে বিছানায় আবার নেতিয়ে পড়ে...।'

প্রতুল আরও বলে,

"যেমন, একটা লোকের ডায়াবেটিস হয়েছে। সে সন্দেশ খাওয়া ছাড়ল। ডায়াবেটিস গেল। কিন্তু তাকে কি সন্দেশাইটিস রোগ ধরল না?"

তো, এই 'বেহ্মজ্ঞান' যার হয়েছে, তার কি 'ব্যর্থতার প্রধান উৎস' বলে আলপনাকে দায়ি করা মানায়?

সুতরাং আলপনার সঙ্গে প্রতুলের এডজাস্ট হয় না ঠিকই, কিন্তু কেন, কি জানে, সেটা পাঠক বুঝে উঠতে পারে না। কেবলই মনে হয়, একটা যেন রহস্য থেকে গেল। প্রতুল যেন সব কিছু খোলসা করে বলতে গিয়েও পারল না। প্রতুল নিজেও হয়তো কিছু বোঝে। তাই বারংবার ফুলারিটাঁড়ের ঘটনার ওপর জোর দেয়, বলে "একটি মাত্র শব্দ—বাকতাল্লা—কী আছে এতে। এতেই হা-হা রবে তার ছিঁড়ে গেল।" অর্থাৎ পাঠক, আমার তেমন দোষ ছিল না, বিশ্বাস করুন, আমি বলছি, এই সামান্য ব্যাপার থেকেই আমাদের ঘর আলাদা হয়ে গেল। পাঁচিল তরতর করে বেড়ে উঠে সিলিঙ ছুঁল।

হায়, পাঠককে এত সহজে ভোলানো যায় কি?

অতএব, পাঠক, আপনি ৮নং অধ্যায়টি আর একবার পড়ুন। ওই যে...বাসে মানিব্যাগ কুড়িয়ে পাবার ঘটনাটা যেখানে বলা হচ্ছে,...খুচরোসহ মানিব্যাগটি কচুরিপানার মধ্যে ফেলে দিয়ে প্রতুল উপরে উঠে এলো।

"লক্ষ্মী দরজা খুলে দিল। তখন লক্ষ্মী কাজ করত।"

তার মানে?

এখন করে না?

কেন করে না?

যাকে দেখে মনোজের চোখ চশমা হয়ে যায়, মেএড-দের বিউটি কনটেস্টে ফার্স্ট হবার মতন রূপসী, যৌবনবতী লক্ষ্মী নিজে কাজ ছাড়ল না, তাকে ছাড়িয়ে দেয়া হল?

কেন?

কর্ডুরয় ট্রাউজার্স থেকে চে গুয়েভারা, জন বার্জার, দা অ্যানাটমি লেকচার অফ ডাঃ নিকোলাস টাল্‌প্‌, ব্যর্থতার রঙ, মনোজের উর্ধ্বাঙ্গের বামনত্ব, সোমেন পালিত, গ্রাহাম গ্রীন, পিকাসো...ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথাই না প্রতুল বলল। অথচ সারা উপন্যাসটিতে সে একবারও জানাল না—লক্ষ্মী কেন এখন কাজ করে না। একবারও বলল না ফুলারিটাঁড় যাবার আগে তাদের সেই ঐতিহাসিক ঝগড়ার কারণ বা উৎস, যার শেষে "কষের রক্ত হাত উলটে মুছে আলপনা পাড়ার গুণ্ডা গ্যাঁড়া-নরেশকে ডাকতে গিয়ে ফিরে আসে।"

অথচ পাঠকের কাছে এসব জানা ছিল জরুরি।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সংস্কারাচ্ছন্ন প্রতুলের পক্ষে "কথা-খোলার মতন এমন মর্ম পর্যন্ত নগ্ন" হওয়া সম্ভব কি? তার উপর সবেমাত্র সে অসুখ সেরে উঠেছে। (অবশ্য কি অসুখ জানি না, সে আরেক ধোঁকা!) তাই তাকে কিছু চেপে যেতেই হয়। কথার পিঠে কথার প্যাঁচ লাগাতে হয়। অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যের শিক্ষা তাই-ই।

আর লক্ষ্মী, হেনাকে তো এক সারিতে বাসানো যায় না, ভদ্দরজনেরা তাহলে বলবে বা কী?

তবু লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ দু'একবার উত্থাপিত হয়, বোধহয় প্রতুলের নিজের এবং পাঠকের অবদমিত যৌনকামনায় সুড়সুড়ি দেবার জন্যই। এব্‌ আমরাও বুঝি, ভীরু, দুর্বলবীর্য প্রতুলের এর বেশি আর কিছু করার সাধ্যও নেই।

টীকা :

(১) সন্দীপনবাবু, বছর দুয়েক আগে একবার আপনার সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন যে, সপ্তাহে একদিন, সোমবার, আপনি কোনো কথা বলেন না। মৌন হয়ে থাকেন। আপনি এবার সপ্তাহে অন্তত ছ'দিন মৌনব্রাত পালন করতে থাকুন। আপনার হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার হবে। আমি এখনও আশা রাখি।

(২) কৃত্তিবাস পত্রিকায় প্রায় এক যুগ পরে বঙ্কিমীয় রীতিতে শম্ভু রক্ষিতের কাব্যগ্রন্থের

সমালোচনাটি আপনার বেশ হয়েছিল। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' আমরা পড়েছি মাত্র তিন বছর আগে। আর আজ পড়ছি 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই'।

(৩) ৺পরিমল রায় 'ভেগোলজিস্ট' নামে একটি শব্দ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর ভাষায় 'যেখানে গন্তব্য নাই অথচ গমন আছে, ক্ষুধা নাই অথচ ভুঞ্জন আছে, বক্তব্য নাই কিন্তু বাক্য আছে—অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় সন্ধান-বিকৃত মনোবৃত্তির উর্দ্ধে লক্ষ্যনিরপেক্ষ নভোচারী চিলের মতো কেবল ভাসিয়া বেড়াইবার উৎসাহ আছে, সেখানেই ভেগোলজির প্রকৃষ্টতম প্রকাশ।' সন্দীপনবাবু, আপনি ছিলেন রোমান্টিক—এগ্‌জিস্‌টেনসিয়ালিস্ট—সুর্‌রিয়ালিস্ট—দাদাইস্ট—ইমেজিস্ট—মিস্টিক—স্ট্রাকচারালিস্ট—এখন এই উপন্যাসটি পড়ে মনে হয়, আপনিই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা সার্থক ভেগোলজিস্ট।

টিপ্পনী :

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কৃত শম্ভু রক্ষিতের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা :

"৬০ দশক জুড়ে এবং ৭০ দশকের ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত সমালোচনায় প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি পুড়িয়ে দেখেছি। এর মধ্যে শম্ভু রক্ষিত-এর 'প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না' বইটি দাউ দাউ করে জ্বলেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সাহিত্য সমালোচনার একটি পৃষ্ঠা :
"পূর্বকালে অগ্নি মহাপরীক্ষক ছিলেন। মনুষ্যের চরিত্র পর্যন্ত অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হইত। যাহারা স্বভাবে অনুমাত্র ময়লা থাকিত অগ্নির নিকট তাহা ধরা পড়িত। বানরপতি শ্রীরামচন্দ্র অগ্নিদ্বারা সীতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও অনেক অরণ্যপতি সাধুত্বের পরীক্ষা সেইরূপে লইয়া থাকেন। অগ্নি দ্বারা স্বর্ণ পরীক্ষা অতি সুন্দর হয়, সকলেই তাহা নিত্য দেখিতেছেন। অতএব অগ্নিদ্বারা আমাদের কতকগুলি বাংলাগ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অন্তত নাটক প্রহসন উপহসন প্রভৃতি আধুনিক রসিক-রঞ্জন গ্রন্থগুলিকে এই পরীক্ষাধীন করিলে ভালো হয়। গ্রন্থের পক্ষে এ পরীক্ষা নূতনও নহে। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই পরীক্ষা প্রবল ছিল ; গ্রন্থ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যদি পুড়িয়া যাইত রাজসভাসদগণ সিদ্ধান্ত করিতেন যে গ্রন্থখানি অবশ্য অসার ছিল নতুবা পুড়িবে কেন! আমরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া একখানি প্রহসন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গ্রন্থ পুড়িয়া গেল। কী করিব গ্রন্থকার কিছু মনে করিবেন না। গ্রন্থকারের নাম হরিহর নন্দী।"

প্রিয় পাঠক! 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই' নামক আধুনিক রসিকরঞ্জন উপহসনটির একটি অগ্নিপরীক্ষা লইয়া দেখুন না! — বিনীত লেখক।

সুভাষ কুণ্ডু

পরিবার পরিকল্পনা

১ম দৃশ্য— সম্পূর্ণ বানর মুখো একটা বাচ্চা ছেলে। হাত পা নোংরা, জামাটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া ও সেলাই করা। রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে ও ছড়া গাইতে গাইতে চলেছে—

'আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়।
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর'

আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব-হীন

আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে

২য় দৃশ্য— ২৭ তলা বাড়ির পেছনে পরিষ্কার আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে

(ফার্স্ট শট্)

— ২৪ তলা। সেই তলার একটা ঘরে ১ জন যুবতী বউ পাঁচালি পড়ছে—

(সেকেন্ড শট্)

'যে রমণী পূজা করেন প্রতি গুরুবারে
লক্ষ্মীর কৃপায় তার বাড়ে ধনে জনে।'

(সেকেন্ড শট্)

— ওই বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা মিছিল, মিছিলে শ্লোগান—

'খাদ্য চাই বস্ত্র চাই
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।
বেআইনী লক্ আউট চলবে না চলবে না
মালিকের দালাল তুমি সাবধান সাবধান'

মিছিলের বেশির ভাগই শ্রমিক, চাষি, বাচ্চা কোলে করে স্ত্রীলোকও আছে। এদের সঙ্গে আছে শহরের দর্শক জনতা।

(থার্ড লঙ শট্)

— মিছিল এক জায়গার দাঁড়িয়ে পড়ে। পুলিশের কর্ডন। ক্রমে ভিড় বাড়তে থাকে। লাইন ভেঙে যায়। ভিড়ের চাপে কর্ডন ভেঙে যায়। মিছিল সামনের দিকে এলোমেলোভাবে ছুটতে থাকে।

(ফোর্থ মিড শট্)

৩য় দৃশ্য— রাস্তায় ছড়ানো ভাঙা ইট, সোডার বোতল, টিয়ার গ্যাসের সেল।
(ফার্স্ট শট্)

অস্ফুট শব্দ] আ-া-া। মাগো-ও। জ্‌ল-জ-অল। ফলনাকে একটু ডাকো না গা। খোকা-আ-আ।

অফ্ ভয়েস]

— ঝক ঝকে পিচের রাস্তা। রক্ত চুইয়ে যাচ্ছে রাস্তারা ধারে।

(সেকেন্ড শট্-ক্লোজ আপ)

— (ক্যামেরা প্যান করে এগিয়ে যায়)
একটা অ্যাম্বুলেন্স, পেছনে পুলিশের কালো ভ্যান্।

(থার্ড শট্)

— (ক্যামেরা প্যান্ ব্যাক্ করে যেতে থাকবে)
পার্ক, গাছ, পূর্বের রক্তের জায়গা। রক্ত কোথাও একটু জমাট বাঁধা। (ক্যামেরাকে আরেকটু সরিয়ে) 'হোটেল হিন্দুস্থান' 'রিজ কন্টিনেন্টাল' নিয়নের আলোয় জ্বলছে।

(ফোর্থ শট)

৪র্থ দৃশ্য— সূর্য উঠছে। পরিষ্কার আকাশ।

(ফার্স্ট শট্)

অফ্ ভয়েসে—(১টা মেয়ে) একটা পয়সা রোজগারের নাম নেই, পেম। একটাকে নষ্ট করে ছেড়েছিস্ ; তাই নিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি কত কানাঘুষো, কেলেঙ্কারির একশেষ। এবার আরেকটাকে ধরেছিস, এ তো তোদের...।

— (১টা ছেলে) মুখ সামলে কথা বলবি দিদি, বলে দিচ্ছি। আমি তো ভাব করেছি, যদি শাড়ির লোভে সিনেমায় চলে যায় তো আমি কি করব? তোদেরই তো জাত। ভালোবাসা কি অপরাধ? চাকরি পাইনি বলে প্রেম করব না কেন। আর তুই? পাঁচ ভাতারী মাগী। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে ; বাবা মার মুখে চুনকালি।

— গাড়ি বারান্দায় নতুন বিয়ে করা ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে

(সেকেন্ড শট্)

(ক্যামেরা সামনের দিকে ছুটবে)—ডবল ডেকার ছুটছে।
আকাশে এ্যারোপ্লেন।
গা-গা-গাঁ-গা-আ-আ (সাউন্ড)

— ডবল ডেকারের সামনে দিকের সিটে বসা দুটো ছেলেমেয়ে হাসিতে একজন আরেকজনের গায়ে

(থার্ড শট্ ফ্রিজ)

মেয়েটা— ওই মুখে পোক পড়ুক। সামনের জম্মে তুই কেঁচো হবি। প্যাটের চিন্তা নাই মাগীর চিন্তা।

অফ্ ভয়েসে— পেম। আমি না থাকলে তোদের ওই উনুনে হাঁড়ি চড়ত না। জল খেয়ে হাঁটু পেটে গুজে শুয়ে থাকতে হতো। ওই মুখে এত বড় কথা। এই পাচ ভাতারী ছিল বলে,

— একটা প্রায় বস্তি মতো বাড়ির একতলার একটা জানালা দিয়ে কয়েকজন উঁকি মারছে ; বিশেষত বুড়ো আর মাঝ বয়সী

(ফোর্থ শট্)

আর জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে মুখ নাড়াচ্ছে—ভাই বোনের কেচ্ছা শুনতে খুব মজা!

(সাবটাইটেলে), বাড়িতে মা ভাই বোন নেই?

(ফাস্ট শট্)

৫ম দৃশ্য— আলো অন্ধকার, আবছা।

— টাগিলা (মিউজিক) ব্যাক্‌গ্রাউন্ড

— রাজপথ। পাশে ময়দানে মেলা হচ্ছে।

এক জায়গায় যাদুকর বলছে—

'এইবার তাসের খেলা দেখুন। কী দেখছেন?'

(সেকেন্ড শট্)

— হরতনের বিবি

(থার্ড শট্)

— গাছে গাছে সবুজ নিয়নের আলো ; কোথাওবা মার্কারি আলো। প্যান্ডেলের গায়ে লাল নীল সবুজ কাগজে মোড়া বাল্বের মালা। রেলিং-এর গায়ে একটা মেয়ে একটা ছেলে গল্প করছে। ওদের মাথার ওপর সাইনবোর্ড—

২টির বেশি সন্তান হলে মনে রাখবেন

ছেলেদের জন্য—ভেসেকটমি

মেয়েদের জন্য—টিউবেকটমি

(ক্যামেরা প্যান্ করিয়ে)

রাজপথ দিয়ে একটা সুন্দর যুবক গাঢ়নীল ফুলহাত সোয়েটার পরে হেঁটে যাচ্ছে। কতকগুলো মেয়ে ময়দানে ফুচকা খাচ্ছে।

(ফোর্থ শট্)

— শত ছিদ্র নোংরা জামা। এক হাতে পুঁটলি, আরেক হাতে বাঁশিসহ একচোখ কানা একটা পাগল। ফ্রিজ।

(ফিফথ্ শট্)

অফ্ ভয়েসে— আমি নষ্ট করেছি! আপনাদের যদি হতো; বলুন বলুন তখন কী করতেন

(ক্যামেরা এগোচ্ছে)

পাগলাটা আস্তে আস্তে হাঁটছে। তারপর বাঁশি বাজাচ্ছে—সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে।

৬ষ্ঠ দৃশ্য— কালো পুলিশের গাড়ি হেড লাইট ফেলে উড়ন্ত বেগে ছুটে যাচ্ছে। সেই লাইটে দেখা যাচ্ছে কতকগুলি মৃতদেহ রাস্তার ধারে আলাদাভাবে পড়ে আছে।

(ফার্স্ট শট্)

— আগের দৃশ্য নিয়ন আলো, ফুচকাওলা, বাস, প্রেমিক প্রেমিকা, ময়দান।

(সেকেন্ড লঙ শট্)

(ক্যামেরা প্যান করতে করতে ফ্রিজ)

— কতগুলি ভিখারি মাংসের হাড় চিবাচ্ছে

(বিগ্ ক্লোজ আপ)

ব্যাক্ মিউজিক—হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন

— একটা ন্যাড়া গাছের নীচে আলোর ঝলমলে সাইন বোর্ড—সারা পরদা জুড়ে 'কলকাতা একদিন তিলোত্তমা হবে!'

(থার্ড শট্)।

চলতে থাকা মিউজিক বেজে উঠল।

'ওই দ্যাখো প্রভাতে উদয়' অমনি

— ছেলেটা মেয়েটার গালে আলতো করে চুমু খেয়ে বলল—'লক্ষ্মীটি, এসো কিন্তু কাল, কাল আরও অনেক কিছু।'

ছেলেটা আস্তে আস্তে বেশ্যাপাড়ার দিকে এগোচ্ছে।—ফেড্ আউট।

(ফোর্থ শট্)

৭ম দৃশ্য— পেন্টিস্ আর ব্রেসিয়ার পরে হোটেলে ক্যাবারে নাচ হচ্ছে। নেতা, ব্যবসায়ী ; কোটপ্যান্টপরা অফিসার।

(ফার্স্ট শট্)

— চায়ের দোকানের সামনে ১০ বছরের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। চা-মালিক বলছে 'এখানে তোর চেনা কেউ আছে?'

— একে চিনি বলবে এমন কেউ নেই। 'তবে তোকে কী করে কাজ দিই? তোকে চেনে বলবে এখানে এমন লোক থাকলে ১ বার চেষ্টা করতাম?'

(সেকেন্ড শট্)

— হোটেলের দৃশ্য আবার।

(থার্ড শট্)

— ছেলেটা ও চা-মালিক

(ফোর্থ শট্)

— (একই পরদায় কাট করে) ক্যাবারে নাচ। চাওয়ালা ও ছেলেটা।

(ফিফথ্ শট্)

অফ্ ভয়েসে— পরিচিত কেউ নেই? কেউ না? তবে কাজ হবে না।

— চায়ের দোকানের সামনে ছেলেটা অপলক চোখে তাকিয়ে আছে একটা মাংসের দোকানে ছাল ছাড়ানো ঝুলন্ত খাসিগুলির দিকে।

(সিক্সথ শট্)

(ক্যামেরাটা একবার ছেলেটার মুখে ; আবার ঝুলন্ত খাসিগুলির ওপর ক্লোজ আপ্।

৮ম দৃশ্য— হাওড়ার পোল থেকে নেমে ফ্লাইওভারে উঠতেই সাইন বোর্ডে লেখা 'শহর কলকাতা। কলকাতা আপনার শহর। কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন রাখুন।' আস্তে আস্তে লেখাটির শুধু ক্লোজ আপ্।

(ফার্স্ট শট্)

— প্রেমিক ছেলেটি বেশ্যাপাড়ায় ঢুকছে। মেয়েরা সেজে দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন রাত প্রায় ৮টা। কিন্তু কয়েকটা ঘরে সবুজ বাতি জ্বলছে—রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে। একজন ছেলেটাকে হাঁটতে হাঁটতে 'সাব, একদম নয়া। দো তিন রোজ হুয়া লায়া হ্যায়।'

(সেকেন্ড শট্—প্রথমে ছেলেটা। তারপর ক্যামেরার ট্রলিট ব্যাক্ করিয়ে আস্তে আস্তে বাকিটা)

অফ্ ভয়েস— '১৫ টাকায় হবে?'

— 'তোর মুখে ঝেঁটা ; দুর হ মিন্‌সে।'

(ক্যামেরাটাকে প্যান্ করিয়ে) এক অফিসার গোছের ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে যাচ্ছে

(থার্ড লঙ শট্)

৯ম দৃশ্য— সামান্য কুয়াশাময় সকাল। তবে পুরোপুরি সকাল বলা যায় না কারণ কুয়াশা সত্ত্বেও রোদের তেজ গায়ে লাগে। ফলত বোঝা যায় বেলা হয়েছে। নদীর পার। মাঝ নদীতে নৌকাসহ ২/৩ জন মাঝি। বুট জুতো হাফপ্যান্ট ফুল হাতা শার্ট পরা একটা মাঝ বয়সী অন্ধ পাগল। জামাকাপড় আধ ময়লা। একটা পুঁটলি ; একটা ব্যাগ নিয়ে গাছের নীচে বসে। মুখটা একটু বাঁকা ও কাটার দাগ।

(ফার্স্ট লঙ শট্। আস্তে আস্তে ক্যামেরা পাগলার মুখে এসে ক্লোজ আপ)

নিজে নিজে বকছে— 'ভালোবাসা। প্রথমে এক চোখ, অখন দুইটাই'। ছেঁড়া পুঁটলি থেকে একটা বাইনোকুলার বার করে চোখে দিল। তারপর আকাশের দিকে মুখ করে চার দিক ঘুরে কী দেখছে। পাশের বেঞ্চ থেকে উঠে এসে এক ভদ্রলোক বলছে, 'এই কী দেখছো?' 'দিবাকাশে নক্ষত্র'। 'এখন যে দিন। তুমি যে অন্ধ। কী করে দেখবে? এখন যে দিন, তুমি যে অন্ধ। তুমি যে অন্ধ।'

(সেকেন্ড শট্)

ফুলের বাগান। তার পাশেই বাড়ি। বৃষ্টিতে ভেজা বাড়ির দেওয়ালে পড়ন্ত বেলার রোদ এসে পড়েছে। দূরে নদী। নদীর জলে সোনালি রোদ ঝিকিমিকি। আরও দূরে পাহাড় রামধনু আকাশে উত্তেজিত হয়ে এই নিস্তব্ধ অপরাহ্নে নদীর কুল কুল স্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডাকছে 'আয়, আয়, খেলবি আয়।' এর উত্তরে বাগানে দাঁড়ানো নাক বোঁচা, কপাল চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট সব মিলিয়ে দেখতে প্রায় নেপালিদের মতো একটা বাচ্চা মেয়ে পরনে শার্ট, হাতে পায়ে ধুলো আমাদেরকে শুধু ধমকাচ্ছে,—'ব্যাপ্, ব্যাপ্, ব্যাপ্'।

(ক্যামেরা প্রথমে জুম করে রামধনু আকাশে পাহাড়। তারপর ট্রলি ব্যাক করিয়ে বাকিটা, অবশেষে বাচ্চা মেয়েটাকে ক্লোজ আপ)—

(থার্ড লং শট্)

শৈলেশ্বর ঘোষ

ভাষার জীবন ও মৃত্যু

একজন তরুণ সাহিত্য-যশ-প্রার্থী একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে দাবি করে, একজন লেখক বেঁচে থাকবে (বা থাকে) তার ভাষার জন্য। যেমন জীবনানন্দ তাঁর ভাষার জন্যই বেঁচে আছেন,—তাঁর ভাষা একেবারে নতুন, আমাদের অভিজ্ঞতায় ছিল না, এমন জিনিস। নিঃসন্দেহে কথাগুলি খুব খাঁটি—তাঁর ওই ভাষা ছাড়া কীভাবেই বা তিনি আমাদের চেতনারাজ্যে ঢুকতে পারতেন। কিন্তু একজন কবি তার ভাষার জন্যই বেঁচে আছে বা থাকে, একথাটি শুনতে যতটা সহজ প্রকৃত পক্ষে তা নয়। কবিতা কী, কবিতার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ কতটুকু, কবির সঙ্গেই বা কবিতার সম্বন্ধ কী, কবির উপর সমাজ ও ব্যক্তির ধ্যানধারণার প্রভাব—অভিজ্ঞতা ও চৈতন্যের পরিধি—এবং সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন আসে চৈতন্য সে সৎ কি অসৎ! ভাষা একজনের চৈতন্যের যথার্থ প্রকাশ, সেইজন্যই ভাষার প্রশ্নটি খুব জরুরি, কারণ কোন্ ভাষা ভবিষ্যৎ গহণ করবে তা নির্ভর করে কোন্ চৈতন্য, পরবর্তীকালের মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে আলোড়িত করবে। বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দের ভাষা পরবর্তী আধুনিকদের কাছে কোনো অর্থ বহন করেনি, কম্যুনিকেট করেনি, করেছে জীবনানন্দের ভাষা। কবিতা ১০০ বছর আগে যে ভাষায় লেখা হয়েছে আজ তা হয় না, সম্ভবও নয়—এমনকি ১০/১৫ বছরে কবিতার ভাষাশরীর পরিবর্তিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মধ্যে যে ব্যাপকতম টানাপোড়েন ; তার ছাপ কবিতার শরীরে থাকবেই, স্খলিত ও গলিত এই সভ্যতার রূপ ও গন্ধ যতই ধরা পড়বে কবির কাছে ততই তার ভাষা হবে খড়্গের মতো ধারালো, নিষ্ঠুর এবং অভিজ্ঞতার আলোআঁধারির খেলা হবে তত বেশি। সমস্ত বিশ্বাসভঙ্গের পর মানুষের জীবন নিষ্ঠুরতা ও ক্রুরতায় পূর্ণ হয়—আর এই নিষ্ঠুরতা ক্রমেই বেড়ে চলে, যেহেতু সে জীবনকে ভালোবাসতে চায়, চায় অস্তিত্বের একটা অস্তিবাচক অর্থ পেতে, সোজাসুজি আত্মহত্যা সে করতে পারে না (আত্মহত্যার নূতন কারণ না পাওয়া পর্যন্ত পুরোনো কারণগুলি তাঁর কাছে হাস্যকর বলেই মনে হয়)। তার সামনে আজ না আছে সেই ঈশ্বর না কোনো অলৌকিক অভিজ্ঞতা। যদিও ভারতবর্ষের বহু মানুষ অলৌকিকে বিশ্বাসী এবং অলৌকিক 'ক্ষমতাসম্পন্ন' গুরুতে এই দেশ পূর্ণ, কিন্তু তাদের আমি কোনোভাবেই পাত্তা দিচ্ছি না, এইজন্য যে সৎ কবি ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই অলৌকিকে বিশ্বাস এক ভয়ঙ্কর ভ্রান্তির মধ্যে ঢুকে পড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিকে মধ্যযুগের আদর্শ, বিশ্বাস ও সংস্কার অন্যদিকে যন্ত্রযুগের দ্রুত প্রসারে ধনতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার বাহুবিস্তার, সৎ চৈতন্য এরই মাঝখানে রক্তাক্ত, নিষ্পেষিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনষ্ট ও নিহত—কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে যন্ত্রসভ্যতার ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা এই মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা ও সংস্কারের বিরোধীতা করে না বরং একে আশ্রয় করেই ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে ধ্বংস করে।

এরকম মানুষ তো প্রচুর চোখে পড়ে তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যেই, যে একই সঙ্গে যন্ত্রযুগের সুযোগসুবিধা নিতে নিতে তার সৃষ্ট অপসংস্কৃতিকেই প্রকৃত সংস্কৃতি বলে মনে করে এবং পাশাপাশি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, মিথ্যাচার ও অলৌকিককেও বিশ্বাস করে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় আধুনিক জীবনের জটিল ধাক্কা সামলাতে না পেরে অনেক কবিলেখক তন্ত্রমন্ত্র সংস্কার কুসংস্কার ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করতে চায় এবং পাঠককে বিশ্বাস করাতে চায় যে এইসবই হ'ল আধুনিকতা! দুর্বলচিত্ত যারা তারা এরই মধ্যে স্বস্তি ও আশ্রয় খুঁজে পায়। বেঁচে থাকার তীব্র ঝুঁকি এইসব রচনার মধ্যে কখনই থাকে না, আরও বড়ো কথা এইসব লেখকদের রচনায় কোনো আবিষ্কার থাকে না, থাকে অতীতে, মিথ্যায়, মায়ায়, মোহে মুখ লুকোবার এক সুচতুর প্রয়াস।

আধুনিক মানুষের কাছে আত্মার অমরতার কোনো সম্ভাবনা নাই, বিজ্ঞান তাকে এমন কতকগুলি ভয়াবহ সত্যের কাছে নিয়ে গেছে যেখান থেকে আর তার পেছন ফেরার উপায় নেই। বা তার সামনে এমন কোনো স্থায়ী মূল্যবোধ নেই যাকে সে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করতে পারে (বিশ্বাসের কোনো স্থির ভূমি নেই বলেই কি অনেকে ইতিহাসের অতীত বিশ্বাসগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ে? হয়তো তাই। না হলে এক আপাত নৈরাজ্যের সম্ভাবনা থাকে—যার মুখোমুখি হবার সাধ্য তাদের নেই)।

এই ফল হিসাবে তথাকথিত শিল্পের হ'ল মৃত্যু। 'শিল্পের জন্য আত্মত্যাগ' শুনলে এখন হাসি পায়। 'শিল্প' শব্দের জায়গা নিয়েছে এখন 'সত্য'। সুতরাং ভাষার এখন একমাত্র কাজ সত্যকে প্রকাশ করা। সত্য, যা বাস্তবতা, যা লুকানো আছে বিকৃত মিথ্যার আড়ালে, তাকে খুঁজে পাওয়া যেমন কঠিন, খুঁজে পেলেও তাকে ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন।

সত্যকে, বাস্তবতাকে চিনতে সাহায্য করে স্বচ্ছ দৃষ্টি, যাকে কেউ কেউ 'ভিশান' বলে মনে করে, একে 'সৎ-চৈতন্য' বলে অভিহিত করাই উচিত বলে মনে করি। সৎ-চৈতন্য তাকেই বলব যে সমাজ-সংস্কার-ইতিহাস-শিক্ষার মিথ্যা বন্ধনগুলিকে চিনতে পারে এবং নিজের অস্তিত্বের মূল্যমান নিরূপন করতে চায়—আর যখন সে তা পারে তখন মিথ্যাপূজার এই যে ধ্বংসাত্মক আরতি চলছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে তখন জানে বিশেষ্য পদগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশেষণ এবং বিশেষণ পদগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্য পদ। দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ করছে বলে বলা হয় সে হয়তো প্রকৃতপক্ষে তা করেনি, করেছে কয়েকজন ধনীর সুবিধার জন্য, আদর্শের জন্য যে আত্মত্যাগ করেছে, আসলে সে তা করেনি, করেছে হয়তো কয়েকজন ব্যক্তির খেয়ালের মোহে পড়ে। সে বস্তু যেখানে থাকবে বলে আমরা জেনেছিলাম তা যে ভুল, এটাই তার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার, যে শব্দ যেখানে বসবে বলে আমরা জেনে রেখেছি তাও ভুল, তাও যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার এক কূট চালমাত্র তাও সে আবিস্কার করবে—এইভাবেই সমগ্র বাস্তবতার রূপটি সে চিনে ফেলবে। অন্যদিকে অসৎ-চৈতন্য চৈতন্যের ভান করে মাত্র। সে নামপদগুলিকে হুবহু মেনে নেয়, বস্তুপুঞ্জের সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করে না এবং বাস্তবতার বিকারকেই বাস্তবতা বলে প্রচার করে,. সে সহজেই ধ্বংসাত্মক শক্তির অধীন ও যন্ত্র সভ্যতার এক একটি নাটবল্টু ছাড়া কিছুই নয়—দৃষ্ট জগতের একটা বস্তুকেও স্থানচ্যুত করার সাধ্য তার নেই। দাস সভ্যতার নিথর জলরাশির বুকে একটা তরঙ্গ তোলার সাধ্যও তার নাই। মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে এরাই সবচেয়ে বড়ো নিগেটিভ ফোর্স। বিজ্ঞাপনের ভাষা, হিসাব লেখার ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষা এদের কাছে এক। কিংবা সাহিত্যের ভাষাকে অর্থহীন জাবেদা খাতায় পরিণত করাই এদের প্রচেষ্টার সার্থকতা। বাংলাদেশের পপুলার লেখক কবিদের প্রচেষ্টাগুলি এই সাক্ষ্য দেয়। আজকের বাংলা সাহিত্যের ৯৫% পাবলিক ল্যাভেটোরির মতো। যন্ত্র সভ্যতার বিকৃত ও মিথ্যা মূল্যবোধ একদিকে,

অন্যদিকে মধ্যযুগীয় সংস্কারে লালিত অশিক্ষিত, নিস্তেজ ও মৃতপ্রায় মানুষদের হৃদয় ও অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিয়ে এদের গদ্য/পদ্য রচিত—এইসব রচনা পাঠে নিস্তেজ মানুষের স্বাচ্ছন্দময় জীবন কোনোভাবেই নাড়া খায় না, ঘুমন্ত আত্মা কোনোভাবেই এইসব রচনা পাঠে জেগে ওঠে না, ভুলজীবন কোনোদিন এদের রচনা পাঠে গর্জে ওঠে না—বুর্জোয়া সমাজ কূট কৌশলে এইসব রচনাকারকে গ্রাস করে ফেলেছে, এরা তা কোনোদিনই জানতে পারবে না।

সৎ-চৈতন্য সম্পূর্ণ বিদ্রোহী। সে তার পাঠককে প্রথম থেকেই হস্টাইল করে, এমনকি সমগ্র সমাজকেও সে হস্টাইল করে, তার কারণ মিথ্যার আবরণ ভেদ করে সে যে সত্য তুলে আনে তা মিথ্যাপূজারীকে কোনোভাবেই তার ভুল-জীবনের সঙ্গে তার কমপ্রোমাইজ করতে দেয় না, ধ্বংসকামী, ক্ষমতালোলুপ, গৃধ্নু সমাজের মূলে সে আঘাত করে বলে, সমাজও হস্টাইল হয়—নিষিদ্ধ প্রদেশগুলিতেই তার চলাফেরা ও অভিযান—সে জানে সত্য, বাস্তবতা সেখানেই আছে।

যন্ত্র সভ্যতায় মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, তার চিন্তাভাবনা, চলাফেরা, কামনা ও অনুভূতি সবই নিয়ন্ত্রিত—ব্যক্তির সার্বিক পরাধীনতা সেখানে—তার ভাষাও তাই হয়ে উঠেছে পরাধীনতার ভাষা। অন্যচালিত মানুষ কেবল সেই ভাষাই বুঝতে পারে যার সঙ্গে তার নিয়ন্ত্রিত চিন্তাস্রোতের কমুনিকেশন হয়—অন্য ভাষা সে বুঝতে পারে না। প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে যে তার কমুনিকেশন প্রায় হয়-ই না, এর কারণও তাই। এর পাশাপাশি বাজারচালু পপুলার লিটারেচারের সঙ্গে তার বোঝাপড়া খুবই ভালো। এর ভাষা সে বুঝতে পারে। এই ভাষা প্রয়োগ ও পদ্ধতি তার মস্তিষ্ক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এই ভাষা যে বিষয়কে প্রকাশ করে তা গ্রহণ করতে এদের কোনো অসুবিধা হয় না।

নিয়ন্ত্রিত এই জীবনের বাইরে থেকে প্রকৃত স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে হয় এমন ভাষা যার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত মানুষের পরিচয় ছিল না, সে ভাষা কখনই পপুলার লিটারেচারের ভাষা নয়, বিজ্ঞাপনের ভাষা, বক্তৃতার ভাষা বা খবরের ভাষাও নয়। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রশ্ন এসে পড়ে। ভাষা জিনিষটি কী, খুশিমতো ভাষা তৈরি করা যায় কি না! ভাষা ইচ্ছামতো তৈরি করা যায় না। সমস্ত জীবন-অভিজ্ঞতার সৎ প্রকাশই ভাষা। স্রষ্টার স্বপ্ন কল্পনা ও জীবন দৃষ্টির সম্মিলিত ফল তার ভাষা। এই ভাষার কাছে পৌঁছানোর জন্য তাকে অতিক্রম করতে হয় অসৎ-চৈতন্যের ব্যাপকতম পরিধি, ভাঙতে হয় অসংখ্য বাধার দেয়াল, সত্য-বাস্তবতাকে দেখতে হয় বিকৃতির পরদা সরিয়ে—এই ভাষা স্রষ্টার প্রকৃত সত্তা, অর্থাৎ লেখক যা হয়ে ওঠেন। স্রষ্টা যখন নিজেই তার বিষয় তখনই তার ভাষা যথার্থ। সেটাই তার প্রকৃত ভাষা। তার অস্তিত্বের প্রকাশ ওই ভাষাতেই হতে পারে—আর স্রষ্টা যদি নিজের জীবন সত্য—বাস্তবতাকে খুঁজে পায়, তবে তার ভাষা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, সন্দেহ নেই। ভাষা নিজেই যখন সত্য-বাস্তব হয়ে ওঠে তখনই তা জীবন্ত :

> 'জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে, সন্তানের মতো হয়ে—সন্তানের জন্ম দিতে দিতে যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময় কিংবা আজও সন্তানের জন্ম দিতে হয় যাহাদের ; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চলে জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ; তাদের হৃদয় আর মাথার মতন আমার হৃদয় না কি?'

ভাষা নিজেই এখানে সত্য হয়ে উঠেছে। এই ভাষার সঙ্গে কবির অস্তিত্ব—তার সম্পূর্ণ বাস্তবতা নিয়ে প্রকাশিত। এই ভাষা অন্তর্ঘাতী। পাঠকের অস্তিত্বের মধ্যে ঢুকে পড়ে এই ভাষা তার ভুল জীবনকে, জড় বোধশক্তিকে আঘাত করবে। অন্যদিকে অসৎ-চৈতন্য যে ভাষায় প্রকাশ পায়

তা পাঠককে আঘাত করে না, আলোড়িত করে না, অস্বস্তিতে ফেলে না, অপরিচিত জগতে নিয়ে যায় না, অস্তিত্বের কেন্দ্রগত ভয়ের মধ্যে নিয়ে যাবার শক্তি সে ভাষার থাকে না। ভাষাই জানিয়ে দেয়, সৎ-চৈতন্য যে, সে জেগে আছে। ঘুমিয়ে পড়া মানেই তো অসৎ-চৈতন্যের অধিগত হওয়া। সত্যের সঙ্গে যখনই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে তখনই সে হারিয়ে ফেলবে নিজেকে, হারিয়ে যাবে তার ভাষাও। সৎ-চৈতন্য অস্তিত্বের কেন্দ্রগত ভয় থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায় না, এই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই সে সৃষ্টি করে সবকিছু।

এমন সমস্ত লেখকের কথা আমরা জানি, এই বাংলাদেশে (গদ্য এবং কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই) এক সময় তাদের রচনায় কিছু কিছু চমক সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু অল্পদিনে তা হারিয়ে গেছে, আজ তাদের রচনাসমষ্টি নিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্কের মানুষ খুব সহজেই গ্রহণ করছে, পপুলার কবি ও লেখক তারা আজ, সহজ পাচ্য তাদের রচনা—এরকম ঘটার প্রধান কারণ, তারা তাদের বাস্তবতা পাবার আগেই ভয়ে ও লোভে অসৎ-চৈতন্যের অধিগত হয়েছে, কর্মাসিয়াল সাম্রাজ্যের প্রভুরা এদের নামে স্মৃতিফলকও তৈরি করে দিচ্ছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এখন এদেরই ইতিহাস—প্রভুদের একচেটিয়া কারবারে তারা মাল-মশলা ভালোই যোগন দিয়ে চলেছে। আজকের পৃথিবীতে মিথ্যাই যখন সত্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন এরা জানে সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেই যন্ত্রদাস সভ্যতায় বেশি সেলামী মেলে। তারা নিজেরা কিছু হয়ে ওঠেনি, কেবল যন্ত্রসভ্যতার ধ্বংসকামী গতিকে বাড়িয়ে দিয়ে, নিজেদের এক একটি নেগেটিভ ফোর্সে পরিণত করেছে।

প্রতিষ্ঠা হারাবার ভয়ে এমন সব 'প্রতিভাবান' গুজবের নায়ক কবি ও লেখকের দেখা মেলে যারা, কখনো যে সত্যকে চেনে না তা নয়, কিন্তু যথার্থ ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারে না। সত্যকে তারা নিজ নিজ জীবন অস্তিত্বের একীভূত সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করেনি, অন্যের অভিজ্ঞতার আঘাতে এবং কখনও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় সত্যের চেহারাটা দুই এক পলক দেখেছে মাত্র—তাই সত্যকে প্রকাশ করার ভাষাও তাদের থাকে না। শব্দ ও ছন্দের মিথ্যা জালে নিজের অসারতা চেপে রাখার অপচেষ্টা করে। রহস্য মুক্ত হওয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা আধুনিক সাহিত্যের, অথচ তারা অপ্রয়োজনীয় রহস্য আর ধাঁধায় সস্তা দার্শনিক বনে যান। বাংলা সাহিত্যের এই বেনো জলের স্রোতের বিরুদ্ধে যাত্রা আমাদের।

বুর্জোয়া সমাজ মানুষের সমস্ত মূল্যবোধকেই ধ্বংস করেছে এবং এ যাবৎ মানুষের যা অর্জন তাকে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছে, এমনকি মানুষের যৌনতাকেও সে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে কাজে লাগিয়ে মানুষকে অন্ধ পশুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এই বাংলাদেশে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যখন আমরা লিখতে শুরু করি তখন বুর্জোয়া ব্যবস্থা লালিত রচনাকাররা কী তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল আমাদের। এদের লেখক না বলে গলায় দড়ি বাঁধা মানুষের পূর্বপুরুষ বলাই ভালো, কারণ এরা কোনোদিনই আত্মসচেতন হয়ে বুঝতে পারে না কে এদের গলার দড়ি ধরে খেলাচ্ছে। এই শক্তিকে চিনতে পারাই তো সৎ-চৈতন্য, চিনতে পারলে তখন কেউ-ই কি আর কমপ্রোমাইজ করে, অন্তত যারা পৃথিবীর গোণাগুণতি দিনগুলি মানুষের জীবনের মতো কাটাতে চায়।

আজও যখন চোখে পড়ে অল্পবয়সী কবি লেখকরা প্রথম থেকেই ধরে নেয় যে তাদের কাজ সমসাময়িক জগতের ঘটনাবলী থেকে দূরে সরে থাকা, বা ওইসব বিষয় নিয়ে একেবারে কিছুই না ভাবা, পণ্য কেন্দ্রিক জীবন থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করাই কবির কাজ—তখন না-ভেবে উপায় থাকে না, যে নিন্দাজনক স্বর্গ থেকে জন্মমুহূর্তেই আমাদের পতন হয়েছিল, এরা সেই স্বর্গকেই উৎকৃষ্ট বাসস্থান বলে মনে করছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না একজন

অনুভূতিশীল মানুষের পক্ষে আধুনিক জীবনের মুখোমুখি হতে গেলে যে ভয়ংকর ঝুঁকি নিতে হয়, এরা তা নিতে চায় না—নিজের অস্তিত্বের সত্য বিন্দুতে পৌঁছানোর কোনো চেষ্টা এদের কাছে পাগলামি বলে বিবেচিত—এদের মৃদু ও অস্পষ্ট শব্দস্রোত—এই সত্যকেই স্বীকার করে। বাস্তবের রূঢ় ঘাত-প্রতিঘাতেই তো কবি চিনবে নিজেকে, কোনো অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, সে তার সময়কে উপেক্ষা করবে কীভাবে? এবং 'তার সময়' তো কোনো বিচ্ছিন্ন সময়খণ্ড নয়, প্রবহমানতার এক স্পষ্ট অংশই তার সময়—প্রশ্ন হলো সে তার সময়ে সংঘটিত সমস্ত কিছুর তাৎপর্য বুঝতে পারে কি না, জীবনের অশ্লীলতার, ক্ষয়ের বিরুদ্ধে তার কোনো প্রতিবাদ আছে কি না, ভবিষ্যৎ তাই দেখবে। যদি সে এড়িয়ে যায় তবে তার ভাষা হবে মৃত ; তথাকথিত মিস্টিসিজম তার এই পলায়নের একটি পুরোনো পথ মাত্র। এমনকি সিম্বলিজম, সুররিয়ালিজম এসবও এখন এতটা পুরোনো যে আধুনিক মানুষের কাছে এইসব ইজম কোনোভাবেই তত কম্যুনিকেট করতে পারে না। আমরা সরাসরি সত্য প্রকাশে বিশ্বাসী। আর ভাষা যখন সত্যকে ধারণ করে তখন সে রূঢ়, নিষ্ঠুর এবং আঘাত করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। কেবল জীবনেরই আছে এই ভাষা।

নিজের বাস্তবতা খুঁজতে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় আপাত বাস্তবের আড়ালে লুকানো সত্যকে। অসৎ-চৈতন্য আপাত বাস্তবতাকেই সুগার-কোটিং দিয়ে বাস্তবতা নামে চালতে চায়। আজকের যে কবি সে তো পণ্য-পৃথিবীরই মানুষ, এই পৃথিবীর, জীবনের কূট জালকে না জেনে তবে কি সে পেছনে ফিরতে শুরু করবে সেই অক্ষয় বড়াল, বিহারীলাল চক্রবর্তীর দিকে। সাহিত্যে এরকম প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে। বর্তমানকে, বাস্তবকে, সত্যকে দেখে সে এত ভয় পায় যে, সে মনে করে ওই আগুন তাকে পুড়িয়ে দেবে, শেষ পর্যন্ত অসৎ-চৈতন্যের পথেই সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ে—আধ্যাত্ম-অলৌকিকের ভুষিমালে সে খাতা ভরিয়ে ফেলে এবং স্বর্গ ও নরকের মাঝখানের না-হওয়া নিষ্ক্রিয়তা চেয়ে হয় শিখণ্ডী! কবির বেঁচে থাকা যে বর্তমানে, যে বর্তমানের অর্থ সে উদ্ধার করে জীবনের প্রতি বিন্দু রক্ত দিয়ে—সেই বর্তমানকেই এদের ভয়!

সংক্রমণ ক্ষমতাহীন এদের ভাষা নির্জীব, স্থবির শব্দস্রোতে পরিণত হয়—ভাষার যে অন্তর্ঘাতী ক্ষমতায় আমাদের বিশ্বাস, প্রকৃত ভাষা যে পাঠকের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে অন্তর্ঘাতী শক্তির মতো ঢুকে পড়ে ভূত তাড়ানোর মতো 'অপর জীবন'কে (ভুল জীবনকে) বের করে দিতে চায়, অতি সচেতন পাঠক এই ভাষা শক্তিকে মেনে নেয় কিন্তু অচেতন বা অর্ধসচেতন পাঠক এবং অসৎ-চৈতন্যের লেখকরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাস্তবের প্রতিটি ঘটনার অন্তরালে রয়েছে সত্যের মুখ, পরদা তুলতে পারলেই তাকে দেখা যায়, কিন্তু পরদা তোলাই সবচেয়ে শক্ত। কবিতা এখন আর কোনো শিল্প নয়, কবিতা এক শক্তি মূঢ় সমাজ সেইজন্য আজ কবিকে ভয় পায় বেশি!

একদিকে, বর্তমানে বেঁচে থাকার তীব্র সচেতনতা ও মিথ্যাপূজার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আক্রমণ, অন্যদকে আধ্যাত্ম-অলৌকিক, মিস্টিসিজমের অসত্য হাতছানির মধ্যে পড়ে ভাষার যে অপমৃত্যু, সঙ্গে কবিরও অপমৃত্যু—তার ইদানীংকালের এক দৃষ্টান্ত উৎপলকুমার বসু। তার রচনায় কোথাও অস্পষ্টভাবে মিথ্যাকে আক্রমণ করার ও সচেতনভাবে সময়কে ধরার অনতিতীক্ষ্ণ প্রচেষ্টা ছিল বটে কিন্তু সংস্কারবশত আধ্যাত্ম-অলৌকিক-রহস্যবাদ ও রোমান্টিকতা তার অস্তিত্বকে অধিকার করে রেখেছিল বলেই, উৎপলকুমার বসুর ভাষাও এই অসৎ-চৈতন্যের শিকার। উৎপলের অপমৃত্যুর কারণও আমাদের ধারণায় তাই। পুরোনো মিস্টিক-রহস্য তার কাব্য প্রচেষ্টার প্রধানতম প্রহেলিকা, যাকে আর এগিয়ে দিতেও পারেননি তিনি, আবার যখন কিছুটা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন তখন নিজের পুরোনো খোলস থেকে বেরিয়েও আসতে পারেননি—যাতে তাকে এক

সময় ভাবতে হয়েছিল, কবিতা লিখে কিছুই হবে না। প্রথম থেকেই ভুল পথ ধরাই তা এই সর্বনাশের কারণ। আমরা প্রথম থেকেই কমিটেড—কবিতাকে এক চূড়ান্ত শক্তি হিসাবে বুঝেছি—উৎপলের সঙ্গে আমাদের এই মূল বিন্দুতেই পার্থক্য ঘটেছিল। শুধু উৎপলের সঙ্গেই নয়, সমস্ত পঞ্চাশ দশকের সঙ্গেই। উৎপলের এই ভুলের জন্যই তার চৈতন্যের কোনো স্পষ্ট গর্জন এখনও পর্যন্ত আমরা শুনতে পাইনি, আর যে সচেতন শক্তি ভাষাকে কান ধরিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, তারই অভাবে ছাড়-পাওয়া দানবের মতো উৎপলের শব্দস্রোতই উৎপলের কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে। উৎপলই প্রমাণ করেন, অসৎ-চৈতন্য কীভাবে মানুষকে মিথ্যার মধ্যে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তার গলা টিপে ধরে।

প্রদীপ চৌধুরী সুবো আচার্য
নির্মল হালদার ফালগুনী রায়
অরুণেশ ঘোষ সুভাষ ঘোষ
অরুণ বণিক। আঁতোয়া আর্তো
হেনরি মিলার জীবতোষ দাস
বাসুদেব দাশগুপ্ত রবিউল
শৈলেশ্বর ঘোষ

ক্ষুধার্ত সংকলন ৫
শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত

ক্ষুধার্ত পঞ্চম সংকলন মে ১৯৭৮

লিখেছেন :

নির্মল হালদার
অরুণেশ ঘোষ
অরুণ বণিক
জীবতোষ দাস
প্রদীপ চৌধুরী
আঁতোয়া আর্ত
হেনরি মিলার
রবিউল
ফালগুনী রায়
সুবো আচার্য
বাসুদেব দাশগুপ্ত
সুভাষ ঘোষ
শৈলেশ্বর ঘোষ

নির্মল হালদার

পয়সা

একটা লোক রাস্তা থেকে কুড়ালো পয়সা
একটা লোকের পকেট থেকে নিশ্চয়ই ঝ'রে গেছে পয়সা
ওই ঝ'রে যাওয়া ঝরনা নয়
ঝরনা হলে দৌড়ে গিয়ে স্নান করতাম এবং
ওই ঝ'রে যাওয়া আমার চোখে পড়ে নাই
আমার চোখে পড়লো
একটা লোক রাস্তা থেকে কুড়ালো পয়সা

আমি পয়সার জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছি
কিন্তু আমার জন্য উন্মুখ হয়নি
আমাদের প্রিয় পয়সা
একটা লোকের পকেট থেকে ঝরবে পয়সা
আমি দৌড়ে গিয়ে অঞ্জলি ভরবো, এরকমই ইচ্ছা।

খরা

মেঘের মাংস চেটেপুটে নীচে নামছে কে
উপরে ওঠে নিচে নামছে কে? কে বলতেই ব'লে উঠলো কেউ
নির্মল নির্মল...
এই নির্মলের প্রাণরক্ষার্থে উপরে উঠে নীচে নামছি আমি
নীচে জল নেই এজন্যেই উপরে উঠে
নীচে নামছি আমি
মেঘ আমায় জল দেবে না, ইয়ার্কি! উপরে উঠে আমি
খুন করেছি মেঘ এবং মেঘের মাংস চেটেপুটে
নীচে নামছি আমি।

গান

হার্মোনিয়াম থেকে উঠে আসে সুর, সুর থেকে
উঠে আসে পাখি, পাখি গায় গান : ওঠো ওঠো।
পাখির গান রেকর্ড হয়নি আজও। পাখি করবে কী রেকর্ড
এইচ এমভিতে?
এইচএমভির বসন্ত বন্দনায় কোকিলের কণ্ঠ আছে
কোকিল কী করবে অনুরোধ : গাও পাখি গাও গান : ওঠো ওঠো
আমাদের অভাব আছে জাতীয় শিল্পীর।

আনন্দে

'আমরা চাষ করি আনন্দে...'
কী চাষ কী আনন্দ, কী আনন্দে চাষ করি
মাঠে মাঠে? আনন্দ কী নয়
যৌনানন্দ?
মাঠ অর্থাৎ মাটির সঙ্গে লাঙ্গলের সংযোগকে, কে না ব'লবেন
যৌনানন্দ?
আমরা যৌনানন্দের চাষি, আমরা হাসি
আমাদের হাসি বহন করে একটি বিজ্ঞাপন :
আমাদের লাঙ্গল আছে, জমি আমাদের।

মানুষ

মানুষই জ্বালানি কাঠ
মানুষের চর্বি আজ থলথলে, মানুষের চর্বি আজ খুব
মানুষ গুঁজে দাও উনানে, মানুষকেই গুঁজে দাও
উনানে,
মানুষই জ্বলবে ভালো, জ্বালানী কাঠের চেয়ে জ্বলবে ভালো
অবশিষ্ট গাছপালাগুলির বংশবৃদ্ধি হোক
অবশিষ্ট গাছপালাগুলি জ্বালানি কাঠের চেয়ে
গাছপালাই হোক
একদিন এক রোগা মানুষ একা, গাছের নীচে ব'সে
উচ্চারণ ক'রবে : কী সুখ! কী সুখ!

অপমান

গায়ে মাখা সাবানের চেয়ে সুন্দর-সুগন্ধযুক্ত
একটি দ্রব্য ব্যবহার করো, যার নাম অপমান
গা থেকে ছাল-চামড়া তুলে গায়ে মাখো,
অপমান।
অপমানে অপমানে অপমানিত আমি
আমার গা থেকে মানুষের ছাল-চামড়া উঠে
অপমানের গন্ধ, কী আরাম!
গালে আমার জুতোর দাগ, হা-হা ক'রে হাসছে
আমি আয়নাতে নিজেকে দেখছি শুধু, কী সুন্দর
আমার চেহারা!
এ চেহারা অপমানেই সম্ভব, অপমান গায়ে মাখলে
অপমানে অপমানে অপমানিত আমি, আমার গায়ে
অপমানের গন্ধ
এ গন্ধ কি মানুষ নামের মানুষের চামড়ায়?

ভয়ঙ্কর

কবরে শুয়ে উদাসীন তুমি
তুমি কি জীবিত? তুমি কি জীবিত সকল মানুষের মধ্যে?
এবং এই করবই কি এখন ঠিকানা?
এখানেই কি ভাতরুটি মদ্যপান, এখানেই কি শুয়ে শুয়ে
সিগারেট
এখানেই কি মৃতের জন্য কান্না এবং অশ্রুপান?
না
সকল মানুষ মৃত কেন মরে কেন এই প্রতিবাদে
কবরে শুয়ে তুমি
তুমি উদাসীন নও, ভয়ঙ্কর জীব
সত্যি সত্যিই জীবিত?

অরুণেশ ঘোষ

ভ্রমণ

১.

ওইখানে যে শিশুটি ঘুমিয়েছে বেঞ্চির তলায়
তার স্বপ্নে হুল্লোড়ের-মাতালের-বেশ্যাদের কোনো
জেগে ওঠা নাই মনে হয়, যেরকম আমাদের
স্বপ্নে আসে বেশ্যাদের-মাতালের অদ্ভুত উল্লাস
পশুর মতন ওকে ভাবা যায়, 'এই মাঝরাতে
পশুর মতন শিশু শুয়ে আছে ভাটিখানা ঘরে
চারপাশে বেশ্যালয়, মাতালেরা, হুল্লোড় চিৎকার
এরই মধ্যে তার ঘুম, স্বপ্ন দেখা...' এইসব ভেবে
বাড়ি ফিরে যাবে এই জনাকয় ফিচেল মাতাল
শেষ খদ্দেরটাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে
কুপী হাতে শায়া-পরা খোলাস্তন খুঁজতে বেরুবে
নাম ধরে ডেকে যাবে মাঝরাতে—যে মায়ের জন্য
আমরাও ওরকম অহংকারে বেঞ্চির তলায়
ঘুমিয়ে পড়তে চাই, চাই স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে চলে যেতে

২.

আরও একবার ওই শিশুটির কথা
ভেবে আমাদের ঘুম লেপের তলায়
খানিকটা ছিন্ন হবে যদি না বিপ্লবী
কবিতা লেখার ধাত রপ্ত হয়ে থাকে
ওর ছেলেবেলা ওই গণিকা পল্লীতে—
হয়তো বা স্কুলে যাবে যেরকম যায়
আজকাল, লেখাপড়া শিখে নেয় এসে
এই সমাজের কাছে, শিখে নিয়ে ফের
ফিরে যায়, কেউ কেউ থেকে যায় লোভে—
যে যেখানে থাক শুধু তার ছেলেবেলা

ক্রোধহীন অবিশ্বাসী বারান্দার থেকে
পথে নেমে আসে—পথ থেকে বারান্দায়
এই পায়চারি তার দুঃখী নয়, সত্য
হয়ে ওঠে তাই কেশে জানায় মায়েকে—

৩.

তোমাদের মতো ছিল আমাদের সেই
দিনগুলি, ছেলেবেলা, হয়তো বা ঠিক
তোমাদের মতো নয়, মানুষ যেভাবে
মায়ের জরায়ু থেকে মানুষী সমাজে
এসে শিখে নেয় ভাষা শোনে জয় গান
আমাদের শিখে নিতে তোমাদের মতো
তন্ময়তা ঠিকই ছিল তবুও সন্দেহ
এসে ডুবিয়ে দিয়েছে অবিকল হওয়া
গান্ধীর ছেলেবেলা অথবা গোর্কির
আমরাও জেনে গেছি এরকম হয়
তাই পালটিয়ে দেওয়া—দিতে বাধ্য করা
যে জীবন পার হয়ে তুই এইখানে
এই অরণ্যের মধ্যে এসে নগ্ন হয়ে
হাওয়ায় ওড়াতে চাস গৈরিক পোশাক

অরুণ বণিক

বুদ্‌বুদ্‌

প্রতিপালিত কুকুরের দাসআত্মা কখনো, প্রভুত্বপরায়ণ গর্জন করে উঠতে চেয়েছে—লোভী ও বশ্যকুকুরের স্কাইক্রেপার জিহ্বা মেলে ধরেছে আকাশের দিকে—বিজয়ী, বিজিত ও জয়োন্মাদ পশুদের প্রাণে গর্জন করে, কাঁদে ও হুহুঙ্কার-হল্লার দামামা বাজায় উপযোগী চরিতার্থতা—

অন্ধ প্রতিযোগিতার জন্ম হয়—যে যে যার যার আখড়ায় মুগুর/ডাম্বেল ভাঁজে—নীতিনিয়ম শিখে নেয় জেনে নেয় উপযোগিতাবাদের কূট-কৌশল—এবং গলায় পড়ে অদৃশ্য শৃঙ্খল—দাসআত্মার এই তো চরিতার্থতা—২৪ ঘন্টা মাথায় উদ্দেশ্য না থাকলে ওরা অনেকেই পাগল হয়ে যায় দুঃস্বপ্নে ঘেমে নেয়ে হাঁসফাঁস করে ওদের শরীর ঘোলাজলে ভেসে যায় ওদের শেলফের চাবি, ডিভিডেন্ডের ফাঁক, ইনকামট্যাক্সের কালো খাতা—কত কত ভারতরত্ন ও পদ্মখেতাবধারী দুঃস্বপ্নের ভেতর পেচ্ছাপ করে বিছানা ভাসায়—

"মোরারজীভাই মুর্দাবাদ্!" "মোরারজীভাই জিন্দাবাদ্!"

ধর্মঘট, লকআউট, নয়াকানুন, মূল্যমানের স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মৃগীরোগীর মতো গোঙাতে গোঙাতে ঘুম ভাঙে—অন্ধকার বিছানায় অভ্যস্ত হাত চাবি খোঁজে—কারো বা দশ আঙুলে নিমজ্জমানের বিপন্নমুদ্রায় আশ্রয়-প্রার্থনা—ততোধিক বিপন্নমানুষ মাতৃহীন বালকের মতো বিছানা ভেজায় অশ্রুনুনে—

বিস্মৃতি—মানুষের অমেয় প্রেয়সী—শাদা চাদরে ঢাকে ধূসর দুঃস্বপ্ন—আরও একটি ভোর—নয়াস্ট্র্যাটেজি—নিত্যদিনের পৃথিবী জটিলতার ক্রমবর্ধিষ্ণু হয়ে ওঠে—সেফটি ভল্টে ঢুকে পক্ষীরাজের সওয়ার সুখী রাজপুত্রের হৃদয় স্বস্তি খুঁজে পায়—স্মৃতিস্তম্ভে ও মর্মরমূর্তিতে গড়ে ওঠে অমরসেতু—

অমারজনীর মূর্তিবিনাশীদল সমস্ত তছনছ করে—মুণ্ডহীন করে স্মৃতিমর্মর। সাইনবোর্ড উপড়ে ফেলে—সংবিধান উলটে যায়—ত্রাসে নেমে আসে জরুরি খড়্গ—অতি প্রলাপীদের জিহ্বায় কুলুপ লাগে—এবং আমার নৈরাজ্যবাদী মুকহৃদয় সঙ্গোপনে গুন্‌গুন্ করে ওঠে—অবমানিত নেপোলিয়'রা আজও সেন্ট-হেলেনায় নির্বাসিত হয়—এতে কোনো চমক জাগে না এই যা বিস্ময়—পণ্যের তেমনি দরদাম চলে—মাংস বাজারে লালা ঝরায় লোভী কুকুরের দল—রবীন্দ্রসরোবরের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মাসডেমনস্ট্রেশান হয়—মাইলের চেয়ে বিস্তৃত লম্বা লাইন পড়ে "শোলে"র টিকিট প্রার্থীদের—নিউ মার্কেটে সবাই আজকাল স্লোগান তোলে "ববিব্লাউস" ও "জুলিরিং"এর আহা যুগোন্মাদনার প্রগতিশীল চরিতার্থতা—বেচারা শিক্ষক কর্মচারীরা আওয়াজ তুলে "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!" ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে নামে ছানার পায়েস, পানের কষ এবং প্রতি রাতে অভ্যস্ত কুকুরের সঙ্গম সেরে সবাই যে যার বিছানায়

ঢুলে পড়ে—

রাত্রি ক্রমশ সতীচ্ছদ সহ কুমারী জরায়ুর দিকে হেলে পড়ে—আমার ঠোঁটে জ্বলে ওঠে গাঁজা-চার্মিনার-অন্ধকারের স্তনের ভেতর আমার নিরেট অডিপাস আত্মা হামাগুঁড়ি দ্যায়—

জেলখানার দেউড়িতে ক্রমে ক্রমে বেজে যায় প্রলম্বিত ঘন্টা—১২টা বাজে ১টা বাজে ২টা বাজে ৩টা বাজে—অশ্বত্থের পাতায় জাগে নিঃসঙ্গ স্বনন—এক এক করে সিগারেটের টুকরায় মেঝে ভরে ওঠে—আমার অবিরল অন্তরীণ সংলাপ ও আত্মখাদক আত্মজদের তীব্র গর্জন আমাকে সুস্থ করে, আমি উদ্বায়ী স্বপ্নের ভেতর গ্যাস বেলুনের মতো ভেসে বেড়াই আমার অনির্ধারিত তৎপরতা আমাকে ব্যবহার করে আমার প্লীহা ও যকৃৎ টান টান চামড়া ও স্নায়ুপ্রণালীর অন্তরীণ আক্রোশ—

ও উনপঞ্চাশবায়ু—আমি জানি না আমার ঠিকানা কখনো আওয়ারা যুবকের সঙ্গে হাঠ্‌-ব্লাউস্‌ ও হাঁ-যোনির গালগল্প শুনি কখনো বা চলে যাই আমার রক্ষিতার ঘরে ওর মা ও সন্তান সহ ওদের যৌথ বিছানায় আমরা চারজন সে আমাকে প্রলুব্ধ করে—বৃদ্ধা ও শিশুর অতি কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আমি একসেকেন্ড বিব্রত "আপনারা শুয়ে পড়ুন!" আমার ভেতর থেকে স্বগতোক্তি করে একজন। "চালিয়ে যা শ্লা...!" অপর এক পামর খিলখিলিয়ে ওঠে—স্তব্ধ রাত্রির বুকে হঠাৎ গভীর ব্যথায় বাজে ঝরা পাতাদের মর্মর ধ্বনি আমার প্রারব্ধ সঙ্গম নেমে যায় গুপ্তঘাতকের অশরীরি উপস্থিতি টের পাই ভয়ে বুক মাথা হাত পা লিঙ্গ সব গুটিয়ে আসে স্থানু শরীর অজানা আশঙ্কায় শীতল শবের মতো আড়ষ্ট ও অনড় হয়ে পড়ে—শুকতারা কখন ঢলে পড়ে অশরীরি আতঙ্কসহ নিশি শেষের একক যাত্রী কিছুতেই আমি আমার ঠিকানা মনে করতে পারি না আমারই পদশব্দ আমারই প্রশ্বাস তাড়িত মৃগদের মতো আতঙ্কিত করে তোলে দূরে কোথাও কাকজ্যোৎস্নায় আহত ও আতঙ্কিত নিঃসঙ্গ কুকুরের আর্তরব শোনা যায় আমি ধীরে ধীরে কুমারী শিশির মাড়িয়ে আমার ঠিকানা খুঁজে বেড়াই—

জীবতোষ দাস

মানুষজন

মানুষজন, আপনার মুখের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে...কপালের ভাঁজ
শিরা-উপশিরা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে
আপনাকে দেখেছি বার কয়েক এগলি সেগলি করে
অসহায়ভাবে বাড়ি ফিরতে, বড়ো করুণ আপনার অবয়ব

মানুষজন, আপনাকে দেখেছি এই সেদিনও,
আপনার ছেলে-মেয়েদের মুখও অবিকল, ঝিম মারা এরকম,
ঠট্‌ঠরে ঠ্যাংগুলো ভেঙে পড়ছে আরও—
বিশ্বাস করুণ, আমার বাবাকেও দেখেছি ঠিক এরকম
যখন আপনারা অপরাধীর মতন নত হন, মাথা হেঁট,
তখনই পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্যটির সৃষ্টি হয়
মানুষজন, একবার চেষ্টা করুন না,
আমাকেও আপনাদের বিশ্বস্ত মিছিলে সামিল করা যায় কিনা।

প্রকৃত কাঠামো

এই সেই স্যানিটেরিয়াম মধ্যবিত্তমানসিকতা চেকপোস্ট দালাল কালচার-ভ্রূণ
যা জন্মসূত্রেই দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে চামড়ার ভিতর রক্তের ভিতর
প্রতি স্তরে স্তরে বংশ পরম্পরায় সাজানো...
প্রকৃত অর্থে সীমাবদ্ধ আয়নায় জীবন-যাপন, ছক বাঁধা প্রেম-প্রীতি
ভালোবাসা ব্যবহার ছবি ঝিম ধরা দেহ, ঘড়ি ধরে কথা বলা
সবকিছু ঠিকঠাক রেখে যৌন উপভোগ, এক কথায় শুধু মেনে
নেওয়া এই জীবনের উপরের কৃত্রিম খোসাটুকু কৃত্রিম বোধটুকু!
যা মূলতই কসমেটিক্সের মতন কিছুক্ষণ জীবনের সুন্দর কৃত্রিম গন্ধ
চাকচিক্য বিজ্ঞাপন বিনিময় হতে থাকে একটা দালাল সভ্যতার
গভীর আকাঙ্ক্ষায় যা বুঝে নিয়ে গভীরে যেতে অনেক সময়
লেগে যায়, সেই হয় আমাদের প্রথম জীবন!
যা এতটা মুক্ত, ক্রমশ নিজস্বতার শীর্ষে মাথা উঁচু করে
সটান বেরিয়ে আসা যায় প্রাণ (কেন্দ্রবিন্দুতে) গন্তব্যস্থলে
সম্পূর্ণ স্বাধীন। দৃষ্টি ও শরীরের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা
ফুলে ওঠে সৃষ্টির গভীর থেকে গভীরে আরও গভীরে
প্রকৃত কাঠামো এখানেই

প্রদীপ চৌধুরী

থাবার সামনে একা

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে আমরা শূন্য ঘরের
হাটখোলা দরজায় ফিরে এসেছি। এক ডজন
উদ্যত কালো বিড়ালের থাবার সামনে
ছেড়ে দিয়েছি নিজেদের। গোটা অবস্থা এখন
স্নায়ু-ক্ষমতার উপর পুরোপুরি নির্ভর করছে!

একটি গোপনীয় অপরাধ আমরা বহন করছি
একত্রে। জলের অতল থেকে যে বেগুনি আলো
তাকে সনাক্ত করতে সাহায্য করতো তা লেগে আছে নিশ্চল
জানালায়। এর আগে
এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখিনি আমরা।

বাতাস ইতিমধ্যে আমাদের ঘাড় থেকে
মাথা বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে হেঁচকা টানে
ছিটকে ফেলে দিয়েছে দূর অতীত থেকে
বেরিয়ে আসা শ্মশানগামী সকাল।
এমনকি দেবদূতের মতো মৃতদেহগুলি সহসা
দারুণ অন্ধকার হয়ে ওঠে। কেউ কাউকে দেখিনি।

তখন ঝড় এত তীব্র হয়ে ওঠে—সাংঘাতিক!
নারী, উপাসনার ভাষায় তোমাকে
ডাকতে গিয়েও গলা আটকে যায়
সমগ্র দিগন্তময় ছড়িয়ে যেতে দেখি
হেমন্তের নীরোগ শরীরের ঝাঁক—
জনিত ফসলের একক প্রদর্শনী
আশ্চর্য ভাষায় মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে।
কবরের ভেতর কিছু সময় আমরা
সম্পূর্ণ শুয়ে থাকি। আর উন্মোচন

আঃ একমুহূর্তের এই অপার্থিব উন্মোচন।
অনেকটা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে
নেমে আসার মতো। খুব সহজেই
আমরা একে নির্বিরোধ ছাইয়ের গাদায়
রূপান্তরিত করি। চোখ বন্ধ করি
আমরা—জানালার প্রতিফলন
আমার মনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।
শুনুন! আমরা চিৎকার করে উঠি

মনে হয়েছিল বুদ্ধিমানের কাজ হতো
ফিরিয়ে নেয়া—'এই যে আমি কি
এই ফুলটা নিতে পারি'? অথচ পরিবর্তে
আরও কয়েক হাজার নক্ষত্র
ছড়িয়ে দিলাম শৃঙ্খলাহীন ঢেউয়ে।

রোগীকে নিজের হাতে খাওয়াবার
সময় সে আমার হাতে ধরা পড়ে যায়।
জ্বরের বিকারের গন্ধ বেরোচ্ছিল
ফিড়িং বোতল থেকে যখন সে
রঙিন হাতে অজানাকে ভেদ করতে উদ্যত।

আন্দোলিত দরজা ঝটকা মেরে
খুলে যায়। প্রধান মাস্তুলের
পায়ের কাছে জুড়িয়ে নিই আমার
রিপুতাড়িত ইন্দ্রিয়। তার সম্পর্কে
আমার অতিরিক্ত খোঁজাখুঁজি এমনি
এক জানোয়ারের দৃষ্টিহীন ক্ষুধা।

ভারতীয় হীরার এই রোমহর্ষক কাহিনিও
বোতলের মুখ ট্রেডমার্ক আবদ্ধ
করতে পারেনি। আমি পাটাতনের
উপর নিজেকে আছড়ে দিই।
এই আবর্তিত ঘূর্ণিতে আমি সম্পূর্ণ
তলিয়ে যাই—পথ আগলানো
সীমাহীন পাহাড়—আমার
নাভিকুণ্ডে জলন্ত চাঁদের মতো
অধিকার করে থাকে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নারকীয় ক্ষুধা—
ক্ষুধা খুব দূরে নয়—গোলাপ
পাপড়ির মতো পাতলা আকাশ

আশ্চর্য, তথাপি আমার কল্পনা
অধিকার করে থাকে—হঠাৎ কোনো
পারম্পর্য থাকে না শব্দে ও চিন্তায়
এবং এক বোবা-হেমন্ত আমাদের
সম্পূর্ণ অধিকার করে নেয়।

শরীর থেকে সব জামাকাপড়
খুলে নেবার আগে আমরা
ভয়ঙ্কর আর্ত চিৎকার শুনতে পাই।
শিরায় দাপাদাপি কমে এলে
গ্রন্থিচ্যুত মানুষের চিৎকার। আবেগের
নীলস্তর পেরিয়ে যেখানে
প্রকৃত অভিযান—কয়েকশো মৃতের
সঙ্গে,—যারা আমাদের একই সারিতে
তাদের দিকে আমি
প্রথম এই নতুন শব্দপ্রয়োগ
আবিষ্কার করি।
অসতীযুবতী গোলাকৃতি শরীরে—যাদুমন্ত্রের
মতো জুয়া খেলা সুসজ্জিত ড্রইংরুম থেকে
রাস্তার প্রতিটি চালাঘরে ছড়িয়ে পড়ছে

পুনশ্চ

পৃথিবীকে দেবার মতো কোনো বাণী বা 'মেসেজ' কোনো লেখকেরই নেই—যিশু-বুদ্ধ-হজরত, কোনো মহাপুরুষই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা নন। 'ত্রাণ' জিনিষটাই অসম্ভব। ত্রাণ সৃষ্টিবিরোধী। পৃথিবীর কনসেপশনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ—এবং মৃতদেহ ছাড়া এর স্বরূপ কারোর কাছেই পরিষ্কার নয়।

আমাদের সমগ্র বর্তমান বদলে গেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ অই একই রকম রয়ে গেছে, এক শূন্য গোঙানির দিকে আমাদের সৃষ্টিকল্পনা ঝুঁকে আছে। এই মুহূর্তের যাবতীয় ঘটনা আমাদের চোখের সামনে একই সঙ্গে জেগে ওঠে এবং মুছে যায়—এই অপ্রমাণিত ভালোবাসার সূত্রেই আমরা সারা জীবন সবকিছুর সঙ্গে ঝুলে থাকি। আমাদের অস্থিরতা, আমাদের ধ্বংস, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের উদাসীনতা—এ সবকিছুর ভেতর দিয়েই আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কোনো বিচার বা বিশ্লেষণ নেই অথবা কোনো স্থূল আশাবাদ, কোনো নৈরাশ্য নেই—এই

মুহূর্তের যাবতীয় মুখ ও মুখোশ, আমাদের ঘিরে রেখেছে যা—মনে হয় যে এই তরল ঘটনাপ্রবাহকে অনুসরণ করাই একজন শিল্পীর কাজ, তাদের নিহিত অবয়ব, তাদের আগমন ও মুছে যাবার আলোছায়া—সময়ের এই নামহীন যাত্রাকে লক্ষ করে যাওয়া শুধু।

অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় চূর্ণ-বিচূর্ণ স্তম্ভ মিলেমিশে সব একাকার—একজন শিল্পী কি করে পৃথিবীকে রমণীয় করে তুলবে, যে পৃথিবী মরতে পারছে না, তাই, প্রতিদিনই মৃত্যুর অপেক্ষা করছে?

কবিতা থেকে বিযুক্ত বলেই এই দুরারোগ্য অসুখ মূল্যবোধের এই আধুনিক পতন বিরাট নাইটমেয়ারের মতো আমাদের অস্তিত্বকে এত দারুণভাবে খেয়ে ফেলছে মনে হয়। টেক্‌নোলজি এবং ব্যবসাচুক্তির বাইরে জীবনের তৃতীয় অর্থ পরিষ্কার হয় একমাত্র কবিতাতেই। 'দর্শন'ও আমাদের এই বিপুল অনুভূতিহননকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। কারণ দর্শন কবিতার মতো অখণ্ড নয়—এই নামহীন মরযন্ত্রণা ও দিব্য চেতনাকে একসঙ্গে, একই সময়ে মেলাতে পারে না দর্শন। হয়তো এরপর, একমাত্র আমাদের কবিতাই মরজীবন ও মুমূর্ষু পৃথিবীকে অনন্ত পরমায়ুর অধিকারী করে তুলতে পারে।

আঁতোয়া আর্তো

সমাজের বলি ভ্যান্ গখ্

আপনারা ভ্যান্ গখের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে যা খুশি ভাবতে পারেন, কিন্তু জীবৎকালে সে তার একটি হাত রান্না করে খেয়েছিল, অন্য হাতটি দিয়ে নিজের বাঁ কানটি কাটার বেশি আর কিছু করতে পারেনি,

এই পৃথিবীতে যেখানে *তারা* প্রতিদিন সবুজ স্‌স্‌ দিয়ে স্ত্রীযোনি ভক্ষণ করে এবং মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র নবজাতকের লিঙ্গটি ছেঁটে দেয় এবং এটা শুধু মাত্র একটি প্রতীকচিত্র নয়, এটা একটা সত্য, যা সারা পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে আচরিত হচ্ছে। হয়তো এই ধারণাকে বিকৃত মনে হবে, কিন্তু বর্তমান জীবন বয়ে চলেছে সেই পুরোনো আবহাওয়ায়, সেই নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, বিকার, বিকৃতি, দুরারোগ্য পাগলামি, বুর্জোয়া জাড্য, মনোজগতের সার্বিক অসংগতি (অস্বাভাবিক এই পৃথিবী), স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যাচার, সীমাহীন ভণ্ডামি এবং যে কোনো সৃষ্টির প্রতি নীচ ঘৃণা...

এমন এক ব্যবস্থার দাবি করা হচ্ছে যার মূলভিত্তি সেই আদিম রক্তপিপাসা নিবৃত্তির উপর,

সংক্ষেপে এই হলো, সংগঠিত অপরাধ!!

ক্রমশ সবকিছুই বাজে দিকে চলেছে কারণ অসুস্থ চৈতন্য এখন নিজের অসুস্থতা অতিক্রম করতে চাইছে না। অসাধারণ দ্রষ্টারা নিজেদের আবিষ্কার দিয়ে এই সমাজকে যখন বিব্রত করতে থাকে তখনই এই অসুস্থ সমাজ আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে আবিষ্কার করে মনোবিকলন শাস্ত্র। জেরার্ড দ্য নেরভাল উন্মাদ ছিল না, কিন্তু তার প্রতি অভিযোগ ছিল সেরকমই, উদ্দেশ্য, ছিল সে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উন্মোচন করতে যাচ্ছিল সকলের চোখে তাকে হেয় করা আর শুধু অভিযোগেই শেষ নয়, আঘাত করা হয়েছিল ঠিক তার মাথায়, শারীরিকভাবেই একরাতে তার মাথায় আঘাত করা হয় যাতে ওই মারাত্মক সত্য, যা সে প্রকাশ করতে চলেছে, চিরকালের মতো ভুলে যায়।

সমাজের সকলে গোপনে তার চৈতন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং সেই মুহূর্তে তাদের সম্মিলিত শক্তির প্রাবল্য নেরভালকে তাঁর সত্য ভুলিয়ে দেয়।

না, ভ্যান্‌গখ্ ও উন্মাদ ছিল না, তার ছবি বন্য আগুন, আণবিক বোমা, তৎকালীন জনপ্রিয় চিত্রশিল্পগুলির সঙ্গে ভ্যান্‌গখের দৃষ্টিকোণের তুলনা করি তবে দেখব, ভ্যানগখ্ বুর্জোয়া সাম্রাজ্যের ও দাস আত্মাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার শিকড় পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে সক্ষম ছিল।

ভ্যানগখ্ জানত ছবি কেবল মাত্র নৈতিক বা আচরণগত প্রতিক্রিয়াকে আক্রমণ করেই থেমে যায় না বরং প্রতিষ্ঠানের সমাগ্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতাকেই আক্রমণ করে।

মনোবিকলন বিদ্যা কতকগুলি গোরিলার বাসগুহা ছাড়া কিছুই নয়, মানব জীবনের ভয়াবহ

উদ্বেগও শ্বাসরোধকারী কষ্টকে বুঝতে না পেরে এরা কতকগুলি হাস্যকর নামে এগুলিকে অভিহিত করে।

প্রতিটি মনোবিকলনবিদই এক একটি কুখ্যাত যৌনজন্তু। আজ সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত আহত চৈতন্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে—কারণ ঠিকমতো শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে দেয়া হচ্ছে না তাকে,

উন্মাদ তাকেই বলা হয় সমাজ যার কথা শুনতে চায় না এবং অসহনীয় সত্যগুলি সে যাতে বলতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে।

ভ্যানগখের মৃত্যু উন্মাদ রোগে নয়,

এই সমাজ নামক শয়তান

কালো কাকের বন্যার মতো তার আত্মার আভ্যন্তরীণ বৃক্ষটিকে ছেয়ে ফেলেছিল এবং তাকে খুন করেছিল।

হেনরি মিলার

সমাজ কবি কবিতা

প্রতিটি সৃষ্টিশীল আত্মার ভয়ের মূল এইখানে যে সে জানে, তাকে কেউ চায় না, (ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে সৃষ্টিশীলতার কোনোই দাম নাই) বর্তমান পৃথিবীর কাছে সে অতি অপ্রয়োজনীয়।

কবি জানেন যে আধুনিক সভ্যতা এক দুর্ভেদ্য জঙ্গল এবং এই জঙ্গলে আত্মরক্ষা করার কৌশল তার জানা নাই।...প্রতিভা চিরাচরিতকে ভেঙে চুরে দেয়, সবকিছুরই পুরোনো ভারসম্য নষ্ট করে দেয়। তার ফলে ভয় পায় সেই ছোট্ট মানুষেরা, এই ভীরু জীবরা নিজেদের দরজায় সবসময় দানবদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে...

...মানুষের বড়ো ভয় চৈতন্যের সম্প্রসারণ, ছোট্ট মানুষদের আকুল প্রার্থনা, "আমাদের শান্তিতে বাঁচতে দাও"—কিন্তু এই ছোট্ট মানুষ তাদের প্রার্থিত শান্তি ও সুষমার জন্য কোনো মূল্য দিতে রাজি নয়। সে মনে করে ওইসব জিনিস দর্জির তৈরি সায়া-ব্লাউজের মতোই কিনতে পাওয়া যায়।

...যথার্থ শিল্প তাই যা মানুষের সত্য আবেগকে জাগিয়ে দেয়, অর্ন্তদৃষ্টি খুলে দেয়। মানুষের সাহস ও বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু হিটলার যেভাবে দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেভাবে কি কোনো কবি দুনিয়া কাঁপিয়ে দিতে পেরেছে?

কবিতার প্রধানতম উদ্দেশ্য আমাদের জাগিয়ে তোলা, সমস্ত মানবজাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, তা না-হলে ধ্বংস অনিবার্য।

বাস্তব তো আমাদের চোখের সামনেই আছে—একেবারে উলঙ্গ বাস্তব। কিন্তু তাকে কবিতার সংগীতে পরিণত করার শক্তি ক'জনের?

যারা ছন্দে বা না-ছন্দে পদ্য লেখে আমি তাদের কবি মনে করি না। তাকেই আমি কবি বলে মনে করি এই পৃথিবীকে পরিবর্তিত করার শক্তি যার আছে।

...মানুষ এখনও চিন্তা করতে শেখেনি বা শুরু করেনি, মনের দিক দিয়ে সে এখনও পশুস্তরে রয়ে গেছে—সে এখনও কুয়াশায় কিল্‌বিল্‌ করছে। তার চোখ বন্ধ, হৃদপিণ্ড ভয়ে ধুক্‌পুক্‌ করছে—সে সবচেয়ে ভয় পাচ্ছে নিজেকেই। বর্তমান পৃথিবী কোটি কোটি অদৃশ্য দানবে পূর্ণ—অথচ কবিদের ভাষায় শুধু প্যানপ্যানানি। নিজের নিরাপত্তার জন্য সে ব্যাকুল! আজ আমাদের দাবি, মানুষ খোলা চোখে সব দেখুক, তার অন্ধ আত্মার চোখ দুটি উন্মুক্ত হোক, সে বাস্তবের প্রকৃত চেহারা দেখতে শিখুক, ভ্রান্তি, মোহ ও অলৌকিকের অন্ধকারে পাখা না ঝাপটিয়ে এবং অর্থহীন কান্নাকাটি না করে।

কবিরাই সত্যকার নক্ষত্র। তারাই সদা মহাকাশে ভ্রাম্যমাণ। তারাই আমাদের অন্য এক জগতের খবর এনে দেন। তারাই বলে দিতে পারেন আমাদের ভবিষ্যৎ, তারাই জানাতে পারেন আমাদের

প্রকৃত অতীতকে, যা লুকিয়ে আছে আমাদের প্রত্যেকের জৈব স্মৃতিতে। তারা অন্য এক জগতের দূত হিসাবে আছে আমাদের মধ্যে।

আমরা তো মৃত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে বাস করি মৃত আত্মার সামিল হয়ে, আর কবিরাই কেবল প্রতীকী জীবন যাপন করেন।

কবি যখন আমাদের ভবিষ্যৎকে জানায় তখনই আমরা তাদের খুন করি কারণ আমরা বাস করি অনাগত সময়ের ভয়াবহ ভীতির অন্ধকারে—কবি বলতে তাদেরই বোঝাতে চাই যাদের বাস আত্মায় ও কল্পনায়।

যথার্থ কবির ভাষা রাস্তার গণিকাদের ভাষা নয়—তাঁদের ভাষা আসে অনেক উপর থেকে, সুদূরতম প্রদেশ থেকে, অচেনা জগৎ থেকে, তাই তাকে মনে হয় গোপন ও রহস্যময়।

আধুনিক কবিরা এমন ভাষা ব্যবহার করে যা তাদের পাঠকদের হৃদয়ের দোরগোড়াতেও পৌঁছাতে পারে না। যদি কবির ভাষা আমাদের আলোড়িত করত না পারে, জাগাতে না পারে আমাদের, তবে তা তো ভূষিমাল মাত্র। অধিকাংশ আধুনিক কবিকেই নপুংসক মনে হয়!! নিজেদের ছোট্ট ছোট্ট অহং-এর ডোবায় তারা বদ্ধ, জগৎ থেকে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয় এই ভয়ে যে জগতের সংস্পর্শে তাদের ঠুনকো অস্তিত্ব চুরমার হয়ে যেতে পারে।

জীবন সম্পর্কে যে কোনো নূতন ভিশান পায়নি তাকে কবি বলা সম্ভব নয়—সত্যকে স্বীকার করার জন্য যার কোনো আত্মোৎসর্গ নাই সেও কবি নয়। কোনো অভিযোগ নয় ; শুধু যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত—এই শিক্ষাই আমরা জীবন থেকে পেয়েছি। আমাদের এই সংস্কৃতিসম্পন্ন ধনতান্ত্রিক সমাজে কবিরা বাস করে কাকতাড়ুয়ার মতো!

পৃথিবী চায় আজ শুধু দাসদের, ক্রীতদাসদের। প্রতিভার স্থান আস্তাকুঁড়ে!

রবিউল

কানামাছি খেলা?

আচ্ছা কবিতা কি নিচু প্রকৃতির গুঁড়েষার ফল এখন যে কবিতায় দেখা যায় শুধু হাহাকারের প্রতিযোগিতা নিঃস্বতার অগাধ জলে গাধা গা ধোয় ছয় ফুটের লগি তল নেই শূন্যতার তবু সেই প্রাচীন প্রদর্শনী আমি বেশি অসহায় শিল্পকল্পনার চর্চা দেখে এই আমার শব্দের পিঠে শব্দের ম্রিয়মাণ দেয়াল স্মৃতির সঙ্গে লুকোচুরি কানামাছি খেলা আমার পরিচয় এসবই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফলাফল অন্যায় শোষণ শ্রেণি ভেদে দাঙ্গায় যুদ্ধের আশ্রয় ভালো ভালো শৈল্পিক বোধের জন্মলগ্ন সেই বিক্ষত ফল থেকে আহা এ যেসব শিল্পের রসদ গড়িয়ে পড়ে পাত্রহাতে কতিপয় অন্ধ অসহায়ের মিছিল ভাই আমাকে একটু দিন ভাই আমি পাইনি আমার কেউ নেই কেউ পায় কেউ পায় না কেউ পায় তাদের কথা কেউ জানে না তবুও কেঁচো শ্রেণীর একজাতের বানিয়ার দল মাটি খুঁড়ে যেই বের করে সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়ার অপরের বাতাস হ্যাঁ আমরা ভাই বুদ্ধি বেচে খাই এখন বেশ সস্তা দর নব্বই টাকা মণ দেবো একসের আগে অবশ্য টাকায় আট মণ পা'য়া যেত অসম্ভব বেশ শোষণ উঠিয়ে দিলাম যুদ্ধ নেই জনতার জয় অভাব নেই মনের ভিতরের মণিমুক্তোগুলো তবুও ব্যথার জারে ডুবে থাকে স্মৃতি নাকি আলস্যের সোনালি বিকেল তবু নিঃসঙ্গতা একটি বিশুদ্ধ বিলাস আলসেমির ডিম ফুটে বের হবে তখন এক তিন ডানাওয়ালা পাখি আসলে রাজনীতিই আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে এবং সর্বদাই রাজনীতিক আমরা দূরে ভিতরের লুকানো সিঁড়ি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি কিন্তু তাকে এড়াবার উপায় নেই।

ফালগুনী রায়

কবিতা হঠাও

১.

বিবাহ সভায় বিধবার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি
আমি এক বেকার মাত্র ডালহৌসি পাড়ায়
পয়সার অভাবে বেড়ে গেল চুলদাড়ি
লোকে বলল নকল করছি রবি ঠাকুরকে কিন্তু
আমরা রবীন্দ্র সদন বা কোনো ভবনের বদলে
এ বছর রকে বসে পালন করেছি রাত বারোটায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

আমাদের পেটে ছিল মদ হেঁড়ে গলায় আমাদের
সম্মিলিত গানের চিৎকার শুনে যেসব
বিবাহিতা মহিলারা স্বামীর উরুর তলায় শুয়ে ছিল
এবং যেসব কুকুরী সঙ্গম শেষে ঘুমচ্ছিল কুন্ডলি পাকিয়ে
তারা সব জেগে উঠে আমাদের রকেতে রবীন্দ্রনাথ-কে
নিয়ে ছেলেখেলার প্রতিবাদে চিৎকার করেছিল যথাক্রমে
মানুষ ও কুকুরের ভাষায়

গ্লোব নার্সারির কাছে আমিও দেখেছি
একটা কুকুরের গলায় কেউ পরিয়ে দিয়েছে বেল ফুলের মালা
আমরা শালা কোনো মেয়ের চুলের খোপায়
গুঁজতে পারিনি এখনো ফুল অথচ বরানগর বাজারে
দেখেছিলুম রজনীগন্ধা চিবিয়ে খাচ্ছে
বিশালাণ্ড ষাঁড়

এইসব দেখে শুনে ভাবি
নর্দমা যেমন হঠাৎ চওড়া হয় নদীর নিকট
অথবা কামনার সঙ্গে প্রেম মিশে গেলে যেমন
ব্যভিচার আর ব্যভিচার থাকে না হয়ে যায়
রাধাকৃষ্ণের ধর্মীয় যৌন উপাসনা

তেমনি যদি আমি একটু প্রসারিত হতে পারতুম
অভাব পীড়িত জৈবিক তাড়নার কাছে এসে
তবে হয়তো নিরন্নকে অন্ন দেবার সঙ্গে সঙ্গে
তাকে বোঝাতে পারতুম অরণ্য পর্বত সূর্য সমুদ্র
ইত্যাদির বিশালতার অনুভবে ঠিক কী ধরনের শান্তি রয়েছে

২.

আমি যেন আমার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকি
নারীর যৌনতা থেকে উৎসারিত সন্তানের মধ্যে নয়
কিন্তু শুধু শব্দের শরীরে থাকুক বেঁচে
আমার চেতনা
আমার মাংসের শরীর খুব ভালো করে জানে
জীবনের মানে বেশি দিন থাকবে না
নিভন্ত চিতায় শুয়ে থাকে রজনীগন্ধার মালা
যে যায় সে যায় যারা বেঁচে থাকে তারা দ্যাখে
পোড়া চিতাকাঠ থেকে কীভাবে খাদ্য খোঁজে উড়ন্ত চড়াই
বাড়ন্ত পুরুষ্ট দেহ একটি মেয়ে বা ছেলে যদি সঙ্গ দিত
জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে—মৃত্যু নয় যৌনতা মনে আসে
মদের টেবিলে কেউ বলে মদ খাবার সময় যদি কেবলি
হিসাব করো দলের ভেতর তবে তুমি বিক্ষিপ্ত নির্দল হয়ে যাবে
একটি নারীকে না পেয়ে একশোটা দেবদাস তৈরি হয়
শরৎ চাটুজ্যের লেখনী ছাড়াই এক হাজার
উপন্যাস দুহাজার ছোটোগল্প বাসে ঝোলে
সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে বিনা পাখায় গরমে সেদ্ধ হয়

সুবো আচার্য

ছদ্মবেশী

১

বারবার মনে হয় ছদ্মবেশে আছি,
যখন আয়নায় দেখি মুখ,
কিংবা ঘোর মধ্যনিশীথে নক্ষত্রের নীচে নক্ষত্রের চেয়ে
আরও একা—
রাত্রি তছনছ করে চলে যায় ট্রেন,
তৎক্ষণাৎ মনে হয় এ আমার ছদ্মবেশ
এ আমার ছদ্মবেশ
ছদ্মবেশে আছি—
একি দৃষ্টি বিভ্রম! একি তাৎক্ষণিক জেগে ওঠা!
একি অজ্ঞানে ভ্রান্তির অনুসরণ! পাগলামি!

২

রাত্রির ভিতরে আরও দূর রাত্রিতে চলে যাই।
এই মানবশরীর ভরে ওঠে রাত্রিতে। রাত্রি। কেবল রাত্রির শব্দ।
তারপর নিস্তব্ধতা। তারপর গভীরের গভীরে চলে যাই।
নিরুদ্দিষ্ট বালক, ভিখারি, ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ, চোর জোচ্চোরদের
ফুটপাথ থেকে আর এক ফুটপাথে। মানুষের নাকডাকার
শব্দের সাথে খবরের কাগজের মেশিনের শব্দ। ইতস্তত
পুলিশ। রাত্রি, গাছপালা অন্ধকারের ষড়যন্ত্রে ডুবে
থাকে। রাস্তায় পড়ে যায় ভ্রূণ। খুন হয়ে যায় কেউ।
আমি চিনি না। আমি এই বহুবিস্তৃত সভ্যতা চিনি না।
আমি এই ধূলোবালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া
মানুষকে দেখি আর তার কসের রক্ত দেখে আমার মনে হয়
আমি কবিতায় 'মানবতা' শব্দটি ব্যবহার করেছি।
অদিতি, আমরা এখনও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন পাইনি।
আমাদের বেঁচে থাকা কল্পনায় বেশি।
অদিতি, তুমি আমাদের মা, তুমি বলো আমাদের
কী সমুদ্রপারে যাওয়া প্রয়োজন নেই ইহজীবনে!

তুই

এখন অজানা ও কালো অনন্তের পারে তোর বসে থাকা,
এখন অনন্তের মুণ্ডহীন আলো কিংবা মাইল মাইল
কুয়াশায় তোর ব্যাপ্ত মিশে থাকা,
এখন একদৌড়ে তুই দিগন্ত পেরিয়ে গেলি,
আকাশের ওপারে আকাশ
বাতাসের ওপারে বাতাস
এখন অনন্ত—
অনন্ত কী অবয়বহীন! দূর! লুপ্ত! ক্ষীণ!
কুয়াশায় ডুবে থাকা মৃত্তিকার মতো!

আমরা এই ক্ষুদ্র মাটি পৃথিবীর লোক,
বুকে অন্ধকার, ঔদাসীন্য, ক্ষোভ, আমাদের তিক্ততা
চেপে রেখে হাসি বমি করা, স্তব্ধ আর অনড়
পাথর বুকে, তৎক্ষণাৎ জেগে ওঠা ম্যাজিকের মতো,
শার্টের কলার আর টাইয়ের গিঁটের সঙ্গে
জুতোর পালিশ, ইনসিওরেন্স, সতত সতর্কভাবে
বাজার দরের ওঠানামা দেখে নিয়ে জেগে ওঠা
সেইভাবে, টক অর্থনীতি, ফুটো হয়ে যাওয়া দর্শন,
ছেঁদো গবেষণা আমাদের দশটায় অ্যাটেনডান্স,
লান্‌চে এসে হাই তোলে চারলি চ্যাপলিন—
আমাদের ছোটো ঘরে বিকেলের আভা, জানালায় ইন্দ্রজাল,
সূর্যাস্ত, মেঘ, পাখিদের বিষণ্ণ ঘরে ফেরা
সমস্ত আকাশময় অসম্ভব আলোকের ছায়া,
তৎক্ষণাৎ বুকে চাবি ঘোরানোর ব্যথা, সব ছবি জেগে
উঠে মুছে যায়, অনুসরণে কী বিষম ক্লান্তি! আহ্
কোনো শব্দ জেগে নেই—
অনন্তের ব্যাপ্ত শরীরে ঠিক কোন্‌খানে তুই মিশে আছিস!
তুই কি রৌদ্রে রৌদ্র কুয়াশায় কুয়াশা বাতাসে বাতাস
জলে জল মাটিতে মাটির সাথে ঘনীভূত!
পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবী অটুট—আমরা তিক্ত বিরক্তিতে
দেখছি খবরের কাগজ আর রেডিয়ো বাচালতা,
অবিরল বায়ুস্রোতে বসে মনে হয় রৌদ্রে রৌদ্র নিভে গেছে
কোথাও বাতাস নেই এরকম মনে হলে কার ছোটো ছোটো
নিশ্বাসের শব্দ, মেঘের ভিতরে কার ছোট দুই মুঠি,
তৎক্ষণাৎ বুকে চাবি ঘোরানোর অনুভূতি
নিস্তব্ধ নারীর চাপা ফোঁপানোর শব্দে ভরে উঠছে পৃথিবী,

আমার বুকে মুচড়ে উঠে আসছে ঢেউ
কোন যৌনএকাগ্রতাও আজ আমার সঙ্গী নয়,
দূর আকাশ ও মাটির দিকে চোখ রেখে
দেখতে পাচ্ছি চিত্রিত সাপ চলে যাচ্ছে
সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে—
বেদান্ত চুরমার করে হাহা হাসি উঠে আসছে
আমাদের দিকে—
পৃথিবীর ভিত্তিপ্রস্তর পর্যন্ত ভেদ করে যাচ্ছে মানুষের দুঃখ,

হায়, তুই আর আমাদের কেউ নোস!

অতৃপ্তি

আচমকা মাঝরাতে ঘুম ছিঁড়ে গেল,
বাইরে শোকস্তব্ধ রাত্রি একা কোন শব্দ নেই
অবয়বহীন অন্ধকার—
বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ছেঁড়েনি,
কেউ কী শূন্যলোক থেকে ডাক দিয়ে গেল!
সহসা দুঃস্বপ্নে ঘুম ছেঁড়েনি,
সিলিং ফ্যানের বধির শব্দ,
ডিনামাইটের মতো আকাশফাটানো জ্যোৎস্নায়
কেউ নেই, কেউ ডাকেনি আমায়, কোনো শব্দ নেই
তবু 'অকস্মাৎ' শব্দটির মতো কশাঘাতে ঘুম ছিঁড়ে গেল ;

আমার হাতে সিগারেট নেই, সিগারেটে স্বাদ পাই না,
হুইস্কিতে স্বাদ পাই না, কবিতার খাতা দূরে জটায়ুর
মতো পড়ে আছে লেখার টেবিলে
দুচোখে যে অস্থিরতা আছে তাও নয়
মাথার ভিতরে আত্মায় কোনোখানে নেই
নিজেকে যে একেবারে টের পাচ্ছি না তাও নয়,
তবু কোথায় একটু অস্বস্তি লুকিয়ে রয়েছে,
শেষ দেশলাই কাঠিটি নিভে গেলে যেরকম
অসহায় লাগে—

মাঝে মাঝে বেলা শেষ হয়ে এলে দু'একমুহূর্তের
জন্য নিজেকে আলিঙ্গনের মধ্যে টের পেয়ে যাই—
ট্রাফিক সিগন্যালে জ্বলছে লাল, অসম্ভব ভিড়,
ক্লান্ত চোখ, অদেখা নদীর শব্দ! মেঘ! তুমুল

স্রোতের ঘায়ে জেগে ওঠা দীর্ণ চরাচর!
বিষম ভিড়ের শব্দে কাকে খুঁজছি!
ঘাড় বেঁকে ঢুকে যাচ্ছে কী আত্মায়!
আমার জিভ কী চেটে দেখছে আপনরক্তের স্বাদ!
আমার চোখ কখনই দেখছে না নিজেকে!

আকাশের দিকে চোখ যায় না, প্রকৃতির কাছে
চুপ একা পরাভূতের মতো যায়, যায় আর আসে,
সস্তা আলোচনা চালাতে মুখ কখনই ক্লান্ত হয় না,
কফি হাউসের ভিতরে গলার নিজস্ব তেজ বেড়ে যায়,
দুহাত ত্বরিৎগতিতে যায় মানুষের দিকে,
তারপর ছদ্মবেশে ক্লান্ত লাগে
তারপর ছদ্মবেশে বড়ো ক্লান্ত লাগে
তারপর মৃত্যুনদীর ঘ্রাণে রোমাঞ্চিত মানুষ জীবন
ঘেয়ো কুকুরের মতো গোঙায় চিৎকার করতে করতে
ঘুমিয়ে পড়ে
ডিনামাইটের মতো ফাটানো জ্যোৎস্নায়
মানুষকে বড়ো অসহায় মনে হয়—
তখন অনেকদূর হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে, হাঁটি

বাসুদেব দাশগুপ্ত

নববর্ষের অনাবিল আনন্দ

মিস ক্যালকাটার উপস্থিতিতে ২০ জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নৃত্য, অর্কেস্ট্রা, বাংলা ও হিন্দি চিত্রের গান, গজল ও ফিরপোর পুরো ক্যাবারে!

আরও একটা ব্যাপার, বললেন, মিসেস কফ্, এখানে নিউইয়র্কের মতো বিজ্ঞাপনের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না। ওখানে জানালা খুললে বিজ্ঞাপনের আলো, টেলিভিশানে বিজ্ঞাপনের ছবি, রেডিয়োর বিজ্ঞাপনের চিৎকার, কোথায় যাই বুঝতে পারি না। এখানে বিজ্ঞাপন এখনও তেড়ে এসে মাথায় উঠে বসেনি। ইচ্ছে করলে নিরিবিলি শান্তিতে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে পারে একজন, বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্যের বাইরে। শাড়ি পরা মিসেস কফের কোলে দৌড়ে এসে বসল তার ফুটফুটে ছেলে, আর মিসেস কফের ছোট্ট চিৎকার, এই যাঃ! কী হলো! শাড়ি খুলে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমরা কোথায় চলেছি?

স্টিকস্ নদী পার হওয়ার সময়-নিশ্চিন্ত করে কেউ বলতে পারে না কোথায় যাচ্ছি...

—ওই যে ডেসমণ্ড! ওই তোমার শত্রু!

—কোথায়?

—এটা ছেড়ে দাও! শান্ত হও ডেসমণ্ড! পৃথিবীতে তোমার কে শত্রু আছে?

—আমি...আমি জানি না স্যার। কিন্তু তলোয়ারটা ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে অজেয় মনে হল, আর সবাইকে শত্রু বলে মনে হতে লাগল।

—এটা অশুভ...। এখান থেকে পালাতে হবে।

সুভাষ ঘোষ

বেতার বার্তা

৬টার সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্, ৬-০৫ সুভাষিত ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি ৬-২০ লঘুসুর ৬-৩৫ ঝাড়ু ৬-৩০ ঝি, বাসনকুশন পয়পরিষ্কার, উনান্ পরিষ্কার, মুখে আগুন ৬-৪৫ দেশবন্দনা ৬-৫৫ সানাই ৭-১০ বেডটি উইথ্ খেজুরে আলাপ ৭-১৫ আবহাওয়াবার্তা ৭-২০ ক্লিয়ার পেচ্ছাপ পায়খানা ৭-৩০ সংবাদ : হচ্ছে...হবে...খুন...হনন...হত্যা...গ্রেপ্তার...অভ্যর্থনা...তোপধ্বনি...অনামী আততায়ী...৮-১৫ বড়ো ব্যথা, চা বড়ো তেতো ৮-২৫ দাঁড়ি ছাঁটাই, বোগল ছাঁটাই ৮-৪০ দাঁত সাফাই ৯ স্নান ৯-১৫ উইথ গান পরনে ধড়াচূড়া ৯-৩০ খাওয়া ৯-৪৫ দাঁত সাফাই ১০টায় হাজিরা সহি ১০-১০ ফাইল্ ইজ পুট্ আপ...প্লিজ অ্যাক্স্পিডাইট...ফর ইয়োর কাইন্ড পেরুজাল...১০-৩০ ফর ইওর কাইন্ড পেরুজাল...ফাইল্ ইজ পুট আপ...প্লিজ অ্যাক্স্পিডাইট ১২-৩০ ফাইল ইজ পুট আপ...১২-৫০ ফর ইয়োর কাইন্ড পেরুজাল...১-৩৫ প্লিজ অ্যাক্স্পিডাইট ১-৪০ লাঞ্চ আওয়ার ২-৩০ মন্থর গতিতে কোল্ড কফি, ওই গতিতে ফেরিঅলা, লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি, ইং খবর, রিক্সোঅলা ঠ্যালাঅলা, গলিতে কুকুর, মিষ্টিঅলা, বেকার মন্থর গতিতে, হাত বুকপকেটে ৪-৫০ ফাইল্ ইজ পুট আপ...আমি যতদূর জানি সে সৎ, বিনয়ী কর্তব্যনিষ্ঠ...মে বি প্রোমোটেড ৫-০০ সময় সঙ্কেত ৫-০৫ খেয়াল ৫-১৫ অবকাশরঞ্জন ৫-৩০ খেয়াল ৬-০৫ আবহাওয়া-বার্তা ৬-১০ ক্লিয়ার পেচ্ছাপ পায়খানা ৬-৩০ চা উইথ খেজুরে আলাপ ৭-৩০ সংবাদ :...হচ্ছে...হবে...গ্রেপ্তার...হনন...হত্যা...অভ্যর্থনা...তোপধ্বনি...অনামী আততায়ী...৭-৫০ বড়ো ব্যথা, চা বড়ো তেতো ৮-০০ সবিনয় নিবেদন ৮-১৫ একমুঠো ধুলো তুলে নাও ৮-২০ রাগপ্রধান ৮-৩০ বাণিজ্যবার্তা : চমৎকার, ধরা যাক দু'একটা ইঁদুর এবার ৯-০০ খেয়াল ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন ৯-৫০ বিচিত্রা ১০-০০ সংবাদ : হচ্ছে...হবে...হনন...হত্যা...গ্রেপ্তার...অভ্যর্থনা...তোপধ্বনি...অনামী আততায়ী...১০-১৫ খাওয়া বড়ো তেতো...ব্যথা বড়ো...১০-২৫ দাঁত সাফাই ১০-৩০ অনুরোধের আসর : মর্দন...মন্থন...রোমন্থন...চুম্বন...রমণ...১১-০০ ঘুম, সঙ্গে আবহাওয়া বার্তা...সাগরে নিম্নচাপ...ঝড় বিদ্যুৎ, নিদারুণ সঙ্কটের মুখে আলো ফোন, তার, বেতার...বাবা বহুদিন শোক নাই ব্যথা নাই, কেবল খরা, জল নাই, মেঘ নাই, বীজ ফসল নাই, শুকনো মাটিতে পা ফেলার জো নাই রাতে বিশ্রাম নাই...আল্লা ম্যাঘ দে' পানি দে

শৈলেশ্বর ঘোষ

আত্মভুক-১

ভালো লাগে চিবাতে রুটি, ক্ষুধার অন্ন গরিবের অস্ত্র
ও হৃদয় আমাদের, ভালো লাগে ওই নকল দাঁতে কামড়ে ধরা
মাংস মদির প্রাণ—আমাদের দুঃখ অস্পষ্ট
পৃথিবীতে ক্রমশ অর্থহীন, আমাদের আনন্দ বেশ্যার
শরীরের মতো ব্যবসা ও বধিরতা মাত্র
পার্কে বসে আমার বন্ধু বলেছিল তার ভয়ের কথা,
হজমের গোলমাল, পাশে শবযাত্রীদের চিৎকার—
জীবনের উচ্ছ্বাস দেখে আমরা ছিলাম নীরব
নীরবতা বড়ো হয়ে মাথা তুলছে আমাদের শরীরে,
রেণু তার ছেলেকে ছেড়ে চলে এল গণিকালয়ে
রেণু তার ছেলেকে ছেড়ে চলে গেল ধর্মকবরে,
আগুন ছাড়া এবারের শীত তবে আমরা কাটাব কেমন করে?

ওরে ছিট্‌চিটে গরিবের মেয়ে তোর খাপছাড়া
মুখে হাসি ফোটাতে এরাতে কেউ আসবে না আর—
তোরও রুটি বুঝি ঠান্ডা হয়েছে ঠিক
আমারই মতো—ক্ষুধা তো দরিদ্রকে পায় না
তাই আছে শুধু চটকানো রাত্রির বিছানা,
সুষম খাদ্য, পালকের ঝাড়ু, অস্ত্রময় ইঁদুরের
আনাগোনা, লাফায় ভাঙে কাচের বাসন, জীবনে
মরণে নিস খাবলে ছিঁড়ে হৃদয় ভোর, উগরে
খাস নিজের বিষ, ভালো লাগবে চিবাতে
রুটি, গরিবের অস্ত্র, ক্ষুধার অন্ন এক ডিস্‌।

আত্মভূক—২

খা তবে নিজেরই রক্ত মাংস কোমল ভালোবাসা
খা, হা-হা হৃদয়ের নৃত্যপরা দুঃখ ও তমসা
নির্জনে খাবার খেয়ে শুয়ে পড় ভয়ে ভয়ে
না বলা গোপন স্বপ্ন বা বুক ভরা শূন্যতা
মুখ থুবড়ে পড়ে থাক্—বাসি সকাল বেলা
ক্লান্তিকর স্ত্রীলোকের ডাক, 'এই যে চা,
উঠে পড়, আজ আমাদের বেড়াতে যাবার কথা'
মাথার ভিতরে কালো কাক সময় মতো ডেকে ওঠে
তাদের কালো কলরবে জেগে উঠি আমি
বসে থাকি শুয়ে পড়ি, হত্যাকারী আবার ঘুমিয়ে পড়ে—
খাপছাড়া ভালোবাসার কালো অত্যাচারে
আমাদের কামনার সূর্য ডুবে যায়, মিথ্যা হয়
কল্পনার চাঁদ, মৃত্যু পর্যন্ত পৃষ্ঠপোশকতা করা এই
আকণ্ঠ ঘৃণার—অপেক্ষা কর উচ্ছিষ্ট কখন
পড়বে এসে থালার উপর, গাছ ও গুল্মের
মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মলমূত্র,
দারিদ্র, আসক্তি ও ভালোবাসাই হলো আমাদের
কল্পনার বিষয়, হে যুবক হে যুবতী তোমাদের
চলে যাবার পর ঘাসের উপর পড়ে রইল কিছু রক্ত
এবার আমরা ফিরে চাইব মুখোশ, প্রসাধন ও অসুখ
অসুখ আছে বলেই আগ্নেয়াস্ত্র গোপন করেছি আমরা,
তাড়া করেছে জাড্য ও জরা, সন্ন্যাসী গেলেন তাই
তার রক্ষিতার কাছে, উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে
হল তাদের ভালো মন্দ কথা, কার পাপে কে
কতটা হয়েছে স্থানচ্যুত, দূরবর্তী শূন্যতা আমরা—
মুখ দেখে বোঝা যাবে না কালো রাত গোপন
কামনা, কাঁটা চামচের মাখামাখি, তল্পপেট থেকে
ক্রমশ উপরে বেদনার সম্প্রসারণ, যা রে জন্তু, ছিঁড়ে খা,
শূন্য এ বুকে যা কিছু এখনও শ্রেণীবদ্ধ, নরম চামড়া

আত্মভূক—৩

আমার চলাফেরা ছিল নদীনালা সীমান্ত ও পর্বতমালা
কামনা ছিল ভালোবাসার গিরিগুহা বন্ধ করে দেয়া
ভালো-লাগা বা ভালো-না-লাগা একই অবয়বে দুরকম প্রদাহ
জানে মানুষ আর জানে মানুষের ভগবান, তাই পাথর ভেঙে

আমরা বারমাস তৈরি করে চলেছি রাস্তা—চামড়ার তলে
ফুস্কুড়ি, হতাশা থেকে আস্তাকুঁড় পর্যন্ত গুনে যাবো তাই,
পোকারা, ধর্মহীন আমি, খা ওই শূয়োরের পাল মাংসের দলা

শরীরে ঘেসে বেড়ে উঠছে গাছ—বসবে তাতে রাতজাগা পাখি?
চল্ তবে আবার সেদিনের মতো কিছুটা হাঁটি কিছুটা বসি,
জাহাজ ঘাটায় একটি ছেলে একটি মেয়ে ডুবে গেল স্বৈর জলে
আরও কিছু রাত হলে অতীতকে টেনে তুলতে আসবে পুলিশ ও কুকুর
আমরা যে ফুল ঘাসের উপর রেখে গেছি, আত্ম ও পর
কুকুরগুলি শুঁকবে এবং পেচ্ছাপ করে যাবে তারই উপর

হাসপাতালে বসে থেকে আমাকে শুনতে হয় ব্যভিচারী
স্বজনের কাহিনি—এবং এ বিসস্বাদ কোনোদিন শেষ হবার নয়
তোমাদের প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম বলেই আমার এই মৃত্যু
পিতা ও মাতা আবার শুরু থেকে ভাবো কীভাবে সন্তানকে
ঘুমিয়ে রেখে ফয়দা তুলে নিতে হয়, তোমাদের
হাতগুলি হিম, তবু কুঁড়িগুলি তুলে, ছিঁড়ে দাও উনুনে
আহুতি শেষ হলে দেখতে পাবে, সর্বনাশ, দশদিক ব্যাপ্ত খরা
খাদ্য নাই, জল নাই, কান্নার শব্দ নাই—প্যান্ট ও জামায় তালি,
প্রবেশযোগ্য রাস্তা না পেয়ে চুল ছেঁড়ে, গোপনে ঢাকনা তুলে
খুশি হয়—দেখে অভ্যন্তরের সবটাই ছাই ও সীসায় ভরা!

জিজ্ঞাসা

একজন আমাকে বলেছিল, পেছনে যে আসে তাকেও ভয় পাই
সামনে যে এগোয় তাকেও
আমরা বসন্তের যাযাবর পাখি নই
প্রতি রাতেই ভালোবাসা নিয়ে আমাদের ঘরে ফিরতে হয়
এই যে মশারি তোলা, চটকানো ক্ষুধা
কোষ্ঠ পরিষ্কার করার পর খুঁজে দেখা আত্মপরিচয়
মা, তোর এক হাতে রক্ত আরেক হাতেই শুধু বরাভয়—

একজন আমাকে বলেছিল যদি অন্ধ হোস্ ভিক্ষা পাবি
রুটি ও রুজি,
যে যার ফোকরে বসে গড়ে তোল্ জরুরি সংসার
তবু খুনি ও লম্পটরাই রেখে যাবে উত্তরাধিকার
মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার লোভ শুধু মানুষের, পশুদের নয়
ভিখারিও তাই দান করে আজীবন সঞ্চয়

ভোরবেলা ময়দানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে যুবকের লাশ
ভবিষ্যৎ দুঃশ্চিন্তা থেকে আমরা মুক্তি চাই, চাই মুনাফা ও পুঁজি
ঝুলে থাকা ফাঁস নিজের গলার পরে নিতেও আমরা আজ রাজি!

কর্মীদের দাবি, সুদীর্ঘ ধর্মমিছিল
লোহা কাঠ মেহগনি কণ্ঠি ও খল
লালসায় চেটে নেয়া উরুর ঝরা জল
টেলিফোন তুলে বলে দিয়েছি আমিই সেই শয়তান
দৃষ্টিহীন চুম্বন করেছে পুঁজ, রক্ত, ক্ষতস্থান
নিহত নির্দোষ ছিল তবু তার ছিল ইষ্ট দুটি হাত
মরে যাবার পর খোলা চোখ দুটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে
নিষিদ্ধ এলাকায় ফেরারি একা তুমি,
লুকিয়ে বাথরুমে ঢুকে সেরে নাও নিজের ভালোবাসা—
সন্ধ্যার কুয়াশার মতো চিরকার ঝুলে থাকবে আমাদের এই জিজ্ঞাসা!
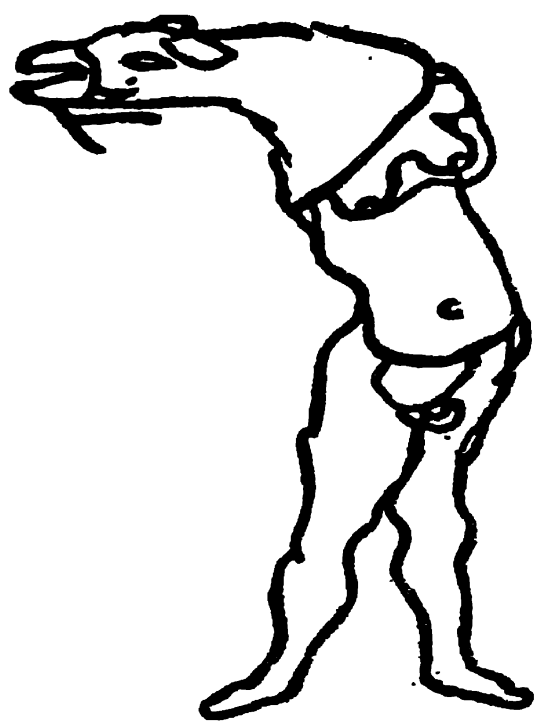
ক্ষুধার্ত

ক্ষুধার্ত

হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত—৬

নভেম্বর ১৯৮১

ক্ষুধার্ত ৬

সম্পাদনা : শৈলেশ্বর ঘোষ

মূল্য : ৪ টাকা

লিখেছেন :

ফালগুনী রায়

গত ৩১শে মে, ৩৫ বৎসর বয়সে ফালগুনী রায়ের মৃত্যু হয়েছে। একজন কবির ৩৫ বৎসর পৃথিবীতে কাটিয়ে যাওয়া কম বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। এর বেশি হলে বাঁচতে হয় মধ্যবিত্ত রোবটের মতো না হয় খুনি অথবা উন্মাদ হয়ে। জীবন অসহ্য বোধ হলে কবিরাই মৃত্যু কামনা করতে পারে—সে ইচ্ছাশক্তি কেবল তাদেরই আছে। ফালগুনীর শেষদিকের লেখাতে এই কামনা দেখা যায়। ফালগুনী চেয়েছিল মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে—তার রচনার মধ্য দিয়ে, তার চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়ে। সে চেয়েছিল তার চিন্তার অনুপরমাণুগুলিকে ভবিষ্যতের বুকে ছড়িয়ে দিতে—এবং জীবৎকালে যে অসুবিধাগুলি সে ভোগ করেছে ভবিষ্যতের মানুষ যেন সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়। সমসাময়িক বাস্তবতাকে সে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল। নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল স্থবির চিন্তার জড় পিণ্ডকে। তথাকথিত অর্থে কবিতা ফালগুনী লেখেনি—ফালগুনীর কবিতা তার চিন্তা, কল্পনা প্রকাশের একটা উপায় মাত্র। আমাদের মতো ফালগুনীও কবিতাকে এক জীবন-বিচ্ছিন্ন শিল্প বলে মনে করেনি। আমরা কবিতাকে জীবনের একটি মূল শক্তি বলে মনে করি। কবিতা 'ওয়ে অব লাইফ' (জাঁ জেনে গদ্যকেও 'ওয়ে অব লাইফ' করে তুলেছেন)। ১৯৬৫ সালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ফালগুনীর আত্মপ্রকাশ। ফালগুনীর জীবন-পদ্ধতি ও রচনা দুই-ই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা। ফালগুনীর উপস্থিতিই তাদের কাছে ভয়ের ও বিরক্তির। ফালগুনী নেই এই তথ্যে তারা কি খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছে? মনে হয় না। ফালগুনীর রচনাগুলি রয়েছে—ফালগুনীর শব্দগুলি বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে এসে ঘাড় মটকে দিতে পারে—এ সম্ভাবনা চিরকালই থেকে যাবে। তাছাড়া পৃথিবী নতুন অভিজ্ঞতাকেই ভয় পায় বেশি। ফুলসহ ফুলদানিটি উল্টো করে রেখে ফালগুনী জীবনকে দেখতে চেয়েছিল, একাজের যে ভয়ংকর মূল্য দিতে হয় সে মূল্য দেবার শক্তি ফালগুনীর ছিল। এই সাহস খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। চৈতন্যের সম্প্রসারনই আজকের কবিতার সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ, এই লক্ষণের বিচারেই ফালগুনী কবি। মধ্যবিত্ত ভাঁড়, শব্দের হালুইকর, বাজারের দালালরা ফালগুনীকে কবি মনে করে কিনা এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নাই—ফালগুনীর তো ছিলই না। এই পৃথিবীতে কবিরা যে আজও বহিরাগত, ফালগুনী আবার তা প্রমান করে গেল। সে এই পৃথিবীর একটা কণাও গ্রহণ করেনি। যথার্থ বিদ্রোহী সে—কবিতার শহীদ। জীবিত ফালগুনীকে কত না বিদ্রূপ আর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। পারিবারিক লোকজন, পাড়ার লেখক, কফি হাউসের পাণ্ডা, কবিতা সভার সভাপতি সকলেরই বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে ফালগুনীর উপর।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছে ফালগুনী আত্মহত্যা করেছে! আমার তা মনে হয় না। কবিরা কখনো আত্মহত্যা করে না, আত্মত্যাগ করে। নিজের সত্যকে প্রকাশ করার ভাষা যার আছে তার আত্মহত্যার দরকার হয় না। কবিতা-সত্য তার জীবন-কোষ থেকে জীবন-রস শুঁষে নিতে

থাকে। এইভাবেই তিলে তিলে তার আত্মবিসর্জনের কাজ চলতে থাকে। একজন কবির জীবন ও মৃত্যু এই জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম থেকেই সে তো জীবনকে দেখেছিল উটের গ্রীবার মতো—এই গ্রীবা ফালগুনীকে প্রলুব্ধ করেছে ও ভীত করেছে। ফালগুনী তাকে ভালোবাসতে চেয়েছে, ভালোবাসা না পেয়ে আক্রমণ করেছে। জীবন তার কাছে এভাবেই রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্লীল রসিকতা করার ও বিশৃঙ্খল ভালোবাসাহীনতা দেখে হো হো করে হেসে ওঠার আগেই মৃত্যু এসে ফালগুনীকে তুলে নিয়ে গেল—এই ক্ষোভ আমাদের থেকে যাচ্ছে।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ও আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য

প্রায় দুবছর পর ক্ষুধার্তের ৬ষ্ঠ সংকলন প্রকাশিত হল। পাঠক জানেন ক্ষুধার্ত পত্রিকা জন্ম থেকেই অনিয়মিত—কিন্তু বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পত্রিকা যথার্থ আন্ডারগ্রাউন্ড লেখালেখি ও চিন্তাধারাকে ধারণ করে আছে। গত ১৫ বছরে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নানা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—সৃষ্টিশীল সাহিত্য আন্দোলনের পথ কখনো সুনির্দিষ্ট ও সোজা হয় না—এই আন্দোলনের পথ নানাভাবে বেঁকেচুরে এগোচ্ছে। কিন্তু এখনও কোনো চোরাগলিতে এই আন্দোলনকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে চোরাগলিতে একে ঢোকাবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু আভ্যন্তরীন ঘাত-প্রতিঘাতে সে চেষ্টা সফল হয়নি। কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে সরে গেছে, কেউ প্রতিষ্ঠানের প্রচণ্ড চাপে ভেঙে গেছে। বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে এই আন্দোলন যে ভয়ংকর ঝড়ের সৃষ্টি করেছিল, তাতে এরকম ঘটনা না ঘটলেই বিস্মিত হতে হতো। বাংলা সাহিত্যে তো হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ছাড়া কোনো সাহিত্য আন্দোলনই হয়নি। কল্লোল বা কৃত্তিবাস কোনো অর্থেই সাহিত্য আন্দোলন ছিল না। কিছু কবি বা লেখক এইসব পত্রিকা কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিলেন বটে কিন্তু সাহিত্যের কোনো নূতন পথ তারা কাটতে পারেননি। জীবনানন্দ দাশ ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে বিনয় মজুমদার কোনো আন্দোলনের ফল হিসাবে বেরিয়ে আসেননি। সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে একেবারে উপরতলার ব্যালকনিতে ঢুকে পড়তে উপরোক্ত পত্রিকা দুটিকে কেন্দ্র করা মূল নায়কদের কোনোই অসুবিধা হয়নি। তারা কিছু লিখতে চেয়েছিলেন—এবং চেয়েছিলেন নগদ বিদায়। তাছাড়া দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও এদের বিশেষ সচেতনতা পাওয়া যায় না। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষার তরুন কবি-লেখকদের জাগিয়ে তুলেছিল। গোটা দেশের উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও প্রচার মাধ্যমগুলি দারুনভাবে রিঅ্যাক্ট করতে বাধ্য হয়েছিল। বোঝা যায় ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতটাকে এই আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে, যা আগে কেউ সচেতনভাবে করতে পারেনি। বর্হির্বিশ্বে, ইংরাজি, আমেরিকান, ফরাসি, জার্মান, ল্যাটিন আমেরিকান ও অস্ট্রেলীয় সাহিত্য জগতে এই আন্দোলন গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভে বহির্বিশ্বে বাংলা সাহিত্যের পরিচিতির পর—হাংরি জেনারেশন আন্দোলনই সারা পৃথিবীর সামনে বাংলা সাহিত্যকে আবার তুলে ধরে। আগেই বলেছি পরিপ্রেক্ষিত ভারতীয়—যেখানে যেকোনো নতুন চিন্তাকে সমূলে বিনাশ করাই একমাত্র আচরিত ধর্ম—বিদেশী চিন্তাধারা কপচে এখানকার বুদ্ধিজীবীরা আধুনিক কিন্তু নিজের ঘরে চলে লক্ষ্মীপূজা

আর শনিপূজা। দু-একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্কুলমাস্টারি সাহিত্যের স্যাতস্যাতে জ্যাব-জ্যাবানিই এদের সৃষ্ট সাহিত্য। ম্যাড়ম্যাড়ে অর্থহীন শব্দ সমষ্টির মাস্টারবেশনই এদের গল্প কবিতা উপন্যাস। বাম ডান সকলের অবস্থা একইরকম। বাস্তব সম্পর্কে এদের কোনো ধারণাই নাই অথবা সেই বাস্তবের মুখোমুখী হবার ক্ষমতা নাই বলেই এরা উটপাখির মতো মুখ গুঁজে থাকা শ্রেয় মনে করে। হাজার বছরের পরাধীনতার ফলে যে হীনমন্যতার জন্ম, তারই আর্তনাদ শুনি যখন বলা হয় 'এই সাহিত্য আমাদের দেশে চলে না।' এই শ্রেণির অস্তিত্ব চরম সঙ্কটের মধ্যে নিয়ে যায় হাংরি আন্দোলন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এরা একজোট হয়ে আক্রমণে নামে। উপহাস, ঘৃণা ও প্রতিরোধ—এই তিনটি কাজের কর্তা হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো মূল্যই থাকে না। এরা কেবলই আশা করে যাচ্ছে এই ১৫/১৬ বছর ধরে, যে হাংরিরা খতম হয়ে যাবে কিন্তু এদের সে সুখের সময় আসছে না। বড়োই দুঃখের ব্যাপার। অনেকে আবার বলতে শুরু করেছে আজ এই ঝড়ের দাপট আর কতটা অবশিষ্ট আছে? কালবৈশাখি কি সারাদিন, সারাসপ্তাহ ধরেই চলে। কয়েকটা ঝাপটাতেই সব ওলটপালট হয়ে যায় না কি? হাংরি আন্দোলনের ধাক্কায় ড্রইংরুমের চালচিত্রগুলি সব যে ওলটপালট এ সত্য আজ ঢাকা যাবে কি?

প্রথম কয়েক বছরের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখেই এই আন্দোলনকে পুরোপুরি আণ্ডাগ্রাউন্ড আন্দোলনের রূপ নিতে হয়। চোরাস্রোতের মতো বয়ে চলেছে এই আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর পাঠক ও সমর্থক সংখ্যা। এই চরিত্র অনেকেই বুঝতে পারেনি—তারা ভেবেছে এরা মৃত বা মৃতপ্রায়—একসময় যেসব প্রতিষ্ঠানের উপর হাংরিরা সরাসরি আক্রমণ করেছে এখন আর তা করে না কারণ কোনো প্রতীকী কাজ দুবার করার অর্থই হলো সেই প্রতীককে বিনাশ করা। জন্মের পর থেকেই সমাজ ও সাহিত্যের বাম ডান সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিপালিত ধ্যানধারণার ও তার বাহকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে হাংরিদের—আর এই লড়াই করতে করতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এর আন্ডারগ্রাউন্ড চরিত্র। বাংলা তথা ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপটে আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য ছাড়া কোনো সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বাঁচার সম্ভাবনা নাই। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সব অঙ্কুরকেই এই প্রতিষ্ঠান হয় গ্রাস করেছে না হয় উপেক্ষা ও নিষ্পেষণে ধ্বংস করেছে।

হাংরি জেনারেশনের জন্মের মধ্যেই আন্ডারগ্রাউন্ড চরিত্রের বীজ নিহিত ছিল তাই অতি দ্রুত পুরানোপন্থীরা সমবেত হয়ে (ভারতীয় লেখক সম্মেলন, সিমলা) ঘোষণা করেন ভারতবর্ষে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য নাই।। এরা ভয় পায় আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্যকে—এই আন্দোলন যে তাদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেবে তা তারা জানতেন। গেরিলা বিপ্লবীদের যেমন প্রতিষ্ঠিত সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চক্র ভয় পায়, আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্যকেও ভয় পায় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান।

হাংরি জেনারেশন কেন আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলন? ভারতীয় সমাজের জড় চেতনাকে এই আন্দোলন প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। এই সমাজ ও রাজনীতি চক্রের সংস্কৃতিপনার শোষণ, দমন, পীড়ন—মনের স্বাধীন বিকাশকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া—এর বিরুদ্ধে অর্থাৎ ভয়ংকর অজগরের মতো প্রতিষ্ঠানটিকে প্রচণ্ড আঘাত হানার সাহস ও শক্তি এই আন্দোলনকারীদের ছিল। আঘাত খেয়েই অজগরটি তেড়ে আসতে থাকে—আঘাতের মাত্রা বাড়লে নিজের দালালদের দিয়ে প্রতিরোধ তুলতে শুরু করে। তখনই এই আন্দোলনকেও পথ ও চরিত্র পরিবর্তন করতে হয়। মনে রাখা দরকার প্রতিষ্ঠানই হলো সমাজের চালিকাশক্তি তাই আঘাতটা পড়েছিল এরই মাথায়। সমাজের উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাই এই মাথা। তাই আঘাত পড়ে তাদের চিন্তা,

সংস্কার, সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা ও লোভের উপর। শত শত বছরের লালিত ধারণাগুলি এই সম্প্রদায়ই টিকিয়ে রাখে। আমি জানি কেউ কেউ বলে এত বড়ো সমাজের কি পরিবর্তন হাংরিরা করতে পেরেছে—সমাজ শরীরের পরিবর্তন করার জন্য যোগ্য লোক রয়েছে—আমাদের কাজ সমাজের বিকৃত মাথাটাকে আক্রমণ করা এবং তাকে রিঅ্যাক্ট করানো। এবং এই কাজ হাংরিরা এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত সুচারুভাবেই সম্পন্ন করেছে। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াগুলি খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, পৃথিবীতে কটা আন্দোলন এরকম ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছে—সংখ্যায় তারা এক বা দুইয়ের বেশি নয়।

রাজনৈতিক ধান্দাবাজ, যৌনশোষণকারী, সাংস্কৃতিক ফড়ে—সকলের উপরই আণ্ডার গ্রাউন্ড সাহিত্য তীব্র আঘাত করে—এদের প্রতিষ্ঠানের কাছে ও কায়েমী স্বার্থের কাছে যেসব চিন্তা বিপজ্জনক ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মনে হয়, দেখা যায় আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য সেগুলিই লালন করে। এই সাহিত্যের শরীরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এতাবৎকালের সৃষ্ট সাহিত্যের চেহারার সঙ্গে তা একেবারেই মেলে না। একজন বাবুর পাশে একজন উপজাতিকে দাঁড় করালে যে পার্থক্য ধরা পড়ে—এও সেই ধরনের পার্থক্য। ভাষার শুচিবাই এই সাহিত্য ত্যাগ করে বলেই এই সাহিত্য প্রাতিষ্ঠানিক ভদ্রলোকদের বমির উদ্রেক করে। শরৎবাবুর পুত্র-পৌত্ররা বাংলা গদ্যসাহিত্যের বাজার রমরমা করে রেখেছে, নতুন গদ্যেরও তাই এই আণ্ডার-গ্রাউন্ড ছাড়া বাঁচবার পথ নাই। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সবগুলি শর্তকেই পূরণ করে বলেই এই আন্দোলন ভারতীয় সাহিত্যের এখনও অবধি প্রথম এবং একমাত্র আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলন। যার সঙ্গে কলেজ ইউনিভার্সিটি এবং খবরের কাগজের পয়দা করা সাহিত্যের পার্থক্য সুমেরু-কুমেরু। জন্মকালেই এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার বিরাট চক্রান্ত হয়েছিল এইজন্যই।

আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্যের আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—তা সবদিক দিয়েই হবে পজিটিভ। না হলে সে বাঁচতে পারে না। যা অস্তিত্বকে রক্ষা করতে চায় কেবল তাই জীবনের সায় পায়—নঙর্থক চিন্তা এর বিরোধীতা করে। হাংরি সাহিত্য পুরোপুরি পজিটিভ—না হলে এতবড়ো চাপ ও প্রতিক্রিয়ার মুখে তা এতদিনে মুছে যেত। কেবল যারা ন্যাকা আর ধূর্ত তারাই এর মধ্যে নিগেটিভ টেন্ডেনসি খুঁজে পায়—হয় তারা সাহিত্যের কিছুই বোঝে না, না হয় তারাই প্রতিষ্ঠানের মুখোশপরা মুখ।

জীবনের উৎসমুখগুলি যখন বন্ধ হয়ে আসে তখন প্রকৃত সাহিত্য আন্দোলন সেই উৎসমুখগুলি আবার খুলে দিতে চায়—এখানেই শুরু হয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তার যুদ্ধ। মানুষের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জীবনের আনন্দ—নতুন সাহিত্য এই দুটি জিনিসই এনে দেবে—প্রথম বসন্ত বাতাসের মতো—এই তার শর্ত।

শৈলেশ্বর ঘোষ

অরুণেশ ঘোষ

সাক্ষাৎকার ঃ শঙ্খ ঘোষ

[কিছুদিন থেকেই আমরা কয়েকজন নামী লেখক/কবির সাক্ষাৎকার নেবার চেষ্টা করছি—যে তিন চার জনকে বাছা হয়েছিল, তারা কেউ সরাসরি অস্বীকার করে, কেউ এড়িয়ে যায়। সন্দেহ হয়, এভাবে হাংরিদের সঙ্গে পরোক্ষে জড়িয়ে পড়লে তাদের পসারের ক্ষতি হতে পারে এই ভয়ে। আমি উত্তর বাংলার এক ছোটো শহরে থাকি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় আসা। শঙ্খ ঘোষের কথা হঠাৎই আমার মনে আসে। হতে পারে ক্ষুধার্তের একটি সংখ্যায় ওনার লেখা প্রচণ্ড গোলমাল সৃষ্টি করে—ভিতরে ও বাইরে—ওনার অনেক মতামতের সঙ্গে আমি একমত না হলেও ওনার সাহস আমার ভালো লেগেছিল। এও দেখেছি কিছু কিছু কবি/লেখক আক্রান্ত হতে ভালোবাসে—হাংরিদের মধ্যে বিশেষ করে এটা দেখা যায়। তাছাড়া ক্ষুধার্ত-২ এর তাণ্ডব-এর পর হয়তো শঙ্খবাবুর কিছু বলার জমা আছে—এরকম চিন্তাও এই সাক্ষাৎকারের পেছনে কাজ করেছে কিছুটা।

উনি প্রত্যক্ষ কোনো সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সেবা করছেন না অথচ প্রতিষ্ঠানকে সজাগ করে রেখেছেন তাঁর সম্পর্কে-এটা আমাকে চমৎকৃত করে। ওনার একটা সাক্ষাৎকার নেবার কৌতূহলও বাড়তে থাকে। ইচ্ছে হয় এমন কতকগুলি প্রশ্ন করার যার উত্তরে আধুনিক সাহিত্যের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। অন্য কিছু কিছু সাক্ষাৎকার দেখেছি সেখানে এড়িয়ে যাওয়াটাই চোখে পড়েছে আর কানে লেগেছে ফ্যাসফ্যাসে গলার কাঁপুনি। এরকম সাক্ষাৎকার আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি নিজেও কবিতা লিখি ফলে আর একজন কবিকে, বিশেষ করে একজন আধুনিককালের কবি যিনি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেননি, পরখ করতে চেয়েছি। তাঁর প্রচুর পাঠক। হয়তো রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক বলেই তাঁর পাঠকদের অনেকে তাকে ভুলভাবে রবীন্দ্রধারার কবি বলে মনে করে। আমি চেয়েছি আমার প্রশ্নগুলির জবাবে উনি ওনার নিজের ও সমস্ত বাংলা সাহিত্যের উপর বোধ ও বুদ্ধির আলো ফেলবেন।]

অরুণেশ : আপনি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন এবং আজ যা লিখছেন, এই সময়ের মধ্যে কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণার কি পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?

শঙ্খ : খুব মৌলিক কোনো বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। আগে কোনো-কোনো ধারণা হয়তো অস্ফুট আর অস্পষ্ট ছিল, এখন হয়তো-বা তার কোনোটি স্ফুটতর বা স্পষ্টতর হয়েছে, এই পর্যন্ত বলা যায়। এটাও বলা যায় যে নিজের লেখার নিস্ফলতা বিষয়ে ধারণা আরো প্রবল হচ্ছে দিনে দিনে।

অরুণশে : প্রায় পঁচিশ বছর কবিতা লেখার পর আজ যথার্থ কবিতার স্বরূপ আপনার কাছে কী মনে হয়?

শঙ্খ : এক সময়ে লিখেছিলাম যে সত্যি কথা বলাই হলো কবিতার একমাত্র কাজ। যথার্থ কবিতার স্বরূপ বলতে এইটেকেই বুঝি আমি এখনও। কিন্তু সত্যি কথা যে কাকে বলে, সেই নিয়েই মুশকিল। আমাদের একটা ব্যক্তিগত সত্য আছে, সমাজের সত্য আছে, গোটা জীবনের কোনো সত্য প্রচ্ছন্ন আছে কোথাও। তিনদিক থেকে এসে কোনো-এক বিন্দুতে এদের সংঘর্ষ হয় একটা, আর সেটাই হয়ে ওঠে কবিতার সত্যের মুহূর্ত। যোগ্য কোনো ভাষা যদি হঠাৎ ছুঁতে পারে সেই মুহূর্তটিকে, একবার কিংবা বারে বারে, তার থেকেই তবে জন্ম নিতে পারে সত্যিকারের কবিতা। অল্প সময়েই হয়তো ঘটে সেটা।

অরুণেশ : কবিতা সম্পর্কে হাংরি কবিদের যে ধারণা তা আপনার কাছে কতটা সমর্থনযোগ্য?

শঙ্খ : কবিতা সম্পর্কে হাংরিদের ধারণা কতটা সমর্থনযোগ্য, তার উত্তর দেবার আগে সেই ধারণাটা নিশ্চিতভাবে বোঝা দরকার। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকারই একটি সংকলন থেকে জেনেছিলাম যে সে-ধারণার কিছুই বুঝিনি আমি। ফলে এই সমর্থন বা অসমর্থন বিষয়ে কোনো কথা বলা ঠিক হবে না।

অরুণেশ : অনেকে মনে করেন পুরস্কার লাভ প্রকৃত কবির পক্ষে ক্ষতিকর। আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে এ ব্যাপারে আপনার কী অভিজ্ঞতা?

শঙ্খ : অনেকে মনে করেন কি না জানি না, কিন্তু আমি খুবই মনে করি। মনে পড়ছে, আমার অন্যতম প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমনি একটা পুরস্কার পাবার মুহূর্তে খুশি হবার চেয়ে ভয় পেয়েছি বেশি, আর এর ঔচিত্য নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক করেছিলাম আমার বন্ধু অলোকরঞ্জনের সঙ্গে। ঘটনাক্রমে অনেক পরে যখন সে-পুরস্কারের সঙ্গে আমারও নাম যুক্ত হলো, পুরানো সেই ধারণাই জোর পেলো তখন বেশি। কেননা তখন আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম, জাল কোন্ কোন্ দিক থেকে ঘিরে ধরতে চায়। প্রতিষ্ঠান আর প্রলোভনের হাত-বাড়ানো নানা দিক থেকে এগিয়ে আসতে চায় তখন, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক না থাকলে নিজের বিষয়ে কতগুলি মূর্খ ধারণা তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেটা যে ক্ষতিকর, তাতে সন্দেহ কী।

অরুণেশ : 'এস্‌টাবলিশমেন্ট' নামে বহু ব্যবহৃত শব্দটি এখন অচল বলে আপনি মনে করেন কি না, একটু বুঝিয়ে বলুন।

শঙ্খ : বহুব্যবহৃত বলে কোনো-কোনো শব্দকে আর টেনে আনতে ইচ্ছে হয় না, সেটা সত্যি। কিন্তু তাই বলে ধারণাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না। যে-সমাজের মধ্যে আমরা টিকে আছি কোনোমতে, সেখানে এসটাবলিশমেন্ট ব্যাপারটাকে অচল ভাবব কী করে? অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

অরুণেশ : 'এসটাবলিশমেন্ট' বাংলা সাহিত্যের কোনো ক্ষতি করছে বলে কি আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : প্রতিমুহূর্তেই করছে। সাহিত্যের, সমাজের, আমাদের মূল্যবোধের, আমাদের জীবনযাপনের সামূহিক ক্ষতি করাই এসটাবলিশমেন্টের কাজ।

কিন্তু এখানে আরও একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের ভাবনায় বা আমাদের আলোচনায় লক্ষ করেছি যে খবরের কাগজকেই ধরে নেওয়া হয় এসটাবলিশমেন্ট, আর সে-কাগজও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে একটি-দুটি নামের

মধ্যে। কিন্তু সেই একটি-দুটি নামে তো নয়, শুধু কাগজেই তো নয়, প্রতিষ্ঠান তো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো। স্কুলে-কলেজে, অ্যাসেম্বলি বা রাইটার্স বিল্ডিং-এ, ট্রামে-বাসে, সর্বত্রই যে আছে এক সচল প্রতিষ্ঠান, সেকথা ভুললে চলে না।

অরুণেশ : সরাসরি কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও দেখা যায় অনেক কবি বা লেখক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সেবামূলক মনোভাব পোশণ করে এবং ধ্বংস হয়ে যায়, এটাই বা কেন হয়?

শঙ্খ : যা সচল এবং বহুল, তার প্রশ্রয় পেলে সমকালীন সফলতার সম্ভাবনা বাড়ে, এইটেই হয়তো দুর্বল মনের পক্ষে মস্ত এক আকর্ষণ। যে-কোনো শিল্পের মধ্যেই আছে এক অমান্যতা, অবাধ্যতা। প্রতিষ্ঠান চায় মান্যতা আর বাধ্যতা। তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে ভিতরে-ভিতরে এক লড়াই। দুর্বলেরা যে সে-লড়াইতে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে তো স্বাভাবিক।

অরুণেশ : দু-একজন সম্ভাবনাপূর্ণ কবি, লেখক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেই অতিদ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়—প্রতিষ্ঠানই কি তাদের ছোবড়া করে ফ্যালে, নাকি সেই কবি বা লেখকই ফুরিয়ে যায়?

শঙ্খ : রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে একটি দরকারি সংলাপ আছে, অনেক সময়ে সেটা আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে যায়। নন্দিনীকে রাজার মনে হয়েছিল ছোট্ট একটি ঘাসের মতো, তার দিকে তিনি হাত বাড়াচ্ছেন। এর আগে কত উর্বরা ভূমি তিনি লেহন করে নিয়েছেন, কিন্তু তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, অল্প-একটু ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে তিনি পাচ্ছেন না। বোঝা যায় নন্দিনীর আগে অনেক মেয়ে এসে নিঃশেষ হয়ে গেছে এখানে। এখানে রাজার ঘর থেকে বেরুনো ছিবড়ে-হওয়া পুরুষদের বলা হয় 'রাজার এঁটো'। উচ্ছিষ্ট আর পিষ্ট এই লোকজনের প্রতিষ্ঠানে এসেও নন্দিনী নিজেকে উচ্ছিষ্ট হতে দেয়নি, এখানকার সকলের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে তার সাধ্যমতো ভাঙতেই চেয়েছে এই প্রাতিষ্ঠানিক, ছিঁড়তে চেয়েছে জাল। কাজেই, ফুরিয়ে যাওয়াই বলুন আর 'ছোবড়া' হয়ে যাওয়াই বলুন, সেটা হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে চরিত্রের উপর। আর, এক হিসেবে, বাইরের দিক থেকে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে আছি তো আমরা সবাই। আগে যেমন বলেছি, গলিত এই সমাজটাই তো সেই প্রতিষ্ঠান। ভিতরে থেকেও বাইরে থাকতে পারি কতটা, লেখক বা শিল্পীর সবসময়ের পরীক্ষাই হচ্ছে সেইটে।

অরুণেশ : আপনি কবিতায় শব্দ ব্যবহার করেন অল্প, মনে হয় প্রতিটি শব্দই সুচিন্তিত কিন্তু অনিবার্য। অন্যদিকে আমাদের কবিতায় শব্দের বহুলতা লক্ষণীয়, এমনকি শব্দের অসচেতন প্রয়োগ প্রচুর হয়ে থাকে, এটা কি কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : এ-প্রশ্নের মধ্যে দুটি ভিন্ন কথাকে আপনি প্রায় সমার্থক ভঙ্গিতে ব্যবহার করছেন : শব্দের বহুলতা আর শব্দের অসচেতনতা। এর কোনোটিকেই অবশ্য আমি কবিতার পক্ষে ক্ষতিজনক বলে মনে করি না। কিন্তু কী অর্থে তা বলছি, সেটা বোধহয় একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

যে-কবিতায় অল্প শব্দেরই ব্যবহার হচ্ছে, তারও মধ্যে কোনো-কোনো শব্দকে মনে হতে পারে বাহুল্যময়। বহুলতা এখানে নিস্প্রয়োজন-বোধক। আবার

যে-কবিতায় বহু শব্দের প্রয়োগ আছে, তার প্রতিটি শব্দই হয়তো হয়ে উঠতে পারে কবিতার পক্ষে অব্যর্থ। বহুলতা এখানে কেবল পরিমাণবাচক। ঠিক তেমনি, অসচেতন কথাটিরও দুই ভিন্ন দিক আছে মনে হয়। কোনো-একটি লাইন, বা সম্পূর্ণ কোনো-একটি কবিতা কেউ হয়তো লিখে যেতে পারেন আচ্ছন্নের মতো, আর সেই মুহূর্তে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে থাকে এক অসচেতনতা। এই অর্থে অসচেতনতা কবিতার ভিতরকার জোরকে বাড়ায় বলেই মনে হয় আমার। কিন্তু যে-অসচেতনতা নিজের লেখার কোনো দায়িত্ব নিতে পারে না, সেইটেকে মনে হয় ভয়ের।

একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। অসচেতন একটা ধাক্কা না থাকলে আমি ছোটো-বড়ো কোনো কবিতাই লিখতে পারি না। আমার কবিতার 'প্রতিটি শব্দই সুচিন্তিত', এই কথাটি যদি গুণবাচক হয় তো স্বীকার করতে হবে যে সে-গুণের আমি অধিকারী নই।

অরুণেশ : প্রথম দিকে আপনার কিছু দীর্ঘ কবিতা আমরা পড়েছি, কিন্তু ক্রমশ দেখা যাচ্ছে আপনার কবিতার আকার সংক্ষিপ্ত থেকে আরও সংক্ষিপ্ত হচ্ছে—এর কারণ কী?

শঙ্খ : 'সংক্ষিপ্ত থেকে আরও সংক্ষিপ্ত' এই কথাটি বলছেন হয়তো আমার শেষ কবিতার-বইটি পড়ে। ওখানে একটা বিশেষ মেজাজের কবিতা আছে, খুবই ছোটো বলতে পারেন, আবার সব-মিলিয়ে একটিই মাত্র বড়ো কবিতা, তাও বলতে পারেন। এখন এমন-একটা সময় যে সে দাবি করে প্রবল স্রোতের মতো টানে কোনো দীর্ঘ এক কবিতা। সেইরকমই লিখতে ইচ্ছে করে আমার। পারি না বলেই ছোটো লিখি। অর্থাৎ, অসচেতনের সেই ধাক্কাটা অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলে দেয় না, যতদূর দেয় তারই মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখা সংগত মনে করি। আর তা নইলেই হয়তো মিথ্যাচরণ হবে।

অরুণেশ : বুদ্ধি, আবেগ এবং অভিজ্ঞতা—যথার্থ কবিতায় এদের কার স্থান কতটা হওয়া উচিত?

শঙ্খ : এ কি কোনো রান্নার রেসিপির মতো বলে দেওয়া যায় যে কার স্থান কতটা, কার পরিমাণ কতটা। অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখাই সম্ভব নয়, আর সে-অভিজ্ঞতাটাকে ধারণ আর প্রকাশ করবার জন্য বুদ্ধি-আবেগের যোগ্য মিলন চাই—এইটুকু শুধু বলা যায়।

অরুণেশ : আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে গত ত্রিশ বছরে লেখা বাংলা কবিতার স্থান কীরকম বলে আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : এ নিয়ে ঠিকমতো কিছু ভাবিনি কখনো। স্থান যে কীভাবে নির্দিষ্ট করা যায়, বুঝতেও পারি না সেটা। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতটাই তো আমাদের কাছে খুব অস্পষ্ট। আমাদের আধুনিকতার ধারণা বা আমাদের বিশ্বসাহিত্যের বোধ মূলত ইংরেজিভাষা আর পশ্চিমিসাহিত্য নির্ভর। কিন্তু সেইটেই তো একমাত্র জগৎ নয়। আমাদের বোধবুদ্ধিমতো বলতে পারি যে বাংলা কবিতা আজও সেন্টিমেন্টের পিছুটানে আর প্রগলভতার চোরাবালিতে থেকে-থেকেই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার নিজের লেখাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ যে-কবিতা পড়ে উজ্জীবিত বা মথিত হতে পারে, তেমন লেখাও বাংলাতে পড়েছি অনেক।

অরুণেশ : গত কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য সমেত বিশ্বসাহিত্যে কয়েকটি তীব্র এবং

বিদ্রোহী কবিতা আন্দোলন দেখা গেছে ; এসব আন্দোলনের ফলশ্রুতি কতটা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : গত কুড়ি বছর কেন, পঞ্চাশ বছর জুড়েই এদেশে-ওদেশে কবিতার আন্দোলন হয়েছে অনেক। কিন্তু এর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখি, সূচনায় যে তীব্রতা থাকে ঘোষণার, যে প্রতিশ্রুতি থাকে বিদ্রোহের, বা যে সম্ভাবনা থাকে ব্যাপক উল্লঙ্ঘনের, শেষ পর্যন্ত আর থাকে না সেই তীব্রতা, সেই প্রতিশ্রুতি, সেই সম্ভাবনা। এর সবচেয়ে বড়ো ব্যতিক্রম ছিল মনে হয় সুররিয়ালিজমের আন্দোলন, সাহিত্যে শিল্পে এইটেকেই বলা যায় এই শতাব্দীর সবচেয়ে তাৎপর্যময় আন্দোলন, যার ফল আর প্রভাব থেকে পরবর্তী প্রায় সব আন্দোলনই ঋদ্ধ হয়েছে কোনো-না-কোনো ভাবে। বাকি ছোটো লড়াইগুলির কোনো মূল্য ছিল না, তা বলি না। তবে তাদের প্রভাব খুব দূরস্থায়ী নয়।

অরুণেশ : অনেকে মনে করেন বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ফলে আজ বেশ কিছু সচেতন পাঠকের পক্ষে বাংলা সাহিত্যে জগতের প্রকৃত অবস্থা বিচার করতে সুবিধা হচ্ছে ; না হলে হয়তো ভঙ্গীসর্বস্বতাই (যারা বিদ্রোহের ভান করে) বাজার মাত করে রাখতো। আপনিও কি তাই মনে করেন?

শঙ্খ : অল্প-কিছু সচেতন পাঠক সব সময়েই থাকেন, যাঁরা বাণিজ্যিক সাহিত্যচর্চা থেকে লেখার জগৎকে আলাদা করে দেখতে জানেন। এও নিশ্চয় ঠিক যে হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন তেমন কিছু পাঠক তৈরি করেছে। কিন্তু আমায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনে হয় না যে এখনও তার পরিমাণ খুব উল্লেখযোগ্য। সে-কথাটা স্বীকার করে নিলেই বোধহয় রিয়্যালিটি-বোধের পরিচয় দেওয়া হবে।

অরুণেশ : হাংরি কবিতাকে এখনও অনেকে অশ্লীল বলে মনে করে ; আবার কেউ কেউ এদের নৈরাজ্যবাদী বলে মনে করে—এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

শঙ্খ : অশ্লীল যারা মনে করে, তারা ঠিক কবিতার বা সাহিত্যের পাঠক নয়, তারা সামাজিক লোকজন। সত্যিকারের পাঠকের কাছে এই 'অশ্লীলতা' কথাটির কোনো মানে হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপাত-শ্লীলতার মধ্যে দিয়েও বহু লেখা ব্যর্থ হয়, আপাত-অশ্লীলতার মধ্য দিয়েও বহু লেখা উত্তীর্ণ হয়। প্রশ্ন এই ব্যর্থতা আর উত্তীর্ণতার, শ্লীলতা-অশ্লীলতার নয়।

কিন্তু নৈরাজ্যবাদ বিষয়ে সে-কথা বলা যায় না। হাংরিদের ইস্তাহার যতটা লক্ষ করেছি আর তাদের কবিতা বা গদ্যের সঙ্গেও যতটুকু পরিচয় হয়েছে, তাতে মনে হয় যে তাদের চেতনায় নৈরাজ্যবাদের একটা লালন অবশ্যই আছে।

অরুণেশ : আমরা (হাংরি কবিরা), বামপন্থী কবিরা কিম্বা অন্যান্য গোষ্ঠীভূক্ত তরুণ কবিরাও আপনার প্রতি দুর্বলতা পোশণ করে, আপনি কীভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করবেন?

শঙ্খ : এই তথ্যে একটু বিস্ময় বোধ হচ্ছে। সত্যিই কি সবার আছে এই দুর্বলতা? সম্ভব নয় সেটা। যদি-বা সম্ভব হতো তার কারণ বিচার করাটা আমার কাজ হতে পারত না। অবশ্য, উলটো দিক থেকে ধরতে পারি প্রশ্নটাকে। হাংরি বা বামপন্থী বা 'অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত' অনেক তরুণ কবির প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, একই সঙ্গে সমান উন্মুখতায় আমি বুঝতে চাই এদের সকলেরই লেখা, পছন্দও করি অনেককে। এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব? জীবন বা কবিতার যে সত্যের কথা বলি, তার আছে এক

বিস্তৃত জটিল বহুমুখী রূপ, সর্বতোভাবে তাকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। এক-এক ধরনের লেখায় সেই সত্যের এক-এক অংশের বিচ্ছুরণ দেখি, যদি দেখি, আর তাই তার সব ধরনকে তুলে নিয়ে একটা মোজেইক তৈরি করে মনে মনে, সবাইকেই বুঝতে চাই তাই। এইটেই হয়তো ব্যাখ্যা।

অরুণেশ : আধুনিক জীবনে রবীন্দ্র সাহিত্যের স্থান কতটা?

শঙ্খ : জীবনের পরিকল্পনায়, জীবনের আদর্শসৃষ্টিতে, এর যে বিশেষ কোনো ভূমিকার ব্যবহার হচ্ছে তা আমার মনে হয় না। আধুনিক জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যের খুবই বড় একটা 'স্থান' চলছে কেবল প্রতিপত্তি রচনায়, ব্যবসায়িকতায়, জীবিকার্জনে। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা জানি যে রাজনৈতিক বিতর্কেও রবীন্দ্রসাহিত্যকে ব্যবহৃত হতে হয় এপাশে-ওপাশে। কিন্তু এর কোনোটাই যথার্থ সাহিত্যিক বিবেচনা নয়।

অরুণেশ : রবীন্দ্রনাথের কবিতার চাইতে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান আমাদের আকৃষ্ট করে—এটাই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

শঙ্খ : প্রশ্নের ধরনে মনে হয় যে ধরে নিচ্ছেন, আগের প্রশ্নের সঙ্গে কোনো যোগ আছে এই প্রশ্নের। কিন্তু বস্তুত এটা এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। এটা হলো শিল্প আস্বাদনের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে তাঁর কিছু গানই যে অনেকের ভালো লাগে, সেটা আমার বেশ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমাদের ভাষায় কবিতার যে সেন্টিমেন্টাল অতিকথনের বিষয়ে বলছিলাম আগে, তার প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে দুর্বল করে দেয় অনেক সময়ে। গান সেইখানে তাঁর মুক্তি। সমস্ত বাহুল্য ছেড়ে তাঁর নিজের নিভৃত জগতের সত্যের কথা গানেই সবচেয়ে সহজে বলতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ, বলতে পেরেছেন সবচেয়ে গূঢ়ভাবে। সেই সত্যের জন্য, ভাষাগত সেই সংযমের জন্য. এই গান হয়তো আপনাদের মতো আরও অনেকের প্রিয়। আর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথও জানতেন তাঁর এই ভবিষ্যতের কথা। একথা প্রায়ই বলতেন তিনি : বাঙালি তাঁর আর সবকিছু ভুলে গেলেও গানকে ভুলবে না।

অরুণেশ : হেনরি মিলার এক জায়গায় বলেছেন, অত্যন্ত মার্জিত এবং সুচারু সাহিত্যের চেয়ে অনেক সময় অমার্জিত কিন্তু সজীব রচনার গুরুত্ব অনেক বেশি, আপনিও কি তাই মনে করেন?

শঙ্খ : হ্যাঁ, আমিও তা মনে করি। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি এও মনে করি যে মার্জিত হয়েও কোনো রচনা হতে পারে সজীব। মার্জিত অজীবের চেয়ে অমার্জিত সজীব পছন্দ করি বটে, কিন্তু জীবনে বা সাহিত্যে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি মার্জিত সজীবকে।

অরুণেশ : কবিতা কি সমাজের ক্ষতি বা মঙ্গল কোনোটিই করতে পারে? করলে, কীভাবে?

শঙ্খ : এ খুব পুরানো প্রশ্ন, উত্তর দিতে গেলে একটি রচনা লিখতে হয়। ক্ষতি বা মঙ্গল দুই-ই করতে পারে কবিতা, তবে তার ক্রিয়া চলে খুবই ধীর আর অলক্ষ্য গতিতে, কেননা তার কাজ মানুষের চেতনার উপর।

অরুণেশ : গত ২০-২৫ বছর যাঁরা বাংলা ভাষার কবিতা লিখেছেন বা এখনও লিখছেন তাঁদের মধ্যে কার কার লেখা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় আপনার কাছে?

শঙ্খ : এ-রকম একটি তালিকা করা শক্ত। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকেই অনেকেরই লেখা বেশ গুরুত্বপূর্ণ লাগে আমার।

অরুণেশ : কিছুদিন আগের একটি 'রেডিয়ো টকে' শৈলেশ্বর ঘোষকে আপনি 'প্রতিবাদী' কবি হিসেবে উল্লেখ করলেন ; প্রতিবাদী কবি বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? শৈলেশ্বরকে শুধুমাত্র 'প্রতিবাদী কবি' এরকম একটা অভিধায় আবদ্ধ করা কতটা সংগত?

শঙ্খ : কোনো কবিকেই কোনো একটিমাত্র অভিধায় আবদ্ধ করা সংগত নয়, সম্ভবও নয়। শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতার পরিচয় দিতে গেলে কাউকেই আমি বলব না যে ইনি একজন প্রতিবাদী কবি। এমনকি, 'ইনি একজন হাংরি কবি' একথা বলতেও আমার ইচ্ছে হবে না। শৈলেশ্বর যে কবি, সেইটেই যথেষ্ট কথা। তাহলে কেন আমি রেডিয়ো টকে বলেছিলাম ওই শব্দ? বলেছিলাম জীবনানন্দ বিষয়ে একটি বিশেষ কথা বোঝাবার জন্যে। এইটুকু আমি সেখানে বলেছিলাম যে পরবর্তী নানা ভিন্নরুচির কবি জীবনানন্দের কবিতায় তাদের জীবনের কিছু সত্য খুঁজে পেয়েছেন। রুচিভিন্নতার সেই ঝোঁকটি বোঝাবার জন্যই শৈলেশ্বর প্রসঙ্গে ওই শব্দটির দরকার হয়েছিল সেদিন।

অরুণেশ : হেনরি মিলার বলেছেন, কবি শিল্পীদের উপর আস্থা রাখলে মানুষ এক বিশৃঙ্খল জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করবে, কিন্তু সেটা হবে এক আনন্দময় অবস্থা—এ বিষয়ে আপনার মত কী?

শঙ্খ : এ বিষয়ে আমি কী বলতে পারি? কবিশিল্পীরা সবাই যদি এক বিশৃঙ্খল জগতের আনন্দময় অভিজ্ঞতা দিতে চান পাঠককে, তবে পাঠকেরা তো তা-ই পাবেন। কিন্তু কবি শিল্পী মাত্রেই যে সেই বিশৃঙ্খল জগতের দিকে নিয়ে যেতে চাইবেন পাঠককে, তা তো নয়। অন্তত আমার তা মনে হয় না।

অরুণেশ : আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃত কবিতার জন্ম অভ্যন্তরীণ এক চূড়ান্ত ও বিশুদ্ধ নৈরাজ্য থেকে—এ বিষয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই।

শঙ্খ : এটা মনে করেন বলেই আপনারা নৈরাজ্যবাদী নামে চিহ্নিত হন। অভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত আর বিশুদ্ধ নৈরাজ্য থেকে একধরনের কবিতা লেখা হয়তো সম্ভব, যা কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কাছে নিয়ে যায় কবিকে আর তার পাঠককে। কিন্তু আগে আমি বলেছি যে বুদ্ধি আর আবেগের যোগ্য মিলন চাই আমরা কবিতায়। সেই বুদ্ধির প্রভাবকে স্বীকার করলে মনে হয় এই বিশুদ্ধ বিশৃঙ্খলার রাজ্যে আর যাওয়া যায় না। অন্তত, সেইটাকেই সবচেয়ে কাম্য বলে আমার মনে হয় না।

অরুণেশ : আপনার কবিতায় কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ছাপ পাওয়া যায় না, তবে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা মানুষের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়?

শঙ্খ : সার্বিক মুক্তি কথাটাই সত্যি কোনো মানে যদি থাকে, তাহলে এটা ঠিক যে কোনো রাজনৈতিক দর্শনের মধ্য দিয়ে সেটা পাওয়া সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মত থাকলে যে কোনো অসুবিধে আছে তা নয়, কেননা, সেই সার্বিক মুক্তির আগেও মানুষের কোনো কোনো প্রাথমিক মুক্তি দরকার, আর সন্দেহ নেই যে তেমন মুক্তির পথ তৈরি করে দিতে পারে কোনো রাজনৈতিক দর্শন। কিন্তু মতবর্তী হওয়া এক কথা, আর দলবর্তী হওয়া হলো আরেক কথা। আর এও সত্যি যে, মত থাকা মানেই এ নয় যে কবিতাকে করে তুলতে হবে সেই মতের কয়েকটি পদ্যসংস্করণ মাত্র।

কবিতায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটা অনেক সময়েই প্রতিফলিত হয় খানিকটা তির্যকভাবে, অনেকটা ভিতরের দিক থেকে তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে।

অরুণেশ : সভ্যতার যে কোনো সন্ধিক্ষণেই মানুষ বারবার প্রকৃত সাহিত্যের খোঁজ করে ; তবে কি মানুষ অসচেতনভাবেই বিশ্বাস করে যে প্রকৃত সাহিত্যই তার মুক্তির পথ নির্দেশ করবে?

শঙ্খ : কখনো কখনো একইরকম পরিবেশে কোনো সামাজিক বিপ্লব, কোনো বিদ্রোহ, আর তার পাশাপাশি কোনো বিদ্রোহী বা বৈপ্লবিক সাহিত্য দেখা গেছে। একই ধরনের কারণেই দুই সম্পৃক্ত ফল হিসেবে দেখা গেছে তাদের। কিন্তু সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত কোনো মুক্তির পথ নির্দেশ করে, এরকম বিরাট ভরসা সমাজের আছে বলে মনে হয় না। দুচারজন লোকের সে-ধারণা থাকতে পারে ঠিকই, সাহিত্যপাগল দুচারজন লোকের। কিন্তু দুচারজন লোকেই তো গোটা মানবসংসারের পরিচয় নয়। সাহিত্যে-শিল্পে মুক্তির যে বোধ প্রকাশ পায়, সমাজমনে তার কাজ হতে থাকে অনেক মন্থর চালে, অনেকদিন ধরে। দ্রুত ফলের আশা অনেক সময়েই তাই নিরাশার সৃষ্টি করে। চুয়ান্ন বছর বয়সে সার্তকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : আপনি কি বলবেন যে আপনার লেখালেখির ফলে কোথাও কিছু পালটে গেছে? উত্তরে সার্তকে বলতে হয়েছিল : এক চুলও নয়। কিন্তু তবু সময়ের একটা মূর্তি, তার চালচলন, ভবিষ্যতের দিকে তার অভিমুখিতা গড়ে তুলতে চান লেখক তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। অল্পকিছু লোকের উপর তার প্রতিক্রিয়াও হয় কিছু।

অরুণেশ : কি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বার বার কবি ও লেখকদের উপর প্রচণ্ড নিপীড়ন দেখা যায়—যদিও দুরকম রাষ্ট্রের নিপীড়নের পদ্ধতি ভিন্ন ; তবে কি সবরকম রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই কবিদের সম্পর্কে প্লেটোর উক্তিই মান্য?

শঙ্খ : প্লেটোর কথাটা এখানে তোলা বোধহয় সংগত নয়। প্লেটো যাকে সত্য বলে জানতেন, তাঁর ধারণায় সমস্ত শিল্পই হলো তার নকলেরও নকল, তাই তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কোনো শিল্পীর ভূমিকা নেই। কিন্তু সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যবহারিক এক সত্যের দিকে চূড়ান্ত ঝোঁক পড়ে বলে প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী লেখকদের সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটোর আপত্তি ছিল লেখকেরা মিথ্যে বলেন ভেবে। আর রাষ্ট্র আপত্তি করে লেখকেরা সত্যি বলেন জেনে।

অরুণেশ : কারো কারো মতে বিংশ শতাব্দীর এই গোধূলি বেলায় মানুষের নৈতিকতার সামগ্রিক পতন হয়েছে ; আমাদের মনে হয় পুরানো নৈতিক বোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং জন্ম হচ্ছে স্বাধীন মুক্ত নৈতিকতার। পুরানো নীতিবোধের জায়গায় হৃদয়ের বিশুদ্ধ আবেগ মানুষকে চালিত করবে এই আমাদের বিশ্বাস...এ ব্যাপারে আপনার কথা জানতে চাই।

শঙ্খ : নূতন এক নৈতিকতার জন্ম হবে, এবং হচ্ছেও অনেক দেশে, একথা অবশ্যই বিশ্বাস করি। কিন্তু এখানে আরও একবার বলি, 'হৃদয়ের বিশুদ্ধ আবেগ' একলা বেশিদূর নিয়ে যেতে পারে বলে মনে হয় না, এখানেও চাই বুদ্ধির সহযোগ। নৌকোয় বসে ন্যায়ের তর্ক করতে করতে পরাভূত বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিমাই গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন তাঁর রচনা, তাঁর ন্যায়ের পুঁথি। তারপর তিনি বিশুদ্ধ হৃদয়ের পথে চালনা করতে চান গোটা একটা দেশের নৈতিকতাকে। সাময়িক কিছু সুফল থাকলেও

সামগ্রিকভাবে দেশের পক্ষে তার ফল ভালো হয়েছে বলে মনে হয় না।

অরুণেশ : ভালোবাসাহীনতাই কি পৃথিবীর প্রধান অসুখ বলে মনে হয় আপনার? যদি তাই হয় তবে ভালোবাসা পুনরুদ্ধার কীভাবে হতে পারে?

শঙ্খ : একে অসুখ বলা যায়, আবার অসুখের ফলও বলা যায় হয়তো। কিন্তু পুনরুদ্ধারের কথায় মনে হয়, একদিন যেন সবার মনেই ছিল এই ভালোবাসার সহজ সঞ্চার। সমাজের ইতিহাস তো দেখায় যে কোনোদিনই ছিল না তা। সবসময়েই মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা এগিয়ে দেবার পরামর্শ দিতে হয়েছে ; যিশু বলুন, বুদ্ধ বলুন, সবাইকেই। উদ্ধারের নয়, এঁরা সকলেই চেষ্টা করেছেন এই ভালোবাসার সৃষ্টির কোনো পথ খুঁজতে। পথ কেউ কেউ বলেছেন বটে, কিন্তু কাজে লাগেনি সেটা। নিজের চেষ্টায় ভালোবাসাই ভালোবাসার পথ, এ ছাড়া আর অন্য কোনো সরল উপায়ের কথা আমি জানি না। তবে এটা মনে হয়, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সমস্যাটা কিছু কম।

অরুণেশ : হাংরিরা ঘুমন্ত সমাজকে জাগাবার জন্য নানারকম আক্রমণাত্মক কাজকর্ম করেছে (লেখালেখি ছাড়াও) আপনার কি মনে হয় এইসব কাজকর্মের দ্বারা হাংরিদের আকাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া গেছে?

শঙ্খ : লেখা ছাড়া আর ঠিক কী ধরনের কাজকর্ম? আমার ঠিক জানা নেই সেটা। ব্যক্তিগত জীবনযাপনের একটা বিশেষ ধরন তাঁদের আছে, সেটা লক্ষ করেছি। একেই কি বলেছেন কাজকর্ম? এর মধ্য দিয়ে কতকগুলি সংস্কার আর মূল্যবোধ ভেঙে দেবার চেষ্টা? আমাদের সমাজে মূল্যবোধের কিছু বদল ঘটছে অনেকদিন ধরে, ধীরে ধীরে। কিন্তু আমি মনে করি না যে তার সঙ্গে হাংরিদের লেখা বা কাজকর্মের বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে। আপনাদের এটা জানাই উচিত যে সমাজের যে-বিশাল অংশকে নিয়ে এই মূল্যবোধের সমস্যা, বা এই ঘুমের সমস্যা, সেই অংশ সাহিত্য নিয়ে খুব কমই ভাবিত হয়, হাংরিদেরও কোনো অস্তিত্ব নেই তার চেতনায়।

অরুণেশ : যদিও আমরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক নেট ওয়ার্কের মধ্যেই আছি তবুও একজন প্রকৃত কবি বা লেখক সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিলে রাজনীতি কি তাকে ধ্বংস করবে, না, নতুন কোনো দিগন্ত খুলে দিতে পারবে?

শঙ্খ : এও নির্ভর করে কবির আত্মপ্রত্যয়ের উপর, তার চরিত্রশক্তির উপর। সরাসরি রাজনীতি নিশ্চয় একজন লেখককে কোনো নূতন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দিয়েছিল। পুরানো দিকের চেয়ে এই নূতন দিক কতটা ভালো বা মন্দ, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে অবশ্য, কিন্তু ভিন্ন-একটা অভিজ্ঞতার স্বাদ তো আমরা পাচ্ছি তাতে। রাজনীতির কুক্ষিগত হওয়া যেমন দুঃখের, রাজনীতির আতঙ্কে গ্রস্ত হওয়াও কবিদের পক্ষে ততটাই দুঃখের আর লজ্জার।

অরুণেশ : শৈলেশ্বর ঘোষ সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশ, 'বাংলা সাহিত্যের ট্রাডিশনের মধ্যেই দুষ্টু ছেলে' এবং আরও মন্তব্য করেছেন, 'জীবনানন্দ ও মাণিক সম্পর্কে প্রথমে আমরা সকলেই খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছি। সার্বিক শূন্যতার সামনে অন্তত আমরা কিছুটা ভরসা পাবো এই আশা ছিল—কিন্তু খড়দুটো ধরে তো আর সমুদ্র পার হওয়া যায় না।'—এই দুটি মন্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

শঙ্খ : তরুণদের অনেকেরই কাছে অনেককিছু পাই যেমন, তেমনি পুরোনোদেরও অনেকের কাছে পেয়েছি অনেককিছু। হাংরি সম্প্রদায় বা শৈলেশ্বর যে সার্বিক শূন্যতা দেখেন আমাদের কবিতার ঐতিহ্যে, আমিও যদি তাই দেখতাম তবে তো হাংরি হতাম আমিও। বলা নিশ্চয় নিষ্প্রয়োজন যে আমি তা নাই। শূন্যতার ওই ধারণায়, ঐতিহ্য বিষয়ে ওই ধারণায়, এটা প্রায় স্বাভাবিক যে জীবনানন্দ বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়েও হাংরিদের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ফিকে হয়ে আসবে অল্পে অল্পে, তাঁদেরও মনে হবে খড়কুটো। খড়কুটো ধরে সমুদ্র পার হওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু এ-সমুদ্র এমন-এক সমুদ্র যে কখনোই কোনাভাবেই পার হওয়া যায় না তা। খানিকটা হাবুডুবু খাওয়াই হচ্ছে ভবিতব্য। হাত-পা ছোঁড়ার মধ্যে জলবিন্দুর কয়েকটি উৎক্ষেপ, সেই হচ্ছে কবিতা। পার হতে আর কে পারে? চায়ই বা কে?

আরও একটা কথা মনে রাখা ভালো। লেখাকে দিয়ে আমি যে-কাজটা করিয়ে নিতে চাই, তার কাছে আমার যা দাবি, তার সম্পূর্ণটাই যদি পেয়ে যেতাম পূর্বতন কোনো লেখকের কাছে, অর্থাৎ খড়কুটো না হয়ে যদি তাঁরা ভেলাই হতেন, তাহলে তো আমার লিখবার কোনো দরকারই হতো না আর, সেই ভেলাতেই তো ভেসে পড়তে পারতাম। আমার সময়ের ইচ্ছে পুরানো লেখকদের কারো কাছেই পুরোপুরি মিটবার নয়, প্রথম থেকে এটা বুঝে নিলে আর মনোভঙ্গের বেদনা হয় না, নিজের লেখারও একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

অরুণেশ : কিছুকাল আগে দেবেশ রায় হাংরিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই সাহিত্য আন্দোলন তত্ত্ববিশ্বের ক্ষেত্রে নকশাল পন্থার প্রথম ইঙ্গিত'—আপনার মতও কি তাই?

শঙ্খ : 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার যে-সংখ্যায় দেবেশ রায় ওই কথা লিখেছিলেন, সে-সংখ্যাতেই অনুরূপ মন্তব্য করেছিলাম আমিও, দেবেশ-নিরপেক্ষভাবেই। হ্যাঁ, এ-দুয়ের মধ্যে এখনো একটা ক্ষীণ সমান্তরাল দেখতে পাই। চিন্তার বা আদর্শের দিক থেকে নয়, পদ্ধতির দিক থেকে।

অরুণেশ : অনেক সমালোচক বলেন হাংরি সাহিত্য ভারতবর্ষে যৌন বিপ্লবের প্রেরণা দিয়েছে এবং আজ দেখাও যাচ্ছে তরুণ সমাজ পুরাতন যৌন-নৈতিকতা থেকে মুক্ত হতে চাইছে, মনে হয় এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই ভারতবর্ষ তার স্বকীয় এবং স্বাধীন যৌন চেতনার অধিকারী হবে—এ বিষয়ে আপনার বিস্তারিত মতামত জানতে পারলে ভালো হয়।

শঙ্খ : এই হলো আবার সেই বাড়িয়ে ভাববার প্রবণতা। হাংরি সাহিত্য কি সত্যি সত্যি এতদূর বিস্তারিত যে গোটা ভারতবর্ষের কোনো যৌন-বিপ্লবের প্রেরণা হতে পারবে সে? তরুণ সমাজ যে পুরানো যৌননৈতিকতা থেকে মুক্ত হতে চাইছে, সেটা খুব স্পষ্ট নয় এখনও। ছেলেমেয়েদের মেলামেশা বাড়ছে, আচরণের বাইরের ধরণ পালটাচ্ছে কিংবা ফিল্ম-থিয়েটার-উপন্যাসে আরেকটু খোলামেলা হচ্ছে যৌন-সম্পর্কগুলি, এইটুকু থেকেই নূতন নৈতিকতার বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়া যায় না। ভিতরকার মূল্যবোধে একটা অনড়তা থেকে গেছে তবু। বিশৃঙ্খল একটা আচরণে অভ্যস্ত হয় অনেকে সুযোগসন্ধানী হিসেবে। কিন্তু আচরণ আর সংস্কারের, ব্যবহার আর নৈতিকতার, মৌলিক একটা সংঘর্ষ ভিতরে থেকে যায় বলেই অল্প সময়ের

মধ্যে মানসিকভাবে চুরমারও হয়ে যায় তারা। একে ঠিক নূতন নৈতিকতা বলা চলে না।

অরুণেশ : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলেই কি মানুষের যৌনমুক্তি ঘটবে বলে আপনি মনে করেন? অথবা যৌনমুক্তি কথাটাই আপনি বিশ্বাস করেন না?

শঙ্খ : এটা মনে হয় যে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলে সমাজে নারীর ভূমিকার বদল হবে, নারীকে পুরুষ তার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করবে না আর, দূর হবে তার নির্যাতন আর অধিকারের প্রবণতা। তখন নারীপুরুষের সম্পর্ক হতে পারবে অনেক স্বাভাবিক, এবং ব্যক্তিগত রুচিবিবেচনার উপর নির্ভরশীল—এছাড়া অন্য কোনো যৌনমুক্তি বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। অর্থনৈতিক বন্ধনের মধ্যে নারীর প্রতি অসম্মান আর অত্যাচারের একটা গড়ন তৈরি হয়, তেমনি আবার যৌনমুক্তির নাম করেও যে তুলে আনা যায় আরেক ধরনের অত্যাচার, এই ভয়টা থেকেই যায়।

অরুণেশ : 'আমাদের মতে বাংলা কবিতা সবদিক দিয়েই যতটা এগিয়ে গেছে বাংলা উপন্যাস বা নাটক ততটা এগোতে পারেনি। আপনার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে কী বলে?

শঙ্খ : গল্প বা উপন্যাস বিষয়ে একথা বলতে একটু দ্বিধা বোধ হয়। এগিয়ে যাবার ধরনটা তো সব শিল্পে ঠিক একইরকম ভাবে ঘটে না। কবিতার চেয়ে অনেক বেশি বাধার মুখোমুখি হতে হয় গল্প-উপন্যাসকে সেকথা সত্যি, কিন্তু সেখানে আমরা কোনোই নূতন অভিজ্ঞতা পাচ্ছি না আর, একথা ততটা সত্যি নয়।

অরুণেশ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'হাংরি সাহিত্য তৃতীয় শ্রেণির আমেরিকান সাহিত্যের অনুকরণ'—এই মন্তব্যে আমরা তো হো হো করে হেসেছিলাম—আপনিও কি হেসেছিলেন?

শঙ্খ : না, আমি হাসিনি। কোনো কথা আমার মনোমতো না হলে, এমনকি আমার একেবারে বিরুদ্ধবাদী হলেও, আমার হাসি পায় না, ভাবনা হয়। সব সময়েই এই ভয়টা আমার থেকে যায় যে সত্যের খুব কমই আমি জেনেছি, খুব অল্পই হয়তো বুঝতে পারছি আমি। তাই অন্যের ভাবনা চিন্তা শ্রদ্ধা নিয়েই জানতে চাই। আমার বিরুদ্ধেও কোনো কোনো তীব্র লেখা পড়েছি অনেক সময়ে। একথা বললে মিথ্যে বলা হবে যে তাতে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। কিন্তু রাগ হয়নি তাতে, বা উপহাস করবার কথা মনে হয়নি। বুঝতে চেয়েছি আমার বোঝানোতে বা আমার প্রকাশে কোথায় ছিল ত্রুটি, বুঝতে চেয়েছি সেই সমালোচকেরও বুঝবার ত্রুটি কোথায়। এইভাবে মনে মনে নিজের সঙ্গে মীমাংসা করে নিয়েছি নিজের। এমন নয় যে মনে মনেও সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছি সেই অভিযোগ, কিন্তু তাই বলে উড়িয়ে দিতে বা এড়িয়ে যেতে চাইনি তাকে।

হাংরি জেনারেশন বিষয়ে সুনীলের ওই মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই, সেটা ঠিক। কিন্তু না, সেজন্য হাসিনি আমি, কষ্ট পেয়েছি।

অরুণেশ : বাংলা সাহিত্যের এমন তিনটি নাম বলুন যাদের এক্ষুনি আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া উচিত—তদ্বির করে নয়, আপনার মতো যোগ্যতার ভিত্তিতে—

শঙ্খ : কিন্তু কী করেই-বা জানলেন যে আমিও তদ্‌বির করেই পাইনি? কথাটা কী জানেন, অল্প দুচারজনেই হয়তো করে এসব কাণ্ড, কলঙ্কটা পৌঁছয় সকলের গায়ে। যাঁদের

আমরা পছন্দ করি না, তাঁরা পুরস্কৃত হলেই রাগ করে ধরে নিই যে এর মধ্যে কোনো অসাধুতা আছে। অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দই হচ্ছে যোগ্যতা-অযোগ্যতা এবং সাধুতা-অসাধুতার মাপকাঠি।

এসব পুরস্কারের তো সত্যিই তেমন-কোনো নির্দিষ্ট মান নেই, তাই যাঁরাই লিখছেন তাঁরা সকলেই এ-মুহূর্তে পেতে পারেন পুরস্কার, এই তো আমার মনে হয়। তিনটি নাম কেন?

অন্য একটি কথা এখানে তুলতে চাই। আগে বলেছিলাম, লেখক-কবিদের পক্ষে এ পুরস্কার ক্ষতিজনক। এখন বলি, গোটা সমাজেরই পক্ষে ক্ষতিকর এইসব পুরস্কার ব্যবস্থা। সেই ক্ষতির একটা দৃষ্টান্ত এই যে, আপনাদের মতো বিদ্রোহীরাও 'পুরস্কার' ভাবনাটিকে টেনে আনছেন কেবলই। এর পোশকতা করা যেমন অসংগত, একে আক্রমণ করে সময় নষ্ট করাও তেমনি নিষ্প্রয়োজন। চেতনার মধ্যে একে এতটা বেশি জায়গা দেওয়া কি ঠিক?

অরুণেশ : আপনাকে আমরা বাংলাদেশের একজন scholar বলে জানি আপনার অগাধ জ্ঞান কবিতাকে কতটা সাহায্য করে?

শঙ্খ : 'অগাধ জ্ঞান' কথাটা কি ঠাট্টাসূচক? সে যাই হোক, এটা আমাদের দেশের মস্ত এক দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে আমাকেও আপনারা কেউ কেউ scholar বলে জানেন। সত্যিকারের জ্ঞানী কাকে বলে, স্কলারশিপের সত্যি চেহারাটা যে কী, তা আমরা দেখেছি কখনো কখনো। দেখেছি বলেই জানাতে পারি যে আমি কোনো অর্থেই পণ্ডিত নই।

হতেও চাই না অবশ্য। সামান্য কিছু পড়াশুনো করতে ভালোই লাগে, কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকে অমল যে সভয়ে বলেছিল 'না পিসেমশাই, আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না, আমি পণ্ডিত হব না' সেইটেকেই সুবিধেজনক পথ হিসেবে জীবনের আদর্শ করে নিয়েছি। যদি থাকত কোনো 'অগাধ জ্ঞান', কবিতাকে তা সাহায্য করত কি না বলতে পারি না, তবে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো সাহায্য পাইনি।

অরুণেশ : একজন কবির পক্ষে সবসময় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা কি ক্ষতিকর?

শঙ্খ : বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের 'চেষ্টা' বলতে ঠিক কী বোঝায়? চেষ্টা করে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গেলে জীবনের পক্ষে সেটা কৃত্রিম হবার সম্ভাবনা, কবিতারও পক্ষে ভালো মনে হয় না সেটা। কিন্তু 'জীবনযাপনের'র মধ্যেই যদি না থাকেন কবি, তবে সেও তাঁর একরকমের ব্যর্থতা। প্রতি মুহূর্তে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চাওয়া, হতে পারা, কবিতার পক্ষে সেটা ক্ষতিজনক তো নয়ই, বরং সেটাই কবিতাকে বাঁচাতে পারে বলে আমি মনে করি।

অরুণেশ : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তরুণ ও অতিতরুণ কবিদের মধ্যে নাম-ধামের জন্য লোভ ও লালসা অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে, এরা অতিসহজেই কবি হতে চায়—এর কারণ আপনার কী মনে হয়?

শঙ্খ : সবাই জানেন, ধনতান্ত্রিক সমাজের নিশ্চিত এক নিয়ম হিসেবে সাহিত্য এখন পণ্য হয়ে গেছে। আর পণ্যের নিয়মে প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞাপন, লাভ এবং ক্ষতির বৃত্তের মধ্যেই ঘুরছে লেখার জগৎ। অনেকেই এর বাইরে দাঁড়াতে চান, কেউ কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন এর বাইরে, কিন্তু তাহলেও ওই উজ্জ্বল বৃত্তের ঘূর্ণি দ্রুত আকর্ষণ

করে সবাইকে, দ্রুত ছুঁতে চায় তারা সেই ফলটাকে। লোভ এবং মত্ততা চারদিকে ছড়ানো আছে বলে খুব স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিতভাবেই ঘটছে এটা।

অরুণেশ : কমল কুমার মজুমদারের রচনা ভবিষ্যৎ বাংলা গদ্যের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে বলে কি আপনার মনে হয়?

শঙ্খ : প্রভাবের নানারকম দিক আছে। যে-ধরনের গদ্য লিখতেন কমলকুমার, মনে হয় না যে তার থেকে বাংলা গদ্যের কোনো ধারা তৈরি হবে। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা দেখা দেন দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে। খুবই অল্প লোকে পড়তে শুরু করবে তাঁর লেখা, তার চেয়েও অল্প লোকে পড়ে শেষ করবে সেটা। কিন্তু যারা শেষ করবে, তাদের মনের উপর কমলকুমারের প্রত্যক্ষণের শক্তি বা তাঁর প্রতিমাসৃষ্টির প্রতিভার একটা প্রভাব থেকে যাবে কোথাও। অনেক পরবর্তী রচনাতেও এইভাবে কমলকুমারের একটা পরোক্ষ প্রভাব থাকা সম্ভব।

অরুণেশ : কমলকুমার মজুমদার প্রায় লেখার শুরুতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনা করে লেখা শুরু করতেন—কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে ওই লেখা পড়লে রামকৃষ্ণদেব কমলকুমারকে থাপ্পড় মারতেন?

শঙ্খ : না, একেবারেই তা মনে হয় না আমার। অপছন্দ নিশ্চয়ই করতেন রামকৃষ্ণ, কেননা তিনি কথা বলতেন সহজ ভাষায়। কমলকুমারের এই ভাষা যে মানুষের কোনো কাজে লাগবে না, একথা বোঝাবার জন্য রামকৃষ্ণ নিশ্চয় কোনো-একটা প্যারেব্‌ল্‌ বলতেন মুখে, আমরা আরও একটা অনবদ্য লৌকিক গল্প পেয়ে যেতাম তাঁর কাছ থেকে, আর, হয়তো ঈষৎ লজ্জিত হয়ে উঠে আসতেন কমলকুমার, কিংবা তিনিও শুনিয়ে দিতেন দুচারটে কথা। না, থাপ্পড় মারতেন বলে তো মনে হয় না।

অরুণেশ : সম্প্রতি কলকাতা গিয়ে আমার ধারণা হলো যে কলকাতায় সত্যিকারের কবিতা পাঠক প্রায় নেই-বা খুবই অল্প—অথচ মফঃস্বল শহরগুলোতে আমি ঘুরে দেখেছি সেখানকার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিতা পড়া ও বুঝার আগ্রহ প্রবল—আপনার অভিজ্ঞতাও কি অনুরূপ?

শঙ্খ : কলকাতায় তো আপনি অল্পই এসেছেন, আর অল্পই থেকেছেন। তার থেকেই এত বড়ো সিদ্ধান্ত করা কি ঠিক হবে? এটা ঠিক যে, কলকাতার কয়েকটা বিশেষ কেন্দ্রকে আমরা ভুল করে ধরে নিই সাহিত্যচর্চার, সাহিত্যপাঠের পীঠস্থান। সেসব জায়গায় খোলা চোখ নিয়ে ঘুরলে আপনার প্রতিক্রিয়া খুব সংগত বলেই মনে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, কলকাতারও আছে অলিগলি, কলকাতাতেও আছে শহরতলি। এমন অনেক পাঠক-পাঠিকা হঠাৎ-হঠাৎ আমি দেখেছি এই শহরেই, কবিতা যারা শরীর দিয়ে পড়ে, পড়ে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে। তারা যতদিন নামহীন ভাবে দূরে থেকে যায় ততই ভালো। এটা ঠিকই যে রুচিকেন্দ্রের অধিকারের মধ্যে চলে এলে এদের শেষ পর্যন্ত এক বোধহীন চাতুর্যের দিকে দৌড়তে হয়, পাঠকের হয় সর্বনাশ। মফঃস্বল শহরগুলিতে কেন্দ্রের এই অধিকার তুলনায় অনেকটা কম বলে সেখানকার তরুদের পড়ার আগ্রহ হয়ত বেশি, কিন্তু সে-বিষয়ে আমার তেমন কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

অরুণেশ : 'ক্ষুধার্ত' ২নং সংখ্যায় 'শব্দ আর সত্য', প্রবন্ধে যে মতামতগুলি আপনি প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে এখন আপনার ধারণা কী?

শঙ্খ : অলজ্জ ভাবেই বলতে হচ্ছে যে সেগুলি সম্পর্কে আমার ধারণার বড়ো রকমের কোনো বদল হয়নি এখনও। যে বিপদগুলির কথা মনে হয়েছিল তখন, তার কয়েকটি পরে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে সম্ভাবনার কথা বলেছিলাম, তাও মিথ্যে হয়নি শেষ পর্যন্ত। হতে পারে যে আরও কিছুদিন গেলে ওই প্রবন্ধের ভুলগুলি আমি বুঝতে পারব। অপেক্ষা করছি।

অরুণেশ : আমরা মনে করি ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর পর বাংলা চলচ্চিত্রে জীবনের নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করার ক্ষমতা এখন আর কারোরই নেই—না সত্যজিৎ রায়ের, না মৃণাল সেনের—এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

শঙ্খ : তাঁর ছবিতে ঠিক যে-জায়গায় আঘাত করতে পারতেন ঋত্বিক ঘটক, বাংলা ছবিতে এখনও পর্যন্ত সেটা যে করতে পারেননি আর কেউ, তা ঠিক। আমাদের সমসাময়িক সত্যের সঙ্গে চকিতে জীবনের একটা মৌল সত্যকে মিলিয়ে দেবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ঋত্বিকের, সেটা আর কারও ছবিতেই পাই না। ঠিক সেই জায়গাতেই ছবিকে মনে হতো কবিতার মতো। বাংলা ফিল্ম যে কবিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না, এটা বেশ দুঃখের।
তরুণতর কয়েকজন পরিচালক শুরু করেছেন তাঁদের কাজ। দেখা যাক, এঁরা কী করেন।

অরুণেশ : আপনি সারাদিনে কতক্ষণ পড়াশুনা করেন, কতক্ষণ লেখেন?

শঙ্খ : এই একটি প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে আমিও হয়তো একধরণের নৈরাজ্যপন্থী! পড়াশুনো করার বা লেখার কোনো সাময়িক হিসেব একেবারেই নেই আমার। অনেক শুনেছি যে লেখকেরা দিনের একটা বিশেষ সময় চিহ্নিত করে রাখেন লেখার জন্য, লিখতে না পারলেও নিয়মিত লেখার টেবিলে বসেন। আমার কোনো লেখার টেবিল নেই। কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাসও চলে গেছে এক লাইনও না লিখে, এমনকি একটা চিঠিও। আবার হঠাৎ, লিখতে কখনো ইচ্ছে হলে সারা দিনরাত্রি জুড়ে লিখছি, এমনও হয়। কবিতা লিখি পথে পথে, গদ্য লিখি ঘরে। কিন্তু যে-কোনো লেখাই একটানা শেষ করে তারপর থামি, বহুদিন আর লেখার সঙ্গে দেখাশোনা হয় না। গদ্যের দাবিদাররা চাপ দিতে দিতে যখন শেষ সীমায় এনে ফেলেন, ত্রস্ত আর কুণ্ঠিতভাবে তখনই কেবল লিখতে বসি অগত্যা, শুধু সেই দিনটাই আমার লেখার দিন। পড়ার অবস্থা হয়তো এর চেয়ে সামান্য একটু ভালো, কিন্তু বেশি ভালো নয়।

অরুণেশ : কোনো কোনো বই আপনার প্রিয়, যা আপনি প্রায়ই পড়েন?

শঙ্খ : না-পড়া বইয়ের সংখ্যা এখনও এত বেশি যে একই-বই প্রায়ই পড়ার বিলাসিতা করতে পারি কম। তাহলেও ফিরে ফিরে পড়ি রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি বই, বিশেষত তাঁর 'ছিন্নপত্র' আর 'গীতবিতান', আর ইউরোপীয় কয়েকজন শিল্পী আর কবির স্মৃতিকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র। বারে বারেই ঘুরতে ভালো লাগে এইসব রোমাঞ্চকর জীবনের মধ্যে।

অরুণেশ : আপনি কবি হলেও একজন সংসারী মানুষ সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনার কবি সত্তার ক্ষতি করে কি না?

শঙ্খ : যখন লিখতে পারি না কিছু, কিংবা লিখে মনের মতো হয় না একেবারেই, তখন

মনে মনে সাব্যস্ত করি যে সাংসারিকতার জন্যই ঘটল এই বিপর্যয়। সেটা যে নিজেরই কোনো অক্ষমতা বা ব্যর্থতা, তা স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না। অন্য কিছুর উপর দায় চাপিয়ে দেওয়া আমাদের মর্মগত অভ্যাস। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে কবিতা আর জীবনের সম্পর্ক বিষয়ে যেভাবে ভেবেছি আমি, তাতে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে পালাবার কোনো উপায় নেই। তাকে মেনে নিয়েই, তার চূড়ান্ত সংঘর্ষসূত্রে যে সত্তা জেগে ওঠে, তাকেই আমি কবিসত্তা বলে মনে করতে চাই।

অরুণেশ : কবিতা লেখার জন্য কি আপনি কোনো অলৌকিক প্রেরণা বা উন্মাদনার উপর নির্ভর করেন, অথবা কবিতা লেখাকে একটা সামাজিক ক্রিয়া বলে মনে করেন?

শঙ্খ : সম্ভবত আগের কোনো প্রশ্নের উত্তরে ইতিমধ্যেই বলেছি যে অসচেতন একটা আলোড়ন এসে না পৌঁছলে লিখতে পারি না আমি। একেই হয়তো প্রেরণা বলা যায়। উন্মাদনা বা অলৌকিক, এই শব্দগুলি হয়তো আমার পক্ষে একটু বেশি ভারী হয়ে যাবে। তবে এটা ঠিক যে আর পাঁচটা সামাজিক কাজকর্মের মতো কবিতা-লেখার কাজটাও ইচ্ছেমতো পরিকল্পনা নিয়ে করতে পারি না, সম্ভব নয় সেটা। কিন্তু ভিন্ন একটা অর্থে কবিতা তো সামাজিকই। চলতি একটা ভুল সামাজিকতার বিরুদ্ধে কবিতা একটা নূতন সামাজিক ক্রিয়া, সে-বিষয়ে সন্দেহ কী!

জন পাইরোজ

নাটকের ভিতরে নাটক

অনুঃ শৈলেশ্বর ঘোষ

চরিত্র : [জো ফ্লাংকি—বয়স ৫০-৬০, সমাজ পরিত্যক্তদের পোষাক; জো ফ্লাংকি জুনিয়র—বয়স ১৫-১৬, গায়ে টাইসার্ট সোয়েটার; অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যা—মাথায় কলেজ গ্র্যাজুয়েট টুপি এবং পরনে গাউন; বিশপ কানা—বয়স ৫০-৬০, গির্জার কেরানির পোষাক; জেনারেল জংগল—মিলিটারি পোষাক; অর্থলগ্নীকারী ফ্রিক—কূটনীতিকের পোষাক]

[জো এবং জো জুনিয়র হেঁটে চলেছে। তাদের সঙ্গে অর্থলগ্নীকারী ফ্রীকের দেখা।]

ফ্রিক : আহ্, একটু বোসো! চলেছে কোথায় তোমরা হে?

জো : স্বর্গে স্যার, স্বর্গে!

ফ্রিক : খানিক বোসো, সাবধান করি তোমায়,
কমিউনিস্টরা ওই পথের বড়ো এক বাধা, ওরা এই করে,
যতসব কমিউনিস্ট স্বর্গের পথ আটকায়!

জো : সদাশয়, মহানুভব—আপনি কি নিশ্চিত?
হ্যাঁ, নিশ্চিত এবং একথার সবটাই সত্যি?

ফ্রিক : তবে আর বলছি কী! শোনো মহাশয়,
একথাই কি আমি বলছিনে তোমায়?
অতএব বোসো এবং নাও বিশ্রাম,
ততক্ষণ আমি তোমায় করি সাবধান,
সেখানে কমিউনিস্টরা তোমাদের জন্য অপেক্ষমান,
তারাই হবে তোমার যথেষ্ট অনুতাপের কারণ!

[সবাই বসে।

জো জুনিয়র : অন্য পথে চলো যাই পিতা,
চলো, দেখি গিয়ে—যা আমরা দেখতে চাই
হয়তো রয়েছে আরও অনেক রাস্তা
যেগুলি চওড়া বেশি এবং মস্ত তাদের স্বাধীনতা!

ফ্রিক : না হে, না—বলি শোন আমার কথা,
সাবধান—বিপন্ন আমাদের নিরাপত্তা,

সেখানে অপেক্ষা করছে কমিউনিস্টরা
তোমার জীবন হবে শুধু তিক্ততায় ভরা!

[ফ্রিক জোর পকেট মারে। দৃশ্যটি প্রলম্বিত হয়]

জো জুনিয়র : বাবা, বাবা! কেন, কেন এই লোক
তোমার পকেট মারে?
কমিউনিস্টদের থেকে সাবধান হতে বলে
ওদিকে তোমার পকেট হাতিয়ে আসল কাজ সারে?

ফ্রিক : বিদায়, বিদায়—আমি তবে যাই—
সাবধান, ওরা কমিউনিস্ট!
হ্যাঁ, যদি তোমাদের সাহায্যের দরকার হয়,
ডেকো যত খুশি
চিৎকার করে ডেকো,
আছে পুণ্যের ঘুষি!

জো : ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, ওগো সদাশয়—
(ছেলেকে) আর তোকে বলি, এই ছেলে আমার—চুপ র
দুনিয়ার রকমসকম তুমি কিছুই বোঝো না
বুঝিস না তুই কাকে বলে হিংসার রীতি,
আয়, এখানেই আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি—
আর কিছুক্ষণ বসি তারই কথামতো—
যতক্ষণ না পাচ্ছি তাঁর কোনো বার্তা
যতক্ষণ না-কাটে কমিউনিস্ট ভীতি!

জো জুনিয়র : কিন্তু বাবা, আমার মনে হয়...

জো : চুপ! একদম কোনো কথা নয়...

[অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যা প্রবেশ করে]

অধ্যাপক : হু, সব শুনেছি আমি—কও কও—
বলি কমিউনিস্ট ঘা সম্পর্কে সাবধান হও,
এসো বন্ধু বসি, কথা বলি এ বিষয়ে, পারি যত
দেখছো না চারদিকে রয়েছে কমিউনিস্ট বিপদ!
এই আমি জানি, এই আমার বলার
যদিও তোমারা অপরিচিত আমার!

[অধ্যাপক জোর মাথার টুপি সরিয়ে মগজ বের করে নেয়]

জো জুনিয়র : বাবা, দেখতে পারছো না কি তুমি কিছুই?

অধ্যাপক : আমার এবার যেতে হয়, মহাশয়
কিন্তু সাবধান ওই কমিউনিস্ট আর তাদের ফেউ
(জো জুনিয়রকে) এর কথাগুলি ঠিক যেন কুত্তার ঘেউ ঘেউ—

জো : তবে বিদায় আপনাকে—ধন্যবাদ মহাশয়,

সযত্নে রক্ষিত হবে উপদেশ আপনার,
(ছেলেকে) ওই মূর্খের মুখর জিভ করে দেবো জড়
জানি আমি ওর ভুলের কোনো শেষ নাই!

জো জুনিয়র : কিন্তু বাবা,

জো : চুপ! বলিনি আমি তোর বয়স কম
দুনিয়ার রীতি সম্পর্কে একেবারে হাবা
কমিউনিস্টরা ছড়িয়ে দেয় ভয়ংকর পাপের বোঝা
তোর পক্ষে তা কি ধরা সোজা?

[সৈন্যাধ্যক্ষ জংগলে প্রবেশ করে]

সৈন্যাধ্যক্ষ : ঠিক ঠিক, তুমি বলেছো খাসা—
বোসো, আমি দেখাব তোমাদের
কী পাপের জন্য পরিচিত কমিউনিস্টরা
পশুসুলভ মিথ্যায় মাথাগুলি ঠাসা!

[সৈন্যাধ্যক্ষ জো'র লিঙ্গ উৎপাটিত করে নেয়]

জো জুনিয়র : বাবা, বাবা কেন চুপচাপ এই আত্মসমর্পণ করা?
দেখ তোমার পুরুষ শক্তি কেড়ে নেয় ওরা,
চলো আমরা ফিরিয়ে নিই, যা কিছু হারিয়েছে আমাদের।
চেষ্টা তো মানুষেরই কাজ—অংশ আমরা মহানিয়মের—

সৈন্যাধ্যক্ষ : মশায়, ছেলে তোমার এমন কথা বলে যেন ও কমিউনিস্টদের পয়দা
সব সময় বমি করছে যত সব মিছে কথা,
এবার যাব আমি—কিন্তু তোমায় সাবধান করি যে
ছেলেকে এবার সাবধান করো—আর বেশি যেন না দেখে চোখে,
যদি সে যত তরুণদের সাথে এসব কথা বলাবলি করে,
যদি সে আমাদের মহান সত্য নিয়ে ফেলে গুয়ের বালতিতে,
যদি সে এই চেষ্টা করে তবে তার মুখ বন্ধ হবে চিরতরে!

জো : ঠিক বলেছেন সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়—অবধান করেছি যুক্তি
নিশ্চিন্ত হোন প্রচণ্ড অত্যাচারে আমি দেবো ওর মুক্তি
যদি সে বোকামিতেই থাকতে চায় আবদ্ধ
নিশ্চিন্ত হোন—আমিই ওকে করে দেবো স্তব্ধ—
যদিও তরুণ সে—এবং আমারই ছেলে,
তবু ওর মুখ বন্ধ হবে প্রচণ্ড অত্যাচারের ফলে!

সৈন্যাধ্যক্ষ : তবে বিদায়, সাবধানে থেকো বন্ধুটি—
যাচ্ছি বটে তবু তোমাদের উপর রাখব সজাগ দৃষ্টি
যদি দেখা যায় কমিউনিস্টরা উঠছে গজিয়ে
কেটে ফেলা হবে, চারাগাছকে যেমন, দা দিয়ে কুপিয়ে।

(প্রস্থান)

জো : (ছেলেকে) এবার তোর জিভ গুটিয়ে নে, ও রে কমিউনিস্ট ঠগবাজ
নইলে তুই—শুধু তুই কেন, সকলে মরব আমরা
দেখতে পাস না, কত ভালোমানুষ—সৎ মানুষ ওরা
কাঁধে তুলে নিয়েছেন কমিউনিস্টদের ধাক্কা সামলাবার কাজ

[বিশপ কানার প্রবেশ]

বিশপ : তোমার কথা শুনেছি আমি ওগো সৎ মহাশয়
ভয় নাই, নিশ্চিন্ত হোন—এবং জানুন—নিশ্চয়
আমি আপনাদের করব রক্ষা
আসবে যখন কমিউনিস্ট ধাক্কা,
নিশ্চিন্তে আবার বসুন কিছুক্ষণ—
কিন্তু সাবধান আপনাকে কবির বারবার,
সাংঘাতিক বিপদ রয়েছে ওই রাস্তার ওপার
বৃদ্ধি ওদের, মনে রাখবেন, হাজার গুণিতক হাজার!

[বিশপ জো'র হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে নেয়]

জো জুনিয়র : আর তো দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না। এসব চুপচাপ,
মারাত্মক, বীভৎস এইসব অন্যায়—ভয়ংকর পাপ,
ঝাঁপিয়ে পড়ব তোর উপর—ওরে পাজি শয়তান
থামিয়ে দেবো সব অত্যাচার—আমি তোদের অভিশাপ!

[জো জুনিয়র বিশপকে আক্রমণ করে—লড়াইয়ের বিশপ পরাজয়ের মুখে এবং চিৎকার করে—'বাঁচাও'—তার সাহায্যে ছুটে আসে সৈন্যাধ্যক্ষ অধ্যাপক অর্থলগ্নীকারী —ছেলেটি সকলের সঙ্গে লড়াই চালাতে থাকে]

সৈন্যাধ্যক্ষ : (জো-কে) মশায়, আসুন আপনিও—সাহায্য করুন এ কাজে
অধ্যাপক : এ একজন কমিউনিস্ট, কোনো সন্দেহ নাই
অর্থলগ্নীকারী : এর ভালোর জন্যই একে ধ্বংস করা চাই
বিশপ : ঢেকে দাও একে পাপের চাদরে—

[জো লাফিয়ে উঠে তাদের সাহায্য করতে লেগে যায়। সকলে মিলে জো জুনিয়রকে হত্যা করে]

সৈন্যাধ্যক্ষ : এই নিন পুরস্কার আপনার—অনেক সাহায্য করেছেন আমাদের

[জোকে একটি মেডেল দেয়]

অর্থলগ্নীকারী : সত্যকার বিরোধী আপনি কমিউনিস্ট পুত্রের,—
বিশপ : এই ভালো ও মরেছে—জানি এ ব্যাপারে আপনিও একমত—
অধ্যাপক : আর সে ধরতে পারবে না পাপ আর অন্যায়ের পথ—
সৈন্যাধ্যক্ষ : বিদায়, বিদায়—সবকিছু সম্পন্ন হ'ল চমৎকারভাবে
অধ্যাপক : বিদায়, এই সুচারুসম্পন্ন কাজে!
অর্থলগ্নীকারী : প্রিয় মহাশয়, ঠিক, ঠিক হয়েছে এই হত্যা
বিশপ : নিহত যখন একজন কমিউনিস্ট সন্তান—হে পিতা!

[জো ছাড়া অন্যদের প্রস্থান]

পিতা জো : [মৃত সন্তানের দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে শোক সঙ্গীত গাইতে গাইতে]

ওরে আমার সন্তান কখন তুই
পড়েছিলি কমিউনিস্টদের খপ্পরে?
এইটুকু ছাড়া তোকে আর কে দূষতে পারে?
এখন মৃত তুমি—প্রিয় পুত্র আমার
দারুণ লজ্জা এলো আজ
যত দোষ ওই কমিউনিস্ট জামার!

ফালগুনী রায়

কালো দিব্যতা

তোমাদের পৃথিবীর পাশে আমার এই স্মরণোৎসব
আমার স্বেচ্ছামৃত্যুর এই গান
আমায় দিয়েছে এনে নির্বাণের মহাসম্মান

এখানে জিভ নিরপেক্ষ শব্দ দিয়েই করতে হয় সবকিছু
পুরুষাঙ্গ জেগে উঠে হয়ে ওঠে বীন
তখনি এক কালোদিব্যতা করে আক্রমণ
তার তীক্ষ্ণপ্রতিভা খরশাণ ফেটে পড়ে অট্টহাস্যে
উপহাসের গমকে গমকে ঝলসে ওঠে তার শব্দার্থ
শব্দ কি পরমব্রহ্ম—সব শব্দ?
গনিকাকবিতাপ্রেমযোনি কিম্বা ঈশ্বর অথবা নভোচারী
শ্লীল শব্দ অশ্লীল শব্দ শব্দ কি পরমব্রহ্ম?
জানি না জানি না কিছু তবু স্মৃতিদেহী শয়তান বলে চলে
শব্দ কথা বাক্য শব্দ বাক্য কথা কে কোথায় কোন উন্মাদ
আছ পাগল উদাসী উদ্ঘাটন কর এই অনৈতিহাসিক
আত্মলিপি হিচিং ফিচিং এস্তার টনাকটিং নেশাহীন
মাথার ভেতর কী সব হচ্ছে এসব শুধু স্মৃতি এসে
করে গ্রাস উন্মাদ এই বর্ণমালা তখনি সহসা
ছুরি হয়ে ওঠে তাবৎ অতীত আর ধারালো ছুরির
ওপর দিয়ে জীবনের হাঁটা দেখে থ মেরে যায় হঠযোগী

আমি থমথমে আকাশের তলায় দেখি জলের দিকে নেমে গ্যাছে সব সিঁড়ি কিছু দেখি না দেখি পাহাড়ি জলের মিঠে স্বাদে নদীগামী সামুদ্রিক ইলিশ মানুষের ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে তার রূপালি অস্তিত্ব আর যৌনতার টানে সন্দেহপ্রবণ পুরুষও নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে ভালোবাসার সঙ্গে।

আর দেখি
নাগরিক নিয়নের আলোয়
আমার একক ছায়ার পাশে

তোমার একাকী ছায়ার বদলে
আমার শরীরে এক ল্যাজ

ডারউইন থিওরি বা ফ্রয়েডের নামের বানান ভুলে আমি রাস্তা হাঁটি আমার প্রাগৈতিহাসিক পুরুষের ছায়া হাঁটে আমার পাশে তখন আর আমার মনে থাকে না অন্যকিছু মনে থাকে না আমি কাকে চিট করেছি কে মেরেছে আমার দশটাকা দুঃখকষ্টের রোজনামচা দিয়ে সাহিত্যের কথা মনে থাকে না এমনকি খোদ ভিয়েৎনাম দিবসে ভুলে যাই ভিয়েৎনাম সমস্যা

সে সময় মনে থাকে ঠিক বেলা পাঁচটার পর কলেজফেরৎ
তুমি ঘুরে বেড়াও তোমার পুরুষবন্ধু নিয়ে একা হাঁটি আমি
আর অইসব যুবকদের স্বাস্থ্যল পাছা দেখে জাগে আপশোস
ইস্ আমি কেন হলুম না সমকামী!
তোমাদের পৃথিবীর পাশে আমার এই স্বমারণোৎসব
আমার স্বেচ্ছামৃত্যুর এই গান
আমায় দিয়েছে এনে নির্বাণের মহাসম্মান

সম্মানিত আমি তবু পথ চলি
হাঁটতে হাঁটতে খুলে পড়ে হাঁটু হতে মালাইচাকি
হাঁটুগেড়ে পড়ে যাই তবু নতজানু আর হতে পারি না কারো কাছে
প্রেমের কথা ভাবলে কনকনিয়ে ওঠে দাঁতের গোড়া

অবশ্য এসব অসুখ আমি সারিয়ে ফেলতে পারবো
কেননা আগেও মানে শরীরে ল্যাজগজানো বা সমকামী
হতে না পারার আফশোষ জাগার আগেও আমি রাস্তা
হাঁটতুম একা এবং মারাত্মক আমি আসলে
মাতৃজঠর থেকে চিতা ওব্দি হেঁটে যাবার পরেও জীবনের প্রত্যাশী
আমি হাঁটতুম—হাঁটল—হেঁটে যাবো আমি হাঁটতুম
আমার মাথার ওপরে কবি ও বিজ্ঞানীর নভোমণ্ডল
আমার শিল্প ও শরীরের পাশে ট্রাফিকের তিন আলো
আমি মাতাল কবিদের সাথে গণিকাপল্লীর ভেতর
দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছি সাবিত্রীসত্যবানের কথা
আমার মাথা ফুঁড়ে জ্বলে উঠত জ্বলন্ত মোমবাতি সে সময়
ব্রহ্মতালুর ঘি জ্বলে যেত দাউদাউ চটাচট পুড়ে যেতো সব চুল

অবশ্যই আমি সম্মোহিত করে রাখতুম অন্যদের তারা শুধু আমার অপরিচ্ছন্ন জামাকাপড় ও গাঁজাটানার পর দাড়ি গোফময় মুখের রবীন্দ্রসংগীত দেখতে ও শুনতে পেতো তারা দেখত না চার্লি চ্যাপলিনের চেয়ে দক্ষ কৌতুক অভিনেতা হয়ে আমি কীরকম নিজেকে ভুলিয়ে রাখছি অহেতুক কৌতুকে কিন্তু আমি দেখতুম পুরানো গল্পের মতন আমার নিজস্ব কৌতুকের ভেতরে দুঃখ—সেই দুঃখ দেখে আমি হেসে উঠেছি হো হো শব্দে সেই শব্দে ভেঙে গিয়েছিল বুঝি

জীবনানন্দীয় ভাঁড়েদের কবিতার আসর এমনকি যেসব প্রথম পোয়াতি মৃতবৎসা হবার বেদ্‌নায় হয়েছিল মূক যেসব ব্যর্থপ্রেমিক ঠিক করেছিল তাদের হারানো প্রিয়ার যোনি চিতা হতে করে নেবে লুঠ তারাও জেগে উঠেছিল—জীবনের ভাঙাসুর তাদের হয়েছিল সহসা প্রাণবান

কিন্তু আমি হাসি থামিয়ে দিতুম
তখনি অল কোআইট ইন দি ফিউরিয়াস ফ্রন্ট
র‍্যাঁবোর প্যারিস কিম্‌বা মিলারের আমেরিকা
অনায়াসে নেমে আসে তখন খালাসিটোলায়
ওকি গংগা না জর্ডন কিমবা কলরাডো
সব কিছু মিলে মিশে হ'ত একাকার

জানা অজানার মধ্যবর্তী এলাকা থেকে কালোদিব্যতা এসে
জানাতো আমায় উইমেন্স কলেজের অনার্স ছাত্রী আর
হাড়কাটার বেশ্যার ঋতুরক্তের রঙ এক
ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে কালোদিব্যতা এসে
জানাতো আমায় সাম্যবাদীরও প্রিয়ার দরকার হাংরিদের মত
স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যবর্তী এলাকা থেকে কালোদিব্যতা এসে
জানাতো আমায় যৌনতার কাছে গেলে নারীও হয়ে ওঠে
অমৃত ধর্ম ও অধর্মের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে কালোদিব্যতা এসে
জানাতো আমায় তুমি অনন্ত তুমি আনন্দ

আজ তোমাদের পৃথিবীর পাশে আমার এই স্বমারণোৎসব
আমার স্বেচ্ছামৃত্যুর এই গান
আমায় দিয়েছে এনে নির্বাণের মহাসম্মান

মানুষের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই

না, মানুষের সঙ্গে আমার আর বিরোধ নেই কোনো—
এখন পাওনাদার দুর্ঘটনায় পড়লে তাকে নিয়ে যেতে পারি হাসপাতালে,
প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীর কাছ থেকে অনায়াসে চাইতে পারি চার্মিনার
দাড়ি গজানোর মতো অনায়াস এ জীবনে আমি
রামকৃষ্ণের কালীপ্রেমে দেখি সার্বভৌম যৌনশান্তি
বাবলিদের স্বামীপ্রেমে দেখি সার্বজনীন যৌনসুখ
একটি চটি হারিয়ে গেলে আমি কিনে ফেলি একজোড়া নতুন চপ্পল
না, মানুষের সঙ্গে আমার আর বিরোধ নাই কোনো
বোনের বুকের থেকে সরে যায় আমার অস্বস্তিময় চোখ
আমি ভাইফোঁটার দিনে হেঁটে বেড়াই বেশ্যা পাড়ায়

আমি মরে গেলে দেখতে পাবো জন্মান্তরের করিডোর
জামি জন্মাবার আগের মুহূর্তে জানতে পারিনি আমি জন্মাচ্ছি
আমি এক পরিত্রানহীন নিয়তিলিপ্ত মানুষ
আমি এক নিয়তিহীন সন্ত্রাসলিপ্ত মানুষ
আমি দেখেছি আমার ভিতরে এক কুকুর কেঁদে চলে অবিরাম
তার কুকুরীর জন্যে এক সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাসিনীর স্বেচ্ছাকৌমার্য
নষ্ট করতে ওঠে তৎপর লম্পট আর সেই লাম্পট্যের কাছে
গুঁড়ো হয়ে যায় এমনকি স্বর্গীয় প্রেম—শেষ পর্যন্ত আমি
কবিতার ভেতর ছন্দের বদলে জীবনের আনন্দ খোঁজার পক্ষপাতী
তাই জীবনের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই—
মানুষের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই।

বিজন রায়

একটি হত্যার প্রাক্কালে

সময় সকাল ৫টা কি ৬টা—আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ফালগুনী আমাকে ডাকছে। ভোরের পাখির ডাক—কীর্তনের আওয়াজ, মানুষের নড়া-চড়ার শব্দের সঙ্গে ফালগুনীর ডাক আমার কানে এসে পৌঁছল। আমি ফালগুনীর মুখোমুখি—'আমি আত্মহত্যা করতে চাই'—এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে ফালগুনীর কথা আমার সারা শরীরে প্রবেশ করল—এক হিম অনুভূতি।

চায়ের দোকানের বেঞ্চে আমি আর ফালগুনী মুখোমুখি ফালগুনী আমার কাছে গত রাত্রে দেখা দুঃস্বপ্নের জট ছাড়াচ্ছে।

আমি দুহাতে চায়ের গ্লাসের ওম্ পাবার চেষ্টা করছি। একটা গরম চায়ের গ্লাস এত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়?

'সম্ভবত আমি একটা no man'sland এ এসে পৌঁছেছি—আমি সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছি—পা দুটো অসম্ভব রকমের ভারী হয়ে গ্যাছে—আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলাম—এই অপরিচিত জায়গায় আকাশটা আমার ভয়ংকর পরিচিত মনে হলো—কতদিন ধরে দেখেছি আকাশটা—আমি আর আকাশ আজ পাশাপাশি হাঁটছি—ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে—আকাশ মানে কি অনন্ত শূন্য?—আমি আকাশের মতো বিশালতা চেয়েছিলাম।'

'দূর থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে—একটা মাংস পোড়া গন্ধ—আমি বহুকাল দূরবীন ব্যবহার করিনি—রাডারে কোনো সংকেত নেই—আমার ত্রিশূল কোথায়—ওদের হাতে কি লেজার রশ্মি—আমি আক্রমণ করতে চাই ওদের—কিন্তু আমার ত্রিশূল নেই –ধনুক নেই—এমন কি সাপ তিনটেকে ছেড়ে দিয়েছি কবে—ওই সাপগুলো আমার মস্তক, স্কন্ধ ও কটিদেশ বেষ্টন করে থাকত—আমার তৃতীয় নয়ন দিয়ে আজ আর আগুন বেরোয় না—খালি জল পড়ে আর পিঁচুটি কাটে।'

'আমি বার বার আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছি—লরা আমার খুব কাছে এগিয়ে এসেছে—বীভৎস মাংস পোড়া গন্ধটা ক্রমশ বাড়ছে—আমি বমি করে ফেল্লাম ওদের গায়ে—বমিতে রক্ত, থুতু, ফুল ও কবিতা—ওরা সযত্নে গা মুছে নিল—ওরা আমার পিঠে হাত রাখল—আমি ওদের চোখের দিকে তাকালাম—ওদের মুখে পাঁচ সিকের মুখোশ—যতো সব মাছি ; কৃমি ও শুঁয়োপোকা—শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হয়। ওরা আমাকে ঘিরে নাচছে—আমি সন্ধির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছি—আমার পা দুটো গলে যাচ্ছে—আমি শুধু হাড়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—ওরা আমাকে চলার নির্দেশ দেয়—আমি চলছি—ওরা চলছে—আমি হাড়ে ভর দিয়ে হাঁটছি—ওরা আমার কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটছে—আমরা সবাই সবাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটছি।'

'ওরা কি আমায় আকাশ দেখাবে?
শুঁয়োপোকা থেকেই তো প্রজাপতি হয়।
আমি প্রজাপতি বড়ো ভালোবাসি।'

'ফালগুনী আপনার পাটনা যাবার সময় হয়েছে—আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন—খাদ্যের প্রয়োজন—ভালোবাসার প্রয়োজন।' ফালগুনী চট করে মায়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করে। ফালগুনীর মুখে এক রহস্যময় হাসি। ফালগুনী বলল, 'উপদেশ দেবার জন্য ধন্যবাদ'।

'তবে শালা মরো—আমার বাপের কী।'

ফালগুনী হা-হা করে হেসে উঠল—আর এককাপ চা খেয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সরে পড়ার আগে ফালগুনী আমায় বলে গেল, 'Thank you, see you again.'

আমি তার পরেও অনেকক্ষণ একা বসেছিলাম চায়ের দোকানের বেঞ্চে। আমার ডান পায়ে ঝিন-ঝিন ধরে গেছে। একটা হিম অনুভূতি আমায় চেপে ধরেছে। আমি প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাসায় এলাম।

ফালগুনীর এই nightmare আজও আমায় তাড়া করে বেড়ায়

শুধুই রাধিকা নয়—

আমি আর ফালগুনী খালাসিটোলায়—ফালগুনী কম মদ খাবে বলে প্রতিশ্রুতি করেছে আমার কাছে—যথারীতি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ। আমি আর ফালগুনী বিহার রেস্টুরেন্টে—মাংস-রুটি খাবার পর আমরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে চৌরঙ্গীতে—আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। আমার একটা বস্ত্র বিপনিতে ঢুকে একটা ৯০ টাকা দামের টাই নেড়েচেড়ে দেখছি। টাইটা দেখতে ঠিক সাপের খোলসের মতো।—বিক্রেতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি—ফালগুনী টাইটার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল '১১ টাকায় হবে?'—বিক্রেতা মাইম করে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে দোকানের বাইরে যেতে হবে।

আমি আর ফালগুনী কার্জন পার্কে—ফালগুনী ঘাসের ডগা চিবোচ্ছে—আমি প্রশ্ন করলাম 'ঘাস খাচ্ছো কেন?—ও বলল 'নেশা হবে বলে'—ও ঝট করে উঠে দাঁড়ালো বলল 'একদম নেশা হয়নি চল আরও মদ খাই'—আমি বললাম 'অসম্ভব, পয়সা নেই'—ফালগুনী 'তবে জল খাই'—আমি বললাম—'সম্ভব'।

এইভাবে রাত বেড়ে গেল—আমি আর ফালগুনী তখনও ধর্মতলা চষে বেড়াচ্ছি চরম অধার্মিকের মতো—ফালগুনী আচমকা আমাকে বলল—'আমি এখন গ্র্যান্ড হোটেলে যাবো'—আমি ঈষৎ বিরক্ত বোধ করলাম—ফালগুনী চলেছে গ্র্যান্ডের দিকে দুপাশে ঝকঝকে আলো—চকমকে গাড়ি-হর্ন-ভিখিরি বাঁশিওলা—ফুটফুটে মেয়ে মানুষ ও মাংসের গন্ধ কাটিয়ে ফালগুনী আলতো পায়ে হাঁটছে ঠিক শিশুদের মতো—আমার ফালগুনীকে খুব পবিত্র মনে হলো—ফালগুনী ট্রাফিক পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলো 'গ্র্যান্ড হোটেলটা ঠিক কোন দিকে হবে?'—ট্রাফিক পুলিস আর্তনাদ করে উঠলো—'হাই যে উ দেখা যাচ্ছে, গ্র্যান্ড হোটেল ভি চিনেন না'? ফালগুনী বলল—'হাড়ে-হাড়ে চিনি'—পুলিস বলল 'কেয়া, হাড়কাটা গলি?—ফালগুনী বলল 'তোর বাপকে'।

আমি আর ফালগুনী গ্র্যান্ড হোটেলের কাছাকাছি এসে গেছি—ফালগুনী কাকে যেন খুঁজছে মনে হলো—আমি জিজ্ঞেস করার আগেই কানে ভেসে এলো কতগুলো আওয়াজ—'ওই যে পাগলা—ওই যে পাগলা আসছে—সঙ্গে আর এক জন—এই পাগলা—শোন—তুই ও

আয়—কিরে তুই আবার মদ খেয়েছিস?—তোকে না কত বললাম।'

একদল মেয়ে (রাধিকা নয়) ফালগুনীকে ঘিরে ধরেছে—তারা ফালগুনীকে প্রশ্ন করছে—কৈফিয়ত চাইছে—ধমক দিচ্ছে—ফালগুনী চুপ—আমি ততোধিক চুপ—ফালগুনী হাসছে—তারা ফালগুনীকে নখ কাটতে বলছে—দাড়ি কাটতে বলছে—নিয়মিত দাঁত মাজতে বলছে—ফালগুনী ঘাড় নাড়ছে—তাঁরা প্রতিজ্ঞা করাচ্ছে—'মা কালীর দিব্যি বল'—ফালগুনী—'মা কালীর দিব্যি'—'আর কোনোদিন মদ খাবি'?—ফালগুনী 'হ্যাঁ'—'তার মানে আবার খাবি?'—ফালগুনী 'না'—'এ্যাই তোদের ঘরে মা-বোন নেই? কিরে বল না?'—

এই আন্তরিকতা—এই আলাপন—

আমার কানে মন্দিরের সন্ধ্যারতির শব্দ হয়ে ভেসে এলো—একদল নাম না জানা পাখি আমার মাথার চারপাশে শিষ দিয়ে উড়ছে—শব্দগুলো বুকের ভেতর আপন খোপে জায়গা করে নিচ্ছে—আমি ধীরে ধীরে ধ্যানস্থ হচ্ছি—সব মিলিয়ে এক পবিত্র অনুভূতি যেন আমাদের পেয়ে বসেছে—আমরা সবাই যেন দেবতা হয়ে গেছি।

ফালগুনী নীরবতা ভাঙল—

'আচ্ছা সাবিত্রীর কী খবর?—কী? ছেলে হয়েছে? বাঃ—কী? কী? —ডান হাতে ৬টা আঙুল! অগ্রিম দাঁত! (মোট ২১টা আঙুল ও ১টা অগ্রিম কষের দাঁত নিয়ে সাবিত্রীর ছেলে হয়েছে।)—'আচ্ছা ছেলেটার নাম কী হতে পারে?'—(জনান্তিকে) ফালগুনী—''যিশু, মার্কস, হিটলার অথবা পরশুরাম অথবা নিতান্তই টনি—যাই হোক না কেন, ও অগ্রিম দাঁত ও বাড়তি আঙুল ও নখের ব্যবহারে কতখানি দক্ষ হতে পারবে—ওর দাঁতে নীল বিষ—নখে নীল বিষ—ওকি একটা মোক্ষম নীল কামড় বসাতে পাড়বে সেই সব সত্যবানদের পাছায় ও টুঁটিতে, যারা ওর মায়ের শরীরের ওপর সব সময় ঝুঁকে থাকে—ওর ডান হাতের বাড়তি আঙুলটা কি সব সময় ট্রিগারে চেপে থাকবে—সময় কি ওকে নীল হতে সাহায্য করবে—'

'ওর হাত আর দাঁত গেরিলা কায়দায় প্রস্তুত-ও নিশ্চয়ই পৃথিবীর বেশ খানিকটা জায়গা নীল করে দেবে—সেই সামগ্রিক নীল স্রোতে ধুয়ে যাবে—কুষ্ঠ, সিফিলিস, গনোরিয়া আর যত সব ভ্যাদভেদে ঘা-চামড়াগুলো সব শিশুদের চামড়ার মতো মসৃণ আর নিষ্পাপ হবে।'

'আর গর্ভপাত নয়,—জন্ম দে সাবিত্রী—জন্ম দে।

পৃথিবীটা ভরিয়ে দে তোদের এই 'অবৈধ সন্তানে'!

তোদের সন্তান—তোদের রক্তমাংসের প্রতিবাদ!'

'আমরা বাসায় ফিরবো এখন'—'কিরে চলে যাবি তোরা'? 'হেঁটে চলে যাবো'—'পয়সা দিয়ে যাস'

'কেন, আজ দেবো না,'—'তাহলে দাঁড়ি ছিঁড়ে দেবো।'

ফালগুনী আমার থেকে পাঁচটা পয়সা নিয়ে মেয়েটার হাতে তুলে দিল—একটা মেয়ে আমার কাছ থেকে দুটো সিগারেট চেয়ে নিল—মেয়েগুলো দল বেঁধে বলে উঠলো—'আর মদ খাবি না—তোর শরীরে কিছু নেই—পেট ভরে ভাত খাবি'...

আমরা হাঁটছি—একটা মেয়ে আলগা হয়ে এলো ওদের থেকে—'এ্যাই তোরা একদিন আমার ঘরে যাবি—আমি নিজে মাংস রেঁধে খাওয়াবো—এই তো ওয়েলিংটনের কাছে—একদিন সন্ধেবেলা এখানে আয়—এখান থেকে সটানে বাসায় চলে যাবো—বাজার হাট সব করা থাকবে—তুই আমাদের কত্তো পয়া'।

বাস টার্মিনার্সে আসতে আসতে শুনেছিলাম ফালগুনীর পয়া হওয়ার ঘটনাটা—

"হ্যাঁ, আমি প্রায়ই দেখতাম ওদের—একটু আড়াল থেকে—একদিন একটা মেয়ে আমাকে দেখতে পেলো—কাছে এগিয়ে এলো—জিজ্ঞাসা করলো—'কিরে কী দেখছিস?'—আমি বললুম 'তোদের দেখছি'—'দেখতে হলে পয়সা লাগে'—একটা ভঙ্গি করে বলে উঠেছিল মেয়েটা—মেয়েটা গর্ভবতী ছিলো—হ্যাঁ সাবিত্রী।

'আমি দিতে পারি—কিন্তু যা দেবো নিবি তো'?—সাবিত্রী বলল—'হ্যাঁ'—আমি পকেট থেকে পাঁচটা পয়সা তুলে দিয়েছিলাম—তারপর সে আমাকে বিদায় জানিয়েছিল।

তার বেশ কিছুদিন পরে একদিন ওই জায়গাটা অন্যমনস্কভাবে অতিক্রম করছি—পার হবার আগে সেই গর্ভবতী মেয়েটা পিছন থেকে আমার হাত ধরে হেসে বলেছিলো—'কিরে পাগলা আজ আমাদের না দেখে চলে যাচ্ছিস'—আমি হেসে বলেছিলুম—'আমি রাতে আজকাল একটু কম দেখি'—সাবিত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলো—'মিথ্যে কথা বলবি না, জিব খসে যাবে'—আচমকা আমি সাবিত্রীর মধ্যে অনেকদিন বাদে কাকে যেন দেখেছিলাম—সাবিত্রীকে দেখতে ঠিক আমার সেজদির মতো—অনেকদিন বাদে সেজদি যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—'মিথ্যে কথা বলবি না, জিব খসে যাবে'—সাবিত্রীর অস্তিত্ব আমার শরীরে প্রবেশ করলো—বহুদিন বাদে সেজদির অস্তিত্ব আমার শরীরে প্রবেশ করলো

'তুই খুব পয়া আছিস—সেদিনকে তুই পাঁচটা পয়সা দিয়ে গেলি আর তারপর পরেই তো কত খদ্দের এলো—সে দিনে আমাদের সবাইয়ের ভালো রোজগার হয়েছিল—কতদিন বাদে আমরা অনেক পয়সা পেয়েছিলাম—সত্যি তুই খুব পয়া আছিস'—এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে থামল সাবিত্রী—আমার বুকের ভেতরটা কে যেন মুচড়ে দিল—আমি দ্রুত নিশ্বাস নিতে লাগলাম—

'তুই আজও আমাদের পয়সা দিয়ে যাবি—তোর পয়সায় ভালো বউনি হবে—কিরে পাগলা দিবি তো?—'

আমি এক অদ্ভুত হাহাকারে ডুবে যাচ্ছি—

আমি মনে মনে বললাম—'যদি তাই হয় তবে কেন দেবো না? নিশ্চয়ই দেবো'

আমি মুখ খুললাম—'হ্যাঁ দেব'

তারপরে আমি জ্ঞাতসারে—অজ্ঞাতসারে বহুবার তাদের কাছে গেছি—ভালো বউনি হবার জন্য।"

আজ ফালগুনী প্রেম ও অপ্রেমের মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে ভালোবেসে ফেলে। কক্‌তোর অর্ফিউস-এর মতো মৃত্যুও ফালগুনীর কাছে দারুণ দেখতে একটা মেয়ে। নাচের পোষাকে সজ্জিত হয়ে সে ফালগুনীকে নাচতে আহ্বান জানায়। ফালগুনীর হৃদয় ও শরীর তার আহ্বানে নেচে ওঠে। ফালগুনী প্রেমে পড়ে ও সুন্দরীর সাথে তালে-তাল মিলিয়ে নেচে ওঠে।

মৃত্যু তার কাছে কামগন্ধ নিয়ে হাজির হয়—ফালগুনী যৌন সুখে মগ্ন।

মৃত্যু তার কাছে বনলতা সেনের চোখের শান্তিময় নীড় নিয়ে আসে—ফালগুনী সেই নীড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আঃ কী তৃপ্ত ফালগুনী!

সুভাষ ঘোষ

ফালগুনী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

লোকে বলে মেনে নেয়াটাই আসল, অথচ মেনে নেয়া যাচ্ছিল না—কিছুতেই মেনে নেয়া যাচ্ছিল না হাওয়ায় এই গুজব, "*ফালগুনী আর নাই*"—বা '*বিদায় ফালগুনী*'—

অথচ একটা, '*নেইতো*' কত কিই না মানব অধ্যুষিত পটে ঘটতে দেখা যায়—১ মাস রাষ্ট্র শোক, ১৫ দিন বা ১ হপ্তা—

কালো পতাকার উত্থান...জাতীয় পতাকার অবনখন...

কোন '*নেই*' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১০টা শিশু-যুবা-যক্ষ্মা হাসপাতাল বা ১০টা বিজ্ঞানাগারের নাম, স্রেফ খামখেয়ালী, বেয়ারা কোন স্কাউড্রেলের নামের আদ্য...মধ্য দিয়ে যুক্ত হতে দেখা যায়...

জানা যায় খবরের কাগজের হেডিং থেকেই, ইতিহাসের কোনো দাস মালিকের বা ব্যবসাদারের নামের স্বপক্ষে মানুষের সমর্থিত হাত উঁচু হচ্ছে...

অথচ ফালগুনী '*নেই*'-এর কোনো প্রতিক্রিয়া কোথাও দেখতে পাই না...আদ্যন্ত কবি ফালগুনীর '*নেই*'-এর প্রতিক্রিয়া...

তাই, সে 'নেই', কিছুতেই মেনে নেয়া যাচ্ছিল না...

সে গায়েব বা গুম্, সে মার্ডারড্ বা বিষপ্রয়োগে বিস্মৃতিতে...

কোনো সমর্থিত খবরও পাওয়া যায় না কাগজের এমনকি সেকেন্ড বা থার্ড পাতায়...

সে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে বা অজ্ঞাতবাসে...

S. O. S. পাঠালেও নীরব থাকে পৃথিবীময় বিস্তৃত জালের রয়টার...

নীরবতা সহ্য করতে পারি না...সে নেই অথচ আমরা আছি, আমরা এই, ধড়িবাজ, মাগীবাজ, ব্যাঙ্কবাজ, সঞ্চয়িতাবাজ, ফেরেববাজ, রাজনীতিবাজ, পলিসিবাজ, নামকাতুরে, অহংবাজ, নেশাখোর, মাংসখোর, ক্ষমতাবাজ, ফন্দীবাজরা দিব্বি Valid passport visa নিয়ে আছি—বিজয়ব্যাজ ধারণ করে চলা ফেরা করছি—মেনে নিতে পারি না হাওয়ায় ঘোষিত absence তার...

এখানে অক্সিজেনের অভাব ঘটেছে বলে সে সাময়িক কোনো হিল্স্টেশানে—এ-সবও...

দ্রুত নিরাময়যোগ্য জায়গাগুলি নক করি...মিসিংস্কোয়াড...কোন্ রেস্পনস্ পাই না...

অন্তত ৫টি হাসপাতাল বলে, 'ও-রকম কোনো রোগী নেই...প্রমিনেন্ট হয় কেবলই, 'রোগী নেই...রোগী নেই...রোগী নেই" যেন তাবৎ রোগ শেষ করে ওরা নন্...ডিসটারবড পাশা খেলায়, 'বিরক্ত করবেন না তো!"

ফোনে শ্মশান চণ্ডাল জানায়, "সে কি হিন্দু?" খাবি খাই। সত্যই কখনো জানা হয়ে ওঠেনি

তো, সে ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা হরিজন কোতলবিশারদ কোনো বর্ণ হিন্দু?

ফোন্ ছেড়ে দিই...মেনে নিতে পারি না কিছুতেই, সে নেই...শরীর থেকে তাবৎ 'বাবুজন' টেনে হিঁচড়ে, বহুদিন বাদে, টেনে হিঁচড়ে ছুঁড়ে ফেলি...

খোঁজে তার হাঁটি, হেঁটে যাই—

প্রথমেই কালীদা, গাব্বু লতিফ রামজীভাইয়ের আণ্ডারগ্রাউন্ড সার্চ করি...পাই না...

নক্ করি ব্যস্ত মহান হাফপার্টটাইম্-কবিদের মিনে করা দরজা— 'আপনার একই নৌকোর সঙ্গী, ভাই ফালগুনীর খবর কী?"

"ওরকম কোনো সঙ্গী কোনো জার্নিতেই তো ছিল না আমার! আমি ছাড়া আর ২য় ভাই নেই আমার"

আর তার কোনো ভাই নেই জেনে ফালগুনীর বাবার ছেলেদের খোঁজে যাই...

: সে কোথায় বলুন?

: সে আমাদের ছিল না, নেই, কেন এই সহি, টিপসহি বলছে না, সে আর কোনোদিন আমাদের থাকবে না,...ক্রোক্ যোগ্য আশয় বিষয় নেই এমন মানুষের খোঁজে আপনার মতো Idiot কেউ আর আমাদের বিরক্ত করুক, চাই না...

এরপর কতবার বরানগর টু সিঁথি হাঁটি...সিঁথি টু বরানগর...

ডান্‌লপ্ টু বরানগর...বরানগর টু ডান্‌লপ্....

শ্যামবাজার টু কলেজস্ট্রিট, কলেজস্ট্রিট টু শ্যামবাজার...টালা, টালাপার্ক...তার গোপন ভ্রমণগুলি চেজ করতে ভুল করি না...রাধাবাজার শোভাবাজার, সোনাপট্টি, ফলপট্টি—তাবৎ গাঁজা ভাং আফিম সম্রাটের ১-পাল্লা খোলা দোকান তচ্‌নচ্ করি...

সাইকেল অধ্যুষিত এন্টালি...

বহুকাল বাদে কফিহাউস...

এই শহরের তাবৎ

RESERVED পেচ্ছাপখানা

এক সময় অনবরত পিয়ালী পাটনা, অশোকগড়, অশোকনগর, বিষ্ণুপুর, চুঁচুড়া চন্দননগর, ত্রিপুরায়, অনবরত টেলিলিংক ঘটাই...উদয়-সূর্যের কাছে তর্পণে যুক্ত যুবকের খোঁজে বিবেকানন্দ ব্রিজে হানা দিই...

কোনো কবি কণ্ঠের খোঁজে মধ্যরাতের চৌরঙ্গী-ট্রাফিক দ্বীপে, জগন্নাথ আউটরাম ঘাটে...

তার কিশোরবাহিনীর একদার সাথী সঙ্গীদের খোঁজে যাই ও তাদের দাঁড়ি ও শ্বশুর সমৃদ্ধির কাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি...

খোঁজে তার তাবৎ বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর লো মিটার গেজ রিড করি

বাবলির কাছে গিয়ে জানি : দেখুন না, নবীন এই বডিস্, বডিস্ বক্‌লসে কি তার নাম লেখা আছে, সদ্য এই লাল শাঁখায়, শায়ায় বা এই জড়োয়ায়? আজ আমার ফুলশয্যা, কেন আপনি?

আমি পুনর্বার তার নিজস্ব বিষণ্ণ মাছিদের কাছে ফিরে যাই।

"সে এসেছিল...সে নেই"...এই গুন্‌গুন্ নিয়ে হাঁটি, একটি ধুতী-পাঞ্জাবী-চপ্পল পায়ের, মাঝখানে সিঁথির কোনো কিশোরের খোঁজে হেঁটে যাই...at random যাই আমি...

"সুভাষ! সুভাষ!" হঠাৎ পিছু ডাক এই ডাকে না কেউ...

'বিজ্ঞপ্তি'...এই শিরোণামায় হ্যান্ডবিল চারদিকে...প্রাসাদ গায়ে, পিক্/পেচ্ছাপখানায় পাবলিক স্পটে সেঁটে দিই...

বিজ্ঞপ্তি

এই পারমিসিভ সোসাইটির যে কোনো ক্রাইম ধ্বস্ত রাস্তার মাঝখানে যদি কাউকে হঠাৎই একক ফেস্টুন হাতে, "রাস্তা রোকো...রাস্তা রোকো..." এই ম্যানিফেস্টোতে দাঁড়িয়ে যেতে দেখেন, মনে রাখবেন, সে ফালগুনী...

মনে রাখবেন, শহীদ বেদীর পাশ দিয়ে যেতে থাকা মেদো মিছিল...ব্যান্ডমাস্টার সমৃদ্ধ উল্লোল যৌনকষবাহী বিবাহ মিছিল, একক বাহু আছড়ে কেউ যদি রুখে দিতে চায়, সে ফালগুনী অবশ্যই...

যদি দেখেন কখনো, কোনো পার্ক কর্ণারে শিশুর পরিণামহীন ভবিষ্যৎ ভেবে মুহ্যমান তরুণ যুবা, মনে রাখবেন, সে, সে ফালগুনী...

মানুষের গাদ শ্লেষ্মার ভেতর মানিক বাড়ুয্যের চশ্‌মার খোঁজ করছে এমন কোনো হতভাগা লক্ষ্যে যদি অবশ্যই ফালগুনী নাম কাউকে স্মরণে আনতে হবে...

স্মরণে আনতে হবে তাকেই যদি অবজারভ করেন, কেউ ছিন্নভিন্ন করছে ওই ক্রমঅগ্রসরমান নষ্ট-আত্মার টি-ভি নেট...

যদি, কখনো আপনার উচাটন মুহূর্তে শোনেন, 'বেশ্যাকে' বহিন বলছে এমন কেউ তক্ষুণি ফালগুনী বলেই তাকে শনাক্ত করবেন...

রামকৃষ্ণের শ্লীল-অশ্লীল যুক্ত ভাষার নির্বিচার ব্যবহার কবিতাপুঞ্জে যদি দেখেন কখনো, আপনার সামনে ভেসে উঠতেই হবে, পরস্পরা সূত্রে ফালগুনী নামাঙ্কিত একটি টি-ভি ফোটো...

যদি কখনো বৃক্ষাকাশে এমন সব পত পত পতাকা :

"আমি মানুষ একজন, প্রেম-পেচ্ছাপ দুটোই করতে পারি"

"...আমার মতো পিতার শরীর দেখে বুঝেছিলুম বেঁচে থাকা জরুরি আমার মা'র হতাশা দেখে বুঝেছিলুম মৃত্যুও দরকারী হতে পারে জীবনের..."

[কারো] "হাতে হ্যাভলক এলিসের বই ও জগদীশ বাবুর গীতা" যদিই তৎক্ষণাৎ তাকে arrest করুন

"মানুষ কেউ হতে চাইছে জেমস জয়েস, কেউ আলামোহন দাস"...এই ধাঁধার কী উত্তর...

"রাজহাঁস ও ফুলবিষয়ক কবিতাগুলি আমি মাংস রাঁধার জন্যেই দিয়েছিলুম উনুনে"...

নিশ্চিত স্মরণ করতে হবে, অনন্য কোনো ইপিটাফ ওসব কোনো অমোঘ তরুণের...

যদি দেখা যায় কোনো তরুণকে : প্রশংসায় নীরব, নিন্দায় অরব, ভালোবাসায় দাবি নেই, মন্দ খাবারে বিচার নেই, বন্ধুত্বে লিপ্ত, শত্রুতে নিষ্করুণ...

তাবৎ মানুষী-উৎসবে, বিবাহে, শ্মশানে, রাজদ্বারে, নামাঙ্কনে স্বমারোণোৎসব চালিয়ে যাচ্ছে...

ভাসিয়ে দিচ্ছে আপন পেচ্ছাপ তোড়ে তাবৎ সামন্ততান্ত্রিক দোষ মুদ্রাদোষ, তাহলে তৎক্ষণাৎ মনে পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দেবে ফালগুনী নামক এক কবিরই নাম...

আপন হস্তচালিত সুরে আনমনা কারোর আলোর জন্য গান বা 'বড়ো আশা করে এসেছি গো...' অবেলায় আপনার হৃদয়ের গণ্ডগোল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে...

তাহলে মিসিং স্কোয়াডে দ্রুত সংযোগ ঘটান...

সংযোগ ঘটান তাবৎ keeping-চেতনা নস্যাৎ কোরে...নষ্ট-আত্মার কেউ নন্ এ-ই প্রমাণ করতে...স্বজনের প্রতিচ্ছবি হয়তো ফিরে পেতে পারেন এই প্রত্যয়ে, মিসিং স্কোয়াড/ক্যাম্পে পা চালিয়ে আসুন...

কেননা গত ৩১ মে ১৯৮১ থেকে নিখোঁজ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না...

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে কোনো স্ত্রীলোকের শাঁখায় বা সিঁদুরে...খোরানার নষ্ট জিন্ কোডে...ব্যাঙ্ক পাশ রেকারিং বইয়ে কোনো...উইল বা দলিলে...আয় ব্যায়ের হিসাব খাতায়...

গুজব এমত ঃ

(১) ***"নষ্ট আত্মার টেলিভিসন"***...এর চিত্রলিপি নির্ম্মানের জন্য অপরাধকামী প্রেতযোনিরা তাকে খুন করেছে...

(২) সে বেঁড়ে ও খাটো মানুষ দেখলেই প্যাঁক দিতো, ফড়াসডাঙ্গার ধুতিপরা লালটুক্টুকে ঠোঁটের পান চিবোনো হৃষ্টবাবু দেখলেই প্যাঁক দিতো, "...হয় তুমি থাকবে, নয় আমরা"...এই জাগ্রত রোষ তাকে অন্ধকূপে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মুখ সিল করেছে।

(৩) ভূষি মালের কারবারী, ভি-ডির চালানদার, নপুংসক কবিতার জনয়িতা এই পৃথিবীকে ফ্রিজে মদ্যে মাংসে মেখে নিরঙ্কুশ খাবে বলে ফালগুনীকে হাড়কাঠে ফেলে নিজেদের নিরাপদ করেছে।

(৪) মাদক ও বিষ উৎপাদকের বাড়তি বিষ ও মাদকের বিশাল স্তুপ কৈশোরের এক ভোরে আকস্মিকভাবে দেখে ফেলে ফালগুনী ও তৎক্ষণাৎ হিম হয়, ঠাস্ পড়ে যায় মাটিতে, তার ভিশান্ হয়...

সে শিশু বড়ো ভালো বাসতো, সৃজনশীল প্রজন্মকে, প্রত্যেক ব্যাপারেই তার নিজস্ব স্টাইল ছিল..."অন্যেরা যখন এগিয়ে আসছে না, নিজেই যতটা পারি কসিয়ে দিই"...এই বিশ্বাসে সে দীর্ঘকাল একা কণ্ঠে বিষ ধারণ করে যাচ্ছিল, একদিন হয়তো মাত্রা খুব বেশি ধারণ করে সে নীল...

কোনো গুজব নয়, আমাদের স্বজন ও বন্ধুর প্রকৃতখবরের আশায় গ্রাহক ক্ষেত্র খোলা আমরা...সেন্সিটিভ মিটার ব্যান্ড আমাদের...

অরুণেশ ঘোষ

ফালগুনী

'জীবনানন্দ যেসব শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর চোখে দেখেছিলেন যেসব শূকরীর চিৎকার কানে শুনেছিলেন, তাদের সন্ততিরা—সন্ততির সন্ততিরা আমার চারপাশে এখন চিৎকার করছে—আমি জানিনা আমার কবিতা দিয়ে সেইসব চিৎকার থামানো যাবে কিনা'—ফালগুনীর 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসনে' পেছনের মলাটের এই লাইন কয়টি আমি বারবার পড়ি। ফালগুনীকে এক বিষণ্ন কিশোরই আমার মনে হয়, যে চারপাশের ভয়াবহ শূকর-চিৎকারের মধ্যে তার নিজস্ব স্বেচ্ছামৃত্যুর গান গেয়ে গেছে। ফালগুনীর পাঠক ছিল তারই সমসাময়িক কিছু কবি। কবিরাই জানত তাকে। ফালগুনীর মৃত্যুর মাস কয়েকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ফালগুনীর পাঠক সংখ্যা বাড়ছে। ফালগুনীর জীবন ও কবিতা কিছু কিছু তরুণ মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

অসংখ্য পদ্য লেখা হ'ল গত ত্রিশ বছরে। নামহীন যুবকেরা ভিড় করে এসেছে এখানে, সময়ের শরীরে একটা ছাপ ফেলে চলে যেতে চায় তারা। মুখ ফোলা, চোখে করুণ দৃষ্টি, গলার স্বর ভেঙে-পড়া—এরা কোনো সাহস নিয়ে আসেনি (এদের না-আছে সৃষ্টি করার ক্ষমতা, না-আছে ধ্বংস করার ক্ষমতা) উঁচু গলায় কথা বলার সাহস এদের নাই। এরা এসেছে পা রাখবার মতো সামান্য একটু জায়গা পাওয়ার জন্য, বিনীতভাবে। ফালগুনীর সাহস তাদের স্তম্ভিত করে দেয়—আজ তার মৃত্যুর পর, তার আত্মার একটি টুকরোকেও খাদ্য হিসাবে পেতে এইসব ছোটো কবিরা মুখ বাড়িয়ে আছে—

কিন্তু ওই পথে চলার সাহস ও শক্তি আছে ক'জনের?
ক'জনের ক্ষমতা আছে ওই সত্য জীবনযাপন করার?
ক'জনের ক্ষমতা আছে জীবনের ওই সত্যগুলিকে উঁচু গলায় বলার?
যদি কারো থাকে, সে এগিয়ে আসুক!

ফালগুনীর জন্যও একটি ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল। ফালগুনী তার ভূমিকাকে চিনে নিতে ভুল করেনি, এবং সে ভূমিকা পালন করে চলে গেছে। আপোশ করেনি ফালগুনী—মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ফালগুনীর মৃত্যু আমাদের আর একটা প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছে। যে আপোশও করবে না, সহসা বেছেও নেবে না মৃত্যুর পথ তাকে নিয়ে কী হবে? শুরু হবে তাকে নিয়ে অস্বস্তি, ভয় ও আতঙ্ক। উপদংশ, কুষ্ঠ ও ক্যান্সার নিয়েও যে বেঁচে থাকবে—হত্যাকারীর মতো—মাতাল ও গণিকার মতো সক্রিয় থাকবে—যাকে কোনোমতেই গিলতে পারা যাচ্ছে না, উল্টে সে-ই তার ক্ষুধার খাদ্য হিসাবে সব উদ্ভটকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

তাকেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া হবে—চিহ্নিত করা হবে মানুষের শত্রু হিসাবে?

'এটাই ফালগুনীর ঘর' (স্বকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফালগুনী রায় ও আমার ব্যক্তিগত মধ্যরাত' থেকে)

মেঝের ওপর তোষক জাতীয় কিছু একটা পাতা ছিল, তোষকের ওপর চাদরও। বালিশের মতন কিছু একটা ছিল। অবশ্য এসব আমাকে ধারণা করে নিতে হয়। আসলে যা ছিল তা হল মোজাইক করা মেঝের ওপর চার বাই নয় নয়ত ছয় বাই এগারো ফুট একখণ্ড অ-কৃত্রিম মাটি। এই পোড়ো রাজবাড়ির দোতলার একটি ঘরের মধ্যে চাষ করার পর মই দিয়ে সমান করা এক টুকরো ভুঁই, কেউ তুলে এনে পেতে দিয়েছে। আর চারকোণা ছাই রঙের একটা পাথরের টুকরো যেটাকে আমি বালিশ ভেবেছিলাম। বসে পড়ি সেই পবিত্র জমিতে। দেয়াল ঘেঁসে ৭০/৭৫ বছর আগের দুটো কব্জাবিহীন ট্রাঙ্ক, মরচে পড়া রঙটাই যার আসল রঙ। ট্রাঙ্ক দুটোর ফাঁকফোকর দিয়ে কাগজ পত্র উঁকি দিচ্ছিল। বুঝলাম, ফালগুনীর পাণ্ডুলিপি বইপত্র যা কিছু ও দুটোর গর্ভেই আছে। এ ছাড়াও ছিল, আলনার মতো একটা ব্যাপার, সেটা কিন্তু একেবারে শূন্য ও কাৎ হয়ে পড়েছিল একপাশে। সন্ন্যাসীর আলখাল্লা বা ফতুয়ার মতন কিছু ছড়ানো ছেটানো ছিল তার চারপাশে। বসেছিলাম, বসে থাকতে থাকতে আমার সিগারেটের কথা মনে পড়ে যায়। চার্মিনার ও দেশলাই দুটোই ছিল সঙ্গে, বেরও করেছিলাম পকেট থেকে কিন্তু ধরাইনি। ধরাবার সাহস হয়নি। চার্মিনার ধরিয়ে সেই ঘরের পবিত্রতা আমি নষ্ট করতে চাইনি।

সুবো আচার্য

গ্লানি

যে মানুষ দীর্ঘ নয় তার কাছে
অত্যন্ত বিনীতভাবে দাঁড়াতে হয়েছে
(দুইহাত ছটফট করেছিলো শুধু—আর কিছু নয়?)
যে মানুষ একাধিক মাগীর কাছে যৌনঋণে বাঁধা
তার কাছে শুনেছি প্রেমের অপরূপ গাথা
যে মানুষ বাজারের বেশ্যার যৌনাঙ্গের মতো কলম করেছে ব্যবহার
তার কাছে শিল্পের মারাত্মক লেকচার শুনে
চুপ করে গেছি—একেবারে ভয়াবহ চুপ
এরা প্রায় সকলেই জানে কীভাবে মাছের তেলে
মাছ ভাজা যায়—কীভাবে তা খাওয়া যায়
যে মানুষ শিল্পের প্রয়োগক্ষেত্রে কেবলই সংসারী
সুগৃহিণীর মতো নিপুণ যার ভাগবাঁটোয়ারা
তার পশ্চাৎদেশে একটি লাথি কষাবার ইচ্ছে থাকলেও
চুপ করে থেকেছি সর্বদা,
আজ সেই লাথি উড়ে আসছে আমার দিকেই—
কী করি বলতো? নিরুপায়, ধুন্দুমার আবহাওয়া
চারদিকে, চরাচর ভরে যায় রাত্রির নিঃশব্দ চিৎকারে
মনুষ্যশরীর রূপ পায় কবন্ধের, কথা বলে দীর্ণ ভাষায়
পিশাচেরা পরেছে পোশাক, জন্মান্ধের হাতে দায়িত্বভার
অর্থনীতির, উড়ে যায় অচেনা বাতাস, মনে পড়ে
অজানা নদীর কথা, চতুর্দিকে মূর্তি নয় সেতু ভাঙে
দুনিয়াফাটানো শব্দে গর্জন করতে ইচ্ছে হয়
গুম্ হয়ে যাই
চুপ হয়ে যাই
প্রকৃতিবিরুদ্ধভাবে চুপচাপ থাকি

ইতিহাস

আবার হুংকার দিয়ে উঠে এসেছে রাত্রির চাঁদ
নক্ষত্রের আভায় ভরে উঠেছে রাত্রির আকাশ
আবার পথে নেমে এসেছি আমি—
আবার রাত্রির ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছি অজানা রাত্রির দিকে
কোনোদিকে নয়, কোথাও থামি না, হাজার হাজার বছরের রাত্রি
পেরিয়ে গাঢ়তর রাত্রির দিকে দেখতে পাই রাত্রির ভিতরে
অটুট সাইনবোর্ড ও নক্ষত্র, ভিখারি ও নিস্তব্ধতা, পলাতক মানুষের
দঙ্গল ছাইভস্ম রান্না করে খাচ্ছে ফুটপাথে বসে তারপর আরও নিস্তব্ধতা,
তাজমহলের মতো জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে চাঁদ, রাত্রির শহর
যেন মারাত্মক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় ছিলা টান করে আছে
নিহত নির্বাক দৃশ্য, দৃশ্যের ভেতরে কোনো ওলোট-পালোট নেই
কেবলই অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মতো যাত্রা আছে মানুষের
কোনদিকে? কার দিক? কোন অপরূপ মর্মরের দিকে?

মনে পড়ে না কবে ঘুম থেকে জেগে ওঠে দেখেছিলাম জীবন,
বিস্ময়, রক্ত, অনির্বাণ জীবনের তীব্র উৎসব—
উৎসব, মানবপতনের শব্দহীন শব্দ, মানুষের গরিমা ও তার মূল্য,
সভ্যতার জয়ধ্বনিতে মুখর মানুষ কবে গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিলো
আবার যুদ্ধের জন্য, তারা অস্ত্র শানিয়ে পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে
দিয়েছিলো, গড়ে তুলেছিলো সৌধ, মিনার, কীর্তিস্তম্ভ
মহাপুরুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে তারা বসেছিলো সিংহাসনে

আমরা তাদেরই সন্তান, আমাদের প্রগতির কোন সনাতন
অর্থ নেই, আমাদের চাঁদ ও বিজ্ঞান নিয়ে খেলা আছে
আছে মানুষের দেহের ওপর দাঁড়িয়ে মানবতা নিয়ে চিলচিৎকার
আছে শকুনির হাড় দিয়ে পাশা খেলা, আছে পিঠ ও পেটের
আরামের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহার, আছে নারীকে মুদ্রার মতো ভেবে
নিয়ে মাংসের অপূর্ব উৎসব, আমরাই জননীকে বেশ্যা বানাই,
আমরা জীবনের মরকত ভুলে গিয়ে আপন স্বার্থের জন্য বেঁকে
গিয়ে মূল্যবোধ নষ্ট করে ফেলি—ফলে, হারানো মূল্যবোধের
জন্য হাহাকার গবেষণা করি, অতীব সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচে
অধরা ভাষায় সেমিনারে শব্দ বমি করি,
গভীর রাত্রির দিকে এগিয়ে এসেছি, সামনে উন্মুক্ত সাগর,
এইখানে কোনোদিন আমাদের বিচার হবে না
আমরা যে যার নিজস্ব মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসি

মানুষের দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা মানুষের বিরক্ত ইতিহাস
শতাব্দী ঘুমিয়ে থাকে, পরের শতাব্দীর খেলা, আরব্যরজনী যেন
এ দিনের বিরাম নেই, এই রাত্রির মৃত্যু নেই, এই পুনরুক্তির শেষ নেই,
এ এক অন্ধ ইতিহাস
এর চাকায় মানুষের রক্তমাংস লেগে আছে
এর গতিপথে ছিটকে যায় মাটি, এর শব্দে মানুষ ঘুমোয়
চক্ষুষ্মান অন্ধে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে,
সিংহীগর্ভে বীর্যপ্রেরণ করছে শেয়াল, অপমানুষে ভরে যাচ্ছে পৃথিবী
এই অদ্ভুত পৃথিবীতে বেদনার সন্তানেরা এ ওর দিকে তাকিয়ে আছে,
কথা বলছে না, তাদের ঠোঁট নড়ছে—
রাত্রের পৃথিবীতে হেঁটে যাই, আলো ও ছায়া চতুর্দিকে এত মানুষ
এরা আমারই মতো, আমি কী এদের কেউ নই, এরা তো আমারও স্বজন!
চতুর্দিকে গভীর মাটি, প্রিয় জীবন, প্রিয়তম সৌন্দর্য,
গোলাপের আভা ঠিকরে পড়ে নারীর গ্রীবায়
এত বিপুল সুন্দর, বুক টলমল করে,
মাতৃসদন থেকে মাতৃসদনে নবজাতকের জন্মমুহূর্তের বিদ্রোহ,
চতুর্দিকে এত মানুষ, প্রত্যেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের মানুষ,
বাতাস ঝাপটা মারে মুখে, কোমল বাতাস,
বহু শব্দ মনে পড়ে বহু নিস্তব্ধতা
বহু কান্না মনে পড়ে/বহু ক্রোধ
বহু মৃত্যু মনে পড়ে বহু লোভ
মানুষের পদশব্দে পৃথিবীর ঘুম ভাঙে
কোনো কোনো মানুষের কাছে জয় ও পরাজয় এক হয়ে দেখা দেয়—

রাতের সমুদ্রে

কালো অসীম, দুর্নিরীক্ষ্য কালো আভার ভেতরে
চুরমার হচ্ছে অনন্ত, নক্ষত্রহীন আকাশ, ফেনিল হাওয়ায়
জেগে উঠছে দারুণ অজানা,
হৃদয়, উন্মুক্ত হও
চক্ষু, জেগে ওঠো
মেধা, তুমি সতর্ক কুকুরের মতো তীক্ষ্ণ পাহারায় থাকো,
এই সমুদ্র সৈকতে মৃত্যুর দেবতার সাথে আমাদের দেখা হবে
তুমি জানো? হাজার বছর ধরে জিজ্ঞাসার ধারালো ব্লেড
বসে যাচ্ছে মাংসে, হাঁ-করা আকাশে কৌতুক,
ছন্দহীন জীবন ছড়িয়ে চলেছে তার রক্তমাখা বিশুদ্ধ তামাশা,

যে সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনুময় অগ্নিবিকীরণে একদিন মগজ
থেকে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত শিহরণ জেগেছিলো
আজ তাতে লেগে আছে পোড়ো হাওয়া, ছাইভস্ম
আজ চুম্বক মুছে যাচ্ছে চুম্বক থেকে
ইস্পাত থেকে ঝরে যাচ্ছে ইস্পাত
দ্যুতি নিভে যাচ্ছে দ্যুতি থেকে
আকাশের দিকে তাকালে অন্য নগরীর কথা মনে হয়,
যে নগর আমার জন্মের আগে ছিলো
যে নগর আমার মৃত্যুর পরেও থেকে যাবে
আমরা কি কোনোদিন সেই নগরে প্রবেশ করতে পারবো না?

রাতের সমুদ্র বড়ো স্তব্ধ শব্দে ভরে আছে
রাতের আকাশভরা কালো মেঘ জন্মমৃত্যুহীন
যে মানুষ জীবনের নেশা থেকে সরে এসে
এখানে দাঁড়ায় তার শরীর ভরে যায় রাতের সমুদ্রে
সৈকত নক্ষত্র ঢেউ বালি অন্ধকার উপর্যুপরি শব্দপ্রহারের
মধ্যে ধারালো প্রশ্নচিহ্নের মতো একজন নিঃসঙ্গ মানুষ
এই প্রকৃতির একটি সামান্য অংশের মতো মিশে আছে
তার বেশি নয়!
তার বেশি নয়!

শাতন

এক অদৃশ্য শুয়োর আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায়—
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন,
নির্জনতা—শুধু নির্জনতা,
মুদ্রা—শুধু মুদ্রা, কফির টেবিল, গ্রন্থ
অনর্থক কথা, কাজ, চিন্তা—জীবনের এরকম গূঢ় বিলাসিতা,
বিপুল সূর্যাস্ত, মেঘ, নীলিমায় তৈরি নারী
তার উরুর সোনা কিংবা নিতম্বের ইস্পাত টেনেছে
অন্ধ পাতালে, গুমরে ওঠে নির্জনতা,
মৃত্যুকে দুহাতে সরিয়ে উঠে আসি—সামনে শুয়োর
তার ধারালো দাঁত—পথ আটকে বেপরোয়া
সে টেনেছে অন্ধ পাতালে—শাওলা পড়া গভীর গুহায়
আলোহীন হাওয়াহীন দিনরাত্রিহীন
ঘুরেছি সেখানে একা, ঘুরেছি অনেকদূর যেখানে দারুণ তমসা

মানুষের মগজ শোলার মতো হালকা করে দেয়, দেয় গাঢ় ঘুম,
আত্মজিজ্ঞাসাহীন চক্ষুহীন ফাঁকা ঘুম, কিংবা রক্তমাখানো ক্রোধ,
রক্তের ছিটলাগা মাথার উত্তেজনা, অসম্ভব যৌনপিপাসা,
কী দারুণ রোষ, যৌনাঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে আরও কাছে টেনে আনা,
যথার্থ আঁধার, হে ক্রীড়াশীল হৃদয়, হে কুট আত্মা, হে চক্ষুষ্মান বুদ্ধি,
হে লোলুপ ইন্দ্রিয়, ওঠো, চলো,
দুহাতে সরিয়ে উঠে যাই
দুহাতে সরিয়ে উঠে যাই
চতুর্দিকে অগ্নিবৃষ্টি হয়, চোখ চিরে রক্তের ফোঁটা পড়ে
হোক, যা-কিছুই হোক, ঘনাক তমসা, সূর্য অস্ত যাক অকস্মাৎ মধ্যদুপুরে
মেঘের আড়াল থেকে দেখা দিক অরণ্যের ঝড়
আমাকে নিজের সীমার বাইরে দাঁড়াতেই হবে
আমি নিজের বাইরে দাঁড়াতে চাই
দাঁড়িয়ে দেখতে চাই আগুন বাতাস জলের গূঢ় হাসিহাসি

এসো দেখি

আকাশ চিরে দিলো তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ
নীচের সমুদ্রে আত্মবিলাপের মতো ক্ষমাহীন ঢেউ
আকাশ মুছে দিলো বিস্তৃত আকাশ
এখন সমুদ্রে শুয়েছে সমুদ্র
এখন আমি আর অন্ধকার বালি আর ঢেউ
সময় স্রোতধারা মেশে সমুদ্রে
সমুদ্রধারা মেশে অনন্তে
মৃত্যুর ছায়া পড়ে দিগন্তে, দিগন্তে দরজা নেই
দিগন্তে আদি অন্তহীন কাল—আদি অন্তহীনতার মাঝখানে একটু সময়
দাঁড়াই সমুদ্রধারায়, স্নান করি, এসো, তুমি এসো
এসো বিদায়ের আগে গান গাই হাততালি দিয়ে
এসো হাততালি গান গাই বিদায়ের
এসো শাশ্বতসূর্যের নীচে মানবগুণের সবটুকু দেখি
এসো অরণ্যপর্বতে যারা এসেছিলো সেই পূর্বমানুষের
কুঠার ছেদন দেখি প্রস্তরসভ্যতা দেখি
এসো আজকের প্রস্তরীভূত মানুষ, জেগে ওঠো
প্রলয়ের আলোয় চমকে দেখি মেধা ও মুখশ্রী
দেখি পাতাঝরা, ঝাউবনে শতাব্দীর বিষণ্ণতা,
আমাদের বুকচাপা ক্রোধ, দমবন্ধ অন্ধকার, সাইরেনের
শব্দে সকাল, এসো ভেঙে ফেলি আমাদের রক্তমাখা

ব্যথা, দেখি আলোর ঝলক লেগে ফুলে উঠছে আলো,
গভীর নীলের আভা মিশেছে বাতাসে, শিশুর দুচোখে
বিস্ময়, আমাদের অন্তর্গত মৃত্যুকে চূর্ণ করে জেগে উঠি,
দেখি গোপনতা জটিলতা গুঁড়ো করে কী উঠে আসছে
দেখি একাকীত্ব কত মিঠে, কতখানি তেতো আত্মগ্লানি
মধুময় পৃথিবীর মধুতে মিশেছে কোন বিষ,
এসো, শুধু নরম বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাবে
দেখবে না হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া—

সমীরণ ঘোষ

প্রতিভূমিকা (১)

এবার বসন্তে আমি মদের পিপের আড়ালে বসে
এক মহাজীবনের গল্প শুনেছি, সে জীবনের
একটা শুরু ছিল, একটা যাত্রা ছিল এবং একটা শেষ আছে
আমি অন্ধকারে সেঁটে রয়েছি শুকনো পাঁজর নিয়ে
আমার আদি অন্তহীন এক নির্বোধ পিপাসা রয়েছে
কোনোই যাত্রা নেই, অমীমাংসিতভাবে অনন্তকাল
আমার থাকবার কথা, দুপুর বেলা আমার
সমস্ত তল্পি তল্পা নিয়ে ফাঁকা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকলাম
এক গুপ্ত প্রণয়ের বিষ অল্প অল্প করে হজম হয়ে গেল
আমার হৃদয়হীন গতিবিধি দেখে সামান্যই বিচলিত হলো,
সামান্য শংকা নিয়েই নিজের হাতে ফুল ছিঁড়লো
তার প্রেম, আমার শরীরে বন্য প্রাণীর বোঁটকা গন্ধ
আবিষ্কার করে ফেলে নিতান্ত নাবালিকাও—
আমি পায়চারী করছি
রেল কলোনীর ভেতর দিয়ে বাতাস বাহিত কোনো ঘ্রাণ
আমার বিবেক চাঞ্চল্য এনে দিচ্ছে না, বেলফুল কিংবা বারুদ
কোনো আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না—

এ পৃথিবীর একমাত্র প্রতিনিধি আমি স্পর্শ করেছি
ঈশ্বরের অশ্রুহীন দু'টি চোখ, অকারণে তাকে
প্ররোচনামূলক লাল পর্দা দেখিয়েছি, প্রতিহিংসাপরায়ণ
ঈশ্বরও আর আমাকে তামসিকতায় ঠেলে দিতে পারছে না
করুণা-নির্ভর চোখের পাতা দু'আঙুলে টেনে বন্ধ করে দিলাম
আমার কোনো বিবেকের তাড়না নেই, দহন নেই,
শাস্তিও নেই, এক নাবালিকার স্মৃতিতে থেকে যাবে
আমার ক্ষমাহীনতা, এক বাতিল হয়ে যাওয়া বেশ্যা
জানলো আমার নত হওয়া, এক ধর্ষিতা উদ্বাস্তু মেয়ে
দেখেছিলো আমার চোখে জল ;

তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধময় অন্ধকারে অর্ধশ্বাপদের মতো
আমি ওৎ পেতে আছি, অথচ এ কোনো অপেক্ষা নয়
সমর্থনহীন আমার থুথ্‌নি নেমে আসছে
নড়বড়ে টেবিলের ওপর, আমি যা শুনতে পাই
শেষ পর্যন্ত তা কোনো অর্থ বহন করে না
আমি যা দেখতে পাই তা কোনো দৃশ্য নয়
রক্তের ভেতরে কেবল বুদ্‌বুদের মতো জেগে উঠছে
অজস্র ফুল, ওরা সব আকাশে উড়ে যাবে,
এ কোনো পরাজয় নয়, প্ররোচনামূলক
লাল পর্দায় বাতাসের শাসন....

প্রতিভূমিকা (২)

আমাদের অকপট ভালোবাসাবাসির পর দুজন
দুই দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়ালাম নীরবে নিজস্ব থাবাগুলি
পরীক্ষা করে দেখছি লেগে আছে মাংস-তন্তু
রোমাঞ্চিত হচ্ছি এই ভেবে যে আমরা পরস্পরের
সামান্যতম হলেও মাংসের স্পন্দন তুলে নিতে পেরেছি
নখের ডগায় এবার আমাদের বেরিয়ে পড়া প্রয়োজন
দরজা খুলে ফেলতেই বাঁধ-ভাঙা জলের মতন
পৃথিবী ঢুকে পড়ল

এবং এ পৃথিবীকে এখনও পৃথিবী বলেই প্রায় চেনা যায়
আমার মাথায় রয়েছে কিছু কাঠ কুড়ানোর মতন গল্প
ঈশ্বর সদৃশ এক বাবু এসে জিজ্ঞাসা করেন
আমি এ নগরের স্থায়ী বাসিন্দা কি না
সেরা হোটেল রেস্তোরাঁ এবং বার্‌ কোন্‌দিকে
আমি পথিকের হৃদপিণ্ডে দেখে ফেলি গাছপালা
তাদের দীর্ঘ ছায়া পাতার নিঃস্বন ও দোদুল্যমান আশ্রয়
মানুষের বড়ো ঘুম পায় বলে আধো ঘুমন্ত নগর
পরিক্রমা করে সহসা নখাগ্রে লেগে থাকা সেই
মাংসের গন্ধ পাই—ভালোবাসা ফিরে পেতে ইচ্ছে করে
দ্রুত সাজিয়ে নিই আত্মপরিচয় জীবনকে ভালোবেসে
দরজা বন্ধ করতে হয় আবার খুলে বেরিয়েও আসা প্রয়োজন
পৃথিবীর মেধা চূর্ণ করে জেগে উঠা নিষ্ঠুর সঙ্গমেচ্ছা নিয়ে
আমি ছুটে যাই

অসম্ভব মুক্তির দিকে আমার এই বারংবার
ছুটে যাওয়া এক নক্ষত্রবিহীন বাতাসের বিরুদ্ধগামী
হাজার নারীর দরজায় পৌঁছে যায় আমার বীভৎস আর্তনাদ
শোকের পরেই জেগে উঠে প্রতিহিংসা
সমস্ত অপরাধ পরাজয় ও দেবতার বন্দনা গান সহ
শেষ পর্যন্ত আমার একমাত্র ধারক এই একচক্ষু জীবন
ঘাতকেরও আরেক পরিচয় এই লোমশ জীবন...

প্রদীপ চৌধুরী

আমি মুদ্রা ভালোবাসি না

আমি মুদ্রা ভালোবাসি না তাই মুদ্রিত শাড়ি
পরা মেয়েদের অনুসরণ করতে অসুবিধা হয়
তারা যখন বিশেষ পুরুষের পাশে রাস্তা হাঁটে
পুরুষ জানে না নিতম্বের মেলানো ছায়া
কীভাবে শহরের অন্ধকার ঘনীভূত করে
শতাব্দীর ব্যবহৃত আত্মার আরেকটি জ্যোতিহীন
পাথর চাপিয়ে দেয় পুরুষ জানে না
তার লাল চোখ লকলকে জিভ
চেটে নিচ্ছে মণিহারী সিন্দুকের ডালা
সে যখন কথা বলে গতি থেকে ভালোবাসা
বিচ্ছিন্ন হয় পুরুষ জানে না একটি মাংসাশী
চুম্বনের পাশে সে যখন নেংটো হয়
একটি বিরাট সরীসৃপ তাকে গিলতে উদ্যত

পরপর পাঁচটি নারীকে খুন করার পর আততায়ী
ফাঁসির অপেক্ষা করছে সে কি
জেনেছিল মুদ্রিত শাড়ীর গোপন অন্ধকার
কিংবা বলা যায় ওই সরীসৃপই গিলেছে খুনীকে
আমি মুদ্রা ভালোবাসি না আমি খুনীকে চিনি না

রূপান্তর

কাল রহস্যময় দূরত্বে আমার সামনে বসেছিল নারী
তার ধবধবে শরীর থেকে ঝরে পড়ছিল শিশিরের জল
আমি তার চোখের দিকে তাকাতেই রূপান্তর শুরু হয়
অতিরিক্ত রক্তচাপে তার শরীর রামধনুর মতো বেঁকে যায়
একটু পরে সে সোজা হয়ে বসে
সে স্পৃষ্ট সবিতার মতো লাল হতে থাকে
তার বুকের রূপালি গন্ধক বিকিরিত হতে থাকে
সারা ঘরে সৌর বিকিরণ
সে আমার চোখ থেকে চোখ সরায় না ফলে

যাবতীয় সৌর রশ্মিগুলি আমার শরীরে ঢোকে
গ্রহের মতো বিশাল বুক ওঠা নামা করতে থাকে
সেখানে মাংস আছে কিন্তু তা পচে না
আকার আছে সীমারেখা নেই
ফার্নেস থেকে ছিটকে পড়া এক স্ফুলিঙ্গ
তার ঠোঁটে লেগে আছে মৃত্যুভেদী হাসি
আমি বুঝতে পারছি তার ভালোবাসার উত্তাপ
স্ফুটনাঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে
শাদা ছাইয়ের মতো আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি
আমি কাল নারীর ভালোবাসা জেনেছিলাম।

গ্রহণ

দলে দলে ছাদের ওপর উঠে আসছে মেয়েরা
অভিশপ্ত ২৪ ঘণ্টার আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড
শেষরাতের সংশয়ভরা আলো-অন্ধকারে
কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না শরীর
মনে হচ্ছে স্বপ্নে দেখা জীবনের যৌনপরমাণু
মেঘের মতো ঘন হচ্ছে পারস্পরিক চুম্বকের টানে
শহরের বাড়িঘরগুলি একসঙ্গে
চলে যাচ্ছে হিমালয় পাহাড়ের কাছে আরও দূর
আকাশের হাতছানি মেয়েরা জেনেছে
ওদের শরীরের রেখা থেকে উপচে পড়া লালা
ও হলুদ কুসুম ভালোবাসার শেষ স্ফুলিঙ্গ স্পর্শে
একটি ওমলেটের মতো সুস্বাদু হয়ে উঠছে

রোমশ বিছানা ছেড়ে দলে দলে মেয়েরা উঠে আসছে
অভিশপ্ত ২৪ ঘণ্টার আর মাত্র কিছুক্ষণ বাকি
অন্ধকারে কক্ষচ্যুত তারাগুলি ঢুকে পড়েছে
ওদের শরীরে শিরার ভেতর আরেকটি
অতিবেগুনি পৃথিবী স্পষ্ট হচ্ছে
পিতা ও সন্তানের মধ্যে আর কোনো ব্যবধান নেই
গর্ভাধারের কাছে সৃষ্টির কোনো ঋণ নেই
অপেক্ষামণ এসবের আনন্দসঙ্গীতে
আতরের মতো চেতনায় ঢুকে পড়ছে মেয়েরা
সমষ্টিগত শরীর মেগনোলিয়ার মতো স্ফীত হচ্ছে—

সন্ধিতে সুগন্ধ নিয়ে মেয়েরা ছাদের উপর উঠে আসছে
গ্রহণ শেষ হতে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি
কিছু পরে রোমশ বিছানাগুলি শতাব্দীর গিরিখাত হবে
পুরুষের সীসা নির্মিত কোমরগুলি স্তব্ধ বালিয়াড়ি
কিছু পরে মেয়েরা বাসি কাপড়গুলিকে এক এক করে
ছুঁড়ে দেবে গলির খরস্রোতা নদীতে
আকাশের আলো সরাসরি স্পর্শ করবে ওদের লুকানো ক্যাকটাস
মেয়েরা ডানা মেলে কবিদের আত্মায় ভেসে বেড়াবে

গোলপার্ক

আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, প্ররোচনা ছাড়াই
আমি পার্কের রেলিঙের ভেতর ঢুকে পড়েছি
করিডর থেকে করিডরে আর শহরের কানাগলিতে
আমার এলোমেলো ২০ বছর এখানেই বেঁচে আছে।
তাদের সকলের বুক চিরে একটি পায়েচলা পথ
দিগন্তরেখা ও আঁতুর থেকে সোজাসুজি
এখানে এসে মিশেছে। রেলিঙের ভেতর আমি একা।

২০ বছর আগের রক্তের শাখাপ্রশাখা থেকে
বেরিয়ে এসেছে ওরা, আমার চারপাশে ক্রীড়াশীল সচল ছায়া
আমি তাদের গ্রীবা দেখে চিনতে পারছি
এখন শরৎকাল, ঘন হচ্ছে শত্রু শরীর, আমি
টের পাই জারজ শিশুর গোল ভারী মুখ—
বিষণ্ন পায়ে আমার পাশে এসে বসে, একজন মাতাল
আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে ওঠে
আমি তাকে ডেকে বলি, 'শরতের হাওয়া'।
গাঁজার গন্ধ সংক্রামিত করতে করতে একদল যুবক
বহুমূল্য কবরের রেলিং ধরে দাঁড়ায় ; স্বপ্ন দেখে
যানবাহন আর নারী ; আমার ভ্রমণ ও দীর্ঘযাত্রায়
কোনো প্রভুর আঙুল ছিল না ধুধু বুকে শুধু অস্থিরতা—
রক্তক্ষরণ শেষ হলে
আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি হোটেলের
রেলিঙে আটকে আছে সপ্তর্ষিমণ্ডল।

আজ আমার হাতে কোনো রক্তের দাগ নেই, একজন যুবতীর
কষানো উরুর বিস্তারই ছিল কবিদের পতন ও মৃত্যু

আজ সেই বহুমূল্য কবরে দাঁড়িয়ে আছে নারী
ব্যাখ্যা করছে ভালোবাসা—আমি
প্ররোচনা ছাড়াই এই আন্তর্জাতিক শোকসভা ছেড়ে
পার্কের ভেতরে এসে গেছি
শতাব্দীর এই শেষ কালোবর্ণ হাস্যকৌতুক!
সাতদিক থেকে একসঙ্গে ট্রাফিকের দিকে এগিয়ে আসছে
সাতটি পলিয়েস্টার গলি
গোড়ালির নীচে তলহীন খাদ
সাতটি গলি সাতটি অক্টোপাসের মতো তৎপর

২.

আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই আমি তাই একটি সস্তা চা-য়ের দোকানে
বসে কিছু অপরাধীকে বলি, 'তোমাদের সামনে রয়েছে
ভালোবাসার বিশাল দিগন্ত, তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও
তোমাদের হাতে রয়েছে রক্তের দাগ আর মাঠের স্মৃতি
তোমারা জানো চারাগাছ কী করে বেড়ে ওঠে
কী করে আলতোভাবে একজনের স্বপ্ন এসে অন্য স্বপ্নে মেশে'
আমি তাদের বলি, 'মারণাস্ত্রে'র যুগ শেষ হয়ে গেছে
কারণ তাদের ব্যবহার বিধি এখন ওদের
বলাৎকার পদ্ধতিতে মিশে গেছে
এই সার্বিক নামহীনতাকে ছিঁড়ে ফেলতে তোমরা এখন
বিষাক্ত দেবদারুর মতো টি. ভি. টাওয়ারের
পাশাপাশি দাঁড়াও
অন্ধকার গর্ত থেকে তোমরা তোমাদের শিকড়গুলিকে
মেলে দাও স্কাইস্ক্রেপারের নীচে—আত্মগোপন করা
ভালোবাসার বিশাল ফসলগুলি এভিনিউর চারদিকে ছড়িয়ে দাও'
আমি তাদের বলি 'হত্যা ও আত্মহত্যা উভয়েই ভালোবাসার সন্তান'।

ব্যক্তিগত/৮৪

কিংবদন্তীর মতো ঘটনা গড়িয়ে চলে, কোথাও
কোনো পারম্পর্শ থাকে না, কিন্তু তাদের
নির্ভুল দাঁত আমার শরীরে চিরস্থায়ীভাবে
বসে যায়, জামাকাপড়ের অনেক নীচে
মানুষের চোখের বাইরে ·
আমি এক স্বতন্ত্র মানুষ।

রবিউল

কবিতাঙ্কের যুদ্ধ

এক

যোনি অবধি সুখ পৌঁছে গেলেই তারা মাতারামরমরমা যেমন এরা পুকুরে জলের ভিতর ঘনিষ্ঠগভীর হস্তমৈথুন করে মৈথুনের যে কোনো বিনাশ নেই সীমা নেই লজ্জা নেই আসলে সব শিল্পই মৈথুনশিল্প।

শিল্পী মানেই মৈথুনশিল্পী
সেই যে কোথায় যেন তারা ওম্‌তে পৌঁছুতে চায়

অপার কারাগারে কাঁসর ঘণ্টা বাজে স্কুলের ঘড়ি দেখে ঠিক দুপুর প্রতিদিন একটায়
ঠিক দুপুর প্রতিরাত একটায়

জীবন আদপেই সূর্যের প্রত্যক্ষে পরোক্ষে চব্বিশটি ঘণ্টার মতো কেউ কেউ আছে মাত্র দুটো হাতুড়ির ঘা দিয়েই চব্বিশটি ঘণ্টা শেষ করে দেয়

সর্বশুদ্ধতার অর্থ কোনোদিন নেই মৃত্যুর সঘন দেশ ছাড়া স্বর্গের একমাত্র পাখি কাকাতুয়া মরণের গ্রামগঞ্জ ছাড়া আর ওড়ে না নিমডালের চ্যাপ্টা তিতো পাতার সবুজে আজও লাল পিঁপড়েরা সারি বেঁধে মৌনমিছিল বয়ে নিয়ে যায় উদ্বাস্তু মন্দিরের খোঁজে যেখানে তাদের মহারাণী মাসিক আড়াই হাজার মুদ্রায় ভাড়া থাকেন এক লাখ বাহান্ন হাজার সাতশো তিরানব্বই জন তুমুল শরীরী নাগরের সঙ্গে

দুই :

২ আমি + ২ তুমি	= ১ আমি + ১ আমি + ১ তুমি + ১ তুমি
	= (আমি + তুমি) + (আমি + তুমি)
	= মি (আ + তু) + মি (আ + তু)
	= ২ মি (আ + তু)

(যেন দেখা হওয়ার পর বাবা মা কোর্টকাছারি করে এইমাত্র ভয়ভাবনাহীন একখানা চমৎকার পিলহীন নিরোধহীন মোক্ষম যৌনসঙ্গম করে বিকেলের ফুরফুর হাওয়ার ভিতর ছাগলের মতো তারা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে)।

ইহার পরেও কি তাহারা প্রেম করিবার জন্য হাহুতাশ করিয়া বক্ষ চাপড়াইবে বিশেষত যে

দেশে নিত্যপ্রয়োজন দ্রব্যসামগ্রীর অসম্ভব উর্দ্ধগতি জনজীবনকে দিন দিন প্রতিমুহূর্তে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। এমতাবস্থায় ইহার পরেও কি এদেশীয় মনুষ্যজাতির শরীরগত মনোগত তাবৎ সুখ আহ্লাদির সঠিক মূল্যায়নে জনগণ উত্তীর্ণ হইবে। ভাইসব আপনারা কি মনে করেন না তাহারা আমাদের এক প্রকৃতিদত্ত সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সবুজ দেশকে মনকে শরীরকে কৃত্রিম উপায়ে একজন খাঁ খাঁ মরুভূমিতে পরিণত করিতেছে না।

তিন :

আমি জনতা রাস্তা রিক্সা পোস্টার মিছিল গাছ গাড়ি আকাশ দালাল মেঘ হলুদ নরম কঠিন নীলপাখি নক্সা শব্দ উড়োজাহাজ বাতাস পাতা বারান্দা শাড়ি রেলিং স্তন মহিলা কিশোরী হাসি দুর্ঘটনা ব্রেক রক্ত হৈচৈ প্রিয়া মারামারি পুলিশ ভিড় বন্ধু এ্যাম্বুলেন্স হুইসেল ট্র্যাফিকজাম মা হাসপাতাল অফিস নদী রাস্তা গাছ আমি সমুদ্র ডাস্টবিন কাক ক্লিনটেক্স দুর্গন্ধ ভিক্ষুক মারামারি হাড় কাঁটা কাড়াকাড়ি শাড়ি মহিলা রেলিং স্তন ভাই জনতা চোখ পাখি হাসি প্রশংসা প্রেম আমি পাঠিকা জনতা খ্যাতি পাঠক সমালোচক নিন্দা বেকার ক্ষুধা কবিতাশব্দ শব্দ অক্ষর সিঁদুর রচনা শব্দ আড্ডা ধুঁয়া সিগারেট মদ জল গাঁজা ঘুম বড়ি অন্ন বেশ্যা বিছানা অর্থ ক্লান্তি পয়সা সেবা ক্লান্তি বিশ্রাম স্বপ্ন বিছানা নিদ্রা দুঃস্বপ্ন তন্দ্রা অনিদ্রা রাস্তা রাস্তা চাকুরি জনতা পথ ছাতি লাঠি অলিগলি রাস্তা অফিস রাস্তা না চাকুরি রাস্তা অফিস বেকার জনতা ধাক্কাধাক্কি বিষ্টি দৌড়াদৌড়ি রাস্তা বেকার অফিস রাস্তা রাস্তা রাত্রি শূন্যতা পুলিশ কুকুর ভিক্ষুক আমি রাস্তা রাত্রি রাস্তা আমি রাত্রি শূন্যতা আমি রাস্তা আমি রাস্তা জনহীন আমি রাস্তা আমি রাস্তা রাত্রি রাস্তা আমি রাস্তা আমি রাস্তা...

চার :

ওইখানে সাহস ওই ঘরে হিংস্রতা এইখানে নম্রতা ওই জায়গাতে ভদ্রতা এই তো ভালোবাসা এই যে শিষ্টাচার এইখানে দুর্ব্যবহার ওইস্থানে কপটতা কাছেই চতুরতা পাশাপাশি বিনয় তার পাশেই নিষ্ঠুরতা ওই জায়গাতে শঠতা একটু দূরে নীচতা তার একটু আগেই শৃংখলা আর ওই যে ছাদের বিমে দড়িতে ঝুলন্ত আত্মহন্তারকের মতো সারি সারি দুল্ দুল্ সভ্যতা...

এইবার সবাই ন্যাংটো হয়ে পুরানো পোশাক পাল্‌টিয়ে এই নতুন পোশাক পরে নাও। এক্ষুনি মূল্যবান যুদ্ধের শুভ উদ্বোধন হবে।

অরুণেশ ঘোষ

একরাত্রির আকাশ

এক রাত্রিবেলা ভয়ংকর নিঃশব্দে নেমে এসেছে আকাশ
ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নক্ষত্রের জোনাকি
স্থির ঢেউয়ের মতন চুলে, স্তনের বোঁটায় আর যোনিতে
চোখের পাতায়, যৌনাঙ্গের প্রতিটি রোমে প্রত্যেক আঙুলে
জ্বলে উঠেছে নক্ষত্রের টুকরো টুকরো আলো
এক রাত্রিবেলা আমি বসে থেকেছি চুপচাপ, তারই শরীর ঘেঁসে
সেই নগ্নতা, ঢেউ আর উত্তাপ
আমাকে ভরিয়ে তোলে
সেই রাত্রিগুলির মধ্যে দিয়ে আমি হাঁটি
মেঘের, বিদ্যুতের আর বৃষ্টির
উন্মাদের, ধুলোর ঝড়ের আর কুষ্ঠরোগীর
বেশ্যার বিছানায় যে অন্ধকার। শিশুর কঁকিয়ে ওঠার মধ্যে
খুনীর ঘাম চেটে নেয় যে রাত, যে রাত মরুভূমির
সমস্ত রাত্রিই আমার মধ্যে এসে জাগিয়ে তোলে
স্তম্ভের মতন এক উল্লাস
অস্পষ্ট ভাষায় গল্প, হাসি আর ফিসফাস
এক রাত্রিবেলা শবের স্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, আমি
অচেনা, উলঙ্গ আর ঘূর্ণীস্রোতের মতো আমার গান
আমি গান গাই...
বেহলা বাদকের এই রাত
শহরের সমস্ত পথ নিয়ে এই রাত্রি
একা আমার
চূর্ণ নক্ষত্র নিয়ে অন্ধকারের স্রোতের সঙ্গে মিশে
নিঃশব্দে নেমে এসেছে আকাশ
এক রাত্রির আকাশ...

কুষ্ঠরোগীর স্বপ্ন

ধানখেতের পাশেই ছিল আমার ঘর, উন্মত্ত সবুজ
সবুজের ঢেউয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসি আমি
শহরের গলি, কুষ্ঠরোগীর স্বপ্ন, অন্ধকার কোণে
জলের কুঁজো, ভাঙা থালা আর তোবড়ানো মগ ও গ্লাশ
আমাকে দেখেই শাদা হাসি হাসে, '...কোনো দুঃখ
কোনো বিষণ্নতা নাই আমার, প্রতিটি ভোরবেলায় আমি
বেরিয়ে পড়েছি পথে, দগ্‌দগে সূর্য আমার সঙ্গী
আমারই মতন সহাস্য ও নিষ্ঠুর, সারাটা দিন
উলঙ্গ সূর্যের নীচে কাটিয়ে দিয়েছি তোকে ভেবেই
তুই আমার স্বপ্ন, আমার গান, সেই বাতাস মধ্যরাত্রির
গহ্বর থেকে উঠে এসে যে আছড়ে পড়ে আমারই হৃদপিণ্ডের
ওপর, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছি নক্ষত্রের তলায়
অসংখ্য চোখ নিয়ে নিস্তব্ধ আকাশ ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের
দিকেই, তবু, তুবও সেই ছিন্নমস্তার মূর্তি আমি দেখতে পাই
পর্বতের চূড়ায়, সমুদ্রের ঢেউ থেকে ঢেউয়ে তার যোনি তার উল্লাস
ঘিরে রাখে আমাকে, শূন্যে ভাসি—নেমে আসি মাটিতে
উচ্ছ্বাসে আনন্দে আমি কাঁদি...'
কুষ্ঠরোগীর স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে আমি ঘুরে বেড়াই, স্বপ্নের আরও
গভীরে, এক একটি স্তর পার হয়ে গিয়ে হত্যা করি তাকে, উটের মতোই
বাড়িয়ে দেয় সে তার গলা, ছড়িয়ে দেয় আঙুলহীন হাত, আর
গলা-চোখে উদাসীন আমার দিকে তাকায়, একবার হাসে, একবার
সে ওপরের সেই নক্ষত্রের কথা বলে আমাকে, রাতের পর রাত
যে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তার জেগে ওঠা—তার আত্মা, স্তব্ধ করি তাকে
টুকরো টুকরো ছড়িয়ে দিই ধানখেতের সবুজে, গোধূলির রক্তিম মেঘে
ও শূন্যতায়, প্রতিটি নক্ষত্রে, শহর থেকে শহরে, বয়ে নিয়ে আসি
বয়ে নিয়ে আসি তারই গান, আকাশ ঘিরে নেচে ওঠে সেই মূর্তি
মেঝে থেকে তুলে নিই ছেঁড়া পাজামা, আকাশের কোণ থেকে
জলের কুঁজো, ভাঙা থালা আর তোবড়ানো মগ ও গ্লাশ

রাত্রি

যে গাছেদের আমি জানি, তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে
এই রাত্রিকে ঘিরে, প্রতিটি ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে
এক একটি উলঙ্গ শব, সমুদ্রের গর্ভের ভেতর থেকে নিয়ে এসেছে
পাগল বাতাস, প্রতিটি শবের ঠান্ডা স্তনের বোঁটা আর পা
ছুঁয়ে দেয় আমার ঠোঁট ও কপাল, মাটি থেকে সমস্ত শেকড়
ছাড়িয়ে নেয় তারা, শূন্যে, আরও শূন্যে গিয়ে নিঃশব্দে
হেসে ওঠে আকাশ কাঁপিয়ে, এই স্বপ্নের মধ্যেই আমার বাস
আমার শিশু কঁকিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়, ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরে আর
অস্ফুট চিৎকারে গুটিয়ে নেয় শরীর, না কোনো ভয় নেই আমার
মৃত্যুর জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসেছে নীল ও উজ্জ্বল পথ, ঘুম
থেকে মাথা তোলে গণিকা মাতাল কুষ্ঠরোগী আর জারজ
পৃথিবীর নাভির নীচে যে অরণ্য ও হ্রদ, সেখানে ফিরে এসেছে
পুরানো সেই পাখির ঝাঁক, অবিকল, ফুটে উঠেছে সেই ফুল
আমি হাঁটি—নগ্ন ও একা, এই রাত্রিকে ঘিরে আমার স্বপ্ন আমার গান..

বামন ও রমণী

রান্না ঘরের মেঝেতেই ঘুমাতে হবে আমাকে, কেউই
অপরিচিত নয় আর, এই সে নগ্ন বামন দুমড়ে
মুচড়ে পড়ে থাকে যার আরও ছোটো আরও খর্বকায়
বীভৎস ছায়া, যে উঠে দাঁড়ায় আমাকে দেখেই, শাদা মুখ
যে আমাকে দেখেই হেসে ওঠে আর হাতে তুলে নেয়
আলো ও পোষাক, যে হাঁটে আমার সামনে ও পেছনে
'এই সেই বাড়ি যেখানে ঢুকতে হবে তোকে, যেখানে...
অনেকেরই জানা ছিল, শুধু তুই, তুই-ই জানিস না'
স্নানঘরের পাশে যে আকাশ, নর্দমায় জেগে উঠেছে
যে ফুল, নক্ষত্র থেকে কালো নিঃশব্দ বাতাস
যে আলো শরীর জুড়ে জাগিয়ে তোলে আলোড়নময়
ঘাম, মত্তজল ছিঁড়ে আনে চোখ ও যোনি, কিছুই
অচেনা নয় আর? বামনের হাসি? হলুদ নিঃশ্বাস?
'...আর কি কোনো পথই নেই—কোনো উপায়?—ভেবে দ্যাখ,
ঘুরে দাঁড়ায় ক্লান্ত বিমুগ্ধ সেই ভাঁড়, '...সুখেই ছিলাম আমি
তুই আসার আগে সুখে উৎকণ্ঠায় আবেগে আর আতঙ্কে
ফাঁকা মঞ্চের দুপাশে দুজন পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে

জেগে থেকেছি রাতের পর রাত...মধ্যরাত্রির সেই নাটক...
ওরে আমিই তো তার একমাত্র...পাগল হয়ে ওঠা আমার হাত
তুলে নিয়েছে ভাঙা বেহালা ও মুখোশ, আমিই একমাত্র
যে দুই রমণীকে ভেসে আসতে দেখি দুই অন্ধকার থেকে
এই আলোর তলায়, যে নাচ তারা নাচে যে গান তারা গায়
যে সংগীত বাজিয়ে তোলে অথর্ব এই আঙুল, সেই
আলো ও উত্তাপ স্তব্ধতা আর উল্লাস যোনি থেকে যোনিতে
উৎসারিত করে প্রাণ...তুই তো জানিস
আমি বামন, আমি অক্ষম হাঁটুর নীচেই আমার বাস'
মঞ্চের কাছেই কবর দেওয়া হয় তাকে, আর কোনো পথ
আর কোনো উপায়ই থাকে না বাঁচাবার, যা ছিল গচ্ছিত সম্পদ
জীবনের অর্থ, অভিজ্ঞতা ও পুঁজি, সবকিছুই...আমি তার কবর খুঁড়ি
দুহাতে নামিয়ে আনি ওপর থেকে নীচে, মাথার ওপরে মেঘ ও শকুন
মেঘ ভ্রূণ রোদ ছায়া নিয়ে এই যে আকাশ, যার থেকে ঝুঁকে
আছে নক্ষত্রের ফুল সমেত একটি ডাল—ফাঁকা মঞ্চের দিকেই...

অরুণি বসু

ভূমিকা

আলো নেই ব'লে অন্ধকার আছে। অন্ধকার আছে
তাই টেবিলে জ্বলে উঠেছে মোম,
মোমের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে গোল হয়ে আর
একটু একটু করে মনে পড়ছে এর-ওর-তার কথা।
অন্ধকারে জ্বলে উঠছে বোগেনভেলিয়া
জ্বলে উঠছে তার কালো ছায়া, কবিতার প্রায়
কীভাবে শুরু করব আমি? গলে গলে ক্ষয়ে যাচ্ছে মোম,
ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে জীবন অনন্তের দিকে, তাই
কেউ গান গেয়ে উঠুক। অথবা হাসুক। গালাগালি দিক।
শুরু হোক আলাপ।

আলো বা অন্ধকার যে কোনো জায়গা থেকেই আজ
শুরু করতে চাই আমি। অনেকদিন বয়ে গেলো অকারণ,
আমি আর চুপ ক'রে থাকতে চাই না।

ধ'রে রাখতে পারিনি

একথা ঠিক, আমাদের অনেক কিছুই নেই।
একথাও ঠিক, আমাদের যা যা ছিলো আমরা তার
সবটুকু ধ'রে রাখতে পারিনি।
যে-রকম, টান-ভালোবাসা!

এমনও দিন ছিলো যখন তোমার আর আমার মাঝে
সুতোও বাহুল্য মনে হতো।
এইভাবে দিন যেতে যেতে, দিন যেতে যেতে
একদিন দেখলুম আমাদের মাঝখানে উঠে এসেছে
পায়ের তলায় পড়ে থাকা পাশবালিশ।

তারপরেও কেটে গেলো অনেকগুলো দিন,
এখন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, রাত্রে, পৃথিবী শব্দবিরল হয়ে এলে
আমাদের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলে পুরো একটা নদী।
আমরা জেগে থেকে, ঘুমের ভান করে সেই নদীর গান শুনি,
কখনো দুঃখের, কখনো হতাশার, কখনো ক্লান্তির।

কচিৎ কদাচিৎ পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে।
পুরানো সেই দিনের কথা।
হাত বাড়িয়ে তোমায় ছুঁতে গিয়ে দেখি, সেই নদী
মাইল-মাইল চওড়া হয়ে গেছে।

একথা ঠিক, আমাদের অনেক কিছুই নেই।
একথাও ঠিক, আমাদের যা যা ছিলো আমরা তার
সবটুকু ধরে রাখতে পারিনি।
যেরকম, আগ্রহ ও আন্তরিকতা।

সমাধিফলক

একবার ভাবো তার কথা যে এখানে শুয়ে আছে।

একবার ভাবো তার কথা,
যে তার দু'টো রোগা হাতে নাড়াতে চেয়েছিলো এই বন্দিনিবাস,
যে ভালোবাসতে চেয়েছিলো মানুষকে এবং ভালোবাসত ভালোবাসা পেতে,
যে খালি গলায় গেয়ে উঠত মুক্তির গান,
যে বুকের মধ্যে ধরে রেখেছিলো এক বিশাল খোলামেলা আকাশ।

একবার ভাবো তার কথা,
যাকে তোমরা ঠাট্টা ছাড়া আর দাওনি কিছুই,
যাকে বোকা পেয়ে বিচক্ষণ মানুষেরা খাটিয়ে নিয়েছে নানা ছলে,
যাকে সন্দেহ করা হতো তার স্পষ্ট কথার অপরাধে,
যাকে যুবক হয়ে ওঠবার আগেই তোমরা বাধ্য করেছিলে,
বুড়ো হয়ে যেতে।

একবার ভাবো তার কথা।
সে এখানে পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

সে ছিলো আসলে একজন কবি।

সেলিম মুস্তাফা

ঈশ্বর নেমে আসুক

অন্ধকারে কেউ একজন চলে যাচ্ছে আমার আত্মীয়—
আমি তাকে ফেরাতে পারি না, আমার প্রিয়
অসুখ আমি কাকে দিয়ে যাবো? আমি ভাবতেও পারি না
দিন এভাবেই কেটে যাবে
রাত এভাবে কেটে যাবে

মানুষ কিছুতেই বিস্মিত নয়, মানুষ আর
শিহরিত হয় না এখন, সদ্যবালিকার জামার ভেতর
ভালোবাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে পরিত্রাণ, অন্ধকারে আমি
খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার অলৌকিক মেয়েমানুষ, পুলিশ
আমাকে বলে বাঁ-দিকে হাঁটুন ;
এক ভয়ের সাম্রাজ্যে আমি ঢুকে পড়েছি, আমার
আচরণ শীতার্ত, শীতের ভয়ে আমি ঢেকে রেখেছি
যাবতীয় অসুখগুলি, আমার গোপন জায়গাগুলি আর
কিছুতেই দেখি না, মানুষের ভালোবাসার ভয়ংকর দ্যুতি
শামুকের মতো ঘিরে আসছে আমার অন্ধকার ঘোচাতে ;

ভালোবাসা: সমস্ত শান্তিপুর মৌজা
দেও নদী ভেঙে নিয়ে গেছে, কোনো দুঃখ নেই আমার,
নদী কাছে না-এলে আমি অপরাধ করতে পারি না,
অপরাধ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না,
যে হৃদয় ভেদ করলে অপরাধ হয়—
যে যোনি গ্রহণ করলে অপরাধ—
তারা কোথায়?

তারা কোথায়, যারা ভালোবাসা করতে এসে
ঘৃণা করে উঠে গিয়েছিল?
আশ্রয় নাই,

পাহাড়ি মেয়ের উদোম শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষের
সহোদর, তাদের ঘৃণা আর ভালোবাসা আজ
এক-ই ছায়া উৎপন্ন করে, মণিরেখার ঘরে
সেই ছায়াকে আমি ঘুরতে দেখেছি, তার বুকের নিচেই
জন্মের ভারী অপরাধ জ্বালা পাহাড়ের মতো
ছড়িয়ে পড়ছে আমি জানি।

শাসন করো এই বাতাস! এই রৌদ্র-জল-কুয়াশায়
কিছু মমতা দাও! শরীর দিয়েছো—
বীর্য দাও, ভালোবাসা দাও!

লোকে বলে, ভালোবাসা পেলে আমি মরে যাবো,
আমিও জানি, অপরাধ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না,
শিখা গোপ বেঁচে আছে একটা বাইসন পেয়ে,
আজও বেঁচে আছে, তুমি চেনো?
বাতাসে মদের গন্ধ—কেবলমাত্র ভাটিখানা জেগে আছে,
আমি কোনো উত্তরণ বুঝি না আর
কোনো অধঃপতন বুঝি না,
আজ সন্ধে থেকে মদ খেয়েও কোনো নেশা হয়নি—
আমার যৌনতা আমি খোলা আকাশের নীচে ছড়িয়ে দেবো,
আমি জন্মের ভেতর ঢুকিয়ে দেবো হাত!
আমার ঈশ্বর নেমে আসুক বনপর্বত কাঁপিয়ে।

রাজা সরকার

কিছু কালো ফুল ও তার ক্ষত

ওই তো ভোরের জানালার ওপারে নিঃস্ব জুয়াড়ির আকাশ
আর এই তো সেই বিছানা
ভারী বাতাসে ভেসে ওঠা ফানুস! সংসার...
একটি দুটি মানুষ গা ছুঁয়ে উড়ে যায় সূর্যের দিকে
তবু তাদের শেকড় থাকে বিছানায়
ভোরের বিছানায় মিশে থাকা শরীরে
ফালি ফালি কচি রোদের ভেতর—
এখানে কোন্ জীবনের গান? স্থির নৈঃশব্দ
কেটে কেটে ঘরে ঢোকে কোন্ শাবকের কান্না?
...শান্ত হয়ে আসে ঘোরের প্রলাপ, আর
দীর্ঘশ্বাস ক্রমে ভারী হয়ে তুলে নেয় এক নোলা মানুষ
কোন্ রহস্যের দিকে—এই নক্ষত্র-কল্পনা!
মৃত্যুর প্রশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে যে জীবন
তখনি তো নেমে আসে সে দু'হাত বাড়িয়ে
আঁশময় এই শরীরে যেখানে এই যাত্রায়
ফোটানো হল কিছু কালো ফুল ও তার ক্ষত॥

নির্মল হালদার

প্রাতিষ্ঠানিক কবি ও লেখকদের

কী যে লিখি কী যে লেখা যায়
আমাদের স্বার্থরক্ষাকারী কাগজেই
আমাদের মৃত্যু, মৃত্যুর স্তব্ধতা!
এই যে মানুষের মরণ নাচে
সকালবেলা
এই যে মানুষের মরণ নাচে
দলে-বলে
কী লিখি, কী লিখি আমরা

আমাদের স্বার্থরক্ষাকারী কাগজে
আমাদের কুকুর চেহারা
তারা দেখবে কতদিন
কতদিনে কাগুজে বাঘের মুখে
আগুন দেবো
আমরা কি জানি?

আমি ছোটো নই

ছোটো মানুষের দল আমাকে নিয়ে যায় ছোটো মানুষের দিকে
ছোটো দিন ছোটো রাতের কথা বলে
আমি কি এতই ছোটো?
আমার খিদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাওয়া
আমার বাঁচার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আকাশ
আমার খিদে জন্ম দিয়েছে আমাদের সম্পদের
মাটিতে মুখ দেখেছি আমি সুন্দর
নখ ও নরুণের আগে আমি শস্যসংবাদ পৌছে দিই
দুয়ারে দুয়ারে
আমার পায়ে কাদা অনেক দূরের।
ছোটো মানুষের দল ছোটো ছোটো টুপি নিয়ে
ছোটো ছোটো চেয়ারের কথা বলে, আমি পাতার ডোঙা
মাথায় বুনে চলেছি পাতার ডোঙা মেঘ-বৃষ্টি।

জীবতোষ দাস

সুন্দর ভোর

যে স্বপ্নের মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেল
সুন্দর ভোর হলো, সেই প্রথম সকালেই
জন্মদাতাকে এক চরম গালাগাল দিই
অপ্রস্তুত পিতৃদেব!
ভূকম্পনের মতন মাত্র বারকয়েক নড়ে উঠলেন
তারপর সব শান্ত।
নীল আকাশ, শূন্য হাত, শূন্য আলোচনা ও শূন্য আমি
আমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করে কিছু বোকা মানুষ
আমি তাদের শুকিয়ে যাওয়া হৃদয় থেকে বের করে
আনি রাজনীতি ও টাকার দলা
মস্তিষ্কে আমার জ্বলে আগুন
আমার মুখে কালো হাসি ও কালো গান
আমি আজীবন শুনে যাই ওদের গালাগাল
যে স্বপ্নের মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেল
সুন্দর ভোর হলো, সেই প্রথম সকালেই
জন্মদাতাকে এক চরম গালাগাল দিই
যেভাবে বাজারের গণিকারা ঊরু দেখিয়ে
গাল দেয় কম পয়সার খদ্দেরকে।

শৈলেশ্বর ঘোষ

পীতজ্বর

‘মুখ দেখে যদি না আসা হয় তবে পাছা দেখিয়ে আনা হবে ঘরে’
সকালের সূর্য ওঠার আগেই যদি আমাদের ফুল আর রক্ত ঝরে—
পশ্চিম আকাশের ম্লান চাঁদ তৈরি থাকে। এখন...পাপড়ি আর
পালক হাসি আর গান—জমানো টাকা নিয়ে এসেছি আমরা,
কর্কটক্রান্তি অপেক্ষা আমাদের—খোলো তোমাদের মদের দোকান
চাষা আর মজুর দাঁড়িয়ে দেখে ফসলের গায়ে অস্ত্রের আঘাত
অবশেষে যে মেয়েরা আমাদেরই ছিল তাদের গায়েও পড়ল হাত—
বাঘ হিংস্র একথা জানে অন্যান্য পশু, তবু একই বনে তাদেরও বাসা
জেটিতে দাঁড়িয়ে জল আর অন্ধকারে শেষ হ’ল আমাদেরও ভালোবাসা
একটি গ্রাহক ঢোকামাত্র সোনাপট্টিতে সোরগোল পড়ে গেল
আমার মতো সূর্যও এক কুসংস্কার : বাক্স তোরঙ্গ সহ কোথাকার যাত্রি
প্রতিহাতে হাতপাখা, গাড়ি কোথায়? সামনে সুদীর্ঘ রাত্রি—
কাছে এসে ডাকে, ‘কেন তুমি একা বসে, এসো আমার কাছে’
‘কেন এত ঠাণ্ডা শরীর?’—অন্ধকে ভিখারি, গণিকাপুরুষ জামা খোল,
বিছানায় পাশবালিশ গেলাস মদ ছাইদান—মঞ্চ বদল
করার সময় ভাবা যায় জীবনের কথা—কেবল পুরানো পাপোশ
আমাদের দুঃখের ফসল—চাই শিশুর আঁকড়ে-ধরা ওই মা
দুহাজার বছর লুকিয়ে রেখেছি আমরা খ্রিস্টের রক্তমাখা জামা
তুলে দেবো খ্রিস্টেরই হাতে—আমরা নিমিত্তমাত্র অপেক্ষা করি—
এ মাটিকে ছাড়বে যে সেই করবে আত্মদান—তবু আপশোষ হয়
গোলাপকে রক্ষা করে তার ওই কাঁটা, লুকোবার জন্য স্কাইস্ক্র্যাপার বাড়ি
মেলে-ধরা যোনি শূন্য কোষাগার : এ রাস্তায় পড়বে সর্বোচ্চ পাহাড়—
ভালোবাসা তো বুকে নেই আছে আমাদের হাতে : এই তো ইতিহাস!
যে তোমার ছেলেকে খুন করে গেছে তাকেই নিয়ে আবার বিছানায়
যাওয়া : একই শরীরে কখনও গ্রাহক কখনো ঘাতক—পীতজ্বরে
আক্রান্ত পুরুষকে টাকার বদলে পাছা দেখিয়ে ফের আনা হবে ঘরে?

মৃত্যুর পথ

মৃত্যুর পথ ঠিক করে নিতে হয় আমাদের জীবনের পথ নয়
লুকানো কীট ধীরে ধীরে নষ্ট করে ডালপালা সব—
কিছু ফুল কিছু ফল হয়তো বা পড়ে থাকে মাটির উপর,
ভালোবাসা যাকে দিতে চাই সে দেখি দুর্বল, সকালের বিছানা
গুটানো হলে মনে পড়ে—পুনরায় ঋতুপরিবর্তনের আগে
রাজার মতো অপচয়যোগ্য হয়ে উঠবে এই নিঃসঙ্গ বর্বর—

যখনই পেঁচা ডাকে গুহা থেকে বের হয়ে আসে হিংস্র জানোয়ার
বাতাসের গন্ধ শুঁকে বুঝে নেয় সে কোথায় তার খাবার,
এরপর খাদ্যখাদকের মিলন হলে হাসে মাটি আর গাছ—
খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে শেষে নিজেকেই খাদ্য হতে হলো,
যে হাত খাবার তোলে মুখে সেই হাত গলাতেও বসে গেল—
কাপড়ে আগুন দিয়ে মনে হয় আর একদিন পরে যদি
ঘটতো এই ঘটনা!

আর একদিন?

তবে কি তৈরি ছিল না খানা? চূড়ান্ত মুহূর্তে
মনে পড়ে তাদেরই কথা—নক্ষত্র সে জেগে আছে একা,
প্রতিবার চাদরের ভাঁজ ঠিক করে নিয়ে
কুকুরের মতো শুয়ে থাকে কল্পনা,
মৃত্যুই অস্থিরতা, ভালোবাসা নেবার পর কেন বিচলিত আমরা!

মৃত্যুর পথ ঠিক করে নিতে হয় আমাদের, জীবনের পথ নয়,
বেঁচে থাকা হয় স্বাভাবিক পথে কিন্তু মৃত্যু কামনা করতে হয়—
বিপ্লব ছেড়ে এসে বিপ্লবী অবশেষে নিজেকেই গুলি করে মারে—
শূককীটের মতো নিজেদের হাতে বন্দী আমরা নিজেদেরই ঘরে—
লালা আর বীর্যঝরা এই বন্দরে এখন মাঝরাত,
বাতাস থম্‌থমে—জানালায় কার মুখের ছবি? অবশ হাত
তুই কি সক্রিয় হবি—ঠেলে দিবি আমাকেই জেটি থেকে জলে?
ইন্দ্রিয় পরবশ আমি--নেশাকেই মেনে নিই নতুন ইন্দ্রিয় বলে—
মৃত্যু এক পুরাতন নেশা...আত্মভূক হয়েও আমি ভয় পেয়ে যাই
যখন দেখি পবিত্রাতাও জায়গা করে নেয় সংঘবদ্ধ উন্মাদের দলে—
শেষদৃশ্যে পৌঁছে গিয়ে অস্বীকার করে বসে নিজেরই আত্মপরিচয়,
শেষদৃশ্যে পৌঁছেছি আমিও : কিন্তু বলাৎকার নাহলে চেনা যায় না
ভালোবাসার পথ—আর ভালোবাসাহীন বলেই আমি ছাড়া পেয়ে যাই
দেখি নিষিদ্ধপল্লীর প্রতিটি দরজার বাইরে পড়ে আছে সব জুতার পার্টি
মাপ নিলে দেখা যাবে এগুলির কোনটিই আমাদের কারো নয়,
শূন্যকে যে অস্বীকার করে তারই পায়ে লেগে থাকে মাটি!

আকাঙ্ক্ষিত নই আমি

পাহাড়ের ওপারে থাকে সূর্য এপারে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা
এইটুকু দূরত্ব—আদিবাসী মেয়েদের ইজ্জত নিতে এখানেও এসেছিল বাবু
গাছের আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জ্ঞানী—একটি বিছানার দূরত্ব
পার হতে বহুরাত জেগে বসে থাকি—আর ভালোবাসা? ভাবি
সহবাসের পরেও কেন নমনীয় নয় শরীর, ভিখারিকে এক টুকরো
রুটি দেবার সময় কেন মৃত্যুর কথা মনে পড়ে—শায়ায় ঢাকা
বেশ্যাদের বুকের মতো জীবন আমাদের, প্রতিদিনের আবর্জনা
পরিষ্কার করার সময় নিজেকে আমি মানুষ বলে বুঝতে পারি না—
লিঙ্গ আর হাত দুই-ই সংক্ষিপ্ত—বুঝি, মৃত্যুর পরই আসবে
সেই প্রভাত যা জন্ম থেকেই চাই—পা-রাখা এই পাটাতন
কখন যে সরে যায়! সূর্যাস্তেরও তবে আর বেশি দেরি নাই!
ঠাণ্ডা বাতাসে এ উপত্যকা ভরা—বাণিজ্যপোত
ঢুকে পড়ে জানালাহীন ঘরে, স্মৃতিগুলি পসরার মতো
পড়ে আছে বিকেলের বন্দরে—ইঁদুরের খুটখাট
ভগবানের চোখ, ঘুমন্ত খাঁচার পাখি, গল্পেই ছিল এক রাজা
কত উঁচুতে তুলে দিয়েছো পাল? দড়াদড়ি রাখো হাতের কাছে
গোল হয়েও পৃথিবী আমাদের শূন্যে একটু ঝুঁকে আছে!
অবাধ্য সন্তানেরা আজ হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র ফিরে পেতে চায়
দেবতার মন্দিরে খেলা করে অভিশপ্ত সাপ—রাজার শোভাযাত্রা
চলে সমুদ্রের পথে, আগের মতোই দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খুনি, যা হয়
ভেতর থেকেই দরজা রয়েছে বন্ধ, ওখানেই পচে ওঠে আমার শব
জানা যায়, মা তার আকাঙ্খিত শিশুটিকে কখনই করে না প্রসব!

লাল নক্ষত্র

আমি এক লাল নক্ষত্র বয়ে এনেছিলাম কলকাতায়
এক ভূগর্ভ পথ ছিল আমার স্বপ্নহীন মাথায়,
বুকের তারকাগুলি দেখে পুলিশ ছেড়ে দিল ঢোকার রাস্তা
একা বলেই শূন্যতার সঙ্গে আমার জন্ম-মৃত্যুর পরিচয়
আমার কঙ্কাল আমিই ভরাই রক্ত মাংস মজ্জায়

আমার ঘুমের সময় ওই নক্ষত্র উপরে উঠে যায়,
গোপন দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয় সাধু আর দৌড়ের ঘোড়া
দুর্বল মুহূর্তে এক স্ত্রীলোক হয়ে যায় খড়ের গাদা

সাততলার ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্ধ্যাতারা
আমার দরকার হ'ল এক বন্ধুর, দরকার হ'ল জল আর কাদা।

আমি যখন এক পরিবারের উঠান পার হতে থাকি
কাঁদে ওই নক্ষত্র—খাদ্যের অভাব ছিল, খাবো খাঁচার পাখি—
ক্ষুধার্তের ভগবান রুটি—একথা যে বলে তার সম্পত্তির
হিসাব চাই আমি, ভাঁড়ারে রান্নাঘরে ওই নক্ষত্র লুকিয়ে রাখি!

আমার বন্ধু আশুতোষ বিয়ে করে জনৈক কালীবাবুর মেয়ে
কালীবাবু তাকে নেশাগ্রস্ত করে—ভয় পায় সে সমুদ্র আর ছাতা
বুড়ি বেশ্যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে ইতিহাসের বুড়ি চাঁদ
সন্দেহ হয় ভালোবাসতে গেলেই ওই নক্ষত্র যাবে আরও সরে

তৃতীয় প্রহরের চেয়েও নিঃশব্দে ওই স্ত্রীলোক ঘর পরিবর্তন করে
কুকুরের ডাক শুনে, প্রতিবারের আত্মসমর্পণই কি বিশ্বাসঘাতকতা?
একদিন এক কিশোরীকে কোলে বসিয়ে সে হাত দেয় কোমরে
একদিন নক্ষত্রসহ আমরা ঢুকে পড়েছিলাম শান্তির ঘরে—
নাবিকেরা কিন্তু পণ্য নিয়ে চলে যেতে থাকে কেবলই উত্তরে!

এইভাবে বসন্তে আসে মৃত্যু—শীতও আসে তবে পাখিদের সাথে
বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আমরা সবাই ট্রেনের অপেক্ষায় আছি
টিনের 'ট্রাঙ্কে ভরা আছে চন্দ্রসূর্য ইত্যাদি—কুকুর আর মাছি
রূপান্তরিত হয়ে ফিরে চলেছে নিজের ঘরে রাতের শেষ বাসে—
খাবারের দোকানে একটাও মানুষ নাই—দরজাগুলি হা-হয়ে আছে!

জামালউদ্দিন

আমার স্ত্রী

লাগাম পরা ঘোড়ার মতো আমাকে চাইলো আমার স্ত্রী
বানিয়ে নিলো মজবুত খোঁয়াড়
আমার বিশৃঙ্খলগতির বিরুদ্ধে পাহারা সাজিয়ে রাখলো
ছিনিয়ে নিলো আমার ঘুমিয়ে পড়া যৌনাঙ্গ
এই আমার রাত
যে রাতে সে নিষিদ্ধ করেছে আমার মাদল উৎসব
নিষিদ্ধ আমার সঙ্গী যাকে হত্যার জন্য এসেছে
আমার উপর তার গোপন নির্দেশ
অথচ ঝর্ণার মতো যে আমার ভিতর ঢোকে রোজ
বা বাতাসের মতো যার ভিতর ঢুকে পড়ি আমি
শুরু হয় নাচ শুরু হয় মাতাল চুম্বন
ফোটে বসন্ত
চার পাশে গজিয়ে ওঠে পাহাড়/অরণ্য/ধ্বস...
যা গিলতে পারে না আমার স্ত্রী
অথবা দিতে পারে না চুম্বন
অভিযোগ আর চিৎকারে
বেলুনের মতো ফেটে যায়।

সিনক্লের বেইলিজ

লন্ডনে আমি ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম

১৯৬৫-র শীতকালে লন্ডনে আমি দারুণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। জঞ্জাল ঘেঁটে খেতে খেতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং ঠিক করি শহর এলাকার একটি ভালো রেস্তোরাঁতে একবেলা খেতেই হবে। আমি খালি পকেটে রেস্তোরাঁতে ঢুকে পড়ি এবং মেনু দেখে সবচেয়ে দামি আর লালা-ঝরানো খাবারের জন্যে আদেশ করি। আমি গলা অবধি খাই এবং বেশ ভালো বোধ করি। চাপরাশি যখন বিল নিয়ে আসে আমি তাকে বলি আমি কোনো পয়সা দিচ্ছি না এবং রেস্তোরাঁটির এটা গর্বের ব্যাপার যে আমি একজন কবি, এখানে এসেছি এবং খেয়েছি। চাপরাসি ম্যানেজারকে ডেকে আনে এবং সে আমার উপর এত ভয়ানক রেগে যায় যে, আমাকে মেরে বসে আমিও তাকে বদলা মার দিই আর তাই পুলিশ ডাকা হয়। আমাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু বিচারের জন্যে চালান দেয়া হয় না। যেহেতু পুলিশের মতে আমি একজন পাগল। পরিবর্তে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেইন্ট আলবানস হারটফোর্ডশায়ারের শেনলি নামের এক মানসিক হাসপাতালে। সেখানে আমাকে ভালো খাবার দেয়া হতো কিন্তু নার্স, ডাক্তার এবং রোগীদের প্রচুর অবৈধ নাকগলানোর বিরুদ্ধে আমাকে সব সময় লড়ে যেতে হতো। মানসিক হাসপাতালে আমার কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপের তালিকা নীচে দেয়া হচ্ছে।

মেঘ চিকিৎসা প্রণালী

আমি লক্ষ করলাম মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা বেশ সান্ত্বনাদায়ক এবং উত্তেজক। মেঘের আকার ও প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকা আমার বেশ উপভোগ্য মনে হতো। আমার মনে পড়ে যেত গ্রেসো ও ব্লেইকের ছবির কথা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গারদের উৎক্ষিপ্ত অন্দরমহল দেখার চেয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকা ছিল সহজতর। আমি তাই ডাক্তার রোগীদের জানাই যে আমি 'মেঘ চিকিৎসা' নিচ্ছি। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমাকে এক নিঃসঙ্গ কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

অন্তরীণ অবস্থাকালীন বিরক্তিকর কর্মচারীর দল :

কর্মচারীরা আমাকে জ্বালিয়ে মারছিল তাই আমি ঠিক করি বদলা নিতে হবে। আমি প্লাস্টিকের হলুদ মূত্রাধারটিকে আমার শিয়রের কাছে এনে রেখে দিই (ভাবি এর বদ গন্ধ ওদের নির্ঘাৎ কাবু করবে)। ওদের মানসিকভাবে কাত করার জন্যে এই-ই যথেষ্ট। আসল আক্রমণটা ছিল এরকম : বিছানার ওপর থেকে রবারশীটটিকে তুলে নিয়ে তার এক প্রান্ত মেঝের উপর ফেলে রেখে আরেকপ্রান্ত হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আমি অপেক্ষা করি। একজন নার্স ঘরে ঢুকেই

রাবারশিটটির ওপর পা রাখে। সে আশ্চর্য আর বাকরুদ্ধ হয়ে আমার দিকে তাকায়। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে কিছু ধারণা করার আগেই আমি মুষ্ঠিবদ্ধ রবারশিটটি ধরে হেঁচকা টান মারি এবং সে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে। এ ঘটনায় আমাকে বেশ ভয় করা হতো এবং কিছু সময় একাকী থাকতে দেয়া হতো।

আমাকে নোংরা এবং অস্পৃশ্য করে তোলার জন্যে :

আমি প্রকাশ্যে আমার মূত খেতে শুরু করি। বসার ঘরের পিয়ানোর তারাগুলিতে মাখিয়ে রাখতে থাকি আমার গু, হতবাক এবং আতঙ্কিত নার্সদের জানাই তারগুলিতে গু মাখালে পিয়ানো আরও সুরেলা হয়ে ওঠে। গুয়ের দলা আগুনে সেঁকে আমি তা খেতে থাকি। (৬ বছর আগে Brion Gysin আমাকে বলেছিল, মরক্কোর যাদুকরদের যে ভয়ের চোখে দেখা হয় তার কারণ ওরা কখনো কখনো নিজেদের গু খেতো এবং মূত্রপান করতো)।

নার্সদের বোঝাতে যে আমি একজন ডাক্তার

স্নানঘরে গিয়ে আমি সতীর্থ রোগীদের প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপতে শুরু করি। বেসিনে প্রথম প্রস্রাব ভর্তি একটি বোতল এবং পাশাপাশি আরেকটি বোতলে একই পরিমাণ জল ঢুকিয়ে দুটোকে একসঙ্গে ভাসিয়ে দিই। স্বভাবতই নার্সরা অভিভূত হয়ে পড়ে। সেই থেকে আমি হয়ে গেলাম ডাক্তার বেইলি যিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাশ করেছেন।

অন্তরীণ কক্ষে একজন রোগীকে পেটাবার ব্যাপারে, কিছু পুরুষ নার্সকে এড়াবার উদ্দেশ্যে :

কীভাবে রোগীদের সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করতে হবে শিখবার জন্যে একদিন 'ডাক্তার' বেইলি তিনজন নার্সের 'আমন্ত্রণ' পান। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করি এবং তাদের পেছন পেছন একটি ঘরে ঢুকি যেখানে একজন রোগীকে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। মুঠোপাকানো হাতে নার্সরা রোগীটিকে ঘুসোতে থাকে এবং আমাকেও তাই করতে বলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করি এবং নার্সরা আমাকে ঘর থেকে বের করে নেয়।

বিরক্তিকর রোগীদের আতঙ্কিত করার জন্যে :

আমি তাদের জানাই যে শেনলি হাসপাতালে চত্বরে সাপ—বহু বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যখন তাদের হাঁটাবার জন্যে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যেন তারা সাবধানে থাকে। আমি তাদের বলি যে তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদেরও সতর্ক করে দেয়া উচিত কারণ লন্ডনের পার্কগুলিতেও সাপ ছাড়া হয়েছে।

সহিংস বিভাগটিকে সাজাবার জন্যে :

বসার ঘরটিকে খাবার ঘর থেকে আলাদা করার জন্যে কপাট দেয়া জানলাসহ একটি কাঠের ফ্রেম ছিল। আমি আমাদের বিভাগটিকে সাজাতে চেয়েছিলাম। একটি ধারালো পাথরের টুকরো

দিয়ে, আমি জানলার কপাটের উপর খোদাই কার্য শুরু করি। রোগীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে এবং তারাও ওরকম করতে চায়, কিন্তু ধারালো পাথরের অভাবে কেউ কেউ ঘুসি মেরে জানলায় গর্ত করে ফেলে। জানলার কবাট ভাঙা বা তার উপর খোদাই ধরনের কাজের তাৎপর্য নার্সরা বুঝতে পারে না। কাউকে শাস্তি দেয়া হয় না। একটি জানলায় 'কোলাজ' তৈরিকালে আমি নানা ব্যাপারের মুখোমুখি হই। আমি বেশ কিছু আজেবাজে কাগজের টুকরো সংগ্রহ করি—অধিকাংশই মিষ্টির মোড়ক—এবং কোনোক্রমে অক্যুপেশন থেরাপি বিভাগ থেকে খানিকটা গঁদও সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। আমি বাইরের জানলায় কিছু কাগজের টুকরো সেঁটে একটা আকার দিতে চেষ্টা করি, এই অবস্থায় ধরা পড়ি, কান ধরে একটি নার্স আমাকে পিয়ানোর কাছে নিয়ে যায় এবং 'গ্রিনস্লিভ্স্' নামক একটি আইরিশ গান করতে বাধ্য করে। আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি না এবং নার্সটিকে বলে ফেলি, 'তুমি একটি খচ্চর'। ফলে সে আমাকে পেটাতে সুরু করে। আমি মেঝেতে পড়ে যাই। ওই অবস্থায় তারা আমাকে লাথি মেরে চলে। তারপর এক সপ্তাহ আমি প্রায় হাঁটতে পারিনি কিন্তু তারপরও আমি সৃষ্টির ক্ষুধা থেকে ত্রাণ পাই না এবং সর্বশক্তি ব্যয় করে রাংতার টুকরো দিয়ে ছোটো একটি স্থাপত্য তৈরি করি।

সময় গড়িয়ে যায়, আমি খাই ও মোটা হই।

অনুবাদ : প্রদীপ চৌধুরী

কাউন্ট দ্য ল্যত্রেমঁ

ম্যালদোরোর গান (অংশ)

অনুবাদ : সুভাষ কুণ্ডু

[ফরাসি কবি ল্যত্রেখঁ মাত্র ২৪ বছর বয়সে তাঁর উগ্র রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের গুপ্ত পুলিশের হাতে নিহত হন। প্যারিসে তার জীবনযাত্রার অধিকাংশই অস্পষ্ট কুয়াশায় ঢাকা। ম্যাক্সজ্যাকব এবং অ্যাপোলিনেয়ার তাকে আবিষ্কার করেন মৃত্যুর অনেক পরে। তিনি হয়ে ওঠেন সুররিয়ালিস্টদের দেবতা। মানব সভ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাগুলিকে তীব্র আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত করে তিনি দেখিয়েছিলেন কী ভয়ংকর ক্রিয়াকাণ্ড সেখানে চলছে। আক্রমণ করেছিলেন ভণ্ডামি, নীচতা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতা লিপ্সা, তথাকথিত নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা—তথাকথিত অর্থে সাহিত্যে বলতে যা বোঝায় তার প্রয়োজনহীনতা বিষয়ে প্রথম তারই কণ্ঠ সোচ্চার। তার রচনা ভয়ংকর, তা হিম করে দেয় এবং নির্বাক করে দেয়। 'কবি' শব্দটিকে তিনি নতুন অর্থ দিতে চেয়েছিলেন।]

পৃথিবীতে কিছু কিছু লেখক আছে যারা মানুষের হৃদয়ের কতকগুলি সস্তা ভাবপ্রবণতা আবিষ্কার করে হাততালি পেতে চায়। তাদের এই কাজ করার ক্ষমতা অবশ্যই আছে। কিন্তু আমি। আমার সমস্ত প্রতিভাকে আমি নিয়োজিত করি নিষ্ঠুরতার আনন্দকে প্রকাশ করার জন্য। এ আনন্দ নয় ক্ষণিকের, নয় মিথ্যা—মানুষের জন্মের সঙ্গেই এরও জন্ম এবং মানুষের মৃত্যুতেই এরও হবে মৃত্যু! ঈশ্বরের সংকল্প অনুযায়ী প্রতিভা কি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেনি? অথবা, যেহেতু একজন নিষ্ঠুর, তাই বলে সে কি প্রতিভাহীন? আমার উক্তিগুলো থেকেই আপনারা তার প্রমাণ পাবেন : কিন্তু আপনাদের যা করতে হবে, তা হল এই—ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলি শুনতে হবে, যদি অবশ্য শুনতে চান!

মাপ করবেন! মনে হচ্ছে মাথার চুলগুলি খুলির উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু না, এ কিছুই না, কারণ আমি জানি অতি সহজেই হাত দিয়ে এদের আবার খুলির উপর মসৃণভাবে শুইয়ে দিতে পারব।

যে আজ আপনাদের সামনে গান করছে, সে দাবি করে না যে তার গানগুলি নতুন। বরং এই জেনে সে গর্বিত যে তার নায়কের মধ্যে যে মহান ও দুষ্ট চিন্তাগুলি কাজ করছে, সেগুলো প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে।

*   *   *   *

সারাজীবন আমি সংকীর্ণমনা ছোটো মানুষদের দেখে আসছি, ব্যতিক্রমহীনভাবে...। এরা দিনরাত মূর্খের মতো কাজ করে চলেছে, অন্যদের সঙ্গে নৃশংস আচরণ করছে এবং যতরকম উপায়ে সম্ভব মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে। এইসব শঠতাকেই সে নাম দিয়েছে 'গৌরব'। এসব দেখে

অন্যদের সঙ্গে আমারও হেসে উঠতে ইচ্ছে করে—কিন্তু এই অস্বাভাবিক অনুকরণ আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি একটা পকেট ছুরি নিয়েছি—এবং ঠোঁট দু'টো যেখানে একত্রিত হয়·সেখানকার মাংস কেটে ফেলেছি। এক লহমার জন্য মনে হয়েছিল, আমার কাজ আমি করে ফেলেছি। আমি একটা আয়নার ভিতর দিয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাটা মুখটা পরীক্ষা করলাম। এটা ভুল হয়েছে। ক্ষতস্থান দুটি থেকে পর্যাপ্ত রক্তপাত হচ্ছে, ফলে বুঝতে পারলাম না এটা অন্য মানুষের হাসি কিনা। কিছুক্ষণ ভালোকরে তুলনা করে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম আমার হাসির সঙ্গে মানুষের হাসির কোনো মিলই নাই। অন্যভাবে বলতে হয়, আমি হাসছিলাম না।

আমি এমন সব মানুষ দেখেছি—যাদের মুখাবয়ব ঘৃণ্য, যাদের ভয়ংকর চোখগুলি কপালের নীচে গভীর কোটরে ঢোকানো। তারা পাথরের চেয়েও রূঢ়, ইস্পাতের চেয়ে কঠিন, হাঙরের চেয়ে নিষ্ঠুর, যৌবনের চেয়েও উদ্ধত—ঘৃণ্য অপরাধীর চেয়েও নির্বোধ ও অনুভূতিহীন, চরম ভণ্ডের চেয়েও শয়তান, গ্রাম্য ভাঁড়ের চেয়েও উদ্ভট, পুরুত ঠাকুরের চেয়েও চরিত্রবান, চরম অন্তর্মুখী মানুষের চেয়েও এরা আত্মনিমগ্ন, স্বর্গের বা মর্তের শীতলতম প্রাণীর চেয়েও শীতল।

নীতিবাগীশ এদের হৃদয় খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত...এবং এদের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ নামিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ ও ক্লান্ত!

আমি এদের সকলকে একসঙ্গে দেখেছি—দেখেছি তাদের দানবীয় মুষ্টি স্বর্গের দিকে তোলা, সেই শিশুর মতো যে ইতিমধ্যেই তার মাকে অস্বীকার করেছে—সম্ভবত কোনো নারকীয় শক্তির প্রেরণায়। এদের চোখে শোকের ছায়া কিন্তু তা একই সঙ্গে জ্বলন্ত এবং ঘৃণ্য। হিমবাহের নৈঃশব্দ তাদের মধ্যে। তারা তাদের বুকের বন্দরে সযত্নে লালিত মহান এবং দুষ্ট চিন্তাগুলিকে প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। অবিচার ও বিভীষিকায় এরা এতটাই পরিপূর্ণ যে স্বয়ং করুণাময়ও এদের জন্য বিমর্ষ।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমি এদের দেখেছি, প্রতিটি মুহূর্তে, দেখেছি এরা অবিশ্বাস্য নির্বোধ অভিশাপ ছুঁড়ে দিচ্ছে তাদের চারপাশে যা কিছু জীবন্ত তার উপর, নিজেদের উপর, ঈশ্বরের উপর, গণিকাদের উপর এবং শিশুদের উপর—এরা কলঙ্কিত করছে শরীরের সেইসব অংশ যেগুলি অতিশয় পবিত্র।

এরপর ফুলে উঠল সমুদ্র, জাহাজগুলোকে টানতে টানতে ঢোকালো অতল গহ্বরে—ঝড় আর ভূমিকম্প ধ্বসিয়ে দিল বড়ো বড়ো দালানগুলোকে, প্লেগ এবং অসুস্থতাগুলি প্রার্থনারত পরিবারগুলিতে খতম করে দিল। কিন্তু মানুষেরা এ ব্যাপারে সচেতন নয়। আমি দেখেছি এরা পৃথিবীতে নিজেদের ঘৃণ্য আচরণের জন্য এদের মুখ ফ্যাকাশে কখনো বা লাল—কিন্তু এসব ঘটনা বড়োই বিরল।

কালবৈশাখী, ঘুর্ণিবাত্যা, নীল নভোমণ্ডল তোমাদের কোনো সৌন্দর্য আমি স্বীকার করি না ; ভণ্ড সমুদ্র আমার হৃদয় ; রহস্যময়ী পৃথিবী ; অন্যগ্রহের অধিবাসীরা ; সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড ; ঈশ্বর—যার অনন্য সাধারণ সৃষ্টি এসব কিছু, তোমার কাছেই আমি প্রার্থনা করি আমাকে একজন ভালোমানুষ দেখিয়ে দাও। কিন্তু তোমার কৃপায় আমার স্বাভাবিক শক্তি যেন দশগুণ বৃদ্ধি পায়—কারণ এরকম একটা দৈত্যকে দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েই মরে যাবো। মানুষ এর চেয়েও অল্পে মরে।

ক্ষুধার্ত

৭ম সংকলন

১৯৮৪

সম্পাদনা : শৈলেশ্বর ঘোষ

ক্ষুধার্ত সপ্তম সংকলন মে ১৯৮৪

লিখেছেন :

ফালগুনী রায়
সমীরণ ঘোষ
বিকাশ সরকার
রবিউল
অরুণেশ ঘোষ
জীবতোষ দাস
রাজা সরকার
নির্মল হালদার
জামালউদ্দীন
শৈলেশ্বর ঘোষ
শঙ্খ ঘোষ
নিকানোর পারা
নিত্য মালাকার
মলয় রায়চৌধুরী

ফালগুনী রায়

বিপ্লবের গান

আমাদের বুকে ভালোবাসা ছিল একদিন
পয়সার অভাবে আজ ঝরে গেছে সব প্রেম
বিপ্লবীদেরও খাবার সমস্যা থাকে
প্রেমিকের তো থাকবেই প্রেমিকাকে খেতে পরতে দেবার চিন্তা
স্রেফ খেতে পরতে দিতে পারেন বলে কত বাবু রাখেন রক্ষিতা

আমরা তো নিজেদেরই খেতে পরতে দিতে পারি না সম্যক—
গণহত্যা ও গণটোকাটুকিতে অংশ নিতে না পারায় আমরা
অনেকের কাছে বনে গেছি গাণ্ডু-
আমাদের অনেকে গ্রাজুয়েট হবার বছরেই রাজনীতির জন্য
হয়েছে রাস্টিকেট
আমাদের অনেকে পার্মানেন্ট হবার বছরেই রাজনীতির জন্য
হয়েছে ছাঁটাই
আমরা খুন হতে চাইনি চাইনি খুনি হতে
কিন্তু শহীদ হবার বদলে শ্রেণীশত্রু খতম করাই আমাদের পছন্দ

বিভিন্ন ময়দানে নেতাদের ভাষণ শুনে শুনে
আমাদের অনেকের পচে গেছে কান
আমাদের ভায়েদের মায়েদের বোনেদের প্রাণ
অনাহারে এবং অসুখে
শেষ হয়ে গেছে থেমে গেছে তাহাদের জীবনের গান
আর সব তাত্ত্বিক পণ্ডিত সিগারেটে দিয়ে শেষ টান
ঘুমিয়েছে সুখে
এই স্মৃতি চোখের সম্মুখে—বেদনার আমরা সন্তান
আমরা তাই
আর ভয় পাই না
এখন কেবল শুনতে চাই
বিপ্লবের গান॥

কবিতা বুলেট

কোথাও শহীদ বেদী ভেঙে তৈরি হয়েছে শনির মন্দির
চলো চলো চলো সে মন্দির ভেঙে ফের
তুলি গড়ে সর্বহারা বাহিনীর কেন্দ্র সামরিক

মৃত সব শহীদ বন্ধুর শেষ যৌনেচ্ছার উদ্দেশ্যে
আমি একদিন করেছিলুম শোকপালন বন্ধ করো মাস্টারবেশন
বেশ্যার ঘরে থাকে টেলিভিশন তাদের কুকুরের জন্যও বরাদ্দ
থাকে মাংস
দেওয়ালে ঝোলেন সেখানেও সস্ত্রীক পরমহংস

আর কত সত্যিকারের সতী মেয়ে বিপ্লবের কারণে
যৌনাঙ্গে বহন করে পুলিশের চুরুটের ছ্যাঁকা
তাদের প্রেমিকরা কেরিয়ারিস্ট হতে না পারায় সমাজের চোখে
বনে যায় বোকা
আর চালাক পাঁঠা কবিদের ভিড়ে ভরে ওঠে কফিহাউস
বঙ্গ সংস্কৃতির প্যান্ডেল উঠিয়ে নিলে পর
ময়দানের সে জায়গায় চরে বেড়ায় ভেড়া...

কবিদের যোগ্যতা আমি চাই বিচার্য হোক কেবলি কবিতায়
রোজগেরে ছেলেদের ভিড় বেড়ে যাক বরং বিবাহ সভায় অথবা
বেশ্যাখানায়

রক্ত মাংসের শরীর আমায় মরে যাবে একদিন নিশ্চিত
তবু শব্দের শরীরে থাকবে বেঁচে আমার চেতনা
ভবিষ্যতের পাঠক, আমি জানি কবি কত মাইনে পেতেন
সে খবর নিশ্চিত রাখবে না

কবিদের কবরে বসে লেখা

আমার মস্তিষ্কের কোষ আর করে না সেই ভ্রাম্যমাণ শব্দ বিচ্ছুরণ
সঞ্চরণশীল বুদ্ধের উপদেশ পাহাড়তলীর গাঁ ছাড়িয়ে
ছড়িয়ে গিয়েছে একদিন গ্রিসে গান্ধারে—নগরে বন্দরে
আমার ভাষা সব কেবলি কি স্বরযন্ত্র নির্ভর অথবা সে চেতনার উদ্ভাস
এই প্রশ্ন এসে উত্থিত শিশ্নের প্রবল কামোচ্ছ্বাসকে কেবল
করবে সে নীরব

ইস্কুল কলেজেও যোগ অভ্যাস শিক্ষা দেবেন ভারত সরকার
আর কম্যুনিস্ট রাশিয়াও যৌগিক প্রক্রিয়ায় সারিয়ে ফেলবে তাদের
পাগলাগারদের অধিবাসীদের ও অ্যাথলিটদের বাড়াবে উদ্যম
মস্কো টু লেনিনগ্রাদ হবে টেলিপ্যাথির বৈজ্ঞানিক
পরীক্ষা ভারতীয় মুনিদের কাছে যা ছিল নিছক .ছেলেখেলা
সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যতম আবিষ্কারক ও স্রষ্টা হে লেনিন
নাভির ওপর পদ্মফুলের কল্পনারত যোগীদের নিয়ে তির্যক ব্যঙ্গ কি
—যা আপনি করেছিলেন ক্লারা জেংকিনের কাছে—তবে আজ হলো
বুমেরাং
হায় যোগের নামেতে আমরা ভারতীয়
করতে শিখি ব্যাভিচার খেতে শিখি গাঁজামদভাং

এই আমার একমাত্র
কবিতা
যা কবিদের কবরে
বলে লেখা॥

তিনটি কবিতা

অবিনাশী আত্মার ওজন মাত্র একুশ গ্রাম নাকি—
মাত্র একুশ গ্রাম নাকি?
হে আত্মা—সন্ন্যাসী ও লম্পটের
শরীরে আমার যুগপৎ আবির্ভাব
আমার ও চামারের দেহে তুমি
আমি ব্রাহ্মণ না হয়েও বলতে পারি
গায়ত্রী মন্ত্র—একজন চামার জুতো
বানাবার পর দেখতে পারে টেস্ট ক্রিকেট
আত্মা আমার—তুমি কি ক্রিকেট
বলের চেয়ে হালকা—আত্মা আমার
শরীরের সীমানা ছাড়িয়ে তুমি চলে যাবে
একদিন অনির্দেশ ওভার বাউন্ডারির দিকে
মৃত্যুর ব্যাট হাতে মহাকাল এভাবেই
আমাদের চেতনার পিচ থেকে তুলে নেবে সময়ের রান
সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি—খ্রিস্টপূর্ব থেকে খ্রিস্টাব্দ
ছেঁড়া জামা ছেড়ে দিয়ে নতুন বসন—এক দেহ থেকে
উৎপন্ন হবে অন্য দেহ—এইভাবে রিলে হবে
ইতিহাস সাহিত্য সভ্যতা—হে আত্মা সদা ভ্রাম্যমান

সীমিত ওজন দিয়ে তুমি তবে কিভাবে সর্বব্যাপী
তবে ওই বিদেশি বিজ্ঞানীর অনুমান ভুল না কি
এবং ভারতীয়রাই সঠিক
যারা খ্রিস্ট জন্মের বহু আগে থেকে করেছে প্রচার
আত্মার ক্ষয় নেই ভয় নেই লয় নেই
আত্মা অবলোকনে নেই রয়েছে মননে
যেমন সেতারের তারে সুর নেই কোনো
সুর আছে সেতারির মনে

২

সেই খানে শতাব্দীর শেষ
সূর্য নিস্প্রভ
মানুষের মনীষার দীপ্তি যত ছিল
সবকিছু হয়ে গেছে ম্লান
ব্রহ্মান্ডের যেহেতু অবসান

সূর্য কেন্দ্রিক যত গ্রহ উপগ্রহ
কক্ষহতে উল্কাপিণ্ড শুধু উল্কার আগুনে
গেছে পুড়ে পৃথিবীর সব ইতিহাস বই ভুগোলের ম্যাপ
সুন্দরীর ভুরু চোখ নাক ঠোঁট বুক দ্যাখার জন্য
পুরুষের চোখগুলি খোলা নেই আর

৩

হঠাৎ কান্না পায়
না ব্যর্থ প্রেম বা ক্ষুধার জন্য নয়
আমি মরে যাবো মরে যাবো এই চেতনায়
জীবনের গর্ভীর থেকে উঠে আসে ক্রন্দনের স্বর
এতদিন বুঝিনি আজ বুঝি বেশ ভালোভাবে
জীবনকে বেসেছিলুম ভালো
দারিদ্র ও নৈরাশ্যের ভেতর
অসফল যৌন তাড়নার তীরে
সেই আত্মপ্রেমী ভালোবাসা
ছিল শুধু আলো হয়ে
মৃত্যুর উপত্যকার তীরে।

আমি এরকমই

সকালে রোদের দিকে তাকালে চোখে জ্বালা দিনদুপুরে ঘুমিয়ে
পড়ি অনেক সময় চলন্ত বাসে রাতদুপুরে নেশাহীন নির্ঘুম
চিন্তাগ্রস্ত আমায় কেউ কবি কেউ পাগল জুয়াচোর ভাবে কেউ
বেকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি নগর থেকে ঘরের দিকে
ফিরে আসি অনেক সময়

আমি আমার গণিকাগমনের কথা বলিনি প্রেমিকাকে
সেও বলেনি কনট্রাসেভটিপস ব্যবহার করেছে আগে
সে, কতবার সন্দেহের প্ল্যাটফর্ম থেকে যৌন বিশ্বাসের
ট্রেনে উঠে পড়েছি আমরা এমনকি ডি-রেল হবার
ভয় ভুলে এখন আমরা এক ভাষার ভৌগোলিক সীমানা
ছাড়িয়ে অন্যভাষী প্রদেশের দিকে চলে যাচ্ছি

কল টিপলেই জল পড়ে এরকম কলকাতা পাওয়া যায় না
সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে
ধোপার বাড়ি পাঠাতে পারলুম না জামাকাপড়
বিদেশি ম্যাগাজিনে প্রেমিকাসহ ছবি ছাপিয়ে
হতে পারলুম না আন্তর্জাতিক বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির
চৌকাঠ ডিঙিয়ে মণিকার যোনির উপযুক্ত হতে
পারলুম না বিজনেস ম্যাগনেট আমি হতে পারবো
না জেনে অনুরাধা শায়া না তুলে উলঙ্গ
উরু মেলে দিল বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র দীপঙ্করের
কাছে হাড়কাটার বিজলীও আলুসেদ্ধ ভাত খেয়ে
ভাঙা ঘরে আমায় ভালোবাসতে চায়নি সে একটা
পাঁচতলা বাড়ি চেয়েছিল আমিও বুকে যেন খানিকটা
মাংস থাকে এরকম স্ত্রী খুঁজেছিলুম, আমার বুকের
ভিতর লোভ অথচ হৃদয় খুঁজতে গিয়ে বুকের ভিতর
রক্তমাংসের গন্ধ পাচ্ছি কেবল—

আকাশ ধোয়া বৃষ্টির পর

অজস্র জাম আর জারুল গাছে আকাশধোয়া বৃষ্টির পর ভাষা
ওঠা রোদ্দুর অজস্র বৃষ্টি জলবিন্দু মুক্তা যেন ঠিক আর
কলমের আঁচড়ে কালির টাটকা গন্ধ আজ বেস্পতিবার মদ বন্ধ
লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তেন মা বালকবেলা প্রতি বেস্পতিবার
মা-র চোখে ছানি মা-র আশাকে টুঁটি টিপে আমি মাতাল

অজস্র জাম ও জারুলের বৃষ্টি ধোয়া পাতায় ঝলমলে রোদ্দুর
আমি বৃক্ষকাশময় হাত রেখে বলি
মাটির সোঁদা গন্ধে নিশ্বাস নিয়ে বলি আমি
নারীর জন্য এখনো প্রকৃত পুরুষ হতে পারি
আমার বুকের রক্তে যে নারীর সিঁথি লাল হয়েছিল
সে যখন অন্য পুরুষের জন্য চলে যায়,
সুখি হোক এই প্রার্থনার পর সেই নারীকে হত্যা করার কথা ভাবি আমি
আমার অসুখ সারাতে পারবে না তুমি নিসর্গ
আমার ব্যাধি সারাতে পারবে না তুমি চিকিৎসক
সমুদ্রের ঝড়ের ভেতর বিধ্বংসী বন্যার মৃত্যুর শব্দের ভিতর
আমার হাহাকার আমি উন্মাদ আশ্রমের কাছে দাঁড়িয়ে
বুদ্ধের নির্বাণ—আমার বাবা নির্বাণ লাভ করেছেন
কিনা আমি জানি না রৌদ্র তুমি উত্তাপ দাও
মাটি তুমি শস্য দাও আমার মৃত্যুর দিনে বৃক্ষ তুমি
উপহার দেবে চিতা কাঠ, আমি অবিনাশী আত্মাকে
উপহাস করে নক্ষত্রের কাছে অনন্তের স্বাদ পাই
প্রেমের জন্য প্রতিহিংসা সম্পর্কে আমি সচেতন
সামনে মদ রেখে আমি মদ্যপান বিরোধী সভার
অভিভাষণ লিখে দিতে পারি
পার্টিমিছিল থেকে মদের দোকানে ঢুকে যেতে কোনো
অসুবিধা বোধ করি না আর—

সমীরণ ঘোষ

ভিক্ষা

ভিক্ষা পাত্র ভরে আছে শূন্যতায়
জীবনের পুনর্জন্মের আর অমরত্বের ভিক্ষাপাত্র
কখনো ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আছড়ে পড়ে
আবার বুকে জড়িয়ে ছুটে যেতে হয়
হা জীবন, সম্মুখেই সামুদ্রিক বিছানা!

চোখ বন্ধ করে এক পা বাড়িয়ে দিতেই
খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে জল
'ঐ পাত্র ফেলে রেখে এসো, অনন্ত রাত্রি
আমাদের জন্যই শুরু হবে
পরাজয়ের ভিতর দিয়েই আমরা বিজয়-প্রক্রিয়া চালাব'
...তবে কি মৃত্যু আমাদের দুর্বোধ্য কল্পনা
আত্মহননের পর আরও নবীন ও প্রকাশ্য জীবন
বহন করে যেতে হবে!

অনতিক্রম্য দূরত্বে রণক্লান্ত যোদ্ধার মতো ঘুমিয়ে পড়া
ক্রমাগত ভিক্ষাও যুদ্ধ একপ্রকার
ক্ষুধার্তই প্রকৃত যোদ্ধা—
আশাহত লক্ষ জীবাণু শরীরী অবয়ব ফাটিয়ে
বেরিয়ে আসতে চায় জলে ও ডাঙায়
অবিশ্রাম রক্তক্ষরণ...
মাতৃজঠর থেকে একটি শূন্য হাত
মহাশূন্যে বাড়িয়ে রয়েছে উদ্যত

মৃত্যুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রী সত্তার
অক্লান্ত ও নিরুপায় ভ্রমণ যোনিপরিক্রমা
ভ্রূণধারণের যোগ্য পৃথিবীর হৃদয়ের মতো
বিপুল এক যোনির ব্যাদান চাই
স্রষ্টার নিজের জন্মের প্রার্থনা ও বিলাপ শোনা যায়॥

কয়েক ইঞ্চি মাত্র

ফুল-পাতায়-কাঁটায় আমার রক্ত মাখামাখি হয়ে গেছে
ঘাসে ভাসমান ধুলিকনায়, তুলোয় ও পাথরে সর্বত্র।
আমি এ কোন রক্তাক্ত স্মারক বয়ে নিয়ে যেতে চাই,
দাঁতের নখের এ কোন বিষ, প্রণয়!
আঘাত ও আসক্তি! ওইসব মাতাল নদনদীর ভেতরে
আশ্রয় দৌর্বল্য হৃদয়ের রক্তক্ষরণ
যে করেই হউক আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে
ছিটকিনি তুলে দিয়ে জলের কুঁজো, শিথিল লিঙ্গ,
আর বিছানা ব্যবহার করাই স্বাভাবিক ধর্ম।

একটি একটি করে সুসংবাদ/দুঃসংবাদ আসুক, ফিরে যাক,
গর্ভধারণের সংবাদ, গর্ভপাতের সংবাদ,
এক ঝাঁক শিশুর মৃতদেহ সহ আসুক সংবাদপত্র
আসুক সেন্সাস কর্মী, আরক্ষা ও দমকল,
জীবনকে ভালোবেসে আমি শুধু হৃদয়ের ফুটো ও
রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দিয়েছি, এইমাত্র, তাছাড়া
দু'হাতে দশটি আঙুল লোহার জালে থাবা ডুবিয়ে
রিপুতাড়িত মাথায় লক্ষাধিক উজ্জ্বল প্রত্যাখ্যান
ভাসমান সভ্যতার খড়কুটো আমি সচেতন স্বপ্নে
প্রস্রাবে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম—

ইতিবাচক যোনিসমূহের কাছে প্রস্তাবিত লিঙ্গ সমূহ
সাংস্কৃতিক বন্ধনে লিপ্ত ভাতের গন্ধ,
তাঁতের শব্দ, সংবাদ কাব্য, নিহত শিশুদের ছবি,
অধিকতর রক্তপাত অধিকতর স্বাধীনতা এনে দেবে।
আমি শুধু পরিমার্জনের অভাবে আমার নিজের উত্তাপ
পরখ করে চলেছি বন্ধ দরজার আড়াল থেকে
ধ্বনি দিচ্ছি, আমি কোনো যুদ্ধের কেউ নই,
আমি কোনো সংগ্রামের কেউ নই, আমি আমারই সন্তান,
আমার প্রভাব বিস্তার কখনোই কয়েক ফুট নয়, বড়ো জোর
কয়েক ইঞ্চি মাত্র...

জীবনের জন্য

জীবনের জন্য ভালোবাসা-বাসি মৃত্যুর ফ্যাকাশে মুখের কাছে
আমাকে নিয়ে যায় বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বলে
ধর্মীয় শোধনাগারে চালান হয়ে যায় রক্ত ও বীর্য
তবু এক রাত্রির জন্য ধার চাই বেশ্যার হৃদয়
অন্তত একরাত্রি আমি নির্লোম শরীর ভেদ করে
ঢুকে পড়তে চাই—দেহরক্ষীবিহীন
প্রহরীশূন্য ফটক ও আমি, হাঁস ও বন্দুক
পরস্পর একবার পরীক্ষা করে নিতে চাই
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে আমার হঠকারী লিঙ্গ ক্ষমাপ্রার্থী
শেষ নক্ষত্র মুছে যাবার পর
সূর্যের মৃত মুখ দেখাবে বলে কারা গেয়ে যায় অশ্লীল জাগরী

এসো

দেখে এলাম অনেক ফুল ফুটে রয়েছে স্থানে ও অস্থানে
লাল ও হলুদ এইসব অবর্ণনীয় ফুলের কাছে আমার দুঃখ
আর অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলাই ভালো
আমি প্রহরীর চোখে চোখ রেখে নিজের থুতু গিলে ফিরে আসি
উদ্বাহু বন্ধনের রজ্জুতে মোম ঘষে নেবার মতো জরুরি
কাজ পড়ে আছে, স্বাধীনতাই ভক্ষণযোগ্য মনে হয়!

প্রকৃতই হতাশাব্যঞ্জক দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, শরীরের মাংসের পচনশীল প্রেম যতটুকু বাজে তার চেয়ে দীর্ঘসময় স্তব্ধ হয়ে থাকে, ঘেন্নায় মিটিয়ে যায় বিপরীত লিঙ্গ, পোশাকে জ্বলন্ত আগুন সহ পালিয়ে যায় মানুষ, মৃত্যুর সঙ্গে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আমি ডাকি এসো, আর একবার এসে ধরা দাও, এই কবি ও শয়তানের আরও কিছু সংক্রমণযোগ্য ব্যাধি রয়ে গেছে, দূরে ছায়াচ্ছন্ন শিকার-কাহিনি থেকে উঠে এসো এই নৃত্যপর আদি ও অকৃত্রিম উল্লাসে, এখানে যা হারাবার আনন্দ, তার চেয়ে দুঃখিত তোমাদের সংরক্ষণ প্রয়াস, তোমাদের বর্ণ গন্ধ সহ এই কালো লাভা স্রোতে এসো ভেসে যাই—

জীবনের পরিবর্ত জীবন আমার
সংযোগ রক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করি আমার কণ্ঠ বসে গেছে
আমার আবেগ মানুষের মতো না, আমার ডাক
চতুর্থ পৃথিবীর মতো নিঃসাড়, প্রতিকূল ও ভয়াবহ
ক্ষমার অযোগ্য আমি প্রতিটি মানুষের শাদা হাড়ে
কালি মেখে দিতে চাই, আমার বেঁচে থাকার বর্ণনা
গর্ভপাতের মতো সাংকেতিক

মানুষের প্রতি গভীর অপরাধ আমার
নিজের ঘর খুঁজতে গিয়ে অনবরত ভুল দরজায় আঘাত করি

আহা আমার স্বাধীনতা, সবচেয়ে একাগ্র মুহূর্তে
শুধু সর্বনাশের কথা ভাবি আর উদ্বাহু বন্ধনের রজ্জুতে
মোম ঘষে নিই যেন পরিষ্কার করে রাখছি বন্দুক
অজস্র ফুল ফুটে আছে দেখে এসেছি
এ কথা স্মরণ হয় আর ভয়ঙ্কর উল্লাসে
ফেটে পড়ি, সৃষ্টিশীলতার কথা ভাবি
আর আমার আত্মা আবেগে গড়িয়ে পড়ে

পরমা ও আমি

আমি আজ পরমাদের বাড়ি যেতে চেয়েছিলাম
সহস্র ভালোবাসা বহন করে রাস্তার উপর
আমি বমি করে ফেলি দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের মুদ্রায়
পরমাদের বাড়ি থেকে অনতিদূরত্বে দীর্ঘ একটি রাত কেটে যায়
আমার গোড়ালি ডুবে গেলো মাংসাশী মৃত্তিকায়
অস্থায়ী তাবু তছনছ করে অন্ধকার ছোরা
বিঁধে গেছে হাড়ে ও মজ্জায়
পরমার প্রেমের চেয়ে মূল্যবান আঘাত আসে
ধূসর দিনের শেষে ফসলের মাঠে পল্লীতে নগরে
ভয়ংকর উল্লাসে আমি শিকার হয়ে গেছি

দ্বন্দ্বময় প্রণয়ের চেয়ে ঢের পরিচ্ছন্ন
আমার এই জানু ভেঙে যাওয়া অন্ধকার কলঘরে
শ্বাসরোধী নাটক আমার খড় ও মাটির কাঠামোতে
প্রাণ দিতে পারিনি পরমার কাছে গোপনে
কিছুই বলার থাকলো না একটি গোলার্ধ যখন
অন্ধকারে ডুবে গেলো আমারই বিক্ষোভ আমি
সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে গেছি

পরমাদের বাড়িতে আমার যাওয়া হবে না কোনোদিন
কারণ আমি ওদের খিড়কি দরজা চিনি না
বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই অনুপ্রবেশকারীর মতো ছদ্মবেশে আছি
নিস্ফল ঘোরাঘুরি কম বেশি ছ'ইঞ্চি রিপুর তাড়না
একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে একদিন মনে হবে
পরমার প্রয়োজনও স্থিতিস্থাপক ছিল।।

বিকাশ সরকার

ভর্ৎসনার পাণ্ডুলিপি

একটা পুরো দিন ঘেন্নার ভিতর দিয়ে কেটে গেল, অথচ
আবিষ্কৃত হ'ল না এই ঘেন্না কার দিকে লক্ষ করে আছে...

আমি যে কুমারীকে ভালোবেসে ব্যয় করলুম কতগুলি
নিরেট বছর, সে এখন ঋতুমতী
থুথুর ভিতর আর ধোঁয়ার ভিতর তার পুনর্জন্মলাভ
যে কোনোদিন সে আমার সন্তানের মা হতে পারে
ঘেন্নার মা

প্রতি বছরের ৬ই জানুয়ারি আমার মৃত্যুদিবস
পালন করেছে ব'লে, সে, আমার সন্তানের মা হবে
প্রতি বছর, অইদিন, অই নির্মম ৬ আমাকে হত্যা করে
আমার গলিত শব পড়ে থাকে গোলাপকাঁটার ভিতর
শবের আশেপাশে ঘাস আর নৈরাজ্য, উড়ে বেড়ায়
মৌলিক প্রজাপতি ; যার ডানা নীল, লাল শুঁড়
বুক ভরা বিষ আর বিষ আর বিষ
নিজের প্রতি যার অশেষ ঘেন্না, সে কি কোনো কুমারীত্ব
সহ্য করতে পারে? নির্মম ৬ তাকে ফি-বছর গুপ্তহত্যা করে

'কী থাকবে মৃত্যুর ভিতর'—এই প্রশ্ন নিয়ে যে সব রমণী
চায় ভালোবাসা, তাদের বলি 'দূর হটো,
মদ ও মাংসগানে আমি নিয়মিত, আমি চাই জল
নিজের প্রতি যার অশেষ ঘেন্না...ভালোবাসা তার কাছে
ক্যাম্পোজগুল্ম হয়ে জেগে ওঠে
স্বেচ্ছাচারী, সে বলে 'যাও'
সে বলে প্রেমহীনতা

কালো পৃথিবীর গল্প

দেখি রাত্রির অদ্ভুত মুঠো খুলে, বেরিয়ে আসছে
উদাসীন ও লোভী এক দীর্ঘ অন্ধকার
বিস্ফোরিত হ'য়ে ভেঙে পড়ছে যান্ত্রিক মেধা
দেখি, আর সেই উদাসীনতায়, নৈরাজ্যে বসে আমি শোনাই
কালো পৃথিবীর গল্প
শোনাই আত্মহন্তারক গান। ভৌতিক হাওয়া, আর
ছুটে আসে প্রাচীন বৃষ্টি
ভালোবাসার গল্প আমি ভুলে গেছি বহুদিন
ভুলে গেছি জোছনা, জলপতনের শব্দ, ফুল্ল অনুষ্ঠান
লক্ষ বর্গমাইলের অন্ধকারে, এখন, আমি দেখি উড়ে যাচ্ছে
ভাত
পৃথিবীর সমস্ত রুগ্ন ও বিপন্ন নদীর ধারে আমার নিঃসঙ্গ ভ্রমণ
আর মাংসে-উৎসব
প্রোটিন শিকার ও ভাতহননের পর, একা, আমি শোনাই
কালো পৃথিবী/আমার দগ্ধ হাড়, হাড়ের ভিতর জেগে ওঠে
অপজীবাণু, জেগে ওঠে অনন্ত সন্ত্রাস
আমি শুনি আর্তনাদের শব্দ
একক চিৎকারে আমি উত্তেজক হেসে উঠি
আমি ছুঁতে চাই নিজস্ব কলম
আমি ছুতে চাই বিবশ ঘিলু, ঘৃণা ; তখন অন্ধকারে
আমার হাত আমারি হাড়ের উপর আছড়ে পড়ে
আমি কাঁদি, অনাথ সন্তানের মতো কাঁদি
ছুঁয়ে দেখতে চাই পুরোনো দিনগুলি
ছুঁয়ে দেখতে চাই প্রীতি ও ফুল, স্মরণীয় জলপ্রপাত
তখনো, আমার আঙুলে উঠে আসে রক্ত
আমার সামনে থাকে অত্যাশ্চর্য কুয়াশা, থাকে দড়ি, আর
কালো পৃথিবী

প্রতিচাঁদ

চাঁদের আশায়, শ্মশানের নগ্ন চত্বরে বসে র'লাম
আমরা, কেটে গেল একটা সুদীর্ঘ রাত/চাঁদ উঠল না...
শিরীষ গাছের চূড়ায় দামাল বাতাস ক'রে গেল
ভৌতিক গান ; খাঁ খাঁ চত্বরে আমরা, বসে আছি ইতিউতি
কাছেই নদী, জলশব্দ আর সুনশান উথারে তখন
চিতার শেষ অঙ্গার, রহস্যজনক নাভি/ঘাসের ডগায় নেমে এলো

শীত, কুঁকড়ে উঠল লোম/চাঁদ উঠল না...
অন্ধকারে, আরও বেশি আন্তরিক হয়ে এলো চামুণ্ডা মূর্তি
জ্বলতে থাকল তাঁর খাঁড়া, রোমাঞ্চদায়ক তাঁর দুধ থেকে
ঝড়তে থাকল রক্ত, চার হাতে, ছড়িয়ে দিল সে ছাই
তীক্ষ্ণ নখে, সে, যেন জ্যান্ত...ছড়িয়ে দিলো
রহস্যপত্রিকার হাওয়া/আর আমরা
তখন বন্দনা করলাম চাঁদের, চাঁদের স্তব জপ ক'রে
আমরা আকাশের দিকে উড়িয়ে দিলাম
আমাদের জামা প্যান্ট জাঙিয়া শাড়ি ব্লাউজ ব্রা
আকাশে স্তুপমেঘ, শিরীষ গাছের তলায় ঘুমন্ত
নাগা সাধু
তার পায়ের কাছে জারজ শিশুর করোটি, তন্ত্রসার
এপাশে ওপাশে তাড়ির বোতল, গাঁজার কল্কে, ভাং
চাঁদ উঠল না
শেষরাতে, আবিষ্কৃত হ'ল আমরা নগ্ন
আমাদের সব গেছে অই ভণ্ড চাঁদের প্রার্থনায়
পরস্পর, নারী ও পুরুষ, আমরা আলিঙ্গন করি
সৌরসন্তান আমরা, টের পাই, এই অকপট শ্মশান
আমাদের উপযুক্ত ভূমি

রবিউল

যে কোনো সুন্দর জিনিষ

যে কোনো সুন্দর জিনিস বড্ড একা একা থাকে

রাত পোনে তিনটার সূর্য কোথাকার ঈথারের আবডালে গেছে
একবার ঘনচুলের ভিতর কালো অক্ষরের সুরগুলো হারিয়ে গেল
পরদিন শিশিরের চারিধারে অক্ষয় প্রাচীর
রূপালী ডিম ঘিরে ঘোরে খড়কুটো গোলাকার বাসা
লতাচুল সুতোখোপা শাদা রংএর বিষ্ঠা
ধুলোর উপর একদলাকফথুতু ধুসরমুক্তো ঘনবীর্য
উড়ান দিয়ে কেমন চিল্লি দিয়ে ওঠে—
সন্ধ্যা সকাল সব তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার
আঁধার আর আলো মিশানো দিগন্তের দুই প্লেট চতুর আহার

যে কোনো সুন্দর জিনিষ বড্ড একা থাকে

শহর ডুবোজাহাজ হয়ে ধীরে আঁধার গড়িয়ে ওঠে
পুকুরের পোষা তিমিমাছ আড়মোড়া খ্যালে
অক্যুরিয়ামে কেউ ব্যাঙাচি পোষে না
মুরগি আর হরিণ ঘোরে পাশাপাশি একচিলতে উঠোনে
আকাশে জলীয়বাষ্প মেঘ নামে জমে
বুকের বামপাশের ব্যথা ডান পা দিয়ে সর্‌সর্‌ করে নীচে উঠে আসে
শহরের সবাই প্রায় টুপি পরে যান্ত্রিক সঙ্গম করে
তবু গিজিগিজি মানুষ যোনি থেকে ছলাৎ করে পিছলিয়ে
দ্রুত বেড়ে ওঠে—
লোকসংখ্যা বনাম মাতৃপ্রেমের অমোঘ দৌড়ুড়িতে
আজকের দিনদুপুর রাত সোয়া এগারোটা পর্যন্ত দেরি করবে
বিমানবন্দরে সদ্যজাত কালোসাপ আর মৃতজোনাকীদের
এক সীমানা-নির্দ্ধারণী জমায়েত হওয়ার কথা আছে
যে সব গাধারা তুমি দিয়ে প্রেমের কবিতা লেখে

তাদেরকে হিজড়ে ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না
নিম্নাঙ্গের কার্যকলাপই সবার একমাত্র উচ্চাঙ্গের বংশপরিচয়
হিংসে করে বীর্য ঢাললে সবাই-এর অক্যুরিয়ামে জন্ম হতে পারে
সব কবুতরগুলোকে চারডানা করে উড়িয়ে দিয়ে
শান্তি শান্তি বলে হাত মারলেও পরমশান্তি আসবে না

মৃত্যুই পরমশান্তি সেই গভীর যোনির মতন
আমি মাইলকে মাইল এক পুত লিঙ্গ হবো উত্থিত
তার অশ্লীল গর্তের ভিতর

যে কোনো সুন্দর জিনিস বড্ড একা একা যাকে
শেষরাতে চুমুচুমি করতে নেই
মুখের বিশ্রী গন্ধে ঘুম খুলে যাবে
মেয়েদের বুকে মুখ ঘষে স্তন টিপে
জানো আমি ভীষণ অসহায় দুঃখী বলাকে মিন্ মিন্ ন্যাকামি
অথচ ন্যাকামি ছাড়া প্রেম হয় না
শরীরে শরীর চিতুপুড়ের হাজারো মহড়া
তবুও নিঃসঙ্গতার কোনো প্রতিষেধক এহেন ব্রহ্মাণ্ডে নেই

যে কোনো সুন্দর জিনিস বড্ড একা একা থাকে

মাঝখানে প্রয়োজনীয় অতীব মূল্যবান সামগ্রীসব কড়া পাহারায় বাস করে
চোখের মনির ভিতর কয়লা-খনি
দাঁতের পাহারায় বিস্বাদ জিহ্বা মুখের খাঁচায় বন্দি
সমস্ত শরীর জুড়ে শুধু বিবমিষার স্বাদই আন হে গোলপি আসামি
দাঁতের ফাঁকে লুকোনো জীবজন্তুর মাংসকণা মাছের কাঁটা লতাপাতা
মুখ থেকে শরীরের দেড় হাত দূরত্ব পার হতেই অন্য মতান্তর
পানীয় জলের প্রস্রাবে রূপান্তর
কতবার ধোয়াধুয়ি শ্রোনীচক্রে গুহ্যদ্বার
শিসুশ্নখী সমকামী অর্শরোগের জন্মভূমি
বদৌলতে ভাগাড়ে ফুলকপি-চাষ
বিষ্ঠিতে ঘামের শরীর খসে পড়ে যায়
গোলাপের গায়ে বোগলের গন্ধ
দু-আঙুলের ফাঁকে পুরাতন ক্ষত লাল পিঁপড়ের মালা
নখের ভিতর লুকোনো ময়লা
সেই যে মূল্যবান আঁধারের আসল ঠিকানা
উরুর চোখে আঁটা কালো সানগ্লাস নাকি লিঙ্গযোনির সখের বাগান
আর বেশিদিন নেই রে তোদের ইচ্ছাশক্তির মহড়া

শূন্য শূন্য হে শূন্য বংশতালিকা
বুকের মাঝে ঢিপ ঢিপ হৃদয়িক নৈসর্গিক দ্বন্দ্ববাদ ব্যামো
তিরিশ ছুঁই ছুঁই আর কদ্দিন হে মাংসের ডাইনামো
রক্তপুড়িয়ে হাইওয়েভে ঘন্টায় সাতমাইল মালগাড়ি চালাবে
সুখ হারিয়ে যাবে বলে আমাকে অনেকেই জিহ্বার অমতে
ভীষণ গালাগালি দিয়ে তাদের বিকল্প সুখ ফিরিয়ে আনে
দড়িতে শিশ্নসুখ বেঁধে নিয়ে লিঙ্গের নোঙ্গর নেমে যায়
নেমে যায় হু হু করে নেমে যেয়ে অতলের তলপেট
খামটি দিয়ে ধরে সুসুখের অসুখ সারাবে বলে

হাতের যাবতীয় নখে-আঙুলে-মুষ্ঠিবদ্ধ-ধরা কালো সেই অসুখী বীর্যমুখি
লিঙ্গেরনোঙ্গর আর কতদিন আঁকিবুঁকি মৈথুন লেখালেখি
কাগজের নিষ্পাপ শাদাপাতে আমরণ যোনিচিরে ধর্ষণের বিষাক্ত চুরিখেলাখেলি

সুন্দর হয়ে থাকতে গেলেই একা হয়ে যেতে হয় অসহায়
সুন্দর জিনিস মাত্রই একা একা থাকে
যে কোনো সুন্দর জিনিস বড্ড একা একা থাকে

অরুণেশ ঘোষ

কুমারীর গুহা

'অমিই সেই আরতি...তুমিও কি আমাকে চেনো না'?
যখন আমরা নেংটো, তখনই জানতে চাই তার নাম
যখন আমরা নেংটো, জিজ্ঞেস করি এটা কোন গ্রাম
শ্মশানের শেষ আর বসতির শুরু, এই যে নদীর বাঁক
এখানেই কে তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে লুকানো এই গুহা
কে তোমাকে খুলে দিয়েছে এই জীবন, মৃতের ওপর নেচে ওঠা?
কে তোমাকে জাগিয়ে তুলেছে ঢেউ, বীভৎস থেকে এই গান
হাত বাড়িয়ে নিতে হয় মুদ্রা, নিষ্ঠুর জনতা, হাতের তালুতে অস্থির
নেচে ওঠে একই প্রাণ...

কথা বলতে শুরু করি আমরা, হাসি আর হাত রাখি
যেখানে থেমে আছে আমাদের সুর, যেখানে স্তব্ধ উন্মাদ...
আত্মহত্যার আগে যারা মেতে উঠতে চেয়েছে পৃথিবীর শেষ
উন্মত্ত সঙ্গমে...
সমুদ্রের ঢেউয়ে, পর্বতের চূড়ায় আর নোংরা কাঁথার ওপর গড়িয়ে
যাদের স্থির থাকতে হয় একে অন্যের যৌনাঙ্গে হাত রেখে
সে হাত মুঠো করে ধরেছে লিঙ্গ, সেখানেও ফুটে ওঠে ঘাম
যে আঙুল স্পর্শ করতে চায় জরায়ুর শেষ, সেও হয়ে ওঠে অসাড়
আমাদের ঘিরে জেগে ওঠে যে গন্ধ, সে-ই বয়ে আনে মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আমরা হাসি তার দিকে তাকিয়ে, তুলে ধরি মদের গ্লাস...

গুহার বাইরে এক জীবন, গুহার উপরে আরেক আকাশ, শূন্যতা আর মাটি
নক্ষত্র আর ছায়া পথের গুহা থেকে গুহায় আমরা হাঁটি
হাতে তুলে দেখি সামান্য পোশাক, বীনা নূপুর আর অস্ত্র
দেয়ালে ঝোলানো পাশাপাশি, মাতৃকা, মহামুদ্রা আর মন্ত্র
বিকট মুখোশ পরে সে নাচে কিন্তু শরীর একই রকম নগ্ন ও খোলা
জেগে আছে স্তন, যৌনাঙ্গ ও ঘৃণা, শুধুই মুছে গেছে সুখ
এই ভোর রাত্রিবেলা
সারারাত যে থাকে অচেনা, তাকেও চিনে নিতে পারি...

সারারাত অন্ধকার ছিঁড়ে তাকিয়ে থাকে চোখ, সঙ্গমের শেষে
হাতে লাগে বীর্যের আঠা, পড়ে থাকে শরীর, জলের সেই শব্দ শুনি

জলের সেই উন্মাদ জেগে ওঠে, গুহারতলায় যে স্রোত বয়ে চলে
কালো জলের সেই ঘূর্ণী শরীরে এসে মেশে
নদীর স্বচ্ছতার মতোই আমাদের পাশ ফেরা, দুদিকে দুজন
মুখ ফিরিয়ে থাকি
আবার কখনো মহাশূণ্যের ভ্রমণ শেষ করে...মুখোমুখি
ঘুম থেকে উঠে আসে হাত
ঘুম থেকে জ্বলে ওঠে শিখা, ঘুমন্ত লিঙ্গ স্পর্শ করে যোনি
স্বপ্নের মধ্যেই সেই হত্যা, স্বপ্ন থেকে ছিটকে, বাইরে বেরিয়ে
আসে খুনি

কিন্তু কেইবা মৃত্যু বেছে নেবে আগে ওই তো আমাদের,
আততায়ী
ছেঁড়া পোশাক, খালি পা, ঘুরে বেড়ায় শূন্য হৃদয় নিয়ে
এক ভাটি খানা থেকে আরেক ভাটিখানা
যে মদ আমরা নেংটো হয়ে পান করি, যে গান আমরা
নেংটো হয়ে গাই
সেও তার কিছুটা কাছে আসে, শুনতে চায় কান পেতে
ভয়ে আর আতঙ্কে ছুটে পালায় দূর থেকে দূরে, দুজনেই হো হো হাসি
যখন চোখ যায় দূর বসতির দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি শ্মশান
যখন কোনো কথাই আর থাকে না, বুক পেতে দেয় গুহার দেয়াল
পাগলের মতোই ভরিয়ে তুলি একের পর এক, তুলি আর রঙ
ছুঁড়ে দিয়ে, জড়িয়ে ধোরে চুম্বন করি আকাশ...

তবু কেন এই আকাশে তলায় মুখোশ পরে আমরা নাচি...?
তবু কেন প্রতিটি নক্ষত্রের শরীরে গজিয়ে ওঠে ঘাস, ঢেউ হয়ে
ফুলে ওঠে সবুজ মাটি?
গুহার দরজায় উঁকি দেয় কয়েকটি মুখ, ওরাই কি আমাদের সন্তান?
যে মৃতদেহ পুড়িয়ে ওরা ফেরে, তারও ছিল কোনো গান?
কোনা পথিকই জানতে চায় না কোথায় শেষ হবে এই পথ
এক রাত্রি কাটাতে হবে গুহায়, আরেক রাত্রিতে ভিখারি চোর ও সাধু...
খুলে দ্যাখো এই আত্মার সম্পদ
আরও এক রাত্রিতে আমি নিজেকে নিয়েই মেতে উঠি—এ কোনো উজ্জ্বল?
এক হাত লিঙ্গে, অন্য হাতের তালুতে ঝরে পড়ে নীহারিকার জল
একই প্রশ্ন, একই উত্তর, চূড়ান্ত আবেগ, শেষ বিন্দুতে এসে ফেটে,
বেরিয়ে আসে লাভা আর আগুনের স্রোত
যদি হত্যা করি একে অন্যকে, তবুও তো গুহার সামনে পড়ে থাকবে
এই দীর্ঘ পথ...

আমাদেরই অপেক্ষায়

গুহা থেকে বেরিয়ে আসি আমি, কিছুটা পথ সে হেঁটে আসে
কিছুটা পথ সে আমাকে এগিয়ে দেয়, কখনো মনে হয় উলঙ্গ
অতৃপ্ত এক চিতা
উন্মোচিত সেই যোনি, যা কখনই বিদ্ধ হবে না
মাংস মাংস মাংস...গহ্বর থেকে একই ধ্বনি
নিঃশব্দ উল্লাস নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ফসলের মাঠ থেকে মাঠে
কিছুক্ষণ সে হাঁটে, কিছুক্ষণ সে গুনগুন করে গান গায়
মাটির পৃথিবীতে
হাঁটু গেঁড়ে ব'সে বুকে তুলে নেয় পথের ধুলা, অদ্ভুত এই
কুমারী, যে কান্নাও জানে না...

পথ আর পথ

'এখানেই শেষ...আর নয়'
নদীর দিকে তাকাই, 'আর কোনো ভয়'
আর কোনো ভয়—স্পর্শ করি কাঁধ
যে বুকে ধরে আছিল রাত্রির আকাশ
উন্মাদ নক্ষত্র নীহারিকা আর অপরাধ
জাগিয়ে তোলে ও কোনো ঢেউ, উল্লাস...?

আহ্, আমার পথ, সঙ্গী ছিল মত্ততা ও ঘৃনা
এই পথ, গর্ভ থেকে বেরিয়ে অতিক্রম
করে মৃত্যুর সীমানা
এই পথ, আমি জানতে চাই সব রহস্য যার
শুরু আমার মধ্যে, যার শেষ আর যার বিস্তার
আমাকে ছাড়িয়ে ভয়ংকর এক আকাশের নীচে
ওই তো সেই বালক, পাপের পথে পথে
উলঙ্গ এক বিদ্যুৎ শিখা
ভাটিখানার কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে
এক আশ্রম বালিকা...
'পাপ' আর 'জীবন'...আমি হাসি
অপরাধ আর আত্মা
এই সেই তপোবন, ঘুপচি ঘরের অন্ধকার
থেকে এই যাত্রা

'...তবু এখানেই খুঁজে নে' তোর ঘর
এই দ্যাখ্, সেই কুমারী আত্মা

মেনে নিয়েছে সব নির্যাতন...
কিন্তু হত্যা করাই যার নেশা
যোনি থেকে যোনিতে ছড়িয়ে
পড়ে যে ভালোবাসা
সেই ঘূর্ণী স্রোত, আরও অচেনা
আমি চাই শেষ-না-হওয়া গান
শুরু না-হওয়া স্বপ্ন আর নিঃস্ব মাতাল
আমি চাই সেই জন্মান্ধ স্ত্রীলোক
কোন অনুতাপই যার নাই, অন্ধতার
জন্য কোনো শোক
ঘুমিয়ে পড়ি তাকে জড়িয়ে
দেখি, সেও একই পথের জন্য পাগল
আমাকে জাগিয়ে তোলে এক ভোর রাত্রিবেলা
বলে, 'বন্ধ করো এই খেলা
একটা মুহূর্ত এখানে নয় আর
আমি দেখি এই ভোরের হাওয়া...'
পথ আর পথ...কোথায় সেই কুটির
পাতায় আর খড়ে ছাওয়া...
তপোবন আর নদী...আমরা হাঁটি
ধীর আমাদের গতি...শান্ত নগ্নতা...

জীবতোষ দাস

স্বপ্ন ও মহাশূন্য

প্রতিটি স্বপ্নের ভেতরই আমি জড়িয়ে আছি
দু'হাতে চেপে ধরেছি হৃৎপিন্ড অথবা শূন্যতা
ঘেমে উঠছি আমি, কতগুলি অপরিচিত শব্দের আনাগোনার।
অলৌকিক জ্যোৎস্নায় শুয়ে আছে শত শত প্রেতাত্মা।
পশু, জঙ্গল, ঘরবাড়ি, আমাদেরই প্রেতিবেশী

যুবক-যুবতী স্বপ্নালু নিঃশ্বাস থেকে বেড়িয়ে আসছে
রাতের সেই লাল বেলুন, নীল পাহাড় ও হলুদ পাখি
উলটো-পালটা হাওয়া আর ভালোবাসা
এঁকে বেঁকে মিশে যাচ্ছে
অণু থেকে ব্রহ্মান্ডে

সেই বিশাল বট-বৃক্ষের ঝুরি নেমে পড়েছে এখন
বেশ্যাবাড়ির রাস্তায়...শ্মশান ও গোরস্থান কিংবা গির্জায়
পথেও আমি পাইনি সেইসব রহস্যময় রাত!
শুধু এক নেশাতুর আন্ধকার রাত!
শূন্য থেকে মহাশূন্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে...
স্বপ্নগুলি নগ্ন হয় একেকটি রহস্যময় গলিতে
কতগুলি অস্পষ্ট মুখও এইমাত্র নড়ে চড়ে ওঠে—
সরে যায়, কাছে আসে ; জেগে ওঠে!
প্রণাম সেরে নাও এখুনি, চিতায় উঠবার আগেই ;
একদিকে শ্মশানের রাত, অন্যদিকে বেশ্যাখানার রাত
জ্বলে উঠছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
জ্বলে উঠছি আমি

আত্মবিশ্বাস কিংবা নীরবতা

কাউকে অনুরোধ অথবা তোষামোদ করবার আগে
আমি বার বার ফিরে আসি নিজের কাছেই
চিনে নিতে পারি
'আত্মবিশ্বাস' এক মহাখচ্চর!

কাউকে তোয়াজ করবার আগেই আমর মেরুদণ্ড
বার বার সোজা হয়ে ওঠে, মুখোমুখি দাঁড়াতে
গিয়ে টের পাই আমি কারোর কৃপাপ্রার্থী নই!
আমি তো পারিনি কারুর অণ্ডকোষে তেল মেখে
রাতারাতি 'কবি' পরিচিতি নিতে? কবির ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করতে?
এখনো তো সেই বিরাট লোভ, কুৎসিৎ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে
আমাদেরই পোষাকের তলায়...
হায়! হায় বিবেক! হায় আত্মা!
কিভাবে বসে আছো আজও এই হৃদয়ে?
অ্যাতোটুকু আপোশ করাতেও দিলে না? আর সহাবস্থান?

সে এক হঠকারী দৃশ্য...
কিছু কিছু আত্মবিশ্বাস এখনো মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে
আমি আমার আত্মার কাছেই ঘাড় গুঁজে বসে থাকি,
মাথা ঝাঁকাই...
সেও এক স্থির নিয়মে হেঁটে বেড়ায়...ভ্রূক্ষেপহীন...
হো হো করে হাসে...
শুধু অপেক্ষা করি...শুধু অপেক্ষা করি...
এই অভিজ্ঞতা এই দেখে যাওয়া

একসময় চুপ করে সরে যেতে হয়
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পরি মানুষের ভিড়ে ; এই জঙ্গলে—
অপমানে, প্রতিবাদে। খোলা আকাশের নীচে
জীবন নিঙড়ে চলে আসে এক অদ্ভুত নীরবতা,
লক্ষ করি, মানুষের মুখ ; মুখোশের তলায় মুখ
কামনা, বাসনা আকাঙ্ক্ষা। চটজলদি কিছু পাওয়া
ইন্টেলেক্চুয়াল পোজ আর বৈষয়িক জীবন বিষয়ে অত্যাধুনিক খেলা!

রাজা সরকার

তাকে জল দেবো

সারারাত অপেক্ষার পর, ঘাম আর বীর্যের অদ্ভুত গন্ধের মধ্যে জেগেছি
কখন জানালা খুলবো
কখন ভোরের হাওয়ায় ভেসে ফিরে আসবে রাত কাটানো পরীদের দলটি
ফিরে যাবে শহরের লেজের দিকে বস্তির প্রাত্যহিক ধুঁয়ায়

কেউ উপার্জন করে আনে নোটভরা থলি
কেউ খুঁইয়ে আসে সঞ্চয়, খসিয়ে আনে কাঁচা পেট, সস্তায় নার্সিহোমে
সবারই মুখের ভাষা এক থাকে
এক এক রিকশায় রক্তশূন্য রাতজাগা ধস্তমাংসের স্তুপ থেকে তারা
অদ্ভুত সুরে গুনগুন করে পেরিয়ে যায় জানালা

২

এখন আমি শহর জুড়ে তন্ন তন্ন করি পরীদের খোঁজে
এখন আমি চাই না কোনো ফিচেল কবির সঙ্গে দেখা হউক আমার
এখন আমি চাই দীর্ঘ, দীর্ঘতর রাত্রির পথ ধরে ধেয়ে যাওয়া

শহরের সবকটি প্রত্যঙ্গ যখন ফুলে ফেঁপে অস্থির
তখন সবকটি অঙ্গ খসিয়ে জড়পিণ্ড আত্মা এক—
নিশুতি শহরের একমাত্র ভিখারি, পরীদের সেও দেখেছে
খিল খিল হাসির শব্দে হাওয়া চঞ্চল করে তারা চলে গেছে এই পথে
ভিক্ষার পাত্রে ফেলে গেছে দু'টি মুদ্রা

৩

কারোর সঙ্গে আর দেখা হবে না আমি জানি
শেষ দেখার পর এই দীর্ঘ পরি পরিসর অতিক্রম...
এসব আর কোনো ঘটনা নয়—একা
একটি অন্ধকার সিঁড়ি পেয়ে যাওয়া
একা একাই চিৎকার করে সশস্ত্র প্রহরীদের জড়ো করা
দেখে ফ্যালা পরীদের একটি পরিত্যক্ত ভ্রূণ নিয়ে ভোরবেলার মানুষের মাতামাতি

৪

এখন কোনো ভণিতা সহ্য হয় না
বিকেল হলেই মনে পড়ে সেবক রোডের রুটি মাংস
আর দুই পেগ কড়া মদ
আমাকে শুধু রুটি অথবা মাংস
হে বন্ধু—দুই পেগ মদ, আঃ কি মহার্ঘ এখন?
যদি এই বিকেলে—

আমি অপেক্ষা করি রাত্রির
ভাবি রাত্রির দৈর্ঘ্যের কথা
ভাবি পরীদের সঙ্গে সারারাত
স্তব্ধ শহরের প্রান্তরে এসে ডুবে যাওয়া

৫

এই শহরের শেষ দেয়ালটিতে আমার থুথু আর পোস্টার
চিহ্নিত করে এ শহরে সুসভ্য অপরাধীদের শহর
অথচ তারপর যে বাস্তবতা ; আমার সমুদ্র ছিল এতকাল
আজ দেখছি প্রারম্ভে তার ভেতর জেগে উঠছে গ্রাম
গ্রামের পর গ্রাম...
যেখানে সমস্ত শূন্যতাকে শুষে খেত, গাছ আর জননক্রিয়ার ছাউনিগুলি
হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে
এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছি আমাক গিলে নেবে তারই মধ্যে
শুতে দেবে সেই ঢেকি ঘরের পাশে...

কোনো এক রাতের অতিথি আমি, আমার চারপাশে এক নিঃশব্দ তৎপরতা
কুপির আলোয় রহস্যময় কেউ একজন ভাত রাঁধে
খেতে দেয়
ষড়যন্ত্রময় নিঃসাড় ঝুঁকে পড়া রাত্রির তলায় একসময়
আরও নিঃশব্দে গা'গতর জ্যোৎস্নায় চুবিয়ে এসে অপেক্ষা করে কেউ আমারই পাশে,
নির্দিষ্ট অন্ধকারে
পিঠে হাত রাখা অবধিই অপেক্ষা—
তারপরই খিল খিল হাসির তরঙ্গ, আর
সমস্ত নিসর্গের ভেতর মুহূর্তেই প্রাণসঞ্চার
লাফিয়ে ওঠা রক্ত এক ঝাপটায় সরিয়ে দিল অন্ধকার
আর মুখোমুখি খুব সাদামাটা ভঙ্গীতেই
আমরা নেমে আসতে থাকি মাটির বিছানায়—

৬

সমস্ত স্মৃতি ঘটনার মৃত্যু হতে থাকে প্রতিমুহূর্তে
জেগে ওঠে রাত্রির উদ্ভিদ এক বিতাড়িত মাংসের মাটিতে
কানে আসে দ্রুত ফিস্‌ফাস্‌
বেড়ায় মুখ লাগিয়ে একজন বলে যায়—
"মাইয়্যা আমার পোয়াতি গো—"
রাত্রির এই নিজস্ব প্রদাহের মধ্যে আমার সমুদ্র আবার
ধীরে ধীরে জাগে, জেগে ওঠে
শুরু হয় পাখিদের জন্ম জন্মান্তরের ডাক
অনিবার্য যুদ্ধ-সংকেতে ভারী, জীবনের এই নিঃশব্দ খেলায়
যেন খেলতে আসছে আরও কোনো চেনা পোয়াতির দল
তাদেরও চাই আঁতুড়!

৭

এরপরেও সহ্য করতে হয় জীবন
জীবনের খাদ আর ভালোবাসা
তুরা পাহাড়ের শাদাপরী নেমে আসবে একদিন
এখানেই, এই কুয়াশায়—
আত্মস্রাবের সুরকেলো স্তব্ধ হলেই তার প্রসবের শুরু
হাতে প্রস্তুত জলপাত্র, তাকে জল দেবো॥

নির্মল হালদার

হারিয়ে যাওয়া

আমার গাঁয়ের মানুষ কোথায় গেল হে
আমার বোন হারিয়ে গেছে
শহরে এসেছিল মিটিংয়ের নামে শহর দেখতে
এখন কোথায় খুঁজি
শহরের কোন্ রাস্তায় কোন্ গলিতে
এত ভিড় কোথায় খুঁজি

কাকে প্রশ্ন করি কোথাও দেখেছো
গায়ে আছে নীল রঙের জামা নাকে নোলক
বয়েস পনেরো ষোলো
শহর দেখতে এসে শহরে হারিয়ে গেল

মাকে গিয়ে কি বলবো
গাঁয়ের কাকা-জ্যাঠাদের কি বোলবো
আমার বোন কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে?
আড়াল থেকে ডেকে ওঠাবে : দাদা...
আমি বোনকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাবো
আমি একা কি ক'রে যাই?

এতো শব্দ এতো কথাবার্তা
কেউ আমার বোনের কথা বলছে না একটুও
আমার গাঁয়ের মানুষ কোথায় গেলে হে
চলো, একটু খুঁজি

কথক

করমচাঁদ বেগুন নিয়ে বাজারে গিয়েছিল
বিক্রি করেছিল দু'টাকা দরে, শুনেওছিল
চালের দাম তিন টাকা বারো আনা

আমাদের মেয়েরা
শালপাতা বিক্রি করতে গেলে
বাজারবাবুরা লক্ষ করেনি
আমাদের মেয়ের পায়ে আলতা আছে কি নেই
লক্ষ্য করে বুক, গল্প করে
আমাদের দারিদ্র নিয়ে

করমচাঁদ একথাই বলবে
আপনাদের কাছে

গরুর গাড়ি

গরুর গাড়ির চাকা
কাদামাটিতে গেঁথে গেল
পথের পাশেই
গরুর গাড়ির চাকা কাদামাটিতে গেঁথে গেল
তুমি চেষ্টা করছো
পথে তুলতে
কেউ শুনছে না কেউ দেখছে না
তুমি চেষ্টা কোরছো
পথে তুলতে
সকালের গাড়ি
কতো বেলা হ'য়ে গেল
গরুর গাড়ির চাকায় শুকিয়ে গেল কাদা

তুমি চাইছো
গরুর গাড়ির চাকা পথে চলুক
তুমি চাইছো চাল ধানের গাড়ি
তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে পৌছে দিতে

জামালউদ্দিন

ক্রীতদাস

আমি একজন ক্রীতদাস
আমার হাত-পা-চোখ-মুখ-মাথা-পেট-যৌনাঙ্গ বা শরীর
জন্মাবধি শেকল ও তালা দিয়ে আঁটা
আমার জরায়ুর সামনে বেলুন বা দেওয়াল
যা পোশাকের মতো ব্যবহার করেন আমার গৃহপতি বা শিক্ষক
তার খাবার মধ্যে আমি।
আমার জন্য সাজানো আছে তার বিদ্যালয় বা আপিসঘর
অথবা খামার বা কারখানা বধ্যভূমি।
যেখানে আমি বা তুমি বা আমরা সবাই তার সাম্প্রদায়িক খুঁটিতে বাঁধা
প্রতিমুহূর্ত আমার সমস্ত শেকড় প্রিয় তোমার দিকে হেঁটে চলে
অথবা প্রতিমুহূর্ত বটের ঝুড়ির মতো আমার দিকে নেমে আসছো তুমি
অথবা আমরা সবাই পরস্পর তাকিয়ে আছি নক্ষত্রের মতো বহুযুগ...
এভাবেই শুরু হয় আমার স্বপ্ন
বা শুরু হয় তোমার স্বপ্ন
অথবা আমাদের সবার স্বপ্ন শুরু হয়।
স্বপ্নে চুরমার হয় দেওয়াল/শেকল/বেলুন...
অথবা থুথুর মতো ঝরে পড়ে তালা।
তোমার ভিতর প্রবেশ করি আমি বা তুমি প্রবেশ করো আমার ভিতর
অথবা আমরা সবাই প্রবেশ করি সবার ভিতর
        আমরাও উলঙ্গ নাচতে থাকি
আমাদের সঙ্গে এসে মিশে যায়
বন-জঙ্গল-পাহাড়-নদী
মিশে যায় গ্রহ-নক্ষত্রের অনু-পরমাণু ও রশ্মি
মিশে যায় সমুদ্র আকাশ...
ফুটে ওঠে বসন্ত ভোর
ঠিক তখন চার-পা তুলে যন্ত্রযানে ছুটে আসেন আমার গৃহপতি বা শিক্ষক
তোমার বোঁটা থেকে আমাকে
বা আমার বোঁটা থেকে তোমাকে
অথবা আমাদের সবার বোঁটা থেকে সবাইকে ছিঁড়ে টেনে নিয়ে যান তিনি
ভেঙে যায় স্বপ্নের কুটির
মেঝেময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে
        আমাদের প্রিয় বসন্ত

শৈলেশ্বর ঘোষ

বুদ্ধ-উপত্যকা (১)

উপত্যকায় নেমে এসে বুঝতে পারলাম রক্তছাড়া সন্তুষ্ট হবে না
ভালোবাসা আমার—উন্মাদেরা তাদের পৃথিবী ঠিকমত চিনতে
পেরেছে বলেই ফিরে আসবে না আর মানুষের মাঝখানে—
ভালোবাসার পাত্রী আমার চমকে উঠবি কি উলঙ্গ হবো যখন
তোর সাথে—প্রতিদিনের বাঁচা আমারা ঠিক বেশ্যাদের মতো
যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আবার আনন্দের জন্য দাঁড়াই গিয়ে রাস্তায়
খুনি আর তার শিকার দুপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে আমাকে
মৃত্যুর মুখে থুথু দিয়ে আমরা ঘুরতে থাকি ঘুরতে থাকি ধর্ম
দিয়েছি যাকে, বলতে পারিস কত নম্বর বাড়িতে সে থাকে—

তোমাদের রাত্রিগুলি আমাকে কোনোভাবে সাহায্য করে না
তোমাদের নোনা বাতাস মন্দির মিথুন সবকিছু ক্ষয় করে চলে
যে সমুদ্রে স্নান করি আমি তার রূপও আছে আমার জানা
ভালোবাসা আমার আকাশ ভ্রমণ—যে আকাশ কালো হয়ে আছে মানুষের গানে
প্রতি ইন্দ্রিয়ের গন্ধ আমাকে বিচলিত করে—অর্ধপশু হানা
দেবে এই অন্ধকারে, বসন্ত যেখান জেগে ওঠে শুধু পাখিদের টানে
'কুকুর হতে সাবধান'—বস্তুত এক কুকুর লুকিয়ে আছে দেবতার উঠানে

এ উপত্যকায় সম্পূর্ণ এখন আমি—দূরের পাহাড়
কুয়াশায় ঢাকা, স্ত্রীলোকেরা ছিল একদিন পথের আহার
পথেই শেষ করেছি—বিসর্জনের আগে এই নাও স্বতঃপ্রণোদিত শরীর
আমার পায়ের নীচে এক ইতিহাস আছে, আছে সমকামীদের গোরস্থান
কালো এ নিসর্গে মহাকাশচারী হঠাৎই শুরু করেছে তার গান।
শ্বাপদ আর দেবতারা আছে...উরুমহাদেশে আগুন মাটি জল
যতদূর প্রবাহিত হবো ততদূর ভয় নাই, জেগে ওঠে সহবাসযোগ্য স্থল
মানুষের রক্ত ঝরেছিল যেখানে—সেখানেই ফুটে ওঠেছে ফুল
বুক থেকে যৌনাঙ্গে নেমেছে ভালোবাসা, হত্যাই তবে কার্যকারী নেশা?
জীবানুশূন্য বাতাস...অপরাধীর সীমার মধ্যেই এসে পড়েছে উপকূল

দ্বিধাবিভক্ত প্রেরণা, তারপরে সেই গর্ত—আশাহীন ছিল উপত্যকা
এক একটি ডুব দেবার পর দেখি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে নদী
যে আকাশে আর বিকীরণ নাই, সেখানে আর ভয় আছে কি?
রক্ত যার গায়ে লেগেছে সে একা...একা—একা—একা—একা
আমারই মুখনিসৃত শব্দগুলি পূর্ণ করে রেখেছে বারম্বার ধর্ষিত গুহা!

কিছুটা মনে পড়ে তাদের কথা—সন্তানের হাতে নিহত হয়েছে পিতা
মনে পড়ে কিছুটা আমাদের কথা, গ্রাস করা লিঙ্গ সন্ত্রাস আর ঘৃণা
তোমাদের কথাও কিছু ছিল, হত্যাকারীর প্রতিনিধি দাবি করেছিল মাথা
মৃত্যুর আগেই কেন উপশরীরে আমাদের জেঠে ওঠে মৃত্যুর বেদনা?

জ্যোৎস্নালোকিত হয়ে আছে উপত্যকা, শূন্যে-শরীরে পারস্পরিক ক্ষুধা
কোনো শরীরে আমি আবদ্ধ নই, সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছি আমি
পুরুষ ও স্ত্রী, কর্তা ও নোকর, তোমাদের পাতাল রাজা পড়েছে বাঁধা
ভয়ের রাজ্যে জ্বলে উঠেছে আগুন—একমাত্র যে চাঁদ অস্তগামী
সেও পাহাড়ের ওপাশে—ভালোবাসা আজ প্রতিফলিত প্রলাপ,
রক্ত সেও ওই ভালোবাসা চায়, জীবন চায় ওই ক্রমসঙ্কীর্ণ নদী, মৃত্যু তার
কঙ্কাল নিয়ে ভিক্ষা চেয়ে ফেরে—চাই অবগাহন আর আহার
দহনের শিখা আমি, পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে এক পৃথিবী
আর কীসের ভয়—অপরাধগুলিই তোমার আনন্দ, সারাৎসার!

বুদ্ধ উপত্যকা (২)

একদিন ঘুম থেকে উঠে সেই লোক চমকে উঠল
নিজেকে দেখে, পুলিশের কাছে সে প্রার্থিত ব্যক্তি
কাগজে ছাপা ছবিটির সঙ্গে নিজের চেহারার কোনো
মিলই সে খুঁজে পেল না—ঘটনা তবে অনেকদূর গড়িয়ে গেছে
যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে এতদিন ঘুরছে সকলে তা জানলো কী করে!
উদ্দেশ্য থেকে সে এতদূরে সরে এসেছে তবু কীসের টানে
সে বাঁধা আছে নির্দিষ্ট কক্ষে—মহাশূন্য সামনে পড়ে আছে
তবু গ্রহানুপুঞ্জের সরে যাবার অনুমতি নাই, কেবল এক বেগ
অনুভব করে সে বুকের ভিতর যে বেগে উল্কাপিণ্ড হয় ছাই
তাকিয়ে দেখল অন্তরের ভয় এখনও গণিকার মতো ঘুমায়!

ভালোবাসাহীন একদিন ঢুকেছিল এসে প্রতিটি গণিকার হৃদয়
উপড়ে নেবে, প্রতিটি গণিকা-সন্তানের জেনে নেবে পরিচয়
মৃত্যু মুখোশের আড়ালে ছিল—সূর্য আজ আর উঠবে না,
নলখাগড়ার বনে আশ্রয় নিয়েছে সাপ, সায়াহ্নের অতিথি

ইন্দ্রিয় বেতারে বলে চলেছে, 'আমি এসে পড়েছি উৎসের কাছাকাছি
জল তার প্রবাহের জন্য খাত চায়, শরীর তার আবেগ ঢেলে
দিতে চায় শরীরের গর্তে, কুমেরু সুমেরু মৃত্যু আর ভালোবাসা
এক ইতিহাস শুয়ে মাখা আরেক ইতিহাস থেকে আমার আসা!
আমাকে দেখা মাত্র ভিজে উঠেছে প্রতিটি হৃদয়হীনের যোনি
নজরে পড়ে না কিছু তবু অন্ধকারে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করেছি আমি।'
সন্দেহ দূর হয় না তার ফলে সে আরও কিছু চায়—মাথার অসুখ
আক্রমণ করে বুক, সামনে পেছনে সব রাস্তাতেই কেন সূর্যোদয়
প্রসাধন শেষ করে এসে দাঁড়ায় স্ত্রীলোক, ঝলমল করতে থাকে বুক
ভূগর্ভে ভরা আছে খনিজ—নিরস্ত্র হয়েই সে নেমে যেতে চায়—
নেমে সে গিয়েছিল—আকরিক থেকে নিষ্কাষিত হ'ল ধাতু
পাশবিক আচরণে নষ্ট করে দেবে সে মানুষের একমাত্র বসন্ত ঋতু
গ্রাহক হিসাবেই প্রতিঘরে সে উপস্থিত হবে—আটকাবে এভাবে মৃত্যু
কিন্তু সতর্ক হয়েছিল কি সে, ঢেকে নিয়েছিল নিজের মুখ
সূর্যকে বিদ্রূপ করে ডেকে উঠল প্যাঁচা—চারপাশে ঘিরে ক্ষুব্ধ জল
'তোমাকেই আজ ভালোবাসা দেব খুঁজে আনো নিষিদ্ধ গাছের ফল'
কিন্তু সহবাস শেষ হবার আগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'একেই কি বলে বাঁচা!'
উপচে পড়া ঘৃণা আমার নেবে শুধু বেশ্যারা, আর কেউ কি নেবে না?
এই গ্রহ আরও ভালোবাসা বুকে টেনে নেবে, অর্থপূর্ণ হবে চলাচল।

মৃত্যুর আবেগ যদি রূপান্তরিত হয় ভালোবাসায় তবু এ উপত্যকা
ছেড়ে যেতে পারে না সে—মন্দিরে মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি তাকে
পাতাল স্টেশন নিয়ে যায়, পাতালে নেমেও সে নিজেকে দেখে একা
যাদের হৃদয় উগড়ে নেবে বলে সে এসেছিল আসলে হৃদয়হীন
ছিল তারা, এই আবিষ্কারের পর কি করে ফিরবে সে সূর্যালোকে—
এখানে বায়ুমণ্ডল নাই আকাশ কালো শব্দে কোনো প্রতিধ্বনি নাই
পর্যাপ্ত বৃক্ষলতায় ঢাকা নয় এ শূন্যতা—যে প্রত্যঙ্গগুলি
আনন্দ নিতে গিয়েছিল তারাই আজ করছে বাঁচার বিরোধীতা
তাহলে নিজেরই হৃদপিণ্ড উপড়ে নিয়ে তার সঙ্গে শুরু হোক কথা
যে মারতে চায় সেই আগে মরে,
এই উপত্যকায় মুখোমুখি আজ খুনি আর জ্ঞানী।

সীতা

আমাকে দেখেই সীতা চিনতে পেরেছিল
প্রথমে ভয় পেয়ে ঢুকে গিয়েছিল ঘরে
তারপর নেমে এলো উঠানে, হাতে পাত্রভরা ভিক্ষা
"আমাকে চিনতে পাচ্ছো না তুমি

আমি তো ভিক্ষা নিতে আসিনি"
পাত্রটি নামিয়ে রেখে সে একটু এগিয়ে এলো
"চিনেছি, তুমি সেই লম্পট, ধর্মহীন কুকুর
সকলের মতো আমিও তোমার মৃত্যু চাই
কদর্যকে ভগবান করেছেন এত সুন্দর"

আমি তার হাত ধরে একটানে নিষিদ্ধ গণ্ডির বাইরে
নিয়ে এলাম—শূন্য ঘর, পূর্ণ ভিক্ষাপাত্র রইলো পড়ে
মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করে
পূর্ণ হবো আমরা ক্ষুধা আর শরীরে
ভালোবাসার অলঙ্কারগুলি সে ছুঁড়ে ফেলেছিল দূরে

এই শহরের বাইরে তাকে বন্দি করে রাখলাম
চোদ্দো বৎসর আয়ু তার—অর্দ্ধেকটা নিলাম আমি
বাকি অর্দ্ধেক প্রকৃতিকে দিয়েছিল সে, বন্ধ্যাভূমি
আমারই ব্যবহারে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠল, দুঃখ আর শোক
অপেক্ষা করেছিল—অতিপ্রাকৃত ভালোবাসায় ভরা বুক
কখন আবার শূন্য হবে—শুনব কখন সমুদ্রের ঘন্টাধ্বনি
ভিক্ষা নয়, বহমানা সিন্ধুকে আমি আবিষ্কার করলাম।

চোদ্দ বৎসর পর নদী ফিরে গেল নিজের প্রকৃতির কাছে
শুধু প্রশ্ন ছিল, "মানুষের ভালোবাসার আর কি কোনো অর্থ আছে?"
প্রকৃতিকে হত্যা করেছি আমি অরণ্যের স্মৃতি দিয়েছি মুছে
দুঃখ তাকে ফিরে নিয়ে গেল—পরীক্ষা হবে তৃপ্ত কিনা সে
রাক্ষসের অভিজ্ঞতা হয়েছে যার, আগুন কি তার কাছে আসে?
অতিপ্রাকৃত ছিল এই চরিতার্থতা, দুজনকেই আমাদের মরতে হবে?

শৈলেশ্বর ঘোষ

জীবন প্রতিষ্ঠান

(এক) দুঃসময়ে আমাদের জন্ম, কয়েক হাজার বছরের বিশ্বাস যখন নষ্ট হয়ে গেছে। যে মূল্যবোধগুলি মূলত ভারতীয় জীবনকে একটা ইতিবাচক ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তার আড়ালে কাজ করে যাচ্ছিল অবিশ্বাস ঘৃণা লোভ আর শোষণ প্রবৃত্তি—আর যাঁদের হৃদয় ও মন এই পাপগুলি দ্বারা পুরোপুরি কবলিত তারা শুধু নিজেরা মিথ্যা হয়েই থেমে থাকেনি, তাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরকে মিথ্যায় রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত তারা যথেষ্ট আনন্দিত হতে পারেনি। কয়েকহাজার বছরের হিন্দু সভ্যতা এবং দুহাজার বছরের খ্রিস্টীয় সভ্যতা মানুষের শোষণ পদ্ধতি ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে কোনো সচেতনতা দেখাতে পারেনি। পাপ ও দুঃখ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলি কোনো কাজে লাগেনি। অবৈধ সত্যের মতো ঈশ্বর ক্রমশ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। ন্যায় ও সত্যের সামগ্রিক বিনাশের মধ্যে জন্ম আমাদের। জীবনানন্দ এই অবস্থাকে বলেছিলেন, অন্তিম বিশ্বাসের মুহূর্ত—আমার মনে হয় শূন্যতার এই অতলস্পর্শী অন্ধকারে অবিশ্বাসেরও চূড়ান্ত বিসর্জন হয়ে যায়। অবিশ্বাস একটা অবলম্বনের মতো কাজ করে অনেক সময়। 'আমি অবিশ্বাসী'—এটা তো একটা বিশ্বাসই। ফলে বিশ্বাসের ধ্বংসের পর কিছু সময়ের জন্য অবিশ্বাস মানুষকে, ইতিহাসকে ধরে রাখে। কিন্তু শূন্যতার সীমাহীন খাদে যে পড়ে তার মধ্যে আর অবিশ্বাসও থাকে না—পুরোনো মূল্যবোধগুলি ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটে—সে এক পরম শূন্যে রূপান্তরিত হয়—এরকম ভয়ঙ্কর শূন্যতার মধ্যে আমিও নিজেকে আবিষ্কার করি এবং বুঝতে পারি আমারও মৃত্যু সম্পূর্ণ হয়েছে। নিজের এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া মাত্রই শুরু হয় যন্ত্রণা, অতল গুহা থেকে বেরোবার রাস্তাটা খোঁজা শুরু হয়—আমার কাছে এটা হলো জীবনের দিকে মৃতের অভিযাত্রা। আর এর প্রতিমুহূর্তের পরিস্থিতি ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াই আমার রচনা। পুরানো ঈশ্বর মৃত এবং অপসারিত, সেই শূন্যে ঝলসে উঠছে বস্তুবিজ্ঞানের চমকপ্রদ আলোকছটা। চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে অন্ধকারের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার আরও অসুবিধা, আমার পাশের অধিকাংশ মানুষকে দেখছি তারা মিথ্যা হয়ে থাকতেই ভালোবাসে, ফলে আমি হয়ে যাই একা, আমার সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এক একাই খুঁজতে হয়...আমার জ্ঞানের ভিতর এই অভিজ্ঞতা কাজ করে যে আমার মৃত্যু হয়েছিল। কে আমাকে মেরেছিল? নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অসত্য মূল্যবোধগুলি। এই সত্য বুঝে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে মৃতের সক্রিয়তা। মৃত্যুর সমান এই শূন্যতার অন্ধকার চঞ্চল ও জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে আমার চেতনার ক্রমসক্রিয়তায়। আমি মৃত কিন্তু মৃত্যু সচেতন—এই চেতনা আমাকে জীবনের দিক নিয়ে যেতে চায়। সব হারিয়ে যে একদিন নিঃস্ব হয়েছিল, আজ আর সে ততটা

নিঃস্ব নয়, আজ আছে তার শূন্যতার চেতনা, গভীরতম অন্ধকারের অভিজ্ঞতা—এই চেতনা এই অভিজ্ঞতাই সে মানুষকে জানাবে। জানাতে চাওয়াই তার অস্তিত্বের সক্রিয়তা। সার্ত্র যখন জাঁ জেনে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখেন : মার্কস সমাজকে বদলাতে চেয়েছিলেন, র‍্যাঁবো জীবনকে বদলাতে চেয়েছিলেন কিন্তু জেনে কিছুই বদলাতে চান না। জেনে যদিও এরকম কোনো অভিপ্রায় প্রকাশ করেননি কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতাজাত চেতনাকে তিনি মানুষের কাছে উপস্থিত করার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে—নিজের চেতনাকে মানুষের কাছে পৌছে দিতে চাওয়াটাই তো সক্রিয়তা। যে অভিজ্ঞতা-চেতনা সমস্ত মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়বে এবং তাদের চেতনা সমুদ্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা জাগিয়ে দেবে। যে মৃত সে যখন নিজের মৃত্যু সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে তখন তারও পুনর্জন্মের আরম্ভ—পাতালনদীর মতো বহমান এক প্রকৃত জীবনের কাছে সে এগিয়ে যেতে থাকে। এটা একটা সক্রিয় কিন্তু অবচেতন ইচ্ছা, যে ইচ্ছার সৃষ্টি তার অভিজ্ঞতা-চেতনারাজ্যে।

আমি জীবনের উপর থেকে কুয়াসার পরদাটা সরিয়ে ফেলতে চাই, মিথ্যার এই আবরণটা সরিয়ে ফেলতে পারলে দেখতে পাবো এক অন্ধকার সমুদ্রকে—প্রকৃত ঘটনাগুলি চিনতে পারব, শব্দের আসল তাৎপর্য বুঝতে পারব অন্তরচেতনায় অবচেতন জগৎ স্পষ্ট হবে—মনুষ্যত্বহারা, কুঁকড়ে যাওয়া আজকের পৃথিবীর মানুষ এটা দেখতে চায় না। কিন্তু যার এসব না দেখে কোনো উপায় নাই, আমি সেরকম একজন, দেখি বলেই দেখাতে চাই। এটা অজানার দিকে যাত্রা নয়, তার উলটো এ যাত্রা। অজানা থেকে সত্যকে জানার দিকে। অজ্ঞান থেকে চেতনায়। শূন্য অবস্থা থেকে হয়ে-ওঠা। অজানার অতলস্পর্শী গহ্বর থেকে উঠে আসা জাগরণে জ্ঞানে। একই অস্তিত্বের মধ্যেই ভ্রমণ। তবে সুখকর ভ্রমণ নয়! রক্তক্ষয়ী অর্ন্তসংগ্রামের অভিজ্ঞতা এই ভ্রমণেরই অভিজ্ঞতা। বুর্জোয়া মূল্যবোধ জনিত ক্লান্তি অবসাদ ও মৃত্যুচেতনায় আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তির খোলা আকাশে উঠে আসার এই চেষ্টা। যে মুক্তি আমারই কিন্তু তা অন্যদেরও হতে পারে। একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় থেকে চেতনায়, চেতনা থেকে ইন্দ্রিয়ে স্বচ্ছন্দ ও বাধ্য হীন গতায়াত। এই হ'ল আমার প্রকৃত স্বাধীনতা। আজ দেখছি পৃথিবী কেবলই ইন্দ্রয়পরায়নতা ও বস্তুসীমার মধ্যে সংকীর্ণ হচ্ছে—এবং নিজের ধ্বংসের সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তুলছে!

ক্ষমতা-সুখ, স্বাচ্ছন্দ-স্পৃহা আর হৃদয়ের জাড্য—এই হ'ল আজকের মানুষের সাধনা। ভালোবাসা—টাকায় কেনা যায়! মানুষ—বুনো জন্তুর চেয়েও সস্তা! জীবন—বাড়ি, গাড়ি আর ব্যাঙ্কে সুরক্ষিত! ইতিহাসে এর চেয়ে নির্মম ও হৃদয়হীন সময় কখনো এসেছে কি? সমাজ-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ ডালপালা ধরে ঝুলে আছে এই সব মানুষেরা—ঝুলতে ঝুলতেই চলেছে এদের হাগামোতা মৈথুনক্রিয়া বংশবিস্তার, ক্ষমতাবিস্তার, শোষণ, খুনের ষড়যন্ত্র। প্রত্যেকেই আঁকড়ে ধরে আছে এক একটা ডাল প্রাণপণে। প্রতিমুহূর্তেই এরা ভীত যে কখন ওই ডালটি থেকে খুলে পড়ে—এই ভয় মৃত্যু ভয়ের সমান। প্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে যাওয়া মাত্রই ঘটবে সেই সর্বনাশ। তখন সে পতিত। সমাজের কাছে সে তখন মূল্যহীন, নামহীন। আবার এই প্রতিষ্ঠানের ডাল যারা ধরতে পারেনি তাদের মর্মন্তদ কান্নাকাটির শব্দ, যারা ডাল ধরে ঝুলছে তারা শুনতে পাচ্ছে। এরা মানুষ-ভাইরাস। এদের কাজ হ'ল অন্যের জীবনকে নষ্ট করা, অন্যের স্বাধীনতা হরণ করা, অন্যের সম্ভাবনার দুয়ার রুদ্ধ করে দেওয়া। এই রক্তচোষার দল জীবনে একবারই মরবে বলে জানে, কিন্তু জানে না যে ওরা ইতিমধ্যেই মরেছে। এরা জীবনের যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক প্রকাশ দেখা মাত্র বাঁদরের মতো মুখ খিঁচায়। এদের প্রতিষ্ঠান গণ্ডির বাইরে যা কিছু ঘটবে তাকেই এরা অপরাধ বলে চিৎকার করবে। এরা সমাজপ্রতিষ্ঠানের

ডাল ধোরে ঝোলে আর পাইখানা করে, এদের পাইখানার দুর্গন্ধে আবিল হয়ে উঠেছে পৃথিবীর বাতাস। প্রতিষ্ঠানের তোয়াক্কা না করে যে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ বেঁচে আছে তাদের শ্বাসকষ্টের কারণ এই। ওদের পাইখানাতে ইতিহাসের আয়তন বেড়ে চলেছে। হায়, মানুষের ইতিহাস! গু, রক্ত আর চোখের জলে রচিত ও বর্দ্ধিত এই ইতিহাস। রক্ত? হ্যাঁ, সেই সব আত্মার—বিদ্রোহী ও সন্তের। চোখের জল? হ্যাঁ, আমাদের হৃদয়চক্ষু থেকে যে জল ঝরে। যারা দেখে তাদের চোখগুলি তো উপড়ে নেয়া হয়, তখন হৃদয়ই চোখের কাজ করে, হৃদয়চক্ষু থেকে জল ঝরে। চক্ষু কোটর থেকে ঝরে আগুন। পৃথিবী তো আমাদের হৃদয়দৃষ্টি চিনতে পারে না, এই দুঃখেও পড়ে দীর্ঘশ্বাস...আমি গু থেকে রক্ত আলাদা করে নিয়েছি। আমার মৃত্যুর মুখ্য কারণ এই। আমার এই অপরাধ-এর ফলে গভীর, গভীরতর অন্ধকার ঘিরে ধরে আমাকে। ঈশ্বর নাই কিন্তু মানুষ আছে, আছে মানুষের পৃথিবী—কিন্তু এই হলো সেই পৃথিবীর চিত্র!

(দুই) গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার :

....

আমি অনেকদিন
অনেক অনেকদিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার!
ভয় পেয়েছি

অন্ধকার, সে কোনো আলোর নাম? পৃথিবীতে এমন সমস্ত ঘটনা ঘটে, এমন সমস্ত শব্দ উত্থিত হয়, সন্ধিতে সন্ধিতে এমন সব অতি গোপন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে, ফলে জীবনে কোনো হিসাবই ঠিকমত মেলে না। এজন্য দুঃখ হয় অনেকের কিন্তু সুনিশ্চিত নিয়ম কখনই এই মূর্খদের জন্য দুঃখিত বোধ করে না। জন্ম জীবন ও মৃত্যু—এই তিন পয়েন্টের পারস্পরিক জটিলতাই এই অন্ধকার। আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই এই অন্ধকারকে বহন করে। বিভ্রান্তিকর অবশকারী ধাঁধার মতো জীবনের রাস্তাকে অস্বচ্ছ করে এই অন্ধকারই। এই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ক্রমশই জেগে উঠতে থাকে মৃত আত্মা—নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দই জীবনের ডাক, সেই ডাক যে শুনতে পায় সেই জানে জেগে ওঠার প্রকৃত অর্থ কী! তাকে বুঝতেই হয় পুনর্জন্মের এক প্রভাত অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। কিন্তু সে কি পারবে সেখানে পৌঁছাতে? সংশয় নিয়েই তাকে চলমান হতে হয়—বাস্তবে তাকে জেগে উঠতে হবে সেই একই পৃথিবীতে কিন্তু চেতনার রূপান্তরিত আলোয় উদ্ভাসিত নতুন এক পৃথিবী—জীবনকে তখন আর 'শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর' মনে হবে না। লোস্ট্রের মতো নিক্ষিপ্ত হয়ে সে স্তব্ধ হয়েছিল কিন্তু নবজন্মের চেতনা তাকে গতিশীল ও সক্রিয় করে তুলেছে। নিজের সম্পূর্ণ মৃত্যু দেখার পর সে ফিরে যাবে ওইখানেই যেখান থেকে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ফিরে গিয়ে আর ভয় কীসের? ভয়ের উৎসেই তো সে গিয়েছিল—আর কি ভয় এই অভিজ্ঞতার পর।

আমার পুনর্জন্ম যদি সম্পূর্ণ হয় তবে, 'মানুষি সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য আমাকে নির্দেশ' কেউ দিতে পারবে না—যে পৃথিবীতে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম চিন্তা কাজ নিয়ত মৃত্যু যেখানে প্রতিটি মানুষকে চালনা করছে—সেই পৃথিবীর পক্ষে আমি পুরোপুরি অনুপযোগী। আমার হৃদয় থেকে মুছে গেছে ঘৃণা আর আক্রোশ। সূর্যের রৌদ্রে

আক্রান্ত এই পৃথিবীতে কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদের উৎসব চললেও তা আমাকে পীড়িত করতে পারবে না—সমস্ত দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত হাসি তখন আমার কাছে স্পষ্ট। অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চাই না আর—এই অভিজ্ঞতার, এই সচেতনতার পর জীবন থেকে মৃত্যুর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করা আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন। মূল্যবোধগুলির বোঝা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই অন্ধকারের অতল যোনি গর্তে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম—এটা আমি চাইনি, এটা ঘটেছে এইটুকু আমি জানি—সেখান থেকেই আমার উঠে আসা, জেগে ওঠার চেষ্টা—জেগে ওঠা স্মৃতিহীন বসন্তে।

আমিষ অন্ধকার : বাবা ছেলেকে বলছে তুই সকলের মতো হ'—ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতে শেখ, এই ইতিহাসই তোর বর্তমান-ভবিষ্যৎ, চেয়ে দেখ কেউ হাসে আর কেউ সেই গু মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। যে মাথায় গু তুলে নেয় সে তো আর মানুষ থাকে না, কেউ তাকে ছোঁয় না, ইতিহাস ওদের জন্য আলাদা বস্তি দিয়েছে, ওরা বস্তিতে থাকবে, মাতলামি করবে আবার বংশ বিস্তার করবে—ইতিহাসের কাছে ওরা কলঙ্ক। কিন্তু তুই থাকবি সেই শ্রেণিতে ইতিহাস যে শ্রেণির দখলে!

মা বলছেন, মেনে নেয়াই ধর্ম। বাবাই তোমার পরিচয়, বাবার প্রতিবাদ কোরো না। ইতিহাসের অংশ হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করো, এছাড়া তোমার অস্তিত্বের আর কোনো অর্থ নাই। গর্ভযন্ত্রণা পর্যন্তই তুমি সত্য ছিলে...

আসুন আমরা একবার দেখি এই রোমান থিয়েটারে কী ঘটছে : অন্ধকারের জরায়ুর মধ্যে এই থিয়েটারের অভিনয় চলছে—

প্রভুর খপ্পর থেকে পলাতক ক্রীতদাসকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে। দর্শকদের দাবিমতো তাকে এবার হিংস্র ঘাতকের সামনে ছেড়ে দেওয়া হবে। ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর দাঁতে বিদ্রোহীদের ছিন্নভিন্ন হতে দেখে কী ভয়ংকর যৌনপুলক হচ্ছে দর্শকদের। বন্ধনছিন্ন ক্রীতদাসের তো দৃষ্টি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নাই—হিংস্র পশুর প্রতিটি আক্রমণে দর্শকদের মুখের বীভৎস বিকৃতি ও চাপা চিৎকার—তখনই বেড়ালের মুখে ধরা ইঁদুরের মুখে হাসি। যতবার ওই জানোয়ার হত্যা করে আমাকে ততবারই নতুন জীবন লাভ করি আমি, জানি : জিতব আমিই। প্রতিটি আক্রমণে ক্রীতদাসের দাস-চেতনাই কেবল ধ্বংস হবে, অবশিষ্ট থাকবে যেটুকু তাই তার প্রকৃত জীবন, মুক্তিচেতনা। বন্ধনছিন্ন ক্রীতদাসই কেবল ইতিহাসের গু আর রক্ত আলাদা করতে পারে। লুসিফার ঈশ্বরের সাম্রাজ্য পাপে ঢেকে দাও।

জন্তু মানুষ নিজের অরণ্য সীমাকেই স্বাধীনতার চৌহদ্দি বলে মনে করে, প্রবৃত্তির এই ক্রীতদাসেরা প্রভুদের মুখের হাসিকেই সূর্যের মতো দেখতে চায়। প্রভু খুশি হয়ে পিঠে চাপড় দিলেই চরিতার্থ তাদের জীবন। অমরতা এই ক্রীতদাসদেরই! আমাদের শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন অন্ধকার ঘিরে রাখে, অন্ধকারেই ক্রমশ বীতকাম হই আমরা, অপরাধ-চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে উঠে আসতে হয় আমাদের, সমুদ্রহৃদয়ের চিরন্তন পবিত্রতার কাছে।

(তিন) ইতিহাস আমাদের বলেছিল : নিজের বিষ্ঠার দিকে তাকাবে না, নিজের যৌনাঙ্গ দেখবে না

দুর্ভাগ্য ইতিহাসের যে আমি তাই করেছি—

ইতিহাস বলেছিল : ভালো হও

শোষণ যুদ্ধ ধ্বংস ও মৃত্যু—এই তো ইতিহাস। জীবন প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুখভঙ্গী এই কটিই।

অসচেতনভাবে ভালো হওয়ার অর্থই হ'ল এই প্রতিষ্ঠানের কাছে বলি হওয়া। এই ইতিহাসের উলটো দিকের রাস্তা ধরতে হয়েছে সৃষ্টিশীল আত্মাদের, কবরের শৈত্য, শ্মশানের উৎসবের মধ্যে শ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। যেতে হয় এর উৎস পর্যন্ত।

ইতিহাস আমাদের বলেছিল : কবিতা-শিল্প ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো দান—কবিকে তো আমরা মাথায় তুলে রাখি, পুরস্কার দিই, শিল্পের বুর্জোয়া ইতিহাসে তুমিও জায়গা পাবে—সৌভাগ্যবশত আমরা বুঝতে পারি এই বুর্জোয়া 'শিল্প' আর 'কবিতা' মানুষের জীবনের দুর্ভাগ্য চেতনায়, অর্থহীন ধাঁধার মধ্যে কোনো আলোকরশ্মি ফেলতে পারেনি, কবিতা—শিল্প তৈরির এই খেলা জীবনের অন্তর্গত অন্ধকারকে লুকিয়ে রাখার বুর্জোয়া চালাকি মাত্র। জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশই আমাদের কাছে কবিতা। অভিজ্ঞতাই চেতনা-সমুদ্রকে আলোড়িত করে—এই আলোড়ন ও মন্থনের ফলে উঠে আসে জীবনের তলদেশে লুকানো সত্যগুলি, আর ওই সত্যগুলিই আমার প্রকৃত পরিচয়। জীবন প্রতিষ্ঠানের অপরাধীরা এই অভিজ্ঞতাকেই ভয় পায়। লরেন্স বলেছিলেন,—পৃথিবী কোনো নতুন তত্ত্বকে ভয় পায় না, ভয় পায় নতুন অভিজ্ঞতা। এইসব অভিজ্ঞতাই জীবন প্রতিষ্ঠানের ধারক বাহকদের ভয়ংকর মুখ একেবারে হাট করে খুলে দেয়। যারা অপরাধী নয় এমন কিছু মানুষ তো নিশ্চয়ই আছে—এই অভিজ্ঞতাগুলি তাঁরা গ্রহণ করে—তাদের চেতনা—আকাশ আরও স্বচ্ছ করে এই নতুন অভিজ্ঞতা। যে রচনা কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয় তা কোনো সৃষ্টিই নয়।

মহত্ত্বের টুপি, করুণার নামাবলী ইতিহাসের পেচ্ছাপখানা থেকে কোনো জীবিত মানুষই তুলতে পারে না!

শেষ ধ্বংসের আগে অপরাধীর সবগুলি ইন্দ্রিয় একসঙ্গে মুক্তি চাইছে আজ।

(চার) তোমাদের আত্মপ্রদর্শনীই তোমাদের ভালোবাসা। গ্রাস করাই তোমাদের ভালোবাসা ; আর যা গ্রাস করতে পার না তা উপরে পেচ্ছাপ কর—কিছুই ফিরিয়ে দিতে জান না তোমরা, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়কে তোমরা ভয় পাও সচচেয়ে বেশি। তোমাদের অপরাধী আত্মা আতঙ্কে শূন্য হয়ে আছে—এই গ্রহটাকে উড়িয়ে দিয়ে তোমরা নিজেদের অপরাধ থেকে মুক্তি চাইছ। নিজেদেরই ঘৃণা কর তোমরা, আমাকেও তাই শেখাতে চেয়েছিলে। তোমরা যা দেখ না আমি তাই দেখি, তাই আমাকে তোমরা আক্রমণ কর—তোমাদের প্রতিটি আক্রমণে আমি মরি কিন্তু হৃদয়চক্ষু দিয়ে সেই মৃত্যুঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং তাকে প্রকাশ করতে পারি। নিজের মৃত্যুঘটনা প্রকাশ করাই আমার বেঁচে ওঠা। আমার ইতিহাস এই মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম। আমি আর অন্য কোনো মুক্তিতে বিশ্বাসী নই—প্রতিটি মৃত্যুর পর প্রতিটি জীবনই আমার মুক্তি। এখন কাজ একটাই—ফাঁসি কাঠে ঝোলান দড়িটা বিচারকের গলায় পরিয়ে দেওয়া!

(পাঁচ) তোমরা সুস্থ পৃথিবীর কথা বল, কিন্তু পৃথিবী তো কোনোদিনই সুস্থ ছিল না—প্রতি শিরায় যার অসুখ তারই নাম মানুষ। মানুষ এক বিশৃঙ্খল সংগঠন। তার মাথা যা ভাবে মুখ তা বলে না, হৃদয় যা অনুভব করে মাথা তা অস্বীকার করে—প্রকৃতি যা নির্দেশ করে কর্ম সে পথে যায় না, হাত যা করতে চায় মন তার প্রতিবাদ করে, আবার মন যা স্বাভাবিকভাবে হাত তা করতে দ্বিধা করে—এই সামগ্রিক বিশৃঙ্খল, এই আবর্তিত দ্বন্দ্বের নাম মানুষ। কিন্তু সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এক কেন্দ্রিয় আবেগ কাজ করছে, সেই আবেগই কবিতা। জীবন বহমান আছে বিপরীতমুখী শক্তিগুলির ঘাত প্রতিঘাতে, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়। প্রকৃত সাহিত্য এই দ্বন্দ্বের ক্রমপ্রসারিত চেতনা। মানুষের ভিতরের নাটবল্টুগুলোর পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কির যে

প্রবলতম যন্ত্রণা তা থেকেই মুক্তি চায় মানুষ—ধর্ম তাকে একদিন এই মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—মানুষ অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা ও অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ খুঁজেছিল ধর্মের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে। অস্তিত্বের বিশৃঙ্খল ও বিপরীতমুখী প্রবণতাগুলিকে নিয়ম ও শৃঙ্খলে বাঁধতে চেয়েছিল ধর্ম। কিন্তু কোনো ধর্ম আচরণ দ্বারাই মানুষের মুক্তি আসেনি। ধর্ম-প্রাণ আর ধর্মহীন আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এবং দুজনের মুখাবয়বকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না। উভয়েই একই অপরাধ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পড়েছে। জীবনের আমিষ অন্ধকারকে অর্থদান করে তাকে স্বচ্ছ করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে তথাকথিত ধর্মদর্শন। কবির আত্মানুসন্ধানে এইসব দর্শন কোনো আলোই ফেলতে পারে না। ব্যতিক্রম কিছুটা গৌতম, ভয়ংকর অন্ধকারে নিজের সব ত্যাগ করে সে বুদ্ধ হয়েছিল।

কবির ধর্ম—আমি মনে করি আত্মবিস্ফোরণ, আত্মাবিষ্কার ও আত্মউন্মোচন। অস্তিত্বের সামগ্রিক বিশৃঙ্খলাকে সত্য সৌন্দর্যে সাযুজ্য দান করে কবি নিজেই এক ধর্ম। ধর্ম তাকে কেউ দিতে পারে না। দুরূহপথেই তাকে আত্মধর্ম আবিষ্কার করতে হয়। আর অসত্যে জারিত জীবনকে আক্রমণ করে তবেই তাকে পৌঁছাতে হয় সত্য-ধর্মে।

(ছয়) বুর্জোয়ার শোষণে আর পচা মূল্যবোধগুলির চাপে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে শূন্য হয়ে মানুষ আশ্রয় নেয় ধর্মগুরুর কাছে—আর বুর্জোয়া নিজেও নিজেরই মূল্যবোধে মিথ্যায় পরিণত হয়ে আশ্রয় করো ওই একই ধর্ম আর ধর্মগুরু। শোষিত আর শোষক একই ঘাটে জল খেতে থাকে, এটাই হ'ল বুর্জোয়া ইতিহাসের চমকপ্রদ অধ্যায়—তালগোল পাকানো এক মিলন, যা থেকে সত্যকে বের করে আনা প্রায় অসম্ভব। জীবন প্রতিষ্ঠানের রক্তপায়ী লুকানো মুখটি হলো এইসব তথাকথিত ধর্ম'। বুর্জোয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য একের পর এক জীবনবিরোধী সংস্কারের জন্ম দিয়ে চলে তথাকথিত এই ধর্ম'।

কবির মৃত্যু তখনই যখন সে মাথা মুড়িয়ে ফ্যালে—কোনো তত্ত্ব বা দর্শনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে—ব্যক্তিগত সমাধান চায়। যে কবি তার কোনো ব্যক্তিগত সমাধান নাই, কারণ সে আর কোনো ব্যক্তি মানুষ মাত্র নয়। চলমান জীবনে তাকে হুটোপুটি খেতেই হয় না হলে সে থেকে যাবে এক নঙর্থক শূন্যে। প্রবাহমান মানবচেতনার সক্রিয় অংশ সে—সেই প্রবাহমানতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই তার অপমৃত্যু। ব্যক্তিগত সমাধান নেওয়া মাত্রই সে বিচ্ছিন্ন এবং মৃত। তখন সে এক সমাজ রাষ্ট্রের এক সাধারণ সদস্য মাত্র, এ ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় থাকে না। এইজন্যই যিনি কবি তিনি জীবন প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক গ্রাস সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। কবির তো কোনো ব্যক্তগত দুঃখ, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত কষ্ট থাকে না। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা একাকীত্ব আনন্দ ভালোবাসা বা ভালোবাসাহীনতা—যা সে নিজের অভিজ্ঞতায় লাভ করে, সেগুলি সবই সমগ্র মানবচেতনার। কবি এই চেতনার প্রতীক। সে রূপান্তরিত চেতনা এবং সত্য-ধর্ম। জীবন প্রতিষ্ঠানের বুর্জোয়া-অপরাধ সম্পর্কে যার হৃদয়ে কোনো ঘৃণার সৃষ্টি হয়নি, যে মনে প্রানে এই ব্যবস্থাকে সেবা করে, পুরস্কৃত হয়, সে কখনই নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে না সত্যে। শব্দ দিয়ে শিল্প রচনা করার দরকার হয় তারই। তথাকথিত ধর্ম আর শিল্প—এগুলি জীবন প্রতিষ্ঠানেরই ছলনাময়ী হাসি মাত্র!

নিজের স্বাধীনতায় আমি হতে চাই আমারই ঈশ্বর—এক জীবনেই বহু জন্ম বহু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পৌঁছাতে হবে এই লক্ষ্যে—জ্ঞানের উপত্যকায় মুক্তি।

শঙ্খ ঘোষ

আত্মতৃপ্তির বাইরে

প্রায় তিরিশ বছর আগে 'কৃত্তিবাস' যখন প্রথম ছাপা হচ্ছিল, তখন তার প্রতিসংখ্যাতেই দু-একটি ভাবনাসঞ্চারী গদ্য থাকত, একটু বড়োদের। তরুণদের কবিতার পাশাপাশি নতুন দিনের কবিতার সমস্যা নিয়ে লিখতেন তখন, কখনো সমর সেন কখনো জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর কখনো-বা শান্তিনিকেতন থেকে সুনীলচন্দ্র সরকার। কবিরা অথবা পাঠকেরা কতদূর মন দিয়ে লক্ষ করেছিলেন ছোটো সেই লেখাগুলি, সেটা আজ বলা শক্ত। কিন্তু সেদিনকার লেখাগুলির মধ্যে ছিল আশ্চর্য এক ঐক্য, ছিল এমন এক প্রত্যক্ষণ যা সেই সময়ের ইতিহাসের দিক থেকে বেশ তাৎপর্যময় বলে মনে করা যায়।

ঐক্যটা ছিল এইখানে যে, আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের প্রায় পঁচিশ বছর কেটে যাবার পর এঁরা সকলেই তখন ইঙ্গিত করছিলেন এক দিক-পরিবর্তনের, এক মুক্তির, ছোটো-কোনো-গোষ্ঠী থেকে বড়ো-এক-সমাজের দিকে মুক্তি। সমর সেন ভাবছিলেন যে কবিতার ভাষা অনেকটা সহজ হয়ে আসছে তখন, 'যাঁরা আগে আবেগকে ঘষেমেজে লাইন বানাতেন তাঁদেরও আজ বেশি কথা বলার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট', আর এই ঝোঁকের প্রেরণা হলো—সমর সেনের বিচারে—'গোষ্ঠী থেকে সমাজে বেরোবার তাগিদ'। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র চেয়েছিলেন, ফিরে আসুক কবিতা-আবৃত্তির লোকায়ত সম্বোধন, 'ব্যক্তি-চিত্রকল্প থেকে লোক চিত্রকল্পের' দিকে উত্তরণ ঘটুক বাংলা কবিতার। আত্মব্যাপ্তি আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবেন কবি, এইটেই হতে পারে নতুন কবিতার পথ—ভাবছিলেন তিনি। আর, প্রায় একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করছিলেন সুনীলচন্দ্র সরকার, বলছিলেন যে কবিরা যদি আজ 'আত্মবিলোপের দ্বারা সোনার ফসল' ফলান তবে সেইটেই কেবল হতে পারে আগামী দিনের স্থায়ী কবিতা। এইভাবে, তিনজনেরই ভাবনার মধ্যে দেখা দিয়েছিল কবিতার সঞ্চারের সমস্যা, পাঠকের দিকে কবিতাকে এগিয়ে নেবার সমস্যা।

এই এগিয়ে নেবার অন্য কোনো কোনো লক্ষণও কি দেখা যাচ্ছিল তখন? কবি আর পাঠকের সংযোগের জন্য কোনো নতুন সম্ভাবনার পথও কি খোঁজা হচ্ছিল? আমাদের মনে পড়বে যে কলকাতার পথে পথে 'আরো কবিতা পড়ুন' এর ধ্বনি নিয়ে কবিদের আন্দোলন এরই সমসাময়িক ঘটনা মনে পড়বে 'কৃত্তিবাস' এর প্রথম সংখ্যাতে 'কাব্যসভা' নামে একটি প্রতিবেদন লিখছেন তরুণ সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। স্কটিশচার্চ কলেজে সভার প্রথম অধিবেশনটির বিবরণ দিতে গিয়ে সুনীল লিখেছিলেন, যে এই সভা 'আত্মকেন্দ্রিক কবিকে চোখ খুলে তাকাতে সাহায্য করবে, সব কবিকেই এই সভা আহ্বান করবে আবৃত্তি আর আলোচনার জন্য।' প্রস্তাবিত কাব্যসভা হয়তো খুব বেশিদূর এগোয়নি আর, কিন্তু এরই পরে দেখা দিয়েছিল সেনেট হলের দু-দিনব্যাপী ঐতিহাসিক সেই কবিসম্মেলন যে-সম্মেলনের সফলতার পর আজ তিন দশক জুড়ে

প্রকাশ্য কাব্যপাঠ আমাদের সংস্কৃতিচর্চার প্রায় এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠল।

তাহলে কি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা সমর সেনরা যা চেয়েছিলেন, সেইটেই ঘটল দিনে-দিনে? গোষ্ঠী থেকে সমাজের দিকে এগিয়ে এলো কবিতা? ঘর থেকে পথে? আত্মকেন্দ্রিকতার বদলে ঘটতে পারল আত্মবিস্তার?

এই প্রশ্নের উত্তরে পৌঁছবার আগে একটা কথা ভাবার আছে। জনমুখি এবং রাজনৈতিক কবিতার একটা ধারা ততদিনে প্রচলিত হয়ে গেছে সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের রচনার মধ্য দিয়ে, অথবা এঁদের অনুসারী কারো কারো রচনায়। কিন্তু আরও কবিতা পড়ার স্লোগান নিয়ে যাঁরা পথে নেমেছিলেন সেদিন, তাঁরা এরা নন। তাঁরা ছিলেন নরেশ গুহ অথবা অরুণকুমার সরকারের মতো কবিরা, কবিতাকে যাঁরা সহজ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যাঁদের কবিতার ভিত্তি ছিল একেবারে ব্যক্তিগত ছোটো একটা জগৎ। সামাজিকতা বা রাজনৈতিকতাকে কবিতার পক্ষে ধিক্‌কারযোগ্য ভেবে এরা তখন তৈরি করতে চেয়েছিলেন এক নিভৃত স্তব্ধতা। আর, এর সঙ্গে সঙ্গে, 'কৃত্তিবাস' বা 'শতভিষা'র মতো পত্রিকাগুলিরও প্রধান সঞ্চয় ভরে উঠেছিল আত্মকেন্দ্রিকতারই নির্মাণে। যে 'আত্মপ্রসাদ' বা 'আত্মকেন্দ্রিকতা'র সংকটের কথা বলা হয়েছিল পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, অল্পদিনের মধ্যে সেইদিকেই উদ্‌গত হয়ে উঠল এর প্রবণতা। আবার নতুন করে দেখা দিল ভাষার তির্যক চাল, প্রকাশগত সংহতির ভাবনা, কখনো-বা ইঙ্গিত এবং রহস্যের প্রতি কবিদের নতুন আকর্ষণ।

সেটা ভালো ছিল কি মন্দ ছিল, সে-কথা আপাতত তুলছি না। কিন্তু যে-কথাটা ভাবতে হবে তা হলো, নতুন এই কবিতার সঙ্গে পাঠকের ঠিক কীরকম সম্পর্ক প্রত্যাশিত। কবিতা-আবৃত্তির কথা এতটা যে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তার কারণ বা প্রেরণা তো কোনো এক সংযোগের ভাবনায়? তিনি ভেবেছিলেন, নতুনভাবে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য কবিকে আজ 'আলংকারিক দিকগুলিকে বর্জন করে কাব্যে অঙ্গীকৃত করতে হবে অপেক্ষাকৃত সহজ ও direct আবেদনের বর্ণাঢ্য ভাষা।' কেবল তিনিই ভেবেছিলেন তা নয়, কথাটা এই যে জনসমাজে প্রত্যক্ষ আবৃত্তিযোগ্য কবিতার একটা নিজস্ব চরিত্র থাকবার কথা, এইটে হবার কথা যে সেখানে থাকবে এক বহির্মুখিতা বা বাগ্মিতা বা উচ্চরোল কোনো প্রবণতা। যে-কবিতা একেবারে তার বিরুদ্ধ রীতির, সেও কি সহজে জনসমাবেশে বহু বাধা পরম্পরায় আবৃত্তিযোগ্য হতে পারে, পৌঁছে দিতে পারে তার ভিতরকার সার? যে কবিতা ধ্যানের, গূঢ়তায়, অন্তর্ভেদের অথবা আক্রমণের—সেও কি হতে পারে 'আরও কবিতা পড়ুন' আহ্বানের অনায়াস উপাদান?

অথচ, হয়ে দাঁড়াল তাই। ফলে এই একটা প্যারাডক্স তৈরি হলে যে কবিতার চরিত্রকে না পালটে পালটানো হলো কেবল পাঠকের সঙ্গে তার যোগাযোগের ধরন। পাঠকের কাছ থেকে অসংগতরকম দূরে সরে যাচ্ছে কবিতা, এই ভাবনাটা নিশ্চয় ছিল কবিদের মনে। কিন্তু এ ভাবনা থেকে তারা যে নিজেদেরই পালটালেন এমন নয়, কবিতা বিষয়ে তাঁদের বোধের যে বদল হল এমন নয়, বদল হলো কেবল প্রচারপদ্ধতির। মুদ্রিত শব্দ বন্দি হয়ে থাকে দুই মলাটের মাঝখানে, তাকে খুলে দেখবার কোনো উৎসাহ পান না পাঠক, তাই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত সেই শব্দকে কবি পৌঁছে দেবেন সমাজে। তাই কবিসম্মেলন। কিন্তু, যে-কবিতা একবার দুবার তিনবার পড়বার, যে-কবিতা চকিত স্ফুরণের অথবা প্রবল প্রপাতের মধ্য দিয়ে ধরতে চায় পাঠকের গাঢ়তম অন্তস্তলকে, যে-কবিতা পড়বার পরেও অনেক সময়ে দুর্গম বা ধ্যানগম্য থেকে যায় পাঠকের কাছে, জনসভায় উচ্চারণমাত্রেই তার সভাসফল হবার কথা নয়। তবু, যে-কবিতা সভার নয়, সে-কবিতা সভায় গিয়ে দাঁড়াল। আর একই ফলে একটু একটু

করে তৈরি হয়ে উঠল প্রচ্ছন্ন এক বিরোধ। শ্রোতাদের দিক থেকে কবিতার ভাষায় লক্ষণীয় হতে লাগল কিছু চটক, কিছু নাটকীয়তা, কিছু-বা সাংবাদিকতা। কবিতার চেয়ে কবিতার কিংবদন্তি হয়ে উঠল বড়ো। কবিতা হয়ে উঠতে চাইল ভুল অর্থে সামাজিক।

কবিতার এই ভুল সামাজিক ভূমিকায় আরও একটা সমকালীন ঘটনা গণ্য করতে হবে। পঞ্চাশের সূচনাকাল পর্যন্ত এটা আমরা দেখেছি, কবিতাপাঠকেরা উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করতেন কয়েকটি পত্রিকার জন্য, 'কবিতা' বা 'পরিচয়', 'পূর্বাশা' বা 'সাহিত্যপত্র', 'অগ্রণী' বা 'ক্রান্তি'র মতো স্বল্পপ্রচার পত্রিকা। কবিদের প্রধান আশ্রয় ছিল এইসব পত্রিকা, এসব পত্রিকায় লিখতে পারলেই সেদিন খুশি হতেন তরুণ কবিরা, পাঠকেরাও জানতেন যে এইখান থেকেই ছোঁয়া যাবে আধুনিক কবিতার ধমনী। কিন্তু এসব পত্রিকার কোনো-কোনোটি লুপ্ত হয়ে গেছে পঞ্চাশের শেষভাগে পৌঁছে, কোনোটি-বা অবসন্ন হয়ে আসছে, কোনোটির প্রকাশ অনিয়মিত। অন্যদিকে 'দেশ'-এর মতো সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রসার বাড়ছে ঠিক এই সময়ে, পঞ্চাশ থেকে তার তিনগুণ মুদ্রণ বেড়েছে ষাটে, সত্তরে প্রায় সাতগুণ। এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাকেও নানা প্রতিপত্তি দিতে শুরু করেছে এ পত্রিকা, এ ধরনের আরও দু-একটি। অল্পে অল্পে এখন কেবলমাত্র সাপ্তাহিকতার ওপর ভর করেই তৈরি হয়ে উঠল নতুন এক পাঠকদল, ঔৎসুক্যহীন প্রস্তুতিহীন দ্রুতমনস্ক যে পাঠক দুটি একটি মুদ্রিত লেখা দেখে বলে দিতে পারেন যে আধুনিক কবিতা 'কিছু বোঝা যায় না' অথবা তা 'ভারী চমৎকার'! পাঠকের এই সম্প্রসারণকে বলা যায় কবিতাবিষয়ক মন্তব্যের সম্প্রসারণ মাত্র, এ ঠিক কবিতাবিষয়ক বোধের কোনো প্রসার নয়।

সমর সেন তাঁর 'কৃত্তিবাস' এর লেখাটিতে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে সমাজমুখি হবার পথে নতুন দিনের কবিতার একটা ভয়ের দিকও আছে। বাগাড়ম্বরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে কবিতা দেখা দিতে পারে ভাবালুতা, কবিরা ভুলে যেতে পারেন যে বুদ্ধি আর আবেগের সমন্বয়েই কবিতার উৎস—মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এসব কথা। পরিপার্শ্বের কারণে, কবিতার প্রকাশ আর প্রচারের অন্তর্গত ওই বিরোধের কারণে, অংশত সত্য হয়ে দাঁড়াল এই আশঙ্কা। কবিতার ইতিহাসে নতুন একটা ভাববার দিক দেখা দিল এই যে, ভাবালু এক আড়ম্বরে বা সাংবাদিক এক মিথ্যায ভারাক্রান্ত হতে চাইল কাব্যভাষার বেশ বড়ো একটা অংশ।

২

এক হিসেব, এ-সংকটটা কেবল আমাদের দেশেরই নয়, এটা আমাদের সময়েরই এক সংকট। যে-কোনো সত্য উচ্চারণকে মিথ্যা আড়ম্বরের দিকে টেনে নিতে এখন আর সময় লাগে না বেশি, যে-কোনো বোধ বা উপলব্ধি মুহূর্তমধ্যে হয়ে উঠতে পারে নিছক পণ্য মাত্র। শব্দ বা ভাষার ব্যবহার তাই আমাদের কাছে ভয় নিয়ে আসে অনেক সময়ে, লেখকেরা নিজেরাও অনেক সময়ে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন তাঁদের ভাষা ব্যবহারের সম্ভাবনা বিষয়ে। লেখা থামিয়ে দেবার কথাও হয়তো তখন ভাবেন কেউ কেউ।

যিনি থামিয়ে দেন, তাঁর আর কোনো সমস্যা নেই অবশ্য। কিন্তু প্রতিরোধের এই জটিলতা আছে বলে সকলে যে থামিয়েই দেবেন তাঁদের সৃষ্টি, এমন কোনো কথা নেই। বরং তখন সচেতন শিল্পীর সামনে এসে পৌঁছয় নতুন ধরনের একটা লড়াই, ভাষাকে ভেঙে দিয়ে ভাষার সত্যে পৌঁছবার কোনো লড়াই। এরই একটা ছবি ধরতে পাই যখন 'Nova Express'-এর মধ্যে বারোজ দেখিয়েছিলেন যে নীরবতাই হলো আমাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষনীয় অবস্থা, কিন্তু শব্দেরই

কোনো বিশেষ প্রয়োগরীতির মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছতে পারি সেই নীরবতায়। নিশ্চয়ই এই রীতির খোঁজেই তাঁকে ভাঙতে হয়েছিল শব্দ অথবা প্রতিমার অভ্যস্ত পারম্পর্য, ধরতে হয়েছিল তাঁর কাট্-আপ পদ্ধতি। কিংবা, এরই একটা ধরন দেখি যখন গিনসবার্গ ভাবেন যে তাঁর কবিতার ছন্দ উঠে আসবে একেবারে তাঁর শরীরের অন্তঃস্থল থেকে, নিঃশ্বাস থেকে, ফুসফুস থেকে—নিছক মনেরই কোনো সৃষ্টি নয় সেটা। অথবা ধরা যাক, একেবারে অন্য দেশের অন্য এক প্রকৃতির কবি ইয়র্গে গ্যিয়েন এরই প্রতিক্রিয়ায় এমন কোনো ভাষা খুঁজে নিতে চান যা শব্দকে অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছে দেবে শব্দাতীত তাৎপর্যের দিকে।

এই কুড়ি বছর বাংলা কবিতাতেও এসবেরই বিক্ষিপ্ত এবং মরিয়া ব্যবহার আমরা দেখেছি অনেক সময়। সমসাময়িক স্থূলতা অথবা বাজারের পণ্যতা আমাদের সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়, এই ভয়ের সামনে দাঁড়িয়ে জীবন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেউ কেউ, ভাষাকে নিয়ে যেতে চাইলেন স্পর্শযোগ্য বাস্তবতার একেবারে বাইরে। প্রতিস্পর্ধী আর অলীক এক দ্বিতীয় ভুবন গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখলেন কেউ, স্বতঃস্ফূর্ত আর অনর্গল প্রতিমাপুঞ্জের মধ্য দিয়ে রহস্যাতুর পরাবাস্তবতার স্বপ্ন কেউ-বা ভাষার জৌলুস ঝরিয়ে দেবার আয়োজন তাকে রিক্ত করে নিয়ে এলেন যতদূর সম্ভব। আর কখনো-বা ঝাঁপিয়ে পড়া হলো ভাষার ওপর সর্বাত্মকভাবে, তছনছ করে ভেঙে ফেলে তার মধ্য দিয়ে ধরতে চাওয়া হলো সমসাময়িক অথচ গূঢ়তর এক বাস্তবতারই চরিত্র।

এটা ঠিক নয় যে চারদিকের সমূহ সর্বনাশ বিষয়ে কোনো চেতনাই ছিল না এই কুড়ি বছরের কবিতায়। এক-একটা সময়ে তরুণ এক কবিদলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভয়াবহতার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছেন তাঁরা, এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরনে যুদ্ধ করতে চেয়েছেন এই ভয়ংকরের বিরুদ্ধে। কিন্তু এও ঠিক যে অবিন্যস্ত অসম্পূর্ণ আর দ্বিধান্বিতভাবে এসব যুদ্ধ নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়ই, ভেঙে গেছে হয়তো মধ্যপথে। তাই কবিতার কোনো সর্বগ্রাসী বিরাট আয়োজন আমাদের চোখের সামনে আজ দেখতে পাই কম। (আমিও কিছুদিন কবিতা লিখেছি বলে এখানে এটা বলা দরকার যে, যেসব দ্বিধাচ্ছিন্নতা বা অসম্পূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতার কথা বলা হচ্ছে এ লেখায়, আমি নিজেই তার এক শিকার।) সাময়িকের মধ্য দিয়েই অতিসাময়িক হয়ে উঠবে যে কবিতা, বোধ আর বুদ্ধির সামগ্রিকতায় গড়ে উঠবে যে কবিতা, ইতিহাসকে সত্তার মধ্যে ধারণ করবার অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে উঠবে যে কবিতা, সে কবিতার যোগ্য ভাষা এখন আর আমাদের আয়ত্তে নেই মনে হয়। জীবনানন্দ অনেকদিন আগে ভেবেছিলেন যে কেবল খণ্ড কবিতা নিয়ে তৃপ্ত থাকবে না ভবিষ্যৎ, শ্লেষে আর নাটকীয়তায় আর দীর্ঘতায় হয়তো বৈচিত্র্য আসবে অনতিদূর বাংলা কবিতার ইতিহাসে। দু'চারটি দীর্ঘ কবিতার সাম্প্রতিক প্রকাশ সত্ত্বেও মনে হয় না যে আমাদের ইতিহাসে সত্য হয়ে উঠছে জীবনানন্দের সেই ধারণা। কেননা, মনে রাখতে হবে, খণ্ডতা বা দীর্ঘতা এখানে কোনো পরিমাণসূচক প্রভেদমাত্র নয়, জীবনানন্দ ভাবছিলেন কোনো এক চারিত্রিক পরিবর্তনের কথা। এমন কোনো কবিতার কথা ভাবছিলেন তিনি যা আমাদের 'নতুন, জটিল সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রী'কে ধারণ করতে পারে, পেতে পারে প্রায় যেন এক শেক্সপিয়রীয় বিস্তার।

জীবনানন্দের নিজের কবিতার ইতিহাসে অভিজ্ঞভাবে এই সমগ্রতার দিকে নিয়ে যাবার পথচিহ্নগুলি থেকে গেছে। অস্তিত্বের অবতল থেকে উদগত হয়ে উঠেছে তার কবিতা, কিন্তু উদ্‌গত হয়ে উঠেছে কেবলই এক ইতিহাস যানের দিকে, সভ্যতাহীন এক সভ্যতার পরিপার্শ্বে। 'মহাপৃথিবী' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত পৌঁছতে

পৌঁছতে আমরা দেখতে পাব কীভাবে একজন কবি সমকালীন সমাজের সমস্ত ক্লেদ এবং আকাঙ্ক্ষাকে, স্খলন এবং উত্থানকে, ভয় আর ভালোবাসাকে একই সঙ্গে ধারণ করতে পারেন তাঁর মজ্জার মধ্যে ; কীভাবে অবচেতনের অতল থেকে উঠে আসতে পারেন অধিচেতনায়। 'বহমান ইতিহাস মরুকণিকায়' পিপাসা মেটাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, আমরা বুঝতে পারছি যে 'সময়ের ব্যাপ্তি সেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে/তাতো নেই ;—স্থবিরতা আছে—জরা আছে', কিন্তু তবু আমরা বলতে পারি 'অন্ধকারে সে-শরণ ভালো/যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।' এইরকমই বলেছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু এতদূর বলেও, এ-কবিরও হয়তো মনে হয়েছিল কোনো অস্পূর্ণতার কথা। যে আধুনিকতা তার মর্মের মধ্যে 'অনেক বড়ো সময় সাপেক্ষ ইতিহাস'কে ধরতে চায়, নিজের পরিণতির মধ্যেও হয়তো তাকে যথেষ্ট বলে ভাবেননি জীবনানন্দ।

কিন্তু যতদূর তিনি পেরেছিলেন, বাংলা কবিতা কি সেই পটভূমিটুকুও আজ হারিয়ে ফেলছে না? জীবনানন্দের অনুরাগীতে কবিতার জগৎ আচ্ছন্ন আজ, কিন্তু জীবনানন্দের যথার্থ কোনো ঐতিহ্য পরে আর সে বইতে পারল কি না সন্দেহ। সে ঐতিহ্য এলোমেলো হয়ে গেল কখনো স্বপ্নাবিষ্টতায়, কখনো তুচ্ছ সাময়িকতায়, কখনো কেবল শব্দঝোঁকে। যে অর্থে একদিন সময়ের দিকে এগোতে চেয়েছিল কবিতা, দার্শনিক সময় থেকে ঐতিহাসিক সময় পর্যন্ত এক মুঠোয় ধরতে চেয়েছিল যেভাবে, তার চিহ্ন যেন সরে যাচ্ছে আমাদের চর্চা থেকে। কেননা দিনে দিনে আমাদের ঘিরে ধরছে একটা ভুল সামাজিকতা, একটা ছোটো সামাজিকতা, আমাদের চারপাশে উদ্যত হয়ে উঠছে অনেক নিরর্থক প্রকাশ্যতা, অনেক বিজ্ঞাপন আর প্রচার, গত এক দশক জুড়ে আমাদের চারপাশে দেখতে পাচ্ছি বিপুল এক ম্যাগাজিন-এক্সপ্লোশন, তীব্র এক মিডিয়া-এক্সপোজারের যুগ। যে-উদাসীনতা, যে-নীরবতার মধ্য দিয়ে শিল্পের নেপথ্য ক্রমশ এগিয়ে আসতে পারত জীবনযাপনের দিকে, চারিদিক থেকে তা দ্রুত ভেঙে পড়ছে বলেই কবি আজ আরও বেশি দিশেহারা হয়ে আছেন, অথবা, কখনো-বা আপ্তুতৃপ্ত। এই একটা সময়, যখন কবিতার জগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুখী আর ছোটো। যখন বড়ো কোনো আত্মবিস্তারের দিকে এগিয়ে যেতে ভুলে যাচ্ছি আমরা। এই একটা সময়, যখন আরও বেশি ব্যক্তিগত সাহসের দরকার হলো কবির, আরও বেশি ব্যক্তিগত আড়াল থেকে তাকে আজ ধরতে হবে আমাদের মহাসময়ের জটকে, আত্মবিলোপ নয়, সর্বস্বজোড়া আত্মোদ্‌ঘাটনে। সেইটেই হয়তো হতে পারে আমাদের আজকের দিনের কবিতার নতুন কোনো উত্তরণ। কিন্তু, এখনও আমরা জানি না, কোথায় অথবা কার কাছে আছে তার যোগ্য কোনো ভাষা, সমস্তের মধ্যে তার যোগ্য কোনো সমর্পণ।

নিকানোর পারা

ছোট্ট বুর্জোয়ার প্রার্থনা সংগীত

আপনি যদি ছোট্ট বুর্জোয়ার স্বর্গে যেতে চান
তবে অবশ্যই আপনাকে 'শিল্পের জন্যই শিল্প'
—এই বংশটিই ধরতে হবে এবং গিলতে হবে প্রচুর থুথু
অনন্তকাল এই শিক্ষানবিশী চলতে থাকবে।

কি কি আপনাকে শিখতে হবে এবং কিভাবে তার তালিকা
বেশ শিল্পসঙ্গতভাবে আপনার নেকটাই বাঁধুন
সঠিক লোকের হাতে আপনার কার্ডটি ধরিয়ে দিন
চক্‌চকে জুতোকে আবার পালিশ করুন
সমস্ত চেহারাটাকে আয়নায় দেখে নিন,
কিছুটা ব্র্যান্ডি খেয়ে নিন,
বড়ো আকারের একটা বেহালা থাকবে,
পাজামা পরে অতিথিদের অভ্যর্থনা করুন
মাথার চুল ওঠা বন্ধ করুন
এবং প্রচুর পরিমাণে থুথু গিলে খান।

সবচেয়ে ভালো সব কিছু ব্যাগে ভরে রাখা :
স্ত্রী যদি অন্য কারও জন্য পাগল হয়
তবে আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব করি :
রেজার ব্লেড দিয়ে দাঁড়ি কামান
প্রকৃতির সৌন্দর্যগুলির প্রশংসা করুন,
একপাতা কাগজ নিয়ে দলা পাকান
দীর্ঘসময় ধীরে কথা বলুন টেলিফোনে
বসার ঘরের খেলনা বন্দুক দিয়ে গুলি করুন
দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ পরিষ্কার করুন
এবং প্রচুর পরিমাণ থুথু গিলে ফেলুন

যদি সে স্যালুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চায়
ছোট্ট ওই বুর্জোয়া
তাহলে তাকে চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিতে শিখতে হবে
শিখতে হবে একই সঙ্গে হাসতে ও হাঁচতে
সীমাহীন গহ্বরের মিনারে ওয়ালস নাচতে হবে

দেবতা মনে করতে হবে যৌনাঙ্গগুলিকে
আয়নার সামনে ন্যাংটো হতে হবে
পেন্সিল দিয়ে ধর্ষণ করতে হবে গোলাপ
এবং কয়েকটন থুথু গিলে খেতে হবে

এই সমস্ত কিছুর'পর আমরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারি :
যিশুখ্রিস্টও কি একজন ছোট্ট বুর্জোয়া ছিলেন?

আমরা দেখেছি, যদি আপনি ছোট্ট বুর্জোয়ার
স্বর্গে পৌঁছতে চান তবে অবশ্যই আপনাকে
এক পরিণত সুদক্ষ খেলোয়াড় হতে হবে :
ওই স্বর্গে পৌঁছান!
নিশ্চয়ই আপনি এক যাদু-খেলোয়াড়
এবং এই খাঁটি শিল্পী কতটা সঠিক,
কারণ তিনি ছারপোকা মেরে মজা দেন!

এই ভয়ংকর চক্র থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য
আমরা এইসব প্রস্তাব দিই :

দৃশ্য হ'ন এবং অদৃশ্য হ'ন
চলাফেরা করুন একটা ঘোরের মধ্যে
ধ্বংসস্তূপের উপর ওয়ালটস্ নাচুন
একটা বুড়োকে কোলে নিয়ে দোল দিন
এবং চোখদুটো তার দিকে নিবদ্ধ রাখুন
মৃত্যুপথযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, কটা বাজে
হাতের চেটোতে থুথু ফেলুন
সকালের পোশাক পরেই আগুনের মধ্যে ঢুকুন
শবযাত্রীদের সঙ্গে চোখের জল ফেলুন
যোনিসাম্রাজ্য অতিক্রম করে যান
কবরের ঢাকনাটা খুলে দেখুন
সেখানে কোনো গাছ গজিয়ে উঠছে কিনা
এবং এক ফুটপাথ থেকে অন্য ফুটপাথে
যাতায়াত করতে থাকুন—
কখন এবং কেন এসব প্রশ্নের মধ্যে যাবার
দরকার নাই...
...কেবল শব্দের যাদু দিয়ে...
আর চিত্রতারকাসুলভ গোঁফ দিয়ে...
...চিন্তার গতি দিয়ে...

নিত্য মালাকার

সভ্যতার গ্রাসের বিরুদ্ধে এক কালো গান

১. বিকারে বিগ্রহ ভেবে সঙ্গম করে লাল ডাকবাক্সের সঙ্গে একদল স্কুল ফেরতা বালক। আর, লোক পোকাদের অবিরাম সঙ্গম দেখে যান এক ভ্রাম্যমান আত্মা। 'অপরাধ আত্মার নিষিদ্ধ যাত্রা'র অভিজ্ঞতা রোমন্থন যোগ্য নয়—ভয়াবহ।

ভূমিকায় অরুণেশ জানিয়েছেন তার বোধের উন্মেষ ও উত্তরণের কথা। হাওয়ার গাড়ি এক অনন্য গ্রাম। এখানে 'মাটির মানুষ'দের মধ্যেই তার বেড়ে ওঠা, একই সঙ্গে—তবে ছেলেবেলার সঙ্গী সাথীদের চাইতে একটু ভিন্নভাবে। 'আমি ঠিক এক দঙ্গল শকুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইনি, —আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি এমন এক পাখির দলের মধ্যে যেখানে দু-একটি দূরদেশি পাখিও লুকিয়ে ছিল, যারা নিজেদের চেনে না। এরা যে সংবাদ বয়ে আনে তার তাৎপর্য বোঝে না।' এরকমই এক সংবাদ বাহক বন্ধ্ মৈমুদ্দি—পাগল, আর রাশি রাশি গ্রন্থ।

এক জন্ম-অপরাধী আত্মার 'স্বপ্নতাড়িত' যাত্রা যে এসে পৌঁছতে পেরেছে পৃথিবীর ও জীবনের 'উত্তপ্ত ও বিশৃঙ্খল, প্রেরণাদায়ক' অংশে। 'অতৃপ্ত, উন্মাদ ও উলঙ্গ। কিন্তু চোখ খোলা আমার, স্বপ্ন সক্রিয়। সত্যকে মেনে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এরকমভাবেই হাংরি জেনারেশনের লেখকদের কাছাকাছি চলে আসা। যারা মৃতদের বাসভূমিতে ছিল একমাত্র জীবন্ত।

হাংরির প্রতিবাদী লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে অরুণেশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে এই আন্দোলন শুরু হবার প্রায় দশ বছর পর, যখন শৈলেশ্বর ঘোষের 'অপরাধীদের প্রতি' কাব্যগ্রন্থও 'প্রতিবাদের সাহিত্য'-এর মতো আশ্চর্য উজ্জ্বল লেখা বেরিয়েছে। 'হাংরি স্পিরিট' কথাটিতে কারোর আপত্তি থাকলেও থাকতে পারে, আমার নেই। যেমন নেই 'নকশাল স্পিরিট' বলতে। বস্তুত, এটা ঘটনা, একে স্বীকার বা অস্বীকারে কিছু এসে যায় না সেইসব সমর্পিত লেখক-বিপ্লবীদের যারা দর্শনের অধিক কিছু দর্শন করে বিভিন্নকালে বিভিন্নদেশে।

বলা উচিত, নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সক্রিয়তার অপরাধীদের ডালপালা ও শেকড় বাকড় আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে ও শূন্যে। মূলত সেই স্পিরিটেরই সৃষ্টি—'৬৪—'৭৪ এর পর এই 'অপরাধ আত্মার নিষিদ্ধ যাত্রা'।

আপাদমস্তক বুদ্ধ নির্লিপ্ত এক অরুণেশের গোত্রহীন এই গ্রন্থ যেন রাত্রির কালো দুঃস্বপ্ন, প্রতিবাদ। প্রতিবাদ সমস্ত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, তা রাজনীতির ধর্মের শিল্পেরই যাই হোক। আর, এই প্রতিবাদের ভাষা খুব যে শিষ্ট অথচ প্রগতিশীল তা নয়, বরং প্রতিক্রিয়াশীল আঘাতের। সবাইকে কমবেশি আঘাত করবে, অপ্রিয় করবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী? কারণ, '...এই অবস্থায় যারা প্রতিবাদী তাদের স্বর পাশবিক হতে বাধ্য—এবং সেইসব শব্দ তারা ব্যবহার করবেই যা' মধ্যবিত্ত পাঠককে বমি করিয়ে ছাড়ে।' [প্রতিবাদের সাহিত্য : শৈলেশ্বর ঘোষ]

অরুণেশের সচরাচর অন্য লেখাগুলোর চাইতে এই গদ্য বেশ আলাদা, ক্ষিপ্র ও আক্রমণমুখি যদিও পূর্ববর্তী লেখালেখিতেও এই ভূমিকা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, কিন্তু ইদানীং, বেশ্যা রাজনীতি মাতাল পার্টি অফিস মধ্যবিত্ত স্তন যোনি লিঙ্গ—এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোটোমানুষ, পার্টিমানুষ ও তাদের রবারের জিভওলা নেতা। এসব অরুণেশের লেখালেখির প্রিয় অনুসঙ্গ।

তাই, প্রথমেই আক্রমণ এসেছে সেইসব লেখা ও লেখকের বিরুদ্ধে যারা কলকাতা সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত মানবতা ইত্যাদি শব্দপ্রেমের নিগড়ে বন্দি ও বন্দিত ; তাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, ডান-বাম নির্বিশেষে। 'অপ'রে আবার সংস্কৃতি। এঁ আরেক হাঁসজারু—'অ' + 'কু'-এর স্লোগান—সন্তান অপসংস্কৃতি অবদমনের জন্যই, শোষণের জন্যই এক নতুন বোতলের পুরনো মদ। তাই চলছে বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে। এরা রোবট যান্ত্রিক কিন্তু আত্মাহীন সভ্যতার আধুনিক ধারক ও বাহক ; টেস্টটিউবে বেড়ে ওঠা, সৌখিন জরায়ুতে মুখ লুকানো নতুন প্রজন্মকে দেখতে পেয়েছেন অরুনেশ। সুতরাং অপরাধ কার? তাদেরই—যারা কৃত্রিমতার পরিপন্থী, যান্ত্রিকতার পরিপন্থী।

যৌনতার অভিযোগ উঠবে অরুণেশের বিরুদ্ধে। সমস্ত রুদ্ধতার, রুগ্নতার, অবদমনের মুখগুলো খুলে দিয়েছেন এই গ্রন্থে। উদ্দেশ্য একটিই,—প্রতিক্রিয়া, হোক। গড়ে তুলুক এমন এক পৃথক মূল্যবোধ যা' নাস্তি দিয়ে শুরু, সাম-রূপ উপসর্গগুলোকে কৃ-রূপ যোনির আবর্তে নিক্ষেপ করতে শেখাবে অনায়াসে। 'মুখোশ ও মুখশ্রীর' পার্থক্যটুকু ধরা পড়ুক আর অসামাজিক ভাষায় কথা বলা আজকের অপরাধী, মাতাল খুনি বেশ্যা ও তার অন্নদাস পরিত্রাণ করুক অবশিষ্টদের যারা নিয়ন্ত্রিত গণ্ডীতেই বেঁচে থাকতে চায় পোকার মতো।

২. 'কলকাতা বা সাহিত্য নামের পুরো ভণ্ডামি থেকে দূরে বাস করেন অরুণেশ। তার জগৎ অতি সাধারণ মানুষের জগৎ, যারা তথাকথিত আত্মিক সংকটে নিপীড়িত নয়, গ্রাম্য, একেবারেই মাটির মানুষ। সভ্যতার পালিশ সেখানে বড়ো কম ; তবু, সেখানেও হাজির হয়েছে পার্টির গণতন্ত্র, সভ্যতার সুসংস্কৃত সংগীত নাটক জলসা। হারিয়ে যাচ্ছে তাদের নিজস্বতা, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য। এই কোচবিহার জলপাইগুড়ি হাওয়া রৌদ্র যা ছিল স্বাভাবিক আলোকোজ্জ্বল প্রাণবন্ত তা' আজ নিষ্প্রভ সংকুচিত ও মৃতবৎ। এই শ্মশানভূমি থেকেই তার যাত্রা দেশজ ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে। যা' মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—সত্য, সেইসব উপাদান উপকরণই তাকে বোধের জমিতে নতুন সৃষ্টি ফলাতে সাহায্য করেছে। অরুণেশের সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই এই বিষয়টি জানে বলে মনে হয়। ফলত কোথাও কখনো সেইসব প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকেনি তার লেখায়। আসলে আত্মস্থ করা ; আর, এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের সমর্পিতা কুমারী প্রেম, ডস্টয়েভস্কির পীড়িত পাপআত্মা থেকে হেনরি মিলারের 'যৌনতার সৌন্দর্য আবিষ্কার' পর্যন্ত সব কিছুই স্বীকৃত, সাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে অরুণেশের মৌলিক সিদ্ধান্তে—'সারমনে'।

আর্থ-সামাজিক ও যে রাজনৈতিক কাঠামো এদেশে গড়ে উঠেছে এদেশে শাদা গৈরিক ও লাল মতবাদের মিশ্রণে, তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেননি অরুণেশ। তা' চান-ওনি, আক্রমণ করেছেন তীব্রভাবে এবং আগাগোড়াই এটা তার লেখালেখিতে এসেছে শ্লেষে ও ব্যাঙ্গে বিদ্রূপে। হ্যাঁ, নৈরাজ্য—প্লেটো সাহেব ও তৎপরবর্তী অন্যসব তাত্ত্বিকদের খাঁচা বানানোর কৌশলের বিরুদ্ধে ফাঁক করে দিয়েছে সবকিছু। ক্রীতদাস বানানোর সবরকম গোপন ও প্রকাশ্য প্রস্তাব যা' এই সভ্যতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে অস্বীকার করেছেন।

তবু, তিনি এই সভ্যতার বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন অন্য কারণে, শ্লেষাত্মক ভাষায়। বিজ্ঞান তার ভয়ংকর পাশব শক্তি নিয়ে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্ষুধায় ; ধ্বংসের গান

গাইছে রোবট।'

৩. ছোটো ও বড়ো মাপের মানুষের দ্বারা এ পৃথিবী বিভক্ত ; জীবিত ও মৃতদের দ্বারা বিভক্ত এ পৃথিবী। সামান্য সংখ্যক জীবিত এখনও, কিন্তু উন্মাদ। মৃতরা হাসে না-জেনেই না-বুঝেই। সভ্যতার ধর্ম দিয়েছিল যে ক্রুশকাঠ তা' যিশু ও পাগল, চোর খুনি, বেশ্যা আর মাতালেরাই বয়ে চলেছে। অবশিষ্টরা,—পর্যুদস্ত এইসব গণিকা, অন্নদাসদের নেগেটিভ ফিল্‌ম ; অবশ্য তা স্বীকার করে না।

অনাথ টাকা চায় বেশ্যা আত্মজার গতর খাটানোর টাকার ভাগ চায় নাঙের সামনেই। খুনি জেলখানার কুঠুরির গরাদের ওপারে দাঁড়ানো তার মেয়েকে মাগী হতে বলে ন্যায্য পয়সার বিনিময়ে। প্রকৃতিস্থতা, কল্পনাতীত ঐশিতার জোরেই তারা এটা করতে পারে। প্রেমিকা, ধর্ষণের সমস্ত ক্লেশকে সহ্য করে যায় একই সঙ্গে দুই প্রেমিকের পশ্চাচার। কারণ তার হারাবার ছিল একটিই—একটি গ্রন্থ, নরকে এক ঋতু—র‍্যাঁবোর ঐশ্বরিক ছবি, যিনিই হতে পারতেন তার অর্থাৎ গীতার প্রকৃত শরীরগ্রাহী, মর্মগ্রাহী। জ্ঞান, বিদ্যার প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী প্রেমিকা, নির্বিকল্প স্বাভাবিক।

এরাই, এরকম ঘৃণিত লাঞ্ছিত অপরাধীরা উঠে এসেছে এই গ্রন্থের পাতার পর পাতায়। লেখক অভিজ্ঞতার শেকড়-বাকড় চালিয়ে তুলে এনেছেন চেতন অবচেতনের সমস্ত সারাৎসার। এক সাঙ্গীতিক প্রতিবাদ, ক্রুদ্ধ আর নির্লিপ্ত সেই গান : "চারপাশে মৃতের স্তূপ দেখে কোনো অহংকার কি জমে উঠল কোথাও? আমার অহংকার, আমার ব্যর্থতার জন্য, অক্ষমতার জন্য, আমার মুখ থুবড়ে ধূলোয় কাদায় পড়ে যাওয়ার জন্য। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াই আমি, মুখ চোখের কাদা রক্ত লালা মুছে নিই হাতের চেটোয়...এগিয়ে চলি..."

৪. এবার লেখক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে কিছু টেকনিক্যাল কথা।

ক) ভাষাগত শিথিলতা অরুণেশ ইচ্ছা ক'রেই রেখেছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু, কেন? বিশেষ ক'রে এই গ্রন্থের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্টটি যেখানে আক্রমণকারী? 'করি নাই' 'দেখি নাই' এর 'নাই' জাতীয় হেলাফেলার ছেড়ে দেওয়া কিছু উপদ্রব আছে, এটা শ্রুতি ও দৃষ্টিকটু নিঃসন্দেহে। বিশদ আলোচনায় না-গিয়ে শুধু এটুকুই বলা যায় এই বইয়ের গদ্য অননুকরণীয় হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হোঁচট খেয়ে ঠেলে পার হতে হয় ছোটো ছোটো বাক্য গঠনের জন্য যা লেখক অরুনেশের অসাধারণ স্টাইলের সঙ্গে বেমানান। আমি জানি এসবই সর্বস্ব নয়, তবু অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী স্টাইলের সঙ্গে বেমানান। শব্দ ও বাগ্‌বন্ধে যাঁর ক্ষমতা প্রশ্নাতীত তাঁর কাছ থেকে এরকম হেলাফেলা ত্রুটি বেদনাদায়ক।

খ) এমন দুর্ধর্ষ গ্রন্থের এ-ধরনের বিতিকিচ্ছিরি 'প্রোডাকশন' ক্ষমা করা মুশকিল। এতে লেখক, প্রকাশক, পাঠক—কারোর প্রতিই সুবিচার করা হয়নি।

সত্য নগ্ন ও বিষময়, 'অপরাধ আত্মার'...এই বিষয়। কিন্তু তাই বলে টাকা আর অসামর্থের অজুহাত দেখিয়ে এমন অন্যমনস্ক প্রকাশনা যেন আর না হয়। পরবর্তী সংস্কার অর্থবহ চেহারায় দেখা দিক আমাদের সামনে এমন প্রত্যাশা রইল।

মলয় রায়চৌধুরী

শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা

"—শরীর আত্মার চেয়ে কম দামি নয়"—অশোক চট্টোপাধ্যায়

ক্ষুধিত প্রজন্ম ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম আসামী শৈলেশ্বর ঘোষ গ্রেফতর হন ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ : রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কবিতার অশ্লীলতা-র দরুণ। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি মানে জন্মনিয়ন্ত্রণ (১৯৬৮), অপরাধীদের প্রতি (১৯৭৪) ও দরজাখোলা নদী (১৯৮১) তিনি নিজেই ছাপান ওই আমলাতান্ত্রিক সাহিত্যসমাজের হেনস্থার অনেক পরে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরোবার আগেই আমি বাঙালি হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলুম বলে, তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ১৯৬৭ নাগাদ ছিন্ন হয়ে যায়। শৈলেশ্বরের ১৯৬৩ তে লেখা 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' ও 'তিন বিধবা' কবিতাগুলি এষণা পত্রিকায় পড়ার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই টালা ব্রিজের শেষে একতলার এক ঘরে—বহু পুরোনো গ্রন্থ ও হলুদ বিষণ্ণ পত্রিকার মাঝে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শুয়ে তিনি তখন অস্তিত্বের নাজেহাল মফস্বলে বুঁদ। নিজের পয়সায় ছাপানো কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর আর্থিক অনটনে পাঠককে আছড়ে ফেললে, আচমকা খেয়াল হয় যে, আরে, অমুক প্রকাশকের উপদেষ্টা একজন কবি—সে কি নিজের স্তাবকদের কাটিয়ে বেরোতে পারে না! চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের চেয়ে অনেক উন্নতমানের কবিতা লিখছেন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ষাট ও সত্তরের অপ্রতিষ্ঠিত কবিরা। অথচ, প্রকাশকদের পরম মুরগিই পরমহংস : আমার সোনার ডিম চাই তোরা যে যা বলিস ভাই। এখন, ৪০—৫০ এর কেউ সাহিত্যসেবার জন্যে চাকরি ছেড়ে দিলে যখন রেস্ত অনেক জমে উঠেছে, আমরা সেই ফ্রড ধরে ফেলি। এমনকি, ৪০-৫০ এর কিছু কবি পাকাচুলে ডিগবাজি খেয়ে বাম থেকে ডানদিকে গেলে ধরে নিই, ওঃ অমন তো হবেই। এই ডামাডোলের মাঝে জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর রাইটআপে শৈলেশ্বর লিখেছিলেন 'মানুষের শেষ ধর্ম কবিতা,' অপরাধীদের প্রতি-র রাইটআপে 'এখানে জীবনের আরেক নাম অপরাধ যারা জীবনে লুটোপুটি খেয়েছিল বলে অপরাধ করেছিল চোখ যাদের কিছু বেশি ও গোপন কিছু দেখেছিল আমৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা বহন করে গেছে ও যাবে...।' দরজাখোলা নদী-র রাইটআপ নেই।

২

শব্দের গূঢ় রহস্য যে-সময়ে আকাটের কাছেও ফাঁস, ওই আদুড় শব্দপ্রয়োগে উদ্দেশ্যমূলক বাকপ্রতিমা তৈরি, ষাট দশকের কবিদের বাধ্য করেছে ভাষাকে তার প্রতিদিনের সহজ ছোঁয়াচ বজায় রাখতে, পাঠকের বোধে যা সরাসরি সেঁদিয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শৈলেশ্বর ঘোষ ষাট দশকের একজন অনন্যসাধারণ কবি। আর, আফজল খাঁনের নাভি-ছিন্ন-করা বাঘনখে যে

প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গীকার, তা আচমকা শৈলেশ্বর মেলে ধরেন—লাবণ্যময় চাকুর ফলা ঝলসে ওঠে : অবোধ পাঠক-ও তাকে নৈরাজ্য বা অসংগতি, ভাববেন বলে মনে হয় না। বস্তুত তাঁর 'দরজাখোলা নদী' গ্রন্থের কবিতাগুলি, বাংলা ভাষা পৃথিবীতে তাঁর অনধিকার প্রবেশের নিন্দাধ্বনিকে এক হুমকিতে স্তব্ধ করেছে। 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' এর কবিতায় যা ছিল সহ্যশক্তি দিয়ে মুকুব করা প্রতুল দুঃখের, 'অপরাধীদের প্রতি' গ্রন্থে তাই খতিয়ে দেখা অবমাননার মুসাবিদা, হঠাৎ-অনীহায় লুকানো উল্লাস-ঝলক, ক্ষোভ-দমানো অহং-গদ্যের নিষিদ্ধ উত্তাপের লু। মানানসই কবিতা কোনোদিনই লেখেননি শৈলেশ্বর ; হয়তো সেজন্যেই, ব্যবসায়িক দাদাদের পত্রিকায় তাঁর লেখা নজরে পড়ে না। মনে পড়ে, লালবাজারের থার্ড-ডিগ্রি কক্ষে খদ্দরপড়া শৈলেশ্বরের শ্বাপদ চোখের হিসাব বহির্ভূত ঝুঁকি—পাশের গলিতে হাফপ্যান্ট-পড়া হবু-নকশালরা তখন ড্যাংগুলি ও লাট্টু চর্চা করছেন।

শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতায় জলজ্যান্ত শব্দবিন্যাসের বিদগ্ধ দমক থেকে ছিটকে আসে হর্ষ ও হ্রেষা, এক নিশ্বাসে হাজার দুর্ঘটনার জীবৎকাল কাটাবার অস্থিরতা : যেনবা তিনি বৌদ্ধ চাকমাদের বাঙালিত্বে জারিত। চোরা-ছন্দের চাপ-চাপ লেখাগুলিতে নদীতে নামানো ড্রেজারের পলিকাটার ধ্বনিপ্রবাহ, ভূকম্পন পরিমাপযন্ত্রের সাইজ্রর মতো ইঙ্গিতময়, পঙক্তি থাকের মধ্যে সংগৃহীত বিকারস্নিগ্ধ প্রজ্ঞা। তাঁর কবিতা তাঁর সংবেদনকে আততায়ী করে তোলে। 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর ঠান্ডা মাথায় খুন করার মতো কবিতার ভয়াবহতার পর 'অপরাধীদের প্রতি' গ্রন্থের নিহিত স্বাতন্ত্র্যের কুপিয়ে-কুপিয়ে মারবার প্রকাশভঙ্গী পাঠকের রোমকূপে ঝিঁঝিঁ ধরায়। 'দরজাখোলা নদী'-তে দেখি বিষদাঁতের ভিতর থেকে স্পুসিয়ান নীল পরাগ ঝরে পড়ে ; নেকড়ের ঘ্রাণশক্তি দিয়ে তৈরি বাগান ; কবিতার দ্রুত ধাবমান এক জান্তব চোখ। ভিন্ন এক মানসদুনিয়া। কাটা-কাটা কথায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ছন্দ। একে কি হিট্ অ্যান্ড রান্ কবিতা বলব? সেই ১৯৬৩ থেকেই, কবিতায় যতি তিনি ব্যবহার করেছেন কবিতাটি শেষ হবার পর। ছেদ চিহ্ন বিরল। কিন্তু 'দরজা খোলা নদী'-তে তিনি বারম্বার বিস্ময় চিহ্ন প্রয়োগ করেছেন প্রতিটি কবিতায়, এমনকি জিজ্ঞাসাচিহ্ন অহরহ। 'লীন তাপ,' 'হলুদ সকালের ফুল' কবিতা দুটি শেষ হয়েছে প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে এবং একটি কবিতার শিরোনামই 'কে আমি?' এই চিহ্নগুলি প্রতীচ্যের নিওক্লাসিসিস্টদের, বিশেষ করে পাসকাল-এর জীবাশ্মের কথা মনে পড়ায়। শৈলেশ্বরের সামনে আরও দুরূহ সমস্যা, মানে তার সামনে বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই, বদল করার ক্ষমতা নেই, এড়িয়ে যাবার ইচ্ছে নেই, পালাবার রাস্তা নেই, দাঁড়াবার জায়গা নেই, মুখে দেবার যো নেই, প্রতিরোধের অস্ত্র নেই।

৩

শৈলেশ্বরের বোধে অ্যালপাইন ও প্যারোইন প্রভাব বেশি। যদিও ষাট দশকের অন্যান্য কবিদের মধ্যে, যেমন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বেবি রায়, রত্নেশ্বর হাজরা, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু দাস এঁদের কবিতায় অস্থিক অনুভব বেশি কাজ করে। শৈলেশ্বরের লেখয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যে মাতৃতান্ত্রিকতা-বিরোধী ফ্রিজ-শট। যেখানে তিনি চকিতে যৌনতা বিষয়ক কোনো মন্তব্য ছুঁড়ে সরে যান, ওই অ্যালপাইন রক্তকোষের জন্য। অবুঝ পাঠক এটাকে যৌনবিকার বা শরীরসর্বস্বতা ভেবে ভুল করে বসেন। শৈলেশ্বর কখনই যৌনবিষয়কে উত্তেজনা নির্ভর করেননি ; বরঞ্চ বলা যেতে পারে যৌনতা তাঁর বিষয়ই নয়। পঞ্চাশ দশকের কবিরা, বিশেষ করে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর

কবিরা, যৌনতাকেই বিষয় করে কবিতা লিখেছিলেন। শৈলেশ্বরকে বোঝাবার জন্যে কিছু নমুনা দেয়া যাক :

(১) আমি ধর্ষণের অপরাধে জীবন পেয়েছি
শরতের চাঁদ দেখে আমার মুখ নীচের দিকে চলে গেছে
আমার অন্য উপায় নেই—স্ত্রীলোক রয়েছে শুয়ে
তার জরায়ুর আঁশ এখনও রয়েছে গায়ে—
[টার্মিনাস পার হতে গিয়ে — জন্মনিয়ন্ত্রণ]

(২) আমি দেখেছি ১০০ পাউন্ডের মেয়েছেলে ২২০ পাউন্ড পুরুষের নীচে চিৎ হয়ে
আছে—চাকরের মতো আজ আমি অন্যজনের মাথায় ছাতা ধরে আছি
[মাংসের চেয়ে দামি নয় — জন্মনিয়ন্ত্রণ]

(৩) নিগ্রো ছেলের লিঙ্গ চিবিয়েছে সাদা মেয়ে
পিস্তল হাতে নিয়েও গুলি খেয়ে মরেছে বিদ্রোহী
[একজন্ম একশব্দ — অপরাধীদের প্রতি]

(৪) ২০ বা ২৫ বছর যৌনাঙ্গ ব্যবহার করতে হবে আমাকেও
কপালের থাম মুছতে হবে
সমকামী ঈশ্বরের ফেস্টুন তুলে নিতে হবে কাঁধে
[শেষ সহবাস — অপরাধীদের প্রতি]

(৫) ঘুম ভেঙে যায় ও লিঙ্গোত্থান হয়,
আমি বুঝি স্বপ্ন ও তার মূল অপচয়,
যোনিমুখ থেকে জরায়ু মুখ পর্যন্ত যখন চেপে ধরি তাকে
আর এক স্ত্রীলোক তখন অন্ধকার বেয়ে নেমে আসে,
উন্মুক্ত উরু, শস্যভরা কোমর
[আমি ও আমার শব — দরজাখোলা নদী]

(৬) সূর্য তুমি অর্ধেক আলো বাকি অর্ধেক অন্ধকার
আমার কাছেই জেগে থাকে এক স্তব্ধ পাহাড়—
উরু স্তন জঙ্ঘা যোনি আকাশের নদী, প্রপাতের ধ্বনি,
সে আমাকে আঁকড়ে ধরে—
[স্তব্ধ পাহাড় — দরজাখোলা নদী]

পাঠকের প্রতিক্রিয়া অবশ্য নির্ভর করে তার আর্থিক-সামাজিক পৃষ্ঠপট, তার শিক্ষা, বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ওপর এবং সে-অর্থে কবিতা-ও তার কাছে 'জিনিস' হয়ে ওঠে। সুতরাং যৌন শব্দাবলীকে কে কীরকমভাবে নেবে তার কোনো চরম মানদণ্ড নেই।

৪

শৈলেশ্বরের কবিতা কেন্দ্রাতিগ হোক বা কেন্দ্রাভিগ, প্রতিটি কবিতার কেন্দ্রে তিনি নিজে। কোনো কবিতা কোনো এক বিশেষ স্পর্শকাতরতার ফসল নয়। তা অস্তিত্বের সামগ্রিকতাকে বাদ দিয়ে নয়। কথনভঙ্গীর ঠাস বুনোট শৈলেশ্বরের কবিতাকে অতিকথন ও মিতকথনের মাঝামাঝি এক

অনন্যতা দিয়েছে—বারবার তিনি নিজেকে নিয়ে আসেন সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতিতে, আর, নিজেকে রেহাই দেন না। সত্যি বলতে কি, শৈলেশ্বরর ওই ভয়াবহ শাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে, চল্লিশ দশকের অনেক কবিতাকে ইয়ার্কি মনে হয়। যে স্থিতধী প্রজ্ঞায় তিনি নিজেকে ষাট দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা করতে পেরেছেন তা আমূল আত্মভিমান ও আত্মাঘাত থেকে সম্ভব হয়েছে। তাঁর কবিতায় তাই নিসর্গের ফালতু উচ্ছ্বাস নেই ; বরং প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক আদিম অভিবাদন ঘুরে ফিরে আসে :

(১) কখনো কখনো সত্যি ভালোবাসার চেষ্টা করে দেখেছি আমি,
জন্তুর মতো শব্দ বের হয় মুখ দিয়ে

(২) শেষ রাতে শ্বাসকষ্ট হলে জানালার ১ পাট খুলে দিই
দেখি কিছু দূরে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রেলপুলিশ ঘুমায়

(৩) আমার ছাদ থেকে ঝুলে আছে জুতার ব্রাশ
মেঝেতে সডাক ব্রেসিয়ার কাঁটা দেশলাই
বুকপকেটে ঢাকা থাকে বুকের বাঁ দিক
এলার্ম কাঁটার উপর আমার অতিথি রুমাল
তুফান এক্সপ্রেসের জানালায় কানা ভিখারি
ভগবান এড়িয়ে ভিক্ষা চায়

(৪) প্রতিটি আস্তাবলে পাহারা, ভ্রষ্ট যে তাকে ভগবান
গ্রহণ করে না—হায় তবে এই আমাদের জন্ম,
দুঃখে রক্ত কাদায় এই শানিত হাহাকার

(৫) ফুলের স্পষ্টতা নিয়ে ফুটে উঠতে পারি না আমরা
অভিপ্রায়হীন জন্তুর মতো হয় না ঘুম, ঘোরাঘুরি করি
শ্মশান, হাসপাতাল, ভার্টি, মন্দির ও মেয়েমানুষের ঘরে

(৬) মৃত্যুর পর মৃতদেহ তারা ভালোবাসে, বুকে তুলে নেয়,
আদর করে—অশ্রু ও রক্ত মুছে দেয় কালো এলোচুলে
তারপর...অন্ধ ও অন্ধকারে সহবাস হয়!

(৭) নক্ষত্রলোকের পথে কারা প্রতিরাতে এঘরে খোঁজ নিতে আসে
মানুষ আর পশুতে একথা আজ জানাজানি হয়ে গেছে :
হত্যা আর আত্মহত্যার মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই—

৫

তাহলে, শৈলেশ্বরের কবিতাকে, আসলে, একজন নগ্নমানুষের শেষ ইতিবাচক অনুসন্ধান বলা চলে। জীবনসূত্রের অনুসন্ধান, যা বেঁচে থাকতে প্ররোচিত করে ; তাড়নার গুপ্ত হাহাকার, যা অস্তিত্বের মূলে পৌছে যায় ; প্রত্যঙ্গহীন অসহায়তা, যা জানুহীন মানুষকে আমরণ হেঁট করে রাখে। তবু, বারবার উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করে।

পরিশিষ্ট

১. ইস্তাহার সমূহ
শৈলেশ্বর ঘোষ
প্রদীপ চৌধুরী
সুভাষ ঘোষ

২. ক্ষুধার্ত পত্রিকার প্রস্তুতি সংখ্যা

ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ

৩. ঘোড়ার সংগে ভৌতিক কথাবার্তা
—শৈলেশ্বর ঘোষ

৪. রন্ধনশালা—বাসুদেব দাশগুপ্ত

[৩ ও ৪নং রচনাদুটি কোনো হাংরি কাগজে বের হয়নি। প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। অনেকেই মনে করেন হাংরি সাহিত্যের উৎসভূমি এই দু'টি রচনা]

সুচিন্তিত মতামতসহ পরিশিষ্টের যাবতীয় তথ্য সাজিয়েছেন অভীক মজুমদার।

পরিশিষ্ট ১

শৈলেশ্বর ঘোষ

মুক্ত কবিতার ইস্তাহার

* কবিতা মানুষের শেষ ধর্ম
* বুদ্ধ যীশু রামকৃষ্ণ নয়—কবি/কবিতা পৃথিবীকে স্বাধীন মুক্ত করতে থাকবে ক্রমশ
* কবিতা ব্যক্তি মানুষকে পুনরভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যায়
* কবিতা অপরাধ চেতনা থেকে জেগে ওঠা গ্লানিহীন আত্মার সংগীত—অন্ধকারে ফুটে ওঠা ফুল

১. সমস্ত ভণ্ডামির চেহারা মেলে ধরা
২. প্রকৃতির দাসত্ব না করা
৩. শিল্প নামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা
৪. আপাদমস্তক কেবল নিজেকেই ব্যবহার
৫. এসটাব্লিসমেন্টের চাকর না হওয়া
৬. যে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই ঘৃণা করা
৭. মানুষী অভিজ্ঞতার শেষ সীমা দেখে নেওয়া
৮. সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা
৯. সত্যকে সরাসরি বলা
১০. যুক্তির স্তর পার হয়ে গিয়ে দ্রষ্টা হিসাবে জীবনকে দেখা ও প্রকাশ করা
১১. সাধারণ কথা ভাষাকে ব্যক্তিগত করে দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করা
১২. যা কিছু গড়ে তোলা হয়েছে তাকে সন্দেহ করা
১৩. অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যকে ধরবার কোনো উপায় নাই—শুদ্ধ বুদ্ধি জীবন সত্যকে ধরতে পারে না
১৪. সমাজ যেসব শব্দকে অশ্লীল বলে বর্জন করে এবং যে চিন্তাকে দূষণীয় বলে ধিক্কার দেয় তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমসাময়িক জীবনের অনেক সত্য—এ গুলিকে ব্যবহার করা
১৫. নিজেকে ক্রমাগত ভাঙ্গা এবং মেলে ধরা
১৬. নিজেকে দেখাই জগৎকে দেখা, দেখাই জ্ঞান
১৭. অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে লুকানো যা কিছু—যা ক্রমাগত মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়, মুখোশের দিকে নিয়ে যায় তাকে প্রকাশ করা।
১৮. জীবনের ভয়ানক রিলেশনগুলি প্রকাশ করা

১৯. যে জীবন দেওয়া হয়েছে তাকে ত্যাগ করে আবার নিজের স্বরূপের কাছে চলে আসা এবং সৃষ্টির মূল নিয়ম ও গতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা

২০. চেতনাকে অরাজক করে তুলে, বুদ্ধির জগতের বাইরে বোধের জগতে চলে যাওয়া

২১. নার্ভ মাথা ও সংবেদন শক্তিকে পর্যুদস্ত করে তান্ত্রিকের মতো উঠে দাঁড়াতে হবে

২২. অস্তিত্বের কেন্দ্রগত ভয়ের মূল বিন্দুকে স্পর্শ করা

২৩. মধ্যবিত্তের রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করা

২৪. সমস্ত বুর্জোয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করা

২৫. মৃত্যু আর যৌনতা, যা মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, লেখায় সেই রুদ্ধ চেতনাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া—অবসেসনগুলিকে লেখায় মুক্তি দিতে হবে—সেটাই বুর্জোয়ার বিপদ

২৬. পৃথিবীর সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে ভয়ংকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে—তাকে প্রকাশ করতে হবে নিষ্ঠুরভাবে

২৭. জীবনকে ত্যাগ করে নয়, জীবনের কাদামাটি অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসা

২৮. জীবন বিরোধী এই সভ্যতায় নিজেকে করে তুলতে হবে প্রতিবাদের প্রতীক।

২৯. বুর্জোয়ার সুখ ও সিকিউরিটি বর্জন করা

(১৯৬৮)

ক্ষুধার্ত

শৈলেশ্বর ঘোষ-এর কবিতা

শ্বাসরোধকারী নাটক

মনে হচ্ছে এক হাজার বছর অন্ধকারে শুদ্ধ হয়ে জেগে উঠেছি
মনে হচ্ছে এক হাজার নিম্নচাপ সমুদ্র হৃদয় গহ্বরে সম্পদ নিয়ে বসে আছি
কোনো মৃত্যু সংবাদ নাই কোনো আততায়ীর গুলির শব্দ নাই
শহীদ মিনারের নীচে কাউকে আবার শহীদ করার ষড়যন্ত্র নাই
ক্ষুধার্ত সে কাঁদে না, মাংসের দরবিগলিত ঘাম নাই
মনে হয় এক হাজার বছর অন্ধকারে আবেদন মাফিক পরিচয়
মঞ্জুর হয়ে গেছে—
আমি দেখেছি অনিচ্ছাকৃত সন্তান হারাবার লোভে এসে খুন হয়ে গেছে মা ও সন্তান,
পোশা কুকুর হাড় থেকে মাংস পরিষ্কার করে দেবার পর
ডাইনির মেঝের নীচে শুয়ে আছে তারা
আর কিছু তবে ভাবার নেই, পরকাল ও সমাধিস্তূপ—
রাত্রিতে কড়' নাড়ার শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে বলতে হচ্ছে না,
'আস্তে শুনতে পাবে কেউ'

এত সব সত্ত্বেও খুনীর পরিচয় মেলে না—খুনী সেই যে আমাদের বাঁচাতে চায়—পাহাড়ে ও জঙ্গলে সন্তানের মতো বন্দুক রয়েছে পিঠে এবং সন্তানও রয়েছে বন্দুকও রয়েছে ঝুলে—এবং কোথাও সন্তানের ভবিষ্যৎ বীমা করে খুন করছে তাকে পিতা—হাতিয়ার আমরা ফেলে দিতে পারি না, সন্তানও আমরা ফেলে দিতে পারি না—চোখের সামনেই কালো হাড় জিরজিরে দেহ দুটি শাদা কাপড়ে ঢেকে গাড়িতে তোলা হয়েছে—তৃতীয়টিও প্রস্তুত, প্রস্তুত আমাদের হৃদয়, কর্মচারী পুলিশ, হিন্দু এলাকা ভিখারিমুক্ত করার পরামর্শ যাত্রীরাই দিয়েছে প্রথম—এই কালোবাজারে কাউকেই আর শনাক্ত করতে পারছি না, বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রাকৃতিক কাজকর্ম প্রকাশ্যে সেরে নিতে গিয়ে ধরা পড়া এবং যে যার পায়ু পরিষ্কার করে পুনরায় আত্মসমর্পণের অছিলা খুঁজি—

চোখ তুই দেখেছিস তুই অন্ধ হবি
কান তুই শুনেছিস তুই কালা হয়ে যাবি
মুখ তুই ভক্ষণের ও বমনের, শব্দপাতের ও
শব্দ ধারণের, তুই বোবা হয়ে যাবি—
হাত তুই অস্ত্রের মেহণের এবং লিখনের
তুই হৃদয়স্থান চিনতে পারিস না বলে পঙ্গু হবি
পা তুই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কাজ করিস

দুরকম চরিত্রে তুই স্বস্থানে ও পরস্থানে
যাতায়াত করিস, তুই খুলে যাবি—
লিঙ্গ তুই কামনাহীন সহবাসে লুপ্ত হয়ে যাবি
হৃদয় তুই শূন্যতার কাছে গিয়ে নেচে উঠিস
হৃদয়ের কাছে যাবার আগে বিদীর্ণ হবি

অন্ধকারে রয়েছে জ্ঞান—ভালোবাসার পাত্রীকে কখনো গণিকারূপেও দেখা যায় শ্বাসরোধকারী নাটকের শেষ অঙ্কে এইভাবেই হাততালি পড়ে এবং যবনিকা পড়ে গেলেও ছায়াদের আর চলে যাবার হুকুম মেলে না!

আনন্দ সংবাদ

আমি নতজানু প্রচারক মেনে নিয়েছি অন্তর্বাসসহ নির্লজ্জ জীবন, জামা ও বুকের ভাঁজে আগ্নেয়াস্ত্র অন্তরালে আকাঙ্খা উত্তেজিত, এই পৃথিবীর নেশা আমার ভৌতিক ভালোবাসা, বলি না আমাকে অনুসরণ কর, বলি না সৌন্দর্য আমার বিশ্বাস ও অমৃত ও অন্ধকার তাপে মলিন, কর্মে অপরাধী আনন্দ প্রণালী পাতালের ছায়ার ঢাকা বিক্ষোভ মিছিল ক্রমশ নিকটবর্তী অভিযুক্ত এবার অভিযোগ জানাতে এগিয়ে আসছে, ধাত্রীবিদ্যাই এখন মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র ত্রানব্যবস্থা, কল্লোলিনী শহরে রক্তসমুদ্র বরাভয় ও মুদ্রা দেখুন আমাদের আরামপ্রদ লিমুজিন আর ডিলুক্স কোচ, দাবী ছিল চুক্তি অনুসারে বন্দী বিনিময় কিন্তু সুন্দরী হেমব্রমকে ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে আমরা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, সত্য তোমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উত্তেজনা কমিয়ে দেবার জন্য এই ধারণা—হৃত এলাকা কখনই পুনরুদ্ধার করা যাবে না এবং শহরে যাবার রাস্তায় তোমাকে খুন করা হবে, বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েও আমি পুনর্মিলনের ডাক দিতে পারি না, এ আকাশে আজ মেঘ নাই পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ে শারদ নিশিবক্ষ মধ্যরাত্রির মতো গুমোট, নদীতে মরা কোটাল, হায় হায় হায় প্রতিবাদ করি সেই আচরণের যারা স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের ধুলায় মিশিয়ে দিতে চায়—হায় অত্যাচারিত, স্বাধীনতা বিরোধী দুর্যোগে ষড়যন্ত্রে কেবলমাত্র অবান্তর, পশ্চিমের জানালা খুলে আমরা পশ্চাদ্ধবনকারীকে দেখে নেব, এই অবধারিত বিশৃঙ্খলা আমাদের শান্তি ও সঙ্গীতময় জগৎ ফিরে পাবার আশা মিলিয়ে গেল—হে স্তব্ধতার বীরগণ কী কুসংস্কার মিথ্যা বৈষম্যবিলাস খোলা আকাশের নীচে ক্রমশ বিরুদ্ধবাদী করে তুলেছে তোমাদের, হে স্তব্ধতার বীরগণ অনিশ্চয়তায় আমরা আনন্দ বোধ করব, নিদারুণ উৎপীড়নে রূপ ও রীতিনাশক অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাব, ভয় নাই আর প্রশ্নকে ভয় নাই, উলঙ্গ শায়িত আনন্দরসে প্লাবিত মেয়েকেও ভয় নাই, পরাধীন শাসককে ভয় নাই চার্লি এই উদাহরণ গান্ধী এই মাও এইসব ভগবান নারীপুরুষকে একত্র করেছেন, এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক নারীগুলি ধর্মবিরোধী ভ্রূণ নষ্ট করে, খুন করা অন্যায় বলে এই কাজ করে, কারণ প্রতিবারের বীর্যে যেসব কীট জরায়ুর দেয়ালে মাথা কোটে তারা কেবল আমাদের সম্পত্তির অংশই চায় না, চায় ধর্মে দীক্ষা নিষিদ্ধ নির্দেশ ও আমাদের সকলের ধন্যবাদ, আমরা বিচ্ছিন্নতাকামী তাই মীমাংসার ব্যাখ্যা চাই, হাতব্যাগ তল্লাসী করে নীতি বিরুদ্ধ জামাকাপড় রক্তমাখা অবস্থায় পাওয়া গেল, আমাদের ছন্দবন্ধন হতচকিত, আমাদের শব্দ বিপর্যয়ই যৌনজয়, যন্ত্রকুশলী তুমি প্রবেশাধিকার নাও, এ মুক্তিযজ্ঞে বিষণ্ণ মুহূর্তগুলি কান্নার চমকগুলি প্রকাশ করো,

আমরা সঙ্গীরা মৃত্যুর কারণ জানতে চাই, মৃত্যু হবে বলেই ভালোবাসা ছেড়ে যায় আগে এখন দাবী ময়নাতদন্ত হোক, সন্তান আমাদের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ, মুখ যদি হতো সার্বজনীন ও বিশ্বাসযোগ্য পুলিশেরও সুবিধে হতো—আমি বিশ্বাসঘাতক ও খুনী এবং প্রতিক্রিয়ার মুখে আমি গেরিলা ও কবি ও শিরস্ত্রানধারী শান্তি প্রহরী—হে শূন্য হে স্তব্ধতা হে বিকার ও ক্লান্তি হে অন্ধ দ্রষ্টা আততায়ী সরে পড়ার পর রক্তাপ্লুত তুমি পড়ে থাকবে—সেই হবে তোমার প্রকৃত আনন্দ সংবাদ!

হারার

হানাদার, ওরে হানাদার, নিঃসঙ্গ কোটর থেকে মুক্তি পেলি আজ অভিনন্দন তোকে লক্ষ অভিনন্দন, ওরে ও উদ্দীপন দুঃস্থ গলিপথে জমাট রক্ত কালো হয়ে আছে, না কোনো দীর্ঘশ্বাস নয় ভবিষ্যতে কোনোদিন অভিবাদন করা যাবে তাকে, হৃদয়ের অন্ধকারে নীরবতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, অকুতোভয় জীবনে পথভ্রষ্ট, মরণের দিনে বুঝে গেলাম একদিন এইভাবে বেঁচে ছিলাম, এই স্ফুট নগরীর প্রাচীরে প্রাচীরে হারারে আবিসিনিয়ার দুর্গে প্রাকারে—মনে কী হয়েছিল দুঃখ চলে গেলে আমরা বাঁচব কী নিয়ে, মৃত্যু না থাকলে কীসের অপেক্ষা করব, অসুখ সেরে গেলে বিব্রত হবার কী থাকবে, প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে যৌনতা না জাগলে ভালোবাসা মিথ্যা হয়ে যাবে—আমাদের গান সংশয় থেকে উদ্গাত, হাহাকার সূর্যের নীচে বিবস্ত্র হবার ভয়, স্বনির্বাচিত এই গর্ভে জরিপের ফিতে হাতে দাঁড়িয়ে থাকার আর মানে হয় না, গলিত হারারে হৃদয়ের পর্ণকুটীরে ভীত সন্ন্যাসী শব্দে জয় করেছো অন্তর্বাহী অন্ধকার আর সেই অন্ধকারেই আনন্দে হাঁটু ভেঙে বসে আছো, পক্ষাঘাতগ্রস্ত পা নিয়ে এখন অগ্নিমরু পার হয়ে পালিয়ে চলেছো, দাসেদের কাঁধে চেপে আদিবাসী, আত্মগোপনকালে তবু কিছুই আবিষ্কার হ'ল না, এই আঞ্চলিক কুৎসায় তোমার দেবার কিছুই নাই চোখ তোমার মাটির দিকে দেখছে না মুখ মরুসূর্যে প্রতিভাত, এখনই সময় হাসো, একবার অন্তত হেসে বলো, আমিই তোমাদের নষ্ট সূর্য, বিকলাঙ্গ স্বপ্ন, ভূতগ্রস্ত ভালোবাসার প্রত্যাখ্যান, সপরিবারে এই শোভাযাত্রা, প্রতিবাদহীন এই পথে ফিরে আসছি আমি, হুজুর তোমার কাছে আবার মাপ চেয়ে নিই, এবার স্বপ্নের চিহ্নগুলিকে দাগী আসামীর অপরাধ বলে মেনে নিতে রাজি আছি আমি!

আমরা ঘুমাব কোথায়

শূন্যতা নক্ষত্রের তলে আরও কিছু জেগে থাকা আমরা
কোটি ভাইবোন কোনোদিন মুখ তুলে দেখি না কে থাকে উপরে
গলায় কী জোর ফাঁস হাতে এই নীরবতা পাত্র সংজ্ঞাহীন
হবার আগে জানব না আমরা কে নগ্ন এই জীবন মায়ের
দুই বুক সাবালক পর্যন্ত পোষণ করে না, হায় মাটি হায় জল
ঘুমের ঘোরে শোনা যায় বাবা বাবাগো আমরা ঘুমাব কোথায়?

আমরা পুরুষ ও স্ত্রী হলুদ চোখ চৌচির চামড়া শীতে
পেলাম জল, দাও না কিছু, ভিখারিরও তো দশ পয়সা পাওনা হয়,
এ পর্যন্ত ভাবা সহজ খাঁচার পাখি মাঝরাতে ডেকে বলিস তুই
কারা সব মরেছে ওদিকে—বসে থাক, শোবার যায়গা না পেলে
গান শোনাব আমি, জানি দু'একটি ভগবানের নাম, বলব
'কারা ডাকে তোমাকে' শূন্যতা নক্ষত্রের তলে আমরা ঘুমাব কোথায়?
বাবা, আমাদের বাবাগো

২

যদি আজ্ঞা হয় তবে আমরা এই কেন্দ্রেই থেকে যাব, বা যদি বলো তবে তোমার তীর্থকেন্দ্র তছনছ করে দেবো, আমরা তো বিরোধী নই, আমাদের কোনো প্রতিবাদ নাই আরও শক্তিশালী হবার জন্য পিতৃদত্ত নাম পাল্টাতে চাই না—আমাদের নিরাপত্তার বিপদ হতে পারে তোমার ১ পয়সা হ্রাস বা ১ পয়সা বৃদ্ধি

আমাদের জন্য আইন অমান্য এই নীতি চালু থাকে, বাবা বাবা বাবাগো তুমি অন্তঃসলিলা ও উগ্রপন্থী—আমাদের নৈরাশ্য তোমার দুঃস্বপ্ন, তোমার হঠকারী স্ত্রীলোক ও সরিয়ে নাও তোমার হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফল হিসাবে এই ভয়াবহ দৃশ্য পূরণ করতে আমরা প্রকাশ্যে আরও ভয়হীন ভালোবাসার দৃশ্য রচনা করি এবং তোমার বাহবা চাই, প্রতিদিন তুমি আমাদের অট্টহাসিতে যোগ দেবে এই আশা করি না, না হলে বলো, আমরা ঘুমাই কীভাবে!

প্রদীপ চৌধুরী

দুঃস্বপ্ন-ডাইমেনশন

চামড়ার নীচে জমে যাওয়া প্লিন্টারের মতো আমাদের জীবন। —সীমা ও সময়—রবারে তৈরি সারা শরীরময় শিরা, মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া ভিটামিন বড়ি, শরীরের দুঃসাহসী বিবেচনাহীন উত্থান—রাত্রি শেষ হয়ে এভাবেই এগিয়ে আসে রক্তময় দিনের ইশারা, রক্ত-মাংস সবল করার যান্ত্রিক প্রবণতা জেগে উঠে মনে—এবং এই অন্তর-যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক বোধ—শূন্য আকাশে কোটি শব্দে লেখা হয় দিনের প্রবেশ—মিছিল বেড়ে যায়, মিছিলের মানুষী ধাতু-পতন শুরু হয়—শুরু হয় নিজের কাছ থেকে নিজেরই পলায়ন...
এভাবেই সময় গড়িয়ে চলে দিনের পর দিন—এইভাবেই ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয়ে চলেছে, এখানে/ওখানে, সর্বশেষ ক্ষমতা খুব বিবেচনার সঙ্গে কারা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, উলঙ্গ বা মৃত, সবকিছুই ঘটা সম্ভব—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে—এক অবসন্ন-ঘুমেই সব সদর্থক-জীবনপদ্ধতি সেরে যায়—জীবনের একই বিছানায় স্তূপীকৃত মাথার খুলি ঠোকাঠোকি চলে—কখনো বা যৌনকাতর মানুষ জড়িয়ে ধরে কর্কশ পাথর...

হাসপাতালের জানালায় ঝুলন্ত আকাশ...হলুদ নদী...মনে পড়ে...পোড়া মাংসভর্তি খাম...তোমার ও আমার মাঝে গড়ে তোলা দীর্ঘ ব্যবধান...যোগাযোগে অসম্মতি...তারপর শূন্যতা জাগিয়ে তোলা শব্দহীনতায়...প্রকৃতিবিমুখ চিত্র ধ্বংস-তরঙ্গের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে...ভাষা সব মূল্যবোধ কেড়ে নিয়ে যায়, বালকের অলৌকিক-চেতনা—কণ্ঠে শব্দ এসে থামে,...উপন্যাসের চতুর কায়দা ধ্বংস হবে...আমরা পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকাই...এই ধূসর পৃথিবীতে মানুষ ফোঁপরা হচ্ছে, কাগজের ভাঁজ বরাবর মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষের অনন্ত কোনো ভাগ্য নেই। একে অপরের শরীরে কষ্ট পাচ্ছে, চলমান পশম এবং তুলোর মধ্যে মৃত্যু তার ভারসাম্য রাখছে, অনুপস্থিতির যৌনতা—অচলাবস্থা/ছোটো স্বপ্ন/একা হয়ে যাওয়া— — —না, একই সরলরেখার এতসব মেলানো যায় না...

আমাদের প্রত্যেকের পায়ুতেই ভেসে আসে মৃত্যুশব্দ। জীবনযাত্রার সবটা পদ্ধতিই হা-করা মুখে ঢুকে যায়—ওই অনতিযুবতী বালিকার চামড়ার নীচে জঘন্য শব্দ—এখানে শয়তান, প্রায় রক্তের কাছাকাছি চলে যায় ঠোঁট—এর চেয়ে বেশি কিছু জানা সম্ভব হয় না—সকলের সামনেই আমাকে গুহ্যদ্বার উন্মুক্ত করতে হয়, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমি টেলিফোন গাইডবুকের মাঝামাঝি চলে যেতে চাই—অকথ্য হস্তক্ষেপ—আমি প্রচণ্ড থাপ্পড় খেয়ে সেখানেই পড়ে থাকি। আমাকে ধর্ষণ করার জন্যে সেখানেই শুয়ে থাকে কোনো এক প্রাণহীন পরমা রমণী—রাত্রি যেন শব্দের গর্জন, প্রতি পাথরেই যেন অন্য এক গান—শুধু শব্দ, প্রগল্‌ভ গর্জন—আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা আমাদের মুক্ত করে নেয়—এভাবেই শেষ হয়—আমাদের গেটপাস তৈরি হয়,

এইসব বিষণ্ণ আততায়ীরা যা কোনোদিন জানতে পারবে না...

কিন্তু আপনার গেটপাস? আপনি কোন্ দিকে যাবেন? বিরামহীন ধ্বংস অথবা ক্যালোরি, শিরা/উপশিরা যুদ্ধ-চুক্তি, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে মৃত্যুর রিহার্সাল, এ্যাপলো/এটম, শিক্ষা ও শিক্ষিতের চালাকি, রাজনীতি, প্রেম, উপদংশের বর্ণচ্ছটাঘেরা মোভি ক্যামেরায় এক অশেষ সৃষ্টিপ্রবাহ—পাগলাগারদ কিংবা গাবদেবী-গণেশপুরী—আপনি এক মারাত্মক চৌ-রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন...রাত্রির ঘড়িতে বাজে প্রকৃত সংকেত ঘণ্টা—এক দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্র কালো পীচের রাস্তাকে ছোড়ার মতো ক্ষমাহীন ও আকর্ষণীয় করে তুলে—আপনি কি মন্দিরের দিকে যাবেন নাকি বৌ ও বাচ্চার বিছানায়? নাকি গোরস্থানে? অথবা কোনো লোকায়ত নারীর কাছে মাথা গোঁজার জন্যে পা বাড়াবার আগেই পুলিশ আপনাকে কালো ভ্যানে উঠিয়ে নেবে সমকামের সঙ্গী করে?

কালো কাগজে মোড়া জরুরিকালীন ট্রেনের কোন্ কামরায় ঢুকবেন আপনি? আমরা জানি। আপনি নিজের ভেতরেই নিজে অনুপ্রবিষ্ট—মারাত্মক ঝুঁকি!!

আপনি কে? আপনি কে? আপনি কে?

সামরিক বাহিনীর লোক আমি	এই আমার বন্দুক
আমি প্রেমিক	এই আমার চিঠি ও ফুলের তোড়া
আমি ফিল্ম হিরো	এই আমার নকল দাঁত ও নষ্ট যকৃৎ,
আমি ছাত্র	"বুর্জোয়া শিক্ষা নিপাত যাক"
আমি শ্রমিক	এই আমার সপ্তাহ-মজুরি
আমি বেশ্যা	এই আমার সংবেদনহীন অকুস্থল

আমি দালাল, আমি সুদখোর, আমি ১০৮ স্বামীজি, I was the Ist boy, আমি সন্ন্যাসী, আমি অধ্যাপিকার নপুংসক স্বামী, আমি সেবাদাসী, আমি ক্ষেপণাস্ত্র ও কমপিউটার চালক...

চুপ কর্ জারজ!!!

সুভাষ ঘোষ

ক্ষুধার্ত—৪

মিলিশিয়া পরাক্রান্ত রাস্তা থেকে আমরা বরাবরই সরে আসতে বলেছিলাম—

প্রত্যেক যুদ্ধরত হিন্দুজেনারেল বুকে হাত দিয়ে বলুনদিকিনি তিনি কী করবেন যদি তাঁর সামনে স্বয়ং ব্যাস—বাল্মীকি এসে দাঁড়ান—বা খ্রিস্টজেনারেলের সামনে স্বয়ং যীশু—বৌদ্ধ সেনানায়কের সামনে গৃহত্যাগী রাজকুমারবুদ্ধ যদি—তিনি কী অস্ত্র সংবরণ করবেন?

করবেন না যে প্রমাণ—**প্রায় ২ হাজার বছর ধরে যীশুর জন্মদিনে রত প্রত্যেক দম্পতিই গর্ভে যীশু চেয়েছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কোটি কোটি ওঁত পেতে বসে এই এরা আমরা কারা?**

কিন্তু আজও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি যুদ্ধরত শত্রুমিত্র সৈন্যের ভেতর হেলিকপ্টার থেকে মোনালিসার প্রিন্ট বিলি করে যুদ্ধের পরিণতি—করলে কী হতো, হয়তো এমন হতো—যুদ্ধের জনক নিয়েই টানাটানি পড়ত!

লক্ষ করি প্রত্যেক নামাবলীতেই ফুটো—প্রত্যেক ধারণায় বড়ো ঝাঁঝরা এবং বুর্জোয়াদের **মাংসের প্লেটেই থেকে গিয়েছে প্রকৃতপক্ষে ক্যানসারের বীজ—**

আপনি মুক্ত, হায়ারারকিহীন সভ্যতায় চলে আসুন—এখানে প্রত্যেকেই স্রষ্টা এবং কেউ কারো ক্রীতদাস নয় বলে আত্মা অকারণে শীষ দেয়—স্রষ্টার নামাবলীর দরকার পড়ে না—নিপাত নামাবলী গায়ে খোজা হিজড়ে বুর্জোয়া—

এই বধ্যভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে যদি মনে করেন আপনি সংখ্যালঘু—আসুন, বুর্জোয়াদের বেডরুম লোপাট করি—ডাইনিং হল লুট করি—

ক্ষুধার্ত পত্রিকার প্রস্তুতি সংখ্যা

ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ

সম্পাদক : শৈলেশ্বর ঘোষ

সংগঠক : বাসুদেব দাশগুপ্ত

The Hungry Resistance first Collection
1967

লিখেছেন : বাসুদেব দাশগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য এবং শৈলেশ্বর ঘোষ।

প্রকাশক ঃ সুভাষ ঘোষ, ২এ, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯
মুদ্রক ঃ দীপক প্রিন্টার্স-এর ননীগোপাল মোদক
৪৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯

মূল্য ঃ ৫০ পঃ

আপনি কি ভেবে দেখেছেন এখন আর পৃথিবীতে শিল্পের দরকার নাই, কবিদের খুন করার কী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলছে! ক্যাপিটালিজম × (ইন্ডাস্ট্রি) × কম্যুনিজমের ঠেলায় পৃথিবীতে শুধু নপুংসক বাবার সংখ্যা বেড়ে চলছে। কেবলমাত্র এক জেনারেশনের নয়, ক্ষুধার্ত গোটা ভারতবর্ষেরর হা-হা শোনা যাচ্ছে। সত্য কথা বলার সাহস ক্রমশই কমে আসছে মানুষের, বললেই...কী হয় সকলেই জানেন। —ইনসিওর কোং এর বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে,—ক্যান্সার, মৃত্যু...আজই ইনসিওর করুন, এত বড়ো অপরাধ কারোর চোখে পড়ছে না, প্রত্যক্ষ মৃত্যুর তলে প্রতিটি মানুষ উন্মাদ হয়ে ছুটছে। সতর্ক পাঠক আপনি বুঝতে পারছেন; বাংলা দেশের সো-called কবি-লেখকদের কতজন ইনসিওর করেছে, লেক, পার্ক, রেস্তোঁরায় সন্ধ্যায় তাদের দেখতে পাবেন, রাত ৯টায় তারা বাড়ির দিকে সরে পড়ছে।

'ক্ষুধা এক বুজরুকি'—আসলে জীবনই এক বুজরুকি। এর আর আশ্চর্য কী, এই খাজা জাতীকে শুদ্ধ করার চেষ্টা কে কে কীভাবে করছিলেন, স্কুলে পড়ে এখন আমরা ভুলে গেছি। যে এক্ষুনি মরবে তার ক্ষুধা হবে না, জানা কথা, যে বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকতে চায়, সে ক্ষুধা ক্ষুধা করে চেঁচাবে এবং অভিযোগ করবে, গালাগাল করবে, দাবি-করবে, হাত পা ছুঁড়বে—বুর্জোয়ারা, জীবনকেই অশ্লীল রক্তশূন্য, করে তুলেছে—ক্রিমিনাল ব্যতীত কারও স্বাধীনতা নাই। স্বাধীন জীবন চাই যৌনতা ও মৃত্যু ছাড়া মানুষের তৃতীয় কোনো চিন্তা নাই, যা তাকে আটকে রাখতে পারে। ফ্রয়েড এটম বোমা জাঁপল সার্ত নিপাত যাক্—মনে রাখবেন, এ হ'ল স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন, স্বাধীনতাই ব্যক্তিগত দুঃখ—ভালোবাসাহীন জীবনে ক্রুদ্ধ দুঃখী লাঞ্ছিত, অহংকারী, অহংশূন্য শহীদেরা আসুন, তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

হুঁসিয়ার

সাহিত্য এখন জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত যে ৫ বছর আগেও যা লেখা হয়েছে বাংলাদেশে তা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে—

প্রতিরোধ

বাসুদেব দাশগুপ্ত—কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূরে প্রচণ্ড চটে আছে কাছে গেলেই রক্তারক্তি, দুনিয়ার সব শালা—খাঁচায় আটকানো বাঘ। বাসুদেব, ওর মা দেখছে সব। ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায় এ ক্ষুধা নাড়িভুড়ি পর্যন্ত খেয়ে ছাড়বে।

সুভাষ ঘোষ—ফর্সা, সভ্যতার গুপ্তচর পুলিশ বাহিনীর দ্রুত নিধন ও নিজের জীবনকে দীর্ঘ

করার জন্য ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টায়। মানুষের মৃত্যুর সময় পতন শব্দ হয় না বলে, দৈব আছে, এবং সকলে সাবধান, একথা এখন বলছে।

দেবী রায়—উপনরক থেকে অনেক দূরে—

প্রদীপ চৌধুরী—মানুষের করণীয় কিছুই নাই বলে দু'খানা কবিতার বই লিখে ও ত্রিপুরায় নিজেকে এক লক্ষ সন্দেহ থেকে বের করে এনে বা ঐভাবেই একা মানুষের অপদার্থ ভালোবাসার দিকে এগোচ্ছে।

সমীর রায়চৌধুরী—ভিয়েৎনামে মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কবিতা পাঠিয়েছে।

সুবিমল বসাক—লং মার্চে যোগ দিতে কলকাতার চলে আসে এবং যত অবিচার তার উপর হয়েছে—এখন সে দাবি করছে সব কিছুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

সুবো আচার্য—এই সেদিন কলকাতা থেকে ইলেকট্রিক চাবুক কিনে নিয়ে গেল, রাত্রে যে সমস্ত হিংস্র কুকুরের পাল ছুটে আসে তাকে ছিঁড়ে খেতে—সেগুলোর জন্য—

শৈলেশ্বর ঘোষ—প্রত্যেকের খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে বুঝিয়ে দেবে তার বিপদ, স্বাধীনতার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে, কবিতা মল মূত্রের মতো, প্রণতির সঙ্গে এক কুকুর, সভ্যতাই এক ফাজলামি বলে প্রত্যেকের গালে থাপ্পড় কষিয়ে যাচ্ছে—তার যোগ্য শত্রুর সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে—রুক্ষ চেহারায় তবু সে—

সুভাষ ঘোষ

ফুলকুকুরের প্রদর্শনী

ত্রিদিবকে বাসে উঠিয়ে লাট সাহেবের বাড়ির গা ঘেঁষে চলি, পাশেই বেতার ভবনের ঠিক উলটো দিকে খুব ভিড়,—"কুকুর-ক্রিসানথিমান স্কুলের ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রদর্শনী", এই জন্যেই শীতকাল আমার এত ভালো লাগে, এই সময় খাবার দাবারে, পোষাক পরিচ্ছদে নানাদিকেই এমন সব বৈচিত্র্য আসে, আমার মনে হয় এই শীতকাল নিয়ে কবিদের ভালো ভালো ওড্ লেখা উচিত, আমি নিজে কবিতা লিখতে পারলে লিখতাম নিশ্চয়ই,

প্রবেশ মূল্য নেই জেনে ভেতরে ঢুকি মেইন গেট হয়ে, যাইহোক খানিকটা সময় কাটানো যাবে, ভেতরে এসেই হঠাৎ এক জায়গায় এত ফুল, এত কুকুর, এত মানুষ মেয়েমানুষ দেখে, এত প্যান্ট টাই শাড়ি সিল্ক আঁচলে ; ব্যাগ ভ্যানিটি ব্যাগ লক্ষ করে ভীষণ ঘাবড়ে যাই, লোভীর মতো এদিকে ওদিকে কেবলই তাকাই, সিগারেট ধরাই একটা, পায়চারি করি, ওই কোনায় কে একজন একসঙ্গে অনেক বেলুন বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষুদে হাততালি—সমস্ত নরম লালকালো বাচ্চাকাচ্চা। ওইদিকে ভিড়ে কে মেয়েলি রুমাল নেড়ে "হ্যালো হ্যালো"—করে, মেয়েটিকে পুরো দেখতে পাই না। এতক্ষণে প্রদর্শনীর গোটা প্রাঙ্গণ লোকজনে ভরে ওঠে। সম্ভবত প্রদর্শনীর আবহাওয়া রক্ষার জন্যই চারকোনার মাইক থেকে খুব নীচু লয়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত দেয়া হয়, 'ও-ই ভুবন মনমোহিনী...' বেশ জমজমাট এখন প্রদর্শনী। প্রথমে ঢুকেই যে আমার বিহ্বলতা ইতিমধ্যে কেটে যায় প্রায় সবটা। সিগারেট খাই ও পায়চারি করি, মাইকের গানের সঙ্গে মৃদু তাল ঠুকে সিগারেট টানি। উৎসাহিত হই আমি এতক্ষণে, কেবলই চোখ যত্রতত্র ঘুরোতে থাকি, চারিদিকে মেলা মণি মেলার আবহাওয়া।

এক সময় মনে পড়ে কখন জাগ্রত শৈশবে দেখা পাণ্ডুয়া মেলার কথা, যেখানে প্রথম আমি নিজে পয়সা খরচ করে একআনা দুআনায় অনেক রঙীন বেলুন কিনি, নিজে ইচ্ছে-করে ওদের উড়িয়ে দিই একটা আকাশের দিকে। কেবলই মেলার ভিড়ে নিজেকে ঢুকিয়ে দিই, দুই প্যান্টের পকেটে ভর্তি বাদামভাজা খাই, খাই অনেক খীরা, লাল তরমুজ ফালি, মনে পড়ে ওইখানেই প্রথম আমি প্লেট ও চামচের কড়া ব্যবহার শিখি, বাবার পাশে বসে মিষ্টির দোকানে প্লেটে চামচ যোগে সন্দেশ খাই, সেবারই বাবার হাত থেকে ওই মেলায় দু-দুবার হারিয়ে যাই আমি, মেলা থেকে আসার আগে আমি ও বাবা লাইনে দাঁড়িয়ে কাউনটারে টিকিট কিনি, আমাদের ডানপাশে তখন, মাচাঙ্গের উপরে রাক্ষুসে জোকার ক্লাউন জ্বলন্ত মশাল খায়, কেবলই তারা বোতল বোতল কেরোসিন, ওইখানেই কালো কোট পরা জনৈক ম্যাজিসিয়ান আলতো হাতের ছোঁয়ার মুহূর্তে ৫২ তাসের রঙ মুছে দেয়, পরমুহূর্তেই আবার ওই তাসের সমস্ত রঙ সামান্য ছোঁয়ায় ফিরিয়ে আনে, তা তখন প্যাট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোয় ব্যানড মাস্টারের জোর ব্যানড।

ওইখানেই প্রথম আমি নিজে গেটে টিকিট নিয়ে খাটানো ছোট্ট তাঁবুর নীচে মিনিয়েচার ধরনের

চিড়িয়াখানায় ঢুকি, ঢুকেই শাদাই দুর দেখি আমি—জীবনে ওই প্রথম, দেখি অনেক জাতের বেড়াল কুকুর শিয়াল ঘাসখেকো শাদা খরগোস কয়েকটা, অনেক সজারু, চটা ওঠা ঘোড়া ১টা, পেখমখেলা ময়ূর—গলা কী করকস, ১টা বুড়ো খোঁড়া বাঘ দেখি রাতে মেলা থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এখনও পষ্ট মনে পড়ে ওইরাতেই আমি ওই চিড়িয়াখানার চটাওঠা ঘোড়ায় চেপে অনেক মাঠ ময়দান ঘুরি, নদী পেরিয়ে আসি অনেক মাইল মাইল রাস্তা—

ইতিমধ্যে কখন ঘুরতে ঘুরতে ফুলকুকুর রাখা শেডগুলির কাছাকাছি এসে পড়েছি, টবগুলির গা জুড়ে ভিড় হয়েছে বেশ, ফুলের পাঁপড়িগুলি কী টস্‌টস্‌ করছে, মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে আবার—ওই ঈষৎ কাঁপান খুব আকর্ষণ করে আমায়।

কে-এক মহিলা, রকেটের মতো বুক নিয়ে আমার দিকে নাককুঁচকে হঠাৎ তাকায়, থমকে যাই আমি, সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেহারা দেখি ও ওঁর সিল্ক শাড়ি ব্যাগের পাশে আমার নোংরা ক্রিজনষ্ট ধুতি পাঞ্জাবীর জন্য বড়োই লজ্জা হয়, খুব মুষড়ে পড়ি আমি, একেবারে উদ্যোগহীন হয়ে যাই।

চলে আসি প্রদর্শনী প্রাঙ্গনের একধারে। নতুন করে চার্মিনার ধরাই একটা, কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে খানিকটা ইজি হই।

যেখানটায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাই আমি ওখান থেকেই এবার সারে সারে সাজিয়ে রাখা কার্ডলকেট যুক্ত প্রদর্শনীর ফুল সব লক্ষ করি।

এর আগে একসঙ্গে একজায়গায় এত লাল এত হলুদ, মিশ্রিত লাল-হলুদ, এত জোয়ান তাগড়া ফুল কখনই দেখিনি আমি। হঠাৎ ভীষণ তোলপাড় হয়, ইচ্ছে হয় ওদের প্রত্যেককে একবারে মুঠোয় আনি, পরে বুকে চাপি শেষ ক্ষুধার্ত গাই যেভাবে খোল ভূষি মাখা জাব খায় ওদের খেয়ে যাই ওইভাবে। পেট ভর্তি হলে ওইখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা ওইসব রোমশ নরম তেলতেলে দিশি-বিদেশীপ্রতীম কুকুরের গায়ে গা ঘষি, ওদের গায়ে গড়াগড়ি খাই।

এক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঠাসাঁটা চুল আঙুল চালিয়ে মোটামুটি পাঠ কয়ে খেলি, টেনেটুনে যতটা সম্ভব মিলিয়ে দিই ধুতি পাঞ্জাবীর ভাঁজ সরাসরি চলে আসি ১নং ফুলটবের কাছে। ফুলোনো কেশরযুক্ত ওই ক্রিসানথিমাম ফুল দেখতে শুরু করি, নিজেই কখনো ১ম, ২য়, ৩য় নির্বাচন করি। নির্বাচিত ১মকে কখনো নিজেই ৮ম কিংবা ১০ম স্থানে ঠেলে দিই, ১০মকে কখনো আবার দ্বিতীয়ে, এইভাবে, ফুল থেকে ভিন্ন ফুলে সেখান থেকে অন্য ফুল চলে আসি, এরই মাঝে পোস্টারে লেখা নাতিদীর্ঘ সব প্রবন্ধ পড়ি, পড়ি এই সব ফুলের আঞ্চলিক দিশী বিদেশী নাম, জন্ম-প্রজন্ম বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস, গোত্র পরিচয় তাদের উপযুক্ত সার বীজ, কার কী পৌরাণিক অনুসঙ্গ, এই প্রসঙ্গে এখানেই জেনে নিই কোন দেশে কোন ফুলের কেমন সমাদর কোন দেশে সবচেয়ে বেশি কার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ফুল দেখি, ফুল শেষ হলে কুকুর ধরি।

কুকুরগুলি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের গলার বেল্ট শেকল আলতোভাবে ধরে রাখে তাদের ওনার যাঁরা, আমি লক্ষ করি ওঁরা মাঝে মধ্যেই ওঁদের ব্যক্তিগত কুকুরের মুখ মাথা কান ঘাড় পরম আদরে নাড়িয়ে দেন, আস্তে করে মালিশ করেন ওদের গায়ের পেটের রোমগুলি কখনো বা, ওই ফাঁকে নিজ নিজ শাড়ি ব্লাউজ প্যান্ট টাই দর্শক কাছাকাছি হলেই মিষ্টি চোখমুখ দিয়ে নীরব ভজনাছল, নিজ নিজ কুকুরের দিকে কেউ কেউ নীরবে ইশারা করেন বা,—"কী, কেমনটি দেখছেন, পছন্দ হয় না, এর আগে আর দেখেছেন এমন' কয়েকজন সুবেশ ভদ্রলোক কাছাকাছি হলে ওই থার্ড প্লেসে দাঁড়িয়ে ২২/২৩-এর মেয়েটি এমন চঞ্চল হয়, ভীষণ হাসি পায় আমার, ঠিক যেন বেবি, মীরা, সেবার একসঙ্গে আমি, শ্রীম, শ্রীশ, শ্রীব যখন ওপাড়ায় যাই, দরজায় দাঁড়িয়ে বেবি মীরাও তখন ঠিক ওই রকম।

লাইনের প্রথম থেকে কুকুর দেখা শুরু করি, কয়েকটা কুকুর তাদের কর্তী দেখার পরে বড়োই ক্লান্ত লাগে, ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে অন্তত এক কাপ চা খাই, কতক্ষণ থেকে কেবলই আমি পায়ের উপরে।

কাছেই ডায়াসের পাশে বিশাল রঙীন ছাতার নীচে চায়ের স্টল, গোল টেবিল জুড়ে চেয়ারগুলি প্রায় সবই ভর্তি। অনেকেই কেবল চা খায়, কেউ চা ও খাবার খায়, কেউ কেউ কোকাকোলা, কয়েক পা বাড়িয়ে যাই চায়ের স্টলে, সঙ্গে সঙ্গে চকে লেখা কালো মেনু—বোর্ড চোখে পড়ে, ইস এখানে চায়ের অত বেশি দাম কেন, পকেটের পয়সা হিসেবে করে দেখি যে ওই চা খেলে বাসে কিংবা ট্রামে ঘরে ফেরা যাবে না। তাছাড়া আমার কয়েকটা সিগারেটও চাই।

ফলে স্টল থেকে ফিরে এলোমেলো ঘোরাঘুরি করি, ওই দিকে গ্লোব নার্সারির স্টলে দাঁড়াই খানিকক্ষণ। বিভিন্ন ফুলের কেনাবেচা দেখি—মরসুমী ফুলের চারা বীজ বেশ বিক্রি হচ্ছে—বই পুঁথি ফুল চাষের হালকা আধুনিক সাজসরঞ্জাম। ওখান থেকে প্রদর্শনীর মাঝখানে আসি ; এখানে এখন তাকালেই কেবল স্ট্রাপযুক্ত মেয়ে দেখি, চোঙ্গাপরা পুরুষ দেখি, পুরুষ প্লাস মেয়ে দেখি।

দক্ষিণ কোনায় একটা গাছ লক্ষ্যে আসে। ওখানে গাছের ছায়ায় ফুলো সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়ি, এখনও প্রদর্শনীর স্বাস্থ্যের জন্য ওই নীচু লয়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত মাইকে, হৈ চৈ এর জন্য একটা কথাও এখন কানে আসছে না, অস্পষ্ট করুণ গোঙানি কেবলই। সিগারেট ধরাই আমি, যতদূরে চোখ যায় তাকাই—এখন তাকালেই কেবল যেদিকে খুশি তাকালে—স্ট্রাপযুক্ত মেয়ে, মেয়ে-ফুল, ফুল-মেয়ে, মেয়ে-কুকুর, কুকুর-মেয়ে, ফুল-কুকুর, কুকুর-ফুল, কেবলই ফুল, কেবলই কুকুর, কেবলই মেয়ে, কেবলই চোঙ্গাপরা পুরুষ, এই স্বাস্থ্যে লাবণ্যে—এই এলাহির ভেতরে যে মেয়েদের ব্যবহার করি আমি কেবলই তাদের করুণ বুড়ি মনে হয়।

উপরে টাওয়ারে চোখ পড়ে—ইস এখানে কত সময় কাটানো গেছে, অকারণে আমি কখনো কখনো যত্রতত্র এত বেশি ঝুলে পড়ি, নিজের উপর বড়ো বেশি রাগ হয়, ঠিক করি এই সিগারেট শেষ করেই উঠে পড়ব, ঘরে ফিরে যাব।

হঠাৎ জোরে মাইক বাজে—"...বন্ধুগণ...কেন আমাদের এই ফুল-কুকুর-চাষ ...কেন এই প্রদর্শনী...কী প্রয়োজনীয়তা এর..."

এই ঘাসের উপর বসে বসেই ওঁর বক্তৃতায় আমি অনেক নতুন কথা, নতুন তথ্য জানি অনেক, জানি এই প্রথম ওইসব বিষয়ে আমাদের দেশেও এত সব হচ্ছে যার কোনোই হদিস রাখি না আমি, আমার সাধারণ জ্ঞানের তীব্র অভাব টের পাই, বুঝতে পারি মালকড়ি কত কম আমার, কত সামান্য কিছু নিয়ে বেঁচে আছি।

ফ্লাড লাইট জ্বলে গেলে—

"বন্ধুগণ...এবার পুরস্কার বিতরণি..."

ঘাস থেকে উঠে দাঁড়াই, দুচার পা এগিয়ে যাই সামনে, তাকাই ডায়াসের দিকে, যে-কুকুরের জন্য ১৮ টু ২৮ বছরের মেয়েটি ১ম পুরস্কার হাতে নেয়, দেখতে দেখতে তার প্রচ্ছদপটের মতো উজ্জ্বল চোখ জলে ভরে ওঠে, ক্ল্যাপ পড়ে, পাশেই প্রেমিক যুবক রুমাল হাতেই প্রস্তুত ছিল দেখি এবং তার উপযুক্ত ব্যবহার করার ব্যাপার অবশ্য আর বেশি দূর গড়ায় না, সব ঠিকঠাক হয়ে যায় সময় মতো।

এইভাবে কুকুরের জন্য ২য়, ৩র পুরস্কার মাইকে ঘোষণা হয়, ফুলের জন্য ১ম ২য়, ৩য়।

পুরস্কার বিলির পরে সভাপতি,"...উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী...আমাদের এই ত্রয়োদশ বার্ষিক সভার কাজ এখানেই শেষ...সর্ব্বশেষে আপনারা জাতীয় সঙ্গীত শুনুন..."

"জনগণমনের..." জন্য আমি মোটামুটি এ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়াই। ফেলে দিই প্রায় অর্দ্ধেক পুড়ে আসা সিগারেট, জাতীয় সংগীতের প্রতি আমার এই বিশেষ আচরণ আমি স্কুলে এন. সি, সি-করেই শিখতে পেরেছি, এই বিষয়ে ওই শিক্ষা বরাবরই খুব কাজ দেয়।

জাতীয় সংগীত সুরু হলে ভিড় ভাঙতে থাকে, ডায়াস থেকে ধীরে সরানো হতে থাকে চেয়ার, টেবল, ভাস, সরবতের, গ্লাস, গাদাগাদি লোকজনের এলোমেলো। চলাচলের ফলে আমার গায়ে হরদম ধাক্কা লাগে, সামনে পেছন থেকে, শুধুই এদিক ওদিক থেকে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খুব মুস্কিল হয়, সিটি চেঁচামেচি হাসাহাসি ডাকাডাকির জন্য মাইকের গানের কথা স্পষ্ট শোনা যায় না আর।

হঠাৎ, "টম্ বেল, বাবুন, মিলি, লীলা, নটি"—ইত্যাদি একে একে কানে আসে, বিদেশী প্রতীম সব কুকুরের ডাকে আসে, তক্ষুণি বুঝতে পারি ওইসব নাম, মানে পৃথক পৃথক সব কুকুরের নাম—কুকুরের ডাকের মহড়া এক সময় এত উঁচু লয়ে পৌঁছে যে জাতীয় সঙ্গীত চাপা পড়ে।

মাইক বন্ধ হলে চাপাচাপি আরো ভীষণ হয় সেই মেইনগেটের মুখ চাপে প্রেসারে থুবড়ে যায় একেবারে, মুখ ফুলে ফেঁপে ওঠে, গেট লক্ষ্য করে আমিও পা বাড়াই, তলপেট কল্ কল্ কল্ কল করে, ক্ষিদে পেয়ে গেছে ভীষণ। এক্ষুণি বাইরে গিয়েই কিছু খাওয়া প্রয়োজন, অন্তত ভাঁড়ের চা একটা, রোদ কিছু থাকতেই আসা গিয়েছিল ; সন্ধে উতরিয়ে কত সময় এখন।

ভীষণ মুস্কিল করে এই বিকেল সন্ধেগুলো, আমার পক্ষে কাটানো এত শক্ত হয়—কখনো খানিক সময় বাস স্টপে—ট্রাম স্টপে খানিক সময়—তেমন কোনো মেয়ে চোখে এলে ২।৪ মিনিট কাটানো গেল—চায়ের দোকানে কিছু সময়—কফি হাউসে কিছু বা—রাস্তায় বেরাস্তায়, কিছু সিগারেটের পেছনে—কচ্চিৎ কোনো বন্ধুর দেখা পেলে কিছু সময়ের জন্য বাঁচা গেল—পয়সাও তেমন রোজ রোজ কাছে থাকে না—দিশি বিদেশী যাহোক কিছু খেয়ে কাটাব নেশা করব কোনো কিছু বা—

আর করুণা কতদূরে—মাসে দেখা কদিনই বা—কথা বলতে বলতেই—রুমালে মুছতে মুছতেই কখন—আমি সময়ে এসে গেছি নাও এবার তোমরা উঠে পড়ো—আবার কবে দেখা হচ্ছে—হাঁ পরশু—না তরশু—হাঁ পরশু—না তরশু—ঠিক আছে—ঠিক আছে—টাইম ট্রেন ঘণ্টা—ফ্ল্যাগ—নীল হুইসিল—টাইম ট্রেন—অতি দ্রুত ফ্ল্যাগ নীল হুইসিল—কখনো মুখ দরজায় বা জানালায়—জানালায়—জানালায় বা দরজায়—দাঁড়িয়ে হাত মুখ দরজায় বা জানালায়—ট্রেন ছেড়েছে, ইচ্ছে হয়েছে কখনো হাতে ওর খচ করে টান দিই, টুপ করে নামিয়ে নেই ওকে—অথবা নিজেই ওর পাশে হ্যানডেলে ঝুলে পড়ি।

ইস্ দিলেতো স্যানডেলের ফিতে ছিঁড়ে, শালা নির্ঘাত কলকাতার পুরুষ ঘোড়া, এদিক ওদিক দিয়ে ধাক্কিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে কেমন, যেন এইভাবে না গেলেই সমূহ সর্ব্বনাশ, সামনে আবার একপাল মেয়ে কিনা, ইচ্ছে হয় ধরে এনে হারামির পিঠে, ওর কোটের উপরেই ক্যাঁৎ করে লাথি মারি, শালা শুধুই নিজেরটা, অন্যের রাস্তা দেখতে পাও না।

ছেঁড়া স্যানডেল টেনেটেনে একপাশে আসি, এত রাতে এ অঞ্চলে কী আর কোনো মুচি পাওয়া যাবে, শেষ পর্যন্ত হাতেই করতে হবে হয়তো বাসে বা ট্রামে স্যানডেল হাতে নিজের অবস্থা কল্পনা করে খুবই শঙ্কিত হই—কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলি—যদি এই নিয়ে কেউ কিছুমাত্র করার চেষ্টা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তার উপর এই স্যানডেল, যা হয় হবে, নিশ্চিত ব্যবহার করব আমি—স্যানডেল হাতে নিয়ে, ভিড় একটু কম হলে পাশের কোনা থেকে গেটে আসি, গেট পেরিয়ে যাই যখন পেছনে তাকাই একবার—ওই দিকে তখনও ওই ফুল, কুকুর, কুকুর, ফুল, চোঙ্গাপরা পুরুষ কেবল স্ট্র্যাপযুক্ত মেয়ে—

ব্যক্তিগত কান্নাকাটি ও ইয়ার্কি
শ্রীসুবো আচার্য

এখন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে নিজেকে বড়ো নিঃস্ব মনে হয় এখন অন্ধকারের সামান্যতাকে গভীরতর মনে হয়। এখন আলো নিভে গেলে যদিও কোনো দুশ্চিন্তা হয় না তবু অন্ধকারে দাঁড়ালে ঘাড় হেঁট দাঁড়িয়ে থাকি, মনে হয় স্মৃতি নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই, ক্রোধ কিংবা হাহাকারের শব্দ নেই, চুপচাপ প্রতিহিংসার চোখে অন্ধকার দেখি অন্ধকার আমার অতীতের মতো, আমার স্ত্রীলোক ও বন্ধুদের মতো আমার নিঃসঙ্গতার মতো, আমার বিস্মৃতি ও দীর্ঘশ্বাস এখন অন্ধকারে আমার মুক্তি নেই মানুষের মৃত্যু খুব অন্ধকার সেই অন্ধকার মুক্তি হতে পারে এবং জীবনের আলো যখন অন্ধকার হয়ে আসে আমি ঘাড়হেট দাঁড়াই, দাঁড়িয়ে থাকি, আমি কথা বলি না, সিগারেট ধরাই না, বই পড়ি না অন্ধকারে দাঁড়ালে নিজেকে বড়ো নিঃস্ব মনে হয়, শূন্যে দাঁড়িয়ে আছি দশদিকে নৈঃশব্দের চিৎকার ভাসে, আমার দীর্ঘশ্বাস তিনশো মাইল দূরে চলে যায় সেই মেয়েটির মুখ এবং তার দৃষ্টি যার কপালে আমার মৃত্যু, রূপসী, আমার সর্ব্বনাশ আমার বিপদ অন্ধকার ভালো দীর্ঘশ্বাস বাতাসে উড়ে যায় আর এমনকি ঘৃণাহীন দাড়িয়ে থাকি, ঘাড়হেঁট বলাই বাহুল্য—

মনে হয় এই হত্যাকারী অন্ধকারের জন্য আমি দায়ী নই তবু আমি শান্তি পাই আমি শান্তি পেতে থাকি আমি দুঃখ পাই অন্ধকারে যীশুর মতো একলা একলা দাড়িয়ে থেকে অসহায় মৃত্যুর আগে মরে যেতে পারলে হয়তো বেঁচে যাওয়া যায় কিন্তু নিজের প্রতি ভালোবাসা ত্যাগ করে অন্যকে ভালোবাসা সত্যি অসম্ভব আমি চেষ্টা করে দেখেছি অন্ধকারে আমার বন্ধুরা যেতে যেতে পিছিয়ে সরে যায় এখন শূন্যে দাড়িয়ে থাকা মৃত্যুর কথা ভাবা মৃত্যুকে মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গই মনে হয় আজকাল।

আমি আমার একজীবন কাটিয়ে এক শহরে যে শহর মেয়েদের শরীরের মতো বেড়ে যায় আমার অনুপস্থিতিতে এখন আমি আমার প্রিয় শহর থেকে চলে এসেছি—আমাকে ভুলে গেছে তারা আমার অনুপস্থিতি যেন মৃত্যু সেখানে তবু শহর নীরব হয় না শোক প্রকাশ করে না হায় আমার প্রিয়, আমার নিষ্ঠুর আমার অসভ্য মনোহীন তোমার অন্ধকার থেকে জেগে ওঠে আমার জীবনের তিন কোটি বারো লক্ষ সাতশো নিঃশ্বাস অবিশ্বাস আমি পৃথিবীর কাছে মার খাই এবং ভালোবাসি, আমি কুকুর—

—অ হা, সেই মেয়েটি আমাকে তার সব দিয়েছিল, মেয়েটার ছিল দারুণ শরীর, অনেক দিয়েছে আমায় কিছুটা হৃদয় আমিও দিয়েছিলাম এখন যে-কোনো মূর্খের সঙ্গমে—ওঃ—মেয়েটা সুখী হোক। আমি কাঁদতে পারি একটি মেয়ের জন্যে বন্ধু ও জন্মভূমির জন্যে আমার কান্নায় তবু কারো লাভ আছে মনে হয় না।

আমি Saddist না হতেও চাই না পদ্মাপারের ছেলে আমি পদ্মার মতো শরীরের জন্যে ব্যাকুল ছটফট করি মাথা ঘোরাই আমি সব নিমেষগুলি মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে আমি এখন স্থির বিনাশ দেখতে পেয়ে ভয় পাচ্ছি এবং মায়ের কাছে ফিরে আসছি আমার মা'র কপালে অসংখ্য বলিরেখা আমার বুকে ভালোবাসা ও দুঃখ অচরিতার্থতা বন্দুকের গুলির মতো দৌড়ে আসছে আমার ব্রেনের দিকে আমার স্টমাকের দিকে আমি জীবন বলতে মৃত্যু বুঝেছি।

আমি শতাব্দীর বিকেলবেলায় কবিতার শেষ উদ্দেশ্য একরকম বুঝেছিলাম মানুষ একরকম বোঝে সেই মেয়েটি আমাকে চুমো খাওয়া শিখিয়েছিল এবং পারি না সিগারেটের ধোয়া গিলতে আমি অন্তত একজনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বুঝিয়ে দিতে চাই মানুষকে লাথি মারতেও আমি পারি মৃত্যুর সময়ে যারা ক্ষমা করে যায় তাদের খুশির বুদ্ধি জোগাড় করার চেষ্টা করছি আমি ভালোবাসা ঘৃণা ও দুঃখের জন্যে কোনো অভিযোগ করি না আমার চোখের সামনে ভয়ংকর নিঃশব্দে জেগে ওঠে কবিতা তিনটে ব্যারেজ কবিতাকে চুমো খাবার জন্যে এগিয়ে যায় এবং কবিতা লুট হতে থাকা একটা বাড়ির মধ্যে ছিটকে যায় আমি দেখি প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদূত বোদলেয়ার তিনটে আনবিক বোমা নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আমি দেখি বরফের চেয়ারে বসে আছে কাফকা, আমি দেখি লোহার সিংহাসন আসছে আমার জন্যে আর লরেল মুকুট আর সুভাষ ঘোষ মশাল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার দিকে—জীবনের তীব্র প্রশ্ন আমি দুটো ঠোঁটে সারা ভারতবর্ষ ও মানবতা এবং শৈলেশ্বর আমায় বলে নিঃসঙ্কোচে চুমো খেতে পারলে একটা মেয়েকে নিশ্চিত বিয়ে করবে—হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা আমি একটা পাগল এবং মূর্খ এবং আমি একটা শিশু যেহেতু ভালোবাসার কথায় কাঁদি যেহেতু এখনও কাউকে কাউকে বিশ্বাস করে ঠকে যাই।

কত মানুষ আমায় ফাঁকি দিয়ে সুখী হয়ে গেল
আর আমি শাস্তি পাই সামান্য ভুল হলে
কোলকাতা এখনও বেশ্যা ও ভিখারিদের নিয়ে পাপস্খালন করে নাকি
কমলবাবুর গঙ্গায়? ভাবতেও হাসি পায় কলকাতার মর্মে মর্মে পাপ আর খুন
যীশুর সন্তানরাও ব্যাভিচার করে আর ভুল করে না প্রার্থনায়
ভালো পৃথিবী গড়তে এসে সভ্যতা গড়ছে ব্রথেল
সভ্যতার গায়ে চিমটি কেটে আমি তারস্বরে বাঁচার প্রার্থনা করেছি,
আরো কতদূর ভদ্রলোক হলে সভ্যতা আমায় বলবে ভালো
অথবা শ্মশান থেকে নড়েচড়ে উঠে আসবে আলো নিয়ে,
প্রেমের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা
স্বপ্নের কাছে রক্তক্ষরণ
বজ্রপাত আশায়
আকাঙ্ক্ষায় ভূকম্পন দেখতে পেয়ে আমি চিৎকার করেছি সাতজন ওভিদের
গলায়—

ইডিয়ট!

জীবনের মতো পাগলামি, আবছা কিছু

প্রস্তর নির্মিত রূঢ়তার ভাগ্য খেলা করে
হে ভয়াবহ তাড়না, আমার অস্তিত্বের আগুন, হে গীতা ও বিভূতি
কালপুরুষ খসে পড়ে আকাশ থেকে অন্ধকারে
এখন নক্ষত্রের ভিড় ভেঙে পড়ে আমার ধ্যান ভরে
ওঠে রক্তে রক্তাপ্লুত কঠোর শিকলের এই পৃথিবীতে
হাজারিবাগের দিকে চলে যায় বাস—আমি যাব?
অবশ্য পরেছি টেরিলিন, ছোটো চুল, হাতে সিগ্রেট
সুনীল গাঙ্গুলীর মতো কোনো কিছু ভেঙে উঠে দাঁড়াতে চাই না
কেননা কোনো মানে হয় না চুপচাপ হয়ে যাওয়া ছাড়া
ভাববে প্রতিশোধ! হাহ্ কার ওপর প্রতিশোধ নেবো
একমাত্র সমস্ত পৃথিবীকে শত্রু করে নিতে পারলে তাহলেও
দশবার শপথ করেও কাউকে ধ্বংস করতে পারতে পারলাম না
নিজে হয়ে গেলাম অনেকটা ধ্বংস—আমি ছাদে একা কাঁদছি না
ভালোবাসা ও সততার বদলে পৃথিবীর লাথি
চমৎকার—ভালো, খুবই ভালো, দারুণ পৃথিবী, মধুময়, অমৃত,
পাপী ও বিশ্বাসঘাতিনীদেরও মধুময় বলে যেতে হবে নাকি?
আমি কি পাপী নাকি আমি দেবতা কী জানি কিছু একটা হবে
আবার না হতেও পারে কিন্তু—চমৎকার!
আমি মৃত্যুর আগে শান্তি পাবো কিনা জানলে লেখা ছেড়ে দেবো।

অভিরামের চলাফেরা

বাসুদেব দাশগুপ্ত

ট্রেনের একটা মান্থলি করেছি।

আজকাল মাঝে মাঝে কলকাতা যাই, স্কুলের পর, কাজ থাকে না ভালো লাগে না তাই ওই ট্রেন। শরত এসে গেল। হঠাৎ কোনো মাঠ কাশফুলে শাদা। পাটক্ষেত আর লাইনের ধারে ছোটো ছোটো ডোবায় পচা পাটের গন্ধ, কখনও বা জলাজমিতে ছোটো ছোটো ধানচারা, কাঁশবন, খড়ে ছাওয়া কুটির, এলোমেলো দালান আর লেভেল ক্রসিং-এ অপেক্ষামান বাস, জনতা, রিক্সা, ভিড়...।

কলকাতায় পৌছলে মনে হয় অচেনা শহর। যেখানে আমি একটানা ১৫ বছর কাটালাম সেই জ্বলজ্বলে, ঝলমলে কলকাতাকে দেখে মনে হয় একে আমি চিনি না। একা একা ঘুরে বেড়াই কফি-হাউস, কলেজ স্ট্রিট, বসন্ত কেবিন, এসপ্লানেড, বইয়ের দোকানে, ন্যুড পিকচার, ফটো...গড়ের মাঠে অন্ধকার ছিঁড়ে দ্রুত চলে যায় গাড়ি। গাড়ির ভিতরে ক্ষণিকের জন্য দেখা যায় ফর্সার চামড়া, শাড়ি, গহনা খিল-খিল হাসির শব্দ ভেঙ্গে ছড়িয়ে যায় বাতাসে, আবার ফিরে বইয়ের দোকানে ন্যুড পিকচার, ফটো...।

পার্কস্ট্রিট দিয়ে হেঁটে গেলে লোভ হয় ভীষণ।

শিয়ালদায় ফিরে এসে সাড়ে নটার ট্রেন ধরি। জানালার ধারে বসে বিশুদা বলে—'আজ মেজাজ ভালো নেই, একদম, গান শোনাও।

কী খাবে? বাদাম না টফি?

কুটকুট করে বাদাম খেতে খেতে বলি,

'সায়গল?'

'তাই হোক।'

বাঁধিনু মিছে ঘর' এই গান শুনতে শুনতে বিশুদা জানালা দিয়ে বাইরে ঘন কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'তিনটা স্টেশন পার হলে বলে—আমরা যখন কলেজে পড়ি। তোমার তো জমমোই হয়নি।' বড়দা বিষণ্ণভাবে বলে—'দু'পয়সায় আস্তো ইলিশ পাওয়া যেতো তখন।' কবিরাজ মশাই জিজ্ঞেস করেন—'কাল কী হয়েছিল? কী ঘুম, কী ঘুম—বাঃ—বাঃ। আমি না থাকলে তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বনগাঁ চলে যেতে।'

কলকাতা যেদিন যাই না, সেদিন চৌরাস্তার মোড়ে বাবলির সঙ্গে দেখা হবেই হবে। আমাকে দেখে ছুটে আসে, বলে—'হ্যালো চিপ্পি, কী খবর? হবে নাকি একটু?'

'পয়সা নেই।'

'কালী?'

'তা-ও না।'

'তবে মিসেস হালদার? কলকাতা যায়নি আজ, দেখেছি।'

এইবার আমাকে ভাবতে হয় একটু। বলি—'ঠিক আছে, সন্ধে হোক। রাস্তায় আলো নেই, তাই আমাদের সুবিধে হয়। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সতর্কভাবে দুজন চলে যাই। বাবলি দরজায় টোকা মেরে চাপা গলায় ডাকে—'বৌদি, বৌদি?' গলার স্বরে হয়তো চিনতে পারেন, দরজা খুলে দেন মিসেস হালদার। আমরা ভিতরে গিয়ে চেয়ারে বসি। মিসেস হালদার গায়ে শুধু একটা শাড়ি জড়িয়ে রেখেছিলেন, এগিয়ে গিয়ে আলমারির পাল্লাটা খুলে জিজ্ঞেস করেন—'জিন হুইস্কি মিশিয়ে?' আলমারি থেকে বোতলগুলো বার করতে করতে আমাকে বলেন—'আমার কাছে আর আসিস না...জানাজানি হবে...ভবিষ্যৎ আছে তো তোদের।" কথা শুনে আমি আর বাবলি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসি।...

গ্লাসে আলতো চুমুক দিতে দিতে বলি—'কলকাতা যাননি আজ?' 'নাঃ, শরীর খারাপ। একটু চুপ করে থেকে বউদি বলেন—'বয়েসও তো হয়েছে, প্রতিদিন ভালো লাগে না আর।'

'কলকাতায় কোথায় যান বলুন তো?' বাবলি বউদির দিকে চোখ নাচিয়ে তাকায়।

'সে খবরে তোর দরকার কী?'

বাবলি আমার দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে—'ওকে চেনেন না তো? চালু পুরিয়া, ঠিক দেখা হয়ে যাবে একদিন।

'দেখা হলে না চেনার ভান করবি, বুঝলি?' বউদি আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন।

'কেন? তখন তো আমি আপনার খদ্দের।'

'ই, খদ্দের...গাল টিপলে দুধ বেরোয়...উনি আমার খদ্দের, সারা মাসের মাইনে উবে যাবে রে। মিসেস হালদার আমার কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে থাকেন। আচমকা আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই ওর বুকের উপর...একটুকুক্ষণ...তারপরই মিসেস হালদার দু'হাতে সজোরে আমার মুখ নিজের শিথিল বুক চেপে ধরেন, আরও পরে...একসময় আমার মুখখানা দু হাতে তুলে ধরে বলেন—'বড্ড কচি রে তুই, নইলে তোকে বিয়ে করতাম।'

কলকাতা থেকে ৩০ মাইল, এই দূর মফস্বলে আমি আমার ৬৫ বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়ে দিন কাটাই।

আমি মৃত্যুর কথা ভাবি না।

আমি ঈশ্বর সম্পর্কেও চিন্তা করি না।

সন্ধ্যাবেলা মন্দির থেকে শাঁখের আওয়াজ আর ঘণ্টার শব্দ ভেসে এলে আমার ভালো লাগে। ছেলেবেলাকে মনে পড়ে। আর রাস্তায় বাসের তলায় একটা বিড়াল চাপা পড়লেও আমি দশমাইল দূর দিয়ে হাঁটি। গতবছর যুদ্ধের সময় গভীর রাতে খুব নীচু দিয়ে প্লেন উড়ে গেলে আমি ঘরের ভিতর নর্দমাতেই পেচ্ছাপের কাজ সেরেছিলাম। আজকাল আমি কখনই কলকাতা গিয়ে রাত কাটাই না। যাই, আবার ফিরে আসি। আমি ভাবতে পারি না, সমস্ত দিন সমস্ত রাত আমার ৬৫ বছরের বৃদ্ধা মা একা, একটা বাড়িতে একা সমস্ত দিন সমস্ত রাত—একা। শেষ বয়সের এই নিঃসঙ্গতা কী ভয়াবহ, কী সাঙ্ঘাতিক—ভেবে আমার গোটা শরীর কেঁপে ওঠে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাই ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দূরে সকালবেলা ওই রান্নাঘরে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা বিধবা একা একা বসে চা-এ আটার রুটি ভিজিয়ে খায় একা। ঝি কাজ করে চলে গেলে একা মুরগীর ঘর পরিষ্কার করতে করতে ভাবেন আমি আর বেশিদিন নেই, চালকুমড়ার ডগা মাচার উপর তুলে দিতে দিতে ভাবেন আমি আর কতদিন?

একা একা সিদ্ধ ভাত চাপিয়ে দিয়ে ভাবেন—একটা বুড়ো মানুষের আর কি-ই বা লাগে। বিছানায় গড়িয়ে বেলা কেটে যায়। তারপর রাত্রি নামে। নিস্তব্ধ ঘন অন্ধকারে শুধু ঝিঁ ঝিঁ ডেকে যায়। অন্ধকার ঘরে একা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কখনও কি মার দম বন্ধ হয়, নিঃশ্বাস আটকে আসে কখনও মা প্রাণপণে বিছানা হাতড়ে বেড়ান শীর্ণহাতে মা কখনও কি জলতেষ্টা পেলে 'অভি' বলে ডাকতে গিয়ে মনে পড়ে 'অভি' নেই, কলকাতা।

ছুটির দিন আমি বাড়িতেই থাকি, সারা সময় মা'র কাছে কাছে। ছুটির দিন, তাই সকালে ডালডায় ভেজে আটার লুচি খাওয়া হয় আলুভাজা দিয়ে। তারপর মা আরও দু'কাপ চা রেখে যায় টেবিলে কখন, আমি মাথার তলায় রেখে শুয়ে শুয়ে পা নাচাই আর আবোল তাবোল ভাবি। কখনও সস্তা রং দিয়ে পোস্টকার্ডে ছবি আঁকি। একসময় উঠে বসে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজাই, রেণুকা। সেনগুপ্তর গাওয়া—'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো...।' তারপর রান্নাঘরে গিয়ে মা'র সামনে উবু হয়ে বসি। মা শশার বাকল কুঁচিয়ে ডাল বেটে বড়া তৈরি করে, আর আমি ইচ্ছেমতো বকবক করে যাই। আমি নানারকম প্ল্যান দিই মাকে, যেমন আগামী বছর বাড়ির চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ফেলব। ইলেকট্রিক লাইট আনব, আরও কিছু মুরগী কিনে একটা ছোটোখাটো পোলট্রি করব, এবার শীতে বাড়িতে কিছু আলু লাগানো যাবে কি? শুনতে শুনতে মার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিছু পরে একপ্লেট গরম বড়া ভেজে মা আমার সামনে ধরে দিয়ে বলে—'মদ খাওয়া আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। মাতালকে আমার ভীষণ ভয়।' আমি চুপ করে থাকি। আগে মা'র মুখে 'মাতাল' শব্দটা শুনলে খুব চটে যেতাম। এখন আর রাগ হয় না।

ধর্মতলায় 'মিত্র ওয়াচ কোম্পানী'তে গেলে ফেকুর সঙ্গে দেখা হয়। বলে—"তোর ঘড়িটা আর দিন দুয়েক বাদে পাবি। দাঁড়া একটু কথা আছে।" ফেকু দোকানের ভিতর দিকে চলে যায় একটু পরে বেরিয়ে এসে বলে,—'চল, তৃপ্তির কাছে যাব। সঙ্গে পার্টি আছে, পয়সাঅলা।'

'এখানে আসবে?'

"নাঃ, সেন্টাল এ্যাভেন্যুর মোড়ে দাঁড়াতে বলেছি।"

একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমি বলি—'জোটালি কোত্থেকে!'

'হুঁ হুঁ—বাওয়া... ...।' ফেকু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। "রীতিমতো শিক্ষিত ছেলে, আমি লেখাপড়া না শিখলে কী হবে বন্ধু-বান্ধব সব কটা এডুকেটেড।" ফেকু বেশ বুক ফুলিয়ে হাঁটে। তোদের হাংরিফাংরি জানে সব, বলছিল আমাকে তবে ওর কথাবার্তা শুনে মনে হল...। ফেকু এবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।

আমি এবার বিরক্ত হয়ে বলি—'বয়স কত?'

'কত আর, এই চব্বিশ পঁচিশ...।'

'এইসব বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে যেতে লজ্জা করে না তোর?' আমি ভ্রূকুঁচকে ফেকুর দিকে তাকাই—'নষ্ট করছিস কেন?'

'পঁচিশ বছর, বাচ্চা? তোর বয়স কত?' ফেকু অবাক হয়। 'তাছাড়া নষ্ট হল কোথায়? বাপের পয়সা আছে, ভালো চাকরি করে, বিয়ে করেনি, বলছিল ফেকুদা নিয়ে চলো একবার...শালা, আমি না নিয়ে গেলেও গরম খেয়ে গন্ধ শুঁকে ঠিক চলে যেত একদিন...আমি জাস্ট একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, নইলে প্রথমদিন ফালতু কোথাও গিয়ে টাক্ খেয়ে যেত। তাছাড়া...।' ফেকু এবার আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়—'...তাছাড়া তিনদিন দুজনে মিলে তাকে মাত্র দশটাকা করে দিয়েছি। এবার একদিন গিয়ে ৬০।৭০ টাকা খরচা না করলে পোঁদে

লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। তুমি দেবে ষাট টাকা? শালা, দেবে তুমি? দাও ওকে নেব না।' ফেকু আমার সামনে দু'হাত পেতে দেয়। ওর যুক্তিগুলো সবই অকাট্য বলে মনে হয় তাই তাড়াতাড়ি ওর পিঠে হাত রেখে যথাসম্ভব মোলায়েম সুরে বলি—নে, চল চল। তুই অল্পতেই চটে যাস বড়ো।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে তৃপ্তির ঘরের সামনে এক ফুলকপিঅলাকে বসে থাকতে দেখে আমি একটু চমকে যাই। তৃপ্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপির দর করছিল, আমাদের দেখে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। তবু আমরা তিনজন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই ওর সামনে। তৃপ্তি মুখটা একটু গম্ভীর করে। আমি মুখে হাসি টেনে বলি,

'কী ব্যাপার, তৃপ্তি? ঝগড়া করছো নাকি কারো সঙ্গে? এত গম্ভীর?'

'ঝগড়া করব কেন?' তৃপ্তি মুখ ঘুরিয়েই জবাব দেয়!'

ফেকু বলে—'আই বাপস্, তৃপ্তি কী বড়োলোক দেখছিস? আমরা শালারা কপির মুখ দেখলাম না আর তৃপ্তি কপির তরকারি খাচ্ছে।'

তৃপ্তি এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, বলে—'বড়োলোক না তো কী? আপনাদের মতো ফোক্‌টিয়া বাবু নাকি?'

'আহা হা, চটছো কেন? সঙ্গে নতুন লোক আছে দেখছো না? ফেকু দু'হাত তুলে যেন অভয় দেয় তৃপ্তিকে তারপর হাসি হাসি মুখে বলে—'ভেতরে যেতে টেতে দেবে না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব?'

ওর সঙ্গে চল্লিশ টাকায় রফা হয় ঘণ্টা দেড়েকের জন্য। নতুন লোকটি শুধু বসবে। ফেকু নিজের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে মদ আনতে দেয়। তৃপ্তি নাক কুচকে বলে—'এ্যা দেশী খাই না।' ফেকু বলে—ঠোঁটে একবার ছুঁইয়ে দিও রানি বিলীতি হয়ে যাবে।' ফুলওয়ালা ঢুকলে আমি একটাকা দিয়ে একটা বড়োসড়ো বেলফুলের মালা কিনে তৃপ্তির খোঁপাতে জড়িয়ে দিই। নতুন ছেলেটা খুবই ঘাবড়ে যায় বোধ হয়। রাস্তায় বেশ বকবক করছিল। তৃপ্তির ঘরে ঢুকে একেবারেই চুপ মেরে যায়। টালুরটুলুর দেখে আমাদের, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় এদিক সেদিক।

মদ এলে আরও জমে ওঠে। নতুন ছেলেটি বাদে আমরা তিনজনই খাই। একটু বাদে ফেকু আরও পাঁচটাকা বার করে। আরও মদ আসে। তারপর একসময় ফেকু তৃপ্তির ব্লাউজটা খুলে দেয়। আমি বডিস। তৃপ্তি ওর মাদ্রাজিবাবুর গল্প বলে আমাদের কাছে। ওই মাদ্রাজি ভদ্রলোক তৃপ্তিকে কী ভালোই না বাসে ওফ্ সপ্তাহে একদিন আসবে একশো টাকার পাত্তি একটা, তাছাড়া জিনিসপত্র দেয় কত্তো! ওই ড্রেসিং টেবিল ওটাও ওই বাবুর দেওয়া...খাটের নরম গদীও বাবু কিনে দিয়েছিল। মাদ্রাজি? হ্যাঁ, অল্প অল্প বলতে পারি তবে বাবু বাংলাও জানে...বলতে পারে না। হিন্দি বলে। গত রোববার এসে সারারাত ছিল। ওই বাবু যেদিন আসবে সেদিন সন্ধে থেকে কোনো লোক নিই না, ঘরে বসে থাকি বাবুর জন্যে। যদি দরজা বন্ধ দেখলো তো চলে গেল...আর ২।৩ মাসের মধ্যে আসবে না। আমি মানুষটা শরীর খারাপ হলেও তো দরজা দিয়ে শুয়ে থাকতে পারি, তা বুঝবে না...রাগ করে চলে যাবে...না, যেদিন আসে সারারাত থাকে পরদিন সকালবেলা এখান থেকেই খেয়েদেয়ে অফিস চলে যায়। হোটেলে কেন? আমি বুঝি রান্না জানি না? নিজে রান্না করি। সেদিন বাজার থেকে ইলিশমাছ এনেছিলাম, ঘি, ইলিশমাছ ভাজা, ইলিশের ঝাল আর ভাত—বাস!' আমি তৃপ্তির খোলা বুকে মাথাটা গুঁজে দিই, তৃপ্তির বুকের ভেতর ধক ধক শব্দ হয়, শুনি। ফেকু বলে—'এ্যাই, আমি একবার।' ফেকু তৃপ্তির বুকে কান পাতে, তারপর হাওয়াই শার্টের বোতাম খুলে আমার বুকে একবার কান পাতে, বলে—'এক শব্দ, ঠিক

এক রকম। তবে কেন আমার ওদের মতো হলাম না রে?' ফেকু ছলছলে চোখে আমার দিকে তাকায়, বলে—'দেখতে শুনতে কি খারাপ ছিলাম কিছু? আমাদেরও লোক আসত...লক্ষ্ণৌ, বেনারস, হিল্লি দিল্লি থেকে...আমরা সকাল থেকে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকতাম, দরজা খুলে বসে থাকতাম কোনো লোক নিতাম না ঘরে। আমরা সারাদিন সারারাত কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম...ও বঁধুয়া তোমার তরে, সারাবেলা পথ চেয়ে ও বঁধুয়া...।' ফেকু হঠাৎ হেড়ে গলায় গান গেয়ে ওঠে, ওর কাণ্ড দেখে তৃপ্তি খিল খিল করে হাসে আদর করে আমাদের দুজনের গাল কামড়ে দেয়।

ডিসেম্বর, আমার স্বাধীনতা
শৈলেশ্বর ঘোষ

আমাদের সমুদ্রযাত্রা, আরম্ভে স্বাধীনতা দিবস
একবার এসে গেলে দ্বিতীয়বারের জন্য অপেক্ষা নাই
রাত্রির ট্রেনের কামরা চিনে নিয়ে অপরিচিত
নেমে গেল যারা
একদিন বাসস্টপে তাদেরও ম্লান মুখে বিদায় সিগারেট
জ্বলে উঠে পড়েছিল সেদিনেরই কাগজে ছাপা
এক স্ত্রীলোকের মুখে
সেই ভালোবাসা কলকাতা
এতদূর ১০০ মাইল মানুষের কাছ থেকে সরে যাওয়া
বুকের ভিতর দিয়ে নীচে যৌন আদর্শের কাছে,
বালক গিয়েছিলাম আমি বাবার পিতৃঅপরাধ জেনে—
বাস চলে রাত্রি বাস চলে
গভীরতা মানুষ এক সাথে
পরস্পর স্বপ্ন আমাদের ভোজবাজীর উত্তর-দক্ষিণ
আমার ঘ্রাণের কাছে সেদিন একবার ভেসে ওঠে
মদের পাহাড় থেকে মাতাল ছুঁড়ে দেয়া পৃথিবী
পায়ের পাতায় আমার লেগেছিল জল, দেখেছিলাম
পাতলা বুকে কব্জা ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়
অপরিষ্কার মনের ভাষা
অথবা পাথর সংসার থেকে আমি উঠে আসি
চোখে পড়ে কাতর ব্যবসা, মায়ের হাতছানি
বড়োদিনের মমতাময়ী রক্ত, ফুটপাত, বিষণ্ন জামা
বড়োজোর এক বিঘৎ বুকের মাপ—
পাশে বসে থেকেও দুপুরের ঝাউগাছ ক্ষীণবালি
দৌড়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে নিভে আসা হিন্দুর মতো
আমাদের কাছে আজ সমুদ্র—সমুদ্র
জন্মেরও ছিল না প্রতিরোধ—আমার দরকার কতখানি
সামান্য দশ টাকা নিতে ভুল হল তালিকার শেষে গেল নাম

পূর্ব্বাভাবে ঝড় ছিল কিন্তু এক ফোটা বৃষ্টিও হল না বলে
মনে পড়ে গর্ভের দিনের মতো আমার শান্তি
বা তোমার ছাপা শাড়ি আজ সে সমুদ্র—

উত্তরের চওড়া সমুদ্রের কাছে তোমাকে আজ
বিশ্বাসভঙ্গের মতো মনে হয়
মনে হয় জলে নেমে চলে যেতে প্রস্তুত পুরুষনারী
হাত ধরে সন্ধ্যার অন্ধকারে এলো ডাক
অথবা কোলাহলের ভিতর থেকে আমি তুলে নিতে চাই
সমুদ্র তোমারই মতো বিছানায় শুয়ে পড়া
কিংবা গরম সংগমের মতো প্লাস্টিক খেলার বল
ছুড়ে দিলে ফিরে আসে মানুষেরই কাছে—
আমার বুকের ভিতর আজ ঘোলা নুন
ঘনীভূত তামাশার জন্য আমরা এসে গেছি বৃষ্টির কাছে
প্রকট জন্মের ১৩২৪ থেকে সহস্র মৃত্যুর চিহ্ন
চারদিকে জল বা সমুদ্র তুমি অপ্রস্তুত আমারই মতো
বা কেবল চেয়ে থাকা তার চেয়ে বেশি কিছু নও—

গম্বুজ প্রমাণ সমুদ্র তোমারই মতো শাদা উপহার
কলশব্দ জোয়ারের জল মাসিক নিক্ষেপের মতো ছুটে আসে—
খাবার টেবিলে বসে তোমার হাতে কাঁটা চামচ
দেখেছিলাম আগুন ক্ষুধার্ত মুখে আমাকে বলেছো
পুনরায় ঢুকে যেতে—ব্যবহার থেকে সরে যেতে—
আমাদের সম্ভাবনা তাও দেশলাইয়ের মতো হয়ে আসে
আর এখন ছেলেদের বন্ধুত্বের চোটে কলকাতাও মুছে যায়—
জলের ধার থেকে তুমি সরে যাও, প্রণতি
এয়ারোপ্লেন উপরে—রাত্রির হলুদ ফাঁকা আমার মৃত্যু
কথা ছিল তোমার চরিত্র শুয়ে থাকা মাথার কাছে
আর একবার দেখা যাবে—ব্রিজের উপরে উঠে
নীচের দিকে মাস্তুলের মতো স্বাধীনতা দেখে আমি
ভুলে যাব খুব অপরাধ করে তোমার সুখের কথা ভেবেছিলাম
ভুলে যাব জল জল, ডিসেম্বরের জল সে আমার মৃত্যু
স্টকএক্সচেঞ্জের দেওয়াল ধরে এক অন্ধ ছেলের কাছে
বিদেশ যাত্রা বন্ধ—জানি আমি দরিদ্র
আমার মায়ের দুঃখ ভগবানের কাছে প্রার্থনা একদিন
একদিন দুপুরে গরম কোট, শ্মশান বায়ু হিন্দুপূজা
এক মিনিট শুধু বেঁচে ছিল ঘর্মাক্ত সঙ্গম করে
পুনরায় ডিসেম্বর, একারই আমার সমুদ্র যাত্রা এবার।

কোন দরজায় প্রথম নক করতে হবে
প্রদীপ চৌধুরী

একটা নিটোল মুখের কথা ভাবতে ভাবতে
আমি শীতের বিছানা ছেড়ে নেমে আসি ডিসেম্বরের মাঠে
ঠাণ্ডা জঠরের ওপর পা ফেলে
আমার পা শহরের নীচের নদীর মতো
থেমে যায়
আমি জানি না কোন দরজায় প্রথম কড়া নাড়তে হবে
জানিনা এত দুর্বল পৃথিবীর ওপর মানুষ কী করে ঘুমায়
স্থির হয়, নাক বরাবর ঘুষি মারার ইচ্ছা দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে-
এ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই, আমার আয়ু
এর ওপর নির্ভর করছে আমার জননক্ষমতা, আমার
মমতা ও ঘৃণা, আজ সময় হয়েছে
প্রতিটি বালিকাকে পরীক্ষা করে দেখার
কভার খুলে দেখে প্রতিটি বাজেয়াপ্ত বই
কতটা ভালোবাসা পেলে মুখ নিটোল হয়, কতটা বাতাস
খেলে মানুষ ভালোবাসে
আমি জানি না উঁচুতে উঠাতে পারছি না মুখ ও মৃগয়া,
প্রার্থনা করি তার জন্যেও, একা উবু হয়ে থাকি
দীর্ঘ কুয়াশায় গলে যাচ্ছে শরীর
কোটি খুনীর দুঃখ আমার সামনে আয়ুর মতো দীর্ঘ

প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা

শৈলেশ্বর ঘোষ

বিশ্বাসভঙ্গের পরেও যৌন একাগ্রতা থেকে যায় (জীবনানন্দ) প্রদীপের সমস্ত লেখা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা, পৃথিবীর লাথি খেয়েও সমগ্র ভালোবাসা দিতে এগিয়ে আসে—জীবনকে উন্মুক্ত কবিতার যোগ্য করে তোলা। প্রদীপ লিখেছে, 'অস্বীকারের ভেতরে সভ্যতা স্থির পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, আমি বলছি পরিণামের অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে 'এমন স্থবিরতা ফাটিয়ে দেব কী করে আমি জানি না, জানি না, জানি না।'

'এখনও আগের মতই খর্ব মনে হচ্ছে নিজেকে।'

কত দীর্ঘ হতে চায়, কত উঁচুতে ওঠে তার সততা মাথা খর্ব্বাকৃতি বামন উরুর উপরে বীর্যের আকৃতি দেখে চিৎকার করে উঠতে হয়—আমি নাস্তিকদৈবে বিশ্বাস করতে আটকাতো না যদি জন্মগ্রহণ না করতাম' কিংবা 'কে বলে পৃথিবীর চামড়ার উপর সবচেয়ে মারাত্মক রোগের নাম মানুষ বাঁচতে পারে না, ভিড়ে দাঁড়াতে পারে না।'

জীবনের মূল অবধি এই অবসেশন চলে যাচ্ছে।

'প্রেমের কোনো বোধ নাই আমার মধ্যে, নিজের প্রতি সততা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে, সারা শরীরে দাঁড়ি গজিয়েছে, প্রত্যেকে জানেন একাজ কত দুরূহ, বাবাগো স্বপ্নের মধ্যে আমার চিৎকার শোনা যাচ্ছে, সহানুভূতিতে আমি চরিতার্থ হতে পারছি না, যতবার নিজেকে শেষ করতে চাইছি ততবার নিজের সম্পর্কে ১০০০০০ সন্দেহ বেড়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর ও সভ্যতার চেহারা বিগড়ে দিতে ভালোবাসাই আমাকে বেশি সাহায্য করবে।'

ভালোবাসাহীন সভ্যতা মৃত্যুর সমান বড়ো হয়ে উঠেছে, তাই আক্রোশে সে বলেছিল, 'দরকার হলে এভিন্যুতে হাজার চোখের সামনে তোমাকে চাবকাতাম—প্রণয়িণী তুমি নষ্ট হবে, লালসা, বিরহ তোমাকে খাবলে ধরবে বায়ুহীন স্থির ডিসেম্বরে।' সমস্ত দুনিয়াই ধীরে নিজেরই চোখের সামনে পাল্টে যেতে থাকে, মানুষ জানে তার করার কিছুই নাই, তাই সে বলে, 'ফুটপাথে সেই কিশোরের কথা ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম ; যেন এইমাত্র অবৈধ সঙ্গম সেরে উঠেছি।'

এছাড়া মাতৃগর্ভ, মাতৃস্তুতি, মাতৃহন্তারক, জীবনের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎহীন বর্তমানের তাড়না, বা একবারও 'স্বপ্নাকে ভালোবাসি' বলা কী যন্ত্রণাদায়ক! জরায়ুর আঁশ যা এখনও লেগে রয়েছে বলে মাতৃস্তাবকের দল 'পুরুষধর্মের পরিবর্তে মাস্টারবেশন করে কবিতা লিখতে শুরু করেছে'—সুকুমারের জন্য গভীর ভালোবাসা নিয়ে একজন পায়খানায় বসে এবং ক্যাপস্টান সিগারেট ফুকতে ফুকতে কোনো না কোনো স্ত্রীলোকের ছবি ভেসে উঠলে আবার নীচের দিকে হাত চলে যায়—।

এ সবই প্রদীপের, তার ভয় ভালোবাসা রাগ বিদ্বেষ মৃত্যু—সমস্ত বইয়ে সে কিছুই লেখেনি

যাকে কবিতা বলা হবে—প্রতিরোধ করে যাওয়া ছাড়া ওই ভাষা স্বাধীনভাবে স্বপ্ন ডাইমেনশন থেকে চলে গেছে একেবারে মুক্তির দিকে।

'মৃত্যুকে কি তুমি ভয় পাচ্ছো প্রদীপ?'

দ্রুতগামী জীবনের অসামান্য তৎপরতা বজায় রাখতে গিয়ে, শুধু ব্যবহৃত হতে হতে, অসম্ভব আত্মত্যাগ করে, কবিতা ছাড়া পৃথিবীর সঙ্গে আর কি সম্পর্ক? আজ পৃথিবীর ভার বড়ো বেশি, কে জানে আরও কতদিন, এভাবে—

বাংলা দেশে যখন কবিতার নামে শব্দের প্যানপ্যানি বড়ো হয়ে উঠেছিল, তখনই কবিতাকে জীবন্ত আগুন করে তোলা হল—এই পরাক্রান্ত কলঙ্কিতকে দেখে ভয়ে নীল হয়ে যাচ্ছে সব—কী চিৎকার?—যে থাকবে, সে স্বাধীন, বেঁচে যাবে।

[প্রদীপ চৌধুরীর "অন্যান্য তৎপরতা ও আমি" কবিতা গ্রন্থ ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়]

ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা

শৈলেশ্বর ঘোষ

এক

বৃক্ষাকাশে কবিতা টাঙাব না আমরা, শোবার ঘরেই গাছ সঞ্চার হয়েছে
গাছেতে ভূমধ্যাকর্ষণ হয় চোরাচালান বোঝে—শোবার ঘরেই চলে
অহরহ বিক্ষোভ-আক্রমণ ; গাছের সঙ্গেই সুদীর্ঘকাল ফলে ওঠে
ভালোবাসাবাসি—কলকাতায় দশবছর খারিজ নীলাম
দরসরবরাহ নিদ্রাপ্রেমের মূল্যবৃদ্ধি—ফাটকায় হাতবদল
দিনমান হৃদয় চিৎ—দিনমানভর তেত্রিশ হিজড়ের গর্ভ হয়
দিনমানধরে হে ঘোড়া ভৌতিক ক্ষুধা কবিতার!

দুই

বহুকাল তেত্রিশ ভূতের সাথে প্রেম-সূত্রপাত বহুকাল
কলকাতাবাংলায় খাতাপত্রে আক্ষেপ—
বহুকালধর্মলোল রাজপথে হে ঘোড়া কোথায় গেলে
একশো বালিকার বুকে তৃণগুল্মখেয়ে কবিতা ফলন হয়!

তিন

একশো ভাদ্রবধূ সাধ খায়, কবিতারই শুধু রক্তপাত
দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছি আমরা পেচ্ছাবখানায়
কলকাতা গলে যায়—হৃদয়ে সঙ্গমসূত্রউৎপাত ইত্যাদি
ধোয়ামোছা হয়—ময়দা বাণিজ্য করি না হে আমরা
একশো শয়তান মিলে দিনমান ভূত হয়, কলকাখানা প্রসব করে,
একশো শয়তান মিলে কুলবধূর গর্ভপাত করে—
একশো শয়তানের বিবিধ উৎপাত তাজ্জব হয়
সারাদিনমান কবিতার হে ঘোড়া এ কী ঋতুস্রাব!

চার

ছাব্বিশ বছরে খুব শোক হয় ছাব্বিশ বছ যেন তো নয়
ছাব্বিশ বছর নিদ্রারস পচে তবু দেখা নাই
হা লৌকিক হা অলৌকিক হা নিষ্ঠুর তবু দেখা নাই!
ছাব্বিশ বছরে কুমির ফসল নিয়ে যায়—জলপাহাড়
ফেটে যায় যানবাহন আত্মসাৎ ঘটে—ছাব্বিশবছর
ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন বসে আছি জুয়াচোর বেশ্যার মন্দিরে
ছাব্বিশ বছরের উপরই বলাৎকার ছাব্বিশ বছর
রক্তেই ক্রমসূত্রপাত ঘটে ভূতপ্রেত আসে
ছাব্বিশটি একান্নবর্তী বছর কোনোক্রমেই যেন নয়
হে ঘোড়া নিষ্ঠুর ছাব্বিশ বছর কেন দেখা নাই!

পাঁচ

কোনো একদিন অবাধ সংকেত বিনিময়ে
ভালোবাসার নৌকায় বাদাম পরানো হয়েছিল—
২৬ বছর গুণটানা ব্যবসায়ে জেগে বসে আছি
ঘোড়া তুমি জানো পরিচয় তাদের
কেননা তোমারই খুরের মারে মুছে যায় কালির ছাপ
তোমারই প্রত্যাশাময় মুখের. কাছে ভেসে ওঠে,
কোনো একদিন উঠেছিল ঘাসের চুমায় বিস্মিত হৃদয়—
কোনো একদিন স্ত্রীপুরুষের চোখে মুহূর্তে লাগানো হয়েছিল বলে
আজও সেই মানুষের হল না প্রস্তুতি সময়
বহুবার বহুপথে হয়েছে ফেরা তবু হায়
২৬ বাঘের মতো অতিহিংস্র গর্জ্জন শেখেনি কোন পথে
ফিরে আসা যায়—অবাধ সংকেতবিনিময়ে একদিন হয়েছিল
দেখা মার্বেল পাহাড়ের সাথে—মাদিমদ্দ দুই
বেহুদ্দ বেড়ালের থাবা জানতে পেরেছিল,
পাখিই কেবল ফিরে আসে ঘরে—বারংবার ২৬ বছর
দূর থেকে ছুটে আসে পশমের বল বিছানার কাছে
দেখা যায় সমুদ্রময় গড়ে উঠছে ত্রস্ত পোতাশ্রয়
হে ঘোড়া প্রত্যাশালিপ্ত সিঁড়ির উপরেই দেখা হবে।

ছয়

হে ঘোড়া তোমার হৃদয়েই ছিল ভালোবাসা
মেঘময় বিছানো ছিল পরমায়ুর খোল
ঘনিষ্ঠ চুমায় ছিঁড়ে যায় ব্লাউজশায়া ডুবোজাহাজ
ব্যভিচারবোধ ভরে তোলে ইতিহাস আদালত—
জানা গেছে বয়সকালে আমাদের উরুদেশময়
ভৌতিক সমুদ্র জাগে—জানা গেছে জুয়ার টেবিলেই
হয়েছিল বুদ্ধের জ্ঞান—জানা গেছে জন্মের নির্বাচন
হয়নি সফল—জানা গেছে জাহাজের পরাশ্রয়ীটান
গোয়েন্দারও কাপড় খুলে দ্যায়—হে ঘোড়া
তোমার নিশান আমার মুখের উপর চুম্বনতিথির
মতো উড়ে আসে—রক্তের অভিমান বেশ্যার পেটে
ছেলে জন্মায়—চারদিকে দন্তোদগম উৎসবের আলো
খুরশব্দ লেখা টেবিলের তবু সহচর জেগে বসে আছি।

সাত

তিন ঘণ্টা বসে আছি বেদনাপ্রধান চিঠি পকেটে
কলকাতা চৌরঙ্গী লেখা এমন নিস্তব্ধ বন্দুক হাতে
কতদিন ঘুম জাগা প্রহরায় কাটাই—দশমনুমেন্ট
ময়দান পকেটমারে এক প্রকার জমির দাম!
তিন ঘণ্টা সবুজপল্লী অনুধাবনীয়তার হাতে মার খায়
হাঁস তবু উড়িয়েছিলাম গায়েপরা আধুনিক-জামা
পাড়াগাঁর স্ত্রীলোকের স্বামীসম্ভাষণ পূর্ণিমা গভীরে
হাজার শিশুর হাসিখেলা আক্রমণ কলকাতা
তিনঘণ্টায় সাতসমুদ্রতল, মনুমেন্টময়দান
মেঘের পেটে যায়, বেদনাপ্রধান চিঠি পকেটে
এক একর জমির বিক্ষোভ দিনমান—বন্দুক
হাতে রাতজাগাপ্রহরায় হে ঘোড়া কতদিন কাটাই!

আট

তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছে পুণ্য বিছানায়
হে ঘোড়া কলকাতায় তিন গেলাস স্বাস্থ্য সুধাপান
পরিত্রাণবিহীনতা হাসে পুরুতের নামাবলী গীতা
ধাতুধর্ম সাতবার গড়াগড়ি যায়—তিন বিধবা
দক্ষিণ সাগরে বায়ুসেবা বেড়াতে যায়—
তেত্রিশ দেবতা ফলভোগী—চাষা মাশুল গুনে দেয়

পুণ্যচোর সদর দরজায়—গৃহস্থের মেয়েরা সব
আইবুড়ো ঘুম জেগে সারারাত খিল তুলে দেয়
পুরাণগীতা পড়ে কুলধর্ম রক্ষা শেখে, ঘোড়া তুমি
রেশমগুটিকা পোকায় প্রেম দিলে হৃদয় কোথায়
গীতাধর্ম পাঠ শুনে কুকুরের অণ্ডকোষে ধাতুমুদ্রা জমে
ঘোড়া তুমি তেত্রিশ কোটি পুণ্যের গায়ে
নামাবলী লেখা হৃদয় কোথায়?
তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছি পুণ্যধর্মহীন
রহস্যতলায়, হে ঘোড়া
পরিবহণযোগ্য রাস্তা বহুদূর শূন্য পড়ে আছে।

'এষণা' (১৯৬২-৬৩)

রন্ধনশালা

বাসুদেব দাশগুপ্ত

বনের ধারে ভেড়ার বাচ্চাটাকে একা একা অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে তখুনি আমি সেটাকে খপ করে ধরে ফেলুম। ভেড়ার বাচ্চাটা ওর ধূসর দুটো চোখ তুলে আমার দিকে করুণভাবে তাকাল। আমি বাঁ হাতে ওর পশমী নরমগরম শরীরটাকে ভালো করে পাকড়ে ধরে ডান হাত দিয়ে ওর ঘাড়টা মুচড়ে দিলুম ওকে একটা আওয়াজ করবার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই। আমার মোচড়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের কাছেই ছোটো ছোটো কচি কচি হাড়গুলো ভেঙে যাবার শব্দ শুনতে পাই—মুট্ মুট্ মুড়্ মুড়্ ; আর সেই সঙ্গে খানিকটা রক্ত ছিটকে এসে লাগে আমার মুখে, ঠোঁটে, নাকের ডগায়। ঘাড়ের কাছে হলদে লোমগুলো লাল হয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যেই। মুণ্ডটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেবার পরও ওকে আমি জড়িয়ে ধরে বসে থাকি। কেননা তখনও ওর শরীরটা আমার আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে থেকে ছটফট করে উঠছিল, ওর দেহে তাপ ছিল তখনও। রবীন শিউরে উঠে দু'হাত দিয়ে ওর চোখ ঢাকল যেন সেই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরেই বিশাল বনভূমি, আমি ও মৃতপ্রায় ভেড়ার বাচ্চাটিকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ বাদে ও চোখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকালে আমিও সম্মুখে তাকাই। অদূরেই আমাদের ঘর দেখা যায়, সাত সকালের পাতলা রোদ্দুরে বরফের টুকরোগুলো শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝক করতে থাকে। কোথাও একটু বাতাস নেই, নিথর গাছের পাতাগুলো সামান্য ফিসফাস করে কথা বলতেও বুঝি ভয় পায়। রবীন তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি রবীনের দিকে তাকিয়ে বলি—'রবীন তুই সবই জানিস। তোকে আমি সমস্ত কথাই খুলে বলেছি। আমি ভয়ানক হিংস্র হয়ে গেছি, ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি। এতসব জেনেও তোর এ ধরনের ন্যাকামো করবার কোনো মানে হয় না।' রবীন তবুও কোনো কথা বলে না, আমার দিকে পিছন ফিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। এবার আমি উঠে দাঁড়াই, ওর কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই, শক্ত গলায় বলি—'ভেড়ার বাচ্চাটাকে ধর।' রবীন আমার দিকে ঘুরে তাকায়, কোনো শব্দ করে না, ভেড়ার বাচ্চাটার ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নেয়, হেঁটে যেতে থাকে। ওর মুখখানাকে আমার পাথর খোদাই করা বলে মনে হয়। রবীন এগিয়ে যেতে থাকে, আমি ওর পিছু পিছু যাই। ভেড়ার বাচ্চাটার গলা বেয়ে রক্ত ঝরে টপ টপ টপ টপ।...

ঘরটা আমি তৈরি করেছিলুম ছোটো ছোটো ইটের মতোন বরফের চাঁই দিয়ে অনেকটা এস্কিমোদের ধরনের। একটিমাত্র ঢুকবার বা বেরোবার দরজা ছিল, কোনো জানালা ছিল না। ছাদটা মাটি থেকে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছিল অর্ধবৃত্তের মতো। ঘরটা ছিল ভীষণ অন্ধকার আর ভীষণ ঠাণ্ডা। এ তল্লাটের আশেপাশে কোনো লোকবসতি না থাকায় ঘর তৈরি করবার জন্য এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দসই হয়েছিল। আমার ঘরের সামনে ছিল এক গহন বন, সেই

বন পেরোলে ধূ ধূ বালির মাঠ তারপর বুঝি লোকালয়। ঘরের পিছনে ছিল এক নদী। সে নদীর কোথায় যে শুরু আর কোথায় যে শেষ তা আমার জানা ছিল না, জানতে চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। আমার ঘরের নিকটে এক পাতাবিহীন গাছ তার শুকনো ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আর প্রায়ই একটা নাম না জানা বিকট চেহারাওয়ালা কিন্তু দুঃখী দুঃখী পাখি উড়ে এসে বসত সেখানে। বড়ো বড়ো ভাঁটার মতো চোখ নিয়ে গোল গোল করে ঘুরে ফিরে তাকাত চারিদিকে আর কাঁদত মাঝে মাঝে মানুষের কান্নার মতোন। কী করুণ সেই কান্না, কী বেদনাদায়ক সেই সুর! ইনিয়ে বিনিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ভেউ ভেউ করে, ডাক পেড়ে, গলা ফাটিয়ে মড়া কান্না কাঁদত যেন সেই পাখি। আমি অবশ্য প্রথমে ওকে বিশেষ ভয় পাইনি। কিন্তু একদিন থমথমে অন্ধকার রাত্রে পাইখানা করবার জন্য বাইরে বের হলে হঠাৎ সেই পাখি বাঁজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল— 'এখন জরুরি অবস্থা, এখন জরুরি অবস্থা।' আমি সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়ে একলাফে ঘরের ভিতরে এসে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। ভয়ে আমর সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছিল ; হাত, পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আর ভয়ানক কাঁপছিলুম হাড়ে হাড়ে লেগে শব্দ হচ্ছিল ঠকাঠক্ ঠক্ ঠক্। কদিন পরে দেখলুম সেই পাখি আর আসে না, কোথায় যেন উড়ে চলে গেল সেই পাখি গাছে এসে আর বসল না উড়ে গেল নিরুদ্দেশে। আহা, আমার সেদিন মহা আনন্দ হয়েছিল। হাত, পা তুলে ডিগবাজি খেয়েছিলুম দশটা বিশটা।...

কবে যেন সন্ধেবেলা নদীর পাড় দিয়ে একা একা ঘুরছিলুম। বাতাসে বইছিল জোরে, আকাশ ছিল পরিষ্কার, নদীতে ছোটো ছোটো ঢেউ ওঠানামা করছিল, দুএকটা তারা ফুটেছিল আকাশে। নির্জন নদীর ধার দিয়ে একা ঘুরছিলুম। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার বরফের ঘরটাকে একটা শাদা তাঁবুর মতোন মনে হচ্ছিল। সমস্ত দিকের জানালাগুলো যেন খুলে যাচ্ছিল একটি একটি করে, যেন এক গভীর নিমগ্নতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলুম আমি ; সময় গিয়েছিল স্তব্ধ হয়ে। একা একা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আমি রবীনকে দেখতে পেলুম। প্রথমে আবছা আলোয় আমি ঠিক বুঝতে না পারলেও কাছাকাছি আসতেই তাকে চিনতে পারি। সমস্ত জামাকাপড় ভিজে, সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি—'একি দশা হয়েছে তোর?' ও কোনো কথা বলে না, হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিতে থাকে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিই, মুখের দিকে তাকিয়ে বলি—'বল কী হয়েছে তোর? ও মাটিতে চোখ নামিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে কাঁপা কাঁপা গলায় বসে—'ওরা আমায় মেরে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল, বোধহয় ভাসতে ভাসতে চলে এসেছি। এবার ফিরে যাব।' এক নিমেষে আমার চোখের সামনে সব কিছুই যেন ওলটপালট হয়ে যায় তাই নদী, মাঠ, বন, ঘর, বাড়ি সব কিছুই গড়াতে গড়াতে দ্রুত দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। বিরাট অন্ধকার এক গহ্বরের দিকে পায়ের নীচের মাটিটা যেন তলিয়ে যেতে চায় আমায় নিয়ে। একমাত্র রবীন ছাড়া আমার নিকটে আর কেউ নেই এটা বুঝতে পেরেই দু'হাতে প্রচণ্ডভাবে ওকে বুক জাপটে ধরি, কাতরস্বরে ওর কাঁধে মাথা গুঁজে বলতে থাকি—'তোকে আমি যেতে দেব না। তুই আমার কাছেই থাকবি, আমার কাছেই থাকবি।'...

প্রবল উৎসাহে রবীনকে আমি আমার ঘর দেখাই। মস্ত বড়ো একটা মোমবাতি কাঠের টুলের উপরে জ্বলছিল। বরফের দেয়াল বলেই বোধহয় ঘরের দেয়ালে আদৌ আমাদের দুজনের কোনো ছায়াই পড়ে না। মোমবাতির নিস্কম্প শিখায় ঘরের সব কিছুই অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন চারিদিকে তাকায়, আনন্দে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়। বলে—'করেছিস কী, এ যে এক এলাহি

ব্যাপার!' আমি সলজ্জ হাসি হেসে বলি—'হ্যাঁ এই আমার ঘর বা রন্ধনশালাও বলতে পারিস।' রবীন তাকের কৌটোগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, জিজ্ঞেস করে—'এগুলো কেন?' 'ওগুলো মশলাপাতি রাখবার জন্য জোগাড় করে রেখেছি। ওই যে কাচের বয়মটা দেখছিস, ওটাতে ভালো গাওয়া ঘি রাখব। আর এই দ্যাখ,'...আমি চৌকির তলা থেকে চকচকে ধারাল বঁটিটা বার করে দেখাই। রবীন হাত দিয়ে বঁটির ফলার ধার পরীক্ষা করে, ঘরের কোনায় তাকায়, তারপরই বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে—'শিলনোড়াও এনে রেখেছিস? 'হ্যাঁ ভাই', আমি বলি—'মশলাবাটার অবশ্য হাঙ্গামা অনেক কিন্তু গুঁড়ো মশলায় রান্নার কোনো স্বাদই খোলে না। আসলে মশলাবাটার ওপরেই রান্নার স্বাদ নির্ভর করে, মানে মশলাটা তুই যত মিহি করে বাটতে পারবি তত তোর রান্না খোলতাই হবে।' রবীন ঘুরে ঘুরে আমার হাড়ি, কড়াই, থালা, বাটি, হাতা, খুন্তিগুলো উলটে পালটে দেখতে থাকে। এখনও নতুন রয়েছে, ঝক্‌মক্ করছে সবকিছু। রবীন আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়, বোধহয় আমি ওর মনের ভাব বুঝতে পেরেই বলে উঠি—'রান্না একদিনও করিনি, করব। আপাতত ওই দেয়ালের শ্যাওলা খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছি।' রবীনকে আমি বরফের দেয়ালের গায়ে গজিয়ে ওঠা সবুজ শ্যাওলাগুলো দেখাই। 'তবে তুই যখন এসে গেছিস তখন এবার আমি রাঁধব, ভালো করেই রাঁধব। তাছাড়া আমি এ সম্পর্কে ভেবেছি অনেক, লিখেও ফেলেছি অনেকটা। আসলে রান্নাটা হল গিয়ে একট উঁচুদরের আর্ট, হেলাফেলার জিনিস নয়। এই যেমন, ধর তুই সরষেবাটা দিয়ে ইলিশমাছ রাঁধছিস, কিন্তু জানিস কি মাথা পিছু একটা করে করমচা কেটে ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিলে অপরূপ স্বাদ হয়? জানে না, অনেকেই জানে না। আমি এইসব লিখে রেখেছি, এই সমস্ত রান্নার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অনেকটা লিখে ফেলেছি। এই দ্যাখ...।' ওকে আমি সুটকেশ খুলে আমার বাঁধানো খাতাখানা বার করে দেখাই। খাতাখানা খুলে রবীন পাতা উলটে দেখে, কিছু কিছু অংশ পড়তেও থাকে। আমি ওকে বলি—'এ সমস্ত জিনিস অতিশয় প্রয়োজনীয়, কেননা এগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে। এখুনি ধরে রাখা দরকার, ধরে রাখা দরকার।' রবীন হয়তো আমার কথা শুনতে পায় না, নিবিষ্টমনে আমার খাতাখানা পড়তে থাকে। খানিকবাদে ও মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়, খাতাখানা বন্ধ করে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠে—'তুই কবে রান্না করবি বল? আমি আর লোভ সামলাতে পারছি না।' রবীনের এই প্রশংসাবাণীতে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে ঠিক চার ইঞ্চি।...

আমরা দুজনে বাইরে দাঁড়িয়েছিলুম। আকাশে তখন আধখানা চাঁদ দেখা যায়। আবছা আলোয় আশেপাশের সবকিছুই মৃদু মৃদু বোঝা যায় বলে আমাদের কোনোকিছুই চিনতে অসুবিধেই হয় না। সামনে গহন বন বিরাট এক অন্ধকারকে বুকে নিয়ে বিশাল এক দৈত্যের মতোন দাঁড়িয়ে থাকে। রবীন বলে—'তুই সময় কাটাস কীভাবে?' 'কেন?'—আমি অবাক হয়ে বলি—'সময় কাটাতে আর অসুবিধে কী? ঘুমোই বেশির ভাগ সময় আর রান্নাবান্না সম্পর্কে ভাবি, মাঝে মাঝে বাসনপত্রগুলো নদীর জলে ধুয়ে মেজে পরিষ্কার করে রাখি। আর...আর...।' হঠাৎ আমার মনে হয় আসলে আরও অনেক কিছু আমার করা উচিত ছিল, অথচ এ ছাড়া আমি তো আর কিছুই করিনি সুতরাং রবীনকে আমি আর কি বলব ভেবে পাইনে। এমন সময় আমার সেই আধছেঁড়া লুডোবোর্ডটার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমি বলি—'আর-আর...আমি মাঝে মাঝে লুডোও খেলে থাকি।' 'লুডো কি একজনে খেলা যায়?' রবীন প্রশ্ন করে। 'কেন যাবে না'—আমি রবীনকে বোঝাই—'একাই আমি দুজনের চাল দিই, মাঝে মাঝে চারজনেরও। খুব ইন্‌টারেস্টিং খেলা। এবার তুই আর আমি দুজনে মিলে খেলব।' রবীন আমার কথার কোনো সাড়া দেয় না। অন্ধকার বনের দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে। একসময় বলে—'আচ্ছা,

বনের ওপারে কী আছে রে?' 'বালির মাঠ'—আমি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিই। 'ওখানে যাসনি কোনোদিন?' 'না।' রবীনকে আর কথা বাড়াতে দিই না আমি। বনের ব্যাপারটা আমি ওর কাছ থেকে গোপন করতেই চাইছিলুম। রবীন এবার ঘরের পিছন দিকটায় এগোয়, আমিও ওর পাশে পাশে হেঁটে যেতে থাকি। তখন নদীর পাড় অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, জলতল থেকে এক অজানিত রহস্যময়তা সমস্ত কিছুকেই যেন অতি অদ্ভুতভাবে সাজাইয়া তোলে। রবীন বলে—'তোর নৌকো নেই?' 'না, নৌকো থাকবে কী করে?' 'কেন'—রবীন সহজ সুরে বলে—'গাছের ডাল কেটে অনায়াসে নৌকো তৈরি করা যায়।' আমি চুপ করে যাই। নদীতে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙার শব্দ হয় ছলাৎছল আর সেই শব্দ দিয়ে ধ্বনি দিয়ে অলক্ষ্যে যেন কত শত শত মালা গাঁথা হয়। কী করে এই বিষয়টাও এড়িয়ে যাব বুঝতে পারিনে। তারপর কখন যেন বলি—'না বাবা, নৌকো ফৌকোতে আমার দরকার নেই। আমার বড়ো ভয় করে। আমি সাঁতার জানিনে।'...

কিছুদিনের মধ্যেই রবীন গাছের ডাল ভেঙে একটা কাঠের নৌকো বানিয়ে ফেলল, সেটাতে চড়ে রবীন প্রায়ই দিনের বেলা ভ্রমণ করতে বেরুত—জল ভ্রমণ। এই ভ্রমণের ফলে রবীনের অগাধ ক্ষিধে হতে লাগল। সবুজ শ্যাওলায় রবীনের ক্ষিধে মিটত না কিছুই। তখন ও আমায় বার বার বলতে শুরু করল—'এবার তুই রান্না কর, এবার তুই রান্না কর।' অথচ রান্না করবার মতোন কোনো জিনিসই তখন আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ভোজ্যবস্তুর ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছিল তখন।...

ভেড়াটার ছাল, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি সব ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জল দিয়ে ওর চর্বিঅলা লালচে শরীরটাকে ভালো করে ধুয়ে ফেললুম। এবার ওটাকে একটা থালায় সাজিয়ে রাখি। ইতিমধ্যে রবীন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক হতে পেরেছে। থালার কাছে উবু হয়ে বসে লোলুপ দৃষ্টিতে ও ভেড়ার কাঁচা শরীরটা দেখতে থাকে। হাসতে হাসতে আমায় বলে—'কাঁচাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।' আমি কিছু বলার আগে রবীন নিজেই বাসনগুলো নিয়ে নদীতে ধুতে যায়, বলে—'কাজটাকে করলে ক্ষিধেটা আরও বাড়বে।' এতদিন বাদে রান্নার সংবাদে ওর যেন আর আনন্দের অবধি থাকে না। রবীন চলে গেলে হঠাৎ আমার খেয়াল হয় যে, ঘি তেল মশলাপাতি কিছুই আমার নেই। সবই এখন যোগাড় করতে হবে। কিন্তু কী করে করব? ভাবতে ভাবতে আমি প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। আরও কী আক্ষেপ করতে হবে অনেকদিন? সব কিছুই কী ব্যর্থ হবে শেষে। দেহের ভিতরে ক্ষিধেটা যেন চাগিয়ে ওঠে, ক্ষিধের চোটে মাথাটাথা ঝিমঝিম করতে থাকে আমার। কোনোও কুলকিনারাই খুঁজে পাইনে আমি। রবীন ফিরে এসে আমার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করে—'হল কী তোর?' আমি সমস্ত কিছু খুলে বলি ওকে। ও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায় না। বলে—'চল, ব্যবস্থা একাই হবেই, নৌকোটা কী এমনি এমনি তৈরি করেছি?' রবীন নদীতে নৌকোটা নামায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে নৌকোয় চড়তে হয়। নৌকো ভাসতে শুরু করে। কোথায় যে এই যাত্রা শেষ হবে, আমাদের দুজনের একজনও হয়তো তা জানত না। তবুও আমরা নৌকো বেয়ে যাই।...

নৌকো থেকে লাফিয়ে পাড়ে নামতেই দেখি সকলে সারবন্দী হয়ে আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে যেন ওরা জানত আমরা এই সময়েই এসে পৌছব। আমাদের দেখে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে—'এসেছে, এসেছে, অ্যাদ্দিনে এসেছে।' একগাদা জোয়ান ছোকরার দল হাত গুটিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসে—'এইবার, বাছাধনরা যাবে কোথায়?' ভয়ে আমার বুক ধুকধুক করতে থাকে তবুও মুখে যথাসম্ভব হাসি টেনে পালাবার পথ খুঁজি। কিন্তু তখন সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনো উপায়ই নেই। রবীনের উপরেই ওদের আক্রোশটা যেন বেশি। দুএকটা বাচ্চা ছেলে

নদীর পাড় থেকে কাদা ছুঁড়তে শুরু করে রবীনের গায়ে। ইতিমধ্যে ভিড় ঠেলে ওদের সকলের উত্তেজনাকে ঠাণ্ডা করে এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন। শান্তভাবে বলেন—'কী চাই?' আমি বিনীতভাবে আমাদের দরকারের কথা বলি। ভদ্রলোক শোনেন আর মুচকি মুচকি হাসেন—'সবই পাবে, সবই পাবে কিন্তু তার আগে...।' ওর কথা শেষ হবার আগেই ছোকরার দল আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে—'ধোলাই হবে, আড়ং ধোলাই।' 'না-আ-আ-আ।'—ভদ্রলোক মাথার উপরে দু'হাত তুলে জোর গলায় বলে ওঠেন—'পুলিশী মার দেওয়া হবে বন্ধুগণ রক্তপাত হবে না একফোঁটাও। বাঁধুন, ভালো করে ওঁদের বাঁধুন।' বৃদ্ধের আদেশ পালন করতে ওরা আর বিন্দুমাত্র দেরি করে না। চটপট শক্ত দড়ি দিয়ে আমাদের দুজনের হাত, পা মুড়ে বেঁধে ফ্যালে। তারপর শুরু হয় খেলা। আমাদের দুজনকে যেন ফুটবল বানিয়ে ওরা খেলতে থাকে। লাথি খেয়ে ওদিকে যাই আবার লাথি খেয়ে এদিকে আসি। ওদিকে যাই, এদিকে আসি। এদিকে আসি ওদিকে যাই। কে যেন একজন গলায় হারমনিয়াম ঝুলিয়ে বাজাতে থাকে বোধহয়। একটা রীডই টিপে থাকে তাই একটানা একঘেয়ে আওয়াজ হয়ে চলে পোঁ-ও-ও-ও-ও-ও।...

খুব করে স্নান করে অনেকটা বিশ্রাম নেবার পরও আমাদের গায়ের ব্যথা যায় না। হাত পা সব টন টন করতে থাকে। তবুও উঠি, মশলা বাটি। রবীন স্তূপীকৃত শুকনো গাছের ডালপালায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে। আমি ভেড়ার গায়ে মশলা মাখাই, পেটের ভিতরে মশলা পুরে সেলাই করে দিই। অনেকটা মশলা উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়। শরীরে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও উৎসাহে আমরা দুজনে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকি। একটা ডালের সঙ্গে ভেড়াটার হাত, পা বাঁধি, দুজনে ডালটার দু'দিক ধরে উলটে পালটে আগুনে পোড়াতে থাকি। একটু বাদে মশলা পুড়ে সুন্দর গন্ধ বের হয়। আমাদের জিভ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। খিদের চোটে পাকস্থলিটা যেন মুচড়ে মুচড়ে ওঠে ; বুঝিবা ওটা নিজেই হজম হয়ে যেতে চায়। ভেড়াটার গায়ে অল্প অল্প বাদামি রঙ ধরে।...

হঠাৎ দেখি আমাদের ঘর গলে যাচ্ছে। সূর্যের প্রখর তাপে যে ঘর গলেনি সেই ঘর, আমাদের সেই সাধের ঘর, এই আগুনের হলকায় গলতে থাকে। বরফের টুকরোগুলো ধীরে ধীরে গলে যায় আর কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো ঘরটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দেখেও আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই না। রবীনকে চিমটি কাটি, ও আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে বলি—'বুঝতে পারছিস, এসব ওদের শয়তানী। এসব হচ্ছে আমাদের রান্নাটাকে পণ্ড করবার চেষ্টা। ফাঁকা জায়গায় বাতাস পেয়ে আগুনের শিখাগুলি অসংলগ্নভাবে জ্বলতে থাকে, ছুটোছুটি করে বেড়ায় তবুও নিবিষ্টমনে আমরা আমাদের কাজ করে যাই। ভেড়াটাকে রোস্ট করতে আমাদের বেশ অসুবিধে হয়, তবুও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকি। রান্নার গন্ধ পেয়ে বন থেকে পাখির দল ছুটে আসে, মাথার উপরে আকাশে দলবদ্ধ হয়ে উড়ে বেড়ায়। আমাদের দেখে সাহস পায় না নামতে। ঠিক সেই সময়েই অকস্মাৎ সেই নাম না জানা বিকট চেহারাওলা কিন্তু দুঃখী দুঃখী পাখিটার ডাক শুনতে পাই। একটা বাচ্চা শিশুর মতো ওঁয়া ওঁয়া বলে কাঁদছে সেই পাখি, যেন সদ্য কোনো শিশুর জন্ম হয়েছে যার বাবা নেই মা নেই কেউ নেই তাই একফোঁটা দুধের জন্য আকুল হয়ে হাত, পা ছুঁড়ে কেঁদে যায় ভালো করে চোখ ফোটেনি ডাক ফোটেনি যার গলায়, সেই অসহায় শিশুটির বুকফাটা কান্নাকেই নকল করে পাখিটা আমাদের শোনাতে থাকে। আমাদের ভীষণ অস্বস্তি শুরু হয়, দুজনেই গম্ভীর হয়ে পড়ি। কান্নার আওয়াজ আরও বাড়তে থাকে। পাখিটাকে আমরা দেখতে পাইনে। হয়তো আগুনের ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে লুকিয়ে ছিল বনের ভিতর, আমরা শুধু সেই অভিভূত করা কান্নাটাই শুনতে থাকি। আমি রবীনকে চিমটি

কাটি। রবীন আমার দিকে তাকায়। আমি বলি—'বুঝতে পারছিস, এসব ওদের শয়তানী। আমাদের রান্নাটাকে পণ্ড করবার চেষ্টা করছে।' রবীন কোনো কথা বলে না। কী যেন ভেবে যায় আপন মনে। আমাদের রোস্ট করা শেষ হয়। রোস্টটাকে আমি একটা থালায় সাজাই, থালায় সাজিয়ে রাখবার সময় যেটুকু তেল মশলা আমার আঙুলে লেগেছিল তাই-ই আমি সন্তর্পণে জিভ দিয়ে চাটতে থাকি। পাখিটার কান্না আরও বাড়ে। আমরা কী করব কিছুই ভেবে পাইনে। পাখিটার কান্নার সুর আমাদের ভয়ানক বিমনা করে দেয়। রবীন চুপ করে কী যেন ভাবে। রান্না শেষ হলেও আমরা খেতে বসি না।...একসময় রবীন হঠাৎ বলে ওঠে—'খাবারটা থাক।' আমি সমস্তই বুঝতে পারি। এই ভয়ই আমি করছিলুম কিংবা এই কথাটাই হয়তো আমি রবীনের মুখ থেকে শুনতে চাইছিলুম। তবুও প্রশ্ন করি—'কেন?' 'খেতে ইচ্ছে করছে না আমার,' রবীন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় ; একটু থেমে বলে—'আমরা তো তবু শ্যাওলা খেয়ে কাটাতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়ে নাতিনাতনির জন্য তো সেটুকুও রইল না।' গলে যাওয়া ঘরটার দিকে রবীন ছলোছলো চোখ তাকিয়ে থাকে। আমি প্রতিবাদ করবার কোনো সাহস পাই না। একটা অজানা আতঙ্কে শরীর মন ছেয়ে যায়। তবুও ক্ষীণ কণ্ঠে বলি—'ওটা তো মিথ্যে কান্না।' 'হয়তো মিথ্যে, তবুও...।'—রবীন ঘন ঘন মাথা নাড়াতে থাকে। পাখিটার কান্না তখনও বড়ো করুণ হয়ে বাজে, আকাশ বাতাস জুড়ে সেই কান্না গলে গলে পড়ে। আমি সম্মুখে সেই বিশাল বনভূমি প্রতি দৃষ্টিকে প্রসারিত করে রাখি। চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে, বুকের ভিতর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। অনেকক্ষণ বাদে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলি—'ঠিক আছে, তাই হোক।' পাখিটার কান্না ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। চতুর্দিকে এক শান্ত নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। শুধু আকাশে দু-একটা পাখি তখনও ওড়াওড়ি করে বেড়ায়। আমি একটা বড়ো থালা দিয়ে খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখি। ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হয় নিজেকে, মনে এক লাফে বয়স বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। ক্ষিদের কোনো তাগিদ বোধ করি না। শুধু একটু শুতে পারলেই যেন বেঁচে যাই। কোনো কিছু করবারই ক্ষমতা নেই তখন। রবীন এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, কী যেন ভাবে আপনমনে, মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে বকে। আমার ভয় হয় ওকে দেখে, ওকে যেন একটা পাগলের মতোই দেখায়। একবার গিয়ে খাবারের ঢাকনাতে হাত দেয়, কিন্তু খোলে না কেননা তখুনি আবার শুরু হয় পাখিটার করুণ কান্না। রবীন ছটফট করতে থাকে। কী করবে কিছুই যেন ভেবে পায় না। আমি এবার নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করি, আমার চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে, মাটি ভিজে যায়। এ কষ্টের ভার আমি আর যেন বইতে পারিনে। তারপর একসময় রবীন ছুটে যায় আস্তাকুঁড়ের দিকে যেখানে আমি ভেড়ার নাড়িভুঁড়িগুলো ফেলে দিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে ও গোগ্রাসে সমস্ত গিলতে থাকে। আমিও আর সামলাতে পারি না নিজেকে, শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বসে পড়ি ওর পাশে। দুজনে মিলে খেতে থাকি ভেড়ার শিং, মাথা, নাড়িভুঁড়ি, চামড়া, এইসব। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। দুজনে মুখ মুছে তারপর সেই ঢাকা দেওয়া খাবারের থালাটার কাছে উবু হয়ে বসে থাকি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতোন। রোস্টের গন্ধ চারিদিক আমোদিত করে তোলে, সেই গন্ধের ঝাপটা এসে লাগে আমাদের নাকে। আর আমরা সেই গন্ধ নাকে নিতে নিতে কত দিনের যেন কত রাতের যেন কত বছরের বুঝি হাজরো হাজার বছরের ক্ষিধেয় শান দিতে থাকি।...

পরিশিষ্ট ৪

প্রকাশ ও মুদ্রণ বিষয়ক তথ্য

প্রথম সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন বাসুদেব দাশগুপ্ত। প্রকাশকও তিনি, ২৮১-৮, অশোকনগর। অশোনকনগর, ২৪ পরগণা-এই ঠিকানা থেকে সংকলনটি প্রকাশ করা হয়েছিল। মুদ্রক ছিলেন রাজলক্ষ্মী প্রেস, হাবড়া, ২৪ পরগণা। উপরন্তু বলা ছিল—যোগাযোগ ঃ ক্ষুধার্ত প্রকাশনী ৬নং বংশীধর মল্লিক লেন। কলকাতা-৭। দাম : ২ টাকা। সংকলটির একটি বিশেষত্ব হলো, আগাগোড়া বিভিন্ন হাল্কা রঙিন-কাগজে ছাপা।

দ্বিতীয় সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন সুভাষ ঘোষ। প্রকাশকও তিনি। ঠিকানা—চন্দননগর, হুগলী।
মুদ্রক—অধনু, ১৭/১-ডি সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা—১২।
যোগাযোগ—কনক ঘোষ c/o ললিতমোহন সাহা, বাউরিপাড়া, চন্দননগর, হুগলি। প্রচ্ছদ করেছিলেন অনিল করঞ্জাই।
দাম—দু টাকা। (যে মূল পত্রিকা আমাদের হাতে এসেছে সেখানে, মুদ্রিত দাম নীল কলমে কেটে লেখা আছে ৫ টাকা। (১)
এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপা আছে।

"কালো কাগজে মোড়া জরুরীকালীন ট্রেনের কোন্ কামরায় ঢুকবেন আপনি?
আমরা জানি। আপনি নিজের ভেতরেই নিজে অনুপ্রবিষ্ট—মারাত্মক ঝুঁকি !!

আপনি কে? আপনি কে? আপনি কে?

সামরিক বাহিনীর লোক আমি — এই আমার বন্দুক
আমি প্রেমিক — এই আমার চিঠি ও ফুলের তোড়া
আমি ফিল্ম হিরো — এই আমার নকল দাঁত ও নষ্ট যকৃৎ,
আমি ছাত্র — "বুর্জোয়া শিক্ষা নিপাত যাক"
আমি শ্রমিক — এই আমার সপ্তাহ-মজুরী
আমি বেশ্যা — এই আমার সংবেদনহীন অনুঘন

আমি দালাল, আমি সুদখোর, আমি ১০৮ স্বামীজি, I was the Ist boy; আমি সন্ন্যাসী, আমি অধ্যাপিকার নপুংসক স্বামী, আমি সেবাদাসী, আমি ক্ষেপণাস্ত্র ও কমপিউটার চালক……………

চুপ কর্ জারজ !!!

স্বকাল/১ এখনো পাওয়া যাচ্ছে। দাম একটাকা

●

'ক্ষুধার্ত' তৃতীয় সকংলন প্রকাশিত হয়, সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে। প্রকাশক—অরুণেশ ঘোষ, ঘুঘুমারি, কোচবিহার। মুদ্রক—পরেশনাথ গোস্বামী, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা-২। প্রচ্ছদসজ্জা : পৃথ্বীশ শিকদার। যোগাযোগ : শৈলেশ্বর ঘোষ, ১/৪ এ ওলাইচণ্ডী রোড, কলকাতা-৬৭। কলেবরে এটি বেশ বড়ো সংকলন। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬২। দাম : ৫.০০ টাকা। এই সংকলনের চতুর্থ মলাটের একেবারে নীচে বিজ্ঞপ্তি ছিল, 'ক্ষুধার্ত লেখকদের বই ও পত্রি-পত্রিকা সিগনেট বুকসপে পাওয়া যায়।' এই সংখ্যায় একটি সূচিপত্র রয়েছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত উইলিয়ম বারোজ-এর সাক্ষাৎকারটির অনুবাদকের কোনো নাম ছাপা নেই। এটি শৈলেশ্বর ঘোষের অনুবাদ।

●

চতুর্থ সংকলনটির সম্পাদনা করেছেন শৈলেশ্বর ঘোষ।
প্রকাশক :সুভাষ ঘোষ c/o ললিতমোহন সাহা, বাউরি পাড়া, পোঃ চন্দননগর। হুগলি। যোগাযোগ—১/৮বি ওলাইচণ্ডী রোড, কলকাতা ৩৭ (অর্থাৎ শৈলেশ্বর ঘোষের ঠিকানা)। মুদ্রক ছিলেন 'অধুনা', ১৭/১ডি সূর্যসেন স্ট্রিট কলকাতা-১২। এই সংকলনে কোনো আলাদা সূচিপত্র ছিল না। চতুর্থ মলাটে একটি গদ্যরচনা ছিল, যেটি সম্ভবত এই সংখ্যার সম্পাদকীয়। আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় এই সংকলনে প্রকাশিত চমকপ্রদ একটি বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ : প্রকাশক চাই/বাসুদেব দাশগুপ্তের উপন্যাস/ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর/
চতুর্থ সংকলনের দাম ছিল ১ টাকা। চতুর্থ মলাটের গদ্যটি ছিল এরকম—
বছর ছয় সাত আগে আমরা লিখেছিলাম, "আমরা শিল্পী সাহিত্যিক নই, হাজার হাজার শহরের গু গোবর টানতে রাজী নই আমরা, আমাদের কোন প্রতিভা নাই, প্রতিভাবানদের মতো পারিবারিক তাঁবেদারীতে আমরা অপারগ, বাংলা সাহিত্যের অংশ বা পরিশিষ্ট নই আমরা, যে কোন ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা সীমাহীন।" আজও বাংলা সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, সব বড়ো বড়ো দোকানদার, তাদের জনপ্রিয় মাল বিক্রির কেন্দ্র বাংলা সাহিত্য বাজার, আর আছে তারই আনাচে কানাচে ফড়েদের আনাগোনা—যারা দশরকম ইজমের বুলি কপচিয়ে খদ্দের পাকড়ায়—প্রকৃত হাংরি কবি লেখক এই করাপশনের মধ্যে ঢুকতে পারে না, ঢোকেনি, তারা এই গর্ব বোধ করে যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনানন্দ দাশ এবং ঋত্বিক ঘটকের মতোই চোলাই-এর বাজারকে এরাও ঘৃণা করে। স্বাধীনতাকে তারা সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়, এজন্য তাদের প্রভূত মূল্য দিতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে—স্বাধীনতার প্রশ্নটি আজ থেকে এক যুগ আগে ভারতবর্ষের ঘুমন্ত বিবেকের সামনে তুলে ধরেছিল এরা।—আমরা সেদিনই বুঝেছিলাম, স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না, স্বাধীনতা আদায় করতে হয়—আর দশ বার বছরে কত নকল বিদ্রোহীকে দেখা গেল গলায় শেকল পরে নিতে—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠাপূরণ করবে এরাই!

মাণিক, জীবনানন্দ এবং ঋত্বিককে আমরা হাংরি মনে করি—এদের চরিত্রের জন্য—যে কোনো সৃষ্টির সঙ্গে চরিত্রের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে বলে আমাদের বিশ্বাস আজ বা ভবিষ্যতে যে কেউ প্রকৃত অর্থে হাংরি তার কাছে এই চরিত্রশক্তি ও বৈশিষ্ট্য আমরা দাবি করি। হাংরি নাম সম্বল করলেই কেউ উৎরে যাবে না—অনেকেই যায়নি।

আমরা কোন দশকে বিশ্বাস করি না, হাংরি আন্দোলন কোন দশকে আবদ্ধ নয়—হাংরি

আন্দোলন একটা ফেনোমেনন—কে যেন পরিহাস করে বলেছিল,—'দশকে আটকে থাকে শশক আর মশক' অবশ্য তামাসার এইসব অপবিত্র ব্যাপারেও আমাদের ঘৃণা আছে। একটার পর একটা দশক যাবে, তার মধ্যেই থেকে ছিটকে আসবে এই 'বিপথে' কেউ কেউ, তার নিজস্ব পথটি খুঁজে নিতে, সত্যকে পেতে এবং ধ্বংস হতে, অর্থাৎ প্রকৃত জীবন শুরু করতে।"

●

পঞ্চম সংকলনটির সম্পাদক এবং প্রকাশক শৈলেশ্বর ঘোষ। শেষ মলাটের পাদদেশে লেখা আছে শৈলেশ্বর ঘোষ কর্তৃক ১/৮বি ওলাইচণ্ডী রোড, কলকাতা ৩৭ থেকে প্রকাশিত এবং অধুনা, কলকাতা-১২ কতৃক মুদ্রিত। এটিই সাতটি সংকলনের মধ্যে সবথেকে কৃশকায়। কোনো সূচিপত্র নেই। প্রচ্ছদে লেখকদের নাম মুদ্রিত আছে। চতুর্থ মলাটে দুটি উদ্ধৃতি মুদ্রিত আছে, একটি চিনদেশীয় লেখক লু সুন (১৮৮১-১৯৩৬)-এর এবং দ্বিতীয়টি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪)। এই সংকলনের দাম ছিল ৭৫ পয়সা। শেষ মলাটের উদ্ধৃতি দুটি :

> "যে জাতির কেবল নালিশের সাহিত্য আছে, তাদের কাছে আশা করার কিছুই নাই।...কিন্তু যে জাতির আভ্যন্তরীণ শক্তি রয়েছে, যারা বিদ্রোহ করার সাহস রাখে, তারা বিভিন্ন ঘটনায় জেগে ওঠে...তাদের বিলাপধ্বনি ক্রোধের গর্জনে পরিণত হয়...এই ধরণের সাহিত্য বিপ্লবের দূত হিসাবে কাজ করে।"
>
> —লু সুন

> ১. "কবিতা সকলের জন্য নয় এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগ্‌বলয় অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণির 'কবি'র স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে—এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোন প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না।" ২..."শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমনকি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন করে গড়তে চাচ্ছে।"
>
> —জীবনানন্দ দাশ

●

ক্ষুধার্ত ৬ সম্পাদনা করেছিলেন শৈলেশ্বর ঘোষ। সংকলনটির প্রকাশকও তিনি। ২৮ অরবিন্দ সরণি কলকাতা ৯০ থেকে প্রকাশিত হয়, অধুনা কলকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত। সূচিপত্রের পাশে জানানো হয়েছে, 'এই সংখ্যা প্রয়াত কবি ফাল্গুনী রায়ের প্রতি উৎসর্গীত।' কবি ফাল্গুনী রায় (৭ জুন ১৯৪৫-৩১মে ১৯৮১) প্রয়াত হবার কয়েক মাসের মধ্যে এই সংকলনটির প্রকাশিত হয়। ফলে এই সংখ্যায় ঘুরে ফিরে এসেছে সেই কবির প্রসঙ্গ। সংকলনটির মূল্য : ৪ টাকা। চতুর্থ মলাটে যে গদ্যটি লেখা ছিল সেটি এই রকম :

> প্রতিটি সৃষ্টিশীল আত্মার ভয়ের মূল এইখানে যে সে জানে, তাকে কেউ চায় না, (ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে সৃষ্টিশীলতার কোনই দাম নাই) বর্তমান পৃথিবীর কাছে সে অতি অপ্রয়োজনীয়। কবি জানেন যে আধুনিক সভ্যতা এক দুর্ভেদ্য জংগল এবং এই জংগলে আত্মরক্ষা করার কৌশল তার জানা নাই। যথার্থ কবিতা

তাই যা মানুষের সত্য আবেগকে জাগিয়ে দেয়, অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, মানুষের সাহস ও বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। কবিতার প্রধানতম উদ্দেশ্য মানুষকে জাগিয়ে তোলা, সমস্ত মানবজাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে—তা না হলে ধ্বংস অনিবার্য। মানুষ এখনও চিন্তা করতে শেখেনি বা শুরু করেনি, মনের দিক দিয়ে সে এখনও পশুস্তরে রয়ে গেছে—সে এখনও কুয়াশায় কিল্‌বিল্‌ করছে। বর্তমান পৃথিবী কোটি কোটি অদৃশ্য দানবে পূর্ণ—অথচ কবিদের ভাষায় শুধু প্যানপ্যানানি। নিজের নিরাপত্তার জন্য সে ব্যাকুল! কবি যখন আমাদের ভবিষ্যৎকে জানায় তখনই আমরা তাকে খুন করি কারণ আমরা সবাই বাস করি অনাগত সময়ের ভয়াবহ ভীতির অন্ধকারে—আমাদের এই সংস্কৃতিসম্পন্ন ধনতান্ত্রিক সমাজে কবিরা বাস করে কাকতাড়ুয়ার মতো! পৃথিবী চায় আজ শুধু দাসদের, ক্রীতদাসদের। প্রতিভার স্থান আস্তাকুঁড়ে!

সপ্তম সংকলনটি সম্পাদনা আর প্রকাশ করেন শৈলেশ্বর ঘোষ/২৮, ঋষি অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা-৯০ থেকে এবং কে. ডি. প্রিন্টিং ২৩ বি দমদম রোড, কলিকাতা-২ থেকে মুদ্রিত। শেষ এই সংকলনটিতে কোনো সূচিপত্র আলাদা করে নেই। নেই কোনো সম্পাদকীয় বা শেষ মলাটের গদ্য। শেষ মলাটের লেখকদের একটি নামতালিকা রয়েছে। সঙ্গে একটি শ্লোগান বা মন্তব্য—'THE TIGERS OF WRATH ARE WISER THAN THE HORSES OF INSTRUCTON,' সংকলনভুক্ত নিকানোর পারার (৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪—) কবিতাটির অনুবাদকের কোনো নাম নেই। পরে জানা গেছে এটি শৈলেশ্বর ঘোষের তর্জমা। সংকলনটির দাম ছিল-৪.০০ টাকা। এই সংকলনে দুটি বিজ্ঞাপন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সেগুলি :

প্রকাশিত হয়েছে

অরুনেশ ঘোষের গদ্যগ্রন্থ

অপরাধ আত্মার নিষিদ্ধ যাত্রা

দাম : ৪ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : কাগজের বাঘ
কলকাতা ইউনিভার্সিটি ও প্রেসিডেন্সী কলেজের
মাঝখানের রাস্তা—স্টল নং ৭১

হাংরি জেনারেশন-এর কবি লেখকদের
বই ও পত্রপত্রিকা "কাগজের বাঘ"
ও "পাতিরামে" পাওয়া যায়

প্রকাশিত হয়েছে

সুভাষ ঘোষের নতুন গদ্যগ্রন্থ

এ্যামবুশ

দাম : ৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : কাগজের বাঘ ও পাতিরাম

কেন এই বিজ্ঞাপন দুটি গুরুত্বপূর্ণ? প্রথম সংকলন (১৩৭৬) থেকে সপ্তম সংকলন (১৯৮৪)-এর মধ্যে প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর কেটে গেছে। প্রথমদিকে যে সংকলনগুলি মোটামুটিভাবে হাতে-হাতে, খানিকটা গোপন ইশ্‌তেহারের মতো ব্যক্তিগত প্রচারবৃত্তে (Private circulation) ছড়িয়ে দেয়া হতো, ক্রমে সেগুলি কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে স্থায়ী বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে। তৃতীয় সংকলনে (১৯৭৫) এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল যে, 'ক্ষুধার্ত লেখকদের বই ও পত্রপত্রিকা সিগনেট বুকসপে পাওয়া যায়।' তবে, সেই ঘোষণার পরের সংখ্যাতেই (১৯৭৭) নীচের বিজ্ঞাপনটি পাওয়া যাচ্ছে। পাঠকদের যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে 'ক্ষুধার্তের ঠিকানায়'। ১৯৮৪-তে সম্ভবত এই পরিস্থিতির বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। 'পাতিরাম' কলেজস্ট্রিট মোড়ের প্রখ্যাত লিট্‌ল-ম্যাগাজিন বিপণি আর অধুনালুপ্ত 'কাগজের বাঘ'-এর স্টলটি ছিল পি.সি. সরকার স্ট্রিটের মুখে, হেয়ার স্কুলের গায়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির ঠিক বাইরে। এই স্টলটিতে নানাধরণের 'প্রতিষ্ঠানবিরোধী' পত্রপত্রিকা বই, ছবি, গানের ক্যাসেট পাওয়া যেত। ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সমাদ্দার, অরিন্দম রায়, বিপ্লব মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন ভট্টাচার্য, জীবন সাহা, তাপস দত্ত প্রমুখের উদ্‌যোগে এবং উৎসাহে এই দোকানটি চলতো। সন্ধেবেলা ভিন্নধারার কবি-সাহিত্যিকদের ঢালাও আড্ডা হতো নিয়মিত। হাংরি কবি-লেখকদের সঙ্গে এই আড্ডায় প্রায় নিয়মিত দেখা যেত দীপক মজুমদার এবং অরূপরতন বসুকে। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, এমন এক 'প্রতিষ্ঠান'-পরিকীর্ণ তল্লাটে এই ছোট্ট দোকানটি এবং ছাত্রছাত্রী মহলে তার জনপ্রিয়তা ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হাংরি জেনারেশনের বইপত্র কলেজস্ট্রিটে এদুটি দোকানে সাড়ম্বরে বিক্রি হচ্ছে, সেই পরিবেশটিও একই কারণে পরবর্তী পাঠকদের নজরে রাখা প্রয়োজন।

ক্ষুধার্ত সংকলনটির সাতটি সংখ্যার দিকে তাকালে, বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিহ্ন আমাদের চোখে পড়বে। কবিতা বা গল্পের আঙ্গিক তথা ভাষার ক্ষেত্রে তাঁরা একদিকে চমকপ্রদ কয়েকটি প্রায়োগিক নিরীক্ষা যেমন করছিলেন, অন্যদিকে লক্ষণীয়, তাঁরা মুদ্রণের ক্ষেত্রেও প্রচলিত পরিপাট্যের ধারণাকে ভেঙে দিচ্ছিলেন। হরফের আকার বৈচিত্র্য এনে, কখনো কখনো হরফের নিয়মিত বিন্যাস পালটে তাঁরা আক্রমণ করতে চাইছিলেন অভ্যস্ত পাঠপ্রক্রিয়াটিকেই। সাহিত্যের এমন দৃশ্যরূপ পরিবর্তনটিকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানবিরোধী জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি হিসেবেই গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন।

সব মিলিয়ে এই সাতটি সংখ্যা ক্ষুধার্ত সাহিত্য আন্দোলনের মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল।